ধন্বন্তরি।

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

দ্বিতীয় বর্ষ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত।

কলিকাতা।

২১৭ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট বিদ্বৎসভা-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

শাখা কার্য্যালয়—৮৪ নং বেচু চাটুয্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্বিতীয় বর্ষের সূচীপত্র।

ধন্বন্তরি।

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

দ্বিতীয় বর্ষ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত।

কলিকাতা।

২১৭ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট বিদ্বৎসভা-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

শাখা কার্য্যালয়—৮৪ নং বেচু চাটুয্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্বিতীয় বর্ষের সূচীপত্র।

ধন্বন্তরি।

মাসিক পত্র।

২য় বর্ষ, { কার্ত্তিক ১৩২৩, ইং ১৯১৬ অক্টোবর, নবেম্বর, { ১ম সংখ্যা।

শ্রীশ্রী৺ জগদ্ধাত্রী।

জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী, জগতের রক্ষাকর্ত্রী,
জগৎসবিত্রী মহামায়া।
ভীষণ সিংহ-বাহিনী, নাগ-যজ্ঞোপবীতিনী,
নগেন্দ্র-নন্দিনী শিব-যায়া।
প্রফুল্ল কমলাসনা, রতন-রাজি-ভূষণা,
লোহিত বরণা ত্রিনয়নী।
কিবা বর-বপু-শোভা, বাল-সূর্য্য-সমপ্রভা,
মনলোভা মহেশমোহিনী।
রক্ত বস্ত্র পরিহিতা, অস্ত্র শস্ত্র সমন্বিতা,
দেবতা সেবিতা বরাননী।
শঙ্খ-চক্র-ধনুর্ব্বাণ, চতুর্ভুজে শোভমান্,
বলবান্ অসুর-দলনী।
নারদাদি মুনিগণে, দিবানিশি একমনে,
পরম যতনে যাঁরে সেবে।
প'ড়ে ঘোর ভবপাকে, কেমনে পূজিব তাঁকে,
বিষয় বিপাকে মরি ভেবে।
ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করি, রক্ষা কর শুভঙ্করি,
শঙ্করি করুণা কর দান।
ভজন-সাধন-হীন, মায়া মোহে অনুদিন,
মুগ্ধ-দগ্ধ দীনে কর ত্রাণ।

শ্রীনকড়ি রায় গুপ্ত।

কি চাহি?

আমি—চাহিনা স্বর্ণ চাহিনা রৌপ্য
চাহিনা হর্ম্ম্য চাহিনা মান।
জানিনাক প্রভু! ধর্ম্মাধর্ম্ম
জানিনা কর্ম্ম জানিনা জ্ঞান॥
ব্যথিত মর্ম্ম টুটাও কর্ম্ম
দাও হে শর্ম্ম ভাসিব সুখে।
নতুবা ক্ষণেক বিনাশী অর্থ
লভিয়া ;—হারায়ে বাজিবে বুকে॥
কি হবে অতুল অশন-বসন
ভূষণ শয়ন আসন রাশি।
দুদিনে যাইবে সকলি চলিয়া
কালস্রোতে মিশি কোথায় ভাসি॥
থাকিবে শেষেতে তোমার দত্ত
করপুটখানি, শীতল জল।
আর অবিরল নির্ম্মলানিল
শয্যা শ্যামল দূর্ব্বা দল॥
সকল শ্রেষ্ঠ সবার প্রেষ্ঠ
গাইব ইষ্ট দেবের নাম।
ঝরিবে অতুল অমিয়ের ধারা
শীতল হইবে তাপিত প্রাণ॥

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় ব্যাকরণতীর্থ।

হিতবাদী ও বৈদ্যজাতি।

অধ্যাপক—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, এম্, এ।

গত ৩০শে ভাদ্র তারিখের হিতবাদীতে "শাস্ত্রীয় কর্ম্মফল" নামক প্রবন্ধে কোনও অজ্ঞাত কুলশীল অল্পদর্শী ব্যক্তি বৈদ্যজাতিকে আক্রমণ করিয়া বেশ একটু ঝাল ঝাড়িয়াছেন। ইহাতে বৈদ্যজাতির বিশেষ দুঃখিত হইবার কারণ দেখি না, যেহেতু ইহা কালধর্ম্ম। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া দেখিতেছি, অতি নিরক্ষরেরাও মধ্যে মধ্যে বৈদ্যের জাতি লইয়া অম্লানবদনে প্রকাশ্য সংবাদপত্রে বৃথা গবেষণায় ব্যস্ত হয়, এবং যাহা খুসী একটা মনগড়া সিদ্ধান্ত করিয়া সুখী হয়। খ্রীষ্টান্ মিশনরীরা যেমন খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকল্পে হাটে মাঠে সর্ব্বত্রই হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ না করিয়া নিজেদের ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারেন না, হতভাগ্য বঙ্গদেশেও তদ্রূপ অপরজাতীয়েরা যত্রতত্র বৈদ্যদিগের সম্বন্ধে অজ্ঞানমূলক নানা কথা কহিয়া, স্ব স্ব জাতির প্রাধান্য প্রতিপাদনে যত্নবান্ হইতেছেন। হিতবাদী পত্রেও ঐরূপ অজ্ঞানমূলক যুক্তিতে বৈদ্যকে অব্রাহ্মণ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আমরা লেখক মহাশয়ের নাম জানিনা, নচেৎ তাঁহাকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া, বা তাঁহারই গৃহে গমন করিয়া—তদীয় শ্রীমুখ হইতে সকল কথা সবিশেষ শ্রবণ করিয়া চরিতার্থ হইতাম। আহা! হিতবাদী পত্রের বৈদ্যস্বত্বাধিকারী মহাশয় তাঁহার পত্রের সাহায্যে দেশস্থ স্বজাতিবৃন্দকে আপ্যায়িত করিবার কি সুন্দর উপায়ই বাহির করিয়াছেন! ইহা কি তাঁহার শুভ শারদীয়া ৺ মহাপূজার উপহার নাকি?

জাতিত্ব ও বর্ণত্ব সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণাদিতে প্রগাঢ় অধিকার থাকা আবশ্যক। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধলেখকের যে এ বিষয়ে কিছুমাত্র পড়াশুনা বা বোধশক্তির উন্মেষ হয় নাই, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি বৈদ্যকে কখনই অব্রাহ্মণ বলিবেন না। তৎপ্রযুক্ত 'ব্রাহ্মণ' শব্দ জাতিবোধক, ধন্বন্তরি-সম্পাদক মহাশয় বোধহয় ভ্রমক্রমে শব্দটিকে বর্ণবোধক জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বৈদ্য পিতৃবর্ণানুসারে ব্রাহ্মণবর্ণীয় হইলেও জাতিতে ব্রাহ্মণ নহেন। এইজন্যই মুখ্য ব্রাহ্মণ বা যাজনোপজীবী ব্রাহ্মণগণ হইতে বৈদ্য ব্রাহ্মণের স্বাতন্ত্র্য! এই জন্যই বৈদ্যকে "বৈদ্য" বলিয়াই অব্রাহ্মণ বলা যায় না। "গুরু" এবং "পুরোহিত" বলিলে, যেমন ব্রাহ্মণ বর্ণীয় প্রথম জাতি বুঝায়, "বৈদ্য" বলিলেও তেমনই ব্রাহ্মণবর্ণীয় তৃতীয় জাতিকে বুঝাইয়া থাকে। বৈদ্য ব্রাহ্মণ বলিয়া অগ্রজ ব্রাহ্মণের অধিকার এবং গৌরব অপহরণ করিতে ইচ্ছুক নহেন, পরন্তু সমাজে অগ্রজের নিম্নে অনুজের উপযুক্ত স্থান অধিকার করিতেই অভিলাষী। ব্রাহ্মণ বৈদ্যের গুরু, কিন্তু অন্য বর্ণের নিকট বৈদ্য ব্রাহ্মণসম্মান এবং গুরুবৎ পূজার অধিকারী।

আমরা অতি সংক্ষেপে লেখকের সংশয় অপনোদন করিতে চেষ্টা করিব। ব্রাহ্মণ শব্দ ব্রাহ্মণবর্ণ ও ব্রাহ্মণ জাতিবোধক, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই যে ব্রাহ্মণাদি প্রধানতঃ ৩৬ জাতি ও তৎপরে অসংখ্য জাতিতে বিভক্ত বিরাট আর্য্য হিন্দুসমাজ, ইহা চারিটি মূলবর্ণে বিভক্ত। অর্থাৎ প্রত্যেক জাতিকেই একটি না একটি বর্ণের মধ্যে পড়িতে হইবেই—বর্ণহীন কেহই নহে। সেবা, স্বাধীনবৃত্তি, ক্ষাত্রকর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণ কর্ম্ম, এই চারিপ্রকার বৃত্তি ও কর্ম্ম এবং তদনুরূপ ধর্ম্মে বর্ত্তমান থাকার জন্য সেকালের প্রাচীন আর্য্যসমাজে দ্বিজাতি সাধর্ম্ম্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য একরূপ তুল্য ছিলেন,

এবং একজাতি শূদ্র ঐ ত্রিজাতি হইতে পৃথক্ ছিল। ইহাও তত প্রাচীন কালের কথা নহে। কালক্রমে ঐ শ্রেণীগুলি পরস্পর হইতে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হইয়া কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপবিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রাচীনতম যুগে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের মধ্যে যথেচ্ছ যৌণ সম্পর্ক সুতরাং পানাহারাদিও চলিত। তৎপরবর্ত্তীযুগে ত্রিবর্ণীয় দ্বিজগণের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল দেখিতে পাই; তখন শূদ্রা বিবাহ নিষিদ্ধ হইতেছিল। ঐ সময়ে এবং পরবর্ত্তী সময়ে দ্বিজাতিগণের মধ্যে প্রতিলোম বিবাহ সমাজের ক্ষতিকর বলিয়া নিন্দিত এবং নিষিদ্ধ হইয়াছিল। অনুলোম বিবাহ তখনও সবর্ণ বিবাহের তুল্য বলিয়া প্রচলিত ছিল। সেই আর্যযুগে ব্রহ্মণেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কন্যাকে যথেচ্ছ বিবাহ করিতে পারিতেন। ঐ ত্রিবর্ণীয়া কন্যাই বিবাহকালে গোত্রান্তর প্রাপ্তির ন্যায় পতি-সবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইত। এই জন্য ব্রাহ্মণের ঐ ত্রিবিধ পুত্রই ব্রাহ্মণ হইত। কিন্তু মাতামহের কুলগৌরব অনুসারে তাহাদের উৎকর্ষ অপকর্ষ স্বীকার করা হইত। এইরূপে যাজনোপজীবী মুখ্য ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত (মূর্দ্ধাবসিক্ত) ব্রাহ্মণ ও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছিল। অতএব দেখা গেল, এক ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যে তিন জাতি ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইতেন। কালে ঐরূপ বিবাহপ্রথা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং ব্রাহ্মণগণও কালে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের সহিত বিবাহাদি আদান প্রদান বন্ধ হইয়াছিল। সুতরাং তখন বর্ণে ব্রাহ্মণ হইলেও পরস্পর হইতে বিশিষ্টতা দেখাইবার জন্য মুখ্য ব্রাহ্মণেরা "ব্রাহ্মণ"শব্দ এবং বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ কেবল "বৈদ্য" শব্দ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের যে সকল বৈদ্য-ব্রাহ্মণ নানাকারণে উপবীত ত্যাগ করিয়া কায়স্থাচার অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা শুদ্ধাচার বৈদ্য হইতে আপনাদিগকে পৃথক্ বুঝাইবার জন্য অদ্যাপি বৈদ্য-কায়স্থ সংজ্ঞার বিষয়ীভূত হইয়া পড়িতেছেন। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণাচার বৈদ্যেরা "বৈদ্যব্রাহ্মণ" বলিয়াই সাধারণ্যে সর্ব্বত্র বিদিত রহিয়াছেন। এই জন্যই বোপদেব আত্মপরিচয় দান প্রসঙ্গে আপনাকে বৈদ্য এবং ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—"বিদ্বদ্ধনেশ্বরচ্ছাত্রোভিষক্ কেশবনন্দনঃ। বোপদেবশ্চকারেদং বিপ্রো বেদপদাস্পদম্"। (মুগ্ধবোধ)। অপিচ, বিদ্বদ্ধনেশ শিষ্যেণ ভিষক্ কেশবসূনুনা। তেন বেদ পদস্তেন বোপদেবদ্বিজেন যঃ॥" (কবিকল্পদ্রুম)। দেশানাম্ বরদাতটং বরমতঃ সর্ব্বাভিধানং মহাস্থানং বেদপদাস্পদাগ্রজগণাগ্রগণ্যং সহস্রং দ্বিজাঃ। তত্রামিয়ু ধনেশ কেশববিদৌ বৈদ্যৌ বরিষ্ঠৌ ক্রমাৎ চক্রে শিষ্যসুতস্তয়োঃ কৃতিমিমাং শ্রীবোপদেবঃ কবিঃ॥" (শতশ্লোকী)। সেই আর্য্যশাসনের দিনে মুখ্য ব্রাহ্মণগণ কাব্যকলার আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া যাজন্য লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। নিজেদের ও অপরের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শুভসম্পাদনের জন্যই সেই সকল জগদ্বন্দ্য ব্রাহ্মণসন্তানেরা সর্ব্বলোকহিতকর আয়ুর্ব্বেদের চর্চ্চাও পাতিত্যজনক বলিয়া ভাবিতেন ("ব্রাহ্মণং ভিষজং দৃষ্টা সচেলং জলমাবিশেৎ")। এই জন্য বোপদেবাদি ভিষক্‌গণ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং বৈদ্যকর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বৈদ্যের জীবিকা অপহরণ করিয়াছিলেন—ইহা কদাচ ভাবা উচিত নহে। পরন্তু তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন বলিয়াই ভিষক্ এবং বৈদ্য, শব্দের সহিত 'বিপ্র' শব্দ গ্রহণ করিয়া আত্মপরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু আজি বঙ্গের এতাদৃশী অবনতি ঘটিয়াছে যে, একজন শিক্ষিত এম্, এ, উপাধিধারী ব্যক্তিও 'দ্বিজ' শব্দ শ্রবণমাত্র ব্রাহ্মণই বুঝিয়া বসেন! দ্বিজ শব্দের এই নূতন অর্থ কতকালের জানি না। কিন্তু ভক্তচূড়ামণি বৈদ্য রামপ্রসাদ যখন 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন, তখনও যে "ব্রাহ্মণ" এই অর্থে ইহা নিশ্চিত। নচেৎ তৎকালে চলিত ভাষায়

দ্বিজশব্দে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের ধারণা হইলে, তিনি ওরূপ সন্দিগ্ধ-প্রয়োগ করিতেন না। সেদিনও স্মার্ত্ত মহাশয়েরা বৈদ্য রাজত্বাবসানে মুসলমান শাসিত বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা করিবার জন্য সমাজে যখন বিবিধ ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেছিলেন, তখন কি জানি কি বুঝিয়া, চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের মূলোচ্ছেদ করিয়া ব্রাহ্মণ ভিন্ন দেশস্থ সমস্ত জাতিগুলির পাতিত্য ঘোষণা করিয়াছিলেন। কেবল নিজেরা ও নিজেদের স্বজাতীয়েরা অক্ষুণ্ণ ব্রাহ্মণ্যের অধিকারী রহিলেন, এবং দেশের অবশিষ্ট সকলেই শূদ্ররূপে পরিণত হইল! তাই "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব চ," "ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াণাং শূদ্রত্বম্" "এবম্ বৈশ্যানাম্ অপি" ইত্যাদি। এই সমাজবিপ্লবের কেহ খোঁজখবর রাখেন কি? আমরা এখানে কেবল বৈদ্যদিগের কথাই বলিব। বৈদ্যদিগের ক্রমিক অবনতি কিরূপে ঘটিয়াছিল, প্রত্যক্ষ করুন। "সত্যে বৈদ্যাঃ পিতুস্তুল্যা স্ত্রেতায়াঞ্চ তথৈব চ। দ্বাপরে ক্ষত্রবৎ প্রোক্তাঃ কলৌ বৈশ্যোপমা হি তে॥" 'ইদানীং অম্বষ্ঠাদীনাং শূদ্রবৎ ব্যবহারঃ' বলিয়া সেদিনকার রঘুনন্দন বৈদ্যদিগকে কিরূপ আপ্যায়িত করিয়াছেন, দেখুন। "শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাৎ অষ্ঠ তা বৈদ্যজাতয়ঃ। কলৌ শূদ্রসমাঃ জ্ঞেয়াঃ যথা ক্ষাত্রাঃ যথা বিশঃ॥" তারপর "অতিদিষ্টং হি বৈদ্যস্য শূদ্রত্বং ক্ষত্রিয়াদিবৎ। তস্মাৎ ক্ষাত্রবিশোস্তুল্যো বৈদ্যঃ শূদ্রস্য পূজিতঃ॥" এক্ষণে সমাজবিপ্লবের ধারণাটুকু লেখক মহাশয়ের হইতেছে কি? এখন ইতিহাসের প্রমাণ দেখুন। Indian Antiquary তে কোল্‌ব্রুক ঐ সমাজবিপ্লবের চিত্র সুস্পষ্ট অঙ্কিত করিয়াছেন। মুসলমান রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া যখন রাজা গণেশ বঙ্গসিংহাসন কিছুকালের জন্য পুনরধিকার করেন, তখন রাজ শাসনের বলে স্মার্ত্ত ব্যবস্থা পাকাপাকি করিয়া লইবার জন্য বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ কি করিয়াছিলেন দেখুন—"ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদবেদাঙ্গাদি ধর্ম্মশাস্ত্রামর্দ্দতয়া যজনাদিষট্‌কর্ম্মসু নৈষাম্ অধিকারাস্তিষ্ঠন্তি।............যতঃ এতে পিতৃসংসর্গাত্ত্যাগিনঃ আচারভ্রষ্টাশ্চ অভবন্, অতঃ মাতৃকুলাশৌচভাগিন-ষট্‌কর্ম্ম সন্ত্যজ্য চিকিৎসাবৃত্ত্যৈব জীবিষ্যন্তি। তথা পোষ্যবর্গ পরিপোষণায় অষ্ঠ বৈশ্যবৃত্তিং করিষ্যন্তি" —ইতিআবেদন পত্রম্।

রাজা গণেশের আজ্ঞাপত্র যথা—"সত্য ত্রেতা দ্বাপরেষু বৈদ্যাঃ তপো জ্ঞানযুক্তাঃ বিদ্বাংসশ্চ আসন্। সম্প্রতি এতে শক্তিহীনা আচারভ্রষ্টাশ্চ অভবন্। অতঃ শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ গণেশচন্দ্র নৃপতে রনুজ্ঞয়া বিপ্রাণামনুরোধাৎ অদ্য প্রভৃতি অম্বষ্ঠা বৈশ্যাচারিণো ভবিষ্যন্তি, মূলা ব্রাহ্মণাঃ অম্বষ্ঠৈঃ সহ ভোজনাদিকং নাচরেয়ুঃ। যে ব্রাহ্মণাঃ অমীভিঃ সহ ভোজনাদিকং করিষ্যন্তি তে পতিতা ভবিষ্যন্তি ইতি॥" লেখক মহাশয় এখন নিজের মত পরিবর্ত্তন করিবেন কি?

এখন কয়েকটী স্মৃতির প্রমাণ গ্রহণ করুন—

(১) "সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু। আনুলোম্যেন সম্ভূতাঃ জাত্যা জ্ঞেয়া স্ত এব তে।" (২) "উঢ়ায়ান্ত সবর্ণায়াম্ অন্যাং বা কামমুদ্বহেৎ। তস্যামুৎপাদিতঃ মনু পুত্রঃ ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে॥" ব্যাস।

(৩) "তিস্রো ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য......তাস্বপত্যং সমম্ ভবেৎ॥" মহাভারত।

(৪) "ত্রিষু বর্ণেষু পত্নীষু ব্রাহ্মণাৎ ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥" মহাভারত।

(৫) "মাতা ভ্রাতা পিতুঃ পুত্রঃ যেন জাত স এব সঃ॥" বিষ্ণু।

(৬) যদেতৎ জায়তেঽপত্যং স এবায়ং ইতি শ্রুতিঃ।
এবম্ এতন্মহারাজ যেন জাতঃ স এব সঃ॥

(৭) ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ অসংশয়ম্।
ক্ষত্রিয়ায়াং চ যঃ পুত্রো ব্রাহ্মণঃ সোহপাসংশয়ম্।
তথৈব ব্রাহ্মণশ্চ স্যাৎ বৈশ্যায়ামপি ব্রাহ্মণাৎ॥
মহাভারত।

(৮) "ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ নসংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাৎ বৈশ্যায়াং চ তথৈব চ।"

(৯) "তাসু পুত্রাঃ সবর্ণানন্তরাসু সবর্ণাঃ।" বৌধায়ন।

(১০) "ত্রিষু বর্ণেষু জাতো হি ব্রাহ্মণাৎ ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥" ইত্যাদি।

লেখক জানিতে চাহিয়াছেন, বৈদ্যদিগের পিতৃ-পুরুষেরা কি বলিয়া পরিচয় দিতেন? ইহার উত্তর উপরে একরূপ দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে আরও একটু বলিলাম—"ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো জ্ঞানাৎ ক্ষাত্রো বীর্য্যাৎ চ দৈহিকাৎ। রাজা ভুবোঽধিকারাচ্চ সোঽম্বষ্ঠশ্চ চিকিৎসনাৎ॥" ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। "সত্য-ত্রেতাদ্বাপরেষু যুগেষু ব্রাহ্মণাঃ কিল। ব্রহ্মক্ষত্রিয় বিটসশূদ্র কন্যকা উপযেমিরে॥ তত্র বৈশ্য সুতায়াং যে জজ্ঞিরে তনয়া অমী। সর্ব্বে তে মুনয়ঃ খ্যাতা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ॥ বিদ্যাসমাপ্তৌ ভিষজস্তৃতীয়া জাতিরুচ্যতে। তস্মাৎ বৈদ্যঃ ত্রিজঃ স্মৃতঃ। স ব্যহৃতিং চ গায়ত্রীং পুটিকাং প্রণবেন চ। উপনীতঃ পঠেৎ বৈদ্যঃ নরসিংহার্চ্চনং চরেৎ। প্রণবাদ্যৈঃ স্বাহান্তৈশ্চ মন্ত্রস্যা হরণং চরেৎ॥" পদ্ম। লেখক যে নরসিংহার্চ্চনার কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও ত পাইলেন? এখন বলুন, ব্রাহ্মণের পুত্র বৈদ্য যে ব্রাহ্মণ ইহাতে সংশয়ই বা হয় কিরূপে, আর প্রমাণই বা কেন দিতে হয়?

অশৌচের কথা লেখক যাহা বলিয়াছেন, তাহা একান্ত উপহাস্য। স্মার্ত্ত যাজক ব্রাহ্মণগণ কতক-গুলি বৈদ্যকে বৈশ্যাচার দেখিয়া অতীব অন্যায় করিয়া সমগ্র বৈদ্যজাতিকে বৈশ্যধর্ম্ম পালনে বাধ্য করিয়াছিলেন। ইহাদের নামান্তে বৈশ্যত্বব্যাপক গুপ্ত উপাধি সংযোগ করিয়া এবং ব্রাহ্মনোচিত সংস্কারের অনধিকারী করিয়া সমগ্র জাতিকেই অব্রাহ্মণ করিয়া তুলিয়াছেন। অগ্রজ ব্রাহ্মণগণের অনুজের প্রতি এই অত্যাচার না ঘটিলে আমরা ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশের ন্যায় এই বঙ্গেও বৈদ্যগণকে ব্রাহ্মণ নামের ও সংস্কারের অক্ষুণ্ণ অধিকারী দেখিতে পাইতাম। আর অশৌচের দিন সংখ্যা ধরিয়া যাহাদের দশ দিনে অশৌচ তাহাদের সকলকেই যদি ব্রাহ্মণ বলিতে হয়, তবে হাড়ী ও ডোমেরা ঐ প্রমাণের বলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়! উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তিন দিনে অশৌচান্ত করিয়া থাকে, এমন জাতি বিশেষও আছে—তাহারা কোন্ বর্ণীয় হইবে? বস্তুতঃ অশৌচ কালের অল্পতা বা দীর্ঘতা বর্ণনির্ণয়ে প্রমাণ বলিয়া কুত্রাপি স্বীকৃত হয় না।

কাজির বিচার।

পাঠ্যাবস্থায় গ্রীষ্মের ছুটীর সময় একদিন কয়েকটি বয়স্য সমবেত হইয়া একস্থানে তাস খেলিতেছিলাম। সেই বাড়ীর একটী বালিকা তিন চারিদিন জ্বরে ভুগিতেছিল, তাহার চিকিৎসার জন্য একজন কবিরাজ ডাকা হয়। আমরা যেখানে বসিয়া খেলিতেছিলাম, কবিরাজ মহাশয়ও সেই স্থানেই আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, বালিকাটীকেও সেই স্থানেই আনা হয়। কবিরাজ মহাশয় বালিকাটীর হাত দেখিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, এবং এক-প্রকার বটীকা ঔষধ প্রদান পূর্ব্বক জীরার চূর্ণ ও মধু অনুপানের সহিত বটীকা সেবনের ব্যবস্থা করিলেন।

আমরা সকলে খেলায় তন্ময় হইয়া থাকিলেও, কবিরাজ মহাশয় যাহা বলিতেছিলেন, তাহার মর্ম্ম গ্রহণে কাহারও অসুবিধা বোধ হয় নাই। কবিরাজ মহাশয়ের অনুপানের ব্যবস্থা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'ভাজা জীরা কি কাঁচা জীরার চূর্ণ দিতে হইবে?' কবিরাজ মহাশয় বলিলেন,—'ভাজা জীরা।' একটী বয়স্য অমনি বলিয়া উঠিলেন—'ভাজা জীরা গরম হইবে।' কবিরাজ মহাশয় অমনি বলিলেন—'ভাজা জীরা নয় কাঁচা জীরা।' অপর একটী বয়স্য বলিলেন,—'কাঁচা জীরা যে শৈত্যগুণ বিশিষ্ট।' তখন কবিরাজ মহাশয় বলি-লেন—'অর্দ্ধেক ভাজা অর্দ্ধেক কাঁচা।' কবিরাজ

মহাশয়ের এই চূড়ান্ত মীমাংসায় আমরা তখন যে আমোদ উপভোগ করিলাম, তাহাতে আমাদের তাস খেলার অবসান হইল। বলিয়া রাখা ভাল যে, এই কবিরাজ মহাশয় জাতিতে নাপিত ছিলেন ; তাহাতেই আমাদের ঐরূপ বাদানুবাদ করিবার সাহস হইয়াছিল, এবং তাহাতেই তাহার দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার পরিচয় পাইবার সুবিধা পাইয়াছিলাম।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষার গড়া-পেটা লইয়া নবীন লেখকদিগের মধ্যে যে একটা মসীযুদ্ধ চলিতেছে, দেখিতেছি, কোন কোন লেখক কবিরাজ মহাশয়ের এই অনুপান-ব্যবস্থার ন্যায় ভাষা-গঠনের ব্যবস্থা করিয়া সন্ধিস্থাপনের উপদেশ খয়রাৎ করিয়াছেন! একজন বলিতেছেন,—"এ বিষয়ের মীমাংসা হওয়া যে এখনকার দিনে কিছুতেই সম্ভবপর নহে, এ কথা কেহই বুঝিতেছেন না—কেহই সন্ধি করিতে প্রস্তুত নহেন। আমরা একটা মোটা কথা বলিতে চাই। আমরা বলি যে, আজকালকার দিনে যুক্তিতর্ক খাটিবে না—যাহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই করিবেন, কাহারও 'স্বাধীন মতেই' কেহ বাধা দিতে পারিবেন না! মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার দিনে যাহার যাহা খুসী, তাহাই লিখিবেন। সাহিত্যক্ষেত্রে কেহ কাহারও কথায় চলিবে না। সুতরাং তর্ক বিতর্ক নিতান্তই নিস্ফল।"

আমাদের বিশ্বাস, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় যাহার যাহা ইচ্ছা ছাপিয়া একটা খাড়া করিতে পারিলেও সমালোচক মহাপ্রভুরা যদি প্রশ্রয় না দেন, তাহা হইলে উহা দাঁড়াইতে পারে না। ভাষার একটা (Standard) আদর্শ থাকা নিতান্ত দরকার। এই আদর্শ স্থিরতর রাখিবার কর্ত্তা সমালোচক। সমালোচক যদি পেটের দায়ে, আশ্রিতবাৎসল্যে অথবা বন্ধুত্বের খাতিরে কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা না করেন, তাহা হইলে, কাহার সাধ্য যে, যাহার যাহা খুসী তাহা লিখিয়া—কাহারও কথায় না চলিয়া পার পাইতে পারেন? আমরা অনেকবার বলিয়াছি, পুস্তকবিক্রেতা প্রকাশকদিগের অর্থলালসা পুরি-তৃপ্তির জন্যই এইসকল কালাপাহাড়ী লেখকের বংশ বৃদ্ধি পাইতেছে। যাঁহার লেখা হইতে উল্লিখিত পংক্তিনিচয় উদ্ধৃত হইয়াছে, তিনি যে এইসকল লেখকের একজন প্রধান উৎসাহদাতা, তাঁহার সম্পাদিত কাগজেই যে এইসকল আবর্জ্জনাস্তূপ বহন করিয়া সমগ্র বঙ্গ পূতিগন্ধময় করিয়া তুলি-তেছে, তিনি তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। তাই বুঝি এইরূপ 'কাজির বিচারের' ব্যবস্থা?

নিতান্ত বে-কায়দায় পড়িয়া যিনি এই 'কাজির বিচারের' পক্ষপাতী, তিনি অপর কেহ নহেন, ভারতবর্ষ-সম্পাদক আমাদের চির-প্রিয়সুহৃদ্ জলধর ভায়া। তিনি চিরকালই, গোলমাল যেখানে দেখেন, সেখান হইতে শত হস্ত ব্যবধানে থাকেন। তাই তিনি বলিয়াছেন,—"যাহার যাহা মর্জ্জি তিনি তাহাই লিখিয়া যান, একজন আছেন, যিনি একদিন ইহার মীমাংসা করিবেন ; তিনি কাল। তিনি কাহারও মুখের দিকে চাহিবেন না, তিনি কাহারও যুক্তি মানিবেন না। তাঁহার হাতে পড়িয়া যিনি টিকিয়া থাকিবেন, তাঁহারই জয়।"

জলধর বাবু ভাল ব্যবস্থাই করিয়াছেন! কাল যে সর্ব্বভুক্, তিনি যে সেই 'প্রথমভাগের' সুবোধ বালক গোপালের মত যাহা পান, তাহাই খান! যাহার নিকট ভালমন্দের বিচার নাই, তাহার উপর বিচার ভারটা অর্পণ করিয়া জলধর বাবু নিজে রেহাই পাইবার প্রয়াস পাইলেও 'কম্‌লি যে ছোড়তা নেই।' ভায়া এই বৃদ্ধবয়সে আর আবর্জ্জনার বোঝা মাথায় না লইয়া ধাপায় চালানের ব্যবস্থার সহায়তা করিলে কতকটা সুবিধা হয় না কি?

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সুলেখক। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার অনুরাগ যথেষ্ট আছে। বার-ভুতে যে বাঙ্গালা সাহিত্যের ঘাড় মটকাইয়া রক্তপান করিতেছে, ইহাতে তিনি প্রাণে আঘাত পাইতেছেন। তাই

তিনি তাঁহার 'সাধুভাষা বনাম চলিতভাষা'য় বলিয়াছেন,—

"সর্বদিক দেখিয়া 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' এই মামলার মীমাংসা করিতে হইলে, 'আধা ডিক্রী আধা ডিস্‌মিস্' ছাড়া উপায় নাই। বাস্তবিক, হাকিম বঙ্কিমচন্দ্র যে কাজীর বিচার করিয়া দিয়াছেন, যিনি যাহাই মুখে বলুন, সকলেই তাহা মাথা পাতিয়া লইয়াছেন। রোখের মাথায় টেকচাঁদ ঠাকুর যে আলালী ভাষা চালাইয়াছিলেন, তাহার পুনঃ প্রচলন বোধ হয় এখনকার দিনে চাহেন না। নিরবচ্ছিন্ন সাধুভাষায় রচনানীতির প্রাণবন্ত বিদ্যাসাগর তারাশঙ্করের ও অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে সঙ্গেই উড়িয়া গিয়াছে, এখন তাহার কঠোর অস্থিপঞ্জর পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচন সমিতির রায়ুশূন্য টিনের কৌটায় রক্ষিত। মুষ্টিমেয় লেখক প্রাচীন রীতি আঁকড়াইয়া আছেন, ফলে তাহাদের পাঠক যুটিতেছে না। পক্ষান্তরে মনীষী ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় গম্ভীর প্রবন্ধেও চলিত শব্দ ব্যবহার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। তাই বলিতে ছিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র সাধুভাষা ও চলিত ভাষার সংমিশ্রণে যে অপূর্ব্ব রচনানীতির প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই প্রকৃষ্ট প্রণালী, সকল সুলেখকই সেই মহাজনের পথ ধরিয়াছেন।"

"হাকিম বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রণালীতে 'আধা ডিক্রী আধা ডিস্‌মিস্' করিয়া রচনানীতির প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, পাঠকমণ্ডলী তাহার (re-trial) পুনর্বিচারের জন্য কাহারও নিকট আপীল করেন নাই, তাঁহার মীমাংসাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু আজকাল যেসকল খোকাবাবুরা সাহিত্যক্ষেত্রে (trespass) অনধিকার প্রবেশপূর্ব্বক ভাষাটাকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে, 'আধা ডিক্রী আধা ডিস্‌মিসে'র ব্যবস্থায় তাহার প্রতিকার হয় না। 'মুষ্টিমেয়' কয়জন 'লেখক প্রাচীনরীতি আঁকড়াইয়া আছেন' বলিয়াই এখনও বাঙ্গালা সাহিত্যের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায়, নতুবা এই সকল কাণ্ডজ্ঞান বিরহিত খোকাবাবুদের উৎপাতে সাহিত্যকানন এতদিনে 'অশোকবনে' পরিণত হইত! আমাদের বিশ্বাস, অধ্যাপক ললিতকুমার খোকাবাবুদের উপদ্রবে প্রপীড়িত হইয়াই এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। নতুবা তাঁহার ন্যায় সুক্ষ্মদর্শী সাহিত্যিক এরূপ কাজিরবিচারের অনুমোদন করিতেন না।

ঠাকুরবাড়ীর ঠাকুর-ঠাকুরাণীরা একযোগে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া 'ভারতী' ও 'সবুজপত্রে' ভাষার গঠন সম্বন্ধে যে উদ্ভট প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, সে ভাষা ঠাকুরবাড়ীর চতুঃসীমায় সীমাবদ্ধ থাকিলে অবশ্যই কাহারও কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হইত না।

সমাজে হিন্দুর সহিত তাঁহাদের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, তাঁহারা এক কোন-ঠেসা হইয়া রহিয়াছেন; বৈবাহিক আদান প্রদানে যাঁহারা তাঁহাদের সংস্রবে আসিতেছেন, তাঁহারাও সেই কোন-ঠেসা। এই ভাবেই সমাজে তাঁহাদের অস্তিত্ব। জানি না, তাঁহাদের সামাজিক অবস্থানুযায়ী ভাষাটাকেও তাহাদের আপনার মত একটা কোণ-ঠেসা—'পিরিলীভাষা' গড়িবার উদ্দেশ্যে এসকল ঘটিতেছে কি না। "ভারতী" ও 'সবুজপত্রে' যাঁহারা 'কথ্য' ভাষা চালাইয়া সাহিত্যের কাঠামো গড়িবার ডঙ্কা বাজাইতেছেন, তাহাদের সেই 'কথ্য' ভাষা যে ভদ্রসমাজে 'অকথ্য' বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, তাহা বুঝিয়া লইবার অবসর তাঁহারা খোজেন না। নিরপেক্ষ সমালোচক সুলেখক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় অনেক দিন হইতেই ইহার প্রতিকারের জন্য ধীরভাবে উপদেশ দিয়া আসিতেছেন, তাঁহার কথায় লজ্জা বোধ না হইলে, ইহাই মনে করিতে হয়, উহাদের এই লজ্জা-জিনিশটার সম্পূর্ণ অভাব!

কিছুকাল পূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদ ঠাকুরবাড়ীর ইজারা-মহাল ছিল। তখন অবসর প্রাপ্ত সিভিলিয়ান,রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বাগ্রজ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তিনি

মাঝে মাঝে কবিতা লিখিয়া পরিষদে পাঠ করিতেন। তাঁহার সেসকল কবিতা শুনিলে উহা 'গস্ত কি পদ্য' বুঝিবার সুবিধা ছিল না। মুখ ফুটিয়া তখন কেহ কোন কথা না বলিলেও মনে করিত, ঠাকুরবাড়ীর সবই বুঝি অদ্ভুত। তাঁহারা সকল বিষয়েই সংসারে সমাজের সহিত স্বাতন্ত্র্য রাখিয়া চালতে চান! আর ইহাও মনে হইত যে, ঠাকুর বাড়ীর ঠাকুর মহাশয়েরা ইচ্ছা করিলেই 'কবি' হইতে পারেন, ইহাই তাঁহাদের ধারণা! 'কবিত্ব' যেন পুত্রপৌত্রাদি ওয়ারিশানক্রমে, তাঁহাদিগকে ভোগ দখলের অধিকার দিয়াছেন!

আমাদের মনে হয়, "পিরিলী" দিগের সহিত যেমন হিন্দু সাধারণের কোন সম্বন্ধ নাই, তদ্রূপ "পিরিলী-ভাষা'র সহিত জনসাধারণের সম্বন্ধ বিচ্যুত হইলেও সমাজের ক্ষতি বৃদ্ধি হইতে পারে না। হিন্দুর সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া যে ব্যক্তি ছাপার অক্ষরে প্রচার করিতে পারে যে,—'সীতা সতী নাম ঘুচিয়ে রাবণকে পূজা করত," তাহার ধমনীতে হিন্দুশোণিতের অস্তিত্ব আছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না! এহেন মনুজপুঙ্গব, অথবা তাহার সংসৃষ্ট নরাকৃতি জীবের সহিত সর্ব্বপ্রকার সামাজিক ও বৈষয়িক সম্বন্ধ বর্জন করা জনসাধারণের একান্ত কর্ত্তব্য। আজ কাল ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে যে আন্দোলন চলিতেছে,—আমাদের বিশ্বাস "ভারতী ও সবুজপত্রের" 'পিরিলীভাষা'ই তাহার অবলম্বনীয়। কোন কোন ক্ষুদ্রকায় মাসিকপত্রে রবিভক্ত খোকাবাবুদের হস্ত কণ্ডূতি ও ইহার অন্যতম কারণ। জিজ্ঞাসা করি, এরূপ 'আধা ডিক্রী আধা ডিস্‌মিস্' ব্যতীত ইহার অন্য কোনরূপ মীমাংসা নাই কি? ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রচলিত আদর্শ অমান্য করিয়া যাহারা উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করে, তাহাদিগকে প্রশ্রয় না দিলে, ভাষা ও সাহিত্যের কি ক্ষতি হইতে পারে? ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধনের জন্য যদি এসকল লেখকদিগের লিখিত প্রবন্ধাদি ছাপার অক্ষরে ছাপিয়া মাসিকপত্রের কলেবর পুষ্ট করিতে হয়, তাহা হইলে সে সাহিত্য ও ভাষাকে কর্ম্মনাশার জলে বিসর্জ্জন দেও না কেন? এতবড় একটা স্পর্দ্ধার কথা কেন বলিলাম, তাহার একটা কৈফিয়ৎ দিব।

গত ভাদ্র সংখ্যা "ভারতী" পত্রে "অভিভাষণ না অভিভাষণ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধ লেখকের নাম শ্রীযুক্ত নবকুমার কবিরত্ন। এই কবিরত্নটী ঠাকুরবাড়ীর ব্যারাকের অন্যতম 'রত্ন'। উক্ত প্রবন্ধে এই রত্নটীর ভাষা ও লিখন ভঙ্গীর নমুনা দেখুন ;—

> সম্প্রতি বাঙ্গালা দেশের খেতাবী রাজা-মহাশয়েরা একটু আধটু কেতাবী কসরৎ সুরু করেছেন। এ খুবই আহ্লাদের কথা। বর্ত্তমানযুগে কুলি মজুরেরাও যখন আত্ম-প্রকাশের জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে তখন মজুরেরা যে হবেন তার আর বিচিত্র কি!"

কবি রবীন্দ্রনাথের এই রত্নটী, সাহিত্যসভায় পঠিত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অভিভাষণের উপর 'পিরিলী ভাষায়' এই টিপ্পনীটী ঝাড়িয়াছেন! নবকুমারের ধৃষ্টতাকে ধন্যবাদ দিতে হয়! শ্রীমান্ সম্ভবতঃ জানেন না যে, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী চিরকাল সাহিত্যচর্চ্চায় নিরত, তাঁহার অর্থানুকূল্যে অনেক সৎ-সাহিত্যের প্রচার হইতেছে, তিনি সাহিত্যের উন্নতিকল্পে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। সুতরাং সাহিত্যক্ষেত্রে 'পিরিলীভাষা'র অনধিকার প্রবেশ অনুভব করিয়া অভিভাষণে দুঃখ-প্রকাশ করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করি,—বর্দ্ধমানের মহারাজ, নাটোরের মহারাজ, সুসঙ্গের মহারাজ প্রভৃতি যে কেতাবী কসরৎ করিতেছেন, তাহা কি আত্মপ্রকাশের জন্য? মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় যে একজন অকপট সাহিত্যসেবী, 'নবকুমার' এর তাহা অগোচর থাকিবার সম্ভাবনা বটে। তিনি যে 'নবকুমার', অন্নপ্রাশনের অন্ন এখনও হজম হয় নাই! সবে পিরিলী ভাষার হাতে খড়ি হইয়াছে! জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি,—শ্রীমান্

নবকুমার যাহার পুচ্ছ ধারণপূর্ব্বক 'সাহিত্য-বৈতরণী' পার হইতে প্রয়াস পাইতেছেন, সেই রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা আত্মপ্রকাশে উন্মত্ত সংসারে আর কয়-আছে? এই আত্মপ্রকাশের জন্য তিনি কি না করিতেছেন? বিলাতের ঢলাঢলীর কথা একটু একটু করিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে; জাপানের কথাটা টাট্‌কা টাট্‌কাই পাওয়া যাইতেছে। এই আত্মপ্রকাশের জন্যই ত রবীন্দ্রনাথ সীতাদেবীর চরিত্র সম্বন্ধে জঘন্য মন্তব্য প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন নাই! রবীন্দ্রনাথ তাহা করিবেন কেন,—তিনি যে না হিন্দু না মুসলমান, শীতের শাকালুখোর!

শ্রীমান্ নবকুমারের লিখিত প্রবন্ধের সমালোচনা করিতে হইলে পুঁথী অনেক বাড়িয়া যায়, তাই আর একটী কথার উল্লেখ করিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। শ্রীমান্ একস্থলে লিখিয়াছেন,—

"মহারাজের উষার প্রথম চোট্‌টা পড়েছে, একদল লেখকের উপর। এই লেখকেরা অকথ্য ভাষা ত্যাগ ক'রে কথ্যভাষায় বই লিখ্‌তে সুরু করেছেন তাই তাঁদের অপরাধ।"

যাহারা 'না বুঝিয়া সুঝিয়া ইস্তের বই পড়িয়া পণ্ডিত হইয়া গিয়াছেন, সেই পণ্ডিতের দলই ত শ্রীমানের উল্লেখিত একদল লেখক? ইহারা যে ভাষাকে 'কথ্য' বলিয়া ছাপার অক্ষরে বাহির করিতেছে, তাহাই যে "অকথ্য" ভাষা! আমরা ত বুঝি, যে ভাষা লোকের নিকট প্রকাশ করিবার যোগ্য নহে, তাহাই 'অকথ্য'। এই ভাষা যে জনসাধারণের নিকট নিতান্ত 'বিট্‌কেল' বলিয়া বোধ হইতেছে, সৎসাহিত্যের একান্ত অনিষ্টকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, রবি-ভক্ত খোকাবাবুর দলের তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার সামর্থ্য এখনও জন্মে নাই। ইহাদের দলে যে দুই একটী 'ইচড়ে পাকা' ইংরেজীনবীশ বোলপুরের আখড়ায় নাম লিখাইয়াছেন, তাহাদের জ্যাঠামী জনসাধারণের আরও বিরক্তি জন্মাইতেছে। এই সকলের উপদ্রব হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে, যে কাগজে ইহাদের লেখা ছাপার অক্ষরে বাহির হয়, সেগুলি উপেক্ষা করাই সুপরামর্শ; কাজির বিচারে 'আধা ডিক্রী আধা ডিস্‌মিস্' এর ব্যবস্থায় সাহিত্য রক্ষা পাইবে না।

কার্ত্তিকের 'ভারতী' পত্রে রবীন্দ্রনাথের বে-আকুবী সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে একজন উড়েও আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন! সীতাদেবীর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার সাফাই গাহিবার জন্য দাঁড়াইয়াছেন—∴ তিনটী ষ্টার! সকলেই কিন্তু সেই পিরিলীভাষায় দাগাবুলাইতেছেন! পরন্তু যিনি যাহাই করুণ না কেন, অমরেন্দ্রনাথের "বনিয়ানা"য় রবীন্দ্রনাথের সদর ও মফঃস্বল যেরূপ নিরপেক্ষভাবে সমালোচিত হইয়াছে, রবি ভক্তবৃন্দের নিকট তাহা ভয়ানক কষাঘাত বলিয়াই অনুভূত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই কষাঘাত প্রশান্তসাগর পার হইয়া জাপানে পৌঁছিয়া কবিবারের চিত্তবিকার ঘটাইয়া দিয়াছে। আমরা বারান্তরে উল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা করিব।

পণ্ডিত গঙ্গাধর কবিরাজ ও প্রাচীন স্মৃতি।

[ডাঃ শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

তৎপরে লক্ষ্মণ সেনের পতন, বঙ্গে যবনাধিকার বিস্তার ও শাস্ত্রগ্রন্থের লোপসাধন, প্রভৃতি রাষ্ট্রবিপ্লব, ধর্ম্ম ও সমাজ বিপ্লবের ঘাতপ্রতিঘাত বঙ্গের হিন্দু সমাজ অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়া পড়ে।

শাস্ত্রালোচনার অভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অধঃপতন এবং হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম ও সংস্কারাদির লোপ হইতে থাকে। তাহার বহুদিন পরে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের অবির্ভাবকাল। তাঁহার সময়েই ধর্ম্মশাস্ত্রের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হয়; তাহার ফলে রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের সৃষ্টি, তাহাই নব্যস্মৃতি নামে পরিচিত, এবং ইহাই বঙ্গদেশের ধর্ম্মশাস্ত্র। এই নব্যস্মৃতিতে, রঘুনন্দন মন্বাদি প্রাচীন স্মৃতিবিরুদ্ধ কোন মত সন্নিবেশিত করিয়াছেন কি না, করিয়া থাকিলে সেই অশাস্ত্রিকতার দরুণ হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ হইতেছে কি না, সে দিকে দৃষ্টিপাত করিবার আবশ্যকতা আজ পর্য্যন্ত কেহই উপলব্ধি করিতেছেন না, শাস্ত্রসঙ্গত হউক আর না হউক, তাহাই বেদবাক্য স্বরূপ পরিগৃহীত হইতেছে। অশাস্ত্রিকতার জন্য হিন্দুর ক্রিয়াকলাপ লোপ হইতে দেখিয়া পণ্ডিত গঙ্গাধর কবিরাজই সর্ব্বপ্রথমে সেই ধর্ম্মশাস্ত্র উদ্ধারের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন। এই জন্যই বোধহয় বঙ্গদেশে গঙ্গাধরের আবির্ভাব। তিনি নির্ভীকভাবে রঘুনন্দনের প্রমাদসমূহ তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। বৈদ্য গঙ্গাধরই হিন্দুসমাজের রোগ নিরূপণ এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাই ধর্ম্মশাস্ত্রের উদ্ধার মানসেই প্রাচীন স্মৃতি মনুসংহিতার 'প্রমাদভঞ্জনী' টীকার সৃষ্টি। ইহাতে ধর্ম্মশাস্ত্রের সদ্ব্যাখ্যারূপ ঔষধের ব্যবস্থা আছে। যতদিন পর্য্যন্ত এই ঔষধ লোক সকল গ্রহণ করিতে না শিখিবে, ততদিন পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজে এইরূপ অশাস্ত্রিকতার তাণ্ডব নৃত্যই চলিতে থাকিবে।

গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, প্রাচীন স্মৃতির চর্চ্চা একরূপ বঙ্গদেশ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে, তাহার স্থান রঘুনন্দনের নব্য স্মৃতি অধিকার করিয়াছে, এবং এই নব্যস্মৃতির ব্যবস্থাই বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের অস্থি মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে।

যে দেশে রঘুনন্দনের অশাস্ত্রিকতা দেখাইয়া দিলেও তাহার সংস্কারের আবশ্যকতা কেহ বুঝিতেছেন না, এবং যে দেশে প্রমাদপূর্ণ ভাষ্যটীকার সাহায্যে শাস্ত্রার্থ বুঝিয়া থাকে, সে দেশে সত্যের আদর এবং প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞের আদর কতদূর হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। সে দেশে ধর্ম্মশাস্ত্রের নাম করাই বিড়ম্বনা মাত্র! আজ যদি প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা এদেশে থাকিত, তাহা হইলে শাস্ত্রের নামে যথেচ্ছাচারিতার বীভৎস দৃশ্য হিন্দুসমাজে দেখিতে পাইতাম না।

আজ যে নানাশ্রেণীর শূদ্রজাতিকে দ্বিজধর্ম্মী বলিয়া উপনয়নের ব্যবস্থা দিতে দেখিতেছি, ইহার মূলেও শাস্ত্রালোচনার অভাব, এবং তাহার জন্য অর্থলোলুপতাই পরিলক্ষিত হইবে। বঙ্গদেশে প্রাচীন স্মৃতির আলোচনা থাকিলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের এরূপ দুর্গতি এবং সমাজবিপ্লব দেখিতে পাইতাম না। এদেশে যাঁহারা সেই স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনা করেন, তাঁহারাও প্রমাদপূর্ণ টীকা ও ভাষ্যদ্বারা শাস্ত্রার্থ বুঝিয়া থাকেন। প্রকৃত শাস্ত্রার্থ কি? অন্যান্য স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের সহিত তাহার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে কি না, এসমস্ত দেখিবার কেহ আবশ্যকতা মনে করেন না, প্রমাদপূর্ণ টীকা বা অনুবাদে যাহা বলিতেছে, তাহাই অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত অশাস্ত্রিকতার হস্ত হইতে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের উদ্ধারের জন্যই গঙ্গাধর লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন।

মনুর ১০ম অধ্যায়ে বর্ণজাতি প্রকরণে পণ্ডিত প্রবর যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন তাঁহাই সর্ব্বপ্রথম আলোচনা করিব। মেধাতিথি, কুল্লুক ভট্ট প্রভৃতি মনুর টীকাকারগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণ ব্যতীত অনুলোম, প্রতিলোম জাত সন্তানগণকে কোন বর্ণের মধ্যেই পরিগণিত করেন নাই; তাহাদিগকে বর্ণশঙ্কর বলিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত গঙ্গাধর প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন,—সমগ্র মনুষ্যজাতিই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য,

এই চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্গত। অনুলোম, প্রতিলোম সন্তানগণও এই বর্ণচতুষ্টয়ের অন্তর্নিবিষ্ট।

এই তত্ত্ব সর্ব্বসাধারণের গোচরে আনয়নই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই তত্ত্ব জানিতে পারিলে, কে কোন বর্ণের অন্তর্গত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন; সুতরাং পরস্পর জাতি বিদ্বেষের কারণ থাকিবে না, সকলেই স্ব স্ব বর্ণোক্ত ধর্ম্ম প্রতিপালনে যত্নবান হইবে; এবং বর্ণান্তর ধর্ম্ম গ্রহণে প্রত্যবায় আছে জানিতে পারিলে তদ্গ্রহণে বিরত থাকিবে।

মনু বলিয়াছেন,—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণাদ্বিজাতয়ঃ:
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রোনাস্তি তু পঞ্চমঃ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি অর্থাৎ দুইবার জন্ম হয়। মাতৃগর্ভে পুরুষের ও ও স্ত্রীলোকের পৃথক জন্ম, উপনয়নে সাবিত্রীতে পুরুষের দ্বিতীয় জন্ম হয়। মন্ত্রে বিবাহে স্ত্রীলোকের শ্বশুরকুলে দ্বিতীয় জন্ম হয়। ইহাতেই দ্বিজ তিন বর্ণ। চতুর্থ বর্ণ একজাতি, মাতৃগর্ভে কেবল মাত্র জন্ম। মন্ত্রে সংস্কার নাই বলিয়া দ্বিতীয় জন্ম নাই। সেই জন্য শূদ্র এক জাতি। এতদ্ব্যতীত পঞ্চম বর্ণ নাই।

ইহাতে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, মাতা পিতা দুই হইতে পুত্র কন্যার জন্ম হয়। ব্রাহ্মণাদি পুরুষের,—সবর্ণা, অসবর্ণা, অবিবাহিতা, পরের বিবাহিতা নিজের বিবাহিতা, ব্রাহ্মণাদি স্ত্রীলোকের গর্ভজাত সন্তান কোন বর্ণ হইবে? তাহাতেই মনু বলিয়াছেন,—

সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষত যোনিষু,
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যাজ্ঞেয়াস্তএবতে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবর্ণের যে স্ত্রীলোক, মাতৃগর্ভে জন্মেতে তুল্য বর্ণা; সে নিজের বিবাহিতাই হউক বা পরের বিবাহিতাই হউক, তাহাতে তুল্য বর্ণ পুরুষ হইতে যে সন্তান হয়, সে পুরুষের বর্ণজাতিই হয়।

ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক পরের বিবাহিতা ব্রাহ্মণীতে জাত যে সন্তান সে পরের ক্ষেত্রজ সন্তান, হইলেও জাতিতে ব্রাহ্মণ বর্ণ ই হইবে। এইরূপ ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াতে, বৈশ্যের বৈশ্যাতে, এবং শূদ্রের শূদ্রাতে, নিজের বিবাহিতা ও পরের বিবাহিতাতুল্য বর্ণা স্ত্রীতে দুই দুই সন্তান, পিতৃজাতি বর্ণ ই হইবে।

তৎপরে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, স্ত্রীলোক জন্মেতে তুল্য বর্ণা নহে, তাহাতে সন্তান হইলে কোন বর্ণ হইবে?

ইহাতে মনু বলিয়াছেন,—

"পত্নীষু সম্ভূতা যে জাত্যাজ্ঞেয়াস্তএবতে।"

যেবর্ণ পুরুষের পত্নীতে জাত যে সন্তান, সে সেই পুরুষের বর্ণজাতি প্রাপ্ত হয়। পত্নী শব্দে ভার্য্যা মাত্র বুঝায় না। যে ভার্য্যার সহিত একত্র ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার বিধি আছে, সেই ভার্য্যাই তাহার পত্নী, অন্য ভার্য্যা পত্নী নহে।

ব্রাহ্মণের নিজের বিবাহিতা, ব্রাহ্মণ কন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা,—এই তিন ভার্য্যার সহিত ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার বিধি আছে, সুতরাং এই তিন ভার্য্যাই তাহার পত্নী। এই তিন পত্নীতে ঐ ব্রাহ্মণ হইতে যে সন্তান হয়, সে সেই ব্রাহ্মণ জাতি বর্ণ ই হয়। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত বিবাহে, জন্মেতেও সবর্ণা এবং বিবাহে এক শরীরাত্মা গোত্রাদি হইয়াও সবর্ণা, সুতরাং এই পত্নীই ব্রাহ্মণের প্রধানা পত্নী। এই পত্নীর গর্ভে যে সন্তান হয়, সে মুখ্য ব্রাহ্মণ জাতি বর্ণ হয়।

ব্রাহ্মণের বিবাহিতা ক্ষত্রিয় [illegible] এবং বৈশ্যকন্যা, জন্মেতে সবর্ণা নহে, কিন্তু বেদমন্ত্রে বিবাহেতে শ্বশুরকুলে জন্ম হইয়া, পতির সহিত এক শরীরাত্মা হইয়া পতিগোত্র প্রাপ্ত হইয়া পতি সবর্ণা হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাতে জাত যে সন্তান সে ব্রাহ্মণ জাতি বর্ণ ই হয়। অর্থাৎ পিতা যে জাতিবর্ণ সেই জাতিবর্ণ ই হইয়া থাকে। কিন্তু উভয়ত সবর্ণা পত্নী জাত সন্তান অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন;

কারণ ব্রাহ্মণের অনুলোমা পত্নী কেবল বিবাহেতেই সবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াপত্নী জাত সন্তানকে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ, এবং বৈশ্যাপত্নীজাত সন্তানকে অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণ বলে।

ব্রাহ্মণের শূদ্রাভার্য্যা পত্নী নহে, কারণ বেদমন্ত্রে বিবাহাভাবে পতি সবর্ণা হয় না। এইপ্রকার ক্ষত্রিয়ের বিবাহিতা ক্ষত্রিয়া পত্নীজাতসন্তান মুখ্য ক্ষত্রিয়জাতি বর্ণ, এবং ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাপত্নীজাত সন্তান মাহিষ্য নামধেয় ক্ষত্রিয় জাতি বর্ণই হয়। এইরূপ বৈশ্যের বিবাহিতা বৈশ্যাপত্নীজাত সন্তান বৈশ্য জাতিবর্ণ হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের শূদ্রা ভার্য্যা পত্নী নহে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—অবিবাহিতা অসবর্ণা হইতে সন্তান হইলে তাহারা কোন বর্ণ জাতি হইবে?

তাহাতেই মনু বলিয়াছেন;—

"অক্ষতযোনিষু আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা-জ্ঞেয়াস্ত এবতে"।

ব্রাহ্মণাদি হইতে অবিবাহিতা অক্ষতযোনি অনুলোমা কন্যাজাত সন্তান ও পিতৃজাতি বর্ণ হইবে। বীজ প্রাধান্যহেতু পিতৃবর্ণই হয়, মাতৃবর্ণ হয় না। যেমন পরাশরের ঔরসে ক্ষত্রিয়কন্যা গর্ভজাত সন্তান মহর্ষি ব্যাস ব্রাহ্মণ বর্ণই হইয়াছিলেন। সত্যবতীর কন্যকাবস্থায় ব্যাসের জন্ম বলিয়া ব্যাস কানীনব্রাহ্মণ। অপাংক্তের ব্রাহ্মণের মধ্যে পরিগণিত।

ক্রমশঃ।

সাময়িকপত্রের উপদ্রব।

[শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি, এ।]

কিছুকাল হইতে হিতবাদী পত্রিকা মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন মহোদয়কে লোক-সমাজে অপণ্ডিত প্রমাণ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। দেশমান্য যশস্বী ব্যক্তির যশোহরণের জন্য মানুষ এত অমানুষ হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই।

Good name in man or woman
Is the immediate jewel of their souls;
Who steals my purse steals trash ,tis some thing nothing;
'Twas mine, 'tis his, and has been slave to thousands;
But he that filches from me my good name
Robs me of that which not enriches him
And makes me poor indeed.

Shakespeare এর এই সুন্দর উক্তি অনুসারে যশস্বী ব্যক্তির যশোহরণ ডাকাতি অপেক্ষাও নিন্দনীয়। হিতবাদী যেন আহার-নিদ্রা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছেন! বাঙ্গালীর সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত বর্ত্তমানের সকল সমস্যা ত্যাগ করিয়া গায়ে পড়িয়া একজন মহামান্য জ্ঞানী ব্যক্তিকে মর্য্যাদাহীন করিবার জন্য যেপ্রকার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া বিস্ময় হয়। গভর্ণমেণ্ট যদি অযোগ্যকে সম্মান করিয়াই থাকেন—তবে সে সম্বন্ধে ২।১ লাইনের একটা টিপ্পনী মাত্র সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইতে পারে। তাহার জন্য বহুদিন ধরিয়া এত আয়োজন ও আড়ম্বর দেখিলে পাঠক-সাধারণের কি মনে হয়? ঈর্ষ্যাপ্রণোদিত না হইলে যশোহরণের জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া কেহই এত প্রাণপণ চেষ্টা করে না। হিতবাদীর এইরূপ নীচ ঘৃণিত অসূয়াবিজৃম্ভিত ব্যাপার দেখিয়া অবাক্

হইয়াছি। ইহা যেন গায়ে গা লাগাইয়া ঝগড়া করা। জানি না, ইহার ভিতরে কে কে আছেন। যিনিই থাকুন,—তিনি দেশের লোকের শ্রদ্ধা হারাইতেছেন। যে উদ্দেশ্যে এত আড়ম্বর ও এত আয়োজন, সে উদ্দেশ্যত বিফল হইতেছেই—পক্ষান্তরে গণনাথ বাবুর যশঃ বঙ্গদেশের দিগ্বিদিকে প্রচার হইতেছে, এবং হিতবাদীর ঘৃণিত অসূয়া দর্শনে দেশের লোক হিতবাদীর প্রতি দিন দিন অশ্রদ্ধাবান হইতেছে। আমরা গোড়া হইতেই বুঝিতে পারিয়াছি, ইহা ঈর্ষ্যার কাজ; সেজন্য উঁহাদের সকল প্রবন্ধেরই সারবত্তা বুঝিয়া লইয়াছি। ঈর্ষ্যার দ্বারা যে অন্ধ, সে আর কি বিচার করিবে?

গণনাথ বাবুর ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তিকে অপণ্ডিত প্রমাণ করা খুবই দুঃসাধ্য। তাঁহাকে ভারতবর্ষের নিখিল আয়ুর্বেত্তৃগণ পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁহার সংসর্গে আসিয়াছেন,তিনিই তাঁহার বিজ্ঞতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন। ভারতবর্ষীয় নিখিল আয়ুর্বেদ-সম্মিলনে তাঁহার সভাপতিত্ব ভারতের পণ্ডিতগণেরই প্রয়াস অনুসারেই ঘটিয়াছে। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁহার সম্মান, তাহাও ঐরূপেই ঘটিয়াছে, তাঁহার মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্তিও শ্রেষ্ঠ দেশমনীষিগণের সুপারীশেই ঘটিয়াছে—গভর্ণমেণ্ট ঘুষ খাইয়া বা স্তুতিবাদে সন্তুষ্ট হইয়া কিছু করেন নাই। তারপর তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাপ্ত পারদর্শিতার নিদর্শন আছে। সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান যুক্তি—তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় মৌলিক গবেষণা সহকারে বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা। এত সত্ত্বেও যদি তাঁহাকে অপণ্ডিত বলা চলে, তাহা হইলে অন্যান্য মহামহোপাধ্যায়ের ত এক তুড়িতেই উড়াইয়া দেওয়া চলে! মুখের কথাতেই যদি একজন পণ্ডিত অপণ্ডিত হইয়া যান—তাহা হইলে সকল পণ্ডিতের ভাগ্যেই বিপৎপাত

দেশের লোকেরও একটা স্বাধীন বিচারশক্তি আছে। হিতবাদী তাঁহাদের জ্ঞানগুরু নহেন। গণনাথ বাবু পণ্ডিত কি না, তাহা বিপুলা পৃথ্বী বিচার করিবেন। হিতবাদী যাহাদের জ্ঞানগুরু, তাহারা যাহাই মনে করুক, ব্রহ্মাণ্ডের তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

তাঁহার রচিত গ্রন্থ যে ভারতের কি মহাসম্পদ হইয়াছে, তাহার বিচার অসূয়া-বিষধরের নিকট সম্ভব নহে। মক্ষিকাধর্ম্মী বা জলৌকধর্ম্মীরা কখনও বিচারক হইতে পারে না। জগতে নিখুঁত কিছুই নাই—গণনাথ বাবুর পুস্তকে ২।১টা সামান্য ভাষা বা ব্যাকরণের দোষ থাকিলেও, বিজ্ঞান-গ্রন্থরূপে তাঁহার মর্য্যাদা কিছুই ক্ষুণ্ণ হইবে না। Shakespeare বা মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থেরও ভুল ধরিতে বসিলে তাঁহারাও রক্ষা পান না। সূর্য্যমণ্ডলে দূরবীক্ষণ সাহায্যে রেখা আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং চন্দ্রমণ্ডলে গুহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাই বলিয়া সূর্য্যমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারপুঞ্জ এবং চন্দ্রমণ্ডল তমোময় গুহা নহে। "গণইতে দোষ, গুণ লেশ ন পাওবি যব তুঁহু করবি বিচার।" হিতবাদী গণনাথ বাবুর পুস্তকের দোষ দেখাইতেছেন—তাহা সত্যই দোষ বটে কি না, তাহা মনীষি আয়ুর্বেত্তৃগণ ও বৈয়াকরণিকগণ প্রতিবাদ করিয়া দেখাইবেন। আমরা দেখিতেছি যে ঈর্ষ্যাপরায়ণ ব্যক্তির নিকট বিচার বিচারই নহে,—বিজ্ঞানগ্রন্থের সমালোচনা উহা আদৌ নহে—ত্রুটী থাকিলেও পণ্ডিত পণ্ডিতই রহিবেন—"একোহি দোষঃ গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।" পাণ্ডিত্যের অর্থ ব্যাকরণের খুটীনাটি নহে। Newton, Huxley, Kant, Hegel, Spencer এর মধ্যে যদি ভাষা বা ব্যাকরণের দোষ থাকে তবুও তাঁহারা জ্ঞানী বা পণ্ডিতই থাকিবেন। পাণ্ডিত্য অর্থে স্কুল বা টোলের পণ্ডিতী নহে। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলও idiom এর ভুল করিলে মূর্খ হইয়া যাইবেন না। সত্যই যদি কর্ম্মীব্যক্তির দুএকটী ত্রুটী ঘটে, তাহাতেই বা কি আসে যায়? ভুল ত কর্ম্মীরই হয়, বচনসর্ব্বস্ব নিষ্ক্রিয়ের ভুল হইতে পারে না। "টিকি.

মুণ্ডে চড়ি উঠি কহে ডগা নাড়ি। হাত পা প্রত্যেকে কাজে ভুল করে ভারি। হাত পা কহিল ভাই হে অভ্রান্ত চুল! কাজ করি আমরা যে তাই করি ভুল॥" পূর্ব্ববর্ত্তী আয়ুর্ব্বেত্তৃগণের সহিত গণনাথ বাবুর পুস্তকের মিল নাই বলিয়া আমরা গণনাথ বাবুকে সত্যই জ্ঞানী ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করিতেছি। যাঁহারা প্রকৃতই পণ্ডিত, তাঁহারা গতানুগতিক নহেন—তাঁহারা স্বাধীনভাবে গবেষণা ও চিন্তা করেন—বিশেষতঃ বিজ্ঞান ক্রমোদ্বর্ত্তনশীল। পরবর্ত্তী কোন বৈজ্ঞানিকই পূর্ব্ববর্ত্তী বৈজ্ঞানিকের অবিকল নকল করেন না। পরবর্ত্তীর গবেষণা ও সাধনা চিরকালই ঈশ্বরানুবর্ত্তির সাধনা হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবে। ইহাত ব্যাকরণ নহে যে, পূর্ব্ববর্ত্তিগণের সহিত মিলা চাই-ই! শুধু মিলিতেছেনা বলিয়া দোষ দিলে হইবেনা, যুক্তিসহকারে দেখাইতে হইবে,—গণনাথ বাবুর গবেষণা ভ্রান্ত এবং বর্ত্তমানযুগের বৈজ্ঞানিক সাধনার সহিত অসমঞ্জস। ৺ গঙ্গাধরের সহিতও পূর্ব্ববর্ত্তী আয়ুর্ব্বেত্তৃগণের মিল হয় নাই। ৺ বিদ্যাসাগরের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী স্মৃতিকারগণের মিল হয় নাই। ন্যায়, সত্য ও প্রাকৃতিক নিয়মের সহিতই তাঁহারা মিলাইতে-বাধ্য—অপর কাহারও সহিত বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক ও পারমার্থিকগণ মিলাইতে বাধ্য নহেন।

গণনাথ বাবুর অন্যতম সাধনা 'সিদ্ধান্তনিদান-' রূপে শীঘ্র আলোক দর্শন করিবে। এ গ্রন্থ ভারতের আয়ুর্ব্বেদ রাজ্যে যুগান্তর আনয়ন করিবে। এই গ্রন্থে ব্যাধি-নিদান শাস্ত্রকে গণনাথ বাবু Up to date করিয়াছেন। অহ্না-কুষ্ঠের চিকিৎসাও যেন গণনাথ বাবু ইহাতে সংযোগ করিয়া দেন।

('বিক্রমপুর' হইতে উদ্ধৃত।)

বিশুদ্ধ ভাষা বনাম প্রাদেশিক ভাষা।

শ্রীযুক্ত "বিক্রমপুর" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, আপনি উপরি লিখিত বিষয়ে আমার মতামত জানিতে চাহিয়াছেন, এবং জানিতে পারিলাম, এতদ্বিষয়ে আরও বহু ব্যক্তিকে চিঠি লিখিয়াছেন। আমার বিবেচনায় আপনি এ সম্বন্ধে এতটা প্রয়াস না করিলেও পারিতেন।

যাঁহাদিগকে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, খুব সম্ভব তাঁহারা সকলেই "লেখক"; তাঁহারা বিশুদ্ধ ভাষায় লেখেন কি প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহার করেন, তাঁহাদের লেখা হইতেই আপনি অনায়াসে জানিতে পারিতেন। কেহ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের ন্যায় যদি 'প্রাদেশিক ভাষার' পক্ষপাতী হন, তবে অবশ্যই তিনি সেই ভাষারই প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন।

দ্বিতীয়তঃ অস্মদ্বিধ 'বাঙ্গাল' দের নিকটে মতামত জিজ্ঞাসা বাহুল্য মাত্র। আমরা নিজের 'প্রাদেশিক' ভাষা তো লিখিতে সাহসীই হইতে পারি না 'কলুকেতাই' লেখাও আমাদের মত 'কাঠ বাঙ্গালের' একেবারে অসাধ্য। দুচারি ছত্র বাঙ্গালা যাহা শিখিয়াছি, তাহা বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত প্রভৃতির পুস্তক পড়িয়া। শিক্ষা-দীক্ষার নিমিত্তে ২।১ বৎসর কলিকাতায় কাটাইতে হইয়াছে, তাও স্বদেশীয়দের মেসে থাকিয়া প্রাণ খুলিয়া আপন 'মাতৃ-ভাষায়' কথাবার্ত্তা বলিয়া। যখন সহাধ্যায়ী নৈঋত (পশ্চিম দক্ষিণ) বঙ্গীয়গণের সঙ্গে কথা বলিতাম, তখন "যাচ্ছি যাচ্ছি" বলিতাম বটে, কিন্তু যথোচিত উদাত্তানুদাত্তস্বর প্রয়োগ করিতে না

পারিয়া তাঁহাদের বিদ্বাস্তের উদ্রেক করিয়া লজ্জা-সুভব করিতাম; আর লজ্জিত হইতাম এই ভাবিয়া যে, আমার মাতৃ-ভাষায় প্রকৃতই আমরা 'যাইতেছি' 'খাইতেছি' বলি—এবং ইহাই পাঠ্য পুস্তকের ভাষা ও ব্যাকরণের বিধি, তথাপি কেন ইঁহাদের ভয়ে হীন অনুকরণ প্রয়াসে প্রবৃত্তি হইল!! ফলকথা আমরা চেষ্টা করিলেও, প্রাদেশিক (অর্থাৎ নৈঋর্ত বঙ্গের) ভাষায় লিখিতে পারিব না—নাটকে ঐ নৈঋর্তী ভাষা * সমধিক ব্যবহৃত হয় বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গীয় কেহ 'নাটককার' ভাবে খ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই।

তৃতীয়তঃ আপনি সম্ভবতঃ এই মতামত সংগ্রহ করিতেছেন, এই নিমিত্তে যে বিশুদ্ধ সাধুভাষার পক্ষে মতাধিক্য দেখাইয়া এবং তৎপক্ষপাতীদের যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করিয়া আপনি প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহারকারী প্রমথ বাবু সদৃশ ব্যক্তিগণকে তাহা হইতে নিরস্ত করিবেন। যদি আমার অনুমান ঠিক হয়, তবে ইহার অপেক্ষা অধিকতর ভ্রম আর হইতে পারে না। যাঁহারা এতাদৃশ সংস্কার বা ধ্বংসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা জানিয়া শুনিয়াই শত সহস্র বিপক্ষের সম্মুখবর্ত্তী হন, এবং তাহাদের আত্মপ্রত্যয় এত অধিক যে বিরুদ্ধ মত সুসঙ্গত হইলেও তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিয়া যান। দৃষ্টান্ততঃ দেখুন। প্রমথ বাবু তদীয় পত্রের উপসংহারে লিখিয়াছেন. "ভাষা সম্বন্ধে আমার মতামত যে ভুল, আজ তিন বৎসর মধ্যে যুক্তি তর্কের সাহায্যে কেউ তা দেখিয়ে দেন নি। * অথবা আপনি যদি এই তিন বৎসরেই সমস্ত পত্রিকার প্রবন্ধগুলি পড়িবার সুবিধা করিতে পারেন, তবে দেখিবেন যে এতদ্বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহার অনেকটিতে বহু সারবান্ কথা যুক্তি তর্ক স্বরূপ লিখিত হইয়াছে।

এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "তবে উপায় ?" আমার বোধ হয় তজ্জন্য ভাবিত হইবার বিশেষ কারণ নাই। প্রমথ বাবু অপেক্ষা খাঁটি কলিকাতার অধিবাসী বহুতর বিশিষ্ট ব্যক্তি এইরূপ 'প্রাদেশিক' ভাষা প্রচলনের বিরোধী। বিশেষতঃ বঙ্গভাষার দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং বোধ হয় এক 'সবুজপত্র' ভিন্ন মাসিকপত্রের সম্পাদকগণ সকলেই সাধুভাষায় পত্রিকা পরিচালন করিতেছেন। কি চিঠি পত্রে, কি বক্তৃতায় দু একজন ভিন্ন সকলেই সাধুভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। মোসলমান সাহিত্য-সেবীগণ যেন প্রকারান্তরে বলিতেছেন, "যদি প্রাদেশিকতা চালাও, আমরাও "মোসলমানী" চালাইব।" তাই নিশ্চিন্ত থাকুন, "প্রাদেশিক" ভাষা চলিবে না।

একবার বসন্তের পীড়া হইয়া গেলে, রোগীর শরীরে দাগ থাকে বটে, কিন্তু পুনশ্চ ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইলেও সাংঘাতিক হইবার আশঙ্কা কম থাকে। ইতঃপূর্ব্বে আর একবার বঙ্গসাহিত্যে 'কলকেতাই' চালাইবার প্রয়াস হইয়াছিল, 'আলালের ঘরের দুলালে'—বিশেষতঃ 'হুতোম প্যাঁচায়'—তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। তাই ভরসা হয়, বর্ত্তমান প্রয়াস কদাপি ভাষার পক্ষে মারাত্মক হইবে না।

সর্ব্বোপরি নিজেরা ঠিক থাকুন। নৈঋর্তদিকে দৃষ্টিপাত যত কম পারা যায় করিয়া সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে থাকুন। ক্ষমতাশালী সাহিত্য সেবক হইবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গে প্রচেষ্টা চলুক। এখানে যদি সাধুভাষার রাজত্ব সুদৃঢ় ও অপ্রতিহত হয়, তবে সাধ্য নাই যে প্রাদেশিকতা মাথা তুলিতে পারে। আর যদি দৈবাৎ এমনটাই হইয়া পড়ে,—পশ্চিম

* অস্মদ্দেশীয় টোলের পণ্ডিতগণ সংস্কৃত নাটকের প্রকৃত ভাষাকে "রাক্ষসী" (নৈঋর্তী) ভাষা বলেন।

* * তৎপরে একটু চালাকি করিয়া লিখিয়াছেন, "যদিও অনেকে এতার প্রতি নানারূপ অসাধু ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন।" অর্থাৎ যিনি যাহাই লিখিয়া থাকুন না কেন, তাহা "অসাধু ভাষা প্রয়োগ" মাত্র!

দক্ষিণে প্রাদেশিকতা চলে—তবে বিশুদ্ধ 'বঙ্গ'ভাষা প্রকৃত 'বঙ্গের'ই আশ্রয়ে অবস্থিত হইবে—এই 'বাঙ্গালেরা'ই 'বাঙ্গালা' ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা করিবে। বাহুল্যেনালমিতি—

ভবদীয়

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মণঃ।

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য গৌহাটী কটন কলেজের অধ্যাপক, তিনিও একজন এম্, এ। তাঁহার রচিত অনেক গ্রন্থ স্কুলপাঠ্য বলিয়া গৃহীত। উদ্ধৃত পত্রখানি তাঁহারই লিখিত। তিনি এ সম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাষা ও সাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই অনুমোদনীয়। অধিকন্তু কথ্য ভাষায় সাহিত্যগঠন যে অসম্ভব, অদূরদর্শী উন্মার্গগামী লেখক নামধারীদিগের তাহা অনুভব করিবার সামর্থ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন কথ্য ভাষা প্রচলিত। শুধু পূর্ব্ববঙ্গে কেন, পশ্চিমবঙ্গের ভিন্ন-ভিন্ন জেলায় 'কথ্য' ভাষায় অনেক বৈষম্য আছে। মেদিনীপুর জেলা প্রেসিডেন্সী বিভাগের অন্তর্গত; কিন্তু এই জেলার ভিন্ন ভিন্ন মহকুমার অধিবাসীবর্গের 'কথ্য' ভাষায় অনেক বৈষম্য। এই জেলার 'কথ্য' ভাষা উড়িয়া ও বাঙ্গালা মিশ্রিত। কথাটা রূঢ় হইলেও বাধ্য হইয়াই বলিতে হয় যে, যাহাদের সহিত ব্যাকরণের সম্বন্ধ রহিত,—ভূমিষ্ঠ হইয়া পিতা মাতার কথাবার্ত্তা শুনিয়া যে ভাষা শিক্ষা করিয়াছে, তদতিরিক্ত আর বেশী অভিজ্ঞতা নাই, অথচ লেখক সাজিবার সাধ ষোল আনা আছে, সেসকল অদূরদর্শীরাই, কলমের মুখে যাহা আসে তাহাই লিখিয়া সাহিত্যের কাঠামো খাড়া করিবার জন্য একান্ত প্রয়াসী। তাঁহাদের জানা উচিত যে কথ্য ভাষায় সাহিত্য গড়িতে হইলে যে সমগ্র বঙ্গে রকমওয়ারি ভাষার সৃষ্টি হইয়া খাঁটী বাঙ্গালা তাহার অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিবে! শুধু তাহাই নহে, এই 'কথ্য' ভাষার মর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য প্রচলিত অভিধানগুলিতে অগ্নিসংযোগ পূর্ব্বক নূতন অভিধান প্রণয়ন না করিলে চলিবে না। কেন চলিবে না, তাহার একটু নমুনা দিতেছি।

গত ভাদ্রের ভারতীতে শ্রীনবকুমার কবিরত্ন স্বাক্ষরিত একটী প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে,—

"প্যালো ব'শেখের 'সাহিত্য-সংহিতা'র কাশিমবাজারের খেতাবী মহারাজের স্বাক্ষরে বে-কায়দা চিত্ত-বিক্ষেপের একটু অপূর্ব্ব নমুনা ছাপা হয়েছে। রচনাটির নাম 'সত্যাপত্তির অভিভাষণ।' তা' না হ'য়ে 'আনাড়ির অভিভাষণ' হ'লেই ঠিক হ'ত।"

কবিরত্ন মহাশয়ের এইরূপ উক্তিতে কাহার 'বে-কায়দা চিত্তবিক্ষেপ' প্রকাশ পাইয়াছে এবং 'আনাড়ি কে, তাহা পাঠকগণ অবশ্যই বুঝতে পারিতেছেন। এই প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই। কিন্তু "প্যালো ব'শেখের 'প্যালো' আর 'ব'শেখ' শব্দ দুটী দেখিয়া যে অনেক জেলার পাঠকবর্গের 'কায়দা-মাফিক' 'চিত্তবিক্ষেপ' উপস্থিত হইবে, তাহার জবাবটা দিতে কবিরত্ন মহাশয়ের 'চিত্তবিক্ষেপ' উপস্থিত হইবে না কি?

পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতের সহিত আমরা একমত হইয়া বলিতেছি,—সমগ্র বঙ্গের সুলেখকবর্গ ই 'সাধুভাষার রাজত্ব সুদৃঢ় ও অপ্রতিহত' রাখিবার জন্য সচেষ্ট থাকুন,—এসকল উন্মার্গগামী খোকাবাবুরা কখনই মাথা তুলিতে পারিবে না। ধঃ সঃ।

সদাচার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন বি, এল্]

"শুনিলাম ইহার বহিঃশোভা অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্য সহস্রগুণে অধিক মনোরম। এবং ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ হইলে অতিথির ভাগ্যে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ ঘটিয়া থাকে।" দ্বারপাল বলিল "হাঁ মহাশয় আপনি যে প্রশংসা শুনিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য এবং তাহাতে বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জন নাই। প্রাসাদে প্রবেশলাভের সম্বন্ধে আপনার পক্ষে কোন বাধা উপস্থিত হইবেনা। মহাশয় অভিমত প্রকাশ করিলেই হইল। আপনার ন্যায় নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মচারীর পদধূলী প্রাপ্ত হইলে আমার প্রভু নিজেকে অতিশয় সমাদৃত ও সৌভাগ্যবান্ জ্ঞান করিবেন। তবে তাঁহার একটি নিবেদন আছে, আপনাকে কেবল সেইটী পালন করিতে হইবে। নিবেদনটী এই যে, অতিথিকে গৃহপ্রবেশের পূর্ব্বে আমার হস্তস্থিত সুশাণিত তরবারী দ্বারা আমার মস্তক ভূমিতে পাটিত করিতে হইবে। অতএব আপনার যদি অনুগ্রহ হয়, তাহা হইলে এই দণ্ডেই এই অসি দ্বারা আমার শরীর হইতে মস্তক দ্বিধা বিচ্ছিন্ন করিয়া অভ্যন্তরে গমন করিতে আজ্ঞা হউক।" এই বলিয়া দ্বারবান কৃতবিত্ত ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকুমারের হস্তে সানন্দে গড়া দিতে অগ্রসর হইল। ব্রহ্মচারী তদ্দর্শনে শিহরিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ দ্রুত পাদবিক্ষেপে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

এবম্প্রকারে ভগ্নমনোরথ হওয়া সত্বেও ব্রাহ্মণকুমারের ঔৎসুক্য নিবৃত্ত না হইয়া অনেকগুণে পরিবর্দ্ধিত হইল। তখন তিনি দুঃখের নিদারুণ যন্ত্রণায় ও তীব্র ঔৎসুক্যের প্রবল তাড়নে ছিন্নমুণ্ড অজের ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন, ও মনোমধ্যে প্রবেশের উপায় চিন্তা ও গৃহস্বামীর উক্ত আদেশ-চতুষ্টয়ের দোষগুণ সমালোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন যে ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, পরনারী গমন ও গোমাংস ভক্ষণ, এই চারিটির কোন একটী অপকার্য্য না করিয়া সৌধাভ্যন্তরে প্রবেশের উপায়ান্তর নাই।

পূর্ব্বে আদি বৈদিকযুগে নরমেধযজ্ঞ প্রচলিত ছিল, কিন্তু পরে উহা বেদেই বারণ হইয়াছে। শুনা যায়, কোন কোন তন্ত্রোক্ত সাধনে ব্রাহ্মণ বলি দিবার ব্যবস্থা আছে; কিন্তু ব্রহ্মহত্যা মন্বাদি স্মৃতি বিরুদ্ধ এবং মহাপাতকরূপে পরিগণিত। এ· কি রাজাও দণ্ডার্হ ব্রাহ্মণকে হত্যা করিতে পারেন না। শ্রুতি ও স্মৃতি-বিরুদ্ধ তন্ত্র গ্রহণীয় নহে ঃ—

শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধানি আগমাদীনি যানি চ।
করালভৈরবঞ্চাপি যামলঞ্চাপি যৎ কৃতম্।
এবম্বিধানি চান্যানি মোহানার্থানি তানি বৈ॥

ইতি কূর্ম্মপুরাণম্।

"যেসকল আগম, করাল ভৈরব, ও যামল শ্রুতি-স্মৃতিবিরুদ্ধ, এবং এইরূপ অন্যান্য যেসমস্ত তন্ত্রশাস্ত্র আছে, তাহারা শাস্ত্রই নহে, কেবল মোহ ও অনর্থের মূল।"

প্রকৃত তন্ত্রশাস্ত্র বেদসম্মতই হইয়া থাকে ঃ—

দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা।
তথা সমস্ত শাস্ত্রাণাং তন্ত্রশাস্ত্রমনুত্তমম্।
সর্ব্বকামং প্রদং পুণ্যং তন্ত্রং বৈ বেদ সংমতম্॥

"যেমন দেবীদিগের মধ্যে দুর্গা ও বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সর্ব্বকামপ্রদ ও পুণ্য তন্ত্রশাস্ত্র অপর শাস্ত্রাপেক্ষা উত্তম, উহা বেদসম্মত।"

আর একটি কথা এই যে, তর্কানুরোধে বেদ ও স্মৃতিবিরোধী তন্ত্র বিধান যেন মান্য স্বীকার করিলাম, তাহা হইলেও ত আমায় ব্রহ্মহত্যা জনিত মহাপাতকে পড়িতে হয়। আগমের উৎপত্তির কারণ এইরূপ বলা হইয়াছে যে, কলিকালে বৈদিক

মন্ত্রসকল নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্ত মানবের উদ্ধারের জন্ত তন্ত্রশাস্ত্র রচিত হইল। ভাল, বৈদিকমন্ত্রই যেন নির্ব্বীর্য্য হইয়াছে, বৈদিক-আচার ত তন্ত্রে নিষিদ্ধ হয় নাই। সুতরাং ব্রহ্ম-হত্যা এখনও মহাপাতক। ব্রহ্মহত্যা পূর্ব্বক তান্ত্রিক সাধনের ফল পাইলেও ব্রহ্মহত্যা জনিত মহাপাতক আমাকে স্পর্শ করিতেছে। রামচন্দ্র রাবণ বধের দ্বারা মহা পুণ্য অর্জ্জন করিলেও তাঁহাকে ব্রহ্ম-হত্যা জনিত পাতকের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। আমি যদি চতুর্ব্বর্গফল সাধনার্থ ব্রহ্মহত্যা করি, তাহা হইলেও আমাকে ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হইতে হইবে। আর মহানির্ব্বাণতন্ত্রে দেখিতে পাই, বলিদানের জন্ত এই পশুগুলিই প্রশস্ত ঃ—

মৃগশ্ছাগশ্চ মেষশ্চ লুলাপঃ শূকরস্তথা।
শল্লকী শশকো গোধা কূর্ম্ম খড়্গী দশ স্মৃতাঃ।

"মৃগ, ছাগ, মেষ, মহিষ, শূকর, শল্লকী, শশক, গোধা, কূর্ম্ম ও গণ্ডার এই দশবিধ পশু বলিদানে প্রশস্ত বলিয়া স্মৃত হইয়াছে।"

সাধকের ইচ্ছানুসারে অন্যান্য পশু বলিদানেরও ব্যবস্থা আছে ; কিন্তু নরবলি, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ বলিদানের ব্যবস্থা দেখিতে পাই না। এবং শবসাধনেও ব্রাহ্মণের শব পরিত্যজ্য। এইসকল কারণে ব্রহ্মহত্যা যুক্তিযুক্ত মনে করি না। অতএব আমি এরূপ গর্হিত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলাম।

গোমাংস ভোজন কলিকালে একেবারেই নিষিদ্ধ। ইহাও এক্ষণে মহাপাতক স্বরূপে গণ্য হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ইহা আমার অত্যন্ত অপ্রীতি-কর, ঘৃণ্য ও নিতান্ত বীভৎস বলিয়া বোধ হইতেছে, সুতরাং ইহাও আমার অসাধ্য।

ব্রাহ্মণকুমারীকে জীবনের চিরসহচরী করা যায় কি না এক্ষণে তাহাই বিচার করিয়া দেখা যাউক, ব্রাহ্মণাত্মজা রূপ-যৌবন-সম্পন্না ; ইহাঁকে বিবাহ করিতে পারিলে, আমার পক্ষে পরম শ্রেয়ই হয়।

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাং॥
অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥

মনু ৩।৪।৫।

গুরুর অনুমতি গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত স্নান সমাপনের পর দ্বিজ সুলক্ষণান্বিতা সবর্ণাকে বিবাহ করিবেন। যে নারী পাত্রের মাতার অসপিণ্ডা ও পিতার সগোত্রা ও সপিণ্ডা নহেন, এমন নারীই বিবাহ সাধ্যকর্ম্মে ও সুরত ক্রিয়ায় প্রশস্তা।"

এই নারী আমার সবর্ণা পরম রূপবতী ও সর্ব্ব-সুলক্ষণযুক্তা—এই রমণীই বিবাহকার্য্যে প্রশস্তা। আচার্য্যের অনুমতিও পাইতে বিলম্ব হইবে না। তবে ইনি অজ্ঞাত কুলশীলা, ইহাঁর গোত্রাদির পরিচয় পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কুল শীল না জানিলে, সপিণ্ডতা ও গোত্রাদির নির্ণয় হইতে পারে না। মাতার অসপিণ্ডা ও পিতার অসগোত্রা ও অসপিণ্ডা বিবাহে ও মৈথুনে প্রশস্তা বলায় বুঝিতে হইবে না যে সগোত্রা ও মাতাপিতার সপিণ্ডা নারীকে বিবাহ করা যাইতে পারে ; তবে সেটা ভাল নহে।

অন্যান্য শাস্ত্রে এরূপ বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। 'প্রশস্ত' বাক্যটী ব্যবহার করিবার কারণ কলিকালের পূর্ব্বে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। অসবর্ণ বিবাহ অপেক্ষা সবর্ণ বিবাহ প্রশস্ত ইহাই বলা হইয়াছে। পরে মনু ইহা ভাল করিয়া পরিস্ফুট করিয়াছেন ঃ—

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তা না মিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোবরাঃ॥
শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বাচ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বাচৈব রাজ্ঞঃ স্যুস্তাশ্চ স্বাচাগ্র জন্মনঃ॥
ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাবাপগ্যপি হি তিষ্ঠতোঃ।
কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্য্যোপদিশ্যতে॥

"সবর্ণা ও অসবর্ণা বিবাহযোগ্যা নারী বিদ্যমানে, সবর্ণা নারী বিবাহার্থ অগ্রে প্রশস্তা অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠা

জানিতে হইবে; কিন্তু যাঁহাদের অসবর্ণা বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে নিম্নলিখিত গুলি পর পর শ্রেষ্ঠা জানিতে হইবে। শূদ্রাই কেবল শূদ্রেরই ভার্য্যা হইবে; শূদ্রা ও বৈশ্যা—বৈশ্যের; শূদ্রা, বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়া—ক্ষত্রিয়ের; শূদ্রা, বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণী—ব্রাহ্মণের হইবে। ইতিহাসাদি কোন বৃত্তান্তে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বিপদে পড়িয়াও শূদ্রা ভার্য্যা গ্রহণের উপদেশ পাই না।"

অতএব এইরূপ অজ্ঞাত কুলশীলা বিবাহের অযোগ্যা, যে হেতু বিবাহ অসিদ্ধ হইবে। দ্বিতীয়তঃ বিবাহের সাধু উদ্দেশ্যও বিফল হইবে। শাস্ত্র বলিয়াছেন:—

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ডঃ প্রয়োজনং।"

ভার্য্যা গ্রহণ পুত্রের জন্য ও পুত্র পিণ্ডের জন্য প্রয়োজন। নিন্দিত পুত্র দ্বারা পিণ্ড অসিদ্ধ হয়। যে বিবাহ নিষিদ্ধ বা নিন্দিত, তাহার দ্বারা সৎপুত্র সম্ভাবনা নাই।

অনিন্দিতৈঃ স্ত্রী বিবাহৈ রনিন্দ্যা ভবতি প্রজা।
নিন্দিতৈ নিন্দিতা নৃণাং তস্মান্নিন্দ্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥
মনুঃ ৩।৪২

অনিন্দিতা স্ত্রী বিবাহে অনিন্দিত সন্তান জন্মায় এবং নিন্দিত বিবাহে মনুষ্যদিগের নিন্দিত সন্তান জন্মে। এইজন্য নিন্দিত বিবাহ ত্যাগ করিবে।

এই কুমারী যদি আমার সগোত্রা হন, তাহা হইলে এই বিবাহ ত অসিদ্ধ হইল ও তদ্গর্ভজ সন্তান আমার গোত্রবর্দ্ধন পুত্র না হইয়া চণ্ডাল হইবে।

'কুমারী সম্ভবস্ত্বেকঃ সগোত্রায়াং দ্বিতীয়কঃ।
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রতো জাতঃ চণ্ডালস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ॥
ব্যাস সং।

মহর্ষি বেদব্যাস তদীয় সংহিতায় বলিয়াছেন, "কুমারী সম্ভব এক প্রকার, সবর্ণা ও অসবর্ণা সগোত্রাতে জাত দ্বিতীয় প্রকার, ও ব্রাহ্মণীতে শূদ্র হইতে উৎপাদিত এই তৃতীয় প্রকার সন্তান চণ্ডাল হয়।" অতএব এরূপ নারী বিবাহের সম্পূর্ণ অযোগ্যা। পরন্তু ইনি স্বয়ং পত্নীত্ব স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহেন। ইনি জীবনের চিরসহচরী হইতে অভিলাষিণী। যখন ইনি অবিবাহ্যা তখন শাস্ত্রানুমোদিত হইলে ইঁহাকে চিরসহচরী করিতেই বা আমার ক্ষতি কি? আমার পক্ষে ত ভালই হয়। পরন্তু শাস্ত্রে বলিয়াছেন (মনু ৯।৩) কুমারী পিতার অধীন থাকিবেন। অতএব তিনি যদি পিতার মত গ্রহণ না করিয়া স্বেচ্ছায় আমার সহচরী হন, তাহা হইলে ইঁহার স্বতন্ত্রতা দোষ ঘটে ও আমার সবর্ণা কুমারী দূষণ ঘটে। সবর্ণা কুমারী দূষণের জন্য পাপ ত আছেই, তাহার উপর কন্যার পিতা যে শুল্ক চাহিবেন, তাহা দিতে হইবে। (মনু ১০।২৪)। যদি পাতক ইহাপেক্ষা অধিক গুরুতর না হয়, তাহা হইলে না হয় কিছু দণ্ডই দিলাম। কিন্তু দণ্ড দিবারও কোন সম্ভাবনা নাই, যেহেতু এই কুমারী অজ্ঞাত কুলশীলা। এখন দেখা যাউক, সবর্ণা-কুমারী-গমনে কোন পাতক হয় কি না। আমি ইতিপূর্ব্বেই উদ্ধৃত ব্যাস বচনে দেখিয়াছি যে "কুমারী-সম্ভব" একপ্রকার চণ্ডাল। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—"সঙ্করো নরকায়ৈব" সঙ্করোৎপাদন নরকের জন্যই হইয়া থাকে। চণ্ডাল সঙ্করাধম, সুতরাং যে কার্য্যে সঙ্করোৎপত্তি বিশেষতঃ যাহাতে চণ্ডাল হয়, তাহা অতীব গর্হিত। তদ্দ্বারা চিরনরকের পথ প্রশস্ত হয়। ভগবান্ মনু (মনু ১১।৯৪) ও বলিয়াছেন:—

রেতঃ সেকঃ স্বযোনীষু কুমারীষন্ত্যজাসু চ।
সখ্যুঃ পুত্রস্য স্ত্রীষু গুরুতল্প সমং বিদুঃ॥

"স্বযোনিষয় অর্থাৎ সহোদরা ও বৈমাত্রেয়ী ভগ্নীতে, কুমারী, অন্ত্যজাতে এবং সখা ও পুত্রের বধূতে রেতসেক গুরুতল্প সমান পাতক জানিবে। গুর্ব্বাঙ্গনা গমন মহাপাতক; অতএব এই সকলগুলিই মহাপাতক নিশ্চিত হইল। এ "কুমারী" কি প্রকার—সবর্ণা বা অসবর্ণা বা অন্য কিছু! চণ্ডালীতে উৎপাদিত পুত্র চণ্ডাল হয়। চণ্ডালোৎপাদন মহাপাতক; কেন না চণ্ডাল সঙ্করাধম। এই

শ্লোকের 'অন্ত্যজা' শব্দটা নিশ্চয়ই চণ্ডালী বুঝাইতেছে শূদ্রা অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই তাহার কারণ শূদ্রাতে পুত্র উৎপাদন মহাপাতক নহে। সে পুত্র চণ্ডাল হয় না, যদিও শূদ্র ধর্ম্মা হয় যথা—

স্বজাতিজানন্তরাজাঃ ষট্‌সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণাঞ্চ সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বে অপধ্বংসজাঃস্মৃতাঃ॥

মনু ১০।৪১

"সমস্ত অপধ্বংসজাগণ শূদ্র সমধর্ম্মা হয়। তদ্ভিন্ন স্বজাতীয়া স্ত্রীতে জাত ব্রাহ্মণের দ্বারা ব্রাহ্মণীতে জাত, ক্ষত্রিয়ের দ্বারা ক্ষত্রিয়াতে জাত, বৈশ্যের দ্বারা বৈশ্যাতে জাতঃ এবং অনুলোমক্রমে ব্রাহ্মণের দ্বারা ক্ষত্রিয়া কুমারীতে জাত ব্রাহ্মণের দ্বারা বৈশ্যা কুমারীতে জাত ও ক্ষত্রিয়ের দ্বারা বৈশ্যা কুমারীতে জাত এই ছয় প্রকার দ্বিজ (পিতার সমান) ধর্ম্মা হয়।" শূদ্রা সম্ভোগে দ্বিজাতি ত্রয়ের দৈব পিত্র্য ও আতিথ্য কর্ম্ম ও বর্ণধর্ম্ম নষ্ট হয়। (মনু ৩।১৭—১৯)। সেই হেতু শূদ্রা পুত্রকে অপধ্বংসজ বলা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভগবান মনু ও মহর্ষি বেদব্যাস একই কুমারীর কথা বলিয়াছেন। এই কুমারী প্রতিলোমা হইতে পারে না—যেহেতু মনু বলিয়াছেন, প্রতিলোম ক্রমে যে সন্তান হয় সে চণ্ডাল হয় না, বর্ণসঙ্কর হয় বটে (মনু ১০।২৪)।

ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যা বেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেণ জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ।

(অধম বর্ণ পুরুষকর্তৃক উত্তম বর্ণা স্ত্রী বিবাহে বা গমনে বর্ণ ব্যভিচার হয়, এইরূপ) বর্ণগণের ব্যভিচার দ্বারা, অবেদ্যা (যথা গুরুসম্পর্কীয়া, সগোত্রা, মাতৃসপিণ্ডা, পিতৃসপিণ্ডা,) বেদন দ্বারা ও নিজজাতীর ও বর্ণোচিত কর্ম্মত্যাগের দ্বারায় বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়।" এই কুমারী অনুলোমা অসবর্ণাও নহে; যেহেতু আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি অনুলোমক্রমে শূদ্রাকুমারীতে জাত সন্তান (যথা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের দ্বারা শূদ্রা কন্যাতে জাত কানীন পুত্রত্রয় যথাক্রমে পারশব, উগ্র ও করণ হয়, ইহারা সর্ব্বেই শূদ্রশ্রেষ্ঠ—বর্ণসঙ্কর বা চণ্ডাল নহে। এবং ব্রাহ্মণের দ্বারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কুমারী দ্বয়ে যে সন্তান হয় এবং ক্ষত্রিয়ের দ্বারা বৈশ্যকুমারীতে যে সন্তান হয় তাহারা (পিতৃবৎ) দ্বিজধর্ম্মা। মনু আরও সুস্পষ্ট ভাবে নিম্নশ্লোকে এই কথা বলিয়াছেন (মনু ১০।৫) যথা:—

সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষ্বক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যাজ্ঞেয়া স্তএবতে॥

"সর্ব্ববর্ণের মধ্যে এই বিধি প্রযুজ্য যে—যাহারা তুল্যা নারীতে, নিজ পত্নীতে, ও অনুলোমক্রমে অক্ষতযোনি কুমারীতে জাত হয় তাহারা জাতিতে পিতার স্বরূপ হয়।" এই শ্লোকে বিশদ ভাবে বলা হইল যে ব্রাহ্মণের দ্বারা অনুলোম ক্রমে ক্ষত্রিয়া কুমারীতে জাত কানীন মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতিতে ব্রাহ্মণ হয়,যেমন বেদব্যাস। ব্রাহ্মণের দ্বারা বৈশ্যা কুমারীতে জাত কানীন অম্বষ্ঠ জাতিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের দ্বারা বৈশ্যা কুমারীতে জাতকানীন মাহিষ্য জাতিতে ক্ষত্রিয় হয়, শূদ্রাকুমারীর জন্য বিশেষ বিধান থাকায় সে এই শ্লোকের অন্তর্ভুক্তা হয় নাই। যদি বলা যায় যে, সবর্ণাকুমারী জাত সন্তান সম্বন্ধেও পিতৃজাতির প্রাপ্তির কথা আছে, যেহেতু তুল্যানারীতে জাত পুত্র পিতৃজাতি প্রাপ্ত হইবে বলা হইয়াছে; তাহা হইলে এই শ্লোকের সঙ্গত অর্থ হয় না। অবশ্য বর্ণতুল্যতা তিন প্রকারে হয়, যথা—জন্মতঃ বিবাহতঃ ও উভয়ত:—যেমন ব্রাহ্মণ কুমারী ব্রাহ্মণের জন্মতঃ তুল্যা, ও ব্রাহ্মণকুমারীর কোন ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ হইলে তিনি সকল ব্রাহ্মণেরই উভয়তঃ তুল্যা। এবং ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা কুমারী, যখন সমন্ত্রক যজ্ঞসংযোগ দ্বারা কোন ব্রাহ্মণের পত্নী হইয়া পতি ব্রাহ্মণের বর্ণ ও গোত্র প্রাপ্ত হন ও পতির সহিত সর্ব্ববিষয়ে, এমন কি ধর্ম্মাধর্ম্মেও এক হইয়া ব্রাহ্মণী হইয়া যান, তখন তাঁহারা সকল ব্রাহ্মণেরই বিবাহতঃ তুল্যবর্ণা হন। যখন মনু কুমারীতে রেতঃ সেক গুরুতল্প সমান পাতক

বলিয়া পরে বিশেষ ভাবে আনুলোম্যে যাহারা জাত, তাহারা পিতৃজাতীয় হয়—চণ্ডাল হয় না—বলিলেন, তখন এই শ্লোকে সবর্ণা কুমারীর কথা স্পষ্ট ভাবে না বলায় তাহারা এই শ্লোকে 'তুল্যা নারী'র ভিতর গৃহীত হয় নাই। অন্যতর প্রমাণ এই যে যখন কুমারীর কথা স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন তখন 'আনুলোম্যে' এই কথাটী না বলিয়া কেবল অক্ষত যোনি বলিলেই ত সবর্ণা কুমারী তাহার ভিতর আসিত, অতএব অনুলোমা বলায় বুঝাইতেছে 'তুল্যা নারীতে' কথার ভিতর 'সবর্ণা কুমারী' গৃহীত হয় নাই। 'পত্নীতে' বলায় বুঝাইতেছে যে, 'তুল্যা নারীতে' কথার ভিতর নিজ পত্নীর কথা গৃহীত হয় নাই। 'তুল্যাতে' শব্দের অর্থ দ্বিজের পরোঢ়া বিবাহতঃ তুল্যা ও উভয়তঃ তুল্যাবিজা এবং শূদ্রের যোঢ়া ও পরোঢ়া শূদ্রা। এই কুমারী শব্দে অবেস্তা কুমারী বিবক্ষিতা হয় নাই। তাহার কারণ অন্যান্য বিশেষ ব্যবস্থানুসারে আবেস্তাতে জাত বর্ণসঙ্কর ও চণ্ডাল হয় বলা হইয়াছে। অতএব এই 'কুমারী' শব্দে সবর্ণা কুমারীই বিবক্ষিতা হইয়াছে। অতএব স্মৃতির বিধানানুসারে এরূপ কুমারীকে সহচরী ভাবে গ্রহণ করিলে আমাকে মহাপাপে লিপ্ত হইতে হইবে। তন্ত্রশাস্ত্রেও ইহার কোন ব্যবস্থা নাই, বরং নিষেধ বিধিই আছে। পঞ্চমকার সাধনের মধ্যে মৈথুন সাধন আছে বটে, তাহা কিন্তু অপরিণীতা রমণীতে হয় না যথা—

বিনা পরিণীতা বীরং শক্তিসেবা সমাচরণ
পরস্ত্রী গমনং পাপং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ।
মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

স্বীয় পরিণীতা স্ত্রী ভিন্ন সাধক অন্য শক্তি গ্রহণ করিলে পরস্ত্রীগমনের পাপ প্রাপ্ত হইবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। অতএব আমার এই কুমারীকে জীবনের চির সহচরী করা হইল না।

সুরা পানটী বোধ হয় উল্লিখিত চতুষ্টয় আদেশের মধ্যে লঘু পাতক। যদিও আমি ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে শ্রুতি ও স্মৃতির মতে ইহা মহাপাতক বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু পুনশ্চ শ্রুতিতেই দেখিতে পাই, বহু পূর্ব্বে, সুরা পান নিষিদ্ধ ছিল না। ঋষিগণ সুরা শোধন করিয়া পান করিতেন। এবং দুই এক স্থানে স্পষ্ট সুরা পানের উপদেশ আছে। যেমন

সৌত্রামন্যাং সুরাং পিবেৎ

"সৌত্রামণি যাগে সুরা পান করিবে। এই বচনটী যেমন শ্রুতির উপদেশ 'মদ্য দিবে না পান করিবে না বা কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করিবে না" তদ্রূপ শ্রুতির আদেশ। ভগবান এই শ্রুতি দ্বৈধ দেখিলে বলিয়াছেন (মনু ২।৮৪)

শ্রুতি দ্বৈধন্তু যত্র স্যাত্তত্র ধর্ম্মা বভৌ স্মৃতৌ।
উভাবপি হিতৌ সম্যগুক্তৌ মনীষিভিঃ॥

"যে স্থলে শ্রুতি বচনদ্বয় পরস্পর বিরোধী হয়, মনীষিগণ তথায় উভয় শ্রুতি বচনকেই ধর্ম্মজনক বলিয়াছেন। অতএব আমার বোধ হয় শোধন করিয়া অল্পমাত্রায় সুরা পান করিলে তত দোষ হইবে না। আর শাস্ত্রের ব্যবস্থা সমস্ত অধিকারী ভেদে বিভিন্ন হয়। মনু ত ইহাও বলিয়াছেন

ন মাংস ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলাঃ॥

"মনুষ্যগণের মাংসভক্ষণে বা মদ্যপানে বা মৈথুনে দোষ নাই, কারণ ইহা ভূতগণের প্রবৃত্তির কর্ম্ম। এই সকল কার্য্য হইতে নিবৃত্তিই মহাফলদায়ক।" মনু মদ্যপান নিষেধ করিবার স্থলে (মনু ১১।৯৭) কারণ দর্শাইয়া এই বলিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণ মদ্যপানে মত্ত হইয়া অপকার্য্য করিয়া ফেলিতে পারে, সেই জন্য মদ্যপান করা উচিত নহে। অতএব দেখা যাইতেছে মদ্য পান যদি একেবারে গর্হিত হইত তাহা হইলে মনু কারণ দর্শাইতেন না; যখন কারণ দর্শাইয়াছেন, তখন জানিতে হইবে মত্ততাই মহা পাতকের লক্ষণ। মত্ততা না হইলে মদ্য পানে দোষ হয় না। শোধিত সুরা অল্পমাত্রায় পান করিলে দোষ হইতে পারে না। না হয় মহা ফল লাভই হইল না। শুক্রাচার্য্য মদ্যপান নিষেধ

করিবার পূর্ব্বে সুরা পান নিষিদ্ধ ছিল না। তিনি অবশ্য সুরা শোধিত করিয়া পান করিয়াছিলেন; পরন্তু তিনি অতিমাত্রায় সেবন করিয়া উন্মত্ত হইয়া পড়েন; ও সেই অবস্থায় প্রিয়শিষ্য কচকে কাটিয়া ভক্ষণ করিয়া ফেলেন বলিয়া সুরা পান সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করিয়া যান। তদবধি বহুশাস্ত্রেও ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই নিষেধ আজ্ঞা সত্ত্বেও বৈদ্যগণ অদ্যাবধি রোগিগণকে মৃতসঞ্জীবনী ও অন্যান্য সুরা ব্যবস্থা করেন। আয়ুর্ব্বেদে সুরার বহু প্রশংসাও দেখা যায়। এবং তান্ত্রিক সাধকগণ এখনও তন্ত্রের ব্যবস্থানুসারে সুরা পান করেন। এবং তন্ত্রে সুরা পানের উপদেশও আছে ঃ—

গৌড়ী পৈষ্টী তথা মাধ্বী ত্রিবিধা চোত্তমা সুরা।
সৈব নানা বিধা প্রোক্তা তাল খর্জ্জুরসম্ভবা॥
তথা দেশ বিভেদেন নানাদ্রব্যবিভেদতঃ।
বহুধেয়ং সমাখ্যাতা প্রশস্তা দেবতার্চ্চনে॥
যেন কেন সমুৎপন্না যেন কেনাহৃতাপি বা।
নাত্র জাতি বিভেদোঽস্তি শোধিতা সর্ব্বসিদ্ধিদা॥
মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

গৌড়ী পৈষ্টী ও মাধ্বী এই ত্রিবিধ সুরাই উত্তম বলিয়া গণ্য; এই সকল সুরা তাল খর্জ্জুর ও অন্যান্য দ্রব্যরসে সম্ভূতা হইয়া থাকে। দেশ-ভেদেও নানাপ্রকার সুরার সৃষ্টি হইয়া থাকে; দেবার্চ্চনা পক্ষে সুরাই প্রশস্ত। এইসকল সুরা যাহার দ্বারাই উৎপন্ন ও আনীত হউক না কেন শোধিতা হইলেই সিদ্ধদাত্রী হয়, ইহাতে জাতি বিচার নাই।” তন্ত্রে আরও বলা আছে যে, সুরা আদ্যতত্ত্ব—ইহা মহৌষধি স্বরূপ—ইহার আশ্রয়ে জীবগণ নিখিল দুঃখভোগ বিস্মৃত হয়, এবং ইহা অতিশয় আনন্দদায়ক। যদি অদ্যতত্ব শোধিত না হয়, উহা হইতে মোহ ও ভ্রমের উৎপত্তি হইয়া থাকে। হে প্রিয়ে! অসংস্কৃত তত্ব পরিত্যাগ করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।” তবে অশোধিত ও অতিমাত্রার পান নিষিদ্ধ আছে।

শতাভিষিক্ত কৌলশ্চেৎ অতিপানাৎ কুলেশ্বরি।
পশুরেব সমস্তব্যঃ কুলধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥

কুলেশ্বরি! শত শত বার অভিষিক্ত কৌল-ব্যক্তিও অতি পান দোষে দূষিত হইলে, কুলধর্ম্মচ্যুত হইবেন; এবং তাঁহাকে পশু মধ্যে গণনা করিতে হইবে।”

তাহা হইলে দেখিতেছি শোধিত সুরা অল্প মাত্রায় সেবন করিলে কোন দোষ হইবে না। অতএব প্রথম দ্বারপালের নিকট গিয়া সুরা পান করিতে পারি। এইরূপ সাব্যস্ত করিয়া ব্রাহ্মণ-কুমার প্রথম তোরণদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারবান্‌কে নিজ অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। দ্বাররক্ষক তৎ-ক্ষণাৎ আনন্দের সহিত ও বিনীতভাবে একপাত্র সুরা প্রদান করিল। ব্রাহ্মণকুমার তাহা তন্ত্রোক্ত-প্রকারে সংস্কৃত করিয়া সাগ্রহে পান করত আহ্লাদে উৎফুল্লিত হইলেন। এবং প্রাসাদাভ্যন্তরে গমন পূর্ব্বক ইতস্ততঃ সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সুরা জনিত সাময়িক অতিমাত্রায় সুখবোধ হওয়াতে তিনি সুরার প্রতি অত্যন্ত লোভাকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তিনি দেখিলেন সৌধের নানাস্থানে বিচিত্র বর্ণের বহুবিধ সুরা তাঁহারই সেবার জন্য রক্ষিত হইয়াছে, এবং পরম রূপযৌবন সম্পন্না রমণীগণ কেহ বা তাঁহার চিত্তবিনোদনের জন্য সুমধুর তান লয়যুক্ত গীত ও নৃত্য করিতেছে, কেহ বা সুরাপাত্র হস্তে সুরা ঢালিয়া দিবার জন্য তাঁহার ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করিতেছে। তখন তিনি মোহে লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বারম্বার সুরা পান করিতে লাগিলেন। পরে ক্রমশঃ যখন রাক্ষসী সুরা তাহার নিজ তামসী প্রভাব প্রকাশ করিল, তখন ব্রাহ্মণকুমার আত্মবিস্মৃত হইলেন। এবং জ্ঞানশূন্য হইয়া যথাক্রমে গোমাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন ও ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি করিলেন এইরূপে বিপরীত ভাবে তাঁহার পঞ্চমকার সাধন ও চতুর্বর্গ ফল লাভ হইল।

উপাধির আদান প্রদান।

অনেকের মনের ধারণা, সই সুপারিশের জোরে উপাধির আদান-প্রদান হইয়া থাকে। এই ধারণা যে কিয়ৎ পরিমাণে সত্য, তাহা, আদানপ্রদানের ব্যবস্থা দেখিয়া অনুভব করা যায়। সাধারণতঃ 'রায়বাহাদুর' 'রায়-সাহেব' প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর উপাধিগুলি যেভাবে বিতরিত হইয়া থাকে, অবস্থা দেখিয়া তাহাতে পাত্রাপাত্রের বিচার হয় বলিয়া মনে করা অনেক সময় অসুবিধাজনক বলিয়াই মনে হয়। স্থলবিশেষে 'রায়বাহাদুর' ও 'রায় সাহেব' উপাধি বিতরণে উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্মানের বৃদ্ধি না হইয়া বরং লাঘবই হইয়া থাকে, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নাই।

মিরার সম্পাদক বৈদ্যকুলতিলক স্বর্গীয় নরেন্দ্র নাথ সেন মহাশয়কে যে বৎসর 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রদত্ত হয়, সেই বৎসর কয়েকজন কেরাণী ও পুলিশইন্‌স্পেক্টরকেও এই উপাধি প্রদান করা হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় এই উপাধি প্রাপ্তির পূর্ব্বে দুইবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া কিরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। লর্ড কর্জ্জনের অনুষ্ঠিত দিল্লীদরবারে ভারতের যাবতীয় প্রদেশের সম্বাদপত্র সম্পাদকগণ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেই সময় নরেন্দ্রবাবু দরবার ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন; লর্ড কর্জ্জন নরেন্দ্রবাবুর হস্তধারণ পূর্ব্বক দরবার ক্ষেত্রে বলিয়াছিলেন—(He is the pioneer of the Indian Journalists) ইনি ভারতীয় সংবাদপত্র সম্পাদকবর্গের অগ্রণী। 'ন্যাসন্যাল কংগ্রেস' গঠিত হইবার পূর্ব্বে যখন 'ন্যাসন্যাল লীগ' নামক একটী সমিতি গঠিত হয়, তখন সমিতির পক্ষ হইতে তাৎকালিক বড়লাট লর্ড ডফারিণের নিকট কয়েকজন প্রতিনিধি গমন করেন। নরেন্দ্র বাবু তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। সেই সময় কথাপ্রসঙ্গে লর্ড ডফারিণের সহিত বাদানুবাদ ঘটে। সেই বাদানুবাদে নরেন্দ্র বাবু যেরূপ মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, এপর্য্যন্ত কোন ভারতসন্তানের তদ্রূপ স্পর্দ্ধার কথা শ্রুতিগোচর হয় নাই। বিশেষ কোন কারণে আমরা ঘটনাটির বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবৃত্তি করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, ইহা হইতেই জিজ্ঞাসা করিতে হয়,—এহেন মনস্বীর পক্ষে 'রায় বাহাদুর' উপাধিটা সম্মানের লাঘবজনক নয় কি?

অন্যপক্ষে এই আদানপ্রদানের ব্যবস্থা দেখিতে গেলে কতকটা বিস্মিত হইতে হয় বই কি! বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ মহোদয় দ্বয় সংবাদপত্র সম্পাদকরূপে ভারতের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ; এতদ্ভিন্ন, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ বাঙ্গালা সংবাদপত্র সম্পাদকগণের প্রসিদ্ধিও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নহে। কিন্তু ইঁহাদের খবর কেহ লইলেন না, খুঁজিয়া পাতিয়া সানকীভাঙ্গা হইতে বিহারীলাল সরকারকে 'রায় সাহেব' উপাধি প্রদান করা হইল! সরকার মহাশয়ের নিকট এই উপাধি বিষম ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে সত্য, কিন্তু এইরূপ 'দানটা' সম্বন্ধে যদি লোকে তোষামোদের কিম্বা সই সুপারিশের ফল বলিয়া বলে, তাহা হইলে আমাদিগকে অবশ্যই নির্ব্বাক থাকিতে হইবে।

এ ত গেল খুচরা উপাধির কথা। এই উপাধির সহিত সুরেন্দ্র বাবু এবং মতিবাবু প্রভৃতির নামের উল্লেখ করিলে তাঁহাদের মানের লাঘব [illegible] বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বড় বড় উপাধির আদানপ্রদান সম্বন্ধে যে নীতি অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতেও দশজনে দশকথা বলিতে কৃপণতা করে না। আমাদের পরলোকগত সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের অভিষেকের সময় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বিলাতে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি

স্বয়ং না যাইয়া পুত্র প্রদ্যোৎকুমারকে প্রেরণ করেন। বিলাত হইতে তখন অভিষেক সম্বন্ধে যে সকল তারের খবর আসিত, তাহাতে (Moharaja Tagore) 'মহারাজা ট্যাগোর' বলিয়া প্রদ্যোৎকুমার অভিহিত হইতেন। চা পানের আড্ডায় ইহা লইয়া তখন বেশ একটু ঘোট হইত। অনেকে বলিত, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন জীবিত অবস্থাতেই পুত্রকে 'মহারাজা' বানাইয়া যাইতে চান, এবং এই উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে বিলাত পাঠাইয়াছেন।

কতকগুলি উপাধি এরূপ আছে যে, উহা ঐশ্বর্য্যশালীদিগেরই একচেটিয়া। যথা,—কে, সি, আই, কে, সি, এস, আই প্রভৃতি। সি, আই, ই, উপাধিটার কদর নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর না হইলেও শুধু ঐশ্বর্য্যের দিকে না চাহিয়া লোকের শিক্ষা দীক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহা বিতরিত হইত। অনেকের ধারণা ছিল, সুরেন্দ্র বাবু ও মতিবাবু অচিরে এই সম্মান লাভ করিবেন। কিন্তু সাধারণের সে আশা পূর্ণ হইল কই? একজন বৃদ্ধ কথা প্রসঙ্গে একদিন বলিলেন,—'স্যর' উপাধিটা লক্ষ টাকা ব্যয় করিলে ক্রয় করা যায়। আমরা তাঁহার কথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম, কিন্তু তিনি আমাদিগকে বিস্ময়াপন্ন দেখিয়া বলিলেন,—'রবিঠাকুর নোবেল প্রাইজে যে টাকাটা পেয়েছে, তাহার সবটা ইউনিভার্সিটীকে দিয়া তাহার বিনিময়ে তাহাকে (Ph. D.) পি, এইচ্, ডি, খেতাব দিয়াছেন, আর গভর্ণমেণ্ট দিয়াছেন 'স্যর' খেতাবটী! রবিঠাকুরের খুব জোর কপাল বল্‌তে হবে।' বৃদ্ধের কথায় কাহাকেও দ্বিরুক্তি করিতে শুনিলাম না। তিনি একজন মাসিক চারিশত গভর্ণমেণ্ট-পেন্সনভোগী, একটু উপাধিও আছে। বাস্তবিক পক্ষে রবি-ঠাকুর ডবল ভাগ্যবান পুরুষ, এক গুলিতে দুইটী শিকার!

পণ্ডিত গণনাথ সেনের মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্তি অবলম্বন করিয়া আমাদের জনৈক পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন,—সুদূর মফস্বলে অনেক কৃতবিদ্য লোক ছিলেন, এবং আছেন, যাঁহারা কর্তৃপক্ষের পারিষদ্‌বর্গকে তোষামোদ করিতে পারেন না বলিয়া সম্মান লাভে বঞ্চিত আছেন। এতদ্‌প্রসঙ্গে তিনি কবিরাজ গঙ্গাধরের নামোল্লেখ করিতেও বিস্মৃত হন নাই। আমরা জানি, এবং আমাদের এখনও দৃঢ় বিশ্বাস, যাঁহারা সম্মানের যোগ্যপাত্র, যাঁহারা উপাধির নামানুযায়ী প্রকৃত গুণগরিমার অধিকারী, তাঁহারা উপাধির জন্য লালায়িত থাকেন না, স্থলবিশেষে উপেক্ষা করিতেও দেখা যায়। যে বৎসর 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধির সৃষ্টি হয়, সর্ব্বাগ্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই ইহা প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল; কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাহার করিয়া বলিয়াছিলেন,—'আমি' অন্যরূপ উপাধিতে পরিচিত হইতে চাহি না, আমার যে টুকু নিজস্ব আছে, তাহাই আমার পরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট।' আমাদের বিশ্বাস, স্বর্গীয় কবিরাজ গঙ্গাধরকে উপাধিপ্রদান করিতে গেলে তিনিও এরূপ উত্তরই প্রদান করিতেন। তাঁহার ন্যায় তেজস্বী পুরুষের সংখ্যা খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের বিশ্বাস কবিরাজ শিরোমণি শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের সম্বন্ধেও এরূপ কথা বলা অন্যায় হইবে না।

যাহা হউক গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের জন্য যতগুলি উপাধির সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে মহামহোপাধ্যায় উপাধিটীই শুধু পাণ্ডিত্যের পরিচয়ে বিতরিত হইয়া থাকে। এই উপাধির সহিত বার্ষিক একশত টাকার একটী বৃত্তির ব্যবস্থা আছে; সুতরাং ইহা ফাঁকি দিয়া, অথবা সই সুপারিশের খাতিরে লাভ করিবার উপায় নাই। এ পর্য্যন্ত যেসকল্ মহাত্মা এই উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই অযোগ্য নহেন, এবং অযোগ্য পাত্রে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করিবারও উপায় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও এরূপ আরও অনেক পণ্ডিত বর্ত্তমান আছেন, যাঁহারা অনেক পূর্ব্বে এই সম্মানে সম্মানিত হইবেন বলিয়া

সাধারণের আশা ছিল। ইঁহাদের মধ্যে কবিরাজ-শিরোমণি শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। ইনি সংস্কৃতে একজন অসাধারণ পণ্ডিত, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় ইঁহার কৃতিত্বের পরিচয় নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন হয় না। আজকাল সহরে প্রধান কবিরাজের নাম উল্লেখ করিতে হইলে, লোকে ইঁহারই নাম উল্লেখ করিয়া থাকে। চিকিৎসা ব্যবসায়ে দরিদ্রের প্রতি দয়া প্রদর্শনে অধুনা ইনি অদ্বিতীয়। এতদ্ব্যতীত অনেক স্থলে ইঁহার বদান্যতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষা-দীক্ষা, গুণ-গরিমায় ইনি যে প্রকৃত প্রস্তাবেই একজন মহামহোপাধ্যায়, সাধারণে তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কর্ত্তৃপক্ষ ইঁহাকে অচিরেই সম্মানিত করিবেন।

স্বাধীন-ত্রিপুরার রাজবৈদ্য শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র দাশ গুপ্ত কবিশেখর একজন সুপণ্ডিত। এই মনস্বীর শিক্ষা-দীক্ষা গুণগরিমা সম্বন্ধে জনসাধারণ এপর্য্যন্ত বিশেষ কিছু জানিবার সুবিধা না পাইলেও, কর্ত্তৃপক্ষ যে এসম্বন্ধে সবিশেষ অবগত আছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, বর্ত্তমান মহারাজের অভিষেকের সময়, ব্যবস্থার জন্য ভারতের নানা-স্থান হইতে পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু বিচারে কবিশেখর ললিতচন্দ্রের ব্যবস্থাই স্থিরতর ছিল। এহেন সুপণ্ডিতের প্রতিও কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি পতিত হওয়া উচিত।

আমাদের পরম সুহৃদ্ পণ্ডিতাগ্রগণ্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন কবিরত্ন মহাশয়ের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করাও জনসাধারণের দুঃখের কারণ হইয়াছে। কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ শুধু পণ্ডিত নহেন, একজন সুচিকিৎসক; চিকিৎসা-ক্ষেত্রে তাঁহার সুযশ আছে। অনেক ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য শিক্ষার্থী তাঁহার নিকট সংস্কৃত ও আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন। আমরা আশা করি, কর্ত্তৃপক্ষ ইঁহাদের পাণ্ডিত্য ও গুণগরিমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইঁহাদিগকে সম্মানিত করিবেন।

গৈলায় বিদ্বৎসভার বিশেষ অধিবেশন।

[শ্রীশ্রীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত, কবিশেখর।]

বরিশাল জেলান্তর্গত গৈলা একটী বৈদ্যপ্রধান স্থান। সেন, দাশ এবং গুপ্ত প্রভৃতি ভিন্ন বংশীয় এতাধিক বৈদ্য পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কোনও এক গ্রামে আছে বলিয়া জানা যায় না। নিখিল বঙ্গের বিভিন্নস্থানীয় বৈদ্যসমাজে ঐক্যবন্ধন এবং সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনকল্পে স্থাপিত কলিকাতার 'বিদ্বৎসভা'র সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন, বি, এল্ মহাশয় সম্প্রতি উপরোক্ত সভার উদ্দেশ্য লইয়া গৈলায় শুভাগমন করেন। গৈলার বৈদ্যসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা, এবং সভার সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন জন্য বিগত ৬ই কার্ত্তিক সুপ্রসিদ্ধ কবীন্দ্র-কলেজ গৃহে এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। গৈলার নেতৃস্থানীয় ও সম্ভ্রান্ত কতিপয় ব্যক্তি দ্বারা এই সভা আহুত হইয়াছিল, এবং তাহাতে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ বহু বৈদ্যসন্তান উপস্থিত থাকিয়া সভার উদ্দেশ্যে ও কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন।

রীত্যনুসারে সভাপতি নির্ব্বাচন এবং বিদ্বৎ-সভার সম্পাদক মহাশয়কে পুষ্পমালা দ্বারা অভ্যর্থনা করা হইলে পর, শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেন মহাশয়

বিদ্বৎসভার মহৎ উদ্দেশ্য, এবং তদর্থে সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন মহাশয়ের নানারূপ ক্লেশ স্বীকারে গৈলায় শুভাগমনের কারণ উপস্থিত ব্যক্তিগণকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেন এবং বৈদ্যজাতির মুখপাত্র স্বরূপ বিদ্বৎসভার মহৎ উদ্দেশ্যের সুসাধনকল্পে সহানুভূতি প্রদর্শন ও সভার সহিত যোগদান পূর্ব্বক জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে সকলকে অনুরোধ করেন। অপরাপর সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন না হইয়া, এই জাতীয় জাগরণের দিনে বৈদ্যমাত্রেরই যে ব্যক্তিগত পার্থক্য ভুলিয়া জাতীয় উন্নতি সাধনে স্বীয় শক্তি নিয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাও তিনি বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেন।

কবীন্দ্র কলেজের পক্ষ হইতে বিদ্বৎসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনকে সাদরে গ্রহণ কল্পে এক অভিভাষণপত্র পাঠান্তে তাঁহাকে প্রদত্ত হইলে পর, উপরোক্ত সম্পাদক মহাশয় তাঁহার আগমনের কারণ এবং বিদ্বৎসভার উদ্দেশ্য বিশদভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য নাতি দীর্ঘ এক বক্তৃতা করেন। তদনন্তর অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভার মহৎ উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীচরণ দাশ গুপ্ত, বি, এ, হেডমাষ্টার, অবসরপ্রাপ্ত ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাশ গুপ্ত, জায়ণীরকাটী গ্রাম নিবাসী ডিঃ জজ শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন রায়বাহাদুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বরিশাল বারের উকীল শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন, বি, এল্, এবং প্রবীণ ডাঃ শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়দিগের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন আরও অনেকে, বিদ্বৎসভার সহিত যে বৈদ্যমাত্রেরই যোগ রক্ষা করিয়া জাতীয় উন্নতি সাধন করা কর্ত্তব্য, তাহা বলেন। রাত্রি অধিক হওয়াতে, পক্ষান্তরে সভার অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যগুলি সম্পাদিত হইতে না পারাতে তৎপরদিবসও সভার অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইলে পর, প্রথম বক্তা শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রস্তাবে স্থিরীকৃত হয় যে, মূল সভার সহিত যোগ রক্ষা করা এবং সভ্য নির্ব্বাচন চাঁদা আদায় প্রভৃতি কার্য্যের জন্য গৈলায় কতিপয় সম্ভ্রান্ত ও উৎসাহী লোক দ্বারা একটী স্থানীয় কমিটি গঠিত করা কর্ত্তব্য।

অতঃপর সুযোগ্য সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত মহাশয় বিদ্বৎসভার সহিত যোগ রক্ষা করিয়া জাতীয় উন্নতি সাধনে অগ্রসর হইতে এবং অনতিবিলম্বে তদর্থে প্রস্তাবিত সব্ কমিটি গঠন করিতে স্থানীয় বৈদ্যদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। অতঃপর সভাপতি এবং বিদ্বৎসভার সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য স্থগিত রাখা হয়।

তৎপর দিবস ৭ই কার্ত্তিক গৈলায় প্রসিদ্ধ দাশমজুমদারদিগের বহির্বাটীতে স্থগিত সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। এই দিবস ঝড়বৃষ্টির আধিক্য বশতঃ আশানুরূপ লোক সভায় সমাগত না হইতে পারিলেও, স্থানীয় অধিকাংশ বংশেরই প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেই সভাস্থলেই অনেকে বিদ্বৎসভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয়েন এবং কতিপয় ব্যক্তি 'ধন্বন্তরি' পত্রিকার গ্রাহক হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহাদিগের নামধামাদি লিখিয়া লওয়া হয়। অধিকন্তু পূর্ব্বপ্রস্তাবিত স্থানীয় সব্-কমিটি অনতিবিলম্বে গঠন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া স্থিরীকৃত হইলে, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনকে বিদ্বৎসভার সম্পাদক ও সভার সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হয়। এস্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, বিদ্বৎসভার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত মহাশয়ের সহৃদয়তা সদাচার এবং কার্য্যপ্রণালী দৃষ্টে স্থানীয় স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত তাঁহার সদ্গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাই কোন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিধবা মহিলা তাঁহার স্বহস্তে প্রস্তুত একখানা গামছা গৃহজাত শিল্পের আদর্শ স্বরূপ সম্পাদক মহাশয়কে উপহার দেন। এতদ্ভিন্ন একটি একাদশ বর্ষীয় বালক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্পাদক মহাশয়ের গুণকীর্ত্তন এবং তৎসহ

'কতকাল সমাজের হীনাবস্থা'র বিষয় একটি সুন্দর কবিতা লিখিয়া পাঠ করে এবং ভক্তিভরে প্রণতঃ হইয়া সম্পাদক মহাশয়ের চরণতলে অর্পণ করে। ঝড়বৃষ্টি এবং অন্যান্য কারণে চলাফেরার নানাবিধ অসুবিধা থাকা সত্বেও যতীন বাবু বিশেষ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক গ্রামের প্রধান প্রধান পাড়ায় গমন করতঃ বয়োবৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত প্রায় অধিকাংশ লোকের সহিতই দেখা সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছেন।

কবীন্দ্র কলেজের সভাপতির অভিভাষণ।

৺বিজয়ার শুভাশীর্ব্বাদ মস্তকে গ্রহণ করিয়া শ্রদ্ধেয় সভাপতি ও সমাগত অম্বষ্ঠ বন্ধুবর্গ ও সমবেত সভ্যমণ্ডলী আমাদের এই কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রারম্ভেই যুক্তকরে আমরা ইহার সাফল্য কামনায় ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিতেছি। আপনারা সকলেই আমাদের সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। মহামান্য বিদ্বৎসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন, বি, এল, হাইকোর্টের উকীল মহোদয় যেরূপ পথক্লেশ স্বীকার করিয়া জাতীয় উন্নতিকল্পে এই মহা সম্মিলনে যোগদান করিয়াছেন, ইহা তাঁহার অম্বষ্ঠ জাতির প্রতি অশেষ প্রীতির পরিচায়ক। ইঁহার আগমনে আজ গৈলাবাসী অম্বষ্ঠগণ গৌরবান্বিত হইয়াছেন। গৈলায় যতীন্দ্র বাবুর শুভাগমনে আমরা কৃতার্থন্মন্য হইয়াছি। আমি গৈলাবাসীর পক্ষ হইতে যতীন্দ্র বাবুকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা মহানগরীতে 'বিদ্বৎসভা'র অনুষ্ঠান হইয়াছে। উক্ত সভার উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী পাঠ করিয়া আমাদের ইহা ধারণা জন্মিয়াছে যে, পরস্পরে সহানুভূতি থাকিলে নিশ্চয়ই এই সভা উন্নতির সোপানে ক্রমশঃ আরোহণ করিতে পারিবে। বৈদ্যজাতির সর্ব্বপ্রকার উন্নতি বিধানের জন্যই এই মহাসভা স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের সমাজের দিন দিন যেরূপ অবনতি হইতেছে, তাহাতে আশা করি, বিদ্বৎসভা এই ভীষণ দুর্দ্দিনে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সমূহের সমক্ষে শত শত বাধা উপেক্ষা করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্যে কৃতকার্য্য হইবে। বংশগৌরব রক্ষার্থ পূজ্যপাদ পিতৃপুরুষগণের মহামহিমার স্মৃতির পুনরুদ্ধারকল্পে, বৈদ্যসমাজের শোচনীয় দুর্দ্দশার দূরীকরণ উদ্দেশ্যে, নববলে বৈদ্যসমাজ প্রতিষ্ঠার্থ কার্য্যতঃ বিদ্বৎসভা আজ প্রথম পথপ্রদর্শক হইয়া এই মহাসম্মিলন আহ্বান করিয়াছেন। সমাজের ভীষণ অবনতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া আজ বৈদ্যসমাজ বুঝিয়াছেন যে, সমাজের ধর্ম্মবিরুদ্ধ নানা বিজাতীয় আচার, নীতি, শিক্ষা, দীক্ষা, আদর্শসমাজকে নানারূপে বিধ্বস্ত ও বিপন্ন করিয়াছে। আশা হইতেছে, বৈদ্যসমাজ তাহার বিলুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অধ্যাত্ম জগতেও যে প্রকার শীর্ষস্থানে উন্নীত হইয়াছিলেন, বাহ্যজগতেও রসায়ন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদি শাস্ত্রের এবং কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়ে জগতের মধ্যে বরেণ্য হইয়াছিলেন। কারণ, তাঁহাদের তাৎকালীন শিক্ষায়, জ্ঞানের পূর্ণতা সাধিত হইত। এবং তাঁহাদের মূলমন্ত্রই "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"। সুতরাং আমাদের শঙ্কিত হইবার কোনই কারণ নাই। আমরা যদি পুনরায় প্রাচীন আর্য্যপ্রণালীর ন্যায় শিক্ষা-দীক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারি, তাহা হইলে সহজেই আমরা বাহ্যজগতে অত্যুচ্চ শ্রেষ্ঠস্থানের অধিকারী হইব, এবং তৎসহ চিরশান্তিপ্রদ মোক্ষলাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইব।

আমাদের সমাজের উন্নতি ও অবনতি শিক্ষিত ব্যক্তিগণের হস্তে নিহিত; সুতরাং তাঁহাদের এ সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি একটু হৃদয়ের সহিত সমাজের মঙ্গলামঙ্গল আলোচনা করেন, সমাজের হিতকল্পে স্বার্থত্যাগ করতঃ দেশের উচ্চশিক্ষাবর্জিত জনসাধারণের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তবে শীঘ্রই তাহারা উচ্চশিক্ষা

প্রাপ্ত হইয়া সমাজের মুখোজ্জ্বল করিতে পারে; কেন না তাঁহারাই সাধারণ মতগঠনের ও সাধারণ সদনুষ্ঠানের প্রধান উপকরণ, বা এক হিসাবে নেতা হইবে। সুতরাং শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সর্ব্বপ্রথমে সদাচার সম্পন্ন হওয়া কর্ত্তব্য; কেননা তাঁহারাই আমাদের ভাবী আশাস্থল এবং লোকসমাজের স্পৃহনীয় আসনে উপবেশন করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতেছেন। তাঁহাদের কথায়, আচার ব্যবহারে, তাঁহাদের আচরিত রীতিনীতির উপর জনসাধারণের মঙ্গলামঙ্গল নিহিত। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই সাধারণকে স্বমতের বশবর্ত্তী করিতে পারিবেন, সুতরাং তাঁহাদের কর্ত্তব্য অতীব গুরুতর, তাঁহাদের সামান্য পদস্খলনে বা সামান্য উপেক্ষায় একটী উদীয়মান মহতী জাতির স্খলন বা পতন হইতে পারে। "যদযদাচরতি শ্রেষ্ঠ তত্তদেবেতরাজনাঃ" এই মহাবাক্য স্মরণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পাদক্ষেপ করিতে হইবে। তরঙ্গে কর্ণধারের অনেক সাবধানতা আবশ্যক; অন্যথা নিমজ্জনের আশঙ্কা বলবতী।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, বরপণ প্রথা নিবারণ না হইলে, উন্নতি দূরে থাকুক, সমাজ ক্রমশঃ হীনদশা প্রাপ্ত হইবে; অধিকন্তু সমাজের অভাবনীয় ব্যাভিচার অবশ্যম্ভাবী। ইহাদ্বারা সমাজের যে ভীষণ অবস্থা হইবে তাহা সমাজের নেতৃবৃন্দ একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? বর্ত্তমানে সমস্ত বৈদ্যসমাজের মধ্যে বিবাহবন্ধন প্রথা প্রচলন না হইলে এই সমাজের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। সমাজের নেতৃবৃন্দের নিকট আমার সবিনয় প্রার্থনা, বৈদ্যগণ যাহাতে সদাচারনিষ্ঠ হইয়া সমাজের উন্নতি সাধন করিতে পারেন, তজ্জন্য যত্নবান হউন।

সর্ব্বগুণালঙ্কৃত আমাদের ভারত সম্রাট আজ ন্যায়রক্ষার্থ মহাযুদ্ধে লিপ্ত, এই সভার পক্ষ হইতে ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে তাঁহার জয় কামনা করিতেছি, এবং আশা করি তিনি অবশ্যই জয়ী হইতে পারিবেন কারণ "যথাধর্ম্ম স্তথা জয়ঃ"।

জাতি ও বর্ণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন বি, এল।]

কেহ কাহাকে কোন্ বর্ণ জিজ্ঞাসা করিলে যদিও তিনি বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে তাঁহার যে জাতি তাহারই পরিচয় দেন বটে, তথাপি জাতি ও বর্ণ শব্দদ্বয় অদ্যাপিও ঠিক একার্থে ব্যবহৃত হয় না। অবশ্য পূর্ব্ববৎ পার্থক্য অনেক সময়ে রক্ষিত না হইলেও ইহা বলিতে পারা যায় না যে উহারা এখন একই ভাব ব্যক্ত করে।

শাস্ত্রে এই শব্দ দুইটীকে বিভিন্ন অর্থেই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়—যথা—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়ো বর্ণাদ্বিজোতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তিতু পঞ্চম॥ মনু ১০।৪

(আর্য্য সমাজে সকলেই চারিটী বর্ণের অন্তর্গত, তন্মধ্যে) যাঁহারা দ্বিজাতি তাঁহারা তিন বর্ণের হন; যেমন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এবং একজাতি (মাত্রেই) শূদ্র বা চতুর্থ বর্ণ হইয়া থাকেন। এই চারিটীর অধিক আর পঞ্চম বর্ণ হইতে পারে না।

দেখা যাইতেছে যে, প্রথমে মনুষ্য সমাজে দুইটী মাত্র জাতির আবির্ভাব হয় এবং চারিটী বর্ণ

থাকে। মনুষ্য সমাজে জাতীয় ভাবের ইহাই আদি সূচনা। এই জাতীয়তা শিক্ষা ব্যাপার লইয়াই আরম্ভ হয়। যাঁহারা শিক্ষিত হইতেন তাঁহারাই প্রকৃত আর্য্য স্বরূপে গণ্য হইতেন। আর যাঁহারা অশিক্ষিত থাকিতেন তাহারা দস্যু অনার্য্য হীন প্রভৃতি নিন্দিত নামে অভিহিত হইতেন। এইরূপে শিক্ষায় দিন দিন গৌরব বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

সনাতন আর্য্যসমাজে পুণ্যতম বেদই যাবতীয় জ্ঞান ও পুণ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধার বলিয়া আবহমানকাল হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। যাঁহারা বৈদিকী শিক্ষা লাভ করিতে পারিতেন না এবং বৈদিক আচার গ্রহণ ও পালনে অক্ষম হইতেন তাঁহারা কখনই শিক্ষিত বলিয়া সম্মানিত হইতে পারিতেন না। বেদের নাম শ্রুতি; ইহা গুরু মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া শিখিতে হইত; এবং বেদ শিক্ষার জন্য শিষ্যকে গুরুগৃহে বাস করিতে হইত। পুণ্যতম বেদ সম্মত আচারই সদাচার বা পুণ্য। এবং তদ্বিরুদ্ধ আচারই কদাচার বা পাপ রূপে অদ্যাপিও গণ্য হয়। সকল ব্যক্তিরই আদর্শ বেদের অধ্যয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। আচার্য্যগণ শিক্ষার্থিগণের দেহ যজ্ঞ দ্বারা শোধন না করিয়া তাহাদিগকে পুণ্যতম বেদে প্রবেশাধিকার দিতেন না ও শিষ্য স্বরূপে গ্রহণ করিতেন না। এই সংস্কারের নাম উপনয়ন। এতদ্দ্বারা উপনীত শিষ্য মদ্য মাংসাদি সর্ব্বপ্রকার অপবিত্র আচরণ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারীর ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক যাবৎ না কৃতবিদ্য হইতেন তাবৎ গুরুগৃহে বাস করিতেন। বিদ্যা সমাপ্ত হইলে শিষ্য সমাবর্ত্তন সংস্কার সম্পন্ন করিয়া আচার্য্যের আদেশ গ্রহণ করিয়া গার্হস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেন। মাতৃগর্ভ হইতে জন্মলাভ করিয়া যতদিন না—আর্য্য সন্তান উপনীত হইতেন ততদিন তাঁহার দেহ অপবিত্র বিবেচিত হইত। সেই হেতু তাহার নাম হীন অনার্য্য শোধন যোগ্য বা শূদ্র। উপনীত হইলেই দেহ শুদ্ধ হইয়া অনার্য্যত্ব হীনত্ব বা শূদ্রত্ব মুক্ত হইয়াই শিষ্য দ্বিতীয় পুণ্যজন্ম লাভ পূর্ব্বক সূত্র মেখলা ধারণ করিতেন ও প্রকৃত আর্য্য হইতেন।

ক্রমশঃ

বৈদ্যবিধবার পরিণাম।

গত ২৯ শে আশ্বিন রবিবার ৺কালীঘাটে যে একটী ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে, দেশের বৈদ্য-সাধারণের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

ঐ দিন আমরা পরিবারস্থ মেয়েছেলে লইয়া ৺কালী দর্শনে গিয়াছিলাম। বেলা সাড়ে এগারটার সময় আমরা সেখানে পৌঁছিয়া একটী বাসা লই। গঙ্গাস্নানান্তে ৺মায়ের মূর্ত্তি দর্শনান্তর প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বাটীতে আসিবার বন্দোবস্ত করিতেছি, এমন সময় একদল ভিকারিণী আমাদের বাসায় আসিয়া তাহাদের মামুলী ভাষায় বলিতে আরম্ভ করিল,—'রাজা বাবা! লক্ষ্মীমা! তোমাদের ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হউক, আমায় একটী পয়সা খেতে দাও মা-বাপ।" যাহারা কালীঘাট যাইয়া থাকেন, তাঁহারা এইসকল ভিকারিণীদের অবস্থা, কার্য্যকলাপ এবং দৌরাত্ম্যের কথা অনেকটা অবগত আছেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই এইরূপ ভিক্ষা একটা ব্যবসা। ইহাদের রীতিমত সংসার পাতা আছে, স্বামী পুত্রকন্যা প্রভৃতি বর্ত্তমান। তবে এই ব্যবসা অবলম্বন করিয়া যা কিছু পায় তাহাই লাভ। এসকল জানিয়া শুনিয়া অনেকে এইসকল ভিকারিণী দিগকে ভিক্ষা দেয় না; কিন্তু ইহাতে যে অনেক সময় প্রকৃত ভিক্ষোপজীবী বঞ্চিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এইসকল ভিকারিণীরা সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর লোক; মধ্যে মধ্যে উচ্চশ্রেণীরও দুইএকটী দেখিতে না পাওয়া যায় এরূপ নহে

আমরা ভিকারিণী দিগকে কিছু না দিয়া তাড়াইয়া দিলাম। সকলে চলিয়া গেল, কিন্তু একটী অর্দ্ধাবগুণ্ঠনাবৃতা বিধবা ঘরের দ্বারের এক-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে দেখিয়া মনে হইল, এটী নীচবংশীয়া নহে। কপালে একটী চন্দনের ফোটা দেখিয়া বোধ হইল, ব্রাহ্মণ অথবা বৈদ্যকুলোদ্ভবা। আমি তাহাকে দ্বারে তদবস্থ দেখিয়া বলিলাম,—"এখানে কিছু হইবে না অন্যত্র চেষ্টা কর।"

আমার কথা শুনিয়া বিধবাটীর চক্ষু বহিয়া দর দর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। আমি তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার বাড়ী কোথায়? বিধবা ঘোমটাটী আর একটু টানিয়া মুখখানি ফিরাইয়া বলিল,—'আপনার বাড়ী কোথায়, সে কথা না জানিলে, আমি আপনার কথার উত্তর দিতে পারিব না।'

আমি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলাম,—'ভিক্ষা করিতে আসিয়াছ, তাতে এত খোঁজ খবরের দরকার কি?' আমার উত্তর শুনিয়া তাহার মনো-কষ্ট যেন আরও বৃদ্ধি পাইল। বিধবা বলিল,—আমার অদৃষ্ট বড়ই মন্দ। খুলনা জেলার অন্তর্গত * * * গ্রামে আমার পিত্রালয়, ঢাকার জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত * * * গ্রামে আমার শ্বশুরালয়; আমার স্বামীর কনিষ্ঠ দুইটী সহোদর আছে। ২১ বৎসর বয়সের সময় আমি একবৎসরের একটী পুত্র লইয়া বিধবা হই। আমার স্বামী পুলীশ ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন; তিনি যাহা কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই দেবরদিগের হস্তগত হয়। গহনা এবং নগদে সামান্য যাহা আমার নিকট ছিল, তাহা দ্বারা আমি পুত্রটীকে মানুষ করিয়াছিলাম। ছেলেটী বি, এ পাশ করিয়াছিল, হঠাৎ জ্বর হইয়া দুই বৎসর হইল মারা গিয়াছে। দেবর দুইজনের মধ্যে পরস্পর মিল নাই। ভাইটী আমার দুঃখে ক্ষমতা তাহার নাই, সামান্য আয় দ্বারা নিজের পরিবার লইয়া দিন গুজরান করাই তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য। আমি এই দুই বৎসর কাল তাহারই আশ্রয়ে ছিলাম; কিন্তু যখন দেখিলাম, আমার দৈনিক এক পোয়া চাউল যোগাড় করাও তাহার পক্ষে কষ্টকর, তখন আমাকে ৺কাশীধামে পাঠাইয়া দিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিলাম। ৺কাশীধামে অন্নপূর্ণার স্থানে কেহ উপবাসী থাকে না শুনিয়াছি; এই জন্যই আমার কাশী যাইবার বাসনা।

কাশীধামে যাইতে যে খরচের আবশ্যক, তাহা সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে কষ্টকর হইল। অনেক চেষ্টা করিয়াও সে তাহা যোগাড় করিতে পারিল না। তখন আমাদের প্রতিবেশী একটী সাহাজাতীয় মহাজনের আশ্রয় লইয়া আমি গত শ্রাবণ মাসে কলিকাতা আসিয়া কালীঘাটে এক ব্রাহ্মণ বাটীতে আশ্রয় লইয়াছি, ভিক্ষা করিয়া ৺কাশীধামে যাইবার বাসনা করিয়াছি। কিন্তু ভিক্ষা করিতে জানি না, সুতরাং এমন অনেকদিন যায় যে, ভিক্ষালব্ধ পয়সায় আমার উপবাস নিবৃত্তি হয় না। আপনি বৃদ্ধ, এবং এই বাসার ঝি বলিল, আপনি বৈদ্য; তাই বড় আশা করিয়া আপনার আশ্রয় লইয়াছি, আপনি দয়া করিয়া আমার ৺কাশীধামে যাইবার একটা ব্যবস্থা করিয়া দিন, আমি ৺অন্নপূর্ণার দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া জীবন ও জাতি রক্ষা করিব। আর একটী কথা, আমি বৈদ্য-বিধবা, কালীঘাটে ছত্রিশ জাতির সহিত ভিক্ষা করিয়া বেড়াইলে, আপনাদের বৈদ্য-জাতির মস্তক অবনত হইবে। আমি অপরিচিতা হইলেও, কোন না কোন সময়ে হয় ত আমার পরিচিত লোকের নিকটও কালীঘাটের ভিখারিণীর বেশে আমাকে হাত পাতিতে হইবে, তাহাতে বৈদ্যজাতির সম্মান বাড়িবে না। আমি আপনাদের জাতীয় সম্মান রক্ষা করিবার জন্যই অনুরোধ করিতেছি,—আমাকে চক্ষের অন্তরাল করিয়া

তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, আমার জাতি ও প্রাণ এবং আপনাদের জাতির মুখ রক্ষা পায়।"

বিধবার কথা শুনিয়া শরীর শিহরিয়া উঠিল, কিছুকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলাম, তাঁহাকে কি বলিব স্থির করিতে পারিলাম না। কিন্তু ইহাঁর যে একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহাতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। বিধবা যে বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া সেখানে যাইয়া দেখি, বাড়ী-ওয়ালা আমারই পূর্ব্বপরিচিত একজন ব্রাহ্মণ, নাম শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার নিকট বিধবাঁর যতটুকু পরিচয় জানিতে পারিলাম, তাহাতে তাঁহার উক্তির এক বর্ণও মিথ্যা বলিয়া অনুভূত হইল না। আমি বিধবাকে একটী সিকি দিয়া, তৎপর দিবস যাইব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া আসিলাম, এবং ভিক্ষার্থ আর কখনও রাস্তায় বাহির না হন, এরূপ অনুরোধ করিয়া আসিলাম।

বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিয়া, বিদ্বৎসভার সম্পাদক মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিপদ শাস্ত্রী এম্. এ, মহোদয়কে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলাম। তিনি সভা হইতে ২৲ টাকা সাহায্য করিবার অনুমতি দিলেন, এতদ্ভিন্ন তিনটী সভ্যের নিকট হইতে তিনটী টাকা, মোট ৫৲ টাকা লইয়া পরদিন কালীঘাটে গমন পূর্ব্বক বিধবার কাশী যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। ৺কাশীধামের প্রণবাশ্রমের শ্রীযুক্ত প্রণবানন্দ স্বামী আমাদের বিশেষ পরিচিত। সেখানে আশ্রয় দিবার জন্য স্বামীজীকে চিঠি দেওয়া হইয়াছে।

উল্লিখিত ঘটনার ন্যায় আরও কতশত শোচনীয় ঘটনা ঘটিতেছে, বৈদ্যসন্তানদিগের মধ্যে অনেকেই তাহার সংবাদ রাখিবার সুবিধা পান না। আমরা প্রতিদিন অনাথা বিধবা এবং দুঃস্থ ছাত্রবর্গের নিকট হইতে যেসকল চিঠি প্রাপ্ত হইতেছি, তাহা পাঠ করিলে, অনেকস্থলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। নিখিল বঙ্গের বৈদ্যসন্তানগণ যদি এদিকে একটু দৃষ্টিপাত না করেন, তাহা হইলে এই দুর্দ্দিনে এই সকল অনাথাদিগের পরিণাম এতদূর শোচনীয় হইয়া পড়িবে যে, বৈদ্যজাতির মুখ দেখান অসম্ভব হইয়া পড়িবে। বিদ্বৎসভা এপর্য্যন্ত ১১টী বিধবা এবং ১০টী স্কুলের ছাত্রকে যৎসামান্য সাহায্য করিতেছেন, ইহা প্রচুর নহে। আশা করি নিখিল বঙ্গের বৈদ্যসন্তানগণ অতীত জাতীয়গৌরব স্মরণ করিয়া, পূর্ব্বপুরুষদিগের বদান্যতার কাহিনী মনে করিয়া স্বজাতির সাহায্যে দৈনিক 'দুইটী ও একটী' পয়সা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইবেন কি?

টীকা-টিপ্পনী।

'ধন্বন্তরি' দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। এই এক বৎসরে ইহার প্রতি বৈদ্যসাধারণের সহানুভূতি যেরূপ অনুভূত হইয়াছে, তাহাতে ধারণা হইয়াছে যে, বৈদ্যসন্তানেরা অতীত জাতীয় গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠায় সমধিক আগ্রহান্বিত।

যেসকল কারণে বৈদ্যজাতির এতদূর অধঃপতন হইয়াছে, এবং কি উপায়ে তাহার পুনরুদ্ধার হইতে পারে, গত বৎসরে 'ধন্বন্তরি' পত্রে তাহার যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। নিতান্তই সুখের বিষয় বলিতে হইবে যে, এই আন্দোলন আলোচনার অনেকটা সুফল ফলিতেছে, দুরদেশবাসী বৈদ্য-সন্তানগণও বিদ্বৎসভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতেছেন।

আচারভ্রষ্ট হইয়া যেসকল বৈদ্যসন্তান একদিন শূদ্রাচারে নিরত ছিলেন, তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হইয়াছে। তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তান্তর যথারীতি উপনীত হইতেছেন। অবস্থা দেখিয়া অনুমান হয়, আগামী বৎসরে আর কদাচারী বৈদ্যসন্তান প্রত্যক্ষীভূত হইবে না। অনুপনীত অবস্থায় যে

ধর্ম্মকর্ম্ম পণ্ড হইতেছে, অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধও এখন তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন।

গত ৬ই কার্ত্তিক বরিশাল জেলার অন্তর্গত গৈলা গ্রামে 'বিদ্বৎসভার' এক বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন সেন বি, এল্ মহোদয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। স্থানান্তরে সভার কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইল। এই কার্য্যবিবরণী দেখিলেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, বৈদ্যসন্তানগণ স্বীয় জাতীয়-গৌরব রক্ষার জন্য কিরূপ আগ্রহান্বিত হইয়াছেন।

বিদ্বৎসভার অনুষ্ঠিত এবং প্রস্তাবিত কার্য্যা-বলীর মধ্যে যে কয়টী কার্য্যে আপাততঃ হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে, তাহা এ পর্য্যন্ত আশানুরূপ সুসিদ্ধ হইতে পারিতেছে না। নিতান্ত অনাথা বিধবা এবং দুস্থ ছাত্রদিগকে কিয়ৎপরিমাণে সাহায্য করা সভার অন্যতম অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে আপাততঃ যে কয়টীকে সামান্যরূপ সাহায্য করা যাইতেছে, তাহা যথেষ্ট নহে। সাহায্যপ্রার্থীর আবেদনের সংখ্যার তুলনায়, তাহা উল্লেখযোগ্যই নহে। অর্থের অসচ্ছলতাই ইহার একমাত্র কারণ। সভ্যগণ যদি যথাসময়ে তাঁহাদের দেয় ভিক্ষাটী নিতান্তই আবশ্যকীয় মনে করিয়া প্রদান করেন, তাহা হইলে অনেকটা কায হয়।

সভার চাঁদা বা ভিক্ষা প্রদান সম্বন্ধে মফঃস্বল-বাসী যতটা তৎপর, স্থানীয় সভ্যগণের মধ্যে সকলে ততদূর নহেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষা-দীক্ষায় গর্ব্ব করিবার অধিকারী, সমাজ যাঁহাদের নিকট অনেকটা আশা করে, তাঁহারা মনে-মুখে এক হইয়া কার্য্য করিলে, সভার অনুষ্ঠিত কার্য্যা-বলী অনেকটা অগ্রসর হইতে পারিত। তাঁহারা মনে-মুখে এক হন না কেন, সে কথাটা খুলিয়া বলিতে গেলে অনর্থক জনকতক লোকের বিষনেত্রে পড়িতে হয়, অথচ তাহাতে কোন ফল নাই বলিয়া, বিরত রহিলাম। জানি না, বাধ্য হইয়া ঘরের কথা প্রকাশ করিতে হইবে কি না।

আজকাল জাতীয় উন্নতির দিকে সকল জাতির প্রখর দৃষ্টি পড়িয়াছে। প্রত্যেক জাতিই জাতীয় উন্নতির জন্য সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া অনেক শুভানুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা অনেকটা সাফল্য লাভ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে সুবর্ণ-বণিকগণ সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী। ইহাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াও যদি বৈদ্যজাতি জাতীয় অনুষ্ঠানে তৎপর না হন, তাহা হইলে এই লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিবে না। বৈদ্যজাতি শিক্ষা-দীক্ষায় যাবতীয় জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে খর্ব্ব হইলে যে তাহাদের সেই গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া যাইবে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত নয় কি?

জাতীয় সংবাদ।

নিতান্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান্, ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান মিঃ বিহারীলাল গুপ্ত পরলোক গমন করিয়াছেন।

মফঃস্বল হইতে যেসকল অনাথা বিধবা ও দুস্থ ছাত্র সাহায্যার্থ বিদ্বৎসভায় আবেদনপত্র প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহারা স্থানীয় অন্ততঃ দুইজন সভ্যের স্বাক্ষর করাইয়া পাঠাইবেন।

যেসকল অন্তঃপুরবাসিনী মহিলা শিল্পকার্য্যে সুনিপুণা, তাঁহাদের শ্রমজাত দ্রব্য দ্বারা যাহাতে তাঁহাদের আয় হইতে পারে, বিদ্বৎসভা তাহার চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং করিবেন। মফঃস্বলের বৈদ্যসন্তানগণ এরূপ মহিলাদিগের ঠিকানাসহ ইহাদের শ্রমজাত শিল্পদ্রব্যের নমুনা পাঠাইলে সভা তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

ধন্বন্তরি

মাসিক পত্র

২য় বর্ষ, } অগ্রহায়ণ ১৩২৩, ইং ১৯১৬ নবেম্বর, ডিসেম্বর { ২য় সংখ্যা

স্মরণে।

[শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় ব্যাকরণতীর্থ।]

ভেসে আসে তোমারি স্মরণ
লয়ে কত স্মৃতি সম্ভারে।
থাকি থাকি মরম মাঝারে
গভীর বেদনা ঝঙ্কারে॥
তব সনে মধুর মিলনে
ভেসেছি সুখের উচ্ছ্বাসে।
ধীরে ধীরে জাগে মনে, দু'খ
নিবারি নিবিড় নিশ্বাসে॥
বারে বারে বিজলী বিভায়
ভাতিছ নিভৃত অন্তরে।
থরে থরে দানিছ যেন গো
অমিয়, মরুর প্রান্তরে॥

অনুভবে অনুমানে বুঝি
বিরাজ হৃদয় মন্দিরে।
দু'খ মাঝে সুখ লভি তাই
হেরি' তোমা হেন সুন্দরে॥
কেন মোরে ত্যজিলে, ঘুরালে
কুটিল কুপথ কান্তারে।
ত্যজ তব কঠোর কামনা
লও তব পথে পান্থেরে॥
অভিলাষ সফল হবে না
আমা'তে যুগ যুগান্তরে।
এস, লহ, মিলিয়া যাইব
তোমাতে আমাতে মন্থরে॥

হিন্দুসমাজের নায়ক।

[অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম্ এ]

বর্ত্তমান যুগে হিন্দুসমাজ যেভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে নায়ক নাই বলিয়া যদি কেহ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাহার প্রতিবাদ করা চলে না। নায়ক না থাকিবার কারণও যথেষ্ট আছে; তন্মধ্যে প্রকৃত নায়কের উপযোগী লোকের অভাবটাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এত বড় একটা সমাজের পরিচালক হইতে হইলে যেসকল গুণ-গরিমা সমন্বিত হওয়া উচিত, তেমন

লোক এই বিরাট সমাজে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। পরিচালক হইতে হইলে যেরূপ যোগ্যতা থাকা দরকার, তদনুরূপ যোগ্যতা কয়জনের আছে? খুঁজিলে একটী লোকও পাওয়া যাইতে পারে না। সমাজের অবস্থা যখন এরূপ, তখন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতই হউক, আর অপর কেহই হউক, সমাজের কর্ণধার হইবার যোগ্য লোক এখন নিতান্তই দুর্লভ।

গত ২৯শে কার্ত্তিকের 'নায়ক' পত্রে 'ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন,—

ইন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতই বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজের আদর্শ পুরুষ। প্রথমতঃ একা তাঁহারাই হিন্দুত্বের বিষ্ণুপঞ্জরটুকু স্বেচ্ছায় ও সযত্নেই হউক, অথবা ব্যবসায়ের খাতিরেই হউক, রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের হাতেই বেদ-পুরাণ, তন্ত্র-মন্ত্র, তাঁহারাই গুরুপুরোহিত, তাঁহাদের ব্যবস্থামত হিন্দুসমাজ এখনও অনেকটা শাসিত। তাঁহারাই আমাদের পুরাতন সভ্যতার শেষ নিদর্শন। তাঁহারা আমাদের আমরা তাঁহাদের। দ্বিতীয় কথা, তাঁহারা যেরূপ সাজ-পোষাকে, পান-ভোজনে, জীবন অতিবাহন করিয়া থাকেন তাহা আমাদের মত দুর্ব্বল পরাধীন জাতির পক্ষে খুব উপযোগী। আমাদের যেমন উপার্জ্জন সামর্থ্য কমিয়াছে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সাজ-পোষাক তেমনি তাহার উপযোগী হইয়াছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সাজিলে খুব অল্প আয়ে সুখে ও শান্তিতে দিন যাপন করা চলে।"

শুধু 'ইন্দ্রনাথ' শুনিয়া হয় ত পাঠকগণ চিনিতে না-ও পারেন; কারণ ইনি স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মাসতুতো ভাই নহেন। ইনি 'বঙ্গবাসী'র "পঞ্চানন্দ" রূপী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণ-প্রসন্ন সেনের হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় যখন'বঙ্গবাসী'র কলেবর পূর্ণ হইত,—সেসকল বক্তৃতা পাঠ করিয়া বঙ্গবাসীর হৃদয়ে যখন লুপ্তপ্রায় হিন্দুধর্ম্ম ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার অব্যবহিত পরেই ইন্দ্রনাথ "পঞ্চানন্দ"রূপে 'বঙ্গবাসীর স্কন্ধে আরোহণ করেন। আমরা জানি, নায়ক-সম্পাদক মহাশয় ইন্দ্রনাথকে গুরু বলিয়া মানিতেন, এখনও তাঁহার প্রতি তদনুরূপ শ্রদ্ধাভক্তি আছে বলিয়া প্রকাশ করেন। তাই নায়কের প্রবন্ধে দেখিতে পাইলাম,—

"ইন্দ্রনাথের এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া বঙ্গবাসীর তখনকার লেখক ও পরিচালকগণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে অগ্রণী করিয়া সকল কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার ফলে সমাজে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের আদর ও সম্মান বাড়িতে লাগিল। আদর ও সম্মান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের অনেক আয়ও বাড়িয়া গেল। কিন্তু ব্রাহ্মণপণ্ডিত সমাজ ইন্দ্রনাথের চালটা বুঝিতে পারেন নাই। সমাজের প্রতি তাঁহাদের যে একটা বড় কর্ত্তব্য আছে, সে কর্ত্তব্য প্রতিপালন যে কতকটা সংযম-সাধ্য তাহাও তাঁহারা বুঝিলেন না। ফলে, তাঁহাদের লোভে, শৈথিল্যে ও ব্যবহার দোষে সমাজের একটা বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকে শিক্ষিত সমাজের হেয় হইয়া আছেন।"

'ইন্দ্রনাথের এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া বঙ্গবাসীর পরিচালকগণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পক্ষ সমর্থন করিতে' ছিলেন কি না সে কথা বলিতে পারি কই? যদি সত্য সত্য তাহাই ঘটিত, তাহা হইলে আমরা অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে পোষাক-পরিচ্ছদের সরলতা প্রদর্শন জন্য পরিধানে সামান্য মারকিন অথবা মাঠাপালামের ধুতি, অঙ্গাবরণে নামাবলী এবং চরণে তালতলার চটী ব্যবহার করিতে দেখিতাম। অধিকন্তু নায়কের প্রবন্ধ-লেখক যাঁহাকে মাতব্বরী তক্ত দিয়াছেন তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদে, পান-ভোজনেও ত কখনও তেমনতর কিছু দেখা যায় নাই! আমরা জানি না,—দেশের দশেও একথা স্বীকার করিবে না যে, ইন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া সমগ্র বঙ্গের হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইয়াছিল। 'তাঁহার 'সিদ্ধান্ত অনুসরণ'করিয়া বঙ্গবাসীর তখনকার লেখক ও পরিচালকগণ হিন্দুয়ানীর চাল চালিতেন, একথা

মিথ্যা নহে ; কারণ এক সময়ে ইন্দ্রনাথ বঙ্গবাসীর শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু ছিলেন, ইন্দ্রনাথ উকীল ছিলেন, তিনি হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যে চাল চালিতেন,—নায়কের প্রবন্ধলেখক সত্য সত্যই বহিয়াছেন, 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ ইন্দ্রনাথের সে চালটা বুঝিতে পারেন নাই! অনেকের বিশ্বাস, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা তাঁহার চালটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথ কৈশোরে ও যৌবনে যেরূপ হিন্দুত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, বঙ্গবাসীর লেখক ও পরিচালকবর্গের গুরুত্ব গ্রহণে তাহা জনসাধারণ ভুলিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বঙ্গবাসীর সহিত সম্বন্ধবিচ্যুত হইয়া 'বঙ্গবাসী'র সর্ব্বস্ব শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সিংহ রায় যখন গত ১২৯৪সালে 'অপূর্ব্ব পঞ্চায়ৎ' নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন, তখন উপেন্দ্র বাবু নিজে একটী কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার একস্থানে ছিল,—

কথন ক্রুশেতে আটা * * *
* * * * * *
মাথায় শামলা আটা, ললাটেতে দীর্ঘ ফোঁটা
সম্পাদক রাজ সেজে আসে আর যায়।
বিধির কি বুদ্ধি মোটা, পদ্মের মৃণালে কাঁটা
জানি না যে চোর সেটা সি দকেটে খায়॥"
(অপূর্ব্ব পঞ্চায়ৎ, ১২ ভাদ্র, ১২৯৪)।

যাহাই হউক, এই প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া বেশী কিছু বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে ; কিন্তু হিন্দুয়ানীর ধুয়া ধরিয়া প্রবন্ধলেখক বৈদ্যজাতির প্রতি যে কটাক্ষ করিয়াছেন, কর্ত্তব্যবোধে তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা একান্ত প্রয়োজন। প্রবন্ধলেখক লিখিয়াছেন,—

"বৈদ্য ব্রাহ্মণ সাজিতেছে, নমঃশূদ্র যে ব্রাহ্মণ হইতেছে, ইহা ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবস্থা অনুযায়ী।"

যাহার ধমনীতে প্রকৃত ব্রাহ্মণ-শোণিত প্রবাহিত হয়, বৈদ্যসম্বন্ধে এরূপ উক্তি তাঁহার পক্ষে সম্ভবেনা। আজ কাল দেখিতেছি, 'নায়ক' পত্রে 'বামনাই' লইয়া একটু বেশী পরিমাণে ঘোটাঘুটী আরম্ভ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যজাতির প্রতি কটাক্ষপাতেও কৃপণতা হইতেছে না। গত ৭ই অগ্রহায়ণের "নায়ক" পত্রে লিখিত হইয়াছে,—

কায়স্থ হইতে আরম্ভ করিয়া মাল মাল, পলিয়ায় পর্য্যন্ত সবাই ক্ষত্রিয় সাজিয়া পৈতা লইতেছে। পক্ষান্তরে বৈদ্য, যোগী, নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতির সকলেও ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়া পৈতা লইবার আয়োজন করিতেছে। এইবার বাজরেড়াও দলে মিশিল ; তাহারাও ব্রাহ্মণ হইতে চাহে। ইহাতে দোষের ত কিছুই দেখি না। যেমন এক দিকে যে-সে ক্ষত্রিয় হইতেছে, তেমনই আর এক দিকে যে-সে ব্রাহ্মণ হইতেছে।'

"বৈদ্য ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়া পৈতা লইবার আয়োজন করিতেছে" নায়ক-সম্পাদক এরূপ কথা বলিতে লজ্জা বোধ করেন নাই, ইহা দেখিয়া আমরা লজ্জিত হইয়াছি। নায়ক-সম্পাদক হালিসহরবাসী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই হালিসহরে বৈদ্যের সংখ্যা কম নহে। অন্য স্থানের বৈদ্য সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা না থাকিলেও যে গ্রামে তাঁহার জন্মস্থান, সে গ্রামের সমাচার অবশ্যই তাঁহার জানা আছে। হালিসহরে বৈদ্যগণ যে যথাযোগ্য বয়সে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া থাকেন, নায়কসম্পাদক অবশ্যই তাহা অবগত আছেন। অতএব তাঁহার এরূপ উক্তি সুধু সত্যের অপলাপ নহে, ঘোরতর অর্ব্বাচীনতা।

আমাদের ধারণা ছিল, জনসাধারণ নায়ক সম্বন্ধে যেরূপ মতামতই প্রকাশ করুক না কেন, সম্পাদক মহাশয়ের শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে কতকটা অভিজ্ঞতা আছে। অন্ততঃ তিনি মুখে দশজনের নিকট যেরূপ ভাব প্রকাশ করেন, তাহাতে লোকে তেমনটী বুঝিবারই সুবিধা পায়। কিন্তু এই সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা দেখিয়া ধারণা হইল, লোকের সে ধারণা অমূলক। যাহা হউক, বৈদ্যজাতি সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের যে চিরপোষিত ঈর্ষ্যা বিদ্যমান, নায়ক সম্পাদকের অবগতির জন্য নিম্নে

তাহার অকাট্য প্রমাণ প্রকটিত হইল। এই প্রমাণের প্রতিকূলে নায়ক সম্পাদকের কিছু বলিবার সাহস আছে বলিয়া বোধ হয় না।

মুসলমান রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজা গণেশ যখন বঙ্গ-সিংহাসন কিছুকালের জন্য পুনঃ অধিকার করেন, তখন রাজা গণেশের বলে স্মার্ত্ত-ব্যবস্থা পাকাপাকি করিয়া লইবার জন্য বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নিকট নিম্নলিখিত আবেদন করেন ;—

"ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদবেদাঙ্গাদিধর্ম্মশাস্ত্রানধীততয়া যজনাদিষট্‌কর্ম্মসু নৈষাং অধিকারাস্তিষ্ঠন্তি। চতুর্ব্বেদোক্তক্রিয়াযু পুণ্যতমা চিকিৎসা এতেষাং বৃত্তিঃ য ষট্‌কর্ম্ম ; যদুক্তং 'অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতমিতি' যচ্চ বিহিতানাং ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রজাতীনাং কন্যায়াং জাতঃ পুত্রঃ পিতৃবৎ জনন-মরণাশৌচমাচরেযুঃ, যথাচোক্তং ক্ষত্রবীট্‌শূদ্রজাতীনাং যে স্বে স্বে মৃত-সূতকে। তেষান্ত পৈত্রিকং শৌচং বিতস্তানাস্তি মাতৃকমিতি॥ তদপি অধুনান্ সমীচীনং। যতঃ এতে পিতৃসংসর্গত্যাগিনঃ আচারভ্রষ্টাশ্চাভবন্ মাতৃকুলাশৌচভাগিনঃ ষট্‌কর্ম্ম সন্ত্যজ্য চিকিৎসাত্যৈব জীবিষ্যন্তি, তথা পোষ্যবর্গপরিপোষণায় অথ বৈশ্যবৃত্তিং করিষ্যন্তি।" ইত্যাবেদনপত্রম্।

রাজা গণেশের আজ্ঞাপত্র যথা,—

"সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু বৈশ্যাস্তপোজ্ঞানযুক্তাঃ বিদ্বাংসশ্চ আসন্। সম্প্রতি এতে শক্তিহীনাঃ আচারভ্রষ্টাশ্চাভবন্। অতঃ শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ-গণেশচন্দ্র নৃপতেরস্মুজ্জয়া বিপ্রাণামস্মুরোধাৎ অদ্য প্রভৃতি অম্বষ্ঠা বৈশ্যাচারিণো ভবিষ্যন্তি, মূলাঃ ব্রাহ্মণা অম্বষ্ঠৈঃ সহ ভোজনাদিকং নাচরেয়ুঃ। যে চ ব্রাহ্মণা অমীভিঃ সহ ভোজনাদি করিষ্যন্তি, তে পতিতা ভবিষ্যন্তি ইতি।"

কোলবুক ক্রচাল অব্ বেঙ্গল।

নায়ক-সম্পাদক যে সত্যাসত্য নির্ণয় না করিয়া প্রত্যেক বিষয়ে যা-তা একটা বলিতে আদৌ লজ্জা বোধ করেন না, ইহা যে তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম একথা কাহারও অবিদিত নাই। এজন্যই যে তাঁহার মতামতের উপর কেহ আস্থা স্থাপন করেন না, ইহা তিনিও সম্যক্ অবগত আছেন। ব্রাহ্মণ-সভা এবং হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে আজকাল তিনি যেসকল মতামত প্রকাশ করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে বলিবার অনেক কথা থাকিলেও, 'নায়কের কথা' বলিয়া অনেকে তাহা অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। এই বৃদ্ধবয়সে তাঁহার একটু বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলেই যেন ভাল হয় বলিয়া মনে হয়।

জাতি ও বর্ণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন, বি, এল্।]

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতি চোদনা॥
তত্র যদ্‌ব্রহ্মজন্মাস্য মৌঞ্জিবন্ধনচিহ্নিতম্॥
তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাচার্য্য উচ্যতে॥
বেদ প্রমাণাদাচার্য্যং পিতরং পরিচক্ষতে।
নহ্যস্মিন্ যুজ্যতে কর্ম্ম কিঞ্চিদামৌঞ্জিবন্ধনাৎ॥
নাভিব্যাহারয়েদ্‌ব্রহ্ম স্বধানি নয়নাদৃতে।
শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ্ যাবদ্ বেদে ন জায়তে॥
কৃতোপনয়নস্যাস্য ব্রতাদেশনমিষ্যতে।
ব্রহ্মণ গ্রহণঞ্চৈব ক্রমেণ বিধি-পূর্ব্বকম্॥

মনু ২।১৬৯-১৭৩

শ্রুতিতে আছে যে দ্বিজগণ মাতৃগর্ভ হইতে প্রথম জন্মলাভ করেন, মৌঞ্জি বন্ধনাদি পূর্ব্বক সংস্কার দ্বারা দ্বিতীয় জন্ম, এবং যজ্ঞদীক্ষা দ্বারা তৃতীয় জন্ম লাভ করেন। এই তিন জন্মের মধ্যে মৌঞ্জিবন্ধন চিহ্নযুক্ত উপনয়ন সংস্কার দ্বারা যে দ্বিতীয় ব্রহ্মজন্ম হয় তাহাতে (গর্ভধারিণী স্থলে) গায়ত্রী মাতা ও (জনকের স্থলে) আচার্য্য পিতা হন। উপনয়নের পূর্ব্বে তপস্যাদি কোন শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মের অধিকার হয় না। বেদ প্রদান করেন বলিয়াই আচার্য্যকে পিতা বলে। উপনয়নের পূর্ব্বে শ্রাদ্ধীয় মন্ত্র ভিন্ন অপর কোন বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে নাই। যাবৎ উপনয়ন সংস্কার না হয় তাবৎ দ্বিজগণ শূদ্রের সমান থাকেন। কৃতোপনয়ন হইলেই তবে দ্বিজ মদ্য মাংসাদি নিষিদ্ধ আহারাদি বর্জ্জন পূর্ব্বক (পবিত্র ব্রহ্মচারী) ব্রত ধারণ ও বেদ গ্রহণের আদেশ প্রাপ্ত হন।

আদিতে যখন সকল লোকেই অশিক্ষিত অসমাজবদ্ধ অবস্থায় থাকিত, তখন আর্য্য, অনার্য্য দ্বিজ শূদ্রাদি ভেদ ছিল না সকলেই একজাতি ছিল। আমরা পরে দেখিব সেই জাতির নাম ব্রহ্মজাতি। শিক্ষা ও বেদের বিস্তারের সহিত আর্য্য অনার্য্য দ্বিজ শূদ্রাদি নাম দেখা দিল। পরে সমাজবদ্ধ হইলে ক্রমশঃ যাঁহারা শিক্ষিত হইলেন, সমাজে তাঁহারা প্রকৃত আর্য্য, দ্বিজ প্রভৃতি সম্মান সূচক আখ্যায় বিভূষিত হইতে লাগিলেন। আর অশিক্ষিতগণ অসংস্কৃত, হীন, শূদ্র, অনার্য্য প্রভৃতি অসম্মানসূচক বিশেষণে লাঞ্ছিত হইত। পূর্ব্বে অসভ্য এবং অশিক্ষিত অবস্থায় জীবিকোপায় ও বহু ছিল না। তখন পশুর ন্যায় মৃগ মাংসাদি দ্বারায় সকলেই উদর পূরণ করিতেন, অতএব তখন বর্ণও একাধিক ছিল না। ক্রমশঃ শিক্ষার সহিত যত জ্ঞানের বিস্তার হইতে লাগিল, ততই বুদ্ধি পরিচালিত জীবনোপায় ও বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল, এবং নিজ নিজ বৃত্ত্যনুযায়ী একাধিক বর্ণের ও আবির্ভাব হইতে লাগিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ই চিরকাল অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে পরাস্ত করিয়া বুদ্ধিজীবী হইয়া থাকে, এবং অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে হীনবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য করে ইহাই স্বভাবের অপরিহার্য্য নিয়ম। জগৎ এই নিয়মেই উদ্বর্ত্তন ও বৰ্দ্ধনশীল হইয়া থাকে। আর্য্যসমাজও যে এই অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াছিল তাহাতে কোন সংশয় নাই। কালে শিক্ষার উপকারিতা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্যকপ্রকারে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয়ঙ্গম হইলে যখন তাঁহাদের সংখ্যা অত্যল্প রহিল না, যখন তাঁহারা দেখিলেন আত্মোন্নতির জন্য অশিক্ষিতের সহিত আদান প্রদান বিবাহাদি নিন্দনীয় করিতে পারেন, যখন বৈদিকী শিক্ষার অভাব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সন্তান সন্ততি মধ্যে অত্যন্ত অযশঃকর বিবেচিত হইত, তখন তাঁহারা স্বকীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাও বংশগত করিলেন, স্বেচ্ছাধীন রাখিলেন না; তখন হইতে সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পুত্রসন্তানগণকে বাধ্য হইয়া উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ পূর্ব্বক গুরু গৃহে বেদাভ্যাস করিতে হইত। তখন হইতেই ব্রাহ্মণগণ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুইটী জাতিতে পরিণত হইল; একটির নাম পবিত্র আচার ও জ্ঞান সম্পন্ন দেব, দ্বিজ, বা আর্য্য জাতি। অপরটীর নাম হইল হীন, অদেব, অদ্বিজ (অসংস্কৃত) অর্থাৎ অশূদ্র,অনার্য্য, বা একজাতি। যাঁহারা দ্বিজ হইলেন, তাঁহারা তাঁহাদের জাতির অগ্রজাত ব্রহ্মনাম ধারণ করিলেন। সেই হেতু তাঁহারা অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মজাতি। আর একজাতীয়গণকে তাঁহারা যেন দ্বিজ জাতি বলিয়াই স্বীকার করিতেন না। সেই হেতু একজাতীয়গণ জাতি ব্রাহ্মণ, অব্রহ্ম বা অব্রাহ্মণ জাতিতে পরিণত হইলেন। দ্বিজগণ হীনবৃত্তিক একজাতীয়গণের জন্য অপবিত্র কর্ম্ম, যথা দ্বিজসেবা ও কায়িক বৃত্তি মাত্র রাখিয়া অপর সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি গুলি আত্মসাৎ করিলেন,একজাতীয়গণকে তাহাতে প্রবেশাধিকার দিলেন না এইরূপে একজাতি মাত্রেই শূদ্র বর্ণে পরিণত হইলেন। এবং দ্বিজ বা

ব্রহ্মজাতীয়গণ বৃত্তিবৃত্তি দ্বারা ক্রমশঃ তিন বর্ণে পরিণত হইলেন। বৃত্তিবৃত্তি গুলি বহু হইলেও তাহাদিগকে তিনটী-শ্রেণী মধ্যে গ্রহণ করা যায়। সেই শ্রেণীত্রয়ের নাম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। অতএব বর্ণ চারিটীর অধিক হইতে পারে না। ভগবান্ মনু পূর্ব্বোদ্ধৃত দশমাধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে এই কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

বহুযুগের পর বৃত্তি সংস্থানগুলি বংশানুক্রমিক হইয়া পড়িলে দ্বিধা বিভক্ত আদিম ব্রহ্ম-জাতির মধ্যে বৃত্ত্যনুসারে প্রবর্ত্তিত চারি বর্ণের মধ্যে ক্রমশঃ বহু জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল যথা ঃ—

ভগবান্ সর্ব্ববর্ণানাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
অন্তরপ্রভবানাঞ্চ ধর্ম্মান্নোবক্তুমর্হসি॥

মনু ১।২

ঋষিগণ বলিতেছেন,—হে ভগবান্ (মনু)! আপনি আমাদিগকে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের ধর্ম্ম, ও উক্ত বর্ণ চতুষ্টয়ান্তর্নিবিষ্ট যাবতীয় জাতিনিচয়ের আনুপূর্ব্বিক ক্রমে ধর্ম্ম বলিতে আজ্ঞা করুন।"

এই শ্লোকের টীকায় মহামান্য কুল্লুক 'বর্ণ'শব্দটী জাত্যর্থে গ্রহণ পূর্ব্বক ভ্রমে পতিত হইয়া 'অন্তর প্রভব' কথাটী 'সঙ্কীর্ণ জাতি'অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ঈর্ষা, দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া কতকগুলি জাতিকে বৃথা গালিবর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার অযথা প্রযুক্ত হীন জনোচিত অসাধুভাষা ও মানসিক সঙ্কীর্ণতা তাঁহার টীকার অযথার্থতা ও দুর্ব্বলতার পরিচয় দিতেছে। তিনি এই শ্লোকটীর যে টীকা করিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

বর্ণ যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই সকল বর্ণেরও যাহারা অন্তরপ্রভব বা সঙ্কীর্ণ জাতি তাহাদের আনুপূর্ব্বিক ক্রমে ধর্ম্ম বলিতে আজ্ঞা হয়। যদ্রূপ খর ও তুরগী হইতে জাত অশ্বতর খর জাতিও হয় না, তুরগী জাতিও হয় না, পরন্তু অন্যতর এক বিভিন্ন জাতীয় জন্তু হয়, তদ্রূপ অম্বষ্ঠ করণ ক্ষত্তা প্রভৃতি জাতীয়গণ যাহারা বিজাতীয় অনুলোম প্রতিলোম মৈথুন প্রভব এবং অশ্বতরবৎ জাত্যন্তর প্রাপ্ত এতাবৎ সঙ্কীর্ণজগণ বর্ণ শব্দে গৃহীত না হওয়ায় তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রশ্ন করিতে হইয়াছে। এতদ্দ্বারা এই মানব সংহিতার সর্ব্বোপকারিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। যে বর্ণের যে ধর্ম্ম উপযুক্ত ও তাঁহাদের আশ্রমাদি যথাবৎ বলিবার জন্য প্রশ্ন কৃত হইয়াছে, অনুপূর্ব্বশঃ অর্থাৎ প্রথম জাতকর্ম্ম দ্বিতীয় নামকরণ এইরূপ যথাক্রমে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম আমাদিগকে বলিতে আজ্ঞা হয়। আপনিই উপযুক্ত বক্তা। যেমন ইহাতে ব্রহ্মহত্যাদি অধর্ম্ম কীর্ত্তিত হইবে তেমন তাহার প্রায়শ্চিত্তরূপ ধর্ম্মবিধানও থাকিবে সেইজন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে প্রশ্ন কৃত হয় নাই।

মহামান্য কুল্লুক অনেকগুলি প্রমাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন যথা—১। জাতি ও বর্ণ যে বিভিন্ন অর্থ-বাচক তাহা তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন, যেহেতু তিনি অনুলোম প্রতিলোমে বর্ণের মিশ্রণকে বিজাতীয় মিশ্রণ বলিয়াছেন। ২। তাঁহার স্মরণ ছিল না, মনুষ্যমাত্রেই এক জাতি, তাহাদের মধ্যে খর তুরগীবৎ বিভিন্ন জাতি থাকিতে পারে না, সেই হেতু মনুষ্যের মধ্যে কোনপ্রকার মৈথুন সংযোগেই অশ্বতরবৎ পিতৃমাতৃ ব্যতিরিক্ত বিভিন্ন-জাতীয় সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে না। অশ্ব ও খরের যে স্বাভাবিক বৈষম্য, মনুষ্যমধ্যে তাহার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। অতএব অশ্বতরবৎ বিভিন্নজাতীয় সন্তান মনুষ্যমধ্যে অসম্ভব। ৩। তৃতীয় প্রমাদ তাঁহার সঙ্কীর্ণ শব্দের অর্থানভিজ্ঞতা। সঙ্কীর্ণ বা সঙ্কর জাতির অর্থ বিভিন্ন দুই বর্ণের মৈথুন সম্ভব নহে। সম্ পূর্ব্বক মার্জ্জনার্থক কৄ ধাতু যোগে এই দুই শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ—যাহা মার্জ্জনী দ্বারা ধূলির ন্যায় বহিষ্কারযোগ্য অর্থাৎ অপবিত্র অসংস্কৃত। অনুলোম প্রভবগণ সঙ্কর বর্ণ নহেন—প্রতিলোমগণ সমাজ হইতে বহিষ্কার যোগ্য, সেইজন্য তাহাদিগকে বর্ণসঙ্কর বা সঙ্কীর্ণ জাতি বলে। যাঁহারা সবর্ণের বৃত্তি ত্যাগ করেন,

অবেন্ন্যা বেদনজাত অথবা সবর্ণা কুমারী বা সগোত্রা কুমারীসম্ভূত তাহারা সকলে বর্ণসঙ্কর বা সঙ্কীর্ণ জাতীয়। ৪। চতুর্থ প্রমাদ এই যে কুল্লুক বর্ণ শব্দের জাতি অর্থ করায় তাঁহার মতানুসারে দ্বিতীয় শ্লোকের এইমাত্র সঙ্গত অর্থ হইতে পারে যে, ঋষিগণ মূল জাতিচতুষ্টয় ও অনুলোম প্রতিলোম জাতগণের ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন মাত্র ; পরন্তু আশ্রমধর্ম্ম প্রায়শ্চিত্ত বিধান, দায়প্রকরণ প্রভৃতির সম্বন্ধে ঋষিগণ কোন প্রশ্নই করেন নাই—জাতিগণের বৃত্তি প্রভৃতি ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে চাতুর্ব্বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা ও দায়ভাগাদির কথন অপ্রাসঙ্গিক হয়। ৫। পঞ্চম প্রমাদ এই যে যদি জাতি ও বর্ণ একার্থবাচকই হয় তাহাহইলে 'সর্ব্ববর্ণের' ও অন্তরপ্রভবগণের সম্বন্ধে বিশেষভাবে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া প্রশ্ন করিবার কোন আবশ্যক ছিল না। যেহেতু "সর্ব্ব জাতির সকল প্রকার অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম বলুন, বলিয়া প্রশ্ন করিলে ত সঙ্গত ও বিশদতর প্রশ্ন হইত। শাস্ত্রে বৃথা বা অনাবশ্যক বাক্য প্রয়োগ করা অসঙ্গত ও দোষ। মহামান্য কুল্লুক এইরূপ অর্থ করায়, মনুতে দোষ পড়ে। দায়ভাগ বা প্রায়শ্চিত্ত বিধানগুলি প্রত্যেক জাতির পক্ষে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা নাই। শূদ্রশ্রেষ্ঠ পারশরের পক্ষেও যেরূপ প্রযুজ্য, শূদ্রাধম চণ্ডালের পক্ষেও তদ্রূপ, ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যে জাতিশ্রেষ্ঠ মুখ্য ব্রাহ্মণের পক্ষেও তদ্রূপ; কোন ইতরবিশেষ নাই। চণ্ডাল ও পারশর উভয়ই শূদ্রবর্ণ, একজন সৎশূদ্র অপরজন বর্ণসঙ্কর ; সুতরাং দায়ভাগ প্রভৃতির সম্বন্ধে কথন কেবল বর্ণ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তরেই সম্ভব; নতুবা জাতি ধর্ম্মের উত্তরে অসঙ্গত হয়। যে বিষয়ের প্রশ্ন হয় নাই, সে বিষয়ের উত্তর থাকিতে পারে না। কুল্লুক বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার অর্থানুযায়ী প্রায়শ্চিত্তবিধান ও দায়ভাগাদির বিধান মনুসংহিতায় স্থান পাইতে পারে না। সেইজন্য তাঁহাকে পুনশ্চ 'ধর্ম্মান্' কথাটার পৃথকভাবে "সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠেয় বিধান" এইরূপে অর্থ করিতে হইয়াছে। সকল জাতির অনুষ্ঠানগুলি বলুন, এইরূপ অর্থ করিতে পারেন নাই। বিস্তৃতির অধিক প্রয়োজন নাই। আমরা এইসকল কারণে মহামান্য কুল্লুকের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে অসমর্থ।

জাতি ও বর্ণ উভয়ই প্রাকৃতিক ভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে উভয়ের মধ্যে বিশেষত্ব এই,—বর্ণ জন্মের পর অবলম্বিত আচার ব্যবহার ও বৃত্তি দ্বারা উপার্জ্জিত হইত; পরন্তু জাতিগত গুণগুলি অর্জ্জিত হয় না, উহারা সকলেই স্বভাবতঃ প্রকাশ পায়। জন্মমাত্রেই স্বভাবজ গুণ বা প্রকৃতি দেখিয়া কে কোন্ জাতীয় জীব তাহা অনায়াসে নির্ণীত হইতে পারে। কিন্তু কাহারও সাধ্য নাই, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র জীবের বর্ণ নির্ণয় করে। শাস্ত্র বলিয়াছেন যে জাতিকৃত ধর্ম্ম স্বভাবত প্রকাশ পায়। যথা :—

> চর্ত্তু লিঙ্গানি ঋতবঃ এবর্ত্তু পর্য্যয়ে।
> স্বানিস্বান্যভি পদ্যন্তে তথা কর্ম্মাণি দেহিনঃ॥
>
> মনু ১।৩১

"যেমন শীত বসন্তাদি ঋতুগণ স্ব স্ব ঋতু চিহ্ন সকল স্ব স্ব কালে আপনা আপনি ধারণ করে, তজ্জন্য কোন চেষ্টা করিতে হয় না, সেইরূপ হিংস্র, অহিংস্র, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি প্রাণীসকল নিজ নিজ জাতীয় ধর্ম্মগুলি বিনা চেষ্টায় স্বভাবতঃ লাভ করে।" যেমন কতকগুলি এইরূপ বিনা চেষ্টালব্ধ স্বাভাবিক গুণ দেখিয়া আমরা বলি ভূমিষ্ঠ জীবটী মনুষ্যশিশু—এই বিশেষ স্বাভাবিক গুণগুলি যাহাতে বিদ্যমান, আমরা তাহাকেই মনুষ্য বলিয়া অভ্রান্তরূপে ধারণা করি। তেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বলিতে যে বিশেষ বিশেষ গুণ সমষ্টিগুলি বুঝায়, তাহা ভূমিষ্ঠ শিশুকে দেখিবামাত্র কেহ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবেন না। এই গুণগুলি জন্মের পর অনুষ্ঠিত আচার দ্বারা প্রকাশ পায়। গুণ ও কর্ম্মের দ্বারা যাহা লাভ করা যায়, তাহা গুণ ও কর্ম্মের দ্বারায় নষ্টও করা যায়। সেই হেতু কর্ম্মের দ্বারা বর্ণান্তর ঘটিতে পারে, কর্ম্ম ব্যভিচারে বর্ণ সঙ্কর হয়, কিন্তু প্রকৃত

জাত্যন্তর হইতে পারে না। যে ভূমিষ্ঠ হইয়া যে জাতি লাভ করিয়াছে সে কিছুতেই তাহা ত্যাগ বা পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু যখন বর্ণাচার বংশগত হইয়া পড়িয়াছে তখন হইতেই বর্ণ শব্দের অর্থ বিকৃত হইয়া কতক পরিমাণে জাতির ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে। কারণ যাহা জন্মের সহিত পাওয়া যায় তাহাই জাতি। এইজন্য এক্ষণে ব্রাহ্মণবর্ণ ব্যক্তির পুত্র তাহার জন্মের সহিত ব্রাহ্মণবর্ণ সংস্কার প্রাপ্ত হওয়ায় ব্রাহ্মণবর্ণ বলিলে, ব্রাহ্মণজাতি বোধগম্য হয়। বাস্তবপক্ষে ইহা অর্থ ব্যভিচার ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

প্রচলিত জাতি প্রথা মনুষ্যসৃষ্ট, ভগবৎসৃষ্ট নহে। যেহেতু মনুষ্যসৃষ্টির পূর্ব্বে বিভিন্ন জাতীয় মনুষ্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। ভগবৎসৃষ্ট জাতি অথবা ব্রাহ্মণাদি বর্ণের জীবও সৃষ্টির পূর্ব্বে হইতে পারে না। পরন্ত জরায়ুজাদি জাতিবাচক নাম ও ব্রাহ্মণাদি বর্ণ নাম এবং উহাদের কর্ম্মাদি মনুষ্যসৃষ্ট নহে, উহা ভগবানের কৃত।

সর্ব্বেষাং তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদ শব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥

মনু ১।২১

হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা সৃষ্টির পূর্ব্বেই শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের ও (জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জের জাতিবাচক নাম জরায়ুজ যথা মনুষ্য গবাদি, অণ্ডজ যথা বিবিধ পক্ষী, বিবিধ মৎস্য ও কচ্ছপাদি, স্বেদজ যথা দংশমশকাদি, উদ্ভিজ্জ যথা বিবিধ বীজপ্ররোহী ও কাণ্ডপ্ররোহী অপুষ্প ফলবন্ত ও বনস্পতি প্রভৃতি, সপুষ্প ফলবান আম্রাদি বিবিধ বৃক্ষাদির) এবং বর্ণগণের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম ও জাতিগুলির স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্ম ও তাহাদের লৌকিকী ব্যবস্থাসকল নির্দ্দেশ করিলেন।

পাছে লোকের সংশয় হয় বর্ণ সৃষ্টির পূর্ব্বে কোথা হইতে বর্ণনাম আসিল, সেই হেতু মনু বলিতেছেন যে, ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ বেদ হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জগৎ বেদ হইতেই জাত। মহাপ্রলয়কালে এই জগতের প্রলয় হইলেও বেদ ব্রহ্মে থাকে। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা যখন সৃষ্টিপ্রয়াসী হন, তখন বেদে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের সৃষ্টিতে যেরূপ বর্ণনাম সকল ও তাহাদের আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম ও যেসকল জাতি নাম ও তাঁহাদের স্বভাবজ কর্ম্ম ও ব্যক্তিসকলের যেরূপ লৌকিকী ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল বিবৃত রহিয়াছে তাহা পৃথক্ পৃথক্ স্মরণ পূর্ব্বক তদনুরূপ সেইসকল বর্ণ ও জাতির নাম কর্ম্ম ও লৌকিকী ব্যবস্থাসকল নির্দ্দেশ করেন। অর্থাৎ তিনি বেদানুসারে ব্যবস্থা করেন কোন বর্ণের কি অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম ও কোন জাতির কি নাম ও কি স্বাভাবিক কর্ম্ম হইবে। বর্ণচতুষ্টয়ের নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পরে প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে প্রত্যেকের যোনি প্রদান করত চাতুর্ব্বর্ণ্যময় জগৎ সৃষ্টি করেন ঃ—

লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়েৎ॥
দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥
তপস্তপ্ত্বা সৃজদ্ যন্তু স স্বয়ং পুরুষো বিরাট্।
তং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ॥
অহং প্রজাঃ সিসৃক্ষুস্তু তপস্তপ্ত্বা সুদুশ্চরম্।
পতীন্ প্রজানামসৃজং মহর্ষীনাদিতো দশ॥
মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ॥
এতে মনুংস্তু সপ্তান্যানসৃজন ভূরিতেজসঃ।
দেবান্ দেবনিকায়াংশ্চ মহর্ষীং শ্চামিতৌজসঃ॥
যক্ষ রক্ষ পিশাচাংশ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরান্।
নাগান্ সর্পান্ সুপর্ণাংশ্চ পিতৃণাঞ্চ পৃথগ্‌গণাম্॥
বিদ্যুতোঽশনিমেঘাংশ্চ রোহিতেন্দ্র ধনুংষি চ।
উল্কা নির্ঘাত কেতুংশ্চ জ্যোতীংষ্যুচ্চাবচানি চ॥
কিন্নরান্ বানরান্ মৎস্যান্ বিবিধাংশ্চ বিহঙ্গমান্।
পশূন্ মৃগান্ মনুষ্যাংশ্চ ব্যালাংশ্চোভয়োদতঃ॥
কৃমিকীটপতঙ্গাংশ্চ যূকামক্ষিকমৎকুনম্।
সর্ব্বঞ্চ দংশ মশকং স্থাবরঞ্চ পৃথগ্বিধম্॥

এব মেতৈরিদং সর্ব্বং মন্নিয়োগান্মহাত্মভিঃ।
যথাকর্ম্ম তপোযোগাৎ সৃষ্টং স্থাবরজঙ্গমম্॥

মনু ১।৩১-৪১

"ভূর্ভুবস্বরাদি লোক সকলের যাহাতে বিচিত্র পুষ্টি ও বর্দ্ধন হয় সেই হেতু প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা তাঁহার মুখ বাহু ও উরু ও পাদ স্বরূপ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ (নাম) সৃষ্টি বা নির্দ্দেশ করিলেন। ৩১। (তাহার পর) সেই প্রভু নিজ দেহ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একার্দ্ধে পুরুষ রূপ ও অপরার্দ্ধে নারীরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক সেই নারীতে (মৈথুন সংযোগে) বিরাট্ পুরুষকে সৃজন করিলেন। ৩২। হিরণ্যগর্ভ পুত্র বিরাট যাঁহাকে তপস্যা করিয়া সৃজন করিয়াছিলেন তাঁহাকে আমি সেই 'মনু' বলিয়াই জানিবে। আমিই এই জগতের (জীব) স্রষ্টা। ৩৩। (অতঃপর মনু তাঁহার সৃষ্টি মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন—) আমি প্রজা সৃজনেচ্ছু হইয়া সুদুশ্চর তপস্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক প্রথমে দশজন মহর্ষি প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিলাম। ৩৪। তাঁহাদের নাম এই :—(১) মরীচি, (২) অত্রি, (৩) অঙ্গিরা, (৪) পুলহ, (৫) পুলস্ত্য, (৬) ক্রতু, (৭)প্রচেতা, (৮) বশিষ্ঠ, (৯) ভৃগু ও (১০) নারদ। ৩৫। পুনশ্চ এই মহর্ষিগণ অপরিমিত তেজঃ সম্পন্ন 'মনু' নাম ধারী অপর সাত জন, (যে দেবগণকে ব্রহ্মা সৃজন করেন নাই সেই) দেবগণ, দেবগণের বাসস্থান, ও অমিত তেজা অপর মহর্ষিগণকে সৃষ্টি করিলেন। ৩৬। (তাহার পর) যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, অসুর, নাগ, সর্প, সুপর্ণ ও পিতৃদিগের পৃথক পৃথক গণ। ৩৭। বিদ্যুৎ, অশনি, মেঘ, রোহিত, ইন্দ্রধনু, উল্কা, নির্ঘাত, ধূমকেতু এবং উর্দ্ধ ও অধ আদি স্থানভেদে নানাপ্রকার জ্যোতিষ্ক প্রভৃতি। ৩৮। কিন্নর বানর,মৎস্য, বিবিধ বিহঙ্গম, পশু, মৃগ, মনুষ্য, হিংস্র জন্তু এবং যে সকল জন্তুর উপর নীচে দুই পংক্তি দন্ত আছে এই রূপজন্তু।৩৯। কৃমিকীট, পতঙ্গ, উকুন, মক্ষিকা, মৎকুন, সর্ব্বপ্রকার দংশ মশক বহুপ্রকার স্থাবর। ৪০। এই রূপে উক্ত দশ মহর্ষি প্রজাপতিগণ আমারই আদেশে মহৎ তপশ্চরণ পূর্ব্বক প্রাক্তন কর্ম্মানুরূপ যোনি প্রদান করত সমুদায় স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি করিলেন। ৪১।"

উপরি উদ্ধৃত অংশের একত্রিংশ শ্লোকের টীকায় মহামান্য কুল্লুক মহামান্য মেধাতিথিকে অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন যে 'ত্রিলোকে ও ত্রিলোকস্থ প্রাণিবর্গের বাহুল্য জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মা মুখ, বাহু, উরু, পদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতীয় মানব সৃষ্টি করিলেন। ব্রাহ্মণাদিগণ প্রাতে ও সন্ধ্যায় অগ্নিতে আহুতি দ্বারা সূর্য্যোপস্থান করেন, তদ্দ্বারা প্রজা বৃদ্ধি হয়'। তিনি আরও বলিয়াছেন, 'দৈবীশক্তির দ্বারা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক তদীয় মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদি সৃষ্টিবিষয়ে আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই যেহেতু ইহা শ্রুতিসিদ্ধ'। ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মানব প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি শ্রুতিসিদ্ধ কিনা তদ্বিষয়ে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করিব। আপাততঃ আমরা দেখাইব, মহামান্য কুল্লুকের ব্যাখ্যা প্রমাদবহুল ও অসঙ্গত। প্রথমতঃ যখন বর্ণ সৃষ্টি হইয়াছে। তখন মানবগণের সৃষ্টিকর্ত্তা স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র দশ, মহর্ষি প্রজাপতি ত দূরের কথা, স্বয়ং মনুর পিতা বিরাটও জন্মগ্রহণ করেন নাই। বর্ণান্তর্গত মানবসৃষ্টি তখনও বহু দূরে। দ্বিতীয়তঃ উপরি উদ্ধৃত মনুসংহিতার ৩৯শ শ্লোকে দেখিতে পাই, সমগ্র মনুষ্যজাতিই মনুর আদেশে দশ মহর্ষি প্রজাপতি কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। এস্থলে 'মনুষ্যগণকে' এই পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয় ভিন্ন অপর মনুষ্যগণকে বলা হয় নাই। তৃতীয়তঃ ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সৃজন করিলেন বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণাদি জাতীয় মানব বলা হয় নাই। যদি ইহা মানব হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী ৩৯শ শ্লোকের সহিত বিরোধ হয় ; সুতরাং ব্রহ্মা সৃষ্ট ব্রাহ্মণাদি ব্রাহ্মণাদিজাতীয় মানব নহে। চতুর্থতঃ যদি ৩১শ শ্লোকের অর্থ ব্রাহ্মণাদি মানব

বলিতে হয়, তাহা হইলে এই শ্লোকের সহিত পরবর্ত্তী শ্লোকের কোন ক্রম পরিলক্ষিত হয় না—ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত। পঞ্চমতঃ মহামান্য কুল্লুকের মতে কেবল মানবজাতির মধ্যেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণ আছে জগতে অন্য সৃষ্টজীবে নাই—ইহা তাঁহার বিষম ভ্রম। আমরা বেদ হইতেই দেখিতে পাই যে, দেবজাতির মধ্যে বৃহস্পতি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ, ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জ্জন্য, যম, মৃত্যু ও ঈশান প্রভৃতি দেবজাতীয় ক্ষত্রিয়বর্ণ, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ত্রয়োদশ বিশ্বদেব এবং ঊনপঞ্চাশ মরুৎ ইহাঁরা দেবজাতীয় বৈশ্য, এবং পৃথ্বী দেবজাতীয় শূদ্রবর্ণ। এইরূপ এই বিশ্বই চাতুর্ব্বর্ণ্যময়। ষষ্ঠতঃ অমূর্ত্ত ব্রহ্মার মুখাদি অঙ্গ কোথা হইতে আসিল? প্রজা সৃষ্টির পূর্ব্বে চারিবর্ণ সৃষ্টি করায় ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ব্রহ্মা বিধান করিলেন যে ভূর্ভুবস্বরাদি লোকসকলে অনেক প্রকৃতির প্রজা হইবে, তাহারা স্বকীয় সমাজ পুষ্টি ও বর্দ্ধনের জন্য নিজ নিজ গুণানুসারে বহু বৃত্তি অবলম্বন করিবে। সেই বৃত্তিগুলিকে শ্রেষ্ঠতা ও অপকর্ষতা অনুসারে যে চারিশ্রেণীতে বিভাজ্য তাহাদের নাম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নির্দ্দেশ করিলেন। গুণ ও কর্ম্মের শ্রেষ্ঠতাজন্য ব্রাহ্মণ যেন তাঁহার মুখ স্বরূপ, ক্ষত্রিয় তাঁহার বাহু স্বরূপ, বৈশ্য তাঁহার উরুস্বরূপ ও শূদ্র তাঁহার পদ স্বরূপ। মহামান্য কুল্লুক "মুখবাহূরুপাদতঃ" কথাটী মুখ, বাহু, উরু ও পদ 'হইতে' ব্রাহ্মণাদি জাতিচতুষ্টয়ের উৎপত্তি বলায় পুনশ্চ মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি 'তস্' প্রত্যয় দেখিয়াই এই জ্ঞানকৃত প্রমাদ করিয়াছেন। তিনি এই 'তস্' প্রত্যয়টী অপাদানে পঞ্চম্যন্তে গ্রহণ করিয়া 'হইতে' অর্থ করিয়াছেন; আমরা বলি এই 'তস্' প্রত্যয়টী প্রথমায় কৃত হইয়াছে, অতএব ইহাতে 'স্বরূপ' অর্থ বোধিত হইতেছে। প্রথমা বিভক্তিতে যে 'তস্' প্রত্যয় হয় তাহা মহামান্য কুল্লুকের অবিদিত ছিল না, যেহেতু তিনি স্বয়ং মনুসংহিতার এই প্রথমাধ্যায়ের ৫ম শ্লোকের "প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ" অংশের 'সর্ব্বতঃ' কথাটী প্রথমায় 'তস্' করিয়া উহার অর্থ 'সর্ব্বস্থান' বলিয়াছেন। এবং ঐ অধ্যায়ের ৪৭শ শ্লোকের 'উভয়তঃ' শব্দটী প্রথমান্ত 'তস্' বিভক্তি যোগে সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া উহার অর্থ 'উভয়রূপ' বলিয়াছেন. আমরা দেখিতেছি যে 'তস্' প্রত্যয়টী প্রথমান্ত করিলেই সঙ্গত অর্থ হয় এবং পঞ্চম্যন্ত করিলে অসঙ্গত হয়। অতএব আমরা প্রথমান্তে গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করি; নতুবা মনুতে অসঙ্গতি দোষ স্পর্শ করে। এইরূপ অর্থেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ। গীতা ৪।১৩।১

গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে আমি চতুর্ব্বর্ণময় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি। (ক্রমশঃ)

প্রার্থনা।

[শ্রীমতী———দেবী।]

শুষ্ক প্রাণেতে আছি মা সদাই
শান্তি-বারি সিঞ্চন কর মা তায়।
এ প্রাণেতে মোর কিছু মা নাই
তোমারে ডাকিতে ভুলিগো তাই
নিশি দিবা মন ভেবে ভেবে
মাগো হতেছে উদাস প্রায়॥

এমন করিয়া উদাস প্রাণেতে
কত দিন আর কাটাব কাল।
এ ধরার খেলা কবে হবে শেষ,
বলে দেমা তারা করিয়া বিশেষ,
বহিতে পারিনা এ দুঃখের বোঝা,
সহেনা হৃদয়ে অশান্তি-জঞ্জাল॥

অন্তরেতে মোর হতেছে যাহা,
অন্তরে থাকিয়া জানিছ সকলি।
ভক্তি বিন্দু মনে নাহি বলে তাই
অশান্তি-অনলে তনু হল ছাই।
'কি হবে কি হবে কি হবে তারা'
এই ভেবে মন হল যে কালি।

নিজ সুখ-দুখে হইয়া মগন
সদাই রহিনু আমি যে হায়!
জীবনের কাজ কিছু না হইল
অযথা করমে সময় কাটিল,
কেমনে নিস্তার পাব গো ভবে,
করে দেমা তারা তারি উপায়॥

ত্রিতাপের তাপে হৃদয় দহিল
বল মাগো তারা কেমনে নিভাই?
ভক্তি বারি যদি দিতে মা মোরে,
ঢালিতাম আজি পরাণ ভ'রে,
অবশ্য জুড়াত ত্রিতাপের জ্বালা;
ভক্তি বিনা প্রাণ জ্বলিছে সদাই॥

ভক্তি বারি দাও ওগো মা তারা
শীতলিয়া মোর তাপিত হিয়া।
সহিতে পারিনা আর যে আমি
করুণা নয়নে চাহ মা তুমি
দয়া কি তোমার হয় না গো তারা!
সদা এত ডাকি কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥

তবে কেন বলে জগত জননী
দয়ার আধার সকলে তোরে?
দয়ার আধার হইতে মা যদি,
জ্বলিত না সবে দুঃখে নিরবধি
পাষাণের মেয়ে পাষাণী তুমি মা
জানিনু আমি গো এত দিন পরে॥

এত যে মাগিনু দিলেনা ভকতি
পরেতে দুষিতে পারিবে না মোরে।
সদা এত ভাসি নয়ন জলে
চাহিলে না কভু ফিরেতো ভুলে
তখন কহিবে ডাকিস্ নি আমায়,
অনন্ত সংসারে ঘুরাব তোরে॥

ওমা এত কিগো অপরাধী
চরণে তোমার।
তাই সর্ব্ব রসময়ী হয়ে
রস শূন্য করলি হিয়ে
বল্ গো তারা কিবা দিয়ে
পূজিব ও পদ এবার।

কোন রস যে নাইকো চিত্তে
কি দিয়ে মজিব তোতে,
ওমা রসহীন এ প্রাণেতে
তোমায় ডাকা হল ভার।
এত কি গো পদে দুখী
তাই দিলি মা যাহা খুসি
মর্ম্ম ব্যথা রাশি রাশি
এই কি মা তোর সুল বিচার।

দয়াময়ী নামটী ধ'রে
নাইকো দয়া আমার পরে
স্নেহ ভরে চাহ ফিরে
(ওমা) কাঁদিতে না পারি আর।
কেঁদে কেঁদে জীবন গেল,
এই কি মা তোর বিচার হল?
(তবে) তোমায় ডেকে কিবা ফল
(যদি) কাঁদতে হবে অনিবার।

মা বিনে যে আর জানিনা
তাই কি মা তোর এ ছলনা
দুঃখে পড়ে ডাকি কিনা
তাই কি দেখিস্ মা আমার।

এ কিমা পরীক্ষা তোর
বিষম সঙ্কট ঘোর
তোলপাড় হৃদি মোর
কেমনে বা হব পার।

কোথা আমি কোথা তুমি
কোথা প'ড়ে কর্ম্ম-ভূমি
বুঝিতে না পারি আমি
সকলি হেরি আঁধার।

আশা হীন্ বল হীন্
পড়ে আছি হয়ে দীন্
দিবি কি দীনের দিন
ওমা দিয়ে চরণ সার।

বিষময় এ সংসার
ভাল ত লাগে না আর
কে আমার আমি কার
শুধু করি হাহাকার।

কোথা হতে আসিয়াছি
কি যেন কি ভুলে গেছি
ঘুরে মরি মিছা মিছি
আমি যেন কোথাকার।

কার তরে হাসি কাঁদি
সুখে দুখে নিরবধি
রাখিতে পারিনা যদি
সবে করি আপনার।

তাই ভাবি গো দিবা নিশি
অশ্রু জলে ভাসি ভাসি
(কবে) তুমি আমি দুয়ে মিশি
হয়ে যাব একাকার।

মর্ম্ম জ্বালা জুড়াইতে
কে আছে আর এ মহীতে
রসময়ী মা ব্যতীতে
তাই ডাকি গো বার বার।

যত দুঃখ পাই হৃদে
মা বলিয়া প্রাণ কাঁদে
পড়িয়া মোহের ফাঁদে
(যেন) ভুলি নাকো আমি আর॥

অনিন্দ্য সুন্দরী !

বরের বাজার নিতান্ত মহার্ঘ হইয়া বরের পিতা মহাশয় দিগের আশা-আকাঙ্ক্ষা দিন দিন যেরূপ উচ্চ করিয়া তুলিতেছে, তাহাতে যে ক'নের বাবারা মান-কাণ লইয়া সংসারে টিকিতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না। কন্যাদায়ে পড়িয়া কুলমর্য্যাদা ত একরূপ জাহ্নবীর জলে বিসর্জ্জন দিতেই হইতেছে। যাঁহারা কুলীন, চিরকাল যাঁহারা মর্য্যাদা পাইয়া আসিয়াছেন, কন্যাদায়ের তাড়নায় তাঁহারাও নীচ-ঘর হইতে অর্থের বিনিময়ে বর সংগ্রহ করিয়া দায় মুক্ত হইতেছেন, কুলমর্য্যাদার কথা মুখ দিয়া বাহির করিবার সাহসও পাইতেছেন না! ফলে সমাজের এরূপ অবস্থায় লোকের মতিপ্রবৃত্তি কিরূপ হইতেছে,—বরের বাবারা কিরূপ অদ্ভুত প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করিতেছেন, নিম্নে একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া তাহা বুঝাইবার প্রয়াস পাইব।

একটী বৈদ্যসন্তান পূর্ব্বে স্কুলমাষ্টারী করিতেন, এখন তিনি কোন মহকুমায় ওকালতী করেন। ওকালতীতে তাঁহার বেশ পসার আছে। ইঁহার ভূতপূর্ব্ব একটী ছাত্র তাঁহার কোন আত্মীয়ের কন্যার সহিত উকীল বাবুর পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পত্র লিখেন। তদুত্তরে তিনি লিখিয়া-ছেন,—"তুমি যে সম্বন্ধের কথা উত্থাপন করিয়াছ ঐসম্বন্ধ হইতে পারে না * * * * * বাবু সগোত্র হইতেছেন, এরূপ অবস্থায় একার্য্য হইতে পারে না। যাহা হউক, তোমার অনুসন্ধানে

কোন 'অনিন্দ্যসুন্দরী' বালিকা যদি থাকে তাহা হইলে তৎসংবাদ আমাকে লিখিবে ; আরও কন্যাটী কুলীনের মেয়ে হওয়া চাই। কন্যা সুন্দরী হইলে অর্থসম্বন্ধে পীড়াপীড়ি করা হইবেক না। আমার পুত্রটী এবার বি, এ পরীক্ষা দিবে, আর একটী এল্ এ পরীক্ষা দিবে, তাহারা উভয়েই কলিকাতা থাকে।" এখন কথা হইতেছে "অনিন্দ্যসুন্দরী" লইয়া। কিরূপ হইলে কন্যা 'অনিন্দ্যসুন্দরী' বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহার সার্টিফিকেট দিবার ভার অবশ্য স্বয়ং বরের বাবার উপরেই রহিল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ভগবানের সৃষ্ট মানব-জাতির মধ্যে নর-নারী যতই রূপসম্পন্ন হউক না কেন, একবারে নিখুঁৎ সুন্দর এপর্য্যন্ত কাহারও নেত্রগোচর হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। কিন্তু এই ভদ্রসন্তানের 'অনিন্দ্যসুন্দরী' বিশেষণটী শুনিয়া মনে হয়, যেন "ডানা কাটা পরীর বাচ্ছা" হইলে তিনি অর্থের জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটী কথা বলিবার আছে। তিনি তাঁহার যে পুত্রটীর জন্য 'অনিন্দ্য-সুন্দরী বালিকা খুঁজিতেছেন, তাঁহার সেই পুত্রটী অনিন্দ্য-সুন্দর না-ও হইতে পারে। পরন্তু এই অবস্থায় তিনি যে, কুলীনের মেয়ে অথচ 'অনিন্দ্য-সুন্দরী'র অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহার একমাত্র কারণ,—তাঁহার পুত্র এবার বি, এ পরীক্ষা দিবে। এটা তাঁহার পুত্রের বাহিক সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক নহে, আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক। তাঁহার ছেলে বি, এ পড়িতেছে, এজন্যই তিনি ঐরূপ স্পর্দ্ধার কথা বলিতে সাহস করিতে পারেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যে সুন্দর বলিয়া তিনি যদি এরূপ দাবি করিবার অধিকারী হন, তাহা হইলে যে বালিকা আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যে সুন্দরী, তাহার হতাদর হইবে কেন?

সংসারের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের হিসাবে বলিতে হইলে ইহাই বলিতে হয় যে, গুণহীনা রূপবতী অপেক্ষা রূপহীনা গুণবতীর আদর হওয়াই উচিত। গৃহস্থের ঘরের বউ-ঝি বাসন মাজা, কুট্‌না-কোটা, বাট্‌না-বাটা, রান্নাকরা, শিশুপরিচার্য্য প্রভৃতি ঘর-কন্নার কার্য্যে অনভিজ্ঞ অথবা অনভ্যস্ত থাকিলে সে সংসারে সুখশান্তির সম্ভাবনা অল্প। বউ-ঝি যদি কেশ-বেশবিন্যাসাদি দ্বারা রূপের পসরা সাজাইবার জন্য সময়াতিপাত করে, আর পাচক-পাচিকা, ঝি-চাকরের উপর ঘর-কন্নার কার্য্য নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে সে সংসারকে গৃহস্থের সংসার বলা যায় না।

আজকাল সংসারে চাকরিজীবী লোকের সংখ্যাই অধিক। বিশেষতঃ বৈদ্যজাতির মধ্যে যাহারা চিকিৎসা-ব্যবসা অবলম্বন করিয়া আছেন, তাঁহাদের মধ্যেও অধিকাংশ লোকের আয়, তুলনায়, চাকরিজীবী অপেক্ষা অধিক বলিয়া মনে করা যায় না। কিন্তু এসকল সংসারে যদি পাচক-পাচিকা, ঝি-চাকর রাখিয়া ঘরকন্না চালাইতে হয়, মিতব্যয়িতার হিসাবে ইহা কখনও অনুমোদনীয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বউ-ঝির সৌন্দর্য্যের অপচয় অথবা অবমাননা হইবে, এই আশঙ্কার বাধ্য হইয়া পাচক-পাচিকা ও ঝি-চাকরের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। অবস্থায় কুলাইয়া না উঠিলেও সৌন্দর্য্যের ইজ্জত রক্ষা করিবার জন্যও এরূপ ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হন। এই স্থূল কথাটী আমাদের উল্লিখিত প্রবীণ এবং শিক্ষিত উকীল বাবু কেন,—তাঁহার ন্যায় যাঁহারা 'অনিন্দ্য-সুন্দরী' বালিকা খুঁজিয়া বেড়ান,—তাঁহাদের সকলেরই একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। অনেক স্থলে কিন্তু এই সৌন্দর্য্যের পসরা লইয়া বিপন্ন হইতে হয়।

যাঁহারা বরপণ গ্রহণ করিয়া থাকেন,—পুত্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের খেতাব অনুসারে যাঁহারা পুত্রের দরের তারতম্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে সেই অর্থ দ্বারা সুখ-স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইয়া যাইতে পারেন, এরূপ দৃষ্টান্ত নেত্রগোচর হইয়াছে বলিয়া

মনে পড়ে না। ইহাতে সমাজে দরিদ্রতার পথ প্রশস্ত হইতেছে, তাহারই জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষীভূত হয়। কোন্ ভাগ্যবান্ পুরুষ এরূপ ভাবে পুত্র বিক্রয় করিয়া জমীদার-তালুকদার অথবা একটা মহাজন হইতে পারিয়াছেন? যাঁহারা এরূপভাবে পুত্র বিক্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদের গৃহীত মূল্য অনেকের পূর্ব্বকৃত ঋণ পরিশোধেই নিঃশেষিত হয়। নব বধূটী ঘরে আসিলে যে অর্থক্ষয়ের একটী নূতন রাস্তা আবিষ্কৃত হয়, তাহা না বুঝেন এরূপ নির্ব্বোধ এখনকার সংসারে নাই। তার উপর বউটী যদি সুন্দরী হন, তাহা হইলে বিপদের মাত্রাটা একটু বড়ই হইয়া থাকে। মাথা ঠাণ্ডা ও কেশবৃদ্ধির জন্য 'কেশরঞ্জন' 'কুন্তলবৃষ্য'; সেমিজ-জ্যাকেট সুগন্ধি করিবার জন্য এস্, পি, সেনের এসেন্স, বদনমণ্ডলের ব্রণ-মেচেতা দূর করিবার জন্য 'মিল্‌ক্‌-অব-রোজ' অথবা 'হিমাংশু দ্রব'; দেহের ময়লা দূর করিবার জন্য সুগন্ধি সাবান;—এগুলি ত চাই-ই। তাহার উপর বউটী যদি পদ্মমালা বা বোধোদয় পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে,নাটক-নভেল ও মাসিকপত্রের আবদার রক্ষা না হইলে কিছুতেই পার পাইবার যো নাই। অন্ততঃ বিবাহের পর হইতে দুইবৎসর পর্য্যন্ত এরূপ আবদার রক্ষাটা 'যেন তেন প্রকারেণ' করিতেই হইবে। বধূমাতার এইসকল আবদারের সহিত শ্রীমানের বেশভূষা চলা-ফিরার সামঞ্জস্য না রাখিয়া চলিলে সেটা মানান সই হয় না। কাজেই এসকল অতিরিক্ত খরচ কুলাইতে হইলে, 'বধূমাতা'র গহনায় হাত পড়ে। একবার হাত পাতিয়া যদি চক্ষুলজ্জাটা কাটিয়া যায়, তাহা হইলে এই দুই বছরে, বধূমাতার করযুগলে কাঁচের চুড়ি ব্যতীত অপর কোন আভরণ খুঁজিয়া পাওয়া মুস্কিল হইয়া দাঁড়ায়। তখন নাটক-নভেল ও মাসিকপত্র বাড়ীর চতুঃসীমায় ঘেসিতে পারে না, 'কেশরঞ্জন', 'কুন্তলবৃষ্য', 'হিমাংশু দ্রব', প্রভৃতির গৃহে প্রবেশ দূরে থাকুক, ঘরের খালি শিশিগুলি পর্য্যন্ত শিশি-বোতলওয়ালার গৃহে প্রবেশ করিতে পথ পায় না!

বি, এ, এম, এ, পাশওয়ালা ছেলের বাপ যখন ছেলের বিনিময়ে এরূপ অর্থ গ্রহণ করেন, তখন ত তিনি মনে করেন,—ছেলে কোনমতে শাম্‌লা মাথায় দিয়া কাছারীতে গেলেই টাকার কাঁড়ি ঘরে ঠেলিয়া প্রবেশ করিতে পথ পাইবে না! কিন্তু ছেলে যখন শামলা আটিয়া কাছারীতে আনাগোনা করিয়া ট্রামভাড়ার পয়সাটা অথবা ইজের চাপকান ফরসা করিবার জন্য ধোবার পয়সাটা লইয়া ঘরে ফিরিতে পারেন না,তখন তাহাদের যে অবস্থা হয়, ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যে তাহা জানেন না।

এরূপ ক্ষেত্রে বধূমাতাটীর অবস্থা তখন আরও শোচনীয় হইয়া পড়ে। নূতন আদরে, নবীন সোহাগে যে দুটী বছর কাটিয়া যায়, তাহাতে অভ্যাসটা একরূপ নূতনতর হইয়া দাঁড়ায়। এতদিন যে দেহ 'লেশপেড়ে' শাড়ী ভিন্ন সমাবৃত হইত না, সেমিজ জ্যাকেট ব্যতীত বেশভূষার সমাদর রক্ষা হইত না, এখন সে দেহ আচ্ছাদনে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের অথবা বিলাতী লাট্টুমার্কার মোটা সাড়ীই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিয়া লইতে হয়! শাশুড়ী ঠাকুরাণী তখন বাপের বাড়ী হইতে হাত-খরচার টাকা পাঠাইবার জন্য বাপ্‌কে চিঠি লিখিতে পীড়াপীড়ি সুরু করেন। বউমা, যে কয়দিন পারেন সহ্য করেন; যখন অসহ্য হয়, তখনি বলিয়া ফেলেন, —তোমাদের ব্রহ্মটানে বাপ-মার কিছু রেখেছ কি যে হাত খরচার জন্য তাদের লিখ্‌ব?" আজকাল অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরেই এরূপ চিত্র পরিলক্ষিত হয়।

ফলে এই বর-পণ ও যৌতুকের কসুনীতে যে দরিদ্রতার মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, আমরা তাহা বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। এরূপ আত্মবঞ্চনা শিক্ষিত-সমাজে প্রশ্রয় পাওয়া কদাচ অনুমোদনীয় বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

অদ্ভুত হিতৈষণা!

সমাজে যখনই কোন একটা বিপ্লব উপস্থিত হয়, তখনই দেশে বিপ্লবানুযায়ী একটা হিতৈষণার সৃষ্টি হয়। আজকাল বরপণ ও যৌতুকের অযথা বাহুল্যে সমাজে কন্যাদায়গ্রস্ত লোকের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে, সুতরাং ইহাদিগকে দায়-মুক্ত করিবার উদ্দেশ্য মুখে করিয়া একদল দেশ-হিতৈষী আবির্ভূত হইয়াছেন! ইহাদের কেহ বা 'উদ্বাহ-সমবায়' কেহ বা 'ম্যারেজলীগ' কেহ বা 'প্রজাপতি সমিতি' নাম দিয়া এক একটী আপীশ খুলিয়াছেন! ইহাদের কার্য্য হইতেছে—সাধারণকে বর ও ক'নের সন্ধান দেওয়া। এই সন্ধান লইতে হইলে ১৲ টাকা সেলামী দিতে হয়। সেলামী প্রদানান্তর, যাহার যাহা আবশ্যক, বর ও ক'নের নাম ও ঠিকানা পাওয়া যায়। নাম-ঠিকানা অনুযায়ী তোমরা চিঠি লিখিয়া অথবা লোক পাঠাইয়া স্থির করিয়া লও, ইহাই হইতেছে এই সকল আপীশওয়ালাদের কার্য্যপ্রণালী। ইহা ছাড়া আরও একটুকু আছে, তাহা পরে বলিতেছি। সহর কলিকাতার ৬৩ নং নিমতলা ষ্ট্রীটে

"প্রজাপতি সমিতি"

নামক এইরূপ একটি জন-হিতসাধিনী (?) কার্য্যালয় আছে বলিয়া 'বেঙ্গলীপত্রে' বিজ্ঞাপনে দেখিতে পাওয়া যায়! বেঙ্গলী সম্পাদক দেশমান্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সভাপতি, এবং শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার নামক একটী যুবক ইহার সম্পাদক। শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার জাতিতে সদ্‌গোপ। জাতিতে সদ্‌গোপ হইলেও ছেলেটী খুব চতুর। চক্ষে চস্‌মা আছে, দেখ্‌তে শুন্‌তেও মন্দ নয়, দিন রাত্রি খুব ঘুরিয়া বেড়ায়। এই 'প্রজাপতি-সমিতি'র আবার ২।৩টী শাখা আছে, তাহার একটী বহুবাজার 'আয়ুর্ব্বেদবিস্তার সমিতি' নামক একটী কবিরাজী দাওয়াইখানায়, একটী আছে শিবপুরে। ভবানীপুরে একটী আছে বলিয়া শুনিয়াছি, এরূপ মনে পড়ে।

নিমতলা ষ্ট্রীটের ৬৩ নং বাটীতে একটী ছোট-খাট ছাপাখানা আছে, ইহার নাম 'প্রজাপতি প্রেস'। প্রেসটী সমিতির, কি শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথের, তাহা প্রকাশ নাই; তবে নামটী দেখিয়া লোকে মনে করিতেছে উহা সমিতিরই সম্পত্তি। এই প্রেস হইতে 'প্রজাপতি' নামক একখানি ক্ষুদ্র মাসিক-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বেঙ্গলী পত্রে এই পুস্তিকার প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা প্রকাশ হইতে দেখিলেও, আমরা যে সময়ে সময়ে দুই এক খণ্ড পাইয়া থাকি, তাহাতে প্রশংসার যোগ্য কিছু দেখিতে পাই না। পাত্র-পাত্রীর সংবাদ উহাতে যাহা প্রকাশিত তাহাও রহস্যজনক! তাহাতে নাম ঠিকানা প্রায়ই থাকে না, কেবল ব্রাহ্মণ 'পাত্র-পাত্রী,' 'বৈদ্য পাত্র-পাত্রী,' সদ্‌গোপ পাত্র-পাত্রী কায়স্থ পাত্র-পাত্রী, ইত্যাকার নাম এবং গোত্রের উল্লেখ থাকে। ফলে ঐ বিবরণী দেখিয়া কোনরূপ খোঁজ খবর লইবার উপায় নাই; উহাদের কার্য্যালয়ে গেলে হয়ত একটা ঠিকানার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। বেঙ্গলীপত্রে যেসকল বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, তাহাতে দেখা যায় যে, আবেদন করিলে সমিতি Bona fide ঘটক পাঠাইয়া থাকেন। ঘটক-সেলামী শতকরা ২৲ টাকা মাত্র! এই শতকরা হিসাবটা অবশ্যই বর-পণের উপরেই ধার্য্য হইবে, নতুবা আর কিছু ধরিতে পাওয়া যায় কই? এরূপ "কমিশন এজেণ্ট" দ্বারা সম্বন্ধ স্থির করিতে হইলে কমিশন এজেণ্টের দৃষ্টিটা বরকর্ত্তার দিকে থাকিবে কি কন্যাকর্ত্তার দিকে থাকিবে, বুঝিয়া লওয়া বেশী শক্ত কথা নহে। অতএব জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, এহেন সমিতি দ্বারা দুস্থ সমাজের কোন্ উপকার সাধিত হইতেছে, অথবা হইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে?

কিছুদিন পূর্ব্বে কাশীমবাজারে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের নেতৃত্বে প্রজাপতি সমিতির এক অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে

কলিকাতা হইতে অনেক গণ্যমান্য লোক যোগদান করিয়াছিলেন। আমরা সে সভায় উপস্থিত না থাকিলেও, সংবাদপত্রে তাহার যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে বুঝিয়াছিলাম ইহা বর-পণ প্রথা নিবারণের অনুকূল। যেসকল বক্তৃতা হইয়াছিল, তাহার সার মর্ম্মও তা-ই। নাম ঠিকানা যোগাইয়া, অথবা ঘটক পাঠাইয়া সম্বন্ধ স্থির করিয়া শতকড়া ২৲ টাকা হিসাবে ঘটকালী লওয়া হইবে, এরূপ আভাস ঘুণাক্ষরেও ছিল না, থাকাও অসম্ভব! কারণ; তাহা হইলে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, সেরপুরের জমীদার গোপালদাস চৌধুরী, নারাজোলের রাজা প্রমুখ মনস্বীগণের নাম ইহার সহিত কখনও সংসৃষ্ট থাকিতে পারিত না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম সভাপতিরূপে এই সমিতির সংসৃষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়! তাঁহার ন্যায় একজন পদস্থব্যক্তি এরূপ একটা ঘটকালী সমিতির সভাপতি হইবেন, ইহা বিশ্বাস করিতেও লজ্জা বোধ হয়!

এতদ্ভিন্ন আরও একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কাশীমরাজাধিপতি, নারাজোলের রাজা, আমাদের বৈদ্য জমীদার শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী এম, এ প্রমুখ মহোদয়গণ মোটা মোটা টাকা, এককালীন দান করিয়া ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন! ইঁহারা কি বুঝিয়া, কি উদ্দেশ্যে যে এই খয়রাৎ করিতেছেন, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। অনেকেরই ধারণা এই যে, 'প্রজাপতি সমিতি' বর-পণ প্রথা রহিত করিবার উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা এই সমিতিতে এককালীন মোটা মোটা টাকা উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারাও এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া দান করিয়াছেন, ঘটকালী করিয়া অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে দান করেন নাই। তাঁহাদের প্রদত্ত এই অর্থের সদ্ব্যবহার হইতেছে কিনা, সম্ভবতঃ তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার অবকাশ তাঁহাদের নাই,—অথবা তাঁহারা তাহা ইচ্ছাও করেন না। কিন্তু ইহাতে সমাজের ইষ্টের পরিবর্ত্তে কোনরূপ অনিষ্ট হইতেছে কি না, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করা জনসাধারণের একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

দেশের রাজা জমীদার মহাশয়েরা অর্থ সাহায্য করিয়া যদি এরূপ সমিতির অস্তিত্ব বজায় রাখেন, আর সেই সমিতির কার্য্যকলাপে যদি বরপণ প্রথা আরও প্রশ্রয় পায়, তাহা হইলে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সমিতির দ্বারা সমাজের ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে। প্রজাপতি সমিতিতে যাঁহারা এইরূপ অর্থপ্রদান করিতেছেন,—সত্যসত্যই যদি এরূপ একটা Bona fide সমিতির অস্তিত্ব থাকে,—তাহা হইলে এইসকল দানপ্রাপ্ত অর্থ দ্বারা দেশে দেশে লোক পাঠাইয়া বরপণ প্রথা রহিত সম্বন্ধে আন্দোলন করাই সমিতির উচিত। সান্ধ্যসমিতি করিয়া কতকগুলি সম্ভ্রান্তলোককে একত্রিত করত মাষ্টারমদনের গান, চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর কৌতুকাভিনয় করিয়া সমাজের কোন উপকার হইতেছে না; বরং এসকল সান্ধ্যসমিতির ঘটায় ধনাঢ্য দিগকে গ্রেপ্তার করিবার সুবিধা হইতেছে মাত্র!

যাহা হউক, এই 'প্রজাপতিসমিতি' সম্বন্ধে জনসাধারণের জানিবার ও বলিবার অনেক কথা আছে। আমদের বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সমিতির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন। আমরা যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে অনুমান হইতেছে,—'প্রজাপতি সমিতি' অর্থে শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার!

সদাচার।

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন বি, এল,।]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

উদ্ধৃত আখ্যায়িকাটী আমাদের বিশদভাবে কামের শক্তি দেখাইয়াছিল। আমরা দেখিলাম, প্রাকৃত ব্যক্তির ত কথাই নাই, কৃতবিদ্য ও সংযতেন্দ্রিয় নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক ব্রহ্মচারীও কামের মোহজালে পড়িয়া ধ্বংস হইলেন! তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই যে, সামান্য প্রাসাদ-দর্শনোৎসুক্য হইতে তাঁহার এত ভয়ানক সর্ব্বনাশ হইবে। কামে প্রচ্ছন্নপ্রভাবে তাঁহার বিচারশক্তি এতদূর অভিভূত হইল যে, তিনি বিবেচনা করিলেন না যে, পুরাকালে ঋষিগণ কখন অসংস্কৃত ও অতি মাত্রায় সুরা সেবন করিতেন না। তিনি জানিয়াও মানিলেন না যে, দ্বিজাতিত্রয়ের পক্ষে সুরাপান একেবারেই নিষিদ্ধ! ধর্ম্মার্থে ত দূরের কথা, ভ্রান্তিক্রমেও ইহা পীত হইলে তাঁহাদের মহাপাতক হয়। তিনি বিস্মৃত হইলেন যে, তন্ত্রে বেদস্মৃতি ও পুরাণ বিরুদ্ধ কোন ব্যবস্থা নাই। সকল শাস্ত্রেই বিভিন্ন অধিকারীর জন্য বিভিন্ন বিধান থাকে, তন্ত্রেও সেইরূপ আছে, তন্ত্রের শোধিত সুরাপানের ব্যবস্থা কেবল অদ্বিজ তামসিক সুরাপানরত নীচব্যক্তিগণের জন্যই বিহিত হইয়াছে, তাঁহার ন্যায় দ্বিজ, বিশেষতঃ সাত্ত্বিক প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্রহ্মচারী বিপ্রের জন্য হয় নাই। কামে তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ হইল, তিনি সুরার বিষম অপকারিতা জানিয়াও সুরাপানপোষক বিধানগুলি সংগ্রহপূর্ব্বক মনকে প্রবোধ দিলেন, ও উহা পানের উপকারিতা সাব্যস্ত করিলেন। কামের রীতিই এইপ্রকার যে, সে যাহাকে মুগ্ধ করে, সে স্বকীয় জনকে সান্ত্বনা করিয়া প্রবৃত্তির প্রতিকূল যুক্তি ত্যাগ করে, এবং অনুকূল যুক্তি সকল সংগ্রহ বা উদ্ভাবনপূর্ব্বক কৃতদুষ্কার্য্যের অনুমোদন করে। কামেন্দ্রিয়গণ দ্বারা সেবিত ও বিষয়ভোগাচারী পরিপুষ্ট হয়। ইহা অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে ও ধীরে আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। সূচ্যগ্রের ন্যায় প্রবেশ পূর্ব্বক বৃহৎ ফালের ন্যায় আমাদিগকে বিদীর্ণ করে। প্রগ্রহ একবার ঈষৎ বিমুক্ত হইলেই কামরূপ অশ্ব-অবশীভূত হয়, এবং অতিশয় প্রাজ্ঞ আরোহীও বিষম বিপন্ন হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এই আরোহী বিপদকেই মঙ্গল বলিয়া বিবেচনা করেন! অতএব জ্ঞান হরণকারী কামই মানবের পরম বৈরী। কামকে দমন না করিতে পারিলে মানুষের দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণের আর অন্য আশা নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন ঃ—

> আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণঃ।
> কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥ ৩৯
> ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধি রস্যাধিষ্ঠান মুচ্যতে।
> এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥ ৪০
> তামাত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
> পাপ্যানং প্রজহিহ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞান নাশনম্॥ ৪১
>
> গীঃ ৩ অঃ।

"হে কৌন্তেয় জ্ঞানীর চিরশত্রু এই কামরূপ অপূরণীয় অগ্নিদ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন আছে। দশেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই কামের অধিষ্ঠান স্থান। সে ইহাদের দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহী জীবকে বিমোহিত করে। অতএব হে ভরতর্ষভ! তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞান নাশক পাপরূপ কামকে জয় কর।"

ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন কামনা জয় ভিন্ন সিদ্ধির অর্থাৎ শান্তি বা মুক্তির আশা সুদূর পরাহত।

> বেদস্ত্যাগশ্চ যজ্ঞাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসি চ।
> ন বিপ্রদুষ্টভাবস্য সিদ্ধিং গচ্ছতি কর্হিচিৎ॥
>
> মনু, ২।৯৭

"বেদ বল, দান বল, যজ্ঞ নিয়ম তপস্যাদিও যে

কোন পুণ্য বা ধর্ম্ম সাধনবল, এসকল বিপ্র দুষ্টভাবাপন্ন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়লোলুপ ব্যক্তিকে কখনই সিদ্ধি প্রদানে সমর্থ হয় না।"

কামনায় সকল ধর্ম্মকর্ম্মই ব্যর্থ হয়, কামনা ত্যাগেই শান্তিপ্রাপ্ত হওয়া যায়।

বিহায় কামান্ যঃ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥
গীঃ ২।৭১।

"যিনি কাম্যবস্তু উপেক্ষা করিয়া নিঃস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দাত্মক) ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে মমতাশূন্য হইয়া বিচরণ করেন তিনিই শান্তি পান।"

প্রশ্ন হইতে পারে, কামনাত্যাগীর কিরূপে কর্ম্ম হইতে পারে। শাস্ত্রেই স্বীকার করে যে প্রবৃত্তি না থাকিলে কার্য্য হয় না। যথাঃ—

অকাম্যস্য ক্রিয়া কাচিদ্দৃশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ।
যদ্যদ্ধিকুরুতে কিঞ্চিৎ তত্তৎ কাম্যস্যচেষ্টিতম্॥
মনু ২।২৪।

"ইহ সংসারে অকামী বা প্রবৃত্তিহীন ব্যক্তির কোন কার্য্যই দেখা যায় না; লোকে যেসকল কর্ম্ম করে তৎসমস্তই প্রবৃত্তি প্রেরিত হইয়া করিয়া থাকে।" তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, কামনা ত্যাগ কর্ম্ম প্রবৃত্তিহীনতা বুঝায় না, কাম্য কর্ম্ম ত্যাগ বা সর্ব্বকর্ম্ম ফলত্যাগকেই বুঝায়। পরন্তু কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ ত্যাগই নহে।

কাম্যানাং কর্ম্মণাংন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়োবিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্ম ফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥
গী ১৮।২

"পণ্ডিতগণের কেহ কেহ সমুদায় কার্য্যকর্ম্মের ত্যাগকে সন্ন্যাস বলেন বটে। পরন্তু তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বিচক্ষণ, তাঁহারা সমুদায় অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের ফলত্যাগকেই ত্যাগ বলিয়া থাকেন, বস্তুতঃ সমুদায় কাম্যকর্ম্মের ত্যাগকে তাঁহারা ত্যাগ বলিয়া স্বীকার করেন না।"

ভগবান্ মনুও এই মত পোষণ করেন যথা—

তেষু সম্যগ্বর্ত্তমানো গচ্ছত্যমরলোকতাম্।
যথা সঙ্কল্পিতাংশ্চেহ সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে॥
মনু ২।৫।

"লোকে কামনা অর্থাৎ প্রবৃত্তি প্রেরিত হইয়া কর্ম্ম করে বটে, কিন্তু বন্ধহেতু ফলাভিলাষ ব্যতীত যদি শাস্ত্রোক্ত বিধানানুযায়ী কর্ম্মসকল ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে কৃত হয় তাহা হইলে ইহলোকে সমুদায় কাম্যবিষয় উপভোগ করিয়াও মুক্তিলাভ করা যায়।"

যাহা অসম্ভব, শাস্ত্র তাহা কখনই উপদেশ দিতে পারেন না। প্রবৃত্তিহীন কর্ম্ম অসম্ভব। শাস্ত্র যখন নিষ্কাম কর্ম্ম উপদেশে দিতেছেন, তখন ইহা স্থির বুঝিতে হইবে যে, শাস্ত্র কর্ম্ম প্রবৃত্তিহীনতার কথা নিশ্চিতই বলেন নাই। অতএব কামনা ত্যাগের অর্থই ফলাভিলাষ ত্যাগ। ফলাভিলাষই আসক্তির মূল। আসক্তি একটি শারীরিক আকর্ষণ মাত্র। মানব এই শারীরিক আকর্ষণে বদ্ধ হয়। ফলাভিলাষে কর্ম্ম করাও যেমন দোষের মূল, পাছে কর্ম্ম করিলে বদ্ধ হইয়া পড়িতে হয় এই ভয়ে কর্ম্মের অকরণও তুল্য দোষের আকর। উভয়ই ফলাভিলাষ, উভয়ই শারীরিক আকর্ষণ, উভয়ই আসক্তির হেতু, উভয়ই তুল্যভাবে পরিত্যজ্য। শাস্ত্র বলিতেছেন, কর্ম্ম করিবেনা কেন, কর্ম্ম না করিয়া মানুষ তিলার্দ্ধও জীবিত থাকিতে পারে না, সুতরাং প্রবৃত্তিপূর্ব্বক সন্তুষ্টচিত্তে কর্ম্ম কর। কিন্তু কোন ফলাভিলাষ করিও না নতুবা বন্ধনপ্রাপ্ত হইবে।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মাতে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥
গী ২।৪৭।

"কর্ম্মেই তোমার অধিকার থাকুক, পরন্তু আসক্ত বা বন্ধের হেতু যে কর্ম্মফল তাহাতে যেন তোমার কদাচ অধিকার না থাকে। কর্ম্মফলই যাহাদের কর্ম্মের হেতু, তুমি তাহাদের ন্যায় হইও

না। এবং কর্ম্মফল বন্ধের কারণ হইবে বলিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যেন তোমার আসক্তি না হয়।"

কর্ম্মে মানবের সম্পূর্ণ অধিকার, সুতরাং মানবের কর্ম্ম করণই ধর্ম্ম। যাহা ধর্ম্মসঙ্গত তাহা প্রবৃত্তিপূর্ব্বক কর্ত্তব্যজ্ঞানে ও সন্তুষ্টচিত্তে সুসম্পাদন করিতে হইবে। এরূপ কর্ম্মের বন্ধন হইতেই পারে না। শাস্ত্র বলিতেছেন, অনবরত কর্ম্ম কর কর্ম্ম করাই ধর্ম্ম, তবে ফলের আশায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত বা অপ্রবৃত্ত হইও না। ফলাকাঙ্খাই বন্ধন-কারণ। যেহেতু উহাতে আসক্তি জন্মে। অবশ্য প্রবৃত্তির বা অপ্রবৃত্তির পশ্চাতে উদ্দেশ্য লুক্কায়িত থাকে। উদ্দেশ্যহীন কর্ম্ম অনেক সময়েই সম্ভবপর নহে। শাস্ত্র এরূপ উদ্দেশ্য মাত্রকেই বাধা দিতেছেন না। শাস্ত্র এই বলিতেছেন যে,—কর্ম্ম কর, সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া কর, কিন্তু তোমার যেন তাহাতে আশক্তি না হয়। কর্ম্মে তোমার অধিকার আছে, ফলে তোমার অধিকার নাই। কর্ত্তব্যকর্ম্মে তোমার যে ফল হয়, হউক; সিদ্ধিই হউক বা অসিসিদ্ধিই হউক, লাভই হউক বা অলাভই হউক, সুখই হউক বা দুঃখই হউক তাহা তোমার দেখিবার প্রয়োজন নাই। ফল বিষয়ে তুমি সমভাব ধারণ কর, অর্থাৎ তোমার মন হর্ষান্বিত দ্বেষান্বিত বা কোনরূপ বিচলিত না হয়। এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তোমাকে কোনপ্রকারে পাপস্পর্শ করিতে পারিবে না।

সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবংপাপ মবাপ্স্যসি॥
গীঃ ২।৩৮।

"সুখ দুঃখ লাভালাভ এবং জয় পরাজয়ে তুল্য জ্ঞান করিয়া কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মযুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হও, তাহা হইলে পাপপ্রাপ্ত হইবে না।"

হে জীব! যাহাতে তোমার অধিকার নাই তাহা তোমার নহে, তাহা পরের দ্রব্য। অতএব তাহা তোমার চর্চ্চার বিষয়ীভূত হইতে পারে না। পর চর্চ্চা এবং পরবিষয়ে নিন্দাই আসক্তি; ইহাই দোষ বা পাপ। যদি তোমার কর্ম্মের উদ্দেশ্য সাধু হয়, অর্থাৎ জগতের হিতের জন্য হয়, নিজ স্বার্থসাধন জন্য না হয়, তাহা হইলে তোমার কর্ম্ম ভগবদুদ্দেশেই কৃত হইবে, যেহেতু এই বিশ্ব তিনি ভিন্ন অপর কেহ নহে :—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রেমণিগণাইব।
গীঃ ৭।৭।

ময়াতত মিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা।
গীঃ ৯।৪।

"হে ধনঞ্জয় আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; মণিমাল্যের মণিগণ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে, সেইরূপ আমার এই প্রকটমূর্ত্তি জগৎ আমাতেই গাঁথা আছে।"

"অব্যক্তরূপী আমি এই সমুদায় জগৎ ব্যাপিয়া আছি।" যদি কিছু শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে জগদ্ধিত বিশ্বপ্রাণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে সমর্পণ করিও। যাঁহার ফল তাঁহাকেই দিও, নিজে ভোগার্থী হইও না, তোমার সর্ব্বকর্ম্মই ভগবৎ প্রীতিসাধনে কৃত হউক। যে কার্য্য তুমি নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কর না, তাহাতে তোমার কামজা আসক্তির সম্ভাবনা নাই। অতএব তুমি সকল কর্ম্মই শ্রীবিষ্ণুর প্রীতিকাম কর, তাহা হইলে তোমার কোন আসক্তি হইবে না পরন্ত পুরষ্কার স্বরূপ জীবন্মুক্ত হইবে।

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসিযৎ।
যৎতপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥
শুভাশুভ ফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তোমা মুপৈষ্যসি॥
গীঃ ৯।২৭-২৮।

"হে কৌন্তেয়! যাহা কিছু কর, যাহা কিছু খাও, যাহা কিছু হবণ কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎসমস্তই আমাতে অর্থাৎ বিশ্বরূপ নারায়ণে বা পরমাত্মাতে অর্পণ কর। তাহা হইলে তুমি কর্ম্মজনিত শুভাশুভ ফলের

আসক্তি হইতে মুক্ত হইবে ; পরে সংন্যাস যোগ-দ্বারা যুক্তাত্মা হইয়া (অর্থাৎ আমাতে যোগদ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক যুক্তচিত্ত হইয়া) তুমি আমাকে পাইবে।"

যাহা কিছু কার্য্য তাহা নিত্য নহে। জগৎ প্রকৃতির কার্য্য, সুতরাং জাগতিক সমস্ত ব্যাপারই অনিত্য ; তাহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, অতএব তাহাতে আনন্দ নাই, যেহেতু ব্রহ্মই আনন্দ—"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতিঃ—জগতে আনন্দ থাকিতে পারে না—"অনিত্যমসুখং লোকমিমং।" গীঃ ৯।৩৩।

আমরা যেসকল ইন্দ্রিয়ভোগ্য সুখের জন্য আসক্ত হই, তাহারা আমাদের ইন্দ্রিয়দান করিয়া কষ্টই দেয়—

যে হিসংস্পর্শজাভোগা দুঃখযোনয়এবতে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥
গীঃ ৫।২২।

"ইন্দ্রিয় ও বিষয় সংস্পর্শজনিত যেসকল সুখ তাহারা প্রকৃতই দুঃখের নিদান ; যেহেতু তাহারা অনিত্য। জ্ঞানীব্যক্তি এইরূপ (জন্মজন্মান্তর প্রাপক আমাদের বন্ধনকারক) মিথ্যা সুখ যাহার অর্জ্জনে দুঃখ, যাহার সংরক্ষণে দুঃখ, ও যাহার পরিনামে দুঃখ) তাহার জন্য প্রয়াসী হয় না।"

আসক্তি হীন হইলেই মানব মুক্ত শিব। আসক্তির বশীভূত হইলেই মানব বদ্ধজীব। ইন্দ্রিয়াশক্তি জীবকে অজ্ঞানতা প্রযুক্ত প্রকৃতির অধীন করিয়া তুলে। হে মানব! তুমি ভুলিওনা, তুমি প্রকৃতি নহ, তুমি পুরুষ। প্রকৃতি তোমা হইতে ভিন্ন। তুমি পরের অধীন হইও না ; নচেৎ দুঃখ পাইবে। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং। মহাভারত।

"যাহা কিছু পরবশ তাহাই দুঃখময়।"

তুমি পুরুষ হইয়াও মোহান্ধপ্রযুক্ত প্রকৃতির দাসত্ব কর বলিয়াই তোমার কষ্ট ; যেহেতু পুরুষ অধিকারী ও নির্গুণঃ—

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃত সম্ভবান্॥
কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতি রুচ্যতে।
পুরুষং সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্‌যোনি জন্মসু॥
উপদ্রষ্টানুমন্তাচ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥
গীঃ ত্র৩।১৯-২২।

"প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই অনাদি জানিবে। প্রকৃতি হইতে (সত্ব রজ ও তম এই) তিন গুণ এবং তাহাদের বিকার (হইতে যথাক্রমে চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশেন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্র যথা— রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এবং পঞ্চমহাভূত (যদ্দ্বারা ভূতদেহ সকল গঠিত হইয়া থাকে) ইহারা উৎপন্ন হইয়াছে। কার্য্য (অর্থাৎ শরীর) কারণ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ) এবং কর্তৃত্ব (অর্থাৎ অধিষ্ঠিত দেবতাবর্গ) এসকলের তত্তদ্ভাব প্রাপ্তি বিষয়ে প্রকৃতিই হেতু (কেন না কুটস্থ আত্মার বিকার নাই) কিন্তু সুখ দুঃখের ভোক্তৃত্ব সম্বন্ধে (প্রকৃতি হইতে ভিন্ন যে) পুরুষ তাঁহাকেই কারণ বলিয়া থাকে। (অর্থাৎ যদিও কার্য্যাদি এবং ভোক্তৃত্ব উভয়ই অহঙ্কার কৃত হউক, তথাপি কার্য্যাদি মাত্রেই জড়াবসান ; এই কারণে তাহাতে প্রকৃতির প্রাধান্য। পরন্তু ভোগ জ্ঞানাবসান প্রযুক্ত তাহাতে প্রকৃতি উপস্থিত চৈতন্যের প্রাধান্য যেহেতু পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া (অজ্ঞান আবরণ জন্য প্রকৃতি সহৈকতা প্রযুক্ত) গুণসকল ভোগ করেন ; কিন্তু সেই পুরুষের সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্ম, তদ্বিষয়ে সত্ব রজ তম এই গুণত্রয়ের সঙ্গই উহার কারণ। এই প্রকৃতি কার্য্যস্বরূপ দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও পুরুষ প্রকৃতিজ দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন নির্লিপ্ত বা সঙ্গরহিত অর্থাৎ প্রকৃতির গুণযুক্ত নহেন ; যেহেতু তিনি উপদ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষিমাত্র (তাঁহার সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি চেতিতা

হইয়া উঠে সেই জন্য) তিনি অনুমন্তা অর্থাৎ অনুগ্রাহক মাত্র (তাঁহারই বীজ হইতে প্রকৃষ্ট এই বিশ্বকে গর্ভে ধারণ করিতে সমর্থ। হয় সেইজন্য) তিনি ভর্ত্তা (তাঁহারই শক্তিতে এই সৃষ্ট বিশ্বকে প্রকৃতি প্রতিপালক করিতে সমর্থা হয় সেইজন্য) তিনি ভোক্তা বা প্রতিপালক (এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যান্বিতা হয় বলিয়া) তিনি মহেশ্বর (এবং তিনি প্রকৃত সৃষ্ট সর্ব্বভূতে আত্মা স্বরূপে বিরাজিত বলিয়া) তিনি পরমাত্মা অভিহিত হন।"

হে মানব তুমি ত কার্য্য কর না, কার্য্য প্রকৃতিই করে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥
গীঃ ৩২৭,

এই অজ্ঞানতা ভ্রমেই মানব মুগ্ধ হয়ঃ—

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতিপ্রভু।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ত্ততে॥
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥
গীঃ ৫।১৪-১৫

ঈশ্বর জীবের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল সংযোগ সৃষ্টি করেন নাই। জৈবী প্রকৃতিই আপনা আপনি কর্ত্তৃত্বাদিরূপে প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ জীব কোন কর্ম্ম করে না, জীবের কোন কর্ম্ম নাই ও সে কর্ম্মফল ও প্রকৃতপক্ষে ভোগ করে না, প্রকৃতিই কর্ত্রী প্রকৃতই কর্ম্ম ও প্রকৃতিই ফলভোগ করে। অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর কাহারও পাপগ্রহণ করেন না, পুণ্যও গ্রহণ করেন না, (যেহেতু পাপ ও পুণ্য কর্ম্মের ফলের সহিত জীবাত্মার সংযোগ নাই সেই জন্য তাহার পাপ পুণ্যই নাই। তবে পরমেশ্বর পাপ পুণ্য গ্রহণ করিবেন কিরূপে ? আমরাই পরমেশ্বর) অজ্ঞান রূপ আবরণে (মানবের) আত্মজ্ঞান আচ্ছন্ন আছে বলিয়া সে জানিতে পারে না যে সে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন সে এই অজ্ঞানের দ্বারা আপনাকে দেহেন্দ্রিয় বিশিষ্ট স্বতন্ত্র জীব ভাবিয়া মুগ্ধ হয়, দেহেন্দ্রিয়াদিতে অহং মমত্ব বুদ্ধিই তাহার মোহ।

জীবের আত্মাই জীব, তাহার দেহেন্দ্রিয় জীব নহে ; জীব শরীর রূপ রথের রথী মাত্র। রথ ও সারথি অশ্ব প্রভৃতি রক্ষীর বশীভূত হইলে তিনি গন্তব্য আনন্দধামে যাইতে পারেন, নচেৎ তাঁহাকে দুঃখভোগ করিতে হয়।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথ মেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ান্যাহু বিষয়াং স্তেষ গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয় মনো যুক্তং ভোক্তে ব্যাহু মনীষিণঃ॥
যস্তবিজ্ঞানবান্ ভবত্য যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥
যস্ত বিজ্ঞানবান ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়ানি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥
যস্ত বিজ্ঞানবান ভবত্যমনস্ক সদাশুচিঃ।
ন স তং পদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি॥
যস্ত বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচি।
সতু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ ভূয়ো ন জায়তে॥
বিজ্ঞান সারথি র্যস্ত মনঃ প্রগ্রহবান।
সোহিনঃ পরমাপ্নোতি তদ্বিজ্ঞেঃ পরমং পদম্॥
কঠোপনিষৎ—৩য় বল্লীতী—৩

শরীরকে রথস্বরূপ জানিবে, আত্মাকে সেই রথের অধিষ্ঠাতা রথী, বুদ্ধিকে তাহার সারথি, এবং মনকে তাহার লাগাম, বলিয়া জানিবে। মনীষিগণ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহকে শরীর রূপ রথের চালক অশ্বস্বরূপ এবং শব্দাদি (স্থূল ও সূক্ষ্ম) বিষয় সমূহকে সেই ইন্দ্রিয়গণের বিচরণ পথ বলিয়া থাকেন এবং শরীর ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত আত্মাকে সুখদুঃখাদির ভোক্তা বা অনুভবিতা বলিয়া থাকেন। যে বুদ্ধিরূপ সারথি সর্ব্বদা অসংযত মনের সহিত সম্বন্ধ, তাহার ইন্দ্রিয় সমূহ বশীভূত থাকে না। কিন্তু যাঁহার বুদ্ধি সর্ব্বদা সংযত মনের দ্বারা বিজ্ঞানবান্ হয়, অর্থাৎ কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের বা গ্রাহ্য ও ত্যাগের প্রভেদ বুঝেন, সারথির সদশ্ব অর্থাৎ

শিক্ষিত অশ্বগণের ন্যায় তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ আত্ম বশীভূত থাকে।

"কর্ম্ম সকল প্রকৃতির সত্ত্ব রজ তম এই গুণত্রয় কর্তৃক অর্থাৎ তাহাদের বিকার দেহেন্দ্রিয়াদির দ্বারা কৃত হয়, কোন অহঙ্কার বিমূঢ় ব্যক্তি অজ্ঞান-বশতঃ "আমি কর্ত্তা" মনে করে। (ক্রমশঃ)

বৈদ্যাভ্যুদয় দুন্দুভিঃ।

[বাঁকুড়ান্তর্বর্ত্তি বিষ্ণুপুরবাস্তব্য-বৈদ্য শ্রীভোলানাথ দাশ শর্ম্মণা।]

"ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥"

গীতা।

যথাবিধি ব্রাহ্মণতোঽভবন্নমী
বিশঃ সুতায়ামিতি মন্বনুজ্ঞয়া।
দ্বিজন্মনামেব সমানজাতয়ো
জয়ন্তি বৈদ্যা অনবদ্যবৃত্তয়ঃ॥ ১

মাতা হি ভস্ত্রা, পিতুরেব পুত্রো
যেনৈব জাতঃ স সুতঃ স এব।
অসূয়য়া হন্ত তথাপি কেচিদ্
দ্বিজা দ্বিজাম্বষ্ঠমপি দ্বিষন্তি !! ২

চিকিৎসয়াম্বষ্ঠগণস্য বৈদ্যতা
ন জাতু জাত্যা স পৃথগ্ দ্বিজন্মনঃ।
তমুত্তমং ব্রাহ্মণকো ন কো দ্বিষন্
কঠোরমাহন্তি কুঠারমাত্মনি ?? ৩

সদা সদাচারপরায়ণত্বাদ্
অনন্যসামান্যগুণান্বিতত্বাৎ।
প্রাণপ্রদত্বাৎ প্রতিভাকরত্বাদ্
বরং বরো ব্রাহ্মণতোঽপি বৈদ্যঃ॥ ৪

ভাতি প্রকৃত্যৈব কবিত্বযুক্তঃ
কবির্যশো রাজবদিত্যুদারঃ।
বর্ত্ততি সর্ব্বোপরি বৈদ্যলোকে
লোকেঽত্র রূঢ়ঃ কবিরাজশব্দঃ॥ ৫

অহো জগত্যামগদো জনেন
ন কেন শক্যঃ সগদেন জেতুম্ ?
একেন বৈদ্যেন বিনা তু কেন
শক্যেত জেতুং সগদোঽগদেন ?? ৬

অলং যদীহ স্যুরদীর্ঘদৃষ্টয়ো
বৈদ্যদ্বিপা বেদিতুমাত্মগৌরবম্।
তদ্ব্রাহ্মণোদ্ঘোরণঘোরশাসনং
চিরং সহেরন্ কিমসী সুনীরবম্ ?? ৭

তদস্য বৈদ্যা হত দীর্ঘতন্দ্রতাম্,
ইত স্বরূপং, স্মরত স্বগৌরবম্।
ইতীব বৈদ্যাভ্যুদয়ায় দুন্দুভি-
র্নিনাদ্যতে বৈদ্যজনেন কেনচিৎ॥ ৮

গৈলা কবীন্দ্রকলেজে ডিরেক্টর সাহেব।

গত ১৬ই নবেম্বর তারিখে বঙ্গের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মাননীয় মিঃ হর্নেল বাহাদুর বরিশাল জেলার অন্তর্গত বৈদ্যপ্রধান স্থান গৈলা গ্রামের কবীন্দ্রকলেজ নামক সংস্কৃতকলেজ পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এই কলেজ ১৩০ বৎসর যাবৎ স্থাপিত হইয়াছে, এবং বৈদ্য অধ্যাপক দ্বারাই ইহার কার্য্য পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। এই কলেজ নিখিল-বঙ্গের বৈদ্যজাতির গৌরব-চিহ্ন।

কলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

গত ১১৯০ বঙ্গাব্দে গৈলা গ্রাম নিবাসী পণ্ডিত রাজকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার নিজ বাটীতে একটী সংস্কৃত টোল প্রতিষ্ঠিত করেন। তদীয় পুত্র স্বর্গীয় পণ্ডিত মদনকৃষ্ণ কবীন্দ্র মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ইহা দিন দিন উন্নত হইতে থাকে। কবীন্দ্র মহাশয় একজন অসাধারণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, এবং তাৎকালীক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের মধ্যে প্রধান অগ্রণী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সেই সময়কার কবিরাজবর্গের প্রায় অধিকাংশই তাঁহার নিজের অথবা তাঁহার ছাত্রের ছাত্র ছিলেন। তৎকালে এই টোলে আয়ুর্ব্বেদ, ব্যাকরণ, কাব্য এবং দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। ইঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পৌত্র অসাধারণ মনীষ-সম্পন্ন পরমপ্রাজ্ঞ কবিরাজ পণ্ডিত চন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত কবিভূষণ এই টোলের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন। কিন্তু আর্থিক অবস্থার শোচনীয়তা নিবন্ধন দীর্ঘকাল ইহার ভার রক্ষণে অসমর্থ হইয়া তিনি স্বাধীন-ত্রিপুরা রাজের পারিবারিক চিকিৎসক এবং দ্বারপণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার অনুজ স্বর্গীয় পণ্ডিত তারাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত কবিভূষণ টোলের ভার গ্রহণ করেন। গত ১২৯৪ সালে তিনি লোকান্তরিত হইলে তদনুজ পণ্ডিত সন্ন দাসগুপ্ত অধ্যক্ষতা গ্রহণ এবং অদ্যাপি তিনি উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। গত ১৩০২ সাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বের ব্যবস্থানুসারেই কলেজের কার্য্য চলিতেছিল। কিন্তু উক্ত গ্রামবাসী, রাজসাহী বিভাগের ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইন্স্পেক্টর পরলোক গত বাবু বিশ্বেশ্বর সেন এম, এ, এবং গ্রামস্থ সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তিবর্গের প্রস্তাবে ইহা প্রকৃত সংস্কৃত কলেজে পরিণত হয়। এই সময় হইতেই পণ্ডিত চন্দ্রকুমার কবিভূষণ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাশ গুপ্ত কবিসাগর এই কলেজের অধ্যক্ষপদে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু কতিপয় বৎসর অতীত হইল তাঁহার পিতৃদেব পণ্ডিত চন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত কবিভূষণ মহাশয় পরলোক গত হইলে স্বাধীনত্রিপুরার রাজবৈদ্যরূপে তিনি পিতৃপদ গ্রহণ করেন। তখন ইঁহার পিতৃব্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত কবিশেখর মহাশয় কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; কবিসাগর ললিতমোহন পদান্তর গ্রহণ করায় তিনি পুনরায় অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান সময়ে, এখানে ব্যাকরণ, কাব্য, সাঙ্খ্য, বেদান্ত, পাতঞ্জল, মীমাংসা, স্মৃতি, বেদ, আয়ুর্ব্বেদ এবং পৌরহিত্য ব্যতীত ইংরেজী ভাষারও অধ্যাপনা হইয়া থাকে। এই কলেজে পাঁচজন বেতনভোগী এবং দুইজন অবৈতনিক অধ্যাপক অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। অধ্যক্ষ মহোদয়ও অবৈতনিক। বর্ত্তমান সময়ে কলেজে ৭৫টী ছাত্র অধ্যয়ন করিছে।

গত ১৯০৮ সালে এই কলেজে গভর্ণমেণ্ট মাসিক ৫০৲ টাকা সাহায্য করিতেন, অধুনা উহা ১৪০৲ টাকা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত একটী 'ফায়ার প্রুফ, (Fire Proof) লোহার সিন্ধুক এবং লাইব্রেরীর পুস্তক এবং আসবাবাদির জন্য গভর্ণমেণ্ট ১৯৬৬৲ টাকা দান করিয়াছেন। এপর্য্যন্ত একটী

সামান্য গৃহে ছাত্রাবাসের কার্য্য চলিত, অধুনা তাহাতে স্থানের সঙ্কুলান না হওয়ায় একটী পাকা ছাত্রাবাস নির্ম্মাণের আয়োজন হইয়াছে। কলেজের স্বত্বাধিকারীর অর্থে গভর্ণমেণ্ট কলেজের সমীপে কতকটা জমী সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। ছাত্রাবাস ও লাইব্রেরীর গৃহ নির্ম্মাণার্থ গভর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। গত ৯৩ই নভেম্বর শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মাননীয় ডব্লিউ, ডবলিউ, হর্ণেল মহোদয় ছাত্রাবাস ও লাইব্রেরীর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

অভিভাষণ।

মহামান্য ডিরেক্টর ডব্লু, ডব্লু, হর্ণেল বাহাদুর মহোদয়ায়।

বাকুলা আর্য্য-সম্মিলনী সভাপরিষদ্ভিঃ কবীন্দ্র কলেজ কমিটী সভ্যৈঃ স্বত্বাধিকারিভিশ্চ সোপাধিকমভিনন্দনং প্রদীয়তে॥

নাস্তেঽস্মাকং কিমিহ ভবতে যৎপ্রদানানুরূপং
দীনা হীনা বুধ! বয়মস্যুক্রোশতো গৃহ্যতাম্ ভোঃ।
ভক্তি প্রীতি প্রণতি কুসুমৈঃসার্দ্ধমস্মদ্ বিধানাং
দেয়ো "বিদ্যার্ণব" ইতি পদোপাধিরাকিঞ্চনানাম্॥

আশা তাসা বিলসতি নভো নির্ম্মলং স্বচ্ছমন্তঃ
কুঞ্জে গুঞ্জন্ ভ্রমতি মধুপোপানসঙ্গী বিহঙ্গঃ।
ইত্থং প্রেম প্রবণ মনসঃ সম্ভৃতানন্দ লোলাঃ
জাতোৎকণ্ঠাঃ সপুদিভবতঃ স্বাগতং প্রার্থয়ন্তে॥

যাবজ্জীবং স্বগণিত নিজ প্রাণ পাতাঃসমেতাঃ
দৈবীবাণীংপুপুষুরনিশং যাঃ কবীন্দ্রাঃ কবীন্দ্রাঃ।
শিক্ষাম্ভোধি প্রবল তরণী কর্ণধারে ত্বয়ীমাঃ
মন্দাক্রান্তাঃ সপদিসুচিরং জীবনং প্রার্থয়ন্তে॥

হে শ্রীমন্! যদবধি তবাগমস্য বার্ত্তা
কর্ণান্তঃ প্রচরতি নঃ সুধাসমানা।
আনন্দ হ্রদ সলিলে ততো নিমগ্না
সংবৃত্তা খলু সমিতিঃ প্রহর্ষিণীয়ম্॥

ত্বাং শিক্ষার্ণব কর্ণধারমাপতন্তং
পশ্যন্তঃ সকল গুণাঢ্যমাত্তমোদাঃ।

তৎ প্রেম্ন্য বিগলদশ্রুবশ্চতস্তে
ভাষেয়ং বুধ! জয়তীসদৈব জীব্যাৎ॥
হর্ণেল্ মহোদয়! দয়োদয় সৌম্যমূর্ত্তে।
যদ্দূরদেশ গমন শ্রম মাকলয্য।
ধন্যাঃ কৃতাস্তদিদমর্থন মীশ্বরাস্তে
সংজীবতাং কৃতপদোন্নতিরত্য সীমম্॥

কবিশেখরোপাধিনা শ্রীশ্রীপ্রসন্ন দাস গুপ্তেন, সভাপতিনা।
তর্কতীর্থোপাধিনা শ্রীশশিকুমার দেবশর্ম্মণা।
বিদ্যালঙ্কারোপাধিনা শ্রীচন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণা।
বি, এল্; উপাধিনা শ্রীপ্রিয়নাথ গুপ্তেন।
কাব্যতীর্থোপাধিনা অশ্বিনীকুমার দেবশর্ম্মণা।
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সে গুপ্তেন।
এম, এ, উপাধিনা শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্তেন।
কবিসাগরোপাধিনা শ্রীললিতমোহন দাশগুপ্তেন বাকুলা আর্য্য সম্মিলনী সভাপতিনা।
বিদ্যারত্নোপাধিনা শ্রীনারায়ণচন্দ্র দেবশর্ম্মণা।
রায় বাহাদুরোপাধিনা শ্রীশ্যামাচরণ দেবশর্ম্মণা।
এম্, এ, বি এল্, উপাধিনা শ্রীশশিকান্ত গুপ্তেন।
বি, এ, উপাধিনা শ্রীকৈলাসচন্দ্র সেন গুপ্তেন।
বিদ্যানিধি উপাধিনা শ্রীঅক্ষয়কুমার দেবশর্ম্মণা।
শিরোমণি উপাধিনা শ্রীকালীকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণা।
শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাশ গুপ্তেন।
কবিচূড়ামণি উপাধিনা শ্রীভুবনমোহন দাশ গুপ্তেন

সম্পাদকেন।

কার্য্যবিবরণী।

১

বৈদ্যজাতির গৌরব স্থানীয় গৈলার সুপ্রসিদ্ধ কবীন্দ্র কলেজ পরিদর্শন এবং কলেজের ছাত্রগণের বাসভবনের ভিত্তি-স্থাপন জন্য গত ১লা অগ্রহায়ণ বঙ্গের শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বোচ্চপদস্থ মহামান্য ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত হর্ণেল সাহেব বাহাদুর শুভাগমন করেন। তিনি কলেজের শিক্ষাপ্রণালী, ছাত্রগণের শিক্ষা, বিশেষতঃ কলেজ-লাইব্রেরীর রক্ষিত সহস্রাধিক বৎসরের অধিক কালের লিখিত আয়ুর্ব্বেদীয় কয়েকখানি গ্রন্থ দেখিয়া অতীব সন্তোষ প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থের কাগজ, কালী এবং লেখা সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ যে অবিকৃত অবস্থায় আছে, তাহাই তাঁহার বিস্ময় উৎপাদন করে। তাই তিনি ঐ সকল কাগজ এবং কালী কি কি উপাদানে এবং প্রণালীতে প্রস্তুত হইত, তাহা বিশেষ আগ্রহের সহিত অনুসন্ধান করেন।

ডিরেক্টর সাহেব বাহাদুরকে সাদরে গ্রহণ এবং অভ্যর্থনার জন্য স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, "বাক্‌লা আর্য্য সম্মিলনী" সভার পণ্ডিতমণ্ডলী এবং কবীন্দ্র কলেজের অধ্যাপক ও কলেজকমিটির সদস্যগণ কলেজগৃহে সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া ডিরেক্টর সাহেব বাহাদুরকে উল্লিলিখিত কতিপয় কবিতাদ্বারা অভ্যর্থনা করতঃ তাঁহাকে "বিদ্যার্ণব" উপাধি প্রদান করেন। তিনিও তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া, সুন্দর ও সরস বাঙ্গালাভাষায় এসম্বন্ধে তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি বলেন, "আমি জানি, সংস্কৃত পড়িলে চাকুরী পাওয়া যায় না, ইহা ভাবিয়াই লোকে আজকাল সংস্কৃত পাঠে আগ্রহ প্রকাশ করে না। কিন্তু চাকুরী অর্থাৎ অর্থই জীবনের সার নহে; মানবজীবনের সার যে ধর্ম্ম, তাহা লাভ করিতে হইলে, এই সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইহাছাড়া, এদেশীয় অন্যান্য ভাষা শিক্ষার মূলেও সংস্কৃত ভাষাই প্রধান। অতএব এদেশের পক্ষে এই ভাষা শিক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার গুরুত্ব ও গৌরব সম্বন্ধে এরূপ বর্ণনা করিয়া পরে বলিলেন,—"আমি এই কবীন্দ্র কলেজ পরিদর্শন করিয়া অতীব আহ্লাদিত হইয়াছি। বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য অর্থের অভাব হইলেও যাহাতে ইহার উন্নতিসাধনে অবস্থানুসারে অর্থ সাহায্য হইতে পারে তাহাতে ত্রুটি হইবেনা। অধিকন্তু এই কবীন্দ্র কলেজের কথা আমার সর্ব্বদা মনে থাকিবে। এমন কি, আমি এদেশ ছাড়িয়া স্বদেশে গেলেও এই কলেজের কথা আমার স্মরণ থাকিবে। আপনারা অদ্য আমাকে যে একটি টাইটেল (উপাধি) দিলেন, তাহা আমি সাদরে গ্রহণ করিলাম। এবং তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে "নমস্কার" করিতেছি ইহা বলিয়া তিনি সভাস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীকে দুইহস্তে অভিবাদন করিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত মহাশয় বাঙ্গালা ভাষাতেই সভার পক্ষ হইতে ডিরেক্টর সাহেব বাহাদুরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে দণ্ডায়মান হইয়া, সাহেব বাহাদুরের সংস্কৃতভাষার প্রতি যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং তাহা শিক্ষার্থে যে আন্তরিক আগ্রহপ্রকাশ করিয়াছেন তাহা পরিস্ফুট ভাবে উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীকে বুঝাইয়া বলেন। এই কবীন্দ্র কলেজ পরিদর্শন জন্য যেরূপ কায়ক্লেশ স্বীকার করিয়া সহরাদি হইতে বহুদূরবর্ত্তী (Outof the wfy) গ্রামে আগমন করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার আন্তরিক ভালবাসার প্রমাণ। এ ভিন্ন কবিন্দ্র কলেজ তাঁহার চিরস্মরণীয় থাকিবে এইরূপ প্রতিশ্রুতিও তাঁহার মহত্বেরই পরিচায়ক এবং আমাদিগেরও বিশেষ সৌভাগ্য এবং আশাপ্রদ এইরূপ বলিয়া তিনি ডিরেক্টর সাহেবকে ধন্যবাদ করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

তৎপরে কলেজগৃহের অনতিদূরে কলেজ বোর্ডিংয়ের ভিত্তি তিনি স্বহস্তে স্থাপন করেন। এতদুর্দ্ধে

নির্ম্মিত রৌপ্যকার্ণীশ দ্বারা তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যাপি মাঙ্গলিক চিহ্ন সমন্বিত একটী বৈয়েম ভিত্তিস্থানে স্থাপন করিয়া উক্ত কার্ণীশ দ্বারা তাহা রীত্যনুসারে গাঁথিয়া দেন।

শ্রীআনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত।

বামুন গড়িবার প্রস্তাব।

দেখিয়া সুখী হইলাম, সহযোগী 'নায়ক' 'ব্রাহ্মণ-রক্ষা'র জন্য বড়ই ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। কথাটা সুখের বটে; কিন্তু 'ব্রাহ্মণ-রক্ষার',কথাটা তুলিয়া এক নিশ্বাসেই বলিয়া ফেলিয়াছেন,—"ব্রাহ্মণ কৈ যে, রক্ষা করিবে?" শেষের এই কথাটা কিন্তু অঠিক নহে। শাস্ত্রের হিসাবে এখন ব্রাহ্মণ দুর্ল-ভই বটে। কিন্তু ব্রাহ্মণ যেমন এখনকার দিনে দুর্লভ, শাস্ত্রের হিসাবে হিন্দুও ত সুলভ নহে? আজকালকার হিন্দু যেমন 'কেমিক্যাল', ব্রাহ্মণও তেমনি। আপসোস্ করিবার কিছু নাই। ইহার উপর মাপ-কাঠির মাপে যাঁহারা বামুন গড়িতে চাহেন, তাঁহারা—হয় ত বে আকুব, নয় ত ফক্কর। কথাটা একটু শক্ত হইল কি?

খাস ম্লেচ্ছের হোটেলে খাইয়াছেন বলিয়া যাঁহারা প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিয়া বাহাদুরী দেখাইতেও সঙ্কোচ বোধ করেন না,—এরূপ কবুল জবাবের জন্য আধুনিক কেমিক্যাল ব্রাহ্মণ-সমাজ কর্ত্তৃক যাঁহারা কোণ-ঠেশা হইয়া আছেন, তাঁহারা এখন 'খাঁটী বামুন' গড়িবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন! আমাদের মনে হয়, ইহা ব্যগ্রতা নহে, নিখুঁৎ পাগ-লামি, সঙ্গে সঙ্গে ভণ্ডামী। কথাটায় অনেকের প্রাণে একটু আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা থাকিলেও, খাঁটী বামুনের যে শিকড়শুদ্ধ কীটদষ্ট হইয়াছে, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। খাঁটী বামুনের বীজ যে এখন সুদুর্লভ!

'নায়ক' কিন্তু বলিতেছেন,—"ইংরেজ পাদরী গড়িবার জন্য কত ব্যয় করে তাহা জান কি? বড় বড় বনেদী ঘরের ছেলেরা পাদরী হইতেছে, লর্ড-কর্জনের পিতা পাদরী পুরোহিত। ইংলণ্ডের পূর্ব্বতন প্রধান মন্ত্রী মার্কুইস্ অব্ সল্স্বরীর এক পুত্র বিশপ হইয়াছেন। সমাজে পাদরীর মান কত—আদর কেমন?" খৃষ্টানদের নিকট পাদরীর আদর খুব বেশী, ইহাত বেশ বুঝা গেল; কিন্তু পাদরী যে একটা স্বতন্ত্র জাতি নহে, একথাটা ত ঠিক? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই যুক্তির বলে, হিন্দুজাতির মধ্যে যে কোন জাতীয় লোক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানার্জ্জনে সমর্থ হইলে ব্রাহ্মণ হইতে পারে কি? হিন্দুসমাজের গুরুতা এবং পৌরোহিত্য ব্রাহ্মণের একচেটিয়া ব্যবসায় ছিল, এখনও তাহাই আছে। এখনকার হিন্দুয়ানীও যেমন, ব্রাহ্মণের গুরুগিরি ও পুরোহিতগিরিও তেমন?

"যাহারা শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, শাস্ত্র-শাসনে সমাজের রক্ষা করা যাহাদের বৃত্তি, তাহা-রাই ছেলেদের ইংরেজী লেখা পড়া শিখাইতে প্রমত্ত। * * * এমন যে পোপ পঞ্চানন তিনিও তিনটী ছেলেকে ইংরেজী পড়াইতেছেন। ইংরেজী লেখা পড়া একটু অধিক মাত্রায় শিখিলে হৃদয়ে-হিন্দুভাব ঠিক মত থাকিতে পারে না।" আমাদের ধারণা—এটা মিথ্যাকথা। মুসলমান রাজত্বের সময় যে পার্‌সী আর্‌বী প্রভৃতি মুসলমানী ভাষায় হিন্দুরা ব্যুৎপন্ন হইত, কই, তাহারাত মুসলমানী ছাঁচে ঢালা হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায় নাই? কায়দায় পড়িয়া যাহারা গিয়াছে, তাঁহারা দোটানায় রহে নাই, একবারেই গিয়াছে, সদর মফস্বলী খেলে নাই।

"বলিতে পার, আমরা ভাল গুরু পুরোহিত চাই—শাস্ত্রজ্ঞ ও আচারবান্, কর্ম্মী ও সাধক ব্রাহ্মণ চাই। পাল্টা জবাবে আমরা জিজ্ঞাসা করিব, তেমন ব্রাহ্মণ গড়িবার জন্য কি উদ্‌যোগ আয়োজন করিয়াছ!" এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলিতে হয় যে, ব্রাহ্মণ শাস্ত্রোক্ত কর্ত্তব্য পালন করিয়া ব্রাহ্মণ নামের যোগ্য হইবে, তাহার জন্য আবার উদ্যোগ আয়োজনের দরকার টা কি? ব্রাহ্মণ গড়িতে কিছু মাল-মসলার দরকার পড়ে নাকি? যে উপাদানে খাঁটী ব্রাহ্মণ গঠিত হয়, তাহা কাহাকেও যোগাইয়া দিতে হয় না। যজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং ব্রহ্মচর্য্য, খাঁটী ব্রাহ্মণ গঠিত হইবার পক্ষে এই কয়টী উপাদানের প্রয়োজন। প্রবৃত্তি থাকিলে, তুমি ব্রাহ্মণসন্তান, অনায়াসে ভাল গুরুপুরোহি ও শাস্ত্রজ্ঞ, আচারবান্, কর্ম্মী ও সাধক হইতে পার। হও না, —ইহা তোমার প্রকৃতি-প্রবৃত্তির দোষ।

ইংরেজী শিক্ষার খাড়ে দোষ চাপাইয়া নিজের দোষ ঢাকিবার যে চেষ্টা করিতেছ, ইহা তোমার বিষম ভুল। মান্দ্রাজ বোম্বাই প্রদেশের ব্রাহ্মণ দিগের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-নিষ্ঠা দেখিয়া মনে হয় নাকি যে, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা? এসকল স্থানের ব্রাহ্মণসন্তানেরা ইংরেজী শিক্ষায় তোমাদের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীবর্গের আচার-নিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য করিলে যদি তোমাদের লজ্জা বোধ না হয়, তাহা হইলে তোমাদের ন্যায় নির্লজ্জ আর এ সংসারে কেহ নাই। ভারতের যাবতীয় জাতির মধ্যে তোমরা নকলনবীশের সেরা। ভারতে কেবল বাঙ্গালী তোমরাই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া সাহেব সাজিতেছ। ইহা ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে নহে, তোমাদের প্রকৃতির দোষে। চাকরি-জীবী হইয়া যে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব অন্য দেশে যায় নাই, তোমার দেশে যায় কেন? পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণ সন্তানেরা তোমার দরোয়ানী করিয়া সংসার চালায়, কিন্তু তোমার ছোঁয়া জল খায় না কেন?

বলিতে চাও,—আগেকার মত লোকে এখন গুরু-পুরোহিতকে অর্থ দিয়া সাহায্য করে না, সুতরাং ব্রাহ্মণ সন্তান সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার উদ্দেশ্যে অর্থকরী বিদ্যা ইংরেজী শিক্ষা করে। কথাটী কিন্তু অনেকেই বিশ্বাস করিতে চাহিবে না। আগেকার দিনে গুরু-পুরোহিত ধনবান শিষ্য যজমান হইতে ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সেই ব্রহ্মোত্তর জমী লাভ করিয়া তালুকদার নাম গ্রহণ করিবার প্রয়াসী ছিলেন না, তাঁহারা ব্রহ্মোত্তর জমী নিজেরা আবাদ করি-তেন, স্বহস্তে কৃষিকার্য্য করা তাঁহারা সম্মানের লাঘব মনে করিতেন না। অন্যের দাসত্ব করা অপেক্ষা কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা অর্জনকে তাঁহারা বরং গৌরবজনক বলিয়াই মনে করিতেন। তখন ব্রাহ্মণ সন্তানের ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি প্রখর দৃষ্টি ছিল, তাঁহারা সংযমী ছিলেন, সুতরাং প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া যাঁহারা অভিহিত হইবার যোগ্য তাঁহাদের সংখ্যা অতি কম ছিল। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের 'নবমবর্ষে গৌরী দানের' ব্যবস্থাটা তখনি খুবই চলিত ছিল, কিন্তু দ্বাদশ বর্ষের বালক ধরিয়া গৌরীদান তখন হইত না। তখন অধ্যয়ন সমাপ্তির পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ-সন্তান বিবাহ করিতেন না। এখনকার কালে আর সেটী আছে কি? এখন বালক-বালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া যুবক-যুবতীর বিবাহ বেশ খর-বেগেই চলিতেছে! সেন্সস্ রিপোর্টে ব্রাহ্মণের সংখ্যা যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, রঘুনন্দনাদির আমলে এত বামুন ছিল বলিয়া বোধ হয় কি?

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এতগুলি ব্রাহ্মণ-সন্তান যদি শুধু গুরু-পুরোহিতগিরি করিয়া ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিতে যায়, তাহা হইলে শিষ্য-যজমানের সৃষ্টির জন্য স্বয়ং ব্রহ্মার নূতন কারখানা সৃষ্টি না করিলে ত আর কুলাইবার সম্ভাবনা নাই! এসকল দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া সুজিয়াই এখন ব্রাহ্মণের ছেলে ইং-রেজী পড়িতে সুরু করিয়া চাকরিজীবী হইতেছে। আমরা কিন্তু বলিব, ব্রহ্মচর্য্য ও সংযমের অভাবেই

ব্রাহ্মণ দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছে, নিজেদের কর্ত্তব্যহীনতা তাঁহাদিগকে হিন্দুসমাজে দিন দিন হেয় করিয়া তুলিতেছে। এখন এমন অনেক ব্রাহ্মণ সন্তান দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদিগকে স্বীয় বৃত্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া যায় ;—

"যদি লিখ্‌থা পড়ার কথা বল্যেন ত ঐট্টা বড় ই লয়, কিন্তু বিদ্দের কথা যদি বল—তবে চাপ্পাইচে কি নাম্মাইচে, বাপ্পের বেট্টা বটেক !'

বর্ণপরিচয়ের মলাট পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া অনেক ব্রাহ্মণ সন্তান "বিদ্যাবিনোদ", 'বিদ্যাবাগীশ' প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধাদিতে নিমন্ত্রণ পত্র সংগ্রহ করিয়া থাকেন, এবিষয়ের দৃষ্টান্তও দুর্লভ নহে। এজন্যই বলিতে ইচ্ছা হয়, নিজেদের কর্ত্তব্য ক্রটির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সমাজের স্কন্ধে দোষ চাপাইতে যাও কেন ? ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া বড় বড় চাকুরী পাইয়া যদি তোমরা ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিতে,—জাতীয়তা রক্ষা করিবার জন্য যদি তোমাদের মতি-প্রবৃত্তি থাকিত, তাহা হইলে তোমরা তাহা অনায়াসে রক্ষা করিতে পারিতে। ইংরাজী শিক্ষা তোমাকে বলিয়া দেয় নাই যে,—তুমি ইংরাজী শিখিয়াছ অতএব তোমার শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতি জাতীয় কর্ত্তব্য পরিহার কর, —তোমাকে প্রণাম করিতে আসিলে তুমি হাত বাড়াইয়া করমর্দ্দন কর,—উইলসন, পেলিটী অথবা গ্র্যাণ্ড হোটেলে যাইয়া রসনায় তৃপ্তিসাধন কর। এগুলি ত তোমার নিজের দোষ, তোমার নিজের ক্রটী—নিজের স্বেচ্ছাচারিতা ?

এসম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে অনেক কথাই বলিতে হয়, তাহাতে হয়ত কাহারও অপ্রীতিভাজনও হইবার আশঙ্কা আছে। সুতরাং এখানেই উপসংহার করা শ্রেয়ঃ। সমাজে যাহারা আধিপত্য-সুখভোগ করিবার সুবিধা পায়, তাহারা যে কিয়ৎপরিমাণে স্বেচ্ছাচারী হয়, জগতের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ব্রাহ্মণগণ চিরকালই হিন্দুসমাজে আধিপত্য করিয়া আসিয়াছেন, এই আধিপত্যের অপব্যবহারে তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রে অনধিকার প্রবেশেও ক্রটী করেন নাই। বলিতে কি, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন পর্য্যন্ত এই অপবাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন নাই। সমাজের অবস্থা যখন এরূপ, তখন নূতন করিয়া ব্রাহ্মণ-গড়িবার কথা মুখে আনিয়া বাতুলতার পরিচয় দেও কেন ?

টীকা-টিপ্পনী।

বরিশালের অন্তর্গত গৈলাগ্রামে 'কবীন্দ্র কলেজ নামক একটী সংস্কৃত শিক্ষামন্দির আছে। ইহা ১৩০ বৎসর যাবৎ প্রতিষ্ঠিত এবং বৈদ্য-অধ্যাপক কর্ত্তৃক পরিচালিত। বঙ্গের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মাননীয় হর্নেল সাহেব গত ১৬ই নভেম্বর এই কলেজ পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। স্থানান্তরে বিস্তৃত বিবরণ প্রকটিত হইল।

হিন্দুসন্তান মাত্রেই কৃষ্ণলীলার পক্ষপাতী। যখন থিয়েটারের এতটা প্রাবল্য ছিলনা, তখন যাত্রাগানই দেশে প্রচলিত ছিল, বিবাহাদি আনন্দ উৎসব উপলক্ষে লোকে যাত্রাগান দিত, দশজনে তাহা শুনিয়া চরিতার্থ হইত। এখনও যে সে প্রথা একবারে তিরোহিত হইয়াছে এরূপ নহে। তবে থিয়েটারের প্রতিই লোকের আগ্রহটা একটু বেশী। গুছাইয়া লইতে পারিলে থিয়েটার হইতে অনেক সার পদার্থ মিলে।

৺নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় একজন খ্যাতনামা যাত্রাওয়ালা ছিলেন; তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় এখন সেই দলের নেতা। সম্প্রতি তিনি কলিকাতায় সদলবলে আসিয়া যাত্রাভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে 'নায়ক' পত্রের বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে ইনি কৃষ্ণলীলা অভিনয় করিয়াছিলেন। শুনাযায়, সহরের অনেক গণ্যমান্য ভদ্রব্যক্তি উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণলীলা শ্রবণ এবং অভিনয়ান্তে ভুরি-ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া গিয়াছেন। 'নায়ক' পত্রে প্রকাশ, সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে বিলাতফের্ত্তাও ছিলেন। তাঁহারা পংক্তি ভোজন করিয়াছিলেন কিনা, তাহা প্রকাশ নাই।

মাননীয় ভুপেন্দ্রনাথ বসু মহাশও এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণলীলা শ্রবণে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বীয় ভবনেও একদিন যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়া স্থানীয় অনেক গণ্যমান্য লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভুরিভোজনের ব্যবস্থাও প্রচুর ছিল বলিয়া প্রকাশ। ভুপেন বাবু গান শ্রবণে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন, নায়ক বলেন, তিনি ভাবে ডগমগ হইয়া কমলাকান্তকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক ভাবোচ্ছাস্ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে ভুপেনবাবুর সম্বন্ধে 'নায়কের' পট-পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। পাঁচকড়ি বাবু ভুরিভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া কবুলজবাব দিয়াছেন দেখিয়া আরও পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

বিলাতফের্ত্তার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ অধঃপাতে যাইতেছেন, এজন্য 'ব্রাহ্মণ সভা'র 'বামুনসভা' নামান্তর ঘটিয়াছে, পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় 'পোপ' উপাধি পাইয়াছেন! 'হায়রে! এহেন সময়ে ইন্দ্রনাথ নাই, হিন্দুধর্ম্ম আর রক্ষা করে কে? এরূপ আপসোসের তুফান বহিয়া যাইতেছে,—আরও কত কি হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই! নায়ক সম্পাদক মহাশয়ের কথা শুনিয়া প্রতীতি হয় যে, এতদিন হিন্দুধর্ম্মটীকে রঘুনন্দনাবতার ইন্দ্রনাথ, বিরাট বঙ্গবাসীর বরাবরে রক্ষা করিয়াছিলেন, এখন ক্ষুদ্রকায় 'নায়ক' তাহার রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন। ভুপেন্দ্রনাথ বিলাত ফের্ত্তা বলিয়া পাঁচকড়ি বাবু ভুরিভোজনের অংশ গ্রহণে আপত্তি করিয়াছিলেন কিনা, একথাটী এখন পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায় নাই। সমাজপতি মহাশয় অনেক দিন হইতে ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ভুগিতেছেন, মহা মহোপাধ্যায় গণনাথ সেন কবিরাজের ঔষধ খাইতেছেন। তিনি হয়ত এই অজুহাতে পাশ কাটাইয়াছেন।

'সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্' বাক্যটী যাঁহারা পঠন করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা বেশী মূর্খ ছিলেন না! বেশী টানাটানি করিলে ছিড়িয়া যায়, একথাও অবহেলা করিয়া উড়াইয়া দিবার নহে। যে স্থানে বেশী টাকাটানি, সেস্থলেই দেখা যায়, টুকরা টুকরা হইয়া ছিড়িয়া গিয়াছে! প্রমাণস্বরূপ ব্রাহ্মধর্ম্মটা দেখনা কেন? বেশী টানাটানি বলিয়াইত হিন্দুসমাজের 'নায়ক' খুঁজিয়া পাইতেছনা, নিজেরা যাহা মুখে বল, কার্য্যে তাহা কর না। তোমরা ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া কায়স্থের সঙ্গে এক পাত্রে ভোজন করিতে সঙ্কোচ বোধ করনা, কিন্তু বক্তৃতার সময় নিরেট ব্রাহ্মণ হইয়া হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার অছিলায় অপরের বাপান্ত কর! তোমাদিগকে কে বিশ্বাস করিবে, বাপ্‌ধনেরা? এখনকার কালের মানুষ যে খুব বেশী দুষ্ট একথাটা আমাদের সকলেরই মনে রাখা উচিত। কোন কার্য্যই লুকাইয়া রাখিবার যো নাই, 'ধা' করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। সুতরাং 'সদর-মফস্বলী' চাল চালিবার দিন আর নাই।

শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা যখন জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে, সে ব্যবস্থাকে কার্য্যে পরিণত না করিয়া (Dead letter) বাক্সে চিঠি বৎ রাখিলে শাস্ত্রের অবমাননা করা হয়। শুধু তাহাই নহে, তদ্দ্বারা ঐ ব্যবস্থার নিষ্প্রয়োজনিতা প্রতিপন্ন হয়। যাঁহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে নিতান্ত ব্যগ্র, শাস্ত্রের বিধান শিরোধার্য্য করিয়া চলা তাহাদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু এখনকার যুগধর্ম্মে যে সেটুকু হইবার সুবিধা নাই। এখন, স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সদর-মফঃস্বলী খেলা খেলিয়া যাহা কিছু করতলগত করা যায়, তাহাই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ বলিয়া বিবেচিত হয়। তাহার প্রমাণ পরিচয় পাইতে বড় বেশী কষ্ট করিতে হয় না। যাঁহারা গগণভেদী বক্তৃতা দ্বারা নিয়ত জনসজ্জকে মাতাইতে অভ্যস্ত, খুঁজিলে তাঁহাদেয় মধ্য হইতেই এরূপ মহাপুরুষ অনেক আবিষ্কৃত হয়। অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখান নিরাপদ নহে।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় এম, এ, এম, বি মহাশয়ের প্রযত্নে কলিকাতা ফরিয়াপুকুরে একটী আয়ুর্ব্বেদ-কলেজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কবিরাজ শ্রীনাথ কবীন্দ্র, লাহার আয়ুর্ব্বেদ-কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক কবিরাজ হরমোহন মজুমদার কাব্যতীর্থ, কবিরাজ বিরজাচরণ কবি-ভূষণ, কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ এবং বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ মজুমদার এম, এ, অধ্যাপকের পদে বৃত হইয়াছেন। কিন্তু এই কলেজের সংশ্রবে কবিরাজ শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি, কবিরাজ প্রবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন কবিরত্ন, মহা-মহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ-সেন সরস্বতী এম্, এ, এল্, এম্, এস্, কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন কবিভূষণ এম্ এ, বৈদ্যরত্ন প্রমুখ মহাত্মাগণের নাম না দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম।

কবিরাজ যামিনীভূষণ প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া কলেজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এবং ইহার উন্নতি কল্পে ইনি জীবন উৎসর্গ করিবেন, এরূপ প্রতি-শ্রুতি শ্রুতিগোচর হয়। বাস্তবিক তাঁহার এইরূপ সঙ্কল্প যে নিতান্ত সাধু, তাহাতে সংশয় নাই। আমাদের ধারণা, এরূপ মহৎ উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য সহায়তা করা বৈদ্য অধ্যাপক মাত্রেরই কর্ত্তব্য। অন্য পক্ষে যাহাতে কলেজটী সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তদ্‌কল্পে বৈদ্য-পণ্ডিত মাত্রের সহানুভূতি লাভের চেষ্টা করা প্রতিষ্ঠাতার উচিত। কিন্তু জানি না, সহরের কবিরাজ শ্রেষ্ঠ উল্লিখিত পণ্ডিতবর্গ ইহা হইতে নির্লিপ্ত কেন! আমরা আশা করি, যাহাতে অবি-লম্বে সাধারণের মন হইতে এই প্রশ্ন তিরোহিত হয় তাহার পরিচয় পাইব।

শুনা যায়, অন্য একজন কবিরাজ মহাশয়ও অপর একটী আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইতেছেন। জনরব সত্য হইলে, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোনটীই স্থায়ী হইবে না। প্রাধান্যলোলুপতায় বাঙ্গালী-সমাজ হইতে একতা এজন্মের মত বিদায় লইয়াছে। ইহার পুনরুদ্ধার যে একেবারেই অসম্ভব, তাহা আমরা পদে পদে অনুভব করিতেছি। লাট-কৌন্সীলের মেম্বরী, মিউনিসিপালিটীর কমিসনরী হইতে আরম্ভ করিয়া সাহিত্য-পরিষদের কর্ম্মকর্ত্তা-গিরি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইতে ইহার পরিচয় বেশ পাওয়া যায়। কিন্তু এই আয়ুর্ব্বেদ-কলেজের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যদি এরূপ কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয়, এবং সেই বিঘ্ন অন্তরায় ঘটায়, তাহা হইলে কিন্তু বৈদ্যজাতির পক্ষে নিতান্ত কলঙ্কের কথা! আমরা কিন্তু এরূপ কার্য্যের প্রশ্রয় কিছুতেই দিতে পারিব না। আশা করি, এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার আবশ্যক হইবে না।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরের বৈদ্য জমীদারগণের সহিত বিক্রমপুর সমাজান্তর্গত বৈদ্য-সমাজ আদান-প্রদান-বিরোধী। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাঁদের আদান-প্রদান বিক্রমপুর, কালিয়া, সেনহাটী প্রভৃতি সমাজেই হইয়া থাকে; ফলে যাঁহারা এরূপ আদান-প্রদান করেন, সমাজে তাঁহারা বদ্ধ থাকেন। আমরা অনুসন্ধানে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে প্রতীতি হয়, ইহার মূলে কিছুই নাই। এই সেরপুরের আদর্শ জমীদার শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী মহাশয় আমাদের একজন পরম-সুহৃদ। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে বংশ বিক্রমপুপ সমাজে 'কুলীন' বলিয়া পরিচিত। তিনি যে বংশে বিবাহ করিয়াছেন, তাহাও তদনুরূপ। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তিনি সেরপুরের জমীদারের ঐশ্বর্য্যভোগ করেন বলিয়া সমাজে অপরাধী! তাঁহার বাড়ীতে যে প্রতিদিন ৪০টী বৈদ্যসন্তান দুই বেলা আহার করিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করিতেছে, তাহারা এবং তাহাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বিশুদ্ধ এবং নিরপরাধ !!

স্থূলদৃষ্টিতে দেখিলেও ইহাই প্রতীতি হয় যে, বৈদ্যসমাজ এই বংশের প্রতি অনর্থক অত্যাচার করিতেছেন। এরূপ অত্যাচার ব্যক্তি অথবা বংশবিশেষের প্রতি প্রযুক্ত হইলে ন্যায়তঃ মহাপাপ বলিয়া স্বীকার করা উচিত। এই বিষয়টীর অনুসন্ধান লইয়া সমস্ত তথ্য অবধারণপূর্ব্বক প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা আশা করি, বিক্রমপুর, কালিয়া এবং সেনহাটী সমাজের প্রবীণ বৈদ্যসন্তানগণ এবিষয়ের প্রকৃত তথ্য জ্ঞাপন করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। শুনা যায়, গোপালদাস বাবু এরূপ ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিগণকে পুরস্কৃত করিয়া সুখী হইতে অভিলাষী।

জাতীয়-সংবাদ।

(ব্যক্তিগত।)

কবিরাজ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বৈদ্যরত্ন পূজার অব্যবহিত পরে বায়ু পরিবর্ত্তন ব্যপদেশে পশ্চিমাঞ্চলে গিয়াছিলেন। আগরায় কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া টেনারীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক দেওঘরে আগমন করেন। সেখানে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বৈদ্যশাস্ত্রী মহাশয় প্রতিবৎসরেই ৺শারদীয়া পূজার সময় জন্মস্থান কালনার বাটীতে সপরিবারে উপস্থিত থাকেন। এবারেও ছিলেন। সেখান হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া সপরিবারে ৺বৈদ্যনাথ গমন করেন। সেখানে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনিও আছেন ভাল।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয় পূজাটা কলিকাতাতেই কাটাইয়া ছিলেন, কি জন্মস্থানে ৺কাশীধামে কাটাইয়াছিলেন ঠিক মনে পড়িতেছে না। তবে দিল্লীতে যে দেশীয় রাজন্যবর্গের সম্মিলন হইয়াছিল, পূজার পর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এখন কলিকাতা ফিরিয়াছেন। উপাধিলাভের পর বৈদ্যজাতিটাকে একদিন মিষ্টমুখ করান এপর্য্যন্ত হয় নাই। সম্ভবতঃ বাঁধাকপির আমদানীর জন্য একার্য্যটা মুলতুবী রহিয়াছে।

কবিরাজ শিরোমণি শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় কিছুদিন ৺বারাণসীধামে কাটাইয়াই কলিকাতা ফিরিয়াছেন। কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র বেশী সময় যাপন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তিনি ইতিমধ্যে একটু অসুস্থ হইয়া-

ছিলেন, এখন ভাল আছেন। তিনি অনেক বৈদ্যসন্তানকে অন্ন ও জ্ঞানদান করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত লোকের অলক্ষিতেও তাঁহার দান যথেষ্ট আছে। এই পুণ্যবলে তিনি সুস্থশরীরে দিন কাটাইতে পারিবেন। তিনি যে অনেকের আশার স্থল।

কবিরাজ প্রবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন কবিরত্ন মহাশয় পূজার সময় ৺কাশীধামে গিয়াছিলেন, এখন সদাশিবের ন্যায় কাঁসারিপাড়ার মোহানায় 'গঙ্গাধর নিকেতন' নামক আয়ুর্ব্বেদ মন্দিরে নিত্যসেবায় নিরত আছেন। চতুর্দ্দিকে ঝড়-তুফান অনেক বহিয়া যাইতেছে, কিন্তু আছেন হিমাচলের মত অচল অটল। নিজের কর্ত্তব্য ভালই করিতেছেন। তিনিও অন্ন এবং জ্ঞানদানে কৃপণতা করেন না। ৺সরস্বতী পূজার সময় প্রতিবৎসরে আমরা তাঁহার আলয়ে রসনার তৃপ্তি সাধনের সুবিধা পাইয়া থাকি। এবারে হয় ত বিদ্বৎসভার সভ্যগণও বখ্‌রা পাইতে পারেন। বিদ্যাবিনোদের উপর পরিবেশনের ভারটা পড়িলে, সভ্যগণ হয় ত বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিবেন।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ বৈদ্যরত্ন এম, এ, মহোদয় পাথুরিয়াঘাটায় পিতৃসিংহাসনে আসীন হইয়া, আর পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিবারও অবকাশ পান না! তাঁহার অনুজেরাও এক একজন বিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত। কিন্তু ইহাঁদের কার্য্যবাহুল্য এতই অধিক যে, দেখাসাক্ষাতে অনেক বিড়ম্বনা ঘটে। ইহার একটা সুব্যবস্থা যে ইহাঁরা শীঘ্রই করিবেন, বৈদ্যসন্তানদের এরূপ আশা দুরাশা নহে!

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় মহাশয় তাঁহার কলেজ লইয়াই ব্যস্ত। তিনি এখন শয়নে স্বপনে কিম্বা জাগরণে কলেজ ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না। এরূপ অধ্যবসায় নিতান্ত প্রশংসনীয়। তবে কলেজ কলেজ করিয়া জাতটাকে অবহেলা করা কিন্তু প্রশংসার কথা নহে। "আগে জাত, পরে ভাত" ঠাকুরমার উপকথার এই ভনিতাটুকু সকলেরই স্মরণীয়। ইহা ভুলিলে যে সব গুলাইয়া যাইবে!

মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় বিজয়রত্ন সেন মহাশয়ের বংশধর আমাদের প্রিয়দর্শন শ্রীমান্ হেমচন্দ্র সেন কবিরত্ন কলিকাতাতেই আছেন। তিনি পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণে নিয়ত সচেষ্ট। কিন্তু আমরা যাবতীয় বিষয়েই তাঁহাকে তদনুসরণে অনুরক্ত দেখিতে আশা করি। বিজয়রত্ন বৈদ্যজাতি ও আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির জন্য প্রত্যক্ষে ও পারাক্ষে যাহা করিয়াছেন, তাহা সকলেরই অনুকরণীয়। স্বর্গীয় কবিরাজ মহাশয় বৈদ্যজাতি ও আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে যদি কিছু ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, কবিরাজ হেমচন্দ্র অচিরে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ খুঁজিবেন, সকলেই এরূপ আশা করে।

কুমারটুলীর 'বড়বাসা' অর্থাৎ ঋষিকল্প কবিরাজ স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ী, কবিরাজ ভগবতীপ্রসন্ন সেনের লোকান্তরের পর নিতান্ত অপ্রসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; ভগবানের কৃপায় এই বাড়ীতে এখন 'প্রসন্নের' বাজার বসিয়াছে। ইহাঁরা প্রসন্নচিত্তে থাকিয়া প্রাতঃস্মরণীয় পিতামহের নাম রক্ষা করিয়া বৈদ্যসমাজের প্রসন্নতা সম্পাদন করিবেন, ইহা বড় বেশী কথা নহে। তবে কথা এই যে, ইহাঁরা এখনও যুবক, হাতে-কলমে কাজ করিবার সময় এখনও বাকী আছে। এই বাটীর জামাই বাবু, হাইকোর্টের অন্যতম উকীল শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম্, এ, বি, এল্, মহোদয় একজন চট্‌পটে যুবক। বিদ্বৎসভার প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে ইনি খুব তৎপরতা দেখাইয়াছিলেন। গত একবৎসর আর তাঁহার পাত্তা নাই। আপসোসের বিষয় বটে।

ধন্বন্তরি।

মাসিক পত্র

২য় বর্ষ, } পৌষ, ১৩২৩, ইং ১৯১৬ ডিসেম্বর, জানুয়ারী, { ৩য় সংখ্যা

৺ কবি প্যারীমোহনের 'কুমারসম্ভব' হইতে

হিমালয়।

(১)

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥ ১ ॥

হিমালয় নামে গিরি পাষাণের দেহ ধরি,
দেব-আত্মা ভারত উত্তরে।
দিক্ হতে দিক্ ব্যাপি, পৃথিবী-পরিধি মাপি,
মগ্ন পূর্ব্ব পশ্চিম সাগরে ॥১॥

মনে হয় বিধি যেন, ভারতে মাপিতে মন,
রচি তার যোগ্য মাপ কাঠি।
ধরিয়া আপন করে রেখেছেন চিরতরে
গিরিবরে উত্তরের দিঠি ॥২॥

অথবা কি কৈল ধাতা দণ্ডধারী দণ্ডদাতা
ধরণীর ধন্ব কীর্ত্তিধর ?
বক্ষ পাতি রক্ষা করে কর্ম্মভূমি ভারতেরে
ব্যাপি কত যুগ যুগান্তর ॥৩॥

পাষাণ-প্রাকাররূপী উদধি অবধি ব্যাপি
অমর* সে হিমগিরিবর।
রুদ্ধ ভারতের দ্বার দুই পার্শ্বে পারাবার
সাধ্যকার প্রবেশে ভিতর ॥৪॥

দুই প্রান্তে সিন্ধুমাঝে মগ্ন হেরি গিরিরাজে
তুলা যন্ত্র বিরাট্ উদয়।
মহীধর ভূধরাদি সার্থক সে নাম যদি
মহী-মান* হিমবানে হয় ॥৫॥

অথবা প্রকৃতিকৃত পর্ব্বে পর্ব্বে গ্রন্থিযুত
রেখাঙ্কিত তুলাদণ্ড যথা।
ভূমি-ভার করে মান বিশাল সে হিমবান্
তুঙ্গতম শৃঙ্গ মুষ্টি সেথা ॥৬॥ †

---

* দেবতা।

* মহীমান=পৃথিবীর পরিমাণ।

† মূলের প্রথম শ্লোক—ব্যাখ্যা করিতে এই ছয়টি শ্লোক রচিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে, প্রথম শ্লোকে সাধারণ ভাবে অর্থ প্রকাশ করিয়া, দ্বিতীয়াদি শ্লোকে উহার বিশেষ বিশেষ বৈচিত্র্য পরিস্ফুট করা হইয়াছে। সহৃদয় পাঠকগণ একটু অনুধাবন করিলেই দেখিতে পাইবেন, প্রথমাদি শ্লোকে "মানদণ্ডঃ" শব্দের "মাপকাঠি" অর্থ—অবলম্বন করা হইয়াছে। পঞ্চম শ্লোকে সাধারণ তুলাযন্ত্রের দণ্ডের সহিত তুলনা হইয়াছে। এই পক্ষে তোয়াধার সমুদ্র উভয়দিকের ভাজন সদৃশ হইতেছে। ষষ্ঠ শ্লোকে ভাজনাদিবিহীন দণ্ড-মাত্র-সার প্রাচীন তুলাদণ্ডের সহিত সাদৃশ্য। এরূপ তুলা যন্ত্র এখনও কচিৎ পল্লীগ্রামে দৃষ্ট হয়।

(২)

যং সর্ব্বশৈলাঃ পরিকল্প্য বৎসং
মেরৌ স্থিতে দোগ্ধরি দোহদক্ষে।
ভাস্বন্তি রত্নানি মহৌষধীশ্চ
পৃথূপদিষ্টাং দুদুহুর্ধরিত্রীম্ ॥২॥

পুরাকালে যে অচলে মিলিয়া সকল শৈলে
বৎসরূপে বরি পৃথ্বীপাশে।
ধেনুরূপা ধরণীর দোহন করিলা ক্ষীর
দোগ্ধা মেরু—পৃথুর আদেশে ॥৭॥

অন্নাভাবে মরে প্রজা দেখিয়া সে পৃথুরাজা
পৃথিবীকে করিল কর্ষণ।
প্রথম কর্ষণ ফলে বরষিল ফলে ফুলে
মানবের নয়ন-তর্পণ ॥৮॥

ওষধি বিবিধ জাতি প্রসবিলা বসুমতী
ধন ধান্যে পূরিল ভাণ্ডার।
উপমায় কহি তেঁই ধেনুরূপা ধরা সেই
হিম শৈল বৎস হৈল যার ॥৯॥

নির্ঝরের নীর—ধারা ঝরে যেথা ক্ষীরধারা
মানবের দুঃখ করি দূর।
আদি রাজা পৃথুসম অদ্রিরাজ অনুপম
যশোরাশি লভিল প্রচুর ॥১০॥

(৩)

অনন্তরত্ন প্রভবস্য তস্য
হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতম্।
একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ ॥৩॥

রম্য সেই ধরাধরে হিম দোষ নাহি ধরে
গুণে ঢাকা দোষটুকু তার।
চাঁদের সুষমারাশি কলঙ্ককালিমা-নাশী
অঙ্ক শোভে যেন অলঙ্কার ॥১১॥

মণি, রত্ন অগণন করে কর বিকিরণ
গিরি-কান্তি করিয়া বর্দ্ধন।
জড়তা জড়িত-কায় লাজে লুকাইতে চায়
চন্দ্র অঙ্কে কলঙ্ক যেমন ॥১২॥*

রজত-কিরীট শিরে দীপ্তি পায় চরাচরে—
ভীম কান্ত অচল মহান্।
পাষাণ আকার তার হৃদি গলে শত ধার
রাজধর্ম্ম যেন মূর্ত্তিমান্ ॥১৩॥*

(৪)

যশ্চাপ্সরোবিভ্রমমণ্ডনানাং
সম্পাদয়িত্রীং শিখিরৈর্বিভর্ত্তি।
বলাহকচ্ছেদবিভক্তরাগা
মকালসন্ধ্যা মিবধাতুমত্তাম্ ॥৪॥

গিরির গৈরিক আভা মেঘে ফুটে মনোলোভা
সন্ধ্যারাগ-সমান শোভন।
অকালে হেরিয়া তায় ব্যস্ততায় বেগে ধায়
প্রসাধনে অপ্সরার গণ ॥১৪॥

গৈরিক রক্তিম রাগে সন্ধ্যা-ভ্রম দিবাভাগে
মনোরম সদা হিমালয়।
শৃঙ্গ তার অভ্র চুমি অপ্সরার লীলাভূমি
স্বর্গ যেন ধরাতে উদয় ॥১৫॥]

(৫)

আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাম্
ছায়া মধঃ সানুগতাং নিষেব্য।
উদ্বেজিতা বৃষ্টিভি রাশ্রয়ন্তে
শৃঙ্গাণি যস্যাতপবন্তি সিদ্ধাঃ ॥৫॥

মেখলায় মেঘমালা অপরূপ করে খেলা
নিম্নে ছায়া উর্দ্ধেতে তপন।
বরষিলে মেঘবারি নিম্ন ভূমি পরিহরি—
উর্দ্ধভাগে ধায় সিদ্ধগণ ॥১৬॥

সেথা তপনের তাপে দেহ মন যদি তাপে
অনাতপ করে মেঘমালা।
বরষণে বারি-ভয় মেঘোপরি নাহি রয়
রবিকর করে সেথা খেলা ॥১৭॥

* জাড্যদোষ—হিমালয়ে এবং কলঙ্কদোষ চন্দ্রে যেন গুণরাশির মধ্যে লজ্জায় লুক্কায়িত।

* উচ্চ চূড়াস্থিত রজতশুভ্র হিমরাশি গিরিরাজের অপূর্ব্ব প্রভাবিমণ্ডিত কিরীটসদৃশ। পাষাণময় গিরিবক্ষ হইতে সহস্র নির্ঝরিণী প্রবাহিত। রাজধর্ম্মে কোমলতা ও কঠোরতা উভয়ই প্রকাশ পায়।

মনে হয় গিরিরাজ ধরি যোগিরাজ-সাজ
ধ্যানাসনে ধ্যানেতে মগন।
শিরে যত হিমকূট শুভ্র যেন জটাজুট
বক্ষে ঘন ঘন-আবরণ ॥১৮॥
ঊর্দ্ধপথে তমোরাশি— মায়া, মোহ—মেঘ নাশি'
জ্যোতির্ম্ময় ভাতিছে ললাট।
তদুপরি নিরমল রবি করে † ঝলমল
যোগিরাজ-মূরতি বিরাট ॥১৯॥

† রবিকরে ঝলমল=(১) সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত; (২) রবি ঝলমল করে।

৬)

পদং তুষারস্রুতিধৌতরক্তম্
যস্মিন্নদৃষ্ট্বাপি হতদ্বিপানাম্।
বিদন্তি মার্গং নখরন্ধ্রমুক্তৈ
র্মুক্তাফলৈঃ কেসরিণাং কিরাতাঃ ॥৬॥

যেথা মৃগরাজগণ করিকুম্ভ বিদারণ
করি করে গর্ব্বে বিচরণ।
গজমুক্তা নখ হ'তে মুক্ত হয়ে পড়ে' পথে
অগণন রহে নিদর্শন ॥২০॥
হিমজলে ধৌতরক্ত কেশরীর নখমুক্ত
মুক্তাফল ব্যক্ত করে পথ।
প্রবল কিরাতবল যেই পথে সিংহ দল
গেছে বলি' হয় অবগত ॥২১॥

(ক্রমশঃ)

সাহিত্যিক ক্রীড়াক্ষেত্র।

দশবৎসর যাবৎ বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক অলোচনার জন্ত দেশের নানাস্থানে 'সাহিত্য-সম্মিলন' নামক বার্ষিক সাহিত্যিক বারোয়ারীর বৈঠক বসিয়া আসিতেছে। এই বৈঠকে রকমোয়ারি সাহিত্যিক সম্মিলিত হইয়া রকমোয়ারি খেলা খেলিতেছেন! আয়োজন-অনুষ্ঠানের ধুমধামের কসুর হয় না,—আদর-আপ্যায়নে উদারতারও কৃপণতা দেখা যায় না! কিন্তু কাষের কাষ কিছু হইতেছে বলিয়া কেহ অনুভব করিবার সুবিধা পায় না!

বর্দ্ধমানে এই সম্মিলনের অধিবেশনের পর বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহোদয় ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বার্ষিক বারোয়ারির বৈঠকে শুদ্ধ হৈ চৈ,—ভিন্ন ভিন্ন লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় এবং ত্রিবাসরীয় আহ্লাদ-আমোদ ব্যতীত আর কিছুই হইতে দেখা যায় না। কারণ, এই বার্ষিক উচ্চবাচ্য করেন না। এই কলঙ্ক মোচনের উদ্দেশ্যে তিনি পাঁচশত টাকার কয়েকটী বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন শাখার প্রবন্ধ লেখকদিগকে, গুণানুসারে এই বৃত্তি প্রদত্ত হইবে, তাঁহার ঘোষণার মর্ম্ম ইহাই ছিল। তাহাতেও কোনরূপ সুফল প্রসূত হইয়াছে বলিয়া টের পাওয়া যায় না।

সাহিত্যচর্চ্চার জন্ত যখন স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ, পণ্ডিত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, স্বর্গীয় পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, ব্যোমকেশ মুস্তফী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ সাহিত্য-সুহৃদ্বর্গের প্রযত্নে "সাহিত্য-পরিষদ্"গঠিত হয়, তখন অনেকেই মনে করিয়াছিল, ইহা দ্বারা সাহিত্যের উন্নতির একটা পথ প্রশস্ত হইবে। বাঙ্গালীর প্রকৃতিগত ধর্ম্মে অচিরেই অনু-

পরিষদ্ স্থানান্তরিত হইল, রাজা বিনয়কৃষ্ণ "সাহিত্য-সভার"র সৃষ্টি করিলেন। বলা বাহুল্য, অনুষ্ঠাতৃবর্গ দুই দলে বিভক্ত হইলেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কার্য্যানুরাগ বৃদ্ধি পায়, এই কথা মনে করিয়া তখন জনসাধারণ আরও একটু আশান্বিত হইবার সুবিধা পাইল।

অস্তিত্ব সম্বন্ধে জনসাধারণের একটা সন্দেহ থাকিলেও, বহুবাজার শ্রীনাথদাসের লেনের ১৭ নং বাটীর ঠিকানায় "সাহিত্য-সম্মিলন" নামক একটা কিছুর আলোচনা কোন কোন বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রে দেখা যাইত। স্বর্গীয় পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রমুখ জন-কয়েক লোকের নাম ইহার সংসৃষ্ট ছিল।

সদনুষ্ঠানের ক্ষেত্র যত সুপ্রশস্ত হয়, সদনুষ্ঠানে নেতার সংখ্যা যত বেশী থাকে, কার্য্যে সাফল্য সম্বন্ধে লোকে ততই আশ্বস্ত হইবার সুবিধা পায়। জনসাধারণের সহানুভূতি লাভের পক্ষে ইহা অতি সুগম পথ। কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহাতে বিপরীত ফল প্রসূত হইল। কার্য্যকলাপে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহাদের মধ্যে যে দুটী দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে সুফলপ্রসূত হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহারা এখন লক্ষ্যভ্রষ্ট! যে উদ্দেশ্যে 'সাহিত্য-সভা' ও 'সাহিত্য-পরিষৎ' গঠিত হইয়াছিল, পরিচালকবর্গ এক্ষন তাহা হইতে অনেক তফাতে যাইয়া পড়িয়াছেন। আরও একটু খোলাসা করিয়া বলাই উচিত।

'সাহিত্য-সভা' এখনও সেই মামুলী বন্দোবস্তেই চলিতেছে। পরিচালকবর্গের মধ্যে অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকিলেও বন্দোবস্তটা ঠিক বনেদী চালেই চলিতেছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর সৃষ্টি হইতেই ইহার কর্ণধার রহিয়াছেন। কিন্তু সাহিত্যের উন্নতি সম্বন্ধে কোনরূপ চেষ্টা এপর্য্যন্ত হইয়াছে বলিয়া বশেষ পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

ইয়াছে, তাহা উহার কর্ম্ম-কর্ত্তারা ব্যতীত অপরে খুব কমই বুঝিতে পারিতেছেন! পরিষদের সৃষ্টির পর কিছুদিন ঠাকুরবাড়ীর একচেটিয়া আধিপত্যে ইহার কার্য্য পরিচালিত হইত। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতিরূপে মাঝে মাঝে কবিতার কসরৎ করিতেন; সে কবিতার মাথামুণ্ড কেহ কিছু বুঝিতে না পারিলেও হাততালির ধ্বনিতে আকাশ পাতাল মুখরিত হইত। তখন আমাদের ন্যায় অনেক হতভাগ্য ইহাকে 'পিরিলী পরিষদ্' বলিয়া মনে না করিয়া থাকিতে পরিতেন না!

কিছু দিন এই ভাবে চলিয়া পটপরিবর্ত্তন হইল। এইবার শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিশ্বকোষের নগেন্দ্রনাথ বসু, মৃণালকান্তি ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ইহার সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িলেন। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় দ্বয় 'কীর্ত্তনের ধারে ধারে' ঘুরিয়া বেড়াইলেও, ইহাকে 'কায়স্থ পরিষদ্' ব্যতীত অন্য আখ্যা দেওয়া অসঙ্গত বলিয়াই মনে হইত এবং এখনও হয়। অধুনা আচার্য্য জগদীশচন্দ্র পরিষদের সভাপতি হইয়াছেন, সোণায় সোহাগা হইয়াছে। নামের সার্থকতা সম্বন্ধে এখন আর কোন গোলযোগ রহিল না। এখন ঢাক, ঢোল, কাঁসর, সানাই প্রভৃতি পূর্ব্বোল্লিখিত কর্ম্মকর্ত্তারাই বাজাইয়া থাকেন, ত্রিবেদী মহাশয় কেবল "পোঁ" ধরিয়া আছেন।

এহেন 'পরিষদ্' দ্বারা কি কার্য্য হইতেছে, তাহার খতিয়ান করিলে বুঝা যায়, নানাদিগ্‌দেশীয় তাম্রফলক আবিষ্কৃত ও রচিত হইয়া পরিষদ্ মন্দিরে রক্ষিত হইতেছে,—প্রকৃত-অপ্রকৃত নির্ব্বিশেষে এইসকল তাম্রফলকের পাঠ উদ্ধার হইয়া 'বিশ্বকোষ' প্রেসের মুদ্রনকার্য্যের পোষকতা করিতেছে; আর হইতেছে—স্মৃতি-সভা, স্মৃতিভবনের পৌনঃপুনিক অনুষ্ঠান! সম্প্রতি ভূতপূর্ব্ব সভাপতি রমেশচন্দ্র

মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, স্বয়ং বাঙ্গলার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল এই শুভকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। দিনকতক পরে হয় ত লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের সভাপতিত্বে 'নগেন্দ্র-ভবন' প্রতিষ্ঠার আয়োজনও লোকে দেখিতে পাইবে! 'বিশ্বকোষ-লেন' নামক একটী নাতিদীর্ঘ রাস্তা ত ইতিমধ্যেই কাঁটাপুকুরে দৃষ্টিগোচর হইতেছে!

উপরে যে কয়টী 'সাহিত্যিক আস্তানার' কথা উল্লিখিত হইল, সাহিত্য অথবা ভাষার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে কোনরূপ অনুষ্ঠানের প্রয়াস কাহারও দ্বারা হইয়াছে বা হইতেছে বলিয়া এপর্য্যন্ত কেহ টের পান নাই, সম্প্রতি একটু একটু টের পাওয়া যাইতেছে! ঠাকুর বাটীর ঠাকুর-ঠাকুরাণী পরিচালিত'সবুজপত্র' এবং 'ভারতী'পত্রে "পিরিলী-ভাষা"র ছটায় তাহা জনসাধারণ এখন বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন! অনেকের বিশ্বাস, দিনকতকের জন্য পরিষদের মাতব্বরী তক্ত পাইয়া মহর্ষিবংশধরগণ (!) স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে বাঙ্গালা-সাহিত্যক্ষেত্রটাকে ঠাকুরবাড়ীর 'খাস মহল' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন! সেইজন্যই পিরিলী বাড়ীর আন্তঃপুরিক ভাষায় সাহিত্যগঠনে তাঁহারা লজ্জা বোধ করা আবশ্যক মনে করেন না।

রবীন্দ্রনাথের 'নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্তির পর তিনি যেরূপ প্রকৃতির পরিচয় দিতেছেন, জাপান যাইয়া তাঁহার প্রকৃতি প্রবৃত্তির যেটুকু উন্মেষ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ, তাহা হইতে অনুমান হয় যে লজ্জা-সরম বলিয়া জিনিষটাকে তিনি এবারে চিরজন্মের মত প্রশান্তসাগরে বিসর্জন দিয়াছেন! দেশে ফিরিয়া আসিয়া হয় ত এবারে জাপানী নর-নারীর অনুকরণে তিনি উলঙ্গ হইয়া স্ত্রীপুরুষে এক টবে স্নান করিবার প্রথা স্বালয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবেন!

রবি-ঠাকুর নিজের পাঁটা লেজের দিকে কাটুন তাহাতে বাঙ্গালী জাতির কোন ইষ্টানিষ্ট নাই; কিন্তু বাঙ্গালা-সাহিত্য এবং ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার অথবা তাঁহার গোষ্ঠীবর্গের স্বেচ্ছাচারিতা দশজনে প্রশ্রয় দিতে যাইবে কেন? বাঙ্গালাভাষা এবং বাঙ্গলাসাহিত্যের উপর ইঁহাদের স্বেচ্ছাচারিতা এবং অত্যাচার অনেক দিন হইতেই সুরু হইয়াছে, সাহিত্য-সভা এবং সাহিত্যপরিষদ্ এই অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রতি দৃক্‌পাত করিতেছেন না! ইহা দেখিয়া যদি কেহ ইঁহাদিগকে লক্ষ্যভ্রষ্ট অথবা কর্ত্তব্যপালন-বিমূঢ় দোষে দুষ্ট বলিয়া অভিহিত করে, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে বেশী বে-আদবী হইবে বলিয়া মনে হয় না।

যখন লর্ড কর্জ্জন বাঙ্গালা দেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন, তখন বাঙ্গালাভাষা বিকৃত হইবে বলিয়া একটা আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল; কারণ, বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন জেলার প্রাদেশিক ভাষায় অনেক পার্থক্য আছে। আমাদের মনে হয়, সাহিত্য-পরিষদও তখন এই আপত্তির পোষকতা করিয়াছিলেন। অধুনা সগোষ্ঠী পিরিলী সম্প্রদায় যে পিরিলী-প্রাদেশিক ভাষা দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের গঠন করিবার জন্য কাঠামো খাড়া করিতেছেন, 'পরিষদ্' এখন তাহাতে উচ্চবাচ্য করেন না কেন? এ সম্বন্ধে যদি 'পরিষদ্' অথবা 'সাহিত্য-সভা' নীরব থাকেন, তাহা হইলে এই দুটীর অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা কি, তাহা আমরা বুঝিব কিরূপে?

সম্প্রতি বাঁকিপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বৈঠক বসিবার ডঙ্কা বাজিয়াছে। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইহার প্রধান সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় যাঁহারা সভাপতি পদে বৃত হইয়াছেন, খাঁটী সাহিত্যিক বলিয়া তাঁহাদের সকলের পরিচয় পাইবার সুবিধা না থাকিলেও, সাহিত্যিকের খাতায় তাঁহাদের নাম লেখান আছে। এতদ্ভিন্ন আধুনিক সাহিত্যিক আইনে, বি, এ, এম্, এ, উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিমাত্রেই যে বাঙ্গালা সাহিত্যে এবং বাঙ্গালা ভাষায় মাতব্বরী তক্ত দাবি করিতে পারেন, সহযোগী 'ভারতবর্ষ' তাহার জলন্ত প্রমাণ। এই প্রমাণ প্রয়োগের প্রতিকূলে কোন কথা বলা ভয়ানক

মুস্কিল। "এম্, এ, বি, এ পাশ করিয়াছে, তাহারা বাঙ্গালা লিখিতে পারিবে না" এরূপ কথা কখনও সম্ভব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে ?" সাহিত্যের দোকানদারদিগের এই ধারণা হইতেই বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের এরূপ সর্ব্বনাশের সূচনা হইতেছে। অচিরে ইহার কোনরূপ প্রতিকার চেষ্টা না হইলে, 'সাহিত্য ও ভাষা'র অস্তিত্ব লোপ হওয়া বিচিত্র নহে।

জাতি ও বর্ণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন বি, এল।]

গীতার 'চাতুর্ব্বর্ণ্য' কথাটী চতুর্ব্বর্ণময় সৃষ্ট জগৎ-কেই বুঝাইতেছে, তদ্দ্বারা কেবল মানবীয় বর্ণচতুষ্টয় যে ভগবৎসৃষ্ট তাহা বলা হয় নাই। এই ভগবৎসৃষ্ট জগতে চর ও অচর যতপ্রকার সৃষ্ট ভূত আছে, তাহা চারি বর্ণে বিভাজ্য। এই বর্ণবিভাগ লব্ধ বা অনুষ্ঠিত গুণ ও কর্ম্মানুসারে করণীয়।

মনুষ্যজাতির মধ্যে যে বর্ণের বিভাগ ভগবৎকৃত নহে তাহা আমরা পুরাণ হইতে সুস্পষ্ট দেখিতে পাই, যথা :—

বর্ণানাং প্রবিভাগশ্চ ত্রেতায়াং সংপ্রকীর্ত্তিতাঃ।
সংহিতাশ্চ ততো মন্ত্র, ঋষিভি ব্র্রাহ্মণৈ স্তুতে ॥

ইহা কীর্ত্তিত আছে যে ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ঋষিগণ দ্বারা (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এইরূপে) বর্ণসকলের বিভাগ ও বৈদিক মন্ত্র সকল সমাহৃত হইয়া (ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এইরূপ) সংহিতা-কার প্রাপ্ত হইয়াছিল।"

এই বায়ু পুরাণোক্ত বচন হইতে আমরা দেখিলাম যে মহামতি কুল্লুকও মেধাতিথি কৃত ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ প্রমাদদুষ্ট। যদ তাঁহাদের ব্যাখ্যা ঠিক হয়, তাহা হইলে, মনুর নিজের বচনেরই পরস্পর বিরোধ হয়, এবং মনুর সহিত বায়ু পুরাণের বিরোধ ঘটে। বায়ু পুরাণ বচন মনুবিরুদ্ধ হইলে অবশ্যই পরিত্যজ্য, কিন্তু যখন উহাঁর লেখক স্বয়ং ভগবান্ এমন কোন অর্থ হইতে পারে কি না যাহাতে উভয় বচনের সামঞ্জস্য রক্ষা হয়, নতুবা আমাদের হঠ-কারিতা প্রকাশ পায়। আমরা দেখিতেছি 'তস্' প্রত্যয়টী প্রথমান্ত ও পঞ্চম্যন্ত উভয় প্রকারেই সম্ভব। এবং প্রথমান্ত 'তস্' করিলে মনু ও ব্যাস বচনের ঐক্য হয় ; তখন মহামতি মেধাতিথি ও কুল্লুকের পরামর্শে বশিষ্ঠ নপ্তা ভগবান্ বাদরায়ণিকে অজ্ঞ ও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিতে কুণ্ঠিত হইলাম।

যাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ আছে তাঁহারই মুখ বাহু উরু ও পদ থাকিতে পারে, যাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ নাই, তাঁহাতে কিরূপে এইসকল পাঞ্চভৌতিক অবয়বের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বর্ত্তমান থাকিবে ? এবং তাহা হইতে কিরূপে জাতির উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে ? ব্রহ্মার যে স্থুল শরীর ছিল না তাহা ভগবান্ বশিষ্ঠদেব স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যথা :—

"বশিষ্ঠ কহিলেন, সমুদয় সকারণ (পঞ্চীকৃত-ভূতোৎপন্ন দেহাদি বিশিষ্ট) প্রাণীর আতিবাহিক ও আধিভৌতিক এই দুই শরীর আছে ; পরন্ত কারণাভাব প্রযুক্ত ব্রহ্মার আধিভৌতিক (মুখাদি অঙ্গ বিশিষ্ট) শরীর নাই। তাঁহার একই শরীর।৮। ইনি সকল ভূতের কারণ, অথচ ইহাঁর কোন কারণ নাই। তাই ইনি একদেহী, দ্বিদেহী নহেন।৯। ইহাঁর ভৌতিক দেহ নাই, ভৌতিক দেহ না থাকায়

আকাশের সমানে ভাসমান আছেন। ১০। পৃথ্বাদি রহিত চিত্তমাত্র শরীর (চিত্ত=সঙ্কল্প) প্রজাপতি যেসকল প্রজা সৃজন করিয়াছেন। ১১। সেইসমস্ত প্রজাও চিদাকাশ স্বরূপ প্রজাপতি ভিন্ন অন্য কারণ-সম্ভূত নহে। কারণ এই যে, যে যে বস্তু হইতে উৎপন্ন হয়, সে সেই বস্তুরই অনুরূপ হয়। ১২।"—উৎপত্তিপ্রকরণ, ৩য় সর্গ। কালীবর বেদান্তবাগীশ অনূদিত বাশিষ্ঠমহারামায়ণ।

যদি বলেন ব্রহ্মার শরীরের কথা ত মনু-সংহিতায় স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইয়াছে যথা :—

সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুঃ বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥

মনু ১।৮

"[সপ্তম শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট] সেই স্বয়ম্ভূ (ব্রহ্মা) স্বীয় শরীর হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া (মহদাদিক্রমে অগ্নি পর্য্যন্ত সৃষ্টিকরণানন্তর ধ্যান বলে) অগ্রে জল সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং সেই জলে পৃথিবী সৃজনক্ষম (ইচ্ছাশক্তিরূপ) বীজ নিহিত করিয়াছিলেন।"

অবশ্য এই শ্লোকে ব্রহ্মার শরীর থাকার কথা উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু সে শরীরটী ভূতশরীর নহে সূক্ষ্ম বা আতিবাহিক শরীর। ভূতশরীর ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, আতিবাহিক শরীর অতীন্দ্রিয়, তাহার কেবল অনুভবরূপ মানস প্রত্যক্ষ হয়, তাহা আকাশবৎ শূন্য অথচ শূন্য নহে সৎ। মনু স্বয়ং এই স্বয়ম্ভূর রূপের কথা বর্ণন করিয়াছেন যথা :—

যোঽসৌ অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ॥ মনু ১।৭

সেই বেদপুরাণাদি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ স্বয়ম্ভূ (মঙ্গলময় ব্রহ্মা) যিনি একাদশ ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিয়া আছেন, যিনি নিরবয়ব বলিয়া ইন্দ্রিয়গণের অগ্রাহ্য, যাঁহাকে বাক্য ও মনের দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না বলিয়া অব্যক্ত বলা যায়, যিনি চিত্তমাত্রশরীরীও পঞ্চভূতকৃত দেহহীন বলিয়া সূক্ষ্ম, এবং সেইজন্য বর্ত্তমান বলিয়া সনাতন, যিনি অরূপ অব্যয় এমন কি চিন্তা দ্বারাও ধ্যেয় নহেন, এবং একমাত্র যোগাধিগম্য বলিয়া অচিন্ত্য, তিনি স্বয়ং অর্থাৎ অকারণ লীলাচ্ছলে সর্ব্বভূতময় হইলেন।"

এই সঙ্কল্পমাত্র আতিবাহিক শরীরী ব্রহ্মার কোন অবয়ব না থাকা সত্বেও যে কেন তাঁহার সম্বন্ধে শরীর, মূর্ত্তি ও অবয়বাদি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার আভাস এই সপ্তম শ্লোকেই "সর্ব্বভূতময়ঃ" বাক্যের দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছে। 'সর্ব্বভূতময়' অর্থাৎ কাল-ক্ষেত্র-প্রধান-অব্যক্ত-মহদাদিতত্ব ভূতাত্মক হইয়া যিনি ভূতসৃষ্টির কারণ স্বরূপ হইলেন। মনু স্বয়ং পরে ইহা বিশদীকৃত করিয়াছেন যথা—

যন্মূর্ত্ত্যবয়বাঃ সূক্ষ্মা স্তস্যেমান্যাশ্রয়ন্তি ষট্।
তস্মাচ্ছরীর মিত্যাহু স্তস্য মূর্ত্তিং মনীষিণঃ॥ মনু ১।১৭

প্রকৃতিযুক্ত ব্রহ্মার মূর্ত্তি সম্পাদক অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র, এই ছয়টি, সূক্ষ্ম অবয়ব আছে। এই সূক্ষ্ম অবয়বগুলি যেহেতু (তাহাদের বিবর্ত্ত) ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূতাদিকে স্ব স্ব কার্য্যরূপে আশ্রয় করে, সেই হেতু মনীষিগণ, তদীয় (সূক্ষ্ম রূপক কল্পিত) মূর্ত্তিকে শরীর বলিয়া থাকেন।

পাঠক দেখিলেন ব্রহ্মার কেবল আতিবাহিক সঙ্কল্প মাত্র শরীর ছিল তাঁহার পঞ্চীকৃত মহাভূতোৎপন্ন দেহই ছিল না অতএব মুখাদি হইতে ব্রহ্মণাদি জাতির উৎপত্তি কতদূর শ্রুতিসিদ্ধ তাহা বুঝিতেই পারিতেছেন! অথচ দিগ্গজ পণ্ডিত কুল্লুক ও মেধাতিথি নির্ভয়ে চক্ষুলজ্জাকে জন্মের মত জলাঞ্জলি দিয়া বলিলেন "দৈবশক্তি দ্বারা মুখাদি অঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণাদি নির্ম্মাণ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক হইয়াছে, ইহা আশঙ্কা করা উচিত নহে যেহেতু ইহা শ্রুতিসিদ্ধ।" বলিতে হইবে কি, যে এই "আশঙ্কা করা উচিত নহে" বাক্যই ইঙ্গিত করিতেছে যে মহামতি কুল্লুকের ইহা জ্ঞান কৃত পাপ? ঠাকুর ঘরে কে? প্রশ্নের উত্তরে যেমন জ্ঞানকৃত পাপী বলিয়া ফেলে "আমিত কলা খাই নাই" ইঁহার

মনুসংহিতা ১।১৭ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"যেহেতু মূর্ত্তি সম্পাদক পঞ্চতন্মাত্রাহঙ্কাররূপ ব্রহ্ম-শরীরের সূক্ষ্ম ছয় অবয়ব পঞ্চমহাভূত ও ইন্দ্রিয়গণকে স্বস্ব কার্য্যস্বরূপে আশ্রয় করিয়া জীব দেহ সম্পাদন করে, সেইহেতু ব্রহ্মার প্রকৃতি বা স্বভাব যাহা ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট জীবদেহে পরিণত হয়, তাহাকে মূর্ত্তি বলে।" পুনশ্চ তিনি মনু ১।৮ শ্লোকের "স্বীয় শরীর হইতে" কথার অর্থ করিতে বলিয়াছেন "স্বীয় অব্যাকৃত নিজস্বরূপ হইতে—'অব্যাকৃত'ই প্রকৃতি এবং তাহাই ব্রহ্মার শরীর।" এবং 'প্রকৃতি' কি তাহা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন, যে "পঞ্চভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, কর্ম্ম, অবিদ্যা, অজ্ঞান বা বাসনা ইহারা সূক্ষ্মতম আকারে শক্তিরূপে অপ্রকাশিত বা অপ্রকটিতরূপে অবস্থিত হইলে অব্যাকৃত অভিহিত হয়।" অতএব ইহা প্রমাণিত হইল, যে বিদ্বান্ কুল্লুক, বিশিষ্টরূপেই জানিতেন, যে ব্রহ্মা নিরাকার, তাঁহার মুখাদি অবয়ববিশিষ্ট স্থূলশরীর নাই, অব্যাকৃত, প্রকৃতি বা ব্রহ্মশক্তিকেই তাঁহার শরীর বলা হয়, যেহেতু তাহা হইতে সাবয়ব জীব উৎপন্ন হয়। এবং এই অব্যাকৃত শরীরী ব্রহ্মার মুখাদি অবয়ব কল্পনা, কেবল রূপকে গুণকর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ও অপকর্ষানুসারে তল্লব্ধ বর্ণের উচ্চাবচতা জ্ঞাপন করিবার জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় অম্বষ্ঠ বিদ্বেষে তিনি এতদূর বিদগ্ধ হইতেছিলেন, যে স্মার্ত্তের পবিত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও আত্মহারা হইয়া ধর্ম্মকে পদদলিত করিয়া বলিয়া ফেলিলেন—মনুষ্যসমাজের ব্রাহ্মণাদি চারিমূল জাতি ব্রহ্মার মুখাদি হইতে জাত। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন এই অসত্য বাক্যে আশঙ্কার বহু কারণ আছে, সেইজন্য "দৈবশক্তির দ্বারা সৃজিত, ও ইহা শ্রুতিসিদ্ধ ইত্যাদি অযথা বাক্যের দ্বারা বিশ্বাসোৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন।

বেদপ্রতিম মান্য শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতে আমরা চতুবর্ণের উৎপত্তি বিষয়ক আখ্যায়িকাটি রূপকাবৃত। ব্রাহ্মণাদি চতুষ্টয়কে কেন যথাক্রমে 'মুখবাহুরূপাদজ' বলা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে যথা:—

> মুখতোঽবর্ত্তত ব্রহ্ম পুরুষস্য কুরুদ্বহ।
> যস্তূন্মুখত্বাদ্বর্ণানাং মুখ্যোঽভূদ্ ব্রাহ্মণো গুরুঃ॥
> বাহুভ্যোঽবর্ত্তত ক্ষাত্রং ক্ষত্রিয় স্তদনুব্রতঃ।
> যো জাত স্ত্রায়তে বর্ণান্ পৌরুষকণ্টকক্ষতাৎ॥
> বিশো বর্ত্তত তস্যোর্ব্বো র্লোকবৃত্তিকরী বিভোঃ।
> বৈশ্য স্তদুদ্ভবো বার্ত্তাং নৃ্নাং যঃ সমবর্ত্তয়ৎ॥
> পদ্ভ্যাং ভগবতো জজ্ঞে শুশ্রূষা কর্ম্মসিদ্ধয়ে।
> তস্যাঞ্জাতঃ পুরাশূদ্রো যদ্‌বৃত্ত্যাতুষ্যতে হরিঃ॥
>
> ভাগবৎ ৩।৬।২৯-৩২।

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! হিরণ্যগর্ভাখ্য পুরুষের মুখ হইতে বেদ প্রকাশিত হইয়াছে তজ্জন্য যিনি এই মুখজ বেদের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, আলোচনা ও উপদেশাদি মুখকার্য্য দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানে উন্মুখ হইয়াছেন, তিনি যেন ব্রহ্ম পুরুষের মুখ হইতে জাত, মুখজ (ব্রাহ্মণ অর্থাৎ অগ্রজ বা মুখ্য) ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হন। এবং (জ্ঞানের স্থান সর্ব্বোচ্চে বলিয়া) তিনি সকল বর্ণের গুরুস্থানীয়।২৯। (সেই হিরণ্যগর্ভাখ্য পুরুষের) বাহুদ্বয় হইতে ক্ষাত্র বল প্রাদুর্ভূত হইয়াছে সেইজন্য যিনি বাহুজ ক্ষাত্রবল আশ্রয় করিয়া দস্যু চৌরাদির ক্ষত বা উপদ্রব হইতে সমাজ শরীরকে রক্ষা করেন তিনি যেন বাহুজ (ব্রাহ্মণ) বা ক্ষত্রিয় নামে খ্যাত।৩০। সেই বিভু হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্মার উরু হইতে বিশা নামক জীব পোষণকরী কৃষি বাণিজ্যাদি স্বাধীন বৃত্তিসকল উৎপন্ন হইয়াছে, সেইজন্য যিনি স্বাধীন বিশা বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাণী সমষ্টিকে পোষণ করেন, তিনি যেন উরুজ (ব্রাহ্মণ) বা (বিশা হইতে জাত) বৈশ্য (ব্রাহ্মণ) বলিয়া খ্যাত হন।৩১। ভগবান্ হিরণ্যগর্ভের পদদ্বয় হইতে ধর্ম্ম সিদ্ধির জন্য শুশ্রূষা বৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে; এইজন্য যিনি হরি (বা সমাজ)

করিয়া শুদ্ধ হন তিনি যেন পাদজ (ব্রাহ্মণ) বা শূদ্র (ব্রাহ্মণ) কথিত হন। ৩২।

শ্রীমদ্ভাগবত অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বলিলেন যে ব্রহ্মার কোন অঙ্গ হইতে জন্মদ্বারায় কেহ কোন বর্ণ প্রাপ্ত হয় নাই, সকলেরই আপন আপন অবলম্বিত জীবিকোপায় দ্বারা বর্ণ লাভ হয়। যাহার যেটি বৃত্তি, সেটি তাহার জীবনপ্রদাতা বা জনক স্বরূপ সেই জন্য রূপক ছলে শাস্ত্রজীবিকে মুখজ বলা যায়। বলের আশ্রয় স্থান বাহু বা বক্ষ, এবং বলদ্বারা পালন হয়, এইজন্য ক্ষত্রিয়বৃত্তিককে রূপকে বাহুজ বা বক্ষজ বলা যায়; উরুই জননস্থান, এইজন্য ধনধান্য উৎপাদন কারী বিশা বৃত্তিককে রূপকে উরুজ বলা যায়; এবং সেবার জন্য পদ গৃহীত হয় সেইহেতু সেবাব্রতীকে রূপকে পদজ বলা সঙ্গত হয়।

যিনি স্থূল শরীর সমষ্টি, তিনি শাস্ত্রে বিরাট নামে অভিহিত হন। পঞ্চীকৃত মহাভূতোৎপন্ন প্রকট জগৎ তাঁহার শরীর। এবং যিনি সূক্ষ্ম শরীর সমষ্টি, তিনি শাস্ত্রে হিরণ্যগর্ভাখ্য পুরুষ, মন, বা ব্রহ্মা অভিহিত হন। তাঁহার দেহ আতিবাহিক। গুণ ও বৃত্তি হইতে বর্ণের উৎপত্তি হয়। সর্ব্বপ্রাণীর গুণ ও বৃত্তিগুলি তাহাদের আতিবাহিক দেহাশ্রিত। আতিবাহিক দেহই গুণ সমষ্টি, এবং বৃত্তিগুলি গুণধর্ম্ম। অতএব সর্ব্বপ্রাণীর জীবিকোপায়গুলিদ্বারা রূপকে হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্মপুরুষের শারীরিক অবয়ব কল্পিত হইয়াছে। মুখ শরীরের শ্রেষ্ঠ স্থান, শাস্ত্রচর্চ্চা বা জ্ঞানচর্চ্চা মুখের দ্বারায় হয়, ও ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি এইজন্য বর্ণগুরু শাস্ত্রজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ মুখজ কল্পিত হইলেন। বিপ্রের নিম্নে সমাজশাসক রাজার সম্মান; বাহু বা বক্ষই বলের আশ্রয়, সেইজন্য ক্ষত্রিয়কে কখন বাহুজ ও কখন বক্ষজ বলা হয়; একই কথা। জ্ঞানী ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর পরামর্শে রাজা সমাজকে সুশাসিত করিলে লোকে বিশা নাম্নী কৃষি বাণিজ্যাদি স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা ধনধান্য পারে, সেইজন্য বিশাবৃত্তিক বৈশ্যের সম্মান সমাজের তৃতীয় স্থানে, এবং উরুই জনন স্থান সেইজন্য তৃতীয় বর্ণ বৈশ্য উরুজ কল্পিত হয়। পদ শরীরের সর্ব্ব নিম্নে অবস্থিত; পদগ্রহণ করিয়াই সেবা করা যায়, সেইজন্য অবুদ্ধিজীবী সেবাপরায়ণ শূদ্রকে যেন পাদজ বলা হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে লৌকিক বিবৃদ্ধির জন্য বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে।

বায়ুপুরাণ আর একস্থলে বলিতেছেন যথা—

বক্ত্রাদস্য ব্রাহ্মণঃ সম্প্রসূতা
তদ্বক্ষসঃ ক্ষত্রিয়াঃ পূর্ব্বভাগে।
বৈশ্যশ্চোরুর্ব্বো যস্য পদ্ভ্যাঞ্চ শূদ্রাঃ
সর্ব্বে বর্ণা গাত্রতঃ সম্প্রসূতাঃ॥

বায়ু পু ৬।৭১

"সকল বর্ণই ব্রহ্মার গাত্র হইতে প্রসূত হইয়াছে, তাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, তাঁহার বক্ষঃস্থলের পূর্ব্বভাগ (হইতে) ক্ষত্রিয়, উরু (হইতে) বৈশ্য, এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র হইলেন।"

বিষ্ণু পুরাণ বলিয়াছেন :—

সত্যাভিধ্যায়িনঃ পূর্ব্বং সিসৃক্ষো ব্রহ্মণোজগৎ।
অজায়ন্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সত্বোদ্রিক্তা মুখাৎপ্রজাঃ॥
বক্ষসো রজসোদ্রিক্তা স্তথাবৈ ব্রহ্মণোঽভবন্।
রজসা তমসা চৈব সমুদ্রিক্তা স্তথোরুজাঃ॥
পদ্ভ্যামন্যাঃ প্রজা ব্রহ্মন্ সসর্জ দ্বিজসত্তম।
তমঃ প্রধানাস্তাঃ সর্ব্বা শ্চাতুর্ব্বর্ণ্যমিদংততঃ॥

"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মা সৃষ্টির আদিতে জগৎ সৃজনেচ্ছু হইলে আকাশবৎ সর্ব্বত্র ও একমাত্র বিদ্যমান বলিয়া সত্যস্বরূপ বা সত্যাখ্য ব্রহ্মার (কল্পিত) মুখ হইতে সত্ত্বগুণ উদ্রিক্ত হইয়া কতকগুলি (ব্রাহ্মণ বর্ণ) প্রজা হইল, তাঁহার রজোগুণ উদ্রিক্ত হইয়া তদীয় (কল্পিত) বক্ষস্থল হইতে কতকগুলি (ক্ষত্রিয়বর্ণ) প্রজা হইল। তদীয় রজস্তমোগুণ উদ্রিক্ত হইয়া তদীয় (সূক্ষ্মদেহের কল্পিত শরীরের) উরুদেশ হইতে কতক-(বৈশ্যবর্ণ) প্রজা উৎপন্ন হইল এবং তদীয়

অন্ত্য (শূদ্রবর্ণ) প্রজা সৃজন করিলেন এইরূপে চাতুর্ব্বর্ণ্যে জগৎ পরিব্যাপ্ত হইল।”

অব্যবহিত উপরি উদ্ধৃত বায়ু ও বিষ্ণু পুরাণ বচনদ্বয়েও রূপকছলে, বর্ণোৎপত্তির কথাই বিবৃত হইয়াছে, জাত্যুৎপত্তির কথা বলা হয় নাই। যেহেতু এই দুই বচনে ক্ষত্রিয়কে বক্ষজ বলা হইয়াছে, কিন্তু মনু ও ভাগবতে বাহুজ বলা হইয়াছে। রূপকে বলের স্থানকে বাহু বা বক্ষ উভয়ই বলা যাইতে পারে কোন দোষ হয় না। নতুবা এগুলি স্থূল শরীরের অবয়ব হইলে শাস্ত্রগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। বায়ু পুরাণে যে গাত্র শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা স্থূলশরীর নহে যেহেতু ব্রহ্ম পুরুষের স্থূলশরীর নাই, ইহা আতিবাহিক বা সূক্ষ্ম শরীর। অতএব বিষ্ণু পুরাণে যে মুখাদি অবয়বের উল্লেখ আছে, তদ্দারা রূপকে শারীরিক মুখাদি ক্রমে বর্ণের শ্রেষ্ঠতা অপকর্ষতা বর্ণিত হইয়াছে মাত্র। সেইজন্য স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে মনঃস্বরূপ ব্রহ্মার সত্ত্বগুণ হইতে ব্রাহ্মণবর্ণ, রজোগুণ হইতে ক্ষত্রিয়বর্ণ, রজস্তমোগুণ হইতে বৈশ্যবর্ণ ও তমঃপ্রধান গুণ হইতে শূদ্রবর্ণ হইয়াছে। অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টির পূর্ব্বে এইরূপে বর্ণ নাম নির্দ্দেশ করিলেন যে সৃষ্ট জীবের মধ্যে যাহারা সত্ত্বপ্রধান হইবেন বা সাত্ত্বিকবৃত্তি অবলম্বন করিবেন তাহারা ব্রাহ্মণ, যাহারা রজঃপ্রধান হইবেন বা রাজসিকবৃত্তি অবলম্বন করিবেন তাহারা ক্ষত্রিয়, যাহারা রজস্তম মিশ্র প্রকৃতিবিশিষ্ট বা রজস্তমোগুণান্বিতবৃত্তি অবলম্বন করিবেন তাহারা বৈশ্য ও যাহারা তমোগুণপ্রধান বা তামসিকবৃত্তি অবলম্বন করিবেন তাহারা শূদ্র হইবেন। সত্ত্বগুণে জ্ঞান, রজোগুণে বল, রজস্তমোগুণে বিষয়বাসনা ও তমোগুণে অজ্ঞানপ্রধাণ হয়। (ক্রমশঃ)

সদাচার।

[শ্রীযতীন্দ্র মোহন সেন বি, এল।]

পূর্ব্বোদ্ধৃত কঠোপনিষৎ বচনের অর্থ এই যেঃ—

শরীরকে রথরূপ জানিবে, আত্মাকে সেই রথের অধিষ্ঠাতা রথী, বুদ্ধিকে তাহার সারথি, এবং মনকে তাহার লাগাম, বলিয়া জানিবে। মনীষিগণ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহকে শরীররূপ রথের চালক অশ্বস্বরূপ, এবং শব্দাদি (স্থূল ও সূক্ষ্ম) বিষয় সমূহকে সেই ইন্দ্রিয়গণের বিচরণ পথ বলিয়া থাকেন। এবং শরীর ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত আত্মাকে সুখ দুঃখাদির ভোক্তা বা অনুভবিতা বলিয়া থাকেন। যে বুদ্ধিরূপ সারথি সর্ব্বদা অসংযত মনের সহিত সম্বদ্ধ, তাঁহার ইন্দ্রিয় সমূহ বশীভূত থাকে না। কিন্তু যাঁহার বুদ্ধি সর্ব্বদা সংযতমনের দ্বারা বিজ্ঞানবান্ হয়, অর্থাৎ কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের, বা গ্রাহ্য ও ত্যাগের অশ্বগণের ন্যায় তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ আত্মবশীভূত থাকে। যে রথী কার্য্যাকার্য্য বিবেকহীন সারথি সম্পন্ন, অসংযত মনা এবং তজ্জন্য সদা মলিন চিত্তবিশিষ্ট, তিনি সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন না, পরন্তু সংসার লাভ করেন। পুনশ্চ যে রথী বিবেকবুদ্ধিরূপ সারথি সম্পন্ন ও বশীকৃত বা সমাহিত মনা, এবং তজ্জন্য সদা বিশুদ্ধচিত্ত থাকেন, তিনি কিন্তু সেই (ব্রহ্ম) পদ প্রাপ্ত হন—যে পদ হইতে চ্যুত হইয়া আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। বিবেকযুক্ত বুদ্ধি যাঁহার সারথি এবং মন যাঁহার ইন্দ্রিয় রূপ অশ্বসংযমনের রজ্জু, তিনি সংসার গতির পরিসমাপ্তি রূপ সর্ব্ব ব্যাপী বিষ্ণুর সেই প্রসিদ্ধ পদ প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপ হইয়া সংসার হইতে চির বিমুক্ত হন।

আত্মাতেই পুনঃ লয় হইবে। কার্য্য কারণেই লয় হয়, কার্য্য অসত্য কারণ সত্য। জ্ঞানের উদয়ে সেই আদি কারণ সত্য আত্মাই থাকে। জগদ্রূপ কার্য্য মিথ্যা অন্তর্হিত হইবে। সেই আত্মাই জীবের পরাগতি তাহা দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে স্বতন্ত্র—

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্ত মব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ, সা কাষ্ঠা সা পরা গতি॥
এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়আত্মা প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধি সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্ম দর্শিভিঃ॥
যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞান মাত্মনি মহতি তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥
(কঠ উ, ৩য় বল্লী ১০—১৩)।

শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহ অপেক্ষা অর্থ বা শব্দাদি তন্মাত্র সকল ইন্দ্রিয়ের কারণ বলিয়া সূক্ষ্ম বা শ্রেষ্ঠ। শব্দাদি অর্থগণ অপেক্ষা সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন শ্রেষ্ঠ—যেহেতু বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার মনের অধীন। মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ—কেন না বিষয়েন্দ্রিয়ের ও মনের গতি বুদ্ধিকৃত নিশ্চয়ের অধীন। বিষয়েন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির অধীশ্বর মহান্ আত্মা (অহঙ্কার, জীব) বুদ্ধি অপেক্ষা ও শ্রেষ্ঠ—কারণ এই মহান আত্মা বা অহঙ্কার জন্যই জীবের চেষ্টা হইয়া থাকে। সর্ব্ব জগতের বীজভূত অব্যক্ত বা প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব হইতে শ্রেষ্ঠ। প্রকৃতি হইতে পুরুষ (বা শান্ত আত্মা, পরমাত্মা) শ্রেষ্ঠ। পুরুষের অপেক্ষা পর বা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। সেই পুরুষই সূক্ষ্মত্ব, মহত্ব ও আত্মভাবের চরম সীমা, এবং সেই পুরুষই জীবের চরম গন্তব্য স্থান। এই পুরুষ সংজ্ঞক আত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরে গূঢ়—অর্থাৎ দর্শন স্পর্শনাদি ইন্দ্রিয় ব্যাপার, অবিদ্যা বা অজ্ঞানাত্মক মায়া দ্বারা সমাচ্ছন্ন—থাকায় (অবিশুদ্ধ চিত্ত কোন ব্যক্তির নিকটই "আত্মা" রূপে) প্রকাশ পান না। পরন্তু কর্ম্মযোগ দ্বারা হইতে অর্থ সমূহ শ্রেষ্ঠ বা সূক্ষ্ম" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত নিয়মানুসারে সূক্ষ্মতার তর-তমভাব ক্রমে পরম সূক্ষ্ম" তত্ত্ব দর্শনশীলা বুদ্ধি দ্বারা সূক্ষ্ম দর্শী-জ্ঞানিগণ কর্তৃক দৃষ্ট হন। (নিম্নোক্ত উপায়ে জীব আত্ম লাভ করিতে পারেন যথা):—বিবেকী ব্যক্তি বাগাদি ইন্দ্রিয় সকলকে মনে সংযত করিবেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলকে মনের বশীভূত করিবেন, মনকে জ্ঞান বা প্রকাশস্বভাব বুদ্ধিরূপ আত্মাতে নিয়মিত করিবেন—বুদ্ধিই মন প্রভৃতি করণবর্গকে বিষয় গ্রহণোদ্দেশে প্রাপ্ত হয় এই কারণে বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যগাত্মা স্বরূপ; সর্ব্বদা বিষয়ানুভূতি ও সর্ব্বপ্রাপ্তিই আত্মার ধর্ম্ম সেইজন্য বুদ্ধিকেও করণগণের আত্মা বলা হইয়াছে। সেই বুদ্ধিকেও মহান্ আত্মাতে বা হিরণ্য গর্ভের উপাধি স্বরূপ মহত্তত্ত্বে বা অহঙ্কার তত্ত্বে নিয়মিত করিবেন। এবং তাহাকেও আবার শান্ত (অর্থাৎ বিকার শূন্য নিষ্ক্রিয়) আত্মাতে নিয়মিত করিবেন। এইরূপে আত্মলাভ করিলে মানব বুঝিতে পারে যে সে নিষ্ক্রিয় আত্মা; ও মায়াময়ী ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি এই জগৎ রচনা করিয়া ভেল্কি খেলাইতেছে। প্রকৃতির কার্য্যের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

অজ্ঞানতা প্রযুক্তই জীব দেহাদি ব্যাপারে আত্ম কার্য্য জ্ঞান করে। সেই অবসরে বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত কামরূপ রাক্ষস জীবকে বিষয়রূপ পঙ্কে নিমজ্জিত করিয়া ভক্ষণ করে। অতএব অজ্ঞানজাত কামরূপ দুর্জ্জয় রাক্ষসকে বধ করা জীবের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আত্মজ্ঞানের দ্বারাই কাম জিত হয় গীতাও এইরূপ বলিয়াছেন,—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥
গীঃ ৩।৪২—৪৩।

ভূম্যাদি পঞ্চ স্থূলভূত ও তদ্‌গঠিত স্থূলদেহ

(শব্দাদি বিষয় বা তন্মাত্র ও তদপেক্ষা) মন শ্রেষ্ঠ বা সূক্ষ্ম, মন অপেক্ষা বুদ্ধি, বুদ্ধি অপেক্ষা (অহঙ্কার ও তদপেক্ষা) যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই সেই জীবের আত্মা বা পুরুষ। হে মহাবাহো এইরূপ (বিচারও যোগাদি দ্বারা) তুমি আপনার আত্মা বা পুরুষকে বুদ্ধি প্রভৃতি (নিস্ক্রিয়মাণা জড়া প্রকৃতির) সর্ব্ব তত্ত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সূক্ষ্ম, বা ভিন্ন (সুতরাং নিস্ক্রিয় নিঃসঙ্গ ও সচেতন পরমাত্মার অংশ স্বরূপ) জানিয়া আপনার নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধি দ্বারা আপনাকে (অর্থাৎ স্বকীয় ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ও অহঙ্কারকে প্রত্যুক্ত সূক্ষ্মতার তরতম ভাবক্রমে সর্ব্বশেষে নিজ আত্মায়) নিয়মিত করিয়া কামরূপ দুর্ণিবার শত্রুকে জয় কর।

ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপারজাত জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নহে তাহা মোহের আকর, আত্মবিস্মৃতি কারক, সংসার গতি প্রাপক ও দুঃখদায়ক। ইন্দ্রিয়াদি শান্ত হইলে যে আত্মজ্ঞানের উদয় হয় তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। সেই জ্ঞানের উদয়ে জীবের ভ্রান্তি বিদূরিত হয়। তখন জীব আর দুঃখময় সংসারে পুনরাবর্ত্তিত হয় না—নিত্য আনন্দরসপ্লাবিত শ্রীবিষ্ণুর অমৃতময় সত্যধামে নিত্যবাস করে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে আত্মজ্ঞানের মাহাত্ম্য বলিয়াছেন :—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্ব দর্শিনঃ॥
যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহ মেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞান প্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নি দগ্ধ কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥
নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥

গীঃ ৪।৩৪—৩৮

"জ্ঞানী তত্ত্বদর্শিগণ তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ ও সেবা দ্বারা উহা লাভ কর। হে পাণ্ডব যাহা অবগত হইলে তুমি পুনর্ব্বার (দেহাত্মবুদ্ধিরূপ) মোহ প্রাপ্ত হইবে না, এবং যদ্দ্বারা ভূতগণকে, আত্মাতে, ও অনন্তর আমাতে অশেষরূপে দেখিতে পাইবে—অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইলে বুঝিতে পারিবে যে আত্মাই ব্রহ্ম—এক আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় কিছুই নাই —তুমিই সেই আত্মা, সেই আত্মাতে অজ্ঞান আবরণ দ্বারা এই জগৎ বহুরূপে ভাসিয়াছে। যদি তুমি সকল পাপী অপেক্ষাও অধিক পাপকারী হও তথাপি সমুদয় পাপরূপ পারাবার জ্ঞানপোত দ্বারা সম্যগ্‌রূপে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। হে অর্জ্জুন যেমন প্রদীপ্ত বহ্নি কাষ্ঠসকলকে ভস্মসাৎ করে সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি কর্ম্মসকলকে ভস্মসাৎ করে। জগতে আত্মজ্ঞানের তুল্য পবিত্র কিছুই নাই। কর্ম্মযোগ দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত ব্যক্তি সেই আত্মজ্ঞান যথাকালে আত্মাতে স্বয়ং লাভ করেন—পরন্তু কর্ম্মযোগ ব্যতীত এই জ্ঞান লাভ করা যায় না।"

জ্ঞানই মানবের পবিত্রতম বন্ধু, যেসকল শাস্ত্র এই তত্ত্বজ্ঞানের পরিপন্থি তাহারা অপাঠ্য, শাস্ত্র নামের অযোগ্য। তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষদায়ক, ইহা সাধু তত্ত্বজ্ঞানীদিগের সেবা, প্রণিপাত, ও জিজ্ঞাসা অর্থাৎ তাঁহাদের নিকট শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও প্রশ্নাদি দ্বারা লাভ করিতে হইবে ; কিন্তু এই তত্ত্বজ্ঞান যোগ অভ্যাস ভিন্ন কিছুতেই আয়ত্ব হয় না। কর্ম্মযোগ-সিদ্ধগণ আপনা আপনি যথাসময়ে ইহা লাভ করেন সেইজন্য ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক বলিয়াছেন :—

"স এব পরমো ধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনম্॥"

যোগ দ্বারা আত্মদর্শনই পরম ধর্ম্ম জানিবে। অতএব যোগই অজ্ঞান দূরীকরণের প্রকৃষ্ট উপায় যোগই সর্ব্বাপেক্ষা সহজে দুরন্ত কাম রিপু জয় করিতে সমর্থবান্। শুদ্ধ জ্ঞানমার্গে অধিকতর কষ্টে কাম জিত হয় পরন্তু আত্মজ্ঞান সিদ্ধ হয় কর্ম্মযোগ দ্বারাও অল্পায়াসে হয়।

যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।

সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥

গীঃ ৫।৫।৬

"জ্ঞানমার্গিগণ যে (মোক্ষ) স্থান লাভ করেন যোগের দ্বারায় সেই স্থানেই যাওয়া যায়। যিনি সাংখ্য ও যোগ (বিভিন্ন হইলেও ফলে) এক বলিয়া জানেন তিনিই প্রকৃত চক্ষুষ্মান্ (যোগিগণও সেই জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হন, সুতরাং যোগ কর্ম্ম হইলেও ফলে জ্ঞানমার্গ স্বরূপ)। হে মহাবাহো (যোগকে প্রকৃষ্টতম উপায় বলিতেছি এইজন্য যে) কর্ম্ম যোগ ভিন্ন অন্য উপায়ে সংন্যাস অতি দুঃখেই লাভ হয় (পরন্তু কর্ম্মযোগের দ্বারা সুখে অনায়াসে সংন্যাস লাভ হয়) সেই জন্য যোগযুক্ত মুনি অবিলম্বেই ব্রহ্ম লাভ করেন।"

যোগবিরুদ্ধ কথা শুনিতে নাই, যাহারা যোগী নহে তাহারা নির্ব্বোধ—তাহারা শান্তি কি তাহা জানে না—তাহারা ভূমানন্দের আস্বাদ পায় নাই :—

নাস্তিবুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তি রশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥

গীঃ ২।৬৬

"যে যোগী নহে তাহার (আত্মবিষয়িণী) বুদ্ধি নাই, সুতরাং তাহার ব্রহ্মের ধ্যান ধারণা নাই, তাহার শান্তি নাই। শান্তিহীনের সুখ কোথায় ?"

অতএব বলা বাহুল্য ভববন্ধন মোচনেচ্ছুগণের যোগের শরণ লওয়াই কর্ত্তব্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

যোগস্থ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগউচ্যতে॥
দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতে দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্‌যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্ম সুকৌশলম্॥
কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলংত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥

গীঃ ২।৪৮-৫৩

হে ধনঞ্জয় আসক্তি ত্যাগ ও সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমভাব ধারণ পূর্ব্বক যোগে অবস্থান করিয়া সকল কর্ম্ম কর—যোগের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া 'আমি কর্ম্ম করিতেছি' 'আমার কর্ম্ম হইতেছে' এইরূপ দেহাত্মবুদ্ধি রহিত অবস্থায় কর্ম্ম করিলে তুমি জানিতে পারিবে যে ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের কর্ম্ম করিতেছে, তোমার সহিত সেই কর্ম্ম ও তাহার ফলের, শুভই হউক বা অশুভই হউক, কোন সম্পর্ক নাই, অতএব তুমি সেই কর্ম্মফল বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া সেই কর্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন হইতে পারিবে। এই সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমভাবই যোগ। জ্ঞানযোগ অপেক্ষা কাম্যকর্ম্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট অতএব তুমি আত্মজ্ঞানের শরণ লও ফলার্থীরা অত্যন্ত হেয়। বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মে যুক্ত ব্যক্তিগণ ইহলোকে সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়ই ত্যাগ করেন—তাঁহাদের কর্ম্ম নাই সুতরাং তাঁহাদের পাপও হয় না পুণ্যও হয় না। সেইজন্য তুমি (আত্মবুদ্ধির অনুকূল ও জ্ঞানযোগ অপেক্ষা সহজসাধ্য) কর্ম্মযোগ অভ্যাসে যত্নশীল হও। যোগ আত্মজ্ঞান প্রাপক একপ্রকার সুকৌশল কর্ম্ম—কৌশল দ্বারা অতি সহজে কর্ম্ম সিদ্ধ হয়; এইরূপ যতপ্রকার সাধন কৌশল আছে তন্মধ্যে যেটি দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অনায়াসে কর্ম্ম সম্পাদিত হয় সেইটীই সুকৌশল, সেইরূপ আত্মজ্ঞানসাধক যতপ্রকার উপায় আছে তন্মধ্যে কর্ম্মযোগটী উৎকৃষ্টতম উপায় এইজন্য এটী সুকৌশল কর্ম্ম। আত্মজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্ম্মজ ফল ত্যাগ করিয়া জন্মরূপবন্ধন হইতে মুক্ত, সর্ব্বোপদ্রবশূন্য, মোক্ষ পদ (অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্ম্য, নিরহঙ্কারিত্ব, নির্ম্মমত্ব ও ব্রাহ্মীস্থিতি) লাভ করেন যখন তোমার

দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি হয়) পরিত্যাগ করিবে তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুতার্থের (অর্থাৎ সংসার) বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে। যখন অনাহত ধ্বনি শুনিয়া তোমার বুদ্ধি অবিচলিতা হইয়া পরমেশ্বরে নিশ্চলা ও অভ্যাসপটুতা বশতঃ স্থিরা হইবে তখন তুমি যোগ বা তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইবে।"

যোগী যে জ্ঞান লাভ করেন তাহা এইরূপ ঃ—

অমানিত্ব মদম্ভিত্ব মহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যো পাসনং শৌচং স্থৈর্য্য মাত্মবিনিগ্রহঃ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্য মনহঙ্কার এব চ।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শনম্॥
অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্ব মিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু।
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তি রব্যভিচারিণী।
বিবিক্ত দেশসেবিত্ব মরতির্জনসংসদি॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্ত মজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥

গীঃ ১৩।৭-১৩

"আত্মশ্লাঘারাহিত্য, দম্ভহীনতা, সর্ব্বপ্রকার পরপীড়া ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, সরলতা, গুরুসেবা, অন্তর্বহিঃশুচিতা, প্রাণের স্থিরতা এবং জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিতে দুঃখ ও দোষের উপলব্ধি, পুত্র-দার-গৃহাদিতে অনাসক্তি এবং তাহাদের সুখে দুঃখে সুখী দুঃখী বা অবস্থান্তরে নিজ অবস্থান্তর বোধ না করা, ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয়েরই প্রাপ্তিতে সর্ব্বদা চিত্তের একরূপত্ব, আমাতে অনন্যযোগে (অর্থাৎ সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টিতে) একান্ত ভক্তি, নির্জ্জন স্থানে (অর্থাৎ একমেবাদ্বিতীয়ং ভাবে) অবস্থিতি, মনুষ্যসমাজে বিরাগ, নিত্য আত্মজ্ঞানপরায়ণতা এবং তত্ত্বজ্ঞানের ফল যে মোক্ষ তাহার দর্শন এই বিংশতি সংখ্যককে জ্ঞান বলে আর যাহা ইহা হইতে অন্যপ্রকার তাহাকে অজ্ঞান বলে।"

যোগী বা জ্ঞানীর তুল্য ভগবৎপ্রেমিক নাই ঃ—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি র্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থ মহং স চ মম প্রিয়ঃ॥
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানীত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

গীঃ ৭।১৬-১৯

"হে ভরতর্ষভ রোগভয়াদিতে বিপন্ন, আত্মজ্ঞানেচ্ছু, ইহলোক পরলোকে ভোগ সাধনভূত অর্থ প্রাপ্তির ইচ্ছু এবং আত্মজ্ঞানী এই চারিপ্রকার সুকৃতিশালী ব্যক্তিরা আমাকে ভজনা করেন। তন্মধ্যে আত্মজ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ যেহেতু তিনি সর্ব্বদাই আমাতে (ব্রহ্মে, শ্রীকৃষ্ণে বা আত্মা-তে) অনন্য ভক্তিবিশিষ্ট। আমি জ্ঞানীর আত্মা সুতরাং অতিশয় প্রিয়, আর তিনিও আমার প্রিয়। এই সুকৃতিশালী চতুর্ব্বিধ ভক্ত সকলেই মহান্ পরন্তু জ্ঞানী আমার আত্মাস্বরূপ হইয়াই আমার মত, যেহেতু মদেকচিত্ত সেই জ্ঞানী সর্ব্বোত্তমা গতি আমাতেই আশ্রয় করিয়াছেন। বহু জন্মের সাধনের পর 'এই চরাচর বিশ্বই বাসুদেব' এইরূপ জ্ঞানে জ্ঞানবান হইয়া লোকে আমাকে প্রাপ্ত প্রাপ্ত হয়; এরূপ জ্ঞানী মহাত্মা সুদুর্ল্লভ।"

যোগীর চিত্ত নির্বাত নিকম্প দীপের ন্যায় অচঞ্চল, প্রসন্ন ও ব্রহ্মলগ্ন।

রাগদ্বেষ বিযুক্তৈস্ত বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধি পর্য্যবতিষ্ঠতে॥

গীঃ ২।৬৪-৬৫

রাগ দ্বেষ হীন আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়সকল দ্বারা বিষয়ভোগ করিলেও বশীভূত চিত্ত ব্যক্তি শান্তিলাভ করেন। আত্মপ্রসাদ জন্মিলেই সর্ব্ব দুঃখের একান্তাভাব হয়। প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্রই স্বয়ং প্রতিষ্ঠা লাভ করে।" (ক্রমশঃ)

বরের বাবার অভিমান!

বৈদ্যসমাজ হইতে নিষ্ঠুর বরপণ-প্রথা তিরোহিত করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্বৎসভা অনেক দিন হইতেই প্রয়াস পাইতেছেন, এবং যাহাতে শিক্ষিত ও পদস্থ বৈদ্যসন্তানগণ এই প্রথার অপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করেন, তজ্জন্য ধন্বন্তরিতে ইহার সম্যক আলোচনা হইয়া আসিতেছে। এই আলোচনা, দেখিতেছি, অনেকের নিকট রুচিকর বলিয়া বোধ হয় না! একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব।

বিক্রমপুরান্তর্গত পাটাভোগ গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রসিকলাল সেন গুপ্ত বিষয়-কর্ম্ম উপলক্ষে পূর্ণিয়া জেলার আড়ারিয়া মহকুমায় বাস করেন; তিনি সেখানকার অনারেরী মাজিষ্ট্রেটও বটেন। গত ১৩ই বৈশাখ তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যার সহিত বরিশাল জেলার অন্তর্গত ফুল্লশ্রী গ্রাম নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্তের পুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রচন্দ্র দাশ গুপ্তের বিবাহ হয়। এই উপলক্ষে ধন্বন্তরি পত্রে নিম্নলিখিত মন্তব্যটী প্রকাশিত হইয়াছিল :—

"গত ১৩ই বৈশাখ বিক্রমপুর পাটাভোগ নিবাসী শ্রীযুক্ত রসিকলাল সেন গুপ্তের দ্বিতীয়া কন্যার সহিত বরিশালের অন্তর্গত ফুল্লশ্রী নিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্তের পুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রচন্দ্র দাশ গুপ্তের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। নিবারণ বাবু পুত্রের মূল্য বাবদেই বলুন, অথবা জন্মাবধি এপর্য্যন্ত পুত্রের প্রতিপালন এবং শিক্ষা-দীক্ষার বাবদেই বলুন, নগদ কোম্পানী নেট ৯০০৲ টাকা মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন! শুনা যায়, বর বাবাজী এবার ইণ্টারমিডিয়েট দিয়াছেন। ছাদ্‌নাতলায় যাইবার পূর্ব্বে পাশের সুখবরটা পাইলে সম্ভবতঃ দরটা আরও একটু উঠিত! যাহাহউক, গহনার ফর্দ্দ দেওয়া হইয়াছিল কি না, সে খবরটা এখনও পৌঁছে নাই। তবে এটুকু বলা যাইতে পারে যে, রসিক বাবু তাঁহার কন্যা-

শুনা যায় এই মন্তব্য পাঠ করিয়া ডাক্তার শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় রসিক বাবুর উপর বেজায় চটিয়াছেন! তাঁহার ধারণা, রসিক বাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ধন্বন্তরিতে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি তাঁহার পুত্রকে পুনরায় বিবাহ করাইবেন, রসিক বাবুকে এরূপ ভাবে অপদস্থ করিবার প্রয়াস পাইতেও অবহেলা করেন নাই! ফলে এরূপ জনরবে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কারণ, ডাক্তার নিবারণ বাবুকে অবশ্যই একজন শিক্ষিত এবং পদস্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সমাজ হইতে এই ঘৃণিত প্রথার উচ্ছেদসাধন করিতে হইলে এই শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি ব্যতীত সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। ডাক্তার নিবারণচন্দ্র যদি এই স্থূল কথাটী বুঝিতে অসমর্থ হন, তজ্জন্য জনসাধারণ অনুযোগের ভাজন হইতে পারেন না। ডাক্তার নিবারণ বাবুকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে আরও কয়েকটী কথা বলিবার অভিলাষ আছে।

ফুল্লশ্রী গ্রাম, নিখিল বঙ্গের মধ্যে একমাত্র বৈদ্যপ্রধান গ্রাম গৈলার পাশাপাশি অবস্থিত। এই গৈলা গ্রামে শিক্ষিত পদস্থলোকের সংখ্যা যথেষ্ট। সম্প্রতি এই গৈলা গ্রামের অগ্রণী, প্রবীণ, সুপণ্ডিত মহাত্মাগণ বিদ্বৎসভার উদ্দেশ্য সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিয়া সেখানে এই সভার একটী সব্-কমিটী সংস্থাপিত করিয়াছেন। যাহাতে বরপণপ্রথা অচিরে সমাজ হইতে বিদূরিত হয়, এইজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প। কিন্তু ফুল্লশ্রী গ্রামবাসী ডাক্তার নিবারণচন্দ্র যদি ইহার প্রতিকূল আচরণ করিয়া এই ঘৃণিত প্রথার প্রশ্রয় দিতে কুণ্ঠা বোধ না করেন, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? ডাক্তার নিবারণ বাবু যেরূপ অবস্থাপন্ন, তাহাতে এই সামান্য অর্থগ্রহণ না করিলেও ...

না। তিনি অবশ্যই তাঁহার নিজের বিবাহের কথা ভুলিয়া যান নাই। সম্ভবতঃ তাঁহার বিবাহের সময় এই ঘৃণিত বরপণ প্রথার প্রচলন ছিল না। যদি একথা সত্য হয়, তাহা হইলে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি আধুনিক সমাজের অধঃ-পতন-স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া শুক্রবিক্রেতার খাতায় নাম লিখাইয়াছেন! ইহা যে নিতান্ত ঘৃণিত ব্যবসা,—এই প্রথা যে নিতান্ত নিষ্ঠুর প্রথা, তাহা অনুভব করিবার শক্তি তাঁহার নাই, একথা আমরা কোন লজ্জায় বলিব? জানিয়া শুনিয়া, বুঝিয়া সুঝিয়া যিনি সমাজবিগর্হিত কার্য্য করেন, অথবা তদ্রূপ কার্য্যের প্রশ্রয় দেন, তাঁহার অপরাধ সমাজের নিকট অমার্জনীয়। সেই অপরাধ সমাজ চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিলে, লজ্জিত না হইয়া যদি কাহারও ক্রোধের উদ্রেক হয়, তাহা হইলে তিনি যে সমাজের সামাজিক বলিয়া পরিচয় দিবার অযোগ্য, ডাক্তার নিবারণচন্দ্র ইহা বুঝিতে অসমর্থ বলিয়া মনে করা যায় না। অতএব পুত্রের বিবাহে পণ গ্রহণ করিয়া যে তিনি ঘৃণিত কার্য্যের প্রশ্রয় দিয়াছেন, আর সেই কথাটা সমাজে বাহির হইয়া পড়িয়া তাঁহার ক্ষোভ ও ক্রোধ অথবা অভিমানের হেতুভূত হইয়াছে, আমরা ইহা অমূলক বলিয়া মনে করিয়া লইব। আশা করি, এই জনশ্রুতিটা যাহাতে অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তিনিও তদনুরূপ আচরণ করিয়া সমগ্র বৈদ্য-জাতির গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

অনেকেই মনে করেন, 'আজ কাল যখন সর্ব্ব-শ্রেণীর লোকেই এই বরপণের লোভ সম্বরণ করিতে কুণ্ঠিত, তখন আমরাই বা এতটা উদারতা দেখাইতে যাই কেন।' যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ স্বার্থের দিকটাই বেশী লক্ষ্য করেন; তাঁহারা কখনও মনে করেন না যে, স্বার্থ-পরতার প্রভাবে সমাজে যদি কোনও ঘৃণিত প্রথা আধিপত্য লাভ করে, অথবা সমাজের অধিকাংশ লোকেই সেই ঘৃণিত প্রথার পোষকতা করে, তাহা হইলেও, যাঁহার ন্যায়-অন্যায় বিচার করিবার শক্তি জন্মিয়াছে বলিয়া লোকে স্বীকার করিবার সুবিধা পায়, তাঁহার নিকট সেই ঘৃণিত, অনিষ্টকর এবং নিষ্ঠুর প্রথা অনুমোদনীয় নহে। আমরা আজ ডাক্তার নিবারণচন্দ্রের দৃষ্টান্ত দ্বারাই জনসাধা-রণকে, বিশেষতঃ আমাদের বৈদ্যসমাজকে এই স্থূল কথাটী বুঝাইবার প্রয়াস পাইলাম। সকলে-রই মনে করা উচিত যে, প্রত্যেক বৈদ্যসন্তানের সহিত বিরাট বৈদ্যসমাজের স্বার্থ জড়িত; একের কার্য্যকলাপে সমগ্র সমাজ দোষ-গুণের বিষয়ীভূত হয়। আজ ডাক্তার নিবারণচন্দ্র সম্বন্ধে আমরা যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই জনশ্রুতি মিথ্যা হউক, ইহাই বাঞ্ছনীয়। আর যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার এই অভিমান অথবা ক্ষোভ-জনিত উক্তিটী যে বৈদ্যসমাজের পক্ষে নিতান্ত ঘৃণামূলক তাহাতে সন্দেহ নাই।

বর-পণ।

[শ্রীবগলাকান্ত রায় গুপ্ত]

"বরপণ" প্রথাটা কি, এবং ইহা কি করিয়া সোণার বাঙ্গালায় কবে যে প্রবেশ করিয়াছে, এবং ইহার উৎপত্তির কারণই বা কি, তাহা আমি বিশেষরূপে অবগত নহি। তবে ইহার উৎপত্তির

বলিব। কিন্তু ইহাতে যদি কিছু ত্রুটী হয়, আশা করি পাঠকবর্গ আমাকে ক্ষমা করিবেন।

পুত্রের বিবাহ দিয়া কন্যার পিতা বা অভিভাব-কের নিকট হইতে, জ্ঞানান্ধ হইয়া, লজ্জার মাথা খাইয়া, যে অর্থ পুত্রের পিতা বা অভিভাবক

আমরা—বিশেষতঃ আমি "বরপণ" বলিয়া জ্ঞান করি, এবং এইরূপ বরপণেরই সম্বন্ধে কিছু বলিব।

আমার বিশ্বাস, প্রায় ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলামণ্ডিত সোণার বাঙ্গালায়, বিশেষতঃ এই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের—যাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ এককালে অবনীর মধ্যে শ্রেষ্ঠজাতি বলিয়া পরিচিত ছিলেন,—যাঁহারা এই জগতে জ্ঞানের প্রধান ভিত্তিস্থাপক,—যাঁহারা এককালে সকল জাতিরই আদর্শস্বরূপ ছিলেন, এবং যাঁহাদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার, বিচার, শিক্ষা, দীক্ষা, আজি বিংশশতাব্দীতেও অবনীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত, তাঁহাদের মধ্যে আমাদের আলোচ্য 'বরপণ' প্রথার ন্যায় কোন প্রথা প্রচলিত ছিল না। কারণ, যদি এইরূপ 'বরপণ' তখন প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে পর্ণকুটীরবাসী কদলীপত্রস্থিত-নিরুপকরণযুক্ত অন্নভোজীর কন্যা কখন কি অশ্বরথসুশোভিত প্রাসাদবাসী পঞ্চাশব্যঞ্জনযুক্ত সুস্নিগ্ধ অন্নভোজী লক্ষপতির গৃহে লক্ষ্মীস্বরূপা কুলবধূরূপে বিরাজমানা হওয়া সম্ভবিত? কিন্তু এইরূপ ভাগ্যবতীদিগের মধ্যে অনেকে অদ্যাপি জীবিতা আছেন। আজিও যাঁহাদের পিতামাতা পর্ণকুটীরে বাস করেন, আমি তাঁহাদেরই মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহাদের বিবাহযোগ্যকাল উপস্থিত হইলে, আজকালকার কন্যার পিতার ন্যায় তাঁহাদের পিতা কখনও বিরসবদনে, উদাসমনে থাকিতেন না; কখনও কন্যার বিবাহের জন্য Matrimonial Allianceএ বা প্রজাপতি-কার্য্যালয়ে খবর দিতেন না; সংবাদপত্রেও বিজ্ঞাপন দিতেন না, বা আজকালকার ন্যায় এত ঘটক-ঘটকী নিযুক্ত করিতেন না। তখনকারকালে কন্যারাও, পিতামাতা 'বরপণ' দানে অসমর্থ, এই হেতু বিবাহ হইতেছে না বলিয়া কখনও নিজ পরিহিত বস্ত্র কেরোসিন তৈলে সিক্ত করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া আত্মহত্যা করিতে জানিতেন না। শুনিয়াছি, আজকালকার পূর্ব্বে কড়ায়-ক্রান্তিতে 'বরপণ' চুকাইয়া না দিতে পারেন, তাহা হইলে বরপক্ষীয় লোকেরা নব-বিবাহিতা বধূকে গৃহে আনিয়া সেই অসহায়, অবলা বালিকাকে যেসকল কষ্ট দিতে দ্বিধা বোধ করেন না, সেসকল যন্ত্রণার নাম পর্য্যন্ত সেকালের বধূরা কর্ণেও শ্রবণ করেন নাই! এসকল হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রায় ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুদিগের মধ্যে আজকালকার বরপণের ন্যায় প্রথা প্রচলিত ছিল না।

পূর্ব্বে যে বরপণপ্রথা হিন্দুজাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল, সে বরপণপ্রথা আর এই বিংশশতাব্দীর বরপণপ্রথা, তুলনায় স্বর্গ-মর্ত্ত্য তফাৎ। সে বরপণ-প্রথায় নিয়ম ছিল, কন্যাকর্ত্তা স্বেচ্ছায় কন্যাকে যৌতুকস্বরূপ যদি একটী কাণা কড়িও দেন, তাহাই বরকর্ত্তা সন্তুষ্টমনে অক্ষুণ্ণহৃদয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু আজকালকার বরপণপ্রথা ঠিক তাহার বিপরীত। কন্যাকর্ত্তা দিতে পারিবেন না, কন্যাকর্ত্তা ভিক্ষুকের ন্যায় দ্বারে উপস্থিত, তথাপিও বরকর্ত্তার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয় না। যদি কন্যাকর্ত্তা ভিটামাটী বিক্রয় করিয়া অনাহারে বা অর্দ্ধাশনে থাকিয়া দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া কোনও প্রকারে বরকর্ত্তার দাবীকৃত অর্থ, বিবাহের রাত্রিতে কড়ায়-গণ্ডায় মিটাইয়া দেন, তাহাতেও ত কন্যাকর্ত্তা কন্যাদায় হইতে নিষ্কৃতি পান না! কোন তত্ত্বে বা অন্য কোন সামান্য ব্যাপারে কন্যাকর্ত্তার যদি কিছু ক্রটী হয়, তাহা হইলে অনলে ঘৃতের পরিবর্ত্তে কেরোসিন বা পেট্রোল ঢালিলে লঙ্কাকাণ্ডের ন্যায় যেরূপ ভীষণ কাণ্ড উপস্থিত হয়, কন্যাকর্ত্তার এ নগণ্য ক্রটীতেও সেইরূপ ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হয়। যে কন্যাকে বধূপদে বরিত করিয়া গৃহে আনিয়া নিজের বংশ রক্ষা করেন, যে কন্যা সন্তানের নিকট হইতে স্বর্গে যাইয়াও নিজে জল বা পিণ্ড প্রার্থনা করেন, যে কন্যা আপনার গৃহে লক্ষ্মী-স্বরূপা হইবেন, যে কন্যা কায়মনোবাক্যে আপনার

সহিত এরূপ দুর্ব্যবহার, সেই কন্যার পূজনীয় পরমারাধ্য দেবতুল্য পিতার সহিত এরূপ দুর্ব্যবহার, নিজের আত্মীয়-কুটুম্বের সহিত এইরূপ দুর্ব্যবহার! হায় আর্য্যবংশ! হায় হিন্দুজাতি! ধিক্ তোমার ধর্ম্মে!

এই নিষ্ঠুর প্রথা কি করিয়া হিন্দুসমাজে প্রবেশাধিকার পাইল, তাহা আমি নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত নহি। আমার বোধহয়, অনুকরণপ্রিয় হিন্দুজাতি, পাশ্চাত্য আচার ব্যবহার হইতে ইহা অনুকরণ করিয়াছেন। আমার মনে হয়, "বরপণ" প্রথাটী পাশ্চাত্য Dowery প্রথার অনুকরণ; কিন্তু ইংরাজীর Dowery কথাটীর অর্থ আমি যতদূর জানি, তাহা এই যে, বিবাহের সময় কন্যাবার্ত্তা বরকর্ত্তাকে Dowery বলিয়া যাহা দেন, কন্যা বিধবা হইলে পর, কন্যা যদি শ্বশুরালয়ে না থাকেন, তাহা হইলে পাত্রপক্ষীয় ব্যক্তিগণ কন্যাকে সেই Dowery ফিরিয়া দিতে বাধ্য। কিন্তু হিন্দুদিগের ইদানীন্তন "বরপণ" শব্দের অর্থ ইংরাজী Dowery শব্দের অর্থ হইতে অনেকাংশে নিকৃষ্ট। কন্যা যদি বিবাহের পরদিনেই বিধবা হন, তাহা হইলেও বরকর্ত্তা "বরপণ" কন্যাকর্ত্তাকে ফিরাইয়া দেন না। ইহাকে আমি পাশ্চাত্য আচার ব্যবহারের অনুকরণ বলিতেছি; কারণ হিন্দুদিগের মধ্যে যেসকল জাতি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, যেসকল জাতির মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি পাশ্চাত্য University Graduate Manufacturing machine এ ম্যানুফ্যাক্চারিত, তাঁহাদেরই মধ্যে এই বরপ্রথার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়! বলি, ইহাই কি বিদ্যার ফল? ইহাই কি শিক্ষার গুণ? কই অশিক্ষিত হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, বাগ্দি, কৈবর্ত্ত, চামার,মুচি প্রভৃতির মধ্যে এই সমাজকলঙ্কজনক বরপণের প্রথা ত প্রচলিত নাই! ইহা কেবল শিক্ষাভিমানী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদিগের মধ্যেই প্রচলিত। অনেকে বলিতে পারেন, "বরপণ" প্রথাটী হিন্দুদিগের মধ্যেই যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমি বলিতে বাধ্য যে, শিক্ষিত অনুকরণপ্রিয় হিন্দুরা দেখিলেন যে, ইংরাজেরা বিদ্যাবলে অলীককেও সত্যে পরিণত করিতেছেন, বৃদ্ধ পিতামহী বা পিতামহদিগের নিকট হইতে ইহারাও অনেক গল্প শুনিয়াছেন, যাহাতে কোন রাজা প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যদি কেহ এই নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে, তাহাকে আমি রাজকন্যা ও অর্দ্ধেক রাজত্ব দিব।" সেইরূপ উপাখ্যানজনিত অলীক 'কামিনী-কাঞ্চন' লাভকে সত্যে পরিণত করিবার জন্যই হয় ত এইরূপ নিষ্ঠুর বরপণ-প্রথার সৃষ্টি করিয়াছেন! যাহা হউক, বরপণ প্রথার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমি কিছু নিশ্চিতভাবে জানি না, সুতরাং ইহার উৎপত্তির বিষয়ে আলোচনা করা আমার মূর্খতার পরিচয় দেওয়া মাত্র; তবে প্রবন্ধ লিখিতে হইলে উৎপত্তির সম্বন্ধে কিছু লেখা কর্ত্তব্য বলিয়া আমার ক্ষীণ ধারণা হইতে এই দুইপ্রকার হেতুর উল্লেখ করিলাম। এই বরপণ প্রথাকে বিদেশজাত বলিবার কারণ এই যে, আমাদের সেই হিন্দুজাতির মধ্যে প্রচলিত সুমহতী প্রথা "বিবাহ-যৌতুক" হইতে কখনই এতাদৃশ নিষ্ঠুর প্রথার উৎপত্তি সম্ভবে না।

বরপণ-প্রথা দেশের উন্নতি করিতেছে বা অবনতি করিতেছে, তাহা আমার জ্ঞানের বাহিরে। তবে আমার এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতদূর বুঝিতেছি, তাহাতে আমার মনে হয়, বরপণপ্রথা দেশের অকল্যাণ ব্যতীত কল্যাণ-সাধন করিতেছে না। বরপণ যে আমাদের দেশের অহিতকর, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। আজ এই বাঙ্গালাদেশের অধিবাসীগণের আত্মীয়-কুটুম্বগণের মুখে বিষাদ-কালিমার চিহ্ন কেন? আজ এই বঙ্গবাসিগণ ক্ষীণকায় কেন? আজ এই অশেষগুণসম্পন্ন হিন্দুজাতির প্রাণ, "কন্যা" এই কথাটী শ্রবণমাত্র, আতঙ্কে শুকাইয়া যায় কেন? তাহা কি কেহ কখনও বুঝিয়া দেখিয়াছেন? যদি

আলোচনা করেন, তিনি জানিতে পারিবেন, "বর-পণ"ই ইহার প্রধান কারণ। আজ এই বন্যাপ্লাবিত, দুর্ভিক্ষপীড়িত বঙ্গদেশে যদি কেহ একটীমাত্র কন্যার পিতা হন, কন্যার ভূমিষ্ঠের দিন হইতে কন্যার বা পিতার মৃত্যু পর্য্যন্ত, পিতাকে দিন দিন যে ক্ষীণদেহ হইতে হয় তাহার একমাত্র কারণ 'বরপণ'। পুত্রের বিবাহ দিয়া কন্যার অভিভাবকের নিকট হইতে তুমি যে টাকা লইবে, তাহা লইয়া তুমি করিবে কি?—করিবে কেবল আমোদপ্রমোদ। কোন্ শাস্ত্রে আছে যে, পরধন লইয়া তুমি আমোদ-প্রমোদ করিবে? ভাবিয়া দেখ, তুমি যে টাকা মুক্তহস্তে জলের ন্যায় খরচ করিয়া নিজে আমোদ-প্রমোদে রত, সেই টাকা কন্যার পিতা কত কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছেন? সেই টাকা সঞ্চয় করিতে গিয়া, তুমি যেসকল আমোদ প্রমোদে রত, কন্যার পিতাকে সেসকল আমোদ-উপভোগ হইতে সর্ব্বদা নিরত থাকিতে হয়। অনেক সময় এমন হয়, তুমি যে টাকা লইয়া বন্ধুবান্ধব ভোজন করাইতেছ, তোমাকে সেই টাকা 'বরপণ' দিতে হইবে বলিয়া কন্যার পিতা হয়ত অনেক সময়ে অর্থ থাকা সত্ত্বেও নিজের ক্ষুধার তৃপ্তিসাধন করিতে অসমর্থ হইয়াছেন! এইরূপ হয় কেন? তুমিও মানুষ—তিনিও মানুষ। পার্থক্যের মধ্যে তুমি দৈবানুগ্রহে পুত্রের পিতা, তিনি কন্যার পিতা!

ধিক্ তোমায়! ধিক্ তোমার আমোদপ্রমোদে! তোমার স্বদেশবাসী,—তোমার স্বজাতীয়,—তোমার আত্মীয় যে অর্থ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া উপার্জ্জন করিতেছেন, তুমি কিনা দৈবানুগ্রহে পুত্রের পিতা হইয়া সেই অর্থের ভোগ হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিতেছ! একবার স্বজাতির প্রতি চাহিয়া দেখ। আর সে সোণার বাঙ্গালা নাই—আছে কেবল সোণার বাঙ্গালার স্মৃতিটুকু। আজ তোমারই স্বদেশবাসী ম্যালেরিয়াগ্রস্ত, দুর্ভিক্ষপীড়িত—আবার তুমি পুত্রের পিতা হইয়া, তোমার ভ্রাতসম

দিগকে আর উৎপীড়ন করিও না। এইরূপ নৃশংস হিন্দুগণের পূর্ব্বপুরুষেরা পুরাকালে স্ত্রীহত্যাকে মহাপাপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আজ তাঁহারা সেই স্ত্রীহত্যা করিতে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করিতেছেন না। এইপ্রকারে কি তোমরা তোমাদিগের সেই মহান্ পূর্ব্বপুরুষদিগের সম্মান রক্ষা করিতেছ? এই কি সেই দেবতুল্য ব্যক্তিগণের বংশধরদিগের উচিত কর্ম্ম? যদিও তোমরা স্বহস্তে স্ত্রীহত্যা করিতেছ না, তথাপি তোমরা প্রকারান্তরে স্ত্রীলোকদিগের পরিধেয় বস্ত্রে কেরোসিন তৈলসহ অগ্নি সংযোগ করাইতেছ,—হাতে দড়ি তুলিয়া দিতেছ, কলসী দিতেছ, পুষ্করিণী দেখাইয়া দিতেছ, আর কি করিয়া স্ত্রীহত্যা করিতে চাও? ইহাতেও কি সেই নারী-রক্তপিপাসু হিন্দুকুলাঙ্গারদিগের লালসার তৃপ্তি-সাধন হয় না? দেখ, ভাল করিয়া দেখ, হিন্দুদিগের কি শোচনীয় অবস্থা। আজ প্রত্যেক ধর্ম্ম-পরায়ণ হিন্দুপরিবারে কর্ত্তা-গৃহিণী, ভ্রাতা-ভগিনী, বালক-বালিকা, দাস-দাসী পর্য্যন্ত ইষ্টমন্ত্র, ইষ্ট-দেবতা, পরকাল, স্বদেশের হিতসাধনা ভুলিয়া গিয়া কন্যাদায় চিন্তায় সর্ব্বদা রত থাকিয়া, নিজেদের সুললিত, সুঠাম, সুন্দর দেহকে কঙ্কালে পরিণত করিতেছেন। আজকাল হিন্দুদিগের মধ্যে 'বরপণ' ইষ্টমন্ত্র হইয়াছে, বরকর্ত্তা ইষ্টদেবতার স্থান অধিকার করিয়াছেন। দেখ, তোমরা কন্যাকর্ত্তাকে পেষিত করিয়া "বরপণ" লইয়া স্ত্রীহত্যাজনিত ও ধর্ম্মলোপ-জনিত মহাপাতকে জর্জ্জরিত হইতেছ। *

---

* এই প্রবন্ধটী মেট্রপলিটন কলেজের প্রথমবার্ষিক শ্রেণীর একটী ষোড়শ বর্ষীয় বালকের লেখা। ইহা কাহারও নিকট প্রকাশযোগ্য মনে না হইলেও, আমাদের মতে, বালক-লেখকের উদ্দেশ্য নিতান্ত প্রশংসনীয়। আমাদের স্কুল-কলেজের বালকবৃন্দের হৃদয়ে যদি এরূপ ভাব প্রদীপ্ত হয়,

রাঙ্গাবউ।

[শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত।]

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—যাঁহারা গুণের পরিচয় না লইয়া অনিন্দ্য-সুন্দরী ক'নে খোঁজেন, তাঁহাদের চক্ষু ফুটাইবার উদ্দেশ্যে এই সত্য-ঘটনামূলক গল্পটি লিখিত হইল। এই আখ্যায়িকার উল্লেখিত নরনারীগণ এখনও জীবিত। প্রবন্ধে নামাদির পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে মাত্র, মূল ঘটনা ঠিক রাখা হইয়াছে।

(১)

"কাল বই নিয়ে স্কুলে না গেলে আমাকে নীচের ক্লাসে নামিয়ে দেবেন ব'লে মাষ্টার মশায় ধম্‌কিয়ে দিয়েছেন। আজও আমার বই কেনা হ'লো না, কাল কি হবে বাবা?"—বলিয়া নলিনী কাঁদ কাঁদ স্বরে নগেন্দ্রনাথকে বলিল। নগেন্দ্রনাথ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"তোর কাকাকে একথা ব'লেছিস্?"

নলিনী।—ব'লেছিলুম বই কি। আজ কাকাবাবু যখন কোর্টের পোষাক পর্‌ছিলেন, আমি তখন তাঁকে একথা বল্লুম; কাকিমা সেখানে ব'সে পান সাজ্‌ছিলেন; আমার কথা শুনেই কাকিমা বল্লেন,—এত ব্যস্ত হ'লে চল্‌বে কেন বাপু? এত বড় সেয়ানা ছেলে হ'য়েছিস্, বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্ না যে, একটা মানুষের ঘাড়ে কত বোঝা? দু'চারদিন সবুর কত্তে হবে, নইলে হবে না বাছা।

নগেন।—কথা শুনে তোর কাকাবাবু কি বল্লে?

নলিনী।—তিনি কোন কথাই বল্লেন না। পোষাক প'রে কোর্টে চ'লে গ্যালেন।

নগেন।—আজও আর একবার তোর কাকাবাবুকে বলিস্, কিন্তু তোর কাকিমার সাক্ষাতে বলিস্ না। তোর কাকাবাবু যখন কল-তলায় নাইতে যাবে, তখন বলিস্।

এই কথা বলিয়াই নগেন্দ্রনাথ বাড়ী হইতে পড়িয়া তাঁহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিল,—দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল! খানিকদূর যাইয়াই অনেকদিনের পরিচিত একটী বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। বন্ধুটী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিহে নগেন বাবু, খবর কি? এমনতর দেখাচ্ছে কেন? ছেলেপুলে সব ভাল আছে ত? এখন কি করা হ'চ্চে, বাসা কোথায়?

নগেন।—কর্‌চি আর কি ছাই! গোষ্ঠী শুদ্ধ ছোট ভাইয়ের ডাল-চাল ধ্বংস কর্‌চি, আর চোরটীর মত বাসার এক কোণে প'ড়ে আছি। ছেলেপুলের মধ্যে দুটী মেয়েকে বিয়ে দিয়ে পর ক'রে ফেলেছি; দুটী ছেলে ছিল, তার একটী—যিনি দিয়েছিলেন, তিনিই নিয়ে গেচেন, আর একটী আছে, তাকে মানুষ কর্‌বার জন্যেই এখন নাকাল হ'য়ে বেড়াচ্ছি। সে ক্লাশ-প্রমোসন পেয়েছে, তার কয়খানা বইয়ের দরকার, তা কিনে দিতে পাচ্ছি না। মাষ্টার নীচের ক্লাশে নামিয়ে দেবেন ব'লে তম্বি ক'রেছেন। ভায়ার কাছে এ কথা বল্‌তে গিয়ে, ছেলে, বউমার কাছ থেকে যে জবাব পেয়েছে, কাঁদ কাঁদ মুখে এসে সে কথাটা আমায় বল্লে, আমি আর তা সহ্য কত্তে পাল্লুম না, তাই বেরিয়ে পড়েছি।

বন্ধু।—বলি যে ভাইটীর জন্যে চাক্‌রী খোয়ালে—পরকালটা নষ্ট কল্লে, তোমার সে ভাইটী কোথা? তার কাছে যাও না কেন?

নগেন।—এ যে সে-ই, ভায়া!

একবারে অবাক্ কল্লে ভায়া!! যার তরে তোমার এতটা হ'ল, তার এমনতর কাজ? এবে চোখে দেখ্‌লেও বিশ্বাস কত্তে ইচ্ছে হয় না! সত্যি-সত্যিই কি এখনকার কালে মানুষ এতটা কৃতঘ্ন হ'তে পারে?

নগেন।—পারে বই কি ভাই! না পাল্লে এরূপ হচ্চে কি করে? আমাকে মানুষ করবার জন্যে বড়্দাও তাঁর সামান্য শক্তিটুকু প্রয়োগ কর্‌তে ভোলেন্ নাই, তিনি এখন বৃদ্ধ, কই আমিত তাঁর কিছু কচ্চি না!

বন্ধু।—তোমার কথা ছেড়ে দাও না বাবু! তুমি নিজেকেই যখন সাম্‌লাতে পাচ্ছনা, তখন আর বড়্দাদাকে কি ক'রে দেখ্‌বে। তা বলে, যার সামর্থ্য আছে, সে কর্‌বে না কেন? শুন্‌ছিলুম তোমার ছোট ভাইটী না এখন ওকালতী কর্‌চে; বেশ দু' পয়সা রোজগার কর্‌চে ব'লেও ত শোনা যায়, নয় কি?

নগেন।—তোম্‌রা বাইরে থেকে যেমন শোন, আমি ভিতরে থেকেও তেমনি শুনি; আসল খবর কিছুই রাখি না ভাই। ঐ যে বল্লুম—দু'বেলা শেয়াল-কুকুরের মত দুটী খাই, আর নীচেকার একটী ঘরে প'ড়ে থাকি। আমার হাল-হকিয়ৎ দে'খে ঝি-চাকরেরাও বড় একটা গ্রাহ্য করে না। কেবল ছেলেটার জন্যে এতটা হেনস্তা সহ্য কর্‌চি, নৈলে কোন্ দিন একদিকে চ'লে যেতুম।

বন্ধু।—তোমার বড়্দা এখন কোথা আছেন—কি কর্‌চেন?

নগেন।—তিনি সেই বাঁকিপুরেই আছেন। বয়েস্ হয়েচে, এখন আর কায-কর্ম্ম কর্‌বার ক্ষমতা নেই; এক পয়সা আয় নেই, সেখানকার বন্ধুবান্ধবদের দয়ার উপর নির্ভর ক'রে এখন দিন কাটাচ্ছেন। আগে যদি বুঝে চল্‌তেন, তা হ'লে এ বুড় বয়সে আর তাঁর এতটা দুর্গতি সইতে হ'ত না।

বন্ধু।—শুনেছি, তোমার সেই উকীল ভাইটী

নগেন।—তা হ'লে কি হবে ভাই। তাঁর কায তিনি করেছেন, এখন ভায়ার কায ভায়া কর্‌চেন! আমি বল্‌চি,—তাঁর দোষেইত ভায়ার এ মূর্ত্তি ধর্‌বার সুবিধে ঘটেছে। তা তিনি তার ফল্‌টাও এখন বেশ ভোগ কর্‌চেন। কিছু দিন হ'লো তিনি ভায়ার কাছে একটী গরম জামা চেয়েছিলেন; দেওয়া চুলোয় যাক্, সেই অব্‌ধি ভায়া আর তাঁকে একখানা কার্ড লিখেও জিজ্ঞেস করেন না।

বন্ধু।—ভায়া ত তা হলে কৃতজ্ঞের অবতার বল! যা হোক্ তুমি ঘণ্টা খানেক পরে আমার বাসায় দেখা ক'রো, আর তোমার ছেলের কি কি বইয়ের দরকার তাঁর লিষ্ট খানা সঙ্গে করে নিও। ভাই, কিছু মনে করো না, আমি বই ক'খানা কিনে দেব। আমি সেই আগেকার বাসাতেই আছি।

(২)

নগেন্দ্রনাথ ঘোষালের নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রামে। ইঁহারা বর্ত্তমানে চারি সহোদর নগেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়। সর্ব্বাগ্রজ সুরেন্দ্র নাথ বাঁকিপুরে কমিসন-এজেণ্টের কার্য্য করিতেন। এক সময়ে তিনি বিস্তর পয়সা উপার্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার, খাওয়া এবং খাওয়ান ব্যতীত অপর কোন দিকে লক্ষ্য ছিল না। এ-বিষয়ে তাঁর আত্ম-পর ভেদ ছিল না। পরকালের 'ভাব্‌না ভাব্‌বার কথা কেহ বলিলে, বলিতেন,—'ভাই ক'টা মানুষ হ'লে আমার কিসের ভাব্‌না?'

নগেন্দ্রের অনুজ হরেন্দ্র তিনটী শিশু পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন। তদনুজ হীরেন্দ্রনাথই এই আখ্যায়িকার উকীল বাবু। ছেলেবেলা হইতেই হীরেন্দ্র সর্ব্বাগ্রজ সুরেন্দ্রের বড়ই প্রিয় ছিলেন। ইঁহার বর্ণ অন্যান্য ভ্রাতা অপেক্ষা একটু ময়লা বলিয়া নিজেই বলিতেন—'বড়্দা আমি বড্ড কালো,"। 'বড়্দা অমনি মুখ চুম্বন করিয়া বলিতেন—'তোমার

বড়্দার আদরের বলিয়া হীরেণ তাঁহার নিকট বাঁকিপুরে যান, এবং সেখানে ইংরেজী পড়া সুরু করিয়া বি, এল, পাশ করত প্রত্যাবৃত্ত হন। হীরেণ যে বছর বি, এ, পাশ করেন, সে বছর তাঁহার বিবাহ হয়। 'রাঙ্গা টুক্‌টুকে বউ এনে বিয়ে দেব' প্রতিশ্রুতিটা মনে করিয়া সুরেন্দ্র ও নগেন্দ্র নামজাদা ঘরের একটী রাঙ্গা টুক্‌টুকে ক'নে আনিয়া হীরেণের বিবাহ দেন। বলা বাহুল্য, হীরেণের বিনিময়ে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন না, 'রাঙ্গা বউ' আনিবার জন্য পণ-যৌতুক তুচ্ছ করেন।

হীরেণ বি, এল, পাশ করিলেন। সুরেন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, হীরেণ বাঁকিপুরে ব্যবসা আরম্ভ করেন; কিন্তু হীরেণ তাহা না করিয়া হুগলীতেই ওকালতী আরম্ভ করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ এই সর্ব্বপ্রথমে হীরেণের স্বাধীন-ভাবের পরিচয় পাইলেন; ইহার পূর্ব্বে তাঁহার কথার প্রতিকূলাচরণ করিতে আর কখনও দেখিতে পান নাই। সৌভাগ্যক্রমে অল্প দিনের মধ্যেই হীরেণের সংসার-প্রতিপত্তির নমুনা দেখা দিল, দেখিতে দেখিতে শাশুড়ী, শ্যালক, শ্যালাজ প্রভৃতি ধীরে ধীরে যাইয়া একটী প্রকাণ্ড সংসার পাতিয়া বসিলেন। এই সময় হইতেই অগ্রজ ও অনুজদিগের সহিত মঙ্গলামঙ্গল প্রভৃতি সমাচারের আদান-প্রদান একটু হ্রাস হইয়া আসিতে আরম্ভ করিল।

সর্ব্বাগ্রজ সুরেন্দ্রনাথ একজন স্বাধীনচেতা এবং স্পষ্টবাদী লোক। এই সমাচার তাঁহার শ্রুতি-গোচর হওয়ায় তিনি ক্ষোভে ও দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইলেন। যে কারণে নগেন্দ্রনাথ কর্ম্ম চ্যুত হইয়া সপরিবারে কষ্ট পাইতেছিলেন, হীরেণ তাহা সম্যক অবগত ছিলেন। বৃদ্ধ সর্ব্বাগ্রজ সুরেন্দ্রনাথের তখন যে আয় ছিল, চেষ্টা করিয়াও তদ্দারা নগেন্দ্রনাথের কষ্টের লাঘব করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত ছিল না বলিয়া, তিনি নিয়ত মর্ম্মযাতনা প্রয়াস না পাইয়া শাশুড়ী, শ্যালাজ এবং শ্যালক প্রভৃতি লইয়া সংসার পাতা কার্য্যটা যে নিতান্ত গর্হিত, হীরেণের হৃদয়ে তাহা জাগিল না দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথ নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং হুগলীর এই নব-প্রতিষ্ঠিত সংসারে কিরূপ অভিনয় হইতেছে তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য হুগলী গমন করা আবশ্যক বোধ করিলেন।

(৩)

পৌষ মাস, দেখিতে দেখিতে দিবা অবসান হইয়া আসিতেছে। বন্ধুটীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নগেন্দ্রনাথ বাসায় আসিয়া দেখেন, ১২টা বাজিয়া গিয়াছে, তাহার স্ত্রী ব্যতীত বাসার প্রায় সকলেরই খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়াছে, ঝি-চাকর পর্য্যন্ত বাকী নাই। তিনি তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া আসিয়া ঝিকে জায়গা করিয়া দিতে বলিলেন। ঝি বলিল,—"বামুন ঠাকুর চ'লে গ্যাচে, এখন ভাত কে দেবে?"

নগেন।—কেন বউমা ত দিতে পারেন।

ঝি।—তিনি খেয়ে দেয়ে উপরে যেয়ে খুকীকে মাই দিচ্ছেন। আর তিনি থাক্‌লেই বা কি হ'তো। হাঁড়ি ছুঁয়ে ভাত দিলেও আবার এইসব সিষ্টি মাজাঘসা না কল্লে আর বিকেলে রান্না হ'তো না! খেয়ে দেয়ে উঠে বাসনকোসন মেজেঘসে আল্‌গা হ'য়ে বসেছি, শীতে গা কন্‌কন্ কচ্চে, এখন আবার এসব মাজাঘসা কে কত্তে যাবে বাবু!

নগেন।—বামুনঠাকুর ত ভাত কটী বেড়ে রেখে গেলেই পার্‌ত?

ঝি।—তা মেজো জ্যেঠাই মা সে কথা একবার বল্‌ছিলেন বটে, সে হয়ত তা ভু'লে গ্যাচে।

ঝির সহিত যখন এই কথাবার্ত্তা হইতেছিল, নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী তখন রান্না ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন! ঝির কথা শুনিয়া দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল; নগেন্দ্রনাথ

দেখিলেন, চাকরটী বৈঠকখানায় বিছানার একটী তাকিয়া মাথায় দিয়া নাক ডাকাইতেছে। অনেক ক্ষণ তামাক খাইতে পান নাই বলিয়া নগেনের ধূমপানের ইচ্ছা হইল। খুঁজিয়া দেখিলেন, যেখানে তামাক থাকে, সেখানে তামাকের পাত্রটী পর্য্যন্ত নাই। 'রামধনী রামধনী', বলিয়া চাকরটীকে ২।৩ বার ডাকিলেন, রামধনী একবার চক্ষু দুটী মেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া রহিল। নগেন্দ্রনাথ কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া পুনরায় বাহির হইয়া পড়িলেন, খাওয়া আর ভাগ্যে ঘটিলনা!

খানিক দূর যাইয়া দেখিলেন, বন্ধুটী তাঁহাদের বাসার দিকে আসিতেছেন; তাঁহার পুত্র, হীরেণের পুত্র এবং শ্যালক বই হাতে করিয়া পাছে পাছে আসিতেছে। ইহাদিগকে দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ দাঁড়াইলেন। বন্ধুটী সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার ছেলে কোথায়? তার বই কেনার কোন ব্যবস্থা হয়েছে কি?

নগেন।—পশ্চাদ্দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন—এটী আমার ছেলে।

বন্ধু।—এ দুটী কে?

নগেন।—এটী হীরেণের ছেলে, আর একটী তাহার শ্যালক।

নগেনের পুত্রের পরিধানে একখানি ছিন্ন বস্ত্র, গায়ে একটী ময়লা জামা এবং পায় একজোড়া ছেড়া চটী,—আর একখানি সামান্য মোটা চাদরে দেহখানি আবৃত করিয়া শীত নিবারণ করিতেছে! অপর দুইটীর পায় বুট, পরিধানে মিহি ঢাকাই ধুতি, দেহে গরম জামা এবং এবং শীত নিবারণার্থ পশমী আলোয়ানে দেহ আবৃত! নগেনের পুত্রটী পিতার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন, অপর দুটী সটান বাসার ভিতরে প্রবেশ করিয়া একবারে অন্দর মহলে গমন করিল।

নগেন্দ্রনাথ বন্ধুটীকে লইয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখেন, রামধনী তখনও শুইয়া আছে। বন্ধুটীকে ধূমপান করাইবার জন্য পুনরায় রামধনীকে ডাকিলেন। এবারে সে আর চক্ষু মেলিল না, পার্শ্ব পরিবর্ত্তনও করিল না! ইতিমধ্যে অন্দর মহল হইতে 'রামধনী' বলিয়া হীরেণের শ্যালকের কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্রই রামধনী চকিতে গাত্রোত্থান করিয়া দ্রুতপদে অন্দরের দিকে ছুটিল। নগেন্দ্রনাথ তখন, 'তামাক কোথায়' জিজ্ঞাসা করিয়া ভৃত্য রামধনীর নিকট জবাব পাইলেন—"মামাবাবু ডাক্‌ছেন, আগে শু'নে আসি, পরে তামাক দেব।"

ভৃত্যের জবাবটী শুনিয়া বন্ধুটীর মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। তিনি নগেন্দ্রনাথকে বলিলেন,—'ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা; আমি হ'লে ত এরূপ অবস্থায় তিলার্দ্ধকালও এখানে বাস কত্তুম না।' নগেন্দ্রনাথ একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিলেন,—'আর খানিককাল অপেক্ষা করনা কেন, আরও রগড় দেখ্‌তে পাবে।' এই কথা শেষ হইতে না হইতেই—রামধনী অন্দর মহল হইতে ফিরিয়া আসিয়া খানিকটা তামাক নগেন্দ্রনাথের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। নগেন্দ্রনাথ বলিলেন 'তামাকটা সেজে দিয়ে যা।' রামধনী অমনি উত্তর করিল,—'মামাবাবু ও দাদাবাবুর খাবার আন্‌তে যাচ্ছি, দেরী হ'লে বক্‌বেন।'

নগেন্দ্রনাথ নিজেই তামাক সাজিতে গেলেন দেখিয়া বন্ধুটী বলিলেন,—'ভায়া হে! এমন স্থলে আমার তামাক খাওয়া দূরে থাক্‌ বস্‌তেও প্রবৃত্তি হয় না! তামাক খেয়ে দরকার নাই, তোমার ছেলেটীকে ডাক, আমি তার বইয়ের খবর নিয়ে এই নরকাধম স্থান ত্যাগ করি।'

নগেনের পুত্র নলিনী সেখানেই বসিয়া ছিল; বন্ধুটীর কথা শুনিয়া তাঁহার কাছে ঘেসিয়া বসিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমার কাকাবাবু তোমার বই কিনে দিয়েছেন?'

নলিনী। দাদার বই কাল কিনে দিয়েছেন,

আজ আমাকে দেড়টা পর্য্যন্ত বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হয়েছিল।

বন্ধু। তোমার কাকাবাবুকে বইয়ের কথা বলেছিলে ?

নলিনী। বলেছিলুম বই কি ! দুদিন বলেছি, কাকাবাবু তাতে কোন জবাবই দিলেন না, কাকিমা বল্লেন দু'চার দিনের আগে হবেনা। দাদা ও মামাবাবুর বই কাল কেনা হয়েছে।

নলিনীর কথা শুনিয়া বন্ধুটীর চক্ষেও জল আসিল। তিনি নলিনীকে বলিলেন, "এখন স্কুল থেকে এসেছ, বোধহয় চাকর এতক্ষণ খাবার আন্‌তে গিয়ে ফিরে এসেছে, জল খেয়ে এস, আমি এখনি তোমার বই কিনে দেব।"

নলিনী ভিতরে যাইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যেই ফিরিয়া আসিল। ইহা দেখিয়া বন্ধুটী মনে করিলেন,—নলিনী হয়ত, বই কেনা না ঘটে মনে করেই তাড়া-তাড়ি আসিয়াছে। তাই তিনি নলিনীকে বলিলেন—'তোমার ভয় নাই, আমি তোমার বই কিনে না দিয়ে কোথাও যাব না, তুমি খাবার খেয়ে এস।

নলিনী। আমি আমার খাবার পয়সা নিয়ে এসেছি। কাকিমা মুড়ী কিনে খাবার জন্যে আমাকে একটা পয়সা দিয়েছেন। বই কিনে নিয়ে এসে শেষে মুড়ী কিনে খাব।

বন্ধু। কেন এই যে রামধনী তোমাদের খাবার নিয়ে এলো ব'লে বল্লে ?

নলিনী। সে খাবার আমার জন্যে নয়, দাদা ও মামাবাবুর জন্যে। তাঁরা স্কুল থেকে এসে খাবার খান, আমাকে কাকিমা রোজই মুড়ী খাবার জন্য একটা পয়সা দেন।

বন্ধুটী আর কোন কথা না বলিয়া নগেন্দ্রনাথ ও নলিনীকে লইয়া বই কিনিতে চলিলেন।

(৪)

সুরেন্দ্রনাথ কন্যার বিবাহের পাত্রানুসন্ধান অভিলাষে হুগলী গমন করিলেন। যাইয়া দেখিলেন, আনাই হীরেণের শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কিত। সকলেই যে শ্বশুরের খাস ভদ্রাসন বাসী, এরূপ নহে, শ্বাশুড়ীর ভগ্নীপতির মাসতুতো ভাইয়ের পিসতুতো ভাই পর্য্যন্তও আছে! সুরেন্দ্রনাথ জীবনে তাহাদিগকে চক্ষেও দেখেন নাই, কিন্তু বাড়ীতে অন্দর মহলের উপর-নীচ সর্ব্বত্রই তাহাদের অবারিত দ্বার! সুরেন্দ্রনাথ যখন বাসায় পৌঁছিয়াছেন, তখন বেলা ১২টা; হীরেণ কোর্টে গিয়াছেন। সুরেন অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া নীচের একটী ঘরে বসিয়াছেন, ঝি-চাকর, বামুনঠাকুর সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিতেছে, পিশতুতো ভাইয়ের মাসতুতো ভ্রাতারা উপরনীচ করিতেছে, আর বঙ্কিম-নেত্রে এক একবার সুরেন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া যাইতেছে, কিন্তু এই শুভ্রকেশমণ্ডিত মস্তকটী ঘাড়ে করিয়া যে একটী জীব বসিয়া আছে, কেহই তাহার সন্ধান করিতেছেন না!

এ সকল চাল-চলন দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথ ভয়ানক ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। বৃদ্ধেরা সাধারণতঃ ধূমপানাসক্ত একটু বেশী হয়; সুরেন্দ্রনাথও তদ্রূপই ছিলেন। সমস্ত রাত্রি তামাক খাওয়া ভাগ্যে ঘটে নাই। বাসায় আসিয়া প্রায় এক ঘণ্টা অতীত হইল, কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরের মামুলী প্রথম আদর-আপ্যায়নের চিহ্ন তামাকটাও দেখিতে না পাইয়া, অন্তরে ক্রোধাগ্নি অপরিসীম প্রদীপ্ত হইল; কিন্তু প্রকাশ করিবার সুবিধা ঘটিল না,—হীরেণ অনুপস্থিত। সমীপবর্ত্তী একটী প্রকোষ্ঠে হীরেণের শ্বাশুড়ী আহার করিতে বসিয়াছিলেন; আহার সমাপনান্তে দরজায় আসিয়া সুরেন্দ্রনাথকে দেখিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিলেন, ভিতরে যাইয়া 'লাবণ্যের বড় ভাসুর এসেছে গো' কথাটী বলিলেন, বাহির হইতে সুরেন্দ্রনাথ একথাটা শুনিতে পাইলেন।

পূর্ব্বাপর হীরেণের শ্বাশুড়ী সুরেনের সহিত কথা বলিতেন, সে দিন ঘোমটাটী একটু বেশী

উপরে হীরেণের শয়নগৃহে উঠিয়া পড়িলেন, কুশল বার্ত্তাটাও জিজ্ঞাসা করিলেন না! হীরেণের স্ত্রী অর্থাৎ 'রাঙ্গা বউ' তখন শয়নকক্ষেই ছিলেন। জননীর সেখানে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই তিনি অবতরণ করিলেন, এবং তফাৎ হইতে ভূমিতে অবনতমস্তক হইয়া সুরেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিলেন। রান্না মহলে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ঝি-চাকর অথবা বামুনঠাকুর কেহই নাই। তখন বেলা প্রায় ২টা বাজিতে চলিয়াছে। ঝি চাকর-বামুন, সুরেন্দ্রনাথের পৌঁছার প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে চলিয়া গিয়াছে, শাশুড়ী ঠাকুরাণীও প্রায় এই সময়টুকু আহারেই অতিবাহিত করিয়াছেন; কিন্তু এই যে আগন্তুক লোকটা আসিয়া বসিয়া রহিয়াছে, কেহ তাহার সন্ধান লইল না! সুরেন্দ্রনাথ রোগের নিদান বুঝিতে পারিলেন, এবং ভালমন্দ কোন কথাটী না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

রাঙ্গাবউ একখানি আসন সুরেন্দ্রনাথের সম্মুখে বিছাইয়া, এক বাটী তৈল, একটী ঘটী, তাহার উপর একখানি গামছা রাখিয়া চলিয়া গেলেন। এমন সময় বই হাতে করিয়া নলিনী স্কুল হইতে আসিল। দূর হইতে দেখিয়াই 'জ্যেঠামশায় এসেছেন,' বলিয়া, আহ্লাদে আটখানা হইল, তাড়াতাড়ি মাটীতেই বই রাখিয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল। জ্যেঠা মহাশায় হাত ধরিয়া টানিয়া মুখ চুম্বন করতঃ কোলে বসাইলেন। নলিনীর পরিধানে একখানি জীর্ণ ধুতি, গায় একটী ময়লা সার্ট, পায়ে এক জোড়া ছেঁড়া চটীজুতা। কাপড় জামা এতটা ময়লা কেন জিজ্ঞাসা করায় বলিল, "এক খানি কাপড় ও একটী জামা বই আর নাই, তাই মা ফি রবিবারে বাড়ীতে সাবান দিয়ে কেচে দেন; কাল রবিবার, কাল কাচা হবে।"

নলিনীর কথা শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ মর্ম্মাহত হইলেন। দেখিতে দেখিতে হীরেণের ছেলে যামিনী এবং শ্যালক যোগেশও বই হাতে করিয়া স্কুল হইতে আসিল। যামিনী ও যোগেশ উভয়েরই পরিধানে একখানি করিয়া ধোপদস্ত মিহি ধুতি,—গায়ে একটী করিয়া আলপাকার কোট, পায়ে বুট জুতা। যামিনী সুরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া প্রণাম করিল, যোগেশ টক্ টক্ করিয়া উপরে চলিয়া গেল।

তখন বেলা ৩টা বাজিয়াছে, সুরেন্দ্রনাথ সেই একই অবস্থায় বসিয়া আছেন, হীরেণের কোর্ট হইতে ফিরিবার অপেক্ষা করিতেছেন। এমন সময় নগেন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিচ্ছদের অবস্থা দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন—ইহারা কি সুখে এবাটীতে থাকিয়া জীবন ধারণ করিতেছে! নগেন সুরেন্দ্রনাথের পদধূলি লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনার স্নানাহার হ'য়েছে কি?

সুরেন।—তিন ঘণ্টা যাবৎ এখানে এসেছি, এপর্য্যন্ত একটীবার তামাক খেতে পাইনি। কাল রাত্রি থেকে তামাক খাওয়া ঘটচে না। দেখ্‌তে পাচ্ছি, কত চেনা-অচেনা লোক আমার সাম্‌নে দিয়ে আস্‌চে যাচ্ছে, কিন্তু আমি কে, এপর্য্যন্ত কেউ জিজ্ঞেস কর্‌চে না! ব্যাপার দেখে শুধু অবাক হইনি, কতকটা বেশ বুঝতে পেরেছি,—সংসারটী ঠিক কেমন ছাঁচে গড়া হয়েছে! তুমি একটু তামাক খাওয়াতে পার কি?"

নগেন্দ্রনাথ তামাক খুঁজিতে চলিলেন, নলিনী জ্যেঠা মহাশয়ের কাছে বসিয়া বসিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল। যামিনী আসিয়া বলিল,—'বড় জ্যেঠা মশায়, মা জিজ্ঞেস কল্লেন—আপনার ভাত চাপাবেন কি?'

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"৪টার সময় যে আমার ভাত খাওয়া হয় না, এটা তোমার মা, বোধ হচ্ছে ভুলে গেছেন! তা যাই হোক্, তাঁকে বারণ কর।

(ক্রমশঃ)

দশম সাহিত্য সম্মেলন।

বাঁকিপুরের "সাহিত্য-সম্মেলনের" দশম বৈঠক শেষ হইয়া গিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের সভাপতিবর্গের অভিভাষণ পাঠ, মামুলী হিসাবে, সুসম্পন্ন হইয়াছে বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। এই সকল বৈঠকে যেসকল অভিভাষণ পঠিত হইয়া থাকে, সেগুলি সভাপতিবৃন্দের স্ব স্ব রুচিপ্রবৃত্তি অনুসারেই লিখিত হয়, জনসাধারণের মতামতের উপর লক্ষ্য রাখিয়া, অথবা প্রত্যেক সভাপতির উপর নিয়ন্ত্রিত বিষয়ের উন্নতিব্যঞ্জক আলোচনার বৈধতা ও প্রয়োজনিয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লিখিত হইতে দেখা যায় না। এই সকল পঠিত অভিভাষণের সমালোচনা সম্বন্ধেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমালোচকগণ অধিকাংশ স্থলেই মুখ চাহিয়া কথা কহিতে বাধ্য হন। এসমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনায় এরূপ নীতি অবলম্বন করা যে জাতীয় সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির ঘোরতর পরিপন্থী, এ কথা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, কিন্তু বুঝিয়াও অনেকে স্যাকা সাজেন।

বাঁকিপুর-সম্মেলনে, মাননীয় স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় প্রধান সভাপতির পদে বরিত হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এরূপ নির্ব্বাচনে কোনরূপ দোষ দেওয়া চলে না। তিনি সম্মেলনের ভূতপূর্ব্ব অধিবেশনে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, ধন্বন্তরির পাঠকবর্গ তাহা সম্যক্ অবগত আছেন। সেই অভিভাষণের সারবত্তা জনসাধারণ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এবারকার অভিভাষণ শুনিয়া জনসাধারণ ততদূর সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা স্তর আশুতোষের নিকট হইতে আরও অনেকটা প্রত্যাশা

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা লইয়া দেশে বেশ একটু আন্দোলন চলিতেছে। আমাদের বিশ্বাস, যে সূত্র অবলম্বন করিয়া এই আন্দোলনের সূত্রপাত, সেই সূত্রকে অবহেলা করাই উচিত ছিল। কারণ, এতদূর একটা গুরুতর বিষয়ে একজন বা দুইজন অকিঞ্চিৎকর লোকের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়াই উচিত। কিন্তু তাহা না করিয়া উহা লইয়া ঘোটাঘুটী আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালা-সাহিত্যে প্রাদেশিক ভাষা,—বিশেষতঃ ঠাকুরবাটীর কথ্য ভাষার প্রচলন করিবার জন্ত গুটী দুই-তিন লোক লম্ফ ঝম্প করিতেছেন; এই লম্ফ ঝম্পই ভাষাসম্বন্ধীয় আলোচনার হেতুভূত। অনেকের ধারণা ছিল, বাঁকিপুরের সম্মেলনে এইসকল "ক্যাব্‌লা লেখকদিগের" শাসনকল্পে দুই-একটা ধমক শুনিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু স্তর আশুতোষের অভিভাষণে তাহার কোন পরিচয় না পাইয়া জনসাধারণ হতাশ হইয়াছেন। আমরা এই অভিভাষণের সম্যক আলোচনা বারান্তরে করিব; আপাততঃ তাঁহার অভিভাষণের উপক্রমণিকাটুকু সাধারণের গোচরার্থ উদ্ধৃত করিলাম।—

"সাজাইতে মাতৃভাষা, সদা যা'র মনে আশা
নাশিতে স্বদেশবাসি-অজ্ঞান-তিমির।
জন্মভূমি-জননীর মুছাতে নয়ননীর,
দিবসযামিনী যার পরাণ অধীর॥
রত্নপ্রসূ বসুধার সে রত্ন-সন্তান।
এ নর-ধরণী' পরে অমরসমান॥"

সমবেত সভ্যমণ্ডলী, দেখিতে দেখিতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন দশম বর্ষে উপনীত হইল। বঙ্গের সাহিত্য-সেবিগণ প্রতিবর্ষে, কোন স্থানে সম্মিলিত

করেন, নানা, রোগ-জর্জ্জর বঙ্গভূমির প্রিয়সন্তান-বৃন্দ, এই সম্মিলনের তিন দিন, আপন আপন সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগ,—সমস্ত একপদে বিস্মৃত হইয়া মাতৃভাষার পবিত্র মন্দিরে, সাধকের ন্যায় উপবিষ্ট হন, ইহা বাঙ্গালীর পরম মঙ্গলের কথা, শ্লাঘার কথা। মহাকবি ভারবি বলিয়াছেন,—যাহার যেটুকু আছে, সে যদি সেইটুকুতেই সুস্থ থাকে, অভ্যুদয়ের দিকে আর না তাকায়, তবে, মনে হয়, বিধাতা ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াই, তাহার আর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন না। সংসারী জীবের পক্ষে এ উক্তি সর্ব্বথা প্রযোজ্য। অনেক চেষ্টায়, অনেক পরিশ্রমের ফলে বঙ্গভাষা বর্ত্তমানকালে যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট হইয়া নীরবে বসিয়া থাকিলে অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গভাষার বিশেষ অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা। কেনন্না, যেসকল গ্রন্থকে স্তম্ভস্বরূপ আশ্রয় করিয়া বঙ্গভাষা এই প্রতিযোগিতা-সঙ্কুল সংসারক্ষেত্রে অক্ষয়ত্ব লাভ করিতে পারে, এখনও বঙ্গভাষায় তাদৃশ গ্রন্থাদি তত অধিক পরিমাণে উপনিবদ্ধ হয় নাই, সুতরাং আমাদের নীরব হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যাহাতে বঙ্গবাসি-জনগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-কামনায় একটা বিক্ষোভ অর্থাৎ একটা তরঙ্গ উত্থিত থাকে, বাঙ্গালী-হৃদয় কোন সময়ের জন্য নিস্তরঙ্গ, স্রোতোহীন শৈবালপূর্ণ আবিল জলরাশির ন্যায় হইয়া না পড়ে সে বিষয়ে সর্ব্বদা যত্ন-পর থাকিতে হইবে। বঙ্গভাষা বিষয়িণী আলোচনা দেশের সর্ব্বত্র আরও অধিকতররূপে আরব্ধ হইবে। আমার এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, অনেকে বলেন, এই সাহিত্য-সম্মিলনের কোন উপযোগিতা নাই। বর্ষে বর্ষে এতগুলি টাকা ব্যয় করায় ভাষার তেমন কি অভ্যুদয় হইয়াছে। এই দীর্ঘ দশ বৎসরে বাঙ্গালাভাষার কোনই ত উল্লেখযোগ্য শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাই না। তবে এ আয়োজনের আবশ্যকতা কি?" ইত্যাদি। যাঁহারা এই কথা বলেন, দুঃখের বিষয়, আমি তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। অনন্তকালের সমক্ষে যাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, তাহার পক্ষে দশ বৎসর বা দশশতবৎসর নিমেষতুল্য বলিলেও বলা যাইতে পারে। যদি আমরা আমাদের জাতিয়তা সঞ্জীবিত রাখিতে চাই, তবে সর্ব্বাগ্রে জাতীয় সাহিত্য গঠন আবশ্যক। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, বাঁচিবার উপায় উপকরণগুলির প্রতি সর্ব্বদা সতর্কদৃষ্টি রাখিতে হইবে। ঔদাসীন্যে চলিবে না। যে জাতির জাতীয় সাহিত্য নাই, এক হিসাবে তাহার কিছুই নাই, সে জাতি বড়ই দুর্ভাগ্য। বাঙ্গালীজাতির যদি জগতে কালজয়ী হইবার বাসনা থাকে, তবে সর্ব্বথাপ্রযত্নে বঙ্গের জাতীয়-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে মনোনিবেশ করিতে হইবে। সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বৎসরে একবার কেন, যদি প্রয়োজন বুঝা যায়, একাধিক বারও এতাদৃশ সম্মিলনের অধিবেশন অনভিপ্রেত নহে। চাই উৎসাহ, চাই উদ্যম। আমার মাতৃভাষাকে জগতের বরণীয় করিয়া তুলিব, একা আমি নহি আর দশজনেও যাহাতে আমার মাকে মা বলিতে পারিলে, নিজেকে ধন্য কৃতার্থ মনে করিবে, এমন ভাবে আমার মাকে গড়িয়া প্রাচ্য-প্রতীচ্য-নির্ব্বিশেষে আমার মার অধিকার প্রস্তুত হইবে, এইরূপ ধারণা লইয়া যদি আমরা কাজ করিতে পারিতে পারি, তবে, আজ যাহা স্বপ্ন বা একান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে, কাল তাহার করস্থ আমলকবৎ হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং যাহাতে বঙ্গবাসীর মনে বঙ্গ-সাহিত্যচর্চ্চার স্পৃহা সতত জাগরূক থাকে, তজ্জন্য, এবং মধ্যে মধ্যে বঙ্গের সাহিত্য-সেবিগণের প্রীতিপ্রণয়ের আদান-প্রদানের জন্য এইরূপ সম্মিলন যে একান্ত আবশ্যক ইহা অবিসংবাদে বলা যাইতে পারে।

(ক্রমশঃ)।

শোকোচ্ছ্বাস।

[শ্রীমতী ষোড়শীবালা দেবী।]

গোপাল !

ত্যজি অভাগিনী জননী তোমার,—
বালিকা গৃহিণী সে নবকুমার,
গিরিজা অনুজে, বিভুকেও ত্যজে,
কোথা গেলে ভাই—নিকটে কাহার ?

জরাগ্রস্ত তব জ্যেষ্ঠতাত ত্রয়,—
উপেন্দ্র-নৃপেন্দ্র পিতৃব্য যুগল,
সতৃষ্ণ নয়নে, চেয়ে মুখপানে ;
তুমি যে এদের অন্তিম-সম্বল !—

হইবে উকীল বুকভরা আশা,
পুরাবে এদের আকুল-পিয়াসা,
সহসা যে দেখি, ভাই তব একি ?
ভেঙ্গে-দিলে দেখি সে আশার বাসা !

নকুল-যতীন-সুরেশ দাদারা,
তব গুণমুগ্ধ সতত তাহারা,
সমরেন্দ্র-শৈল, অনুজ যুগল
'মেজদাদা' নামে হ'তো আত্মহারা !

সকলের ছোট শ্রীমান শঙ্কর,
কোলে টেনে নিলে বেশী দিন নয়,—
টুনী-খেনী-চারু, ফুচী, পচি, তরু,
সুধা-খুকুরাণী ভগিনী নিচয়।

সতত রয়েছ ইন্দিরার সনে,
পড়ে নাকি ভাই সেকথাটী মনে ?
গত মধুমাসে, শ্বশুর আবাসে
রেখে কি বিদায় নিলে সন্তর্পণে ?

শ্রীমান গণেশ-হেম-নিবারণ
সে অমৃতলাল, রাধিকারঞ্জন,
জ্যেষ্ঠ ভগ্নিপতি সহোদর প্রীতি ;

খগেন-নন্দন সুধীর সুনীল,
সুশীল, খোকন,—ভাগিনেয় সব,
জীবন-রেণুকা মেরী-তিনু-বীণা
ভাগিনেয়ী সবে অনুরক্ত তব ;—

সন্তোষ-শিশির আছে দূরান্তরে,
দেখনি ত দোঁহে একদিন তরে,—
দেখিবার আশা, অতৃপ্ত পিয়াসা
র'য়ে গেল ভাই অন্তরে অন্তরে !—

কেবা নাহি ছিল তব এ সংসারে,
একমাত্র ছিলে জনক-বিহীন,—
এতগুলি যার, কিবা দুখ তার;
সুধু মুখ দেখে, সুখে কাটে দিন।

বিজলির মত বৈশাখের দেখা,—
স্বপনে জানিনা এই শেষ দেখা ;—
তা' হ'লে তখন আরো কিছুক্ষণ
দেখিয়ে নিতুম জনমের দেখা।

তাই—

এস একবার বাসুকী আমার,
দেখে নিই তোরে আরো একবার,
নিয়ে কোলে তুলে, চুমিয়ে কপোলে,
দেখার পিপাসা মিটাই আমার।

এতগুলি যার র'য়েছে ঘেরিয়া,
কিবা দুঃখ তার ? হাসিয়া খেলিয়া,
দিন কেটে যায় ; তবে কেন ভাই,
এ সব ছাড়িয়া গেলেছে চলিয়া ?

পশিল কি তব কোমল হৃদয়ে,
শেল হ'য়ে সব সংসার-গঞ্জনা ?
সহিতে না পারি, গেলে সবে ছাড়ি

জানিতাম ভাই তব সহিষ্ণুতা,
পিঠে দু'ঘা খেয়ে কহিতেনা কথা,—
আজি কেন ভাই, কোন কথা নাই,
চলিলে অমনি প্রাণে দিয়ে ব্যথা ?

যাও ভাই যথা জনক তোমার,—
জুড়াও হৃদয় কোলে ব'সে তাঁর,
ঠাকু'মা সেখানে, দা'মশায় সনে
ভোগিছেন সদা আনন্দ অপার।

নাহি সেথা ভাই সংসার-গঞ্জনা,
জরামৃত্যু নাই ভোগের বাসনা;
লভি মোক্ষপদ, থাকিবে সতত,
মায়া-মমতার ধার ধারিবে না॥

লেখিকার খুড়তুতো ভ্রাতার অকাল বিয়োগে লিখিত। বঃ, সঃ

টীকা-টিপ্পনী।

গত কার্ত্তিক মাসের 'ধন্বন্তরি' পত্রে বরিশাল গৈলা গ্রামে বিদ্বৎসভার অধিবেশনের যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে ভ্রমক্রমে সভাপতির নাম শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দাশগুপ্ত না হইয়া শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছিল। আশা করি, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় আমাদের এই ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।

গৈলাগ্রামে বিদ্বৎসভার যে স্থানীয় সব-কমিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় সম্পাদক, এবং শ্রীযুক্ত অশ্বিনী-কুমার দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত প্রিয়বন্ধু গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত রসময় গুপ্ত, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত রামচরণ দাশ-গুপ্ত, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দাশগুপ্ত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদে বৃত হইয়াছেন।

স্থানীয় বৈদ্যসন্তানদিগের মধ্যে কোন কোন মহোদয়ের স্বজাতি-প্রীতি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। পরিতাপের বিষয় এই যে, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই অধ্যাপক, উকীল, এটর্ণী এবং ডাক্তার। সুশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে অবশ্যই এইরূপ পদ লাভ করা ভাগ্যে ঘটে না। সুতরাং নায়ক-সম্পাদক পাঁচকড়ি বাবুর মতে সায় দিয়া বলিতে হয়,—আধুনিক ইংরাজীশিক্ষায় বাঙ্গালী মতি-প্রবৃত্তি সত্য সত্যই বিগ্‌ড়াইয়াছে! অনেকেই বলিয়া থাকেন, বৈদ্যজাতির ভিতর জাতীয় একতা এবং স্বজাতি-প্রীতি অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অনেক বেশী; কিন্তু এই শ্রেণীর কতিপয় বৈদ্যসন্তানের পরিচয় পাইলে, সে ধারণা অমূলক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, সম্ভবতঃ ইহাঁদের আচরণ বৈদ্যসমাজের গোচর করিতে বাধ্য হইতে হইবে।

নিতান্ত আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে, ভারত এবং ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রবাসী বৈদ্য-সন্তানগণ বিদ্বৎসভার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন। ইহাঁদের মধ্যে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, সবজজ, ডেপুটী, মুন্সেফ প্রভৃতি উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারীর সংখ্যা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নহে। স্থানীয় বৈদ্যসন্তানদিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্প আয়বিশিষ্ট লোকের স্বজাতিপ্রীতি এবং জাতীয় উন্নতি সম্বন্ধে ঐকান্তিকতা নিতান্ত আশাপ্রদ।

নিখিল বঙ্গের বৈদ্যসন্তানদিগের মধ্যে এরূপ ঐকান্তিকতা থাকিলে, "বিদ্বৎসভা" অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীর সুসাধনে অচিরে সমর্থ হইতেন।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় এম্, এ, এম্, বি, মহাশয় যে আয়ুর্ব্বেদ কলেজের সূচনা করিয়াছেন, উক্ত কলেজ তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি না হইয়া যাহাতে সাধারণের সম্পত্তি হয়, স্থানীয় কবিরাজমণ্ডলীর অনেকে এরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত নহেন বলিয়া অপর কেহ ইহাতে যোগদান অথবা সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে অসম্মত। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য হইলে নিতান্তই পরিতাপের বিষয়! সহরে যেসকল কবিরাজ বিজ্ঞ ও বহুদর্শী বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা যামিনী বাবুর বেতনভোগী হইয়া অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন, এরূপ আশা করাই ভুল। অন্য পক্ষে ইহাঁদের সহানুভূতি ব্যতিরেকে আয়ুর্ব্বেদ-কলেজ পরিচালনা করিবার প্রত্যাশাও বাতুলতা।

বিষয় বিশেষের অভাব মোচন করিতে হইলে সর্ব্বতোভাবে স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন দিতে হয়। কলিকাতায় একটী আয়ুর্ব্বেদ কলেজের বিশেষ অভাব অনুভূত হইতেছে। এই অভাব পূরণ করিতে হইলে সর্ব্বসাধারণের, বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহচর্য্য একান্তই প্রয়োজন। এরূপ অনুষ্ঠানে পূরবর্ত্তী হইয়া যিনিই কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হউন না কেন, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তাঁহার স্বার্থের গন্ধ থাকিলে, সাধারণের সহানুভূতি লাভ করিবার আশা দুরাশা মাত্র। কবিরাজ যামিনীভূষণ প্রকৃত অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠান করিলে, কলেজটী সাধারণের সম্পত্তি হওয়া সম্বন্ধে তাঁহার আপত্তি করা সঙ্গত নহে। জনসাধারণের অর্থ ও সামর্থ্যের প্রত্যাশা করিলে, এই স্বার্থটুকু পরিহার করা বিধেয়। যতদিন তিনি ইহা না করিবেন, ততদিন এই উদ্যোগে সাফল্যলাভ সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ আছে। এমন কি, ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে কোনরূপ চেষ্টা হইলে, তাহার সাফল্য সম্বন্ধেও ঘোরতর অন্তরায় ঘটিবে।

পত্রিকার বিনিময়ে পত্রিকা প্রদান করা একটা চিরন্তন প্রথা প্রচলিত ছিল। আধুনিক পত্রিকা-সম্পাদকদিগের মধ্যে কেহ কেহ সেই প্রথা রহিত করিবার প্রয়াসী! এই প্রয়াসটীকে রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া আমরা নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করিতে পারি। সম্পাদকের প্রকৃত গুণগরিমা যাঁহাদের ভিতরে বর্ত্তমান আছে,—আত্মগরিমায় যাঁহারা দিশাহারা নহেন, আমাদের ধারণা, তাঁহাদের প্রত্যেকেই আমাদের কথায় সায় দিবেন। আমরা দেখিতেছি,—'প্রবাসী', 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' ও 'মালঞ্চ' প্রভৃতি কয়েকখানি মাসিকপত্র বিনিময়ে আদান-প্রদান করাটা ততদূর পছন্দ করেন না। না করিবারই কথা। কারণ, প্রবাসী-সম্পাদক একজন এম্, এ, তার উপর আবার অধ্যাপক; সুতরাং তিনি যদি দশজনের সহিত আদান-প্রদান করিয়া সমকক্ষতার সৃষ্টি করেন, পদমর্য্যাদার হানির আশঙ্কা হইতে পারে। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' সম্পাদক একজন মহারাজা; এরূপ আদানপ্রদানে তাঁহার রাজ-সম্মান খাট হইতে পারে, এরূপভাব তাঁহার মনে স্থান পাওয়া অস্বাভাবিক নহে। 'মালঞ্চ'-সম্পাদকের এই রোগ কেন, তাহা অবোধ্য!

কিন্তু 'অধ্যাপক-সম্পাদক' এবং 'মহারাজা-সম্পাদক' দ্বয়ের বুঝিয়া লওয়া উচিত যে, যখন অপর দশজন সম্পাদকের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত হইয়া দশজনের ন্যায় মূল্য গ্রহণ পূর্ব্বক সম্পাদকী খেতাব গ্রহণ করিয়াছেন, তখন, অধ্যাপকতা এবং মহারাজাগিরি ভুলিয়া যাইতে হইবে। সাহিত্যক্ষেত্রে

মহারাজাগিরি আর অধ্যাপকতা প্রভৃতি ঠিক একই তুলাদণ্ডে পরিমিত। এ ক্ষেত্রে অপরাপর লেখক-লেখিকাবর্গের সহিত তুলনায় মহারাজা ও অধ্যাপক সম্পাদক অপেক্ষা, পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, দেবীপ্রসন্ন রায় ও জলধর সেন প্রমুখ সম্পাদক মহোদয়গণের আসন অনেক উচ্চে। কষ্টিপাথরে কসিলে, মহারাজা ও অধ্যাপকে অনেক খাদ বাহির হইবে! এখনকার কালে নবটাদ মতিচাঁদ প্রমুখ জহরী অপেক্ষা কেমিক্যালের গহনা বিক্রেতারা সারসপক্ষীর ন্যায় দীর্ঘকণ্ঠ প্রসারণ পূর্ব্বক আত্মপ্রশংসা কীর্ত্তনে লজ্জাবোধ করেন না।

বিদ্বৎসভার সভাপতি বৈদ্যকুলতিলক মান্যবর শ্রীযুক্ত রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর বহরমপুর ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শুধু বঙ্গে কেন, ভারতে সর্ব্বপ্রথমে ইনিই বেসরকারী চেয়ারম্যানের পদে বৃত হইলেন। বৈদ্য-জাতির পক্ষে এই সম্মান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নহে। রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর একজন আদর্শ পুরুষ। কর্ত্তৃপক্ষও তাঁহাকে তদনুরূপ যোগ্য মনে করিয়াই এই সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন। রায় বৈকুণ্ঠনাথের এই নিয়োগ দেশে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদানের প্রথম সূত্রপাত বলা যাইতে পারে।

মাননীয় বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় এবারকার কংগ্রেসের সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। ইহা নিখিল বঙ্গের বৈদ্যসমাজের গৌরবের বিষয়। ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে তিনি পঞ্জাবের ছোট লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। ছোটলাট বাহাদুর অনেকক্ষণ তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য অবগত হইয়াছেন। শুনা যায়, তিনি কংগ্রেসের কার্য্যাবলী বিশেষ আহ্লাদের

মাননীয় বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার একজন প্রবীণ, বিজ্ঞ এবং বহুদর্শী বৈদ্যসন্তান। গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ কংগ্রেসের বৈঠক বসিতেছে, কিন্তু অম্বিকা বাবু ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই রাজনীতিক বিষয়ের আলোচনায় লিপ্ত থাকিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। দেশের লোকের নিকট প্রকৃত গুণের আদর থাকিলে আমরা অনেক পূর্ব্বে মাননীয় অম্বিকাচরণকে এই সম্মান লাভ করিতে দেখিতে পাইতাম। এবারেও তাঁহার নির্ব্বাচন সম্বন্ধে প্রতিকূলাচরণের ক্রটী হয় নাই।

লাট-কৌন্সীলে মেম্বর নির্ব্বাচন উপলক্ষেও অম্বিকা বাবুর প্রতিকূলে অনেক চেষ্টা-চরিত্র হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও কোনরূপ বিঘ্ন ঘটে নাই। আমাদের ধারণা, যে উদ্দেশ্যে জনসাধারণের প্রতিভূস্বরূপ লাট-কৌন্সীলে মেম্বর গ্রহণ করা হয়, সেই উদ্দেশ্য সাধনে প্রবীণ, বিজ্ঞ এবং বহুদর্শী লোকের নিয়োগই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আজ কাল দেখা যায়, ঐশ্বর্য্যশালী অনেক যুবক এই পদ প্রাপ্তির জন্য একান্ত ব্যগ্রতা প্রদর্শন করেন। এই সকল ব্যাপার লইয়া লাঠালাঠি, হুড়াহুড়িও দেখিতে পাওয়া যায়! অর্থের বিনিময়ে যোগ্যতা ক্রয় করিয়া যাঁহারা 'মান্যবর' শিরোপা মাথায় পরিতে চান, তাঁহাদের সেই মস্তক কার্য্যতঃ উন্নত না হইয়া অবনতই থাকে।

বিদ্বৎসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন মহাশয়ের বৈবাহিক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মজুমদার মহাশয়, সভার সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর মহাশয়ের জামাতা। তিনি বৈদ্যসন্তানদিগের মধ্যে একজন, অবস্থাপন্ন লোক। বাঁকিপুরে তাঁহার নাম-যশ যথেষ্ট আছে। তাঁহার ব্যবহারে আমরা স্বজাতিরপ্রীতি ও উদারতার বেশ পরিচয় পাইয়াছি। আমরা আশা করি

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে, তাহার পদোচিত সাহায্য করিয়া নিখিল বঙ্গের বৈদ্যসন্তানের ধন্যবাদ ভাজন হইবেন।

নববর্ষের উপাধি বিতরণে এবার বঙ্গে কোন পণ্ডিত 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন নাই। আমাদের আশা ছিল, এবারে কবিরাজ শিরোমণি শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের শিক্ষা-দীক্ষা ও কৃতিত্বের প্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টিপাত হইবে, কিন্তু সে আশায় নিরাশ হইতে হইল! কবিরাজ শ্যামাদাস শুধু পণ্ডিত এবং সুচিকিৎসক নহেন, তিনি পরদুঃখকাতর এবং উদার প্রকৃতিসম্পন্ন। তিনি অনেকগুলি বৈদ্যসন্তানকে অন্ন ও জ্ঞান দান করিয়া আসিতেছেন। এতদ্ভিন্ন দরিদ্রের দুঃখমোচনেও তিনি মুক্তহস্ত। এরূপে মনীষা সম্পন্ন লোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে অবহেলা প্রত্যক্ষ হইলেই দুঃখের কারণ হয়।

জাতীয়-সংবাদ।

বর্দ্ধমানের ডেপুটী কলেক্টর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং বিহারের লাট্‌কৌন্সীলের সদস্য মাননীয় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত নববর্ষ উপলক্ষে 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। 'রায় বাহাদুর' উপাধিটী আজ কাল যেরূপ উদারভাবে বিলি হয়, তাহাতে ভূপেন বাবু এবং শরৎ বাবুর মান বাড়িল কি কমিল বুঝা যায় না। ইঁহারা উভয়েই বিদ্বৎ-সভার সভ্য।

বিদ্বৎসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্তের জ্যেষ্ঠপুত্রের শ্রীমান্ সুধাংশুমোহন সেন গুপ্ত বি, এস্‌সির, সহিত বাঁকিপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মজুমদার মহাশয়ের কন্যার শুভ উদ্বাহের প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইয়াগিয়াছে। আগামী বৈশাখমাসে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবে। এই বিবাহে যতীন বাবু পণ-যৌতুক বাবদ এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিবেন না। এমন কি, পাথেয় পর্য্যন্ত তিনি গ্রহণ করিবেন না।

ব্যক্তিগত।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র সেন এল্, এম্, গত পূজার অবকাশের সময় দীর্ঘকাল দার্জ্জিলিংএ অতিবাহিত করিয়া কলিকাতা প্রত্যাগমনের পর ব্যবসায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। তিনিও অনেক দিন হইতেই কলে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রোক্ত বটিকা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার কর্ম্মচারীবর্গের মধ্যে অধিকাংশই বৈদ্যসন্তান, তাঁহার ছাপাখানাটীও একটী বৈদ্য-সন্তানের অধ্যক্ষতায় পরিচালিত হইতেছে। ইহা কবিরাজ রাখালচন্দ্রের জাতীয় প্রীতির পরিচায়ক।

স্বর্গীয় কবিরাজ বিনোদলাল সেন মহাশয়ের পৌত্র শ্রীমান্ পুলিনকৃষ্ণ সেন তরুণবয়স্ক হইলেও ন্যায়পরতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় অনেক প্রবীণের সমকক্ষ। স্বর্গীয় পিতামহের প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ের ভার গ্রহণ করিয়া পুলিনকৃষ্ণ যেরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে এই ঔষধালয়ের অতীত যশ যে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যায়। আমাদের বিশ্বাস, পুলিনকৃষ্ণের তত্ত্বাবধানে এই ঔষধালয়ের গৌরব দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে।

ধন্বন্তরি।

মাসিক পত্র।

২য় বর্ষ, } মাঘ, ১৩২৩, ইং ১৯১৬ জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, { ৪র্থ সংখ্যা।

৺কবি প্যারীমোহনের 'কুমারসম্ভব' হইতে

হিমালয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[অধ্যাপক শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী এম্, এ।]

(৭)

ন্যস্তাক্ষরা ধাতুরসেন যত্র

ভূর্জ্জত্বচঃ কুঞ্জরবিন্দুশোণাঃ।

ব্রজন্তি বিদ্যাধরসুন্দরীণা-

মনঙ্গলেখক্রিয়য়োপযোগম্ ॥৭॥

যেই খানে মনোহর ধাতুরসে ন্যস্তাক্ষর

বিদ্যাধরী প্রেমপত্র রচে।

কুঞ্জরের বিন্দুসম শোণ বর্ণে মনোরম

পত্র কার্য্য সারে ভূর্জ্জত্বচে ॥২২॥*

(৮)

যঃ পূরয়ন্ কীচকরন্ধ্রভাগান্

দরীমুখোত্থেন সমীরণেন।

উদ্গাস্যতামিচ্ছতি কিন্নরাণাম্

তানপ্রদায়িত্বমিবোপগন্তুম্ ॥৮॥

যেখানে কিন্নর গীতে মনসাধে তান দিতে

হিমালয় করিলে মনন।

কীচকের লক্ষ্য রন্ধ্রে যেন লক্ষ বেণুযন্ত্রে

দরীমুখে বহে সমীরণ ॥২৩॥

গুহাবায়ু বেণুরন্ধ্রে কভু তার কভু মন্দ্রে

বাজে ধীরে সুমধুর স্বনে।

মনে লয় হিমালয় দিতে বুঝি তানলয়

বেণু লয় কিন্নরের গানে ॥২৪॥†

(৯)

কপোলকণ্ডূঃ করিভির্বিনেতুং

বিঘট্টিতানাং সরলদ্রুমাণাম্।

যত্র স্রুতক্ষীরতয়া প্রসূতঃ

সানূনি গন্ধঃ সুরভীকরোতি ॥৯॥

---

* ভূর্জ্জপত্র ও বল্কলে সিন্দূরাদি ধাতুরস দ্বারা পত্র লেখা হয়। হস্তিগাত্র বয়োবিশেষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুদ্বারা পরিশোভিত হইয়া ঐরূপ দৃষ্ট হয়।

† কীচক—ছিদ্রভূয়িষ্ঠ পর্ব্বতজাত বংশবিশেষ; অতএব 'বংশী-তুল্য'। দরী বা গুহা হিমালয়ের মুখ। তন্মুখ প্রবহমান বায়ু বেণুচ্ছিদ্রে প্রবেশ করিলে অতীব সুস্বর ধ্বনি উত্থিত হয়।

সেইস্থানে গজগণ করে কণ্ডূ নিবারণ
সরলাঙ্গে গণ্ড ঘরষণে।
ছিন্নবল্ক বৃক্ষ তায় ক্ষত দেহে ক্ষীর বায়—
সিক্ত সানু সুরভি সেচনে ॥২৫॥
গজগণ যুথে যুথে ক্রীড়া করে নানামতে
মদে মাতি সরলের বনে।
সরল সরল অতি করী যদি করে ক্ষতি
তবু মতি গন্ধ বিতরণে ॥২৬॥

(১০)

বনেচরাণাং বনিতাসখানাম্
দরীগৃহোৎসঙ্গনিষক্তভাসঃ।
ভবন্তি যত্রৌষধয়ো রজন্যা-
মতৈলপূরাঃ সুরতপ্রদীপাঃ ॥১০॥

ওষধি বিবিধ যেথা দীপ্তি পায় হেথা সেথা
দূর করে দরী-অন্ধকার।
বনিতারে লয়ে সুখে বনচর সে আলোকে
করে কিবা রজনী-বিহার ॥২৭॥
মণি-মহৌষধি-ভাতি যেন বিজলীর বাতি
দ্যুতি পশে নিভৃত কন্দরে।
গুহাগর্ভে কি আকাশে সুহাস কৌমুদী হাসে
গিরিবাসী সুখে বাস করে ॥২৮॥
তৈলহীন যেন বাতি জলে মণি সারারাতি
জলে কিবা ওষধি নিকর।
শশধর দর্পহর যেন শত শশধর
সমুদিত ধরণী উপর ॥২৯॥

(১১)

উদ্বেজয়ত্যঙ্গুলিপার্ষ্ণিভাগান্
মার্গে শিলীভূতহিমেঽপি যত্র।
ন দুর্বহশ্রোণিপয়োধরার্ত্তা
ভিন্দন্তি মন্দাং গতিমশ্বমুখ্যঃ ॥১১॥

ক্ষীণ-কটি-কলেবর পীন-শ্রোণি-পয়োধর
হিম শৈলে চলাচলে ক্লেশ পায় পদতলে
তবু ধীরে ধীরে ধীরে যায় ॥৩০॥
হিমালয়ে শিলাপথে কিন্নরীরা যেতে যেতে
আর্ত্ত হলে শীতল তুষারে।
দ্রুত চলিবারে চায় শকতি নাহিক পায়
মন্দগতি নিন্দে আপনারে ॥৩১॥

(১২)

দিবাকরাদ্রক্ষতি যো গুহাসু
লীনং দিবাভীতমিবান্ধকারম্।
ক্ষুদ্রেঽপি নূনং শরণং প্রপন্নে
মমত্বং উচ্চৈঃশিরসাং সতীব ॥১২॥

পুঞ্জে পুঞ্জে তম যত দিনে যেন দিবাভীত *
লুকাইতে স্থান নাহি পায়।
তাই নিরাশ্রয়ে আজ দয়া করি গিরিরাজ
কুক্ষিমাঝে দিয়াছে আশ্রয় ॥৩২॥
কবি কয় হিমালয় উচ্চ হেতু উচ্চাশয়
তাই কেহ মাগিলে শরণ।
বক্ষ পাতি রক্ষা করে 'ছোট-বড়'—এ বিচারে
মন তার না যায় কখন ॥৩৩॥

(১৩)

লাঙ্গুলবিক্ষেপবিসর্পিশোভৈ
রিতস্ততশ্চন্দ্রমরীচিগৌরৈঃ।
যস্যার্থযুক্তং গিরিরাজশব্দং
কুর্ব্বন্তি বালব্যজনৈশ্চমর্য্যঃ ॥১৩॥

চমরীর পুচ্ছভার যেন চন্দ্রকর-সার
গিরিরাজ-চামর সুন্দর।
ব্যজন বীজন করে হেলে দুলে অহঙ্কারে
সূক্ষ্ম শুভ্র অতি মনোহর ॥৩৪॥

(১৪)

যত্রাংশুকাক্ষেপবিলজ্জিতানাম্
যদৃচ্ছয়া কিম্পুরুষাঙ্গনানাম্।

দরীগৃহদ্বারবিলম্বিবিম্বা-
স্তিরস্করিণ্যো জলদা ভবন্তি ॥১৪॥

গুহা-গৃহে নিরজনে কিন্নরী কিন্নর সনে
ব্রীড়া ভুলি ক্রীড়া লয়ে রয়।
কামনা আকুল করে বসন খসিয়া পড়ে
চন্দ্রমুখী হেঁট মুখ হয় ॥৩৫॥
জলদের যবনিকা সহসা পড়িয়া ঢাকা
দরীমুখ আবরিয়া দোলে।
তাহা দেখি অম্বমুখী প্রিয় সনে মহাসুখী
অচকিত খেলে কুতুহলে ॥৩৬॥

(১৫)

ভাগীরথীনির্ঝরশীকরাণাম্
বোঢ়া মুহুঃ কম্পিতদেবদারুঃ।
যদ্বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈ
রাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবর্হঃ ॥১৫॥

ভাগীরথী নিরঝর ঝরে যেথা ঝরঝর
বহে বায়ু শীতল শীকর।
কাঁপাইয়া দেবদারু নাচাইয়া পিচ্ছ চারু
জুড়াইয়া শ্রান্ত-কলেবর ॥৩৭॥

(১৬)

সপ্তর্ষিহস্তাবচিতাবশেষা
ণ্যধো বিবস্বান্ পরিবর্ত্তমানঃ।
পদ্মানি যস্যাগ্রসরোরুহাণি
প্রবোধয়ত্যূর্দ্ধমুখৈর্ময়ূখৈঃ ॥১৬॥

সূর্য্য হতে কত উর্দ্ধে শোভা পায় গিরিমূর্দ্ধে
সরোবরে বিকচ কমল।
সপ্তঋষি স্বর্গে বসে সেথা হতে অনায়াসে
নিজ হস্তে তুলে পদ্মদল ॥৩৮॥

উর্দ্ধমুখে দিনকর প্রসারিয়া নিজ কর
বিকশিত করে পদ্মদলে।
স্বর্গ হতে দেবগণে মন্দাকিনী পদ্ম-সনে
সেই পদ্ম তুলে কুতুহলে ॥৩৯॥

(১৭)

যজ্ঞাঙ্গযোনিত্বমবেক্ষ্য যস্য
সারং ধরিত্রীধরণক্ষমঞ্চ।
প্রজাপতিঃ কল্পিতযজ্ঞভাগং
শৈলাধিপত্যং স্বয়মন্বতিষ্ঠৎ ॥১৭॥

যজ্ঞের সাধনভূত বস্তু সেথা নানা মত
ধরাধর সেই যোগ্যতম।
প্রজাপতি কৈল গণ্য গিরিরাজ হৈল ধন্য
যজ্ঞভাগ লভি দেবসম ॥৪০॥

(১৮)

স মানসীং মেরুসখঃ পিতৄণাং
কন্যাং কুলস্য স্থিতয়ে স্থিতিজ্ঞঃ।
মেনাং মুনীনামপি মাননীয়া-
মাত্মানুরূপাং বিধিনোপযেমে ॥১৮॥

দেব-আত্মা হিমালয় করিলেন পরিণয়
গিরিকুল করিতে বিস্তার।
অযোনি-সম্ভবা কন্যা মেনা নামে মুনি মান্যা
গুণে ধন্যা বধূ হল তাঁর ॥৪১॥
প্রথিতা সে পিতৃসুতা মেনা নানাগুণযুতা
বেদ-বাদ যোগেতে নিপুণ।
মেরুসখা শৈলপতি ধর্ম্মে অতি দৃঢ়মতি
বধূবর হৈল সমগুণ ॥৪২॥

কদাচারে-সদাচার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[ডাঃ শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন শর্ম্মা।]

পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, নিরগ্নিক দ্বিজগণের মধ্যে যাহারা পক্কান্ন দ্বারা প্রেতশ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সে শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হয় না, পিতৃ-পুরুষের প্রেতত্বও দূর হয় না, এবং তাঁহাদিগের প্রেতাশৌচ জনিত দেহাশুদ্ধি চিরকাল থাকিয়া যায়।

বর্ত্তমানকালে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের পক্ষে আমান্ন শ্রাদ্ধই প্রশস্ত।

বৈদ্যগণ যে আমান্ন শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহা কদাচার নহে, নিরগ্নিক দ্বিজগণের পক্ষে ইহাই শাস্ত্রাদেশ।

বৈদ্যসমাজে বর্ত্তমানকালে যে সমস্ত কদাচার চলিয়া আসিতেছে, তাহা কি প্রকারে বিদূরিত হইবে, কি প্রকারে বৈদ্য সমাজ পুনরায় সদাচার সম্পন্ন হইয়া নষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার করিবেন, তাহাই এখনকার পরিচিন্তনীয় বিষয়।

বহুকাল প্রচলিত কদাচার সমূহের কারণ অনুসন্ধান করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, যে একই কারণে বা একই সময়ে এই সকল-কদাচার সমাজ শরীরে প্রবেশ লাভ করে নাই।

ঘন ঘন রাষ্ট্রবিপ্লব ধর্ম্মবিপ্লব এবং সমাজবিপ্লব সমগ্র হিন্দুসমাজের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অধঃপতনের মূল কারণ হইলেও, বৈদ্য সমাজের অধঃপতনের আরও কতকগুলি বিশেষ কারণ ছিল। তন্মধ্যে মহারাজ বল্লাল সেনের পদ্মিনী সম্পর্ক। তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেন কর্ত্তৃক বল্লাল সংসর্গকৃত বৈদ্যগণের প্রতি উপবীত ত্যাগের ব্যবস্থা, বল্লাল সংসর্গভীত বহু বৈদ্যের শূদ্রবৎ পরিচয় দান, এবং রাঢ়দেশীয় দশাহাশৌচ প্রতিপালনকারী বৈদ্যগণকে শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পক্ষাশৌচ প্রতিপালনের ব্যবস্থা দান, পত্যাকালে, তাৎকালিক যাজক ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বৈদ্যের ব্রাহ্মণাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈশ্যাচার পালনের আদেশ প্রার্থনা, এবং রাজা গণেশের তদাদেশ প্রদান; তৎপরবর্ত্তীকালে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক তদ্বিষয়ের সহায়তা করণ,—প্রভৃতি কারণ সমূহই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৈদ্যের পক্ষাশৌচ যে কদাচার ইহা বুঝিতে হইলে অম্বষ্ঠ বৈদ্যগণ কোন বর্ণান্তর্গত সর্ব্বাগ্রে তাহাই বুঝা দরকার।

এই বর্ণ নির্ণয়ে তাৎকালিক সমাজে নিশ্চয়ই বিষম ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়াছিল, নচেৎ এক বর্ণের অশৌচ অন্য বর্ণে প্রচলন, শাস্ত্রার্থ প্রকটনে প্রমাদ না ঘটিলে কখনই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

যে সময় বৈদ্যগণকে পক্ষাশৌচ পালনে বাধ্য করা হয়, তাৎকালিক হিন্দুসমাজের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল, একদিকে যবন অত্যাচারে যেমন ধর্ম্মশাস্ত্রাদির লোপ সাধনে শাস্ত্রচর্চ্চা দেশ হইতে তিরোহিত হইতে লাগিল এবং দেশ অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, অপরদিকে যবন সংসর্গে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

অনেকেই জীবিকার জন্য রাজভাষার চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন, যবনের আরবী, পারশী ভাষা সংস্কৃতের স্থান অধিকার করিল।

কেবলমাত্র ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণপণ্ডিত-গণের মধ্যে শাস্ত্রানুশীলন সামান্য ভাবে সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল, তাঁহারাও শাস্ত্র গ্রন্থাভাবে মন্বাদি মূল স্মৃতি শাস্ত্রের সম্যক আলোচনায় সুযোগ পাই-লেন না, সংগ্রহ-মিতাক্ষরাদি দ্বারা শাস্ত্রার্থ বুঝিতে

যাঁহার যেরূপ বাসনা হইল তাৎকালিক সমাজে তিনিই সেইরূপ ব্যবস্থা দান করিতে লাগিলেন। এমন কি রঘুনন্দনের সময় পর্য্যন্ত মনুস্মৃতির অস্তিত্ব বঙ্গদেশে ছিল না, নচেৎ তাঁহার ন্যায় প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি মনুস্মৃতি পড়িলে কখনই মারাত্মক প্রমাদসমূহ দ্বারা শাস্ত্রার্থ কলঙ্কিত করিতেন না।

এবম্বিধ শাস্ত্রজ্ঞান লইয়াই তাৎকালিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা প্রদান করিতেন। বৈদ্যগণের পক্ষাশৌচ ব্যবস্থাও এইরূপে শাস্ত্রানভিজ্ঞতা বশতই প্রচলিত হইয়াছে। সে সময় বৈদ্যগণের অধিকাংশের মধ্যেই ধর্ম্মশাস্ত্রের চর্চ্চা একরূপ লোপ পাইয়াছিল, তৎপরিবর্ত্তে জীবিকার্থ কেবলমাত্র আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের কথঞ্চিৎ আলোচনা প্রচলিত ছিল। শ্রীখণ্ডাদি রাঢ়ীয়সমাজের যে কএক ঘর বৈদ্য ছিলেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণবৎ দশাহাশৌচ প্রতিপালন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যেও শাস্ত্রচর্চ্চার সম্পূর্ণ অভাব ঘটিয়াছিল, সুতরাং প্রতিপত্তিবিহীন মূর্খ কএকঘর বৈদ্যের মধ্যে পক্ষাশৌচ প্রচলন করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল না।

এইক্ষণ দেখা যাউক সেই সময়কার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কোন্ যুক্তির বলে বৈদ্যগণকে পক্ষাশৌচের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন।

পক্ষাশৌচ যে অব্যবস্থা এরূপ ধারণা তাঁহাদিগের ছিল বলিয়া বিশ্বাস হয় না। কেবল শাস্ত্রানভিজ্ঞতা বশতঃই তাঁহারা এইরূপ প্রমাদে পতিত হইয়াছিলেন।

মিতাক্ষরাধৃত শঙ্খ বচনই সম্ভবতঃ তাঁহাদিগকে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত করিয়াছিল। শঙ্খ বলিতেছেন—

ব্রাহ্মনেণ ক্ষত্রিয়ায়ামুৎপাদিতঃ পুত্রঃ, ক্ষত্রিয়এব ভবতি।

ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়ামুৎপাদিতঃ পুত্রঃ, বৈশ্যএব ভবতি।

মিতাক্ষরাকার এই শঙ্খ বচনের অর্থ করিয়াছেন,—ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া স্ত্রীজাত পুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্তের কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম প্রাপ্তি হইবে, এবং ক্ষত্রিয়োক্ত দণ্ডাজিন উপবীতাদি দ্বারা তাহার উপনয়ন সংস্কার হইবে। তদ্ব্যতীত মূর্দ্ধাভিষিক্তের জাতি নিরাকরণ হইবে না।

মিতাক্ষরার এই ব্যাখ্যা যে প্রমাদ সঙ্কুল পণ্ডিত গঙ্গাধর কবিরাজের মনুর "প্রমাদ-ভঞ্জনী" টীকায় তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে, মিতাক্ষরায় এই অর্থ, সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ ব্রাহ্মণের স্ববিবাহিতা ক্ষত্রিয়া স্ত্রীজাত পুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত, ব্রাহ্মণবর্ণ হইবে।

ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা স্ত্রী সমন্ত্রক বিবাহে পতি-সবর্ণা, পতি-সগোত্রা ও পতি সপিণ্ডা হইয়া থাকে, সুতরাং তজ্জাত পুত্র পিতৃবর্ণ ই প্রাপ্ত হয় একথা মন্বাদি স্মৃতি একবাক্যে বলিয়াগিয়াছেন। তাহা না হইলে যমদগ্নিপুত্র ঋচিক ও ঋচিকপুত্র পরশুরাম ব্রাহ্মণবর্ণ হইতে পারিতেন না। এইরূপ দৃষ্টান্ত হিন্দুশাস্ত্রে বিরল নহে।

ব্রাহ্মণের স্ববিবাহিতা অনুলোমা ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা স্ত্রীজাত পুত্র—মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বর্ণ ই হইবে, তদ্ব্যতীত মাতামহবর্ণ হইবে না, সুতরাং মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠগণ কিপ্রকারে শঙ্খ বচনের বিষয়ীভূত হইতে পারে?

এখানে পরোঢ়া (পরের বিবাহিতা) অনুলোমাই শঙ্খ বচনের অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে, বিষ্ণুও বলিয়াছেন "অনুলোমাসু মাতৃবর্ণা," অনুলোমাতেজাত পুত্র মাতৃবর্ণ হইবে। এখানেও অনুলোমী বর্ণ অপর ব্যক্তির বিবাহিতা স্ত্রীজাত পুত্রই বুঝিতে হইবে। আর পূর্ব্বোক্ত শঙ্খ বচন যে জাতি নিরাকরণার্থ নহে তাহাই বা কিপ্রকারে সঙ্গত হয়? মূর্দ্ধাভিষিক্তাদি জাতি যখন ব্রাহ্মণের স্ববিবাহিতা পত্নীজাত সন্তান তখন ব্রাহ্মণ বর্ণেরই অন্তর্গত, সুতরাং তাহাদিগের বর্ণ জাতি নিরাকরণই বা হইল না কিপ্রকারে?

সুতরাং তাহারা পূর্ব্বোক্ত শঙ্খবচনেরও বিষয় হইতে পারে না। শঙ্খবচনোক্ত পরোঢ়া অনুলোমা জাত সন্তানেরও যে ক্ষত্রিয় বর্ণও জাতি নিরাকরণ হইবে, এধারণা মিতাক্ষরাকারের ছিল না, কারণ—

"সংস্কার বিশেষেণ হি জাতিপ্রাপ্তিস্তাৎ" সংস্কার বিশেষের দ্বারাই জাতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। উপনয়ন সংস্কার মন্ত্রাদি দ্বারা তুল্যানুষ্ঠান হইলেও দণ্ডাজিন ভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ভেদ হইয়া থাকে। যাহাদের ক্ষত্রিয়াদির ধর্ম্মপ্রাপ্ত হইবে এবং ক্ষত্রিয়াদিবৎ যাহাদের উপনয়ন সংস্কার হইবে, তাহারা ক্ষত্রিয় বর্ণও জাতিই হইবে; সুতরাং মিতাক্ষরার এই ব্যাখ্যা দ্বারাও পরোঢ়া অনুলোমা জাত সন্তান যে ক্ষত্রিয়বর্ণ হয় তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।

মিতাক্ষরাকার ব্রাহ্মণের অনুলোমা পত্নী জাত মূর্দ্ধাভিষিক্তাদিকে শঙ্খবচনোক্ত পরোঢ়া অনু-লোমা সন্তান মনে করিয়া এক প্রমাদ করিয়াছেন, দ্বিতীয়ত উক্ত শঙ্খবচনোক্ত অনুলোমাজাত সন্তানের বর্ণত্ব অস্বীকার করিয়া অপর প্রমাদ ঘটাইয়াছেন। শঙ্খ বচনের মিতাক্ষরার এই অসদ্ব্যাখ্যাই তাৎ-কালিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটাইয়া ছিল, সেইজন্ত তাঁহারা উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাইয়া বৈদ্যের পক্ষাশৌচ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

আজ যেমন স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের বহু অশাস্ত্রিকতা বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের অস্থি মজ্জাগত হইয়া ক্রিয়া-কলাপ পণ্ড করিতেছে, তদ্রূপ বৈদ্যসমাজও ব্যব-স্থার ত্রুটীতে জাত্যুক্ত ধর্ম্ম পরিভ্রষ্ট হইয়া কদাচারে ক্রমশঃ ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছে।

পিতৃলোকের উদ্ধারের জন্যই পুত্রের জন্ম। সেই পুত্রের পিণ্ডোদক লাভ করিয়া পিতা মাতা পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন; এবং তাঁহাদের আশী-র্ব্বাদেই সন্তানের মঙ্গল হইয়া থাকে। পিতৃ-লোকের আশীর্ব্বাদ কামনাতেই আমরা সর্ব্বপ্রকার শুভকর্ম্মারম্ভে শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিত্র্যর্চ্চনা করিয়া আমাদের পিণ্ডোদক তাঁহাদের নিকট পৌঁছি-তেছে না, এ কথা স্মরণ হইলে শরীর শিহরিয়া উঠে, সেইজন্তই বোধ হয় এ জাতি দিন দিন লয় প্রাপ্ত হইতেছে।

বহুদিন পূর্ব্বে পণ্ডিত গঙ্গাধর কবিরাজ এই ত্রুটী সমাজ সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং ইহার প্রতিবিধান করে সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সময় সে কথার সারবত্তা যে কেহ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না অধঃপতিত সমাজ আজও ঘোর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন। জাগরণের সাড়া আর কত দিনে দেখিতে পাইব?

হিন্দুর শাস্ত্র-বাক্য সত্য হইলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে পিতৃলোকের আশীর্ব্বাদে আমা-দের ঐহিক পারত্রিক শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদিগের অর্চ্চনা যদি সিদ্ধ না হয় তাহা হইলে আমাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

বৈদ্যসমাজের যেদিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই ক্ষয় ব্যতীত বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যায় না। প্রতিবৎসর এজাতির মৃত্যুর হার যেরূপ বাড়ি-তেছে এখনও যদি এসমাজের রক্ষার চেষ্টা না হয় তাহা হইলে অচিরে এজাতি বঙ্গদেশ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে।

এখনই অনেক বৈদ্যপ্রধান পল্লী বৈদ্যশূন্য হই-য়াছে। যে স্থান এক সময় বৈদ্যজনগন্ধে এবং বৈদ্যপ্রাধান্তে মুখরিত ছিল, সে স্থান এখন অরণ্যে পরিণত। কোন স্থানে বা দুই এক ঘর বৈদ্য সন্তান দৈন্যভাবে কালাতিপাত করিতেছেন, কোন স্থানে বা দুই একটি বৈদ্য বিধবার কাতর কণ্ঠ শ্রুতি-গোচর হয়। কায়ক্লেশে দিন যাপন করিয়া তাঁহারা পৈত্রিক ভিটায় বাতি দিয়া পূর্ব্ব পুরুষের স্মৃতিমাত্র রক্ষা করিতেছেন; এই ত মফঃস্বলের অবস্থা। সহরের অবস্থা ও সুবিধাজনক নহে, অনেকেই উপার্জ্জন ব্যপদেশে দেশ ছাড়িয়া সহরবাসী হই-

সম্পত্তি করিয়া সুখ সচ্ছন্দে বাস করিতেছেন এরূপ লোকের সংখ্যা খুব কম। অধিকাংশই এই মহার্ঘ্যের দিন উদরান্ন সংস্থানের অতিরিক্ত বেশী কিছু করিতে পারেন না। তাহার উপর আবার কন্যাদায়ের গুরুভারে অধিকাংশ বৈদ্য সন্তানই অবসন্ন প্রায়, সর্ব্বদাই মুখে বিষাদের রেখা অঙ্কিত। কি প্রকারে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইব, এই দুশ্চিন্তায় অনেকেরই উৎসাহ উদ্যম ও উন্নতির আশা শিথিল হইয়া পড়িতেছে।

কুৎসিত বর-পণ প্রথায় এ জাতি উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। এ কুপ্রথা দূর করিতে না পারিলে এ জাতির উত্থান সুদূরপরাহত। এই কুৎসিদাচার দূর করিতে হইলে চরিত্র বলের আবশ্যক। ধর্ম্মভাবের উন্মেষ না হইলে চরিত্র বলের বিকাশ হয় না।

ধর্ম্মভাব জাগাইতে হইলে ধর্ম্মে আস্থা স্থাপন সদাচার সম্পন্ন হওয়া এবং শাস্ত্রালোচনা আবশ্যক, শাস্ত্রাদেশ পালনই সদাচার সম্পন্ন হইবার প্রকৃষ্ট উপায়, এবং সদাচারই মানুষকে কর্ত্তব্যের পথে পরিচালিত করিয়া থাকে।

শাস্ত্রালোচনা ব্যতীত সদাচার ও কদাচারের সম্যক জ্ঞান লাভ হইতে পারে না, জ্ঞান লাভ না হইলে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। তাই বলিতেছিলাম শাস্ত্র জ্ঞানের অভাবেই বৈদ্য জাতিতে দশাহাশৌচ লোপ হইয়া কদাচার প্রচলিত হইয়াছে, তাহারই ফলে ধর্ম্মভাব মলিন হইতেছে, যথেচ্ছাচার ক্রমশঃই সমাজ দেহ পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছে।

মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণবৎই অশৌচাদি হইবে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যবৎ হইবে না।

মনু অশৌচ প্রকরণে বলিয়াছেন ;—

একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্র যোঽগ্নি বেদ সমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবলবেদস্ত দ্বিহীনো দশভির্দিনৈঃ॥

যে ব্রাহ্মণ অগ্নি ও বেদ উভয় সমন্বিত তাহার এক দিন, যিনি কেবল বেদযুক্ত আছে তাহার তিন দিন, এবং যিনি অগ্নি ও বেদ দুইটিই বিহীন তাহার দশাহাশৌচ হইবে।

এইক্ষণ সকল ব্রাহ্মণই বেদাগ্নি-বিহীন, সুতরাং কাহারই একাহাশৌচ নাই, কেবল বেদযুক্ত ব্রাহ্মণও কেহ নাই, অতএব কাহারও ত্র্যহাশৌচ ব্যবস্থা হয় না। এখন সকল ব্রাহ্মণেই বেদাগ্নি-হীন, সুতরাং সকলেরই দশাহাশৌচ বিধি। মূর্দ্ধাভিষিক্ত, সুবর্ণ, ভিষক, ও অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) এই চারি ব্রাহ্মণেরও দশাহাশৌচ বিধি। ইহাতে যদি কেহ বিতণ্ডা করিয়া কহেন, এই চারি ব্রাহ্মণের কেহ ক্ষত্রিয়বৎ, কেহ বৈশ্যবৎ, কেহ বা শূদ্রবৎ অশৌচ প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদের তদ্বৎ অশৌচাদি পালনই সঙ্গত। তাহার উত্তর এই যে, ব্রাহ্মণ শূদ্রবৎ হইলেই যদি শূদ্রবৎ মাসাশৌচ বিধান হয় তাহা হইলে, সকল ব্রাহ্মণেরই মাসাশৌচ হওয়া কর্ত্তব্য।

মনু বলিয়াছেন :—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

যে দ্বিজ অগ্রে বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্রাদি অধ্যয়নে শ্রম করেন তিনি জীবিত থাকিয়াই সন্তানের সহিত শূদ্রবৎ হইয়া থাকেন।

বশিষ্ঠও স্বসংহিতায় এই মনু বচন নিদর্শন করিয়া বলিয়াছেন :—

অশ্রোত্রিয়া অননুবাক্যা অনগ্নয়ঃ শূদ্রধর্ম্মানোভবন্তি।
নানৃগ্ ব্রাহ্মণোভবতি মানবঞ্চ শ্লোক মুদাহরন্তি।

এখন সকল ব্রাহ্মণই বেদাগ্নি রহিত হইয়া শূদ্রবৎ হইয়াছেন, সুতরাং রঘুনন্দনের ব্যবস্থানুসারে সকল ব্রাহ্মণেরই মাসাশৌচ প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য ; কেবল মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠগণের সর্ব্বনাশ করা কেন?

ফলতঃ প্রকৃত শাস্ত্রাদেশ এই যে, যে কোন ব্রাহ্মণ জন্মকর্ম্মাদি সর্ব্বসংস্কারভ্রষ্ট এবং সন্ধ্যোপাস-

হইলেই তাহার দশদিন অশৌচ হইবে। তাহাই কলির ধর্ম্মাত্মা পরাশর বলিয়াছেন ;—

জন্মকর্ম্মাদি বিভ্রষ্টঃ সন্ধ্যোপাসন বর্জ্জিতঃ।
নামধারক বিপ্রশ্চ দশাহং সূতকীভবেৎ ॥

অতএব যে কোন প্রকার আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণই হউক না কেন তাহার দশদিনের অতিরিক্ত অশৌচ হইতে পারে না। ক্রমশঃ

মহারাজ রাজবল্লভ।

[শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী কবিরাজ।]

রাজবল্লভের পরিচয় বাঙ্গালীর অবিদিত নহে। সাধারণে তাঁহাকে 'রাজা রাজবল্লভ' বলিয়া থাকেন। আমরা 'মহারাজ রাজবল্লভ' লিখিলাম বলিয়া, কেহ যেন এই 'মহা' বিশেষণটীকে আমাদের মহা ভ্রান্তির ফল মনে না করেন। রাজবল্লভ কেবল মহারাজ নহেন, ইহার উপর দিল্লীর বাদসাহ প্রদত্ত "সমরজঙ্গ" উপাধিও তাঁহার ছিল। জপ্‌সা নিবাসী বৃদ্ধ আনন্দকুমার রায় মহাশয় বলিয়াছেন,—জপ্‌সার রামমোহন কোঠারির গৃহে রাজবল্লভের লিখিত পারস্তভাষায় চিঠিপত্রে তাঁহার 'সমরজঙ্গ' উপাধি তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কঠোর কাল, কীর্ত্তিনাশাগর্ভে রামমোহন কোঠারির আবাসস্থল নিমজ্জিত না করিলে হয় ত আজিও আমরা সেইসকল চিঠিপত্র দেখিবার সুবিধা পাইতাম। রাজবল্লভের জীবনী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, নবাব সিরাজদ্দৌলার ও মিরকাশিমের ভাগ্যচক্র অন্যরূপ হইলে, তাঁহাদের পরিবর্ত্তে রাজবল্লভই বাঙ্গালার মসনদে শাসনকর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন। সে সব কথা জীবনীর যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

প্রসিদ্ধ বৈদ্যরাজবংশ বিধ্বস্ত হওয়ার বহুদিন পরে মহাত্মা রাজবল্লভ বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, পুনর্ব্বার বৈদ্যজাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। তিনি বৈদ্যজাতির গৌরবস্থানীয় হইলেও বস্তুতঃ বাঙ্গালীর এবং সমগ্র বঙ্গদেশেরই গৌরবস্বরূপ ছিলেন। দুঃখের বিষয় কয়েকজন বৈদ্যবিদ্বেষী লেখকের অত্যাচারে এই পূতচরিত্র মহাপুরুষের পুণ্যকাহিনী কলঙ্কিত হইয়া প্রচলিত হইয়াছে। যাঁহারা তাঁহাদের সেইসকল প্রবন্ধ বা পুস্তকাদি পড়িয়া, রাজবল্লভকে দুর্জ্জন ভাবিয়াছেন, তাঁহারা একবার শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত বি, এল, লিখিত রাজবল্লভ জীবনীর আলোচনা করিলেই নিজেদের ভ্রান্তবিশ্বাস বুঝিতে পারিবেন। এইসকল বিদ্বেষী লেখকের মধ্যে কৈলাসচন্দ্র সিংহ নামক একজন লেখকই রাজবল্লভের উজ্জ্বলচরিত্রে মসীলিপ্ত করিবার জন্য অধিক চেষ্টা করিয়াছেন। মনে পড়ে,—এই কৈলাস বাবুই একবার কোন ব্রাহ্ম পত্রিকায় কয়েকটী মাত্র উপাধি সাদৃশ্য দেখাইয়া বৈদ্যজাতিকে কায়স্থের অন্তর্ভুক্ত বলিতে কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করেন নাই! সুতরাং এমন বৈদ্যবিদ্বেষীর হাতে বৈদ্য রাজবল্লভের কোনরূপ লাঞ্ছনাই বিচিত্র নহে! প্রশংসিত রসিক বাবু যেসকল প্রমাণবলে কৈলাস বাবুর উক্তি সমূহকে অমূলক প্রতিপাদন করিয়াছেন, সেই সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ ও প্রতিবাদসহ তাঁহার লিখিত রাজবল্লভ চরিত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, অদ্য আমরা ধন্বন্তরির পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। বৈদ্য মহাপুরুষ-

আশা করি, সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বাগ্রগণ্য এই মহাত্মার জীবনকাহিনী পড়িয়া ধন্বন্তরির পাঠকবর্গও পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ঢাকা—বিক্রমপুরের অন্তর্গত বিলরাওনিয়া গ্রামে রাজবল্লভের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কৃষ্ণজীবন মজুমদার, মাতার নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী। চারি সহোদরের মধ্যে রাজবল্লভ তৃতীয় ছিলেন। অল্পবয়সেই তিনি পিতৃহীন হইয়া ১৯ বৎসর বয়সের সময়ে পিতৃবন্ধু রামনিধি বসু কানুনগোর সাহায্যে ঢাকার নবাবসরকারে প্রবেশলাভ করেন। নবাবের দেওয়ান যশোবন্ত রায়, রাজবল্লভের কার্য্যনিপুণতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পেস্কারী পদে উন্নীত করেন। অতঃপর আলিবর্দ্দী খাঁ মুর্শিদাবাদের সিংহাসন অধিকার করিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নিবাইশ মহম্মদকে ঢাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলে, বৃদ্ধ দেওয়ান যশোবন্ত রায় ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে রাজবল্লভকে দেওয়ানিপদ প্রদান করিয়া তীর্থযাত্রা করেন। এই সময় হইতেই রাজবল্লভের অসাধারণ প্রতিভা প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র লাভ করিয়া আশ্চর্য্যরূপে সম্প্রসারিত হইতে লাগিল। সুশৃঙ্খলরূপে রাজ্যশাসন, পতিত রাজস্বের উদ্ধার প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রিয় কার্য্যদ্বারা তিনি ক্রমশঃ নবাবের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দী ঢাকার নবাবের নিকট নিকাশ তলব করেন। রাজবল্লভ সেই সময় মুর্শিদাবাদ গিয়া, তথাকার অন্যতম কর্ম্মচারী জপ্‌সা নিবাসী লালা রামপ্রসাদ সেনের * সহিত পরিচিত হইলেন এবং তাঁহার নিকটে নবাব্ সরকারের সমস্ত অবস্থা ও নবাবের প্রকৃতি প্রভৃতি অবগত হইয়া, প্রভু নিবাইশ মহম্মদের হিসাব নিকাশ—বিশেষ নিপুণতার সহিত প্রদান করিলেন।

ইহাতে নবাব আলিবর্দ্দীও তাঁহার বুদ্ধিচাতুর্য্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। রাজবল্লভের সৌভাগ্যবলে এইসময়ে মুর্শিদাবাদ নবাবের দেওয়ানী পদ শূন্য হইয়াছিল, এবং ঘটনাসূত্রে জগৎশেঠের ভ্রাতার সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। তাই ভ্রাতার অনুরোধে জগৎশেঠ রাজবল্লভকেই দেওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য নবাবের নিকট প্রার্থনা করেন। তৎপূর্ব্বেই নবাব তাঁহার যোগ্যতা অবগত থাকিলেও পুনর্ব্বার আরও কিছু পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি প্রদানপূর্ব্বক দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

রাজা রাজবল্লভ দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হইয়াই নবাবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক আত্মীয় রামানন্দ সরকারকে সেরেস্তাদারী এবং ভ্রাতুষ্পুত্র মৃত্যুঞ্জয়কে নাওয়ার দেওয়ানী ও কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণদাসকে খালিসার দেওয়ানী পদ প্রদান করিলেন। লালা রামপ্রসাদ সেনকেও সরকারী কার্য্য হইতে অপসৃত করিয়া, নিজের মন্ত্রিপদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বপ্রভু ঢাকার নবাব, রাজবল্লভের এইরূপ উন্নতি দেখিয়া অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহার অনুরোধে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র রামদাসকে ঢাকার দেওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদের নবাব বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নামে অভিহিত হইয়াও স্বয়ং রাজ্যশাসন করিতেন না, 'রায়রাঁয়া' উপাধিধারী একজন প্রধান কর্ম্মচারীই রাজ্যশাসন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। রাজবল্লভ দেওয়ান হইয়া শাসনকার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য নবাবকে পরামর্শ দিলেন, এবং নবাবও তাহার উপযোগিতা বুঝিয়া, তাহাতেই সম্মত হইলেন। এই সময়ে কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ নবাব একদিনের মধ্যে সাতলক্ষ টাকা দিবার জন্য রায়রাঁয়াকে আদেশ করেন, কিন্তু ধনাগারে তাহা সঞ্চিত না থাকায় রায়রাঁয়া সেই আদেশ পালনে অসমর্থ হইলেন। তৎপরে রাজবল্লভের প্রতি সেই অর্থসংগ্রহের ভার প্রদত্ত হইলে,

* লালা উপাধি কোন জাতিগত নহে। মুসলমানগণ কেরাণীদিগকেই বোধ হয় লালা বলিতেন। এইজন্যই পশ্চিমদেশের কায়স্থগণ আজিও 'লালা' উপাধিতে ভূষিত রহিয়াছেন।

আশা করি, সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বাগ্রগণ্য এই মহাত্মার জীবনকাহিনী পড়িয়া ধন্বন্তরির পাঠকবর্গও পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ঢাকা—বিক্রমপুরের অন্তর্গত বিলপাওনিয়া গ্রামে রাজবল্লভের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কৃষ্ণজীবন মজুমদার, মাতার নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী। চারি সহোদরের মধ্যে রাজবল্লভ তৃতীয় ছিলেন। অল্পবয়সেই তিনি পিতৃহীন হইয়া ১৯ বৎসর বয়সের সময়ে পিতৃবন্ধু রামনিধি বসু কানুনগোর সাহায্যে ঢাকার নবাবসরকারে প্রবেশলাভ করেন। নবাবের দেওয়ান যশোবন্ত রায়, রাজবল্লভের কার্য্যনিপুণতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পেস্কারী পদে উন্নীত করেন। অতঃপর আলিবর্দ্দী খাঁ মুর্শিদাবাদের সিংহাসন অধিকার করিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নিবাইশ মহম্মদকে ঢাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলে, বৃদ্ধ দেওয়ান যশোবন্ত রায় ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে রাজবল্লভকে দেওয়ানিপদ প্রদান করিয়া তীর্থযাত্রা করেন। এই সময় হইতেই রাজবল্লভের অসাধারণ প্রতিভা প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র লাভ করিয়া আশ্চর্য্যরূপে সম্প্রসারিত হইতে লাগিল। সুশৃঙ্খলরূপে রাজ্যশাসন, পতিত রাজস্বের উদ্ধার প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রিয় কার্য্যদ্বারা তিনি ক্রমশঃ নবাবের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দী ঢাকার নবাবের নিকট নিকাশ তলব করেন। রাজবল্লভ সেই সময় মুর্শিদাবাদ গিয়া, তথাকার অন্যতম কর্ম্মচারী জপ্সা নিবাসী লালা রামপ্রসাদ সেনের * সহিত পরিচিত হইলেন এবং তাঁহার নিকটে নবাব সরকারের সমস্ত অবস্থা ও নবাবের প্রকৃতি প্রভৃতি অবগত হইয়া, প্রভু নিবাইশ মহম্মদের হিসাব নিকাশ—বিশেষ নিপুণতার সহিত প্রদান করিলেন। ইহাতে নবাব আলিবর্দ্দীও তাঁহার বুদ্ধিচাতুর্য্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। রাজবল্লভের সৌভাগ্যবলে এইসময়ে মুর্শিদাবাদ নবাবের দেওয়ানী পদ শূন্য হইয়াছিল, এবং ঘটনাসূত্রে জগৎশেঠের ভ্রাতার সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। তাই ভ্রাতার অনুরোধে জগৎশেঠ রাজবল্লভকেই দেওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য নবাবের নিকট প্রার্থনা করেন। তৎপূর্ব্বেই নবাব তাঁহার যোগ্যতা অবগত থাকিলেও পুনর্ব্বার আরও কিছু পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ‘রাজা’ উপাধি প্রদানপূর্ব্বক দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

রাজা রাজবল্লভ দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হইয়াই নবাবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক আত্মীয় রামানন্দ সরকারকে সেরেস্তাদারী এবং ভ্রাতুষ্পুত্র মৃত্যুঞ্জয়কে নাওয়ার দেওয়ানী ও কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণদাসকে খালিসার দেওয়ানী পদ প্রদান করিলেন। লালা রামপ্রসাদ সেনকেও সরকারী কার্য্য হইতে অপসৃত করিয়া, নিজের মন্ত্রিপদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বপ্রভু ঢাকার নবাব, রাজবল্লভের এইরূপ উন্নতি দেখিয়া অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহার অনুরোধে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র রামদাসকে ঢাকার দেওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদের নবাব বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নামে অভিহিত হইয়াও স্বয়ং রাজ্যশাসন করিতেন না, ‘রায়রাঁয়া’ উপাধিধারী একজন প্রধান কর্ম্মচারীই রাজ্যশাসন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। রাজবল্লভ দেওয়ান হইয়া শাসনকার্য্য আয়ত্ত করিবার জন্য নবাবকে পরামর্শ দিলেন, এবং নবাবও তাহার উপযোগিতা বুঝিয়া, তাহাতেই সম্মত হইলেন। এই সময়ে কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ নবাব একদিনের মধ্যে সাতলক্ষ টাকা দিবার জন্য রায়রাঁয়াকে আদেশ করেন, কিন্তু ধনাগারে তাহা সঞ্চিত না থাকায় রায়রাঁয়া সেই আদেশ পালনে অসমর্থ হইলেন। তৎপরে রাজ-

* লালা উপাধি কোন জাতিগত নহে। মুসলমানগণ কেরাণীদিগকেই বোধ হয় লালা বলিতেন। এইজন্যই পশ্চিমদেশের কায়স্থগণ আজিও ‘লালা’ উপাধিতে ভূষিত

তিনি জগৎশেঠকে নানাপ্রকার ভীতি ও আশ্বাস প্রদান করিয়া, তাঁহার নিকট হইতেই ঐ অর্থ একদিনে সংগ্রহ করেন। এই ঘটনায় নবাব পরিতুষ্ট হইয়া,রাজবল্লভকে 'মহারাজ' উপাধিপ্রদান পূর্ব্বক তাঁহারই হস্তে রাজ্যশাসনের ভার প্রদান করিয়াছিলেন।

অতঃপর তিনি ভূম্যধিকারীগণের নিকট হইতে অনাদায়ী রাজস্ব ৮০ আশি লক্ষ টাকা আদায় করিয়া নবাবের ধনাগারে অর্পণ করেন। ইহাতে নবাবও তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ পাঁচ লক্ষ মুদ্রা এবং তাঁহার জন্মস্থান বিল-দাওনীয়া গ্রামে একটী রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া রাজবল্লভের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহের পরিচয় দিয়াছিলেন। রাজবল্লভ ঐ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া, স্বগ্রামে বহু দেব-মন্দির পুষ্করিণী প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিলেন, এবং নানাজাতীয় বহুলোকের তথায় বসবাসের ও বাণিজ্যাদির সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া, দাওনীয়া গ্রামখানিকে 'রাজনগর' নামক মহানগরে পরিণত করিলেন। এই অনাদায়ী রাজস্ব আদায় ও স্থায়ীভাবে রাজস্ব বৃদ্ধি প্রভৃতি কার্য্যের জন্য ভূম্যাধিকারিগণ রাজবল্লভের প্রতি অবশ্যই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে,—কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র "পূর্ব্বে রাজা জরাসন্ধঃ ইদানীং রাজবল্লভ" বলিয়া অনেক সময়ে মনের আক্রোশ প্রকাশ করিতেন। ঐ রাজস্ববৃদ্ধি ও রাজস্ব আদায় ব্যতীত ইহার অন্য কারণ দেখা যায় না। এই সময়ে রাজ্যশাসনের অধিকারচ্যুত হইয়া রায়রাঁয়া এবং সাত লক্ষ মুদ্রা প্রদানে বাধ্য হইয়া জগৎশেঠও রাজবল্লভের প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ইহার জন্য এসময়ে তাঁহার কোন অনিষ্ট না হইলেও ভাগ্যবিপর্য্যয়কালে ইহারই পরিণাম নিতান্ত অশুভজনক হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

এই সময় হইতে রাজবল্লভের ভাগ্যচক্র বিপরীত দিকেই পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইল। কামুকস্বভাব ছিলেন। কামপ্রবৃত্তি পরিতৃপ্তির জন্য কোনও উত্তেজক ঔষধ সেবন করিয়া, এই সময়ে রামদাস সহসা প্রাণত্যাগ করেন। সেই পুত্রশোক মন্দীভূত হইলে, রামদাসের পদে দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণদাসকে নিযুক্ত করিবার জন্য রাজবল্লভ মুর্শিদাবাদ নবাবের কৃপাপ্রার্থী হইলেন। নবাবও তাঁহার অনুরোধে কৃষ্ণদাসকেই দেওয়ানিপদ প্রদানের জন্য ঢাকার নবাবকে আদেশপ্রদান করেন। ইহার কিছুদিন পরেই ১৭০৬খৃঃ বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। আলিবর্দ্দী তাঁহার প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলাকেই সিংহাসন প্রদানের অভিলাষী ছিলেন। কিন্তু অপর জামাতা নিবাইশও সিংহাসনলাভের দ্বিতীয় অধিকারী। সুতরাং বৃদ্ধের মনোভাব বুঝিয়া, নিবাইশও সিরাজের প্রতিকুলতার জন্য পূর্ব্ব হইতেই আয়োজনের ত্রুটী করেন নাই। এই অভিপ্রায়েই তিনি, প্রতিভার অবতার রাজবল্লভকে মুর্শিদাবাদের দেওয়ানী লাভে বিশেষ সাহায্য করিয়া, তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে রাখেন এবং তাঁহার সহিত পূর্ব্ব সৌহার্দ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, রাজবল্লভও হোসেনকুলীর সহিত একমতে বলসঞ্চয় করিতে থাকেন। কিন্তু ভাগ্যদোষে আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। জামাতার মৃত্যুর পর আলিবর্দ্দী নিবাইশ পত্নী ঘেসেটী বিবিকেই ঢাকার শাসনকর্ত্রী রাখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ হোসেনকুলী ঢাকার নবাবিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। নিবাইশের মৃত্যু হইলেও ঘেসেটী বিবি যে তাঁহার পৌত্র মবারক উদ্দৌলার জন্য সিংহাসনের আকাঙ্ক্ষা করেন, সিরাজের তাহা বুঝিতে বাকী ছিল না। তাই ঘেসেটীর পক্ষচ্ছেদ করিবার অভিপ্রায়ে সিরাজউদ্দৌলা হোসেনকুলীর হত্যাসাধন করিয়াছিলেন। হোসেনকুলীর মৃত্যুর পর রাজবল্লভই ঘেসেটীর সমস্তকার্য্যে পরামর্শদাতা ছিলেন। পূর্ব্ব হইতে তাঁহারা মতিঝিলের প্রমোদোদ্যানে যথেষ্ট বল সঞ্চয়

আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর পর ঘেসেটীর সমস্ত সৈন্য-সামন্ত সিরাজের ভয়ে পলাইয়া গেল। আলিবর্দ্দীর মহিষীও সিরাজকে নিরাপদ করিবার অভিপ্রায়ে ঘেসেটীকে অনেক বুঝাইয়া নিজের অন্তঃপুরে লইয়া আসিলেন। দুর্ব্বৃত্ত সিরাজ তৎক্ষণাৎ ঘেসেটীকে কারারুদ্ধ করিয়া, নির্ব্বিবাদে স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিলেন।

রাজবল্লভের সহিত ঘেসেটীর ষড়যন্ত্র কথা সিরাজের অবিদিত ছিল না। বিশেষতঃ পূর্ব্বশত্রু রায় রাঁয়া ও জগৎশেঠ, তাঁহার বিরুদ্ধে বহু কল্পিত কথাও সিরাজের কর্ণগোচর করায়, সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনারূঢ় হইয়াই রাজবল্লভের শিরশ্ছেদের আদেশ করিলেন। ঘাতুক উপস্থিত হইলে রাজবল্লভ নানাবিধ কাতরোক্তি ও কৃতকার্য্যাদির বর্ণনা দ্বারা সিরাজের কৃপার উদ্রেক করিয়া প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার রাজনগরের প্রাসাদ লুণ্ঠনের জন্যও সিরাজ ফৌজ প্রেরণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস সেই সংবাদ পাইয়া, ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য কলিকাতা পলায়ন করিলেন, এবং ইংরাজ-কুঠীর অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেবের নিকট আশ্রয় লইলেন। সিরাজ উহা শুনিবামাত্র পুনর্ব্বার রাজবল্লভকে ঘাতকের হস্তে দিলেন। এবারেও বুদ্ধির এবং বাক্যের চতুরতায় রাজবল্লভ প্রাণরক্ষা করিলেন এবং জানিনা কোন্ কৌশলে কারামুক্তিও প্রাপ্ত হইলেন। কৃষ্ণদাসকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিবার জন্য সিরাজউদ্দৌলা ড্রেক সাহেবকে অনুরোধ করিলেও ইংরাজ-অধ্যক্ষ তাহাতে অসম্মত হওয়ায়, সিরাজ কলিকাতায় যুদ্ধ যাত্রা করে। ইংরাজের সংখ্যা তখন অতি অল্প; সুতরাং নবাবের বিপুলবাহিনীর বিরুদ্ধে অধিক্ষণ অস্ত্রধারণ করিতে না পারিয়া ড্রেক সাহেব আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইলে, নবাব কৃষ্ণদাসকে ও অন্যান্য ইংরেজ বীরপুরুষকে বন্দী করিয়া মুর্শিদাবাদে আনিলেন। কিন্তু আলিবর্দ্দীমহিষীর অনুমুক্তি দিতে বাধ্য হইলেন। তখন পিতা ও পুত্র কারামুক্ত হইয়াও, নবাবের আদেশে মুর্শিদাবাদেই নজরবন্দীর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এইসময়ে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়। ষড়যন্ত্রকারিগণ প্রথমেই রাজবল্লভের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মভীরু রাজবল্লভ তাহাতে যোগ না দিয়া নিমকের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি নিরপেক্ষ থাকিলেও, ইতিহাস প্রসিদ্ধ ষড়যন্ত্রকারিগণের চেষ্টায় সিরাজের পতন হইল, এবং ইংরাজের অনুগ্রহে মীরজাফর নবাবী প্রাপ্ত হইলেন। তিনিও পুনর্ব্বার রাজবল্লভকেই রাজ্য শাসনভার ও কৃষ্ণদাসকে ঢাকার দেওয়ানী প্রদান করেন। এই সময়ে আগামেহদি ঢাকার নবাবের শিরশ্ছেদ করিয়া স্বয়ং নবাব হইলে, মীরজাফর রাজবল্লভকেই তাহার শাসনের জন্য ঢাকায় প্রেরণ করেন। রাজবল্লভ আগামেহদির বংশনাশ ও ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগত হইলেন, এবং ইহার ফলে নূতন নবাব মীরজাফরেরও বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। ধর্ম্মকর্ম্মপ্রিয় রাজবল্লভ, এই অবসরে মুর্শিদাবাদেই কয়েকটী যজ্ঞকার্য্য ও কিরীটেশ্বরীতে কয়েকটী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে দিল্লীর বাদসাহ, নবাবের ঔদ্ধত্য নিবারণজন্য সসৈন্যে পাটনা পর্য্যন্ত আসিয়া মুর্শিদাবাদে দূত প্রেরণ করেন। পাটনার নায়েব রাজা রামনারায়ণ, বাদসাহসৈন্য পরাভূত করিয়া তাহাদিগকে পাটনাপ্রবেশে বাধা দিয়াছেন, সংবাদ পাইয়া, গর্ব্বিত মীরণ বাদসাহের আধিপত্য অস্বীকার করিলেন এবং রাজবল্লভকে সেনাপতি করিয়া বাদসাহের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য পাটনায় উপস্থিত হইলেন। পরিণতবুদ্ধি রাজবল্লভ ইহা অমঙ্গলকর বিবেচনা করিয়া মীরণকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করেন, এবং তাঁহার দুঃসাহস দমনের আকাঙ্ক্ষায় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেও

সৈন্যচালনা করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করায় প্রথম যুদ্ধে মীরণের পরাজয় ঘটিল। তৎপরে বাদসাহসৈন্য শিবির লুণ্ঠনের জন্য অগ্রসর হইলে, রাজবল্লভ উপস্থিত হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এই যুদ্ধে বাদসাহসৈন্যই পরাজিত হইল। যুদ্ধ জয়ের পর রাত্রিকালে নবাবশিবিরে বিবিধ আনন্দোৎসব হইতেছে এমন সময়ে সহসা শিবিরে বজ্রাঘাত হইয়া, উদ্ধত মীরণের অভিশপ্ত জীবন নিমেষের মধ্যে অপহরণ করিল। রাজবল্লভ তখন স্বতন্ত্র শিবিরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। মীরণের মৃত্যু-সংবাদ পাইবামাত্র, সকলকে তাহা গোপন রাখিতে পরামর্শ দিয়া পরদিন বাদসাহের পুনরাক্রমণ রাজবল্লভই নিবৃত্ত করিলেন। বাদসাহ পুনর্ব্বার পরাজিত হইয়া যুদ্ধবাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ধির জন্য রাজবল্লভকে আহ্বান করিলেন। অমাত্যগণ শত্রুশিবিরে যাইতে বারংবার নিষেধ করিলেও, রাজবল্লভ তাহাতে নিবৃত্ত না হইয়া, বিবিধ উপঢৌকনসহ বাদসাহশিবিরে উপস্থিত হইলেন এবং যথারীতি অভিবাদন করিয়া, সকল বিষয় এমন কৌশলে নিবেদন করিলেন যে বাদশাহ অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া সন্ধিস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে অভিনন্দনপত্র, পাঞ্জা, তরবারি ও 'সমরজঙ্গ' উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিলেন। প্রবাদ আছে— এইসময়ে বাদসাহ একটী কলমদানি ও একখানি তরবারি এই দুইটী দ্রব্য রাজবল্লভের সম্মুখে রাখিয়া, ইচ্ছামত দ্রব্য গ্রহণের জন্য রাজবল্লভকে আদেশ করেন। রাজবল্লভ তরবারি স্পর্শ না করিয়া কলমদানি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাদসাহ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বাদসাহের সেনাপতিত্ব অপেক্ষা মন্ত্রিত্ব পদই তাঁহার অধিক অভীপ্সিত, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া, বাদসাহের সন্তোষসাধনে যথেষ্ট সমর্থ হইয়াছিলেন। জীবনী-লেখক রসিক বাবু কিন্তু রাজবল্লভের উত্তরাধিকারি-গৃহে বাদসাহপ্রদত্ত তরবারি দেখিয়া, তরবারি

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ রাজবল্লভের স্কন্ধে তখন মুর্শিদাবাদের সমস্ত গৌরবভার অবস্থিত। মীরণের মৃতদেহ, নবাবের যুদ্ধসম্ভার প্রভৃতি তাঁহারই দায়িত্বে না থাকিলে, হয়ত এই সুযোগেই দিল্লীর উজীর হইতে পারিতেন। কিন্তু বিধাতার বিধান অন্যবিধ। তাই তাঁহার জীবনপ্রবাহ নূতন পথে অগ্রসর হইবার সুবিধা পাইল না। অতঃপর রাজবল্লভ মীরণের মৃতদেহ সেইখানেই সমাধিস্থ করিয়া, মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগত হইলেন এবং কিছুদিন বিশ্রামভোগের অভিপ্রায়ে নবাবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তীর্থযাত্রা করিলেন। এইসময়ে নবাবসৈন্যগণ প্রাপ্য বেতনের দাবিতে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে, মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিম তাহাদিগকে শান্ত করেন। এই ঘটনায় ইংরাজগণের নিকট যোগ্যতার পরিচয় দিয়া এবং নানাপ্রকারে শ্বশুরের অযোগ্যতা তাঁহাদের গোচরে আনিয়া, মীরকাশিম নিজেই নবাবী লাভের আয়োজন করিয়াছিলেন। ইংরাজ অধ্যক্ষগণের মধ্যে এই বিষয়ে মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়; একদল মীরণের নাবালক পুত্রকে নবাবীর উত্তরাধিকারী করিয়া রাজবল্লভকে তাহার কার্য্যনির্ব্বাহক করিতে বলেন, আর অপর দল মীরকাশিমকেই নবাবী প্রদানে অভিলাষ করেন। শেষোক্ত অভিপ্রায়ই মীরজাফরের অনুমত হওয়ায়, রাজবল্লভকে, কার্য্যতঃ নবাব দেখিবার সুবিধা দেশের লোক প্রাপ্ত হইলেন না। তৎপরিবর্ত্তে নিয়তি দেবী যেন কঠোর উপহাসের সহিত এই কর্ম্মবীর মহাপুরুষের চিরসমুজ্জ্বল জীবনপ্রদীপ এক ফুৎকারে নিবাইবার আয়োজন করিলেন।

রাজবল্লভ তীর্থদর্শনের পর প্রত্যাগত হইলে, মীরকাশিম তাঁহাকে পাটনার শাসন-কর্ত্তৃপদে নিয়োজিত করিলেন। অতঃপর রাজবল্লভের শত্রুপক্ষ মীরকাশিমকে বুঝাইয়া দিলেন যে রাজবল্লভ গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার উচ্ছেদ চেষ্টা করিতেছেন। ইংরাজ দরবারে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে রাজ-

হইতেই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না; এখন আবার ষড়যন্ত্রের কথায় অধিকতর শঙ্কিত হইয়া, সপুত্র রাজবল্লভকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালার অধিকাংশ প্রধান পুরুষগুলিকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সৎপরামর্শদাতার অভাব বশতঃই হউক, অথবা অতিমাত্র গর্ব্বিত হইয়াই হউক, মীরকাশিম ক্রমশঃ ইংরাজের আনুগত্য অস্বীকার করিয়া মুঙ্গেরে রাজধানী আনয়ন পূর্ব্বক ইংরাজবিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ইংরাজ অধ্যক্ষ এই সংবাদ অবগত হইবামাত্র মীরকাশিমের শাসনার্থ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধে মীরকাশিম সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া, চির-দিনের জন্য মুসলমানের রাজলক্ষ্মী ইংরাজের হস্তে তুলিয়া দিলেন! "বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি" ইহা এদেশে চিরপ্রচলিত সত্য প্রবাদ। দুর্বৃত্ত মীরকাশিমের শেষ কার্য্য, সেই প্রবাদকে অধিকতর প্রমাণিত করিয়াছিল। মীরকাশিম যুদ্ধযাত্রার সময়ে, কারারুদ্ধ সমস্ত প্রধান পুরুষের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। রাজবল্লভ ও তৎপুত্র কৃষ্ণ-দাসকে 'কিরূপ মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করেন' জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা গঙ্গাগর্ভে নিঃক্ষেপের অনুরোধ করেন। দু'দিনের নবাব মীরকাশিমও তাঁহাদের সেই অন্তিম অনুরোধ রক্ষা করিতে অন্যথা করেন নাই। কৃষ্ণদাসের জীবন রক্ষার জন্য রাজবল্লভ বহু উৎকোচাদি প্রদানের প্রস্তাব করিলেও কৃত-কার্য্য হইতে পারেন নাই। সে চেষ্টা বিফল হইলে, তাহাকেই পুত্রের পূর্ব্বে গঙ্গায় নিঃক্ষেপের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু নির্দ্দয় ঘাতকগণ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া, তাঁহার চক্ষুর সম্মুখেই প্রথমে কৃষ্ণদাসকে ও তৎপরে রাজবল্লভকে গঙ্গা-গর্ভে নিঃক্ষেপ করিয়াছিল। এইরূপে বাঙ্গালার উজ্জ্বলরত্ন—অকালে—অবিচারে গঙ্গার অতল তলে নিমজ্জিত হইয়াছিল! মৃত্যুকালে তাঁহার ৫৬ বৎসর মাত্র বয়স হইয়াছিল।

গঙ্গার যেস্থানে এইসমস্ত মহাপুরুষ নিমজ্জিত হইয়াছিলেন অদ্যাপি তথায় একটী পাষাণময় দ্বীপ উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া, দুরাচার মীর-কাশিমের অত্যাচার কাহিনীর ঘোষণা করিতেছে! সেই দ্বীপের নাম 'মৈন পাথল', কিংবদন্তী যে মৃতের কণ্ঠবদ্ধ পাষাণই বৃদ্ধি পাইয়া এই দ্বীপের সৃষ্টি করিয়াছে।

আরও একটী প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে রাজবল্লভ গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র কিরীটেশ্বরী-স্থিত তাঁহার 'রাজবল্লভেশ্বর' শিবও নাকি সশব্দে বিদীর্ণ হইয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

[শ্রীকামিনীমোহন সেন গুপ্ত।]

বর্ত্তমান সময়ে সমাজের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে, সমাজ ও ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যের পোষকতায় লোকের মতি-প্রবৃত্তি যেরূপ গঠিত হইতেছে, তাহাতে কোনরূপ সদনুষ্ঠান দেখিলে, স্বতঃই হৃদয়ে একটু অপার আনন্দের উদ্রেক হয়, এবং সেই আনন্দ-সমাচার দশজনকে জানাইবার বাসনা জন্মে।

যাঁহারা নীতিবিগর্হিত কার্য্য দ্বারা সমাজকে অধঃপাতিত করিতে চাহেন, সমাজে নিষ্ঠুর প্রথার প্রবর্ত্তন দ্বারা সামাজিকের উচ্ছেদ-সাধনে যাঁহারা অকুণ্ঠিত, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দশজনের গোচর করিয়া প্রতীকারের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ, স্বার্থের প্রলোভনে তাঁহারা এতদূর মুগ্ধ যে,

অসম্ভব হইয়া পড়ে। বিবাহে বর-পণ ও যৌতুক-গ্রহণ-প্রথার উচ্ছেদ-সাধন-কল্পে প্রয়াস পাইয়া ইহা আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। শুধু উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, এই প্রয়াসে আত্ম-পর উভয়েরই বিরাগভাজন হইতেছি। কিন্তু তাহা বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া কূলে নৌকা ডুবাইবার ব্যবস্থা করিব না।

অনেকেই বলিয়া থাকেন,—'মুখে যিনি যাহাই বলুন না কেন, যাঁহার ছেলে আছে, তিনি কিছুতেই বরপণ ও যৌতুকের লোভ সম্বরণ করিতে পারিবেন না।' ইতিপূর্ব্বে ধন্বন্তরি-পত্রে কিন্তু এরূপ দুইএকটী সদ্দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে ! চলিত মাঘ মাসের ৫ই তারিখ মঙ্গলবার এই মহানগরী কলিকাতায় যে একটী উদ্বাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, নিম্নে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল।

রায়সাহেব শ্রীযুক্ত কালীমোহন সেন আসামের অন্তর্গত ডিব্রুগড়ের সব-এসিষ্টাণ্ট সার্জন। ইঁহার নিবাস ঢাকা জেলার অন্তর্গত, বিক্রমপুরের শিক্ষিত-পদস্থ বৈদ্যপ্রধান স্থান - সোণারঙ্গ গ্রামে। উক্ত বিক্রমপুরান্তর্গত ষোলঘর গ্রাম নিবাসী কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত একটী অনূঢ়া কন্যা ও তিনটী পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। শ্বশুরালয়ে কন্যাটী লইয়া প্রতিপালিত হইবার সুবিধা ছিল না বলিয়া কালী-প্রসন্নের স্ত্রী সোণারঙ্গ গ্রাম নিবাসী স্বীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রসিক বাবু সম্পন্ন অবস্থাপন্ন লোক না হইলেও ভগ্নী ও তাঁহার সন্তানগণের ভরণ-পোষণের আংশিক ভার গ্রহণে অবহেলা করেন না। কালী-প্রসন্ন সেন মহাশয়ের কণিষ্ঠ শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন সেন মহাশয়ও মাসিক সাহায্য দ্বারা ভ্রাতৃজায়া ও তদীয় পুত্রকন্যাগণের ভরণ-পোষণের সহায়তা করেন।

ক্রমে ভাগিনেয়ী বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিলে পাত্রের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু বরপণের কম্নীতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। সম্প্রতি ও যৌতুক বাবদ এক কপর্দ্দকও গ্রহণ না করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত এই নিঃস্ব বিধবার কন্যার উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ব্যয়-সঙ্ক্ষেপের উদ্দেশ্যেই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, কলিকাতায় এই উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। কোন বিষয়েই বাড়াবাড়ি হয় নাই, বিদায় আদায় লইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে কোনরূপ বাক্‌বিতণ্ডা হয় নাই, উভয় পক্ষের হাসিমুখে শুভ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, কন্যাদায়গ্রস্তা বিধবা কঠোর সমস্যা হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন।

অনেকের মুখেই শুনা যায়, যাঁহারা কন্যাদায়-গ্রস্ত নহেন, স্থলবিশেষে তাঁহারা এরূপ অনুকম্পা প্রদর্শন করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু রায়-সাহেব কালীমোহন বাবু এই ধারণারও অসারতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি নিজেও কন্যাদায়-গ্রস্ত; আধুনিক সমাজের ঘৃণিত প্রথায় হয়ত তাঁহাকে বরপণ ও যৌতুক দিয়া কন্যা পাত্রস্থ করিতে হইতে পারে। কিন্তু এরূপ অবস্থা সত্ত্বেও তিনি এক কপর্দ্দক গ্রহণ না করিয়া একটী বিধবাকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করতঃ সমগ্র বৈদ্যসমাজের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, রায়সাহেব কালী-মোহন হয়তঃ 'অনিন্দ্য-সুন্দরী' কন্যার প্রলোভনে পড়িয়া এইরূপ স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহাও বলিবার সুবিধা নাই। ক'নেটী 'অনিন্দ্য-সুন্দরী' নহে, রঙ ময়লা, বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের বিশেষ কোন চিহ্ন ইহাতে পরিলক্ষিত হয় না; কিন্তু আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যে ইহাকে 'অনিন্দ্যসুন্দরী' বলা যায়। কেন না, আধুনিক যুগে এরূপ বয়স্থা কন্যারা লেখা পড়া এবং শিল্পকার্য্যে যতদূর পার-দর্শিতা লাভ করিয়া থাকে, এটী তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে; এতদ্ভিন্ন গৃহকার্য্যে সুনিপুণা। শুনা যায়, রায়সাহেব কালীমোহন এরূপ সৌন্দ-র্য্যেরই পক্ষপাতী ছিলেন,—তিনি এরূপ সৌন্দ-

আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছেন,—তিনি স্বয়ং সুখী হইয়াছেন, আর তাঁহাতে বৈদ্য সন্তানের চিরগত উদারতার দৃষ্টান্ত পাইয়া সমগ্র বৈদ্যসমাজ উৎফুল্ল হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আজকাল এই বরপণ ও যৌতুকের প্রাচুর্য্যে সমগ্র বঙ্গের বৈদ্যসন্তানগণ দিন দিন দরিদ্রতার ক্রোড়ে আশ্রয় লইতেছেন। স্বজাতীয় বলিয়া সমবেদনার লেশ বৈদ্যসাধারণের হৃদয়ে থাকিলে, আজ এই জাতির এতটা অধঃপতন হইত বলিয়া মনে করা যায় না! আজ যে মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া রায় সাহেব কালী মোহন, নিজে কন্যাদায়-গ্রস্ত থাকাসত্বেও, স্বজাতীয়ের প্রতি সমবেদনা প্রদর্শন করিয়াছেন, সমগ্র সমাজের বৈদ্য সন্তানগণ যদি এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন, আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি, বৈদ্য সমাজ হইতে অচিরে এই নিষ্ঠুর প্রথা তিরোহিত হইয়া যাইতে পারে।

আজকাল বৈদ্য সমাজে দুঃস্থের সংখ্যা অধিক। অতীত জাতীয় গৌরব রক্ষা করিয়া চলিবার প্রয়াস পাওয়াই ইহার অন্যতম কারণ। জীবিকা অর্জ্জনের জন্য কোন বৈদ্যসন্তান নীচবৃত্তি অবলম্বন করে না, অথচ সমাজে দশের সহিত সমকক্ষতা করিয়া চলিবার বাসনা খুব বলবতী। এই বাসনা পূর্ণ করিতে হইলে আয় অপেক্ষা ব্যয়ের মাত্রা বেশী হইয়া পড়ে। সুতরাং দরিদ্রতা যে আপনা আপনি আসিয়া পড়ে, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ বৈদ্য জাতির মধ্যে দারিদ্র্যের ইহাই প্রধানতম কারণ। বৈদ্য সন্তানগণ ইচ্ছা করিলেই সমাজ হইতে এই দরিদ্রতা তিরোহিত করিতে পারেন। আমরা আশা করি, সমগ্র বঙ্গের বৈদ্যসন্তানই রায় সাহেব কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বৈদ্য জাতির অতীত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হইবেন।

জাতি ও বর্ণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীযতীন্দ্র মোহন সেন বি, এল।]

আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি—মনুসংহিতা, ভাগবত' বায়ুপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণে বর্ণোৎপত্তি ব্যাপারটী রূপকে বিবৃত হইয়াছে। এই শাস্ত্রগুলিতে রূপকে অশরীরী ব্রহ্মার একটী মানব শরীরের ন্যায় এক আনন,দ্বিভুজ, উরুদ্বয় ও দ্বিপাদ বিশিষ্ট অবয়ব কল্পিত হইয়াছে। সত্ব গুণ বা সাত্বিকী বৃত্তিগুলি দ্বারা সেই ব্রহ্মশরীরের মুখ, রজোগুণ বা রাজসিকী বৃত্তি দ্বারা তাঁহার বাহুদ্বয়, রাজসিক ও তামসিক মিশ্রগুণ বা বৃত্তি দ্বারা তাঁহার পদদ্বয় কল্পিত হইয়াছিল। অর্থাৎ সত্বগুণ বা সাত্বিকী বৃত্তি ব্রহ্মার মুখস্বরূপ, রজোগুণ বা

তামসিক মিশ্রগুণ বা রাজসিকী ও তামসিকী মিশ্রা বৃত্তিগুলি তাঁহার উরুদ্বয় স্বরূপ এবং তমোগুণ বা তামসিকী বৃত্তিগুলি তাঁহার পাদদ্বয় স্বরূপ। যেহেতু বৃত্তি হইতে বর্ণের উৎপত্তি, এবং যিনি যে বৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করেন তিনি সেই বৃত্তি কল্পিত ব্রহ্মাঙ্গের পুত্র স্বরূপ সেইহেতু ঐ সকল শাস্ত্রে বৃত্ত্যনুয়ায়ী লব্ধ বর্ণ সকলকে ব্রহ্মার গুণ ও বৃত্তি কল্পিত মুখাদি অঙ্গজাত বলা হইয়াছে। কিন্তু সুপণ্ডিত কুল্লুকভট্ট এই ব্যাপারটী ঢাকিবার জন্য বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণাদি মূলজাতি চতুষ্টয় ব্রহ্মার মুখাদি অঙ্গজাত ইহাতে কোন আশ্-

যে বচনের মূলে ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণাদি জাতির উৎপত্তি শ্রুতিসিদ্ধ বলা হইয়াছে তাহা এই :—

যৎপুরুষংব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন ?
মুখং কিমাসীৎ ? কিংবাহু ? কা উরূ ?
কা পাদা উচ্যতে ?

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূরাজন্য কৃতঃ।
উরূতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥
ঋক—২০।১১—১২

এই বচনটী ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তের একাদশ ও দ্বাদশ ঋক্। ইহাতে ও আমরা দেখিতে পাই যে রূপকে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়কে, ব্রহ্মার না বলিয়া, বিরাট পুরুষের কল্পিত দেহের যথাক্রমে মুখ বাহু-রুপাদস্বরূপ বলা হইয়াছে। যে নরাকৃতিবিশিষ্ট দেহ প্রকৃত নহে, কেবল রূপককল্পিত তাহাতে ব্রহ্মার স্থলে বিরাট বলিলেও কোন বিরোধ হয় না, যেহেতু উভয়েরই ভাব এক।

আমাদের মতে,—এই পুরুষসূক্তের উক্ত বচ-নাংশের এইরূপ সরল ব্যাখ্যা হওয়াই কর্ত্তব্য :—

(সেই ব্রহ্মৈকপাদ স্থূল জগদ্রূপে প্রকটিত বিরাট্ রূপ পুরুষের বিচিত্র কার্য্য বুঝিবার জন্য মহর্ষি সাধ্য ও দেবগণ) বিশ্বরূপ পুরুষ শরীরকে যে পশুভাবে কল্পনা করিয়া, এক আনন দ্বিভুজ উরুদ্বয় ও দ্বিপাদ বিশেষে, বিভাগ করিয়াছিলেন তাহা কয় প্রকারে করিয়াছিলেন ? (তাঁহার) মুখ কি—সেই কল্পিত পশুকে বিভক্ত করিয়া যেটী মুখাংশরূপে ছিন্ন হইল সেটী জগতের কিসের স্বরূপ? (তাঁহার) বাহুদ্বয় কি—সেই কল্পিত যজ্ঞীয় পশুর যে দুইটী বাহুদ্বয়রূপে ছিন্ন হইল তাহারা বিশ্বের কাহার স্বরূপ ? (তাঁহার) উরুদ্বয় কি উক্ত যজ্ঞীয় পশুর ছিন্ন অঙ্গের মধ্যে যে দুইটী অংশ উরু-দ্বয়-স্বরূপ হইল তাহা জগতের কাহার সহিত উপমেয় ? (তাঁহার) পাদদ্বয়কে কি বলে—উক্ত বিশ্বরূপী বিরাটের যজ্ঞীয় পশুভাবে কল্পিত ও ছিন্ন করা যাইতে পারে ? (ব্রহ্মর্ষি আদি গণ প্রশ্নোত্তর ছলে ব্রহ্মের কার্য্য বুঝিবার চেষ্টা করিয়া এইরূপে একাদশ মন্ত্রে অগ্রে সাধারণভাবে চিত্তে অগ্রে সামান্য প্রশ্ন ক্রমে বিশেষভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া নিজেরা ধ্যানেই তাহার উত্তর ছলে দ্বাদশ মন্ত্রে মীমাংসা করিতেছেন) ব্রাহ্মণ বর্ণ তাঁহার মুখের (স্বরূপ) হইল—ব্রাহ্মণবর্ণ দ্বারা সেই যজ্ঞীয় পশুর মুখকল্পিত হইয়াছিল ; ক্ষত্রিয়বর্ণ বাহুদ্বয় (স্বরূপ) ক্ষত্রিয় বর্ণ দ্বারা বাহুদ্বয় কল্পিত হইয়াছিল ; উহার যে দুইটী উরুদ্বয় (স্বরূপ) তাহা যেন বৈশ্যবর্ণ—বৈশ্য-বর্ণ দ্বারা উহার উরুদ্বয় কল্পিত হইয়াছিল ; শূদ্রবর্ণ উহার পদদ্বয় স্বরূপ হইল—'পদ্ভ্যাং' পদের পঞ্চমীটী বিভক্তি ব্যত্যয়, প্রথমার স্থানে ব্যত্যয়ক্রমে পঞ্চম্যন্ত হইয়াছে—শূদ্রের সহিতই উক্ত যজ্ঞীয় পশুর পদদ্বয় উপমিত হইতে পারে।

উক্ত ঋগ্বচনের পূজ্যপাদ মহাত্মা সায়নাচার্য্য কৃত টীকার ভাবার্থ এইরূপ :—

"প্রশ্নোত্তরে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সৃষ্টি বলিবার জন্য ব্রহ্মবাদিগণের প্রশ্ন বলা হইয়াছে যথা—যখন প্রজা-পতি ব্রহ্মা বা ব্রহ্মপুরুষের প্রাণরূপা দেবতা সঙ্কল্প দ্বারা বিরাট্ পুরুষকে উৎপাদিত করিলেন, তখন কয় প্রকারে সেই বিরাট্ পুরুষের দেহ কল্পিত হইয়াছিল ? উক্ত বিরাট্ পুরুষের মুখ কি ? বাহু-দ্বয় কি ? উরুদ্বয় কি ? এবং পদদ্বয় কাহাকে বলে ?' একাদশ মন্ত্রে—প্রথমে সামান্য প্রশ্ন, তাহার পর 'মুখ কি' ইত্যাদিভাবে বিশেষ প্রশ্ন কৃত হইল। দ্বাদশ মন্ত্রে উহার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে যথা—'ঐ প্রজাপতি ব্রহ্মার ব্রাহ্মণত্ব জাতি বিশিষ্ট পুরুষ মুখ হইলেন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জাতি ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হইলেন। ঐ যে ক্ষত্রিয়ত্ব জাতি বিশিষ্ট পুরুষ তিনি বাহুদ্বয় হইতে হইলেন অর্থাৎ বাহুত্ব হইতে নিষ্পাদিত বা ব্রহ্মার বাহুদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইলেন। তদানীং প্রজাপতির যে দুইটী উরুদ্বয় তদ্রূপ বৈশ্য সম্পন্ন হইলেন। তথা উঁহার পদদ্বয়

পরম পূজনীয় সায়নাচার্য্যের এই ব্যাখ্যা আমাদের মতে অত্যন্ত কষ্টকল্পনাপ্রসূত ও নিতান্ত অসঙ্গত। পুরুষ-সূক্তে পাঠক পরে দেখিতে পাইবেন আদৌ জত্যুৎপত্তির কোন প্রসঙ্গ নাই। মহাত্মা সায়ন "পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত" এই অংশটীর পঞ্চম্যন্ত "পদ্ভ্যাং" পদটী ও "অজায়ত" কথাটি পাইয়াই "পদদ্বয় 'হইতে শূদ্রত্ব 'জাতিমান্' পুরুষ উৎপন্ন হইলেন" এইরূপ অর্থ করিয়া বসিলেন। দেখিয়া মনে হয় তিনি যেন ব্রাহ্মণ জাতির নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্ব ও ব্রাহ্মণাদি জাতি ব্রহ্মার কৃত, প্রতিপাদনের জন্য সমগ্র বেদ হইতে একটি অনুকূল বচন অন্বেষণ করিতেছিলেন। এই বচনটী কথঞ্চিৎ তাঁহাকে সেই সুযোগ প্রদান করিল। তিনি এই সুযোগ পাইয়া অভীষ্ট সিদ্ধি মানসে অপর তিনটী যথা 'মুখম্' 'বাহু' ও 'উরু' পদের প্রথমা বিভক্তির বিপর্য্যয় সাধন পূর্ব্বক স্বীয় মনোমত অর্থ করিতে বাধ্য হইলেন, যথা—'মুখ হইতে,' 'বাহুদ্বয় হইতে,' ও উরুদ্বয় হইতে। উক্ত তিনটী পদের সোজা সুজি 'মুখদ্বয়,' 'বাহুদ্বয়,' ও 'উরুদ্বয়' অর্থ করিলে পাছে লোকের মনে সংশয় উপস্থিত হয়, যে 'পদ্ভ্যাং' শব্দটী 'পাদৌ' শব্দ স্থানে বিভক্তিব্যত্যয় ক্রমে হইয়াছে, বেদে এইরূপ বহু বিভক্তি ব্যত্যয় দেখিতে পাওয়া যায় (ব্যত্যয়ো বহুলমিতি পাণিনিঃ) সেইজন্য তিনি একটিমাত্র পঞ্চম্যন্ত বিভক্তি পাইয়া অপর তিনটি প্রথমান্ত পদকে পঞ্চম্যন্ত স্বরূপে গ্রহণ করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করিলেন। একটিকে বজায় রাখিবার জন্য তিনটীর বিভক্তি ব্যত্যয় করিয়া অর্থ করা কি সাধু ও যুক্তিযুক্ত হইয়াছে? পূর্ব্ব তিনটী পদের বিভক্তি দেখিয়া একটির বিভক্তি ব্যত্যয় হইয়াছে বলিলে সঙ্গততর ভাবে সামঞ্জস্য রক্ষাও হইত এবং অর্থবিপর্য্যয়ও হইত না। 'অধমই উত্তমকে ভজনা করে উত্তম কখন অধমকে ভজনা করে না' এই ন্যায়ানুসারে এই শরীরের সর্ব্ব নিম্ন ও নিকৃষ্টতম অঙ্গ পদদ্বয়েরই শ্রেষ্ঠাঙ্গত্রয়ের বিভক্তি বিভক্তি পরিবর্ত্তন ন্যায়ানুমোদিত বলা যায় না। একই বিরাট্‌রূপী কল্পিত যজ্ঞীয় পশুর বিভিন্ন অঙ্গ হইতে তর্কচ্ছলে বিভিন্ন মানবের উৎপত্তি স্বীকার করিলেও তাহাদের জাতিত্বের বিভিন্নতা হইতে পারে না এবং তাহাদের মধ্যে উত্তমাঙ্গোদ্ভূতগণ অধমাঙ্গোদ্ভূতগণ অপেক্ষা কোনক্রমে শ্রেষ্ঠ তাহাও স্বীকৃত হয় না। পরম-পূত-সলিলা পতিত-পাবনী দুরিতাপহারিণী, মোক্ষদায়িনী মন্দাকিনী গঙ্গা শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণাম্ভোজজাতা হইয়াও ব্রহ্মমুখ বাহুরূপাদজ মানব ত দূরের কথা, ব্রহ্মর্ষি পিতৃ দেবাসুর যক্ষ রাক্ষস কিন্নরাদি বিশ্বপ্রাণীর পূজ্যা। আমরা পুরুষ-সূক্তেই দেখিতে পাইব পৃথিবী সম্বন্ধে ও "পদ্ভ্যাং ভূমিং" কথিত হইয়াছে। যদি ইহার দ্বারা দেবী পৃথিবীকেও ব্রহ্মপাদজাতা বলিতে হয় তাহা হইলে তিনিও যখন মনুজ ব্রাহ্মণের নমস্য তখন পাদদেশ বা শরীরের নিম্নদেশ হইতে উদ্ভব হইলেই যে উচ্চ দেশ হইতে উদ্ভূত অপেক্ষা অপকৃষ্ট বা হেয় হইবে তাহার কোন অর্থ নাই, যেমন একই ডুমুর বৃক্ষের মূলদেশোদ্ভূত ফল প্রকাণ্ড বা শিখর স্থানজাত ফল অপেক্ষা জাতি ও প্রকৃতিতে কোন অংশে অপকৃষ্ট হয় না সেইরূপ। ভগবানের পদ হইতে, দেবতা হইতে মানব পর্য্যন্ত সকলেরই যখন উৎপত্তি স্বীকার করিতেছেন তখন একস্থান হইতে জন্ম হইলেই একজাতি এবং বিভিন্ন স্থান হইতে জন্ম হইলেই বিভিন্ন জাতি হইবে, তাহা বলাও সঙ্গত নহে। পূজ্যপাদ সায়নের ব্যাখ্যার অসঙ্গতি তাঁহার টীকা হইতেই দেখা যায়। তিনি বলিতেছেন—"প্রশ্নোত্তরে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সৃষ্টি বলিবার জন্য ব্রহ্মবাদিগণের প্রশ্ন বলা হইয়াছে" "একাদশ মন্ত্রে প্রথমত সামান্য প্রশ্ন তাহার পর 'মুখ কি?' ইত্যাদিভাবে বিশেষ প্রশ্ন করা হইল।" দেখা যাউক প্রশ্নই বা কি, উত্তরই বা কি। সামান্য প্রশ্ন যথা:—"যখন প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রাণরূপা দেবতা সকল দ্বারা বিরাট্‌রূপ পুরুষকে উৎপাদিত

কল্পিত হইয়াছিল?" পাঠক এখানে জাতি সৃষ্টি বিষয়ক কোন সামান্য প্রশ্ন পাইলেন কি? এখানে একটি ব্রহ্মাণ্ডরূপী বিরাটের একটী মানবদেহের ন্যায় পুরুষ শরীর কল্পনা করার প্রসঙ্গ দেখিতেছেন না কি? এবং একটি বিশ্বের কোন্ কোন্ বস্তু সাহায্যে বা বস্তুর উপমায় সেই দেহের কল্পনা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন কৃত হয় নাই কি? এখানে জাতিসৃষ্টির কোন প্রশ্নই নাই সুতরাং উত্তরেও জাতিসৃষ্টি বিষয়ক কোন প্রসঙ্গই থাকিতে পারে না। আর একটি কথা নরাকার বিশিষ্ট যে একটী দেহ কল্পিত হইয়াছিল সেটী ব্রহ্মার কি বিরাটের পাঠক তাহা প্রশ্ন হইতে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবেন। যে কয়প্রকারে বা যে যে জাগতিক বিষয়ের উপমানে সেই পুরুষের কল্পিত দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কল্পিত হইয়াছিল তাহাই বিশেষ প্রশ্নাকারে জিজ্ঞাসিত হইয়াছে যথা—'মুখ কি', 'বাহুদ্বয় কি', 'উরুদ্বয় কি', 'পদদ্বয় কাহাকে বলে?' উক্ত শরীরটী প্রকৃত মুখ, হস্ত, উরু ও পাদবিশিষ্ট নহে উহা যে কল্পিত তাহা "পদদ্বয় কাহাকে বলে?" প্রশ্নের দ্বারায় পরিস্ফুটিত হইয়াছে অর্থাৎ ইহা দ্বারা বিশদীকৃত হইতেছে যে কতকগুলি বস্তু দ্বারায় যেন বিরাটের মুখ, কতকগুলি দ্বারায় যেন তাঁহার বাহু কতকগুলি দ্বারা যেন তাঁহার উরুদেশ এবং অপর কতকগুলি দ্বারায় যেন তাঁহার পদদ্বয় কল্পিত হইল অতএব সেই সেই বস্তু যথাক্রমে যেন তাঁহার মুখ, বাহু, উরু ও পাদস্বরূপ। 'মুখ কি?' প্রশ্নে বিরাট্ পুরুষেরই কল্পিত শরীরের কোন বস্তু মুখস্বরূপ হইল তাহাই বুঝাইতেছে পুরুষসূক্ত উত্তর ছলে বলিতেছেন ব্রাহ্মণবর্ণ সেই বিরাট পুরুষের (কল্পিত শরীরের) মুখ (স্বরূপ) হইলেন। কিন্তু পূজনীয় সায়ন লিখিতেছেন—"ঐ প্রজাপতির (ব্রহ্মার) ব্রাহ্মণত্ব জাতিবিশিষ্ট পুরুষ মুখ হইলেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতি ব্রহ্মার মুখ হইতে হইলেন।" ইহা কি ধান ভানিতে শিবের গীত নহে? প্রশ্ন হইল? আর উত্তর হইতেছে 'ব্রহ্মার' মুখ হইতে কি হইল!!! প্রশ্ন হইতেছে—(বিরাটের) পদদ্বয় কাহাকে বলে বা কোন্ পদার্থের দ্বারা বিরাটের পদদ্বয় কল্পিত হইল? আর উত্তর হইতেছে— "তথা উঁহার (ব্রহ্মার) পদদ্বয় শূদ্রত্ব জাতিমান্ পুরুষ উৎপন্ন করিল!!!" ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ও মুখ, বাহু, উরু ও পদ এই শব্দকয়টী দেখিয়াই সায়ন লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তিনি 'উদোর খাড়ে বুদোর পিণ্ডি' চাপাইয়া বিরাটের স্থানে ব্রহ্মা খাড়া করিলেন এবং যে যে পদার্থের দ্বারায় তাঁহার মুখাদি কল্পিত হইয়াছে তাহাদেরই মুখাদি হইতে জাত করিয়া মনোমত ব্যাখ্যা করিলেন। ব্রাহ্মণাদি বাক্য থাকিলেই কি ব্রাহ্মণাদি জাতিবিশিষ্ট মানব বুঝায়? আমরা দেখিয়াছি দেবাসুর রাক্ষস যক্ষ প্রভৃতি সর্ব্ব প্রাণিগণের এমন কি বিশ্বের চরাচর সর্ব্বপদার্থের ভিতর ব্রাহ্মণাদি বর্ণ আছে কিন্তু জাতি নাই, এই 'জাতিবিশিষ্ট পুরুষ', 'জাতিমান পুরুষ' প্রভৃতি বাক্য সায়ন কোথা হইতে পাইলেন? গরজ বড় বালাই তাঁহার আবশ্যক বেদ হইতে বর্ত্তমান জাতি ভেদপ্রথা সমর্থন করেন ও দেখান যে, ইহা স্বয়ং ব্রহ্মার কৃত, তাঁহারই বিভিন্ন অঙ্গ হইতে তিনিই বিভিন্ন জাতিসকল সৃজন করিয়াছেন, যে জাতি তাঁহার যে অঙ্গ হইতে জাত সেই জাতির শ্রেষ্ঠতা ও অপকৃষ্টতা সেই অঙ্গের শ্রেষ্ঠতা ও অপকৃষ্টতার উপর নির্ভর করে, এই ভেদ মনুষ্যের কোন প্রক্রিয়া দ্বারা দূরিত হইবার নহে যেন ইহারা বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। অতএব উচ্চজাতীয় ব্যক্তি যতই অপকার্য্য করুক সে নিম্নতর জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ থাকিবেই ও নিম্নজাতি যতই সাধু আচারবিশিষ্ট হউক না কেন সে, উচ্চজাতীয় ব্যক্তি অত্যন্ত দুরাচারী হইলেও তাহার, শ্রেষ্ঠত দূরের কথা সমকক্ষ হইতে পারে না। সেইজন্য বেদে জাতিসৃষ্টির কথা থাকুক আর নাই থাকুক মহাত্মা সায়ন জাতিসৃষ্টির

এইরূপে তাঁহার শুভ্র ও পবিত্র লেখনীতে চির-কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিলেন। সমগ্র ভারত এই মহাপুরুষের নিকট ঋণী তাঁহারই ব্যাখ্যা-সাহায্যে অধুনা আমরা যৎকিঞ্চিৎ বেদ চর্চ্চা করিয়া ধন্য হই। কিন্তু সত্যের জন্য আমরা অতি দুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহারও ত্রুটী দেখাইতে বাধ্য হইলাম।

মহামান্য কুল্লুকও দেখিলেন তাঁহার মাহেন্দ্র যোগ উপস্থিত, তিনি মহাত্মা সায়নের ব্যাখ্যার আশ্রয়ে নিজ সাধুতা রক্ষা করিবেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা ফলবতী হয় নাই। অবশ্য নিজ স্বার্থ-সাধনোদ্দেশে স্বার্থপর ব্যক্তিগণ তাঁহার ব্যাখ্যার সমাদর করিলেও ধর্ম্মভীরু সত্যপ্রিয় পণ্ডিতসমাজে উহা হতাদৃত হইয়া থাকে, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

পাঠক এক্ষণে বিচার করিয়া দেখুন, ব্রহ্মার মুখাদি অঙ্গ হইতে জাতিসৃষ্টি শ্রুতিসিদ্ধ বলা কতদূর সঙ্গত ও সত্য। ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্তের উক্ত অংশের সায়ন কৃত উপরিউক্ত ব্যাখ্যাকে সঙ্গত স্বীকার করিতে হইলে, উক্ত ঋগ্বেদীয় বচনের সহিত অন্যান্য শ্রুতি যথা পশ্চাদুদ্ধৃত বৃহদারণ্যক ও শত পথ ব্রাহ্মণ বচনকে ভ্রমাত্মক বলিতে হয়; এবং এতদ্দ্বারা শ্রুতির সহিত শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ বচনের বিরোধ হয়। সেই হেতুও আমরা পূজনীয় সায়নের উক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে অক্ষম। পাঠকের বোধ সৌকর্য্যার্থে আমরা আগামী সংখ্যায় সমগ্র ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্তটী উদ্ধার করিয়া তাহার ভাবার্থ দিব। ক্রমশঃ

বৃদ্ধের খেয়াল।

[শ্রীআত্মারাম শর্ম্মা।]

এই মাঘ-মেসে দারুণ শীতে সকাল-বিকেল ঘর থেকে বের হ'তে কষ্ট হয়, কাজেই ঘরে ব'সে ব'সে গুরুকের শ্রাদ্ধ করা বই আর অন্য গতি নাই! কিন্তু গুরুকের এম্‌নি একটা শক্তি আছে যে, ধুঁয়াটী যেই মাথায় ঢোকা, আর অম্‌নি দুনিয়ার যত খেয়াল সেখানে ডেকে আনা! কাছাকাছি কেউ থাক্‌লে তখনি সেখানে সব খেয়ালের চচ্চড়ি হয়; আর তা না থাক্‌লেই সেগুলি পেটভর্ত্তী থাকে, আর হজম হয় না, যেন তেন প্রকারে বের হ'য়ে পড়তে চায়! আমারও তাই হ'য়ে পড়েছে। অনেকগুলি খেয়াল জমা হ'য়ে পেট কাঁপিয়ে তুলেছে, অল্পে অল্পে বের ক'রে ফেলা বড়ই দরকার হ'য়ে পড়েছে। আমার এই খেয়াল-চচ্চড়ি অনেকের মুখরোচক না হবারই কথা।

মারফতে সমাজ থেকে বর-পণটা তু'লে দেবার চেষ্টা পাচ্ছেন; বলি কিছু ক'রে উঠ্‌তে পাচ্ছেন কি? "ভবি যে ভুলবার নয়।" মুখে মুখে তোমাদের কথায় সায় দেবার ঢের লোক যুটবে, কিন্তু হাতে-কলমে কাজ দেখাবার বেলা সব মিয়া তফাৎ! নাম ক'রে এ বুড় বয়সে আর শত্রু বাড়াব না,—এই সে দিন একজনের সঙ্গে এই বর-পণ নিয়েই কথা হচ্ছিল। সে মহাপুরুষকে নেহাৎ যুবাও বল্‌তে পারি না, বুড়ও বল্‌তে পারি না। কিন্তু চোক্ দুটী টিপে টিপে বল্‌তে লাগ্‌লেন,—"কেন মশায় বরপণটা তোলা হবে কেন? যুগধর্ম্মে এটা সমাজে এসে ঢুকে পড়েছে। সমাজে কখনও যা ছিল না, তেমনতর ত ঢের জিনিশই ঢুকেছে, কই আর কোনটার বেলা ত এমনতর

উকীল হওয়াটা ত আগে ছিল না, এখন সেটা হয়েছে;—ঘরে ঘরে ইংরেজীনবীশ গড়্ গড়্ কর্‌চে, —ইংরেজী প'ড়ে কেরেস্তান হচ্চে, আরো কত কি হচ্চে ;—কই ইংরেজী লেখাপড়া বন্ধ কর্‌বার জন্যে চেষ্টা হচ্চে না ত ? হিন্দুর ঘরে পোলাও, কালিয়া, কোপ্তা, চপ্, কাট্‌লেট উদরস্থ কর্‌বার ব্যবস্থা ত এত দিন ছিল না ! মাছে-ঘিয়ে মিশিয়ে খেলে গোমাংস ভক্ষণ করা হয় ব'লে বামুন পণ্ডিতের রায় ছিল ; এখন যে পূজা-পার্ব্বণে, বিয়ের নেমন্তন্নে এসব খানার ব্যবস্থা না হ'লে ত আর ইজ্জত বজায় থাকে না ! কই, এসবগুলি তু'লে দেবার কথাটা ত কারু মুখ থেকে বেরোয় না ? এরকম আরো কত শত নূতন নূতন রকমোয়ারী কেতা এসে সমাজে ঢুকে যে সমাজটাকে বহুরূপী ক'রে তুলেছে,সেগুলি শোধ্‌রাবার কথা ত কারু মুখে শোনা যাচ্ছে না ? এসকলের কোনটাতেই দোষ নাই, দোষ কেবল বরপণটার বেলা, নয় ?"

তাঁর বল্‌বার ভঙ্গী,—তাঁর সেই হাতনাড়া মুখ-নাড়া দেখে আমি ত হতভম্ব হ'য়েই রইলুম ! যদি কোন কথা না ব'লে একবারে চুপ্ ক'রে যাই, তাহ'লে লোকটা মনে কর্‌বে,—আমি হেরে গেলুম —হয় ত আমার মাথাটা মুড়িয়ে দিয়ে গাঁ থেকে বের ক'রে দিতে চাইবে। তাই বল্লুম—"ভায়া হে কাল-ধর্ম্মের প্রভাবে যেগুলি এসে সমাজে ঢুকে পড়েছে ব'লে তুমি দেখাচ্ছ, সেগুলি সবই সত্যি ; কিন্তু কথাটা কি জান,—যাদের পয়সা আছে, কালিয়া, পোলাও, কোপ্তা টোর্ম্মার জন্য তাদেরি পেটকামড়ানি [illegible] দিনান্তে দু'বেলা ভাত যোট্‌বার ব্য[illegible] তাদের রসনা আর সে সাধ মিটা[illegible] কই ? কড়ায়ের ডাল, আর পুঁই শাক চচ্চড়ি যাদের যোটেনা, তারা কি আর—ঐ যা সব বল্লে,—হজম কত্তে পারে ? কালে ভদ্রে যদি কখনো কারু বাড়ীতে ব্যাপার-স্যাপারে নেমন্তন্নে গিয়ে এক দিন তা উদরস্থ করে, তিন দিন তার ঢের ! আপীশ কামাই ক'রে মাইনা কাটা ত যায়-ই, তার ওপর আপীশ-মাষ্টারের দাঁতখিচুনীটা ফাউ ! ঘরে থেকে পায়খানায় আনাগোনাটাও নেহাৎ ছোটখাট সাজা নয় ! এরা কি আর পার্য্যমানে তোমার পোলাও, কালিয়া, কোপ্তার কাছ দিয়ে ঘেস্‌তে চায় ? বরপণের কম্‌নীতে ত এরাই মরে।"

লোকটা আমার কথা শুনে যেন তেলে বেগুণে জলে উঠ্‌লে ! বল্লে কি—"এসকল কেরাণীবাবুর বংশধরেরাই ত 'পোঁটাচুন্নীর' পুত চন্দনবিলাস' হ'য়ে বরের বাজারটাকে মাগ্‌গি ক'রে তুলেচে ! যাদের খুদ খে'তে নুন যোটেনা, মা-বোন্ যাদের শতগ্রন্থি ন্যাকড়া প'রে দিন কাটায়, তাদের ছেলে-রাই মাথার পেছন্‌দিকটার চুল খাটো ক'রে—সাম্‌নের দিকটা বড় রেখে টেরি বাগিয়ে, ডবল-ব্রেষ্ট সার্টে বপুখানি ঢেকে বুক ফুলিয়ে বেড়ায় ! দাদাঠাকুর ! সাধ ক'রে কি আর অতগুলি কথা বল্লুম্ ? আশু মুখুয্যে এণ্টেস্ পাসটা খুব সোজা ক'রে দিয়ে 'মাতৃকলিসন' গ'ড়ে দিয়েছেন। এখন এইসব ছেলেগুলো সেটা পাস্ দিয়ে—শুধু মাতৃ নয়—মাতৃ-পিতৃ উভয় কলিসনে আর দৃক্‌পাত করে না ! বুককোলান সার্ট, বুকখোলা কোট, লেসবাঁধা জুতা না হ'লে মায়-পোয় বাপ-বেটায় বেজায় কলিসন বেঁধে যায় ! দাদাঠাকুরের কাছে কি সেখবরটা পৌঁছায় নাই ? ত্রিশ টাকার তন্‌খাওয়ালা বাবা এসব হেপা মেটায় কোত্থেকে ? কাজেই ছেলের বিয়ে দিতে বেজায় টান না ধ'রে আর থাক্‌তে পারে না !"

এমন তর বাজে অজুহাৎ কিন্তু ঢের শুনে আস্‌চি, তার উতোর কাটাকাটি কত্তে গেলে ত আর মামুলী ইজ্জৎটুকু বজায় রেখে মর্‌তে পার্‌ব না, তাই অনেক সময় চুপ ক'রে থাক্‌তে হয় ! নইলে ছেলেরা যে এখন বিয়ের পণ নিয়ে আত্ম-বিক্রয় কত্তে চায় না, এহেন কথাও ত ঢের শোনা

যে ঐশ্বর্য্যের ফোয়ারা দেখা'বার জন্য যৌতুকের চৌদ্দপুরুষান্ত করেন তাও ত দেখ্‌তে পাই। নাম না করে কোন কথা বল্লেও যখন মুস্কিল দাঁড়ায়, তাই আসন্নকালে আর কারো নাম ক'রে মুস্কিলটা ডেকে আন্‌ব না। সে দিন এ বুড় বয়সেও এই মাঘ-মেসে দারুণ শীতে দু'খানা লুচীর লোভ সাম্‌লাতে না পেরে এক জায়গায় নেমন্তন্নে গেলুম। দুয়োর গোড়ায় গিয়ে দেখি—লোকে লোকারণ্য—যেন বেলুড় মাঠে রামকৃষ্ণোৎসব! অনেক কষ্টে ত ঘরের ভেতর ঢুক্‌লুম; কিন্তু বস্‌বার আর জায়গা পাই না! মিনিট পাঁচেক পরে দেখি দাঁড়িয়ে থাক্‌তেও পাচ্ছি না,—এদিক দিয়ে একজনের ঠেলায় ওদিকে যাই, আবার ওদিক থেকে আর একজনের ঠেলায় এদিকে এসে পড়ি! ঠেলা-ধাক্কা খেয়ে খেয়ে পাশের আর একটী ঘরে ঢুকে পড়্‌লুম। ঘরে দেখি,—একটা প্রকাণ্ড টানাওয়ালা টেবিল, তার ওপর একজোড়া রূপার দোয়াত একটী রূপার দোয়াতদানীর উপর বসান; তাতে দুটী রূপার কলমও আছে। সাম্‌নে একটা রূপার ব্লটীংপ্যাড্‌; রূপার একখানা রেকাবের ওপর একটী পানের ডিবে, তাও রূপার তৈরি! একটী ফাইলও আছে। ব্লটীংপ্যাড্‌ আবার একটী নহে—হাতে কালী ব্লট্‌ কর্‌বার জন্যে আবার আর একটী হাতপ্যাড্‌ও রয়েছে। সেটীও রূপার! শোনা গেল, বরটী নাকি হাকিম। তাই বুঝি ক'নের বাবা আপীসের সাজসজ্জা রূপার গ'ড়ে দিয়েছেন? বলি, হাকিম জামাইকে কোর্টে যাবার জন্যে একখানা রূপার গাড়ী, একটী রূপার ঘোড়া—রূপার সইস্‌-কোচান,—কয়েদী আটক রাখবার জন্যে রূপার একটী জেলখানা ক'রে দিলেই ত ষোলকলা পূর্ণ হ'ত। আমার ত মনে হয়, এসকল বাজে জিনিশ খয়রাৎ না কল্লেও হাকিম-বরটীর মেজাজ বিগড়াইত না। তবে ক'নের বাবার উদারতা অথবা ঐশ্বর্য্যের পরিচয়টা দেওয়া হ'তো

বেড়ায়,—"পয়সাওয়ালা মহাপ্রভুরাই বরের মাথা খেলে।"

আচ্ছা থাক্ সে কথাটা। বল দেখি, এখন ত বিদেশে আর চা'ল চালান হচ্চে না, রেঙ্গুন-সিঙ্গাপুর থেকে জাহাজভর্ত্তী চা'ল এদেশে আমদানী হচ্চে, তবু চা'লের দর সেই ছ'টাকা কেন? বাজারে শাকওয়ালীরা সেই চাট্টি ক'রে নটে শাকের ভাগা দিয়ে বসে; এত কম কেন, জিজ্ঞেস কল্লে বলে,—"বাবা আম্‌রা কি কর্‌ব, দেখ্‌চ না নড়াই যে!" কলেজষ্ট্রীটটা, এতদিন কেতাবের দোকানে ভর্ত্তী ছিল, এখন কালেজের ছেলেরা কালেজী বিদ্যা শিখে জুতার দোকান খুলে বসেছে। রাস্তাটাকে এখন সু-ষ্ট্রীট বল্‌তে হয়! দোকানের ভেতর বড় বড় আখরে সাইনবোর্ড লেখা আছে 'ধারে বিক্রয় নাই একদর'। ভেতরে ঢুকে দর জিজ্ঞেস কল্লে শুন্‌বে,—ছোটবড় নির্ব্বিশেষে জোড়া সাড়ে ছয় টাকা মাত্র।' দর শুনে যদি তুমি চম্‌কে গেছ, এমন ভাবটা বুঝ্‌তে পায়, জুতাওয়ালা ভদ্রলোক মশায় অম্‌নি ব'লে বস্‌বেন—'ছয়'টাকার কমে কি আর ভদ্র লোকের জুতা হয়?' নড়াইয়ে চামড়ার দর বেড়ে গেছে। জুতায় দেখ্‌চি অনরেবল্ ডাক্তারকেও বাজারে নাবিয়েছে!

তার পর কাপড়টার দিকে একবার চেয়ে দেখ না কেন? কাপড় জোড়াকরা একটা টাকা বেড়ে গেছে! এই চাদ্দিকে যতটা বাড়াবাড়ি দেখ্‌চ, সবই এক লড়াইর দোহাই দিয়ে! ফলে সত্যি কথাটা খুলে বল্‌তে গেলে অনেকেই চট্‌বেন। ঐ যে ওপরে যৌতুকের কথাটা বলা হ'য়েচে, তাতেও যে কেউ না চট্‌বেন, এমন নয়। কিন্তু চটাচটীর ভয় যদি রাখ্‌তে হয়, তা'হলে, আমার আর কথা বলা চলে না! তা ছাড়া একবারে কিছু না ব'লে যদি চুপ করে যাই, তখন যে এই সকল খেয়াল পেটের ভেতর জমা হ'য়ে পেট ফাঁপিয়ে তুল্‌বে! তখন উপায়? তাই বল্‌চি,

মাগ্‌গির দশশালা বন্দোবস্ত হয়ে থাক্‌চে তোমাদের বাঙ্গালী আর মাড়োয়ারী মহাপ্রভুদের অর্থ পিপাসায়। সেই বেলেঘাটা থেকে সুরু করে হাটখোলা পর্য্যন্ত যত চা'লের গোলদার আড়তদারের দোকানে যাও, দেখ্‌তে পাবে গোলাভর্ত্তী চা'ল মজুত! আড়ং থেকে এরা বেশ সস্তাদরে কিনে গোলাভর্ত্তী ক'রে রেখেচে, কিন্তু তুমি কিন্‌তে যাও, হেঁকে বস্‌বে—সেই মন্বন্তরে দর ৬৲ টাকা ৭৲ টাকা! দেশশুদ্ধ লোক খেতে পাক্‌ আর না পাক্‌ বাজার নাব্‌তে দেবেনা, লাভের মাত্রাটা খাটো হয়ে যাবে যে! একথাটা যে মিথ্যে নয়, গোলদার আড়তদারের দোকান ছেড়ে একটা ছোট-খাট দোকানদারের কাছে গেলেই বুঝ্‌তে পার্‌বে।

এ দেশে মাড়োয়ারীরা হচ্চে কাপড়ের বিধাতা-পুরুষ। বিলাতী কাপড়ের আমদানী এরাই ক'রে থাকে। এরা বিলাতী হৌসওয়ালাদের মারফতে বিলেত থেকে কাপড় আমদানী করে। দেশী মিলে ভাল কাপড় তৈরি হওয়া অবধি কাপড়ের বাজারটা বেশ একটু নরম হ'য়ে পড়ে। ইহাতে মাড়োয়ারী ভায়ারা একটু কাবু হ'য়ে পড়ে বিলিতি কাপড়ের কাট্‌তি কমে যায়, আর মাড়োয়ারিদের ঘরে বিলিতি মাল মজুত হ'তে থাকে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে এদের ঘরে এত মাল জ'মে যায় যে, গত বিজয়ার দিন অনেকে কাপড় আমদানীর চুক্তি করেন না। সুতরাং আমদানী বন্ধ হইয়া যায়। কাজেই এখন বাজারে মালের বেজায় টান পড়েছে, আর মাড়োয়ারী ভায়ারা জোড়া করা এক টাকা দর চড়িয়ে সেই কসুরটা এখন সুদে আসলে আদায় করে নিচ্ছে! কথাটা মনে ঠিক লাগ্‌চে কি ভায়া?

দেশের লোকের মতলব যখন এরূপ দাঁড়িয়েছে,—'ভায়া আপনার প্রাণ বাঁচা, কথাটা যখন তোমরা শক্ত করে ধ'রে ব'সে রয়েচ,—পাশাপাশি বাড়ীর গেরস্তকে উপোস্‌ কত্তে দেখে যখন তোমরা পোলাও কালিয়া হজম কত্তে পার্‌চ,—কন্যাদায়ে সহোদরের ভিটে-মাটী বিকিয়ে যাচ্ছে, আর পাঁচ দফা কেল্লার ব্যাণ্ড বাজিয়ে শোভা যাত্রা ক'রে ছেলের বিয়ে দিতে যেয়ে, যখন তোমাদের প্রাণে আমোদের ফোয়ারা ছোটে, তখন তোমাদের বাহাদুরা দেব নাত কি কর্‌ব বল? তা ছাড়া তোমরা যখন লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে এতটা নিষ্ঠুর হ'তে পেরেচ, স্বার্থপরতা যখন তোমাদের পরদায় পরদায় ঢুকে পড়েছে, আমি তাঁবা-তুলসী-গঙ্গাজল ছুঁয়ে বল্‌তে পারি, তোমরা মনুষ্যত্ব গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়ে বসেছ! তোমরা সদরে এক রকম কথা বল, শোবার ঘরে ঢুক্‌লে আর সেকথা মনে থাকে না। তোমরা এখন শয্যাগুরুর শিষ্য, স্বার্থের দাস; স্ত্রী-পুত্র কন্যা ছাড়া মা-বাপ্‌, ভাই-বোনের কষ্ট দেখেও যখন তোমাদের প্রাণে কষ্টবোধ হয় না, তখন আর তোমাদের থেকে আহাম্মুখী বই অপরে আর কোন আশা কত্তে পারে না।

পার্থক্য।

[শ্রীহেমচন্দ্র সেন গুপ্ত।]

১

আমি— অল্প লইয়া রহিব সন্তোষ
নাহিক অধিক আশা;
কি করিব আমি চাহিয়া বহু
সম্বল সুধই ভাষা।

তুমি— সাগর প্রমাণ সঞ্চিয়া অর্থ
গ'ড়েছ ধবল গৃহ,
পূর্ণ গৃহ তব পূর্ণ পরিজন
আপন গরবে রহ।

২

আমি— দু'টী প্রাণী নিয়ে রচিয়া সংসার
রহিব সান্ত্বনা লয়ে ;
অতি ক্ষুদ্র জেনে সংসার পাথারে
থাকিব সকলি স'য়ে।

তুমি— বিজয়-ডঙ্কা বাজায়ে ভুবনে
ঘোষিছ আপন যশ ;
অগাধ অর্থ রেখেছ ভাণ্ডারে
জগৎ করিতে বশ।

৩

আমি— বিশ্বকর্ত্তা যিনি আঁধারের মণি
সুধুই তাঁহারে জানি ;
নিশি দিন তাঁর ধরিয়া চরণ
শুনিব আশার বাণী।

তুমি— দলিত করিয়া ক্রুদ্ধ ফণিনী
চাহিছ গর্ব্বিত হ'তে ;
মানুষ গড়িছে দেবতা ভাঙ্গিছে
করনা বিশ্বাস তাতে।

৪

আমি— বসিয়ে নীরবে পর্ণকুটীরে
জপিব সন্ধ্যায় মালা ;
তাহারি আশায় তুলিব ফুল
ভরিয়ে হৃদয়-ডালা।

তুমি— বিজয়-গৌরবে সৌধ-চূড়ায়
উড়াবে সৌধ-পতাকা ;
বাজাবে দুন্দুভি মাতিয়া উল্লাসে,
গা'বে বৈভব গীতিকা।

টীকা-টিপ্পনী।

স্থানাভাব বশতঃ এবার 'রাঙ্গাবউ' গল্পের অবশিষ্টাংশ প্রকাশিত হইল না, আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

বিদ্বৎসভার অনুষ্ঠিত 'সারস্বত পাঠশালা নামক উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়ের বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

কলিকাতা সহরের কেন্দ্রস্থলে একটী লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্কুল 'বিদ্বৎসভা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এই স্কুলের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া বিদ্বৎসভার প্রস্তাবিত প্রণালী অনুসারে ইহার কার্য্য পরিচালিত হইবে, এবং এই বিদ্যালয় হইতে যাহাতে ১৮১৯ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়া যাইতে পারে তাহারি ব্যবস্থা করা হইবে। কোন্ স্কুলটী গ্রহণ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, "ঘরের ঢেকী কুমীরের" ভয়ে আমরা আপাততঃ তাহা প্রকাশ করিতে বিরত রহিলাম। 'ভাঙ্গেন ত মচ্ কান্ না,' বৈদ্যসমাজে এরূপ লোক ঢের আছে। আর আছে—নিজের মনের মত কথা অথবা কার্য্যটী না হইলে, ফোঁস করিয়া কেউটের মত ফণা-ধরা জীব! ইহাদের বিষ না থাকিলেও 'কুল-পানা চক্করের' অভাব নাই। বিদ্বৎসভার হিতাকাঙ্ক্ষী সভ্য এবং ধন্বন্তরির পাঠকবৃন্দের অবিলম্বেই ইহাদের পরিচয় পাইবার সুবিধা ঘটিবে।

লোকের সহিত ব্যবহার না করিলে প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় না। নাম ও পদমর্য্যাদার দোহাই দিয়া সমাজে একটা হাক-ডাক জন্মাইবার আকাঙ্ক্ষা অনেকেরই থাকে; কিন্তু সংস্পর্শে যাইলে,

চয় পাওয়া যায়। ১৯১৫ সালের জুন মাসে বিদ্বৎ-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহার বিস্তৃত কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হয় নাই। চৈত্র-সংখ্যা ধন্বন্তরির সঙ্গে তাহা বৈদ্যসাধারণ (সভ্য-অ-সভ্য নির্ব্বিশেষে) প্রাপ্ত হইবেন। তাহা হইতে সমগ্র বঙ্গের বৈদ্যসন্তানগণ স্বজাতীয় "মাকাল ফল" গুলি চিনিয়া লইতে পারিবেন।

আমরা সম্প্রতি শ্রীযুক্ত কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম্, এ, এম্, বি মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত 'অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়' পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম। দেখিয়া নিতান্ত প্রীতি হইয়াছি। অধুনা যে প্রণালীতে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইয়া থাকে, তাহাকে অঙ্গহীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হিন্দুর চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অস্ত্র-চিকিৎসা অর্থাৎ শল্যতন্ত্রাদি কখনও অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা, আধুনিক আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকগণের চিকিৎসা-প্রণালী হইতে তাহার নিরাকরণ করা দুরূহ। কোন্ সময় হইতে 'অষ্টাঙ্গ' নামটী লুপ্ত হইবার পথে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার নির্দ্দেশ করা অসম্ভব।

কবিরাজ যামিনীভূষণের প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার অঙ্গহীনতা বিদূরিত করিবার সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রোক্ত ভেষজাদির সহিত শিক্ষার্থী-গণকে বিশেষরূপে পরিচিত করিবার উদ্দেশ্যে যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহপূর্ব্বক এরূপভাবে রক্ষিত হইয়াছে যে, একজন শিক্ষার্থী দুই তিন ঘণ্টা চেষ্টা করিলে প্রায় যাবতীয় উপকরণ চিনিয়া লইতে পারিবে। এতদ্ভিন্ন অস্ত্রচিকিৎসা,শারীরবিদ্যা প্রভৃতি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যাবতীয় বিষয় শিক্ষাদানের যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের অধ্যাপনা [illegible] তাহা অভূতপূর্ব্ব। কারণ যেসকল মনীষী প্রণালীকে জীবিত রাখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই এরূপ প্রয়াস পাইয়াছেন বলিয়া শ্রুতিগোচর হয় না। বিদ্বৎসভার প্রস্তাবিত আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের শিক্ষাবিধানের কল্পিত ব্যবস্থা ঠিক এইরূপ।

আমরা আশা করি, সমগ্র বৈদ্যসমাজ,—অর্থাৎ যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি বিধান পূর্ব্বক ইহার অতীত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে আন্তরিক যত্নবান, তাঁহারা সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া যাইয়া কবিরাজ যামিনীভূষণের এই শুভানুষ্ঠানে যোগদান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। 'বিদ্বৎসভা' এই অনুষ্ঠানকে সমগ্র বৈদ্যসমাজের অনুষ্ঠিত কার্য্য বলিয়া মনে করিয়া ইহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনে অকুণ্ঠিত। দেশে যে কোন বিষয়েরই বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হউক না কেন, সে অভাব মোচন করিতে হইলে জনসাধারণের সহানুভূতি একান্ত প্রয়োজন। সাম্প্রাদায়িকতা বিস্মৃত হইয়া একতা অবলম্বন ব্যতীত কোন কার্য্যেই সাফল্য-লাভ হয় না। কার্য্যের অনুষ্ঠান একজনেই করিয়া থাকেন, সিদ্ধি-লাভে জন-সমষ্টির প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। দেশের সমগ্র বৈদ্যসন্তান—বিশেষতঃ চিকিৎসা ব্যবসায়ীগণ —কবিরাজ যামিনীভূষণের এই অনুষ্ঠানে অকপট-ভাবে যোগদান করিবেন, আমরা এরূপ আশা করিতে পারি। যোগদান না করিলে লজ্জার কথা।

অনুষ্ঠাতা কবিরাজ যামিনীভূষণের সহিত আলাপ করিয়া যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা হইতে এপর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, এই বিদ্যালয় তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি হউক, এরূপ কল্পনা তিনি হৃদয়ে পোষণ করেন না। তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যে জনসাধারণের সাহচার্য্যে সিদ্ধিলাভ হইলে যদি তাহা হইতে তাঁহার ব্যক্তিগত লাভের যেটুকু অধিকার থাকে, তদ্ব্যতীত তিনি অপর কিছুর প্রত্যাশী নহেন। প্রায় পঁচিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইতে

ডাক্তারের সহযোগে বেলগাছিয়ায় একটী মেডিকেল স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। জনসাধারণের সহানুভূতির প্রভাবে, আজ গভর্ণমেণ্টও তৎপ্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনে অগ্রসর হইয়াছেন। এখন উহা গভর্ণমেণ্টের অনুমোদিত মেডিকেল কলেজে পরিণত হইয়াছে। জনসাধারণের সহানুভূতি পাইলে, কবিরাজ যামিনীভূষণের এই বিদ্যালয়ও যে অচিরে আদর্শরূপে পরিণত হইয়া বৈদ্যজাতির মুখোজ্জ্বল করিতে পারিবে, এরূপ আশা দুরাশা নহে। আমরা আশা করি, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন এম্, এ, এল, এম্, এস; কবিরাজ শিরোমণি শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি; লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ বিজ্ঞ এবং বহুদর্শী কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন কবিরত্ন; কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন বৈদ্যরত্ন বিদ্যাভূষণ এম, এ প্রমুখ চিকিৎসকবর্গ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অবহেলা করিবেন না।

সম্প্রতি দ্বারভাঙ্গার মাননীয় মহারাজের অধিনায়কত্বে শোভাবাজারে স্বর্গীয় স্যার রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে 'বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-সভার' এক বিরাট অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় হিন্দু, অ-হিন্দু, নিম্-হিন্দু এবং মজাদেখা হিন্দু প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ শ্রেণীর হিন্দুই সমবেত হইয়াছিলেন। কোন শ্রেণীর হিন্দুই বক্তৃতায় কৃপণতা করেন নাই। সভাপতি দ্বারভাঙ্গাধিপ যেভাবে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষার কল্পনা দ্বারা স্বীয় অভিভাষণের সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়াছেন, যুগধর্ম্মানুসারে তাহা কিয়ৎপরিমাণে সমীচীন বোধ হইলেও, বর্ত্তমান যুগে এমন ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু এখনও বর্ত্তমান আছেন, যাঁহারা, সেই কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে হিন্দুর ধর্ম্মরক্ষার ঘোরতর পরিপন্থী বলিয়া মনে করিবেন। সেদিনকার সভায় স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে যেন এরূপভাবেরই কতকটা আভাষ পাওয়া গিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন আর যাঁহারা বক্তৃতা করিয়া স্ব স্ব মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'বর্ণাশ্রমের' 'বর্ণ' জ্ঞান অনেকেরই নাই। "ধর্ম্ম"টা এখন অনেকের নিকটেই 'সকের জলপান সাড়ে বত্রিশ ভাজা'য় পরিণত হইয়াছে। আধুনিক প্রণালীতে যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহারা খেয়ালে পড়িয়া এই 'সকের জলপান সাড়ে আঠার ভাজা' মুখে তুলেন মাত্র, উদরস্থ করেন না।

কিন্তু ইহাঁরা উদরস্থ করুন আর না-ই করুন, মুখে তুলিলেও কতকটা আশা থাকে,—যদি ভুলক্রমেও একটু উদরস্থ হয়, তাহা যে একবারে নিষ্ক্রিয় প্রতিপন্ন হয়, আজকাল দুইএকটী দৃষ্টান্ত দেখিয়া, তাহা অনুমান হয় না। বিলাত-প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার-প্রবর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ গুপ্ত, এবং নেসন সম্পাদক স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (এন্, এন্, ঘোষ) প্রমুখ জনকতক ব্যক্তির নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তা ছাড়া 'নায়ক' পত্রের কথা যদি কাহারও বিশ্বাস করিতে আপত্তি না থাকে, তবে শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রনাথ বসুও এরূপ ব্যবহারের জন্য একটু বেশী বাহাদুরীর অধিকারী। কেন না, তিনি বাড়ীতে শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছেন। আমরা বলি, "শুভস্য শীঘ্রং"—যত সত্বরে কার্য্যটী হইয়া যায়, ততই মঙ্গল। কারণ, ভুপেন বাবু অতি অল্প সময় হইল বিলাত হইতে প্রত্যাগম করিয়াছেন; বিলাতের গন্ধটা এখনও দূর হয় নাই। চতুর্দ্দিকে নানা রকমের প্রলোভন এহেন মান্যবর ব্যক্তিবর্গকে নিয়ত প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতেছে। মত্‌লব ফস্‌কিয়া যাইতে কতক্ষণ?

"বর্ণাশ্রমধর্ম্মসভার" অধিনায়ক দ্বারভাঙ্গার মহারাজ বিশিষ্ট শ্রেণীর মৈথিলী ব্রাহ্মণ। তিনি একজন বিশিষ্ট হিন্দু বলিয়া পরিচিত থাকিলেও, তাঁহার গোঁড়ামির পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি

এতই উদার যে, আহারে-বিহারে উপনংকারকেও অবজ্ঞা করিতে কুণ্ঠিত। আহারেও এতই উদার যে, সম্মুখে যাহা প্রাপ্ত হন, অথবা শ্রদ্ধা করিয়া তাঁহাকে আহারার্থ যাহা কিছু সম্মুখে দেওয়া যায়, তদ্দ্বারা অম্লানবদনে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন; অখাদ্য বলিয়া কোন বস্তুর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম নহে। কাজেই তিনি অভিভাষণে তদনুরূপ উদারভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই উদারভাব সর্ব্বসাধারণে গ্রহণ করিতে পারে, অনেকের তদ্রূপ সাহস নাই। সুতরাং আশঙ্কা হইতেছে, মহারাজের এই অনুষ্ঠানের ফলে, দেশে ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় অপর একটা 'উদ্ভট' সমাজ সৃষ্টি না হইয়া পড়ে!

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

রবিয়ানা। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত, মূল্য বার আনা। গ্রন্থকার নিরপেক্ষ সমালোচক বলিয়া সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত। সমালোচ্য গ্রন্থে তিনি তাঁহার নিরপেক্ষতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। 'রবিয়ানা' রবীন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনের অকপট বিশ্লেষণ,—কবি-যশঃপ্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথের একখানি নিখুঁৎ ফটো,—গ্রন্থের নাম 'রবিয়ানা' না হইয়া 'রবিচ্ছবি' হইলে মানাইত ভাল। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের অকপট ছবি প্রত্যক্ষ করিতে অভিলাষী, 'রবিয়ানা' তাঁহাদের সে আকাঙ্ক্ষা সম্যক্‌রূপে পূর্ণ করিবে। অন্ধরবি-ভক্ত দলেরও ইহা পাঠে চক্ষু ফুটিবে।

স্বাস্থ্যনীতি। প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা। ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্, বি, সম্পাদিত, মূল্য যথাক্রমে ৵০ আনা ও ৵০ আনা। ডাক্তার বসু সম্পাদিত 'স্বাস্থ্য-সমাচার' নামক মাসিকপত্রে স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে যেসকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া এই পুস্তিকাদ্বয় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম সংখ্যায় ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যনীতি, অর্থাৎ প্রাতঃক্রিয়া, স্নান, আহার, জলপান, পরিধান, পরিশ্রম ও ব্যায়াম, বিশ্রাম ও নিদ্রা, সংযম প্রভৃতি মানবের অবশ্য-জল, খাদ্য এবং রোগাদি সম্বন্ধে গৃহস্থের অবশ্য-প্রতিপাল্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। উভয় গ্রন্থই মানবের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ উপাদেয়। গ্রন্থদ্বয়ের ভাষা সরল, প্রাঞ্জল এবং সহজবোধ্য। গ্রন্থদ্বয় নিম্ন ও উচ্চপ্রাথমিক পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলে স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে কোমলমতি বালকবালিকাদিগের জ্ঞানলাভে বিশেষ সহায়তা করিবে।

আয়ুর্ব্বেদ। মাসিকপত্র, 'অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়' হইতে প্রকাশিত, বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩৷৵০ আনা। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-প্রণালী সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা করাই এই পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য। আমরা প্রথম বর্ষের চারি সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। ইহা 'অষ্টাঙ্গআয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের' মুখপত্র। আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার্থীমাত্রেরই ইহা গ্রহণ করা উচিত।

স্বাস্থ্য-সমাচার। মাসিকপত্র, প্রথিত-নামা ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্, বি, সম্পাদিত। পত্রিকাখানি ৩য় বর্ষ উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে ইহার কলেবর

সমাদর হওয়া উচিত। মূল্য নিতান্ত সুলভ—বার্ষিক এক টাকা মাত্র।

আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকর। কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র সেন এল, এম্, এস, কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, -মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র। যাহাতে সর্ব্বসাধারণে রোগনির্ণয় এবং সহজে রোগ-চিকিৎসা করিতে পারে, এই উদ্দেশ্য-সাধনকল্পে কবিরাজ রাখালচন্দ্র আয়ুর্ব্বেদীয় যাবতীয় গ্রন্থের সারসংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় ঔষধ (বটিকা, আসব, অরিষ্ট, মোদক, চূর্ণ, তৈল, ঘৃত প্রভৃতির) প্রস্তুত প্রণালী, রোগের নিদান, ঔষধের বিবরণ এবং আবশ্যকমতে পাশ্চাত্যপ্রণালী অনুসারে চিকিৎসা প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সরল ও প্রাঞ্জলভাষায় বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থখানি গৃহী ও চিকিৎসা ব্যবসায়ী উভয়েরই বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে। মফঃস্বলের যেসকল স্থানে চিকিৎসক দুষ্প্রাপ্য, সেসকল স্থানের অধিবাসীবর্গ এই গ্রন্থের সাহায্যে অনেক উৎকট রোগের প্রতীকারে সমর্থ হইবেন। গৃহী মাত্রেরই এই গ্রন্থের এক একখানি গৃহপঞ্জিকার ন্যায় সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত।

একখানি মর্ম্মস্পর্শী চিঠি।

[শ্রীহেমচন্দ্র সেন গুপ্ত।]

শ্রদ্ধাস্পদেষু,—

সঙ্গে যে চিঠিখানা পাঠাইলাম, তাহা জাজ্জ্বল্যমান নৃশংসতার পরিচায়ক। বৈদ্যসমাজে এমন নীচ ও নিষ্ঠুরপ্রকৃতিসম্পন্ন আর কয়টী লোকের অস্তিত্ব আছে জানি না। সঙ্গীয় চিঠিখানা ভাল করিয়া পড়িবেন। পড়িয়া আমি অশ্রুসংবরণ করিতে পারি নাই, আপনিও পারিবেন কি না জানি না। লেখিকা আমার শ্যালকবধূ। আখ্যায়িকার নায়ক বি বাবু S. A. S. আড়ারিয়া নিবাসী * * * বাবুর সহোদরা আমার গৃহিণী। বি বাবু তাঁহার জ্ঞাতি-ভ্রাতা। সুতরাং লেখিকার মর্ম্মস্পর্শী লিপি পাঠ করিয়া আমি অশ্রুসংবরণ করিতে পারি নাই। কি বলিয়া বালিকাকে প্রবোধ দিব জানি না। চিঠিখানা পত্রস্থ করিবেন, আমার বিশেষ অনুরোধ।

মা!

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু।

সেনঠাকুর! গত কল্য আপনার স্নেহপূর্ণ শান্তি-মাখা পত্রখানা পাইয়া কত যে সুখী হইলাম তাহা সামান্য পত্রে আপনাকে জানান অসাধ্য। আশা করি, দুঃখিনীকে সর্ব্বদা এভাবে স্মরণ রাখিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। আপনার হৃদয় যে এত কোমল এবং স্নেহপূর্ণ তাহা পূর্ব্বে কখনও জানিবার সুবিধা পাই নাই। অনেকবার ইচ্ছা হইয়াছে, আপনার নিকট পত্র দেই, যে সময়ে আপনি নওগাঁ ছিলেন, তাঁহাকে প্রবোধ দিবার জন্য, কিন্তু তাঁহার ভয়েই দেই নাই। কেননা, কোথাও আসা-যাওয়া, এবং কাহার নিকটে পত্রাদি লিখা, ইত্যাদি মোটেই তিনি পছন্দ করিতেন না। তাই,

দেই নাই,—তিনি যেন আমারপ্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু সেনঠাকুর! বিধি আমার প্রতি বড়ই বিমুখ, তাই শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমার কোন আশাই সফল হইল না, সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। আমি আমার পিতার প্রথমা কন্যা,—বড়ই আহ্লাদের মেয়ে ছিলাম; মায়ের প্রায় ৩০ বৎসরে আমি হতভাগিনী গর্ভে জন্ম লইলাম, তাই আমাকে পিতা ছেলের ন্যায় শিক্ষা দিয়া আহ্লাদে আহ্লাদে বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। ঠিক সাড়ে তের বৎসরে আমার এ শুভবিবাহ সংঘটিত হয়। নগদ সারে চারি শত টাকা এবং ডিব্রুগড়ের পড়ার খরচ ইত্যাদি নিয়া প্রায় দেড় হাজার টাকা পণ দেওয়া হইয়াছে। আমার বিবাহের আদ্যঘটনা যদি শ্রবণ করেন, তবে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। লোকের মন এরূপ কঠোর হইতে পারে কি? যদি কখনও শ্রীচরণ সাক্ষাৎ হয়, তবে সকলকথা জানিতে পারিবেন। সংক্ষেপে এ দুঃখের কথা আর কত লিখিব! যেদিন বিবাহ হইল, তাহার পর দিনই বলেন,—আমি কুৎসিতা; আর আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন না। বলিলেন, হাতের আংটী ভাল হয় নাই, যদি আর একটী আংটী দেয় তবে আমি ভাল হব। তৎক্ষণাৎ দুটী আংটী দেওয়া হলো, তৎপর এখান হইতে ক্যাসবাক্স এবং নমস্কারী ১০০৲ শত টাকা পেয়েছিলেন এবং আশীর্ব্বাদীয় অনেক কাপড় ছিল, তখন তাঁহারা আগড়তলার নিকটে কমলপুর নামক একটী স্থানে ছিলেন। সেখানে আমাকে লইয়া গিয়াই আমার সব জিনিষপত্র নিয়া গেলেন; তাহাতেও আমি কিছু মাত্র দুঃখিতা ছিলাম না। বর্ত্তমানে তাঁহার হাতে যে আংটী ও ক্যাসবাক্স ব্যবহার করিতে দেখেন তাহাই সেই। তৎপর বিবাহের পর এক কথা উঠাইলেন যে, যতদিন ছাত্রজীবন থাকিবে, ততদিন আমাকে ভাল বাসিবেন না, অর্থাৎ আমার সঙ্গে দেখা করিবেন না। যদি বাবা তখন পড়ার করিবেন এটা কাহাকেও বলেন নাই; তাই মা এবং বাবা মনে করিলেন, এটা ত ভাল কথাই। পিতাঠাকুর রীতিমত পড়াখরচ, এবং যখন যত টাকার প্রয়োজন হইত সবই দিতে লাগিলেন। তাঁহার মা-বাপ ভাই-বোন সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করে; নিজেই নিজের কর্ত্তা। বাপ, অমতে বিবাহ করাইয়াছে, এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা,—তাঁহার এক বন্ধুর দ্বারা আমাকে দেখিয়া নিজে ইচ্ছা করিয়া এ বিবাহ করিয়াছিলেন; তৎপর, টাকা দ্বারা ডাক্তারি পাশ করিয়াই আবার বিবাহের উৎযোগ করিতে লাগিলেন। আমি এ সব দেখিয়া মনে ভাবিলাম যে, আর পিত্রালয় যাইব না, এখানে থাকিয়াই প্রাণপণে তাঁহাদের সেবা করিব। সামান্য একটা পশুপক্ষীও, অনেক দিন পালিলে তাহার জন্য মমতা হয়! যাহা মনে ভাবিলাম, কার্য্যেও তাহাই করিলাম। বিবাহের পর এই আমার প্রথম বাপের বাড়ী আসা। ৮ বৎসর সমানে তথায় থাকিয়া দাসীর ন্যায় সেবা করিতে লাগিলাম। আমার শাশুড়ী আমাকে খুব স্নেহ করিতেন, ঐ ভরসাতেই তথায় রহিলাম। যখন দেখিলেন, আমি তথায় থাকায় তাঁহার বিবাহের বড়ই অসুবিধা, তখন আমাকে নানারূপে ভয়ানক যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিলেন, আমি যন্ত্রণা পাইয়াও সে যন্ত্রণা অক্লেশে সহ্য করিতে লাগিলাম, কিন্তু ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত রাগ হইল। আমাকে বিশেষরূপে জব্দ করার জন্য সকলকে বাঁকীপুরে লইয়া গেলেন। তথাকার সে ভীষণ কথা মনে হইলে, এখনও ভয়ে আমার শরীর শিহরিয়া উঠে! তথায় নিয়া কেবল অনর্থক প্রহার করিতেন, দিবা রাত্রি, আমাকে একা ফেলিয়া রাখিতেন। সে অত্যাচারে আমার টাইফয়েড্ ফিভার হইয়াছিল। আমি মনে করিলাম, যদি আমার এ জীবন-লীলা সাঙ্গ হইয়া যায় তবে ভালই হয়। কিন্তু আমার অদৃষ্টের দুঃখ কে নিবে? যদি আরো কতকদিন

পিতাও ছেলের আদেশ পাইয়া নানারূপে আমাকে যন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। আমার জ্বর সম্পূর্ণরূপে না সারিতেই হাজারিবাগ বদ্‌লী হইলেন, ৬০৲ টাকা মাহিয়ানা হইতে ৩০৲ টাকায় তথায় গেলেন। সাহেবকে নাকি মন্দ বলিয়াছিলেন সেই অপরাধের শাস্তি। আমরা সকলে আবার কাশীতে আসিলাম। এ দুঃখপূর্ণ জীবন বহন করার জন্য আবার ভাল হইলাম। খুড়-শ্বশুর মহাশয়, অর্থাৎ উ, চ, সেন সর্ব্বদাই,—আমাকে যেন আমার শ্বশুর যন্ত্রণা না দেন, এই উপদেশ দিতে লাগিলেন। তৎপর আমি যখন দেখিলাম আপনার বি—বাবু আমাকে নিকটে রাখিয়া কোনও রূপে সুখ পান না,—আমি বাসায় থাকি বলিয়া বাসায় পর্য্যন্ত আসিতেন না, কাজেই তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য আমি শিলচর আসিলাম। এখন বোধ হয় ভগবান তাঁহাকে সুখী করিয়াছেন। আমি দুঃখ পাই তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তিনি যেন সতত সুখে থাকেন এই আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। ভগবান এতদ্দিনে তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। যেরূপ অপরূপ সুন্দরী চাহিয়াছিলেন,তাহা পান নাই, কোমরপুরের মোহিনীমোহন গুপ্তের মেয়েকে নাকি বিবাহ করিয়াছেন। মেয়েটী নাকি গ্রাম্য; লেখা পড়া জানে না, খুব গরিবের মেয়ে, দেখিতে নাকি রং কালো। সেনঠাকুর! আমার মনে এখন আর কোনও অনুতাপ নাই। কেননা, এত বৎসর তথায় থাকিয়া, কত হাতে ধরিয়া, পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া—কত নরম পত্র দিয়া,—সকল রকমেই দেখিয়াছি; এখন একেবারে ক্ষান্ত হইয়া চুপ করিয়াছি। এখন আর পত্র দেই না, কেননা, পাছে এ নববধূটী মনে কষ্ট পায়। আমার ইচ্ছা নয় যে ঐ বধূটী কষ্ট পায়। তবে আপনি তথায় একখানা পত্র লিখিয়া দেখিবেন, যে এ বিবাহ করিয়া তাঁহার মনে শান্তি হইয়াছে কিনা। এ কথাটী জানিতে আমার বড়ই বাসনা।

সরকারী চাকুরী হইতে যে বরখাস্ত হইয়াছেন বোধ হয় তাহা জানেন। বেনারস শাশুড়ী, শ্বশুর, দেবর ননদ, জা, সতীন সবই আছে, কিন্তু কেহই ভয়ে আমার নিকট পত্র দেয় না। ননদ দুটীকেও আমি নিজেই লেখাপড়া শিখাইয়াছি; তাহারা আমাকে খুব ভাল বাসে; কিন্তু ভাইকে অত্যন্ত ভয় করে। সবই আমার অদৃষ্ট দোষ! নতুবা মানুষের হৃদয় এরূপ কঠোর হইতে পারে কি? যতদিন তথায় ছিলাম, কেবল শাশুড়ীর একটু দয়া পাইয়া; নতুবা বোধ হয় থাকিতেই পারিতাম না। আজ এক বৎসর হইল এখানে আসিয়াছি। আপনি যে অযাচিতভাবে আমার নিকট পত্র দেন, ইহাতে আমি বড়ই সুখী আছি। জানিনা আপনি কোন স্বর্গীয় মানুষ, তাই আমার এ দারুণ হৃদয়ে সতত উপদেশ দানে শান্তি দিতেছেন। আপনার টিকিট পাইয়া অতিশয় সুখী হইলাম। ঐ সংসার হইতে এ পর্য্যন্ত সামান্য একখানা টিকিটও পাই নাই! যতদিন তথায় ছিলাম, পিতাঠাকুর মহাশয় আমার সমস্ত ব্যয় বহন করিয়াছেন, অর্থাৎ আমার সব জিনিষ তথায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। যখন ননদের বিবাহ হয়, তখন আমার বাপের বাড়ীর জিনিষ হইতে তাহাকে সোনার চিরুণী, শিল্কের সাড়ী ইত্যাদি দেওয়া হইল, কিন্তু কিছুতেই আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন না। একটী কথা,—নিজ মন হইতে ভালবাসা না জন্মিলে শত চেষ্টা করা বিফল। এটা নিজ জীবনে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। এখানে আমার পিতা পেস্কার ছিলেন, এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, পেন্সন পান। আমা দ্বারা তিনি মনে নিদারুণ আঘাত পাইয়াছেন। একটী ছোট ভাই আছে, সে এখানকার স্কুলে এন্‌ট্রেন্স পড়ে, সেজন্যই পিতা এখন এখানে আছেন। মাতাও আছেন, আর একটী ছোট ভগ্নী আছে, বোধ হয় চিনেন; সে গৌহাটী থাকে, ৺কৈশিকী গুপ্ত মহাশয়ের মেজ ছেলের সঙ্গে গত

বানের কৃপায় শ্রীমতী শান্তিতেই আছে। আপনি যদি বেনারস পত্র দেন তাই ঠিকানা দিলাম। ২৩ নং পাতালেশ্বর, বেনারস সিটী। অন্ত লিখিতে লিখিতে মনের আবেগে অনেক কথা লিখিয়া ফেলিলাম। নিজ গুণে আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া লইবেন। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন, হেম দিদিকে ও বিনীত প্রণাম দিবেন। খুকীদিগকে স্নেহাশীষ দিবেন,—আশা করি পুনরায় পত্রোত্তরে তাপিত প্রাণ শীতল করিবেন। অত্র মঙ্গল আগামীতে শ্রীচরণ মঙ্গল সহ সকলের মঙ্গল দানে সেবিকানন্দিত করিতে ভুলিবেন না। ইতি,—

সেবিকাধমা প্রণতা

স্নেহের স্থ—

পত্র প্রেরক 'বিদ্বৎসভার'একজন বিশিষ্ট সভ্য। তিনি আসামপ্রদেশে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, সুতরাং তাঁহার লিখিত বিষয়ে অবিশ্বাস করিবার হেতু নাই বলিয়াই লেখিকার চিঠিখানা অবিকল প্রকাশিত হইল। বর-পণের কঠোরতায় প্রপীড়িত হইয়া সমাজে আজ কাল, অনেকেই যার-তার হাতে কন্যা সমর্পণ করিয়া দায় মুক্ত হন। কিন্তু কত নিরীহ বালিকা যে অন্তঃপুরে নীরবে এহেন যন্ত্রণাভোগ করিতেছে, তাহার খবর কে রাখেন? এই লোমহর্ষণ আখ্যায়িকার নায়ক আমাদেরও নিতান্ত অপরিচিত নহেন। ইনি পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে গত একবৎসর যাবৎ অনেক চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এতদিন কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন না। লেখিকার পিতা যথোচিত 'বর-মূল্য' দিয়া, পরে বরের শিক্ষার ব্যয়-ভার বহন করিয়া বরটীকে ডাক্তার করিয়া দিয়াছিলেন। এহেন পুত্রের উপার্জ্জনের উপরই বরের-বাবা' মহাশয়ের গ্রাসাচ্ছাদন এখন নির্ভর করিতেছে; সুতরাং তিনি এহেন যোগ্যপুত্রের (!) সন্তুষ্টির জন্য নিরাপরাধা বালিকা-বধূর প্রতি অত্যাচার করিতে বাধ্য বই কি!! যে মহাপুরুষ এহেন যোগ্যপাত্রে পুনরায় কন্যা সমর্পণ করিয়াছেন—তিনি সম্ভবতঃ নিতান্তই নিরুপায় অবস্থায় কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইবার জন্য এরূপ নৃশংসের হস্তে কন্যাটীকে অর্পণ করিয়াছেন! এই নিরপরাধা বালিকার অদৃষ্টে কি আছে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? পরিতাপের বিষয় এই যে, যাঁহারা অবস্থাপন্ন হইয়াও বিবাহের অছিলায় পুত্র বিক্রয় করিয়া অর্থগ্রহণ করেন, তাঁহাদের বেচা-কেনার কথা সমাজে বাহির হইয়া পড়িলে, বধূকে পিত্রালয়ে যাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করেন! ইহাও নৃশংসতার অন্যতম দৃষ্টান্ত নহে কি? যিনি অর্থের বিনিময়ে তোমার পুত্র ক্রয় করিয়া প্রাণাধিক বালিকাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, অন্যে তোমার সেই পুত্রবিক্রয়ের কথা,—তোমার দুষ্ক্রিয়ার কথা বলিলে, তোমার পুত্র-ক্রেতা অথবা তাঁহার কন্যার কি অপরাধ? যাহা হউক, এইসকল লোমহর্ষণ দৃষ্টান্তগুলি দেখিয়া সমাজের একটু চৈতন্য হওয়া উচিত,এবং যাঁহারা এরূপ নৃশংস ব্যবহারে অনুরক্ত তাহাদের সহিত আদান-প্রদান বর্জন করা সমাজের সমাজিকগণের একান্ত কর্ত্তব্য।

মরণে।

[শ্রীপ্রভারঞ্জন দাশ গুপ্ত বি এ।]

যুবকটী এম, এ, বি, এল। নাম যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি আত্মজীবন বিনিময়ে পদ্মার আবর্ত্তে নিমজ্জমানা জনৈক সপরিচারিকা ভদ্রমহিলাকে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করেন। এই অদ্ভুতকর্ম্মা যুবকের আত্মবিসর্জ্জন বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালীর ইতিহাসকে উজ্জ্বল করিয়াছে।

কাঁদায়ে সহস্র প্রাণী, জাগায়ে সহস্র গ্লানি,
অজস্র শোকাশ্রুজলে নিয়েছ বিদায়।
স্মরণে পাষাণ-হিয়া উঠে আজ শিহরিয়া,
মরণে মাধুর্য্যহেন আছে গো কোথায়?
বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত, সম্ভ্রমে আকুল
আনন্দ-আচ্ছন্ন শোকে পূর্ণ হৃদি-কূল। ১।

নিতান্ত জাগিছে মনে, একান্ত অশুভক্ষণে
প্রশান্ত দিনেশ, হায় দিবা নিয়ে এলে;
স্মরি'হিয়া অবসন্ন প্রাণের পুত্রের জন্য
মায়ের প্রস্তুত অন্ন, না স্পর্শিল ছেলে।
এই আসে, এই আসে, নয়নের মণি
জানে না সে, বুকে তার পড়েছে অশণি!। ২।

জগতের ত্রাণতরে, হায়রে এমনি ক'রে,
নিমাইও ত গিয়াছিল মাকে দিয়া ফাকি,—
অভাগী শচীর প্রাণ, পুত্রশোকে ম্রিয়মাণ,
পুনরভিনয় তার ছিল বুঝি বাকি।
তুমি ত মরনি, আজ বুঝিলাম স্থির,
মৃত্যু ভয়, তবপাশে, মরিয়াছে বীর!। ৩।

কেবলি জাগিছে চিতে, এসেছিলে অবনীতে,
যোগভ্রষ্ট হে তাপস! পাপনষ্ট তরে;
ছেদিয়া কর্ম্মের জাল, মহিম-মণ্ডিত ভাল,
চলে গেছে, আসিবে না আর ধরা'পরে।
আমরা দুর্ব্বল হিয়া, মায়ামুগ্ধ জীব,

কলির লক্ষ্মণ হায়, সরযূতে ভেসে যায়,
শোকার্ত্ত সহস্র রাম দাঁড়াইয়া তীরে;
পরহিত মূর্ত্তিমান্, সলিলে স'পিল প্রাণ,
উজ্জ্বল মহিমা এক, ডুবে গেল নীরে।
শিবি ও ভীষ্মের দেশে, যুগান্তের পর,
কি দৃশ্য দেখালে আজ ভীষ্মতুল্য নর!। ৫।

আবর্ত্তের ঘূর্ণীপাকে, সফেণ ভীষণ ডাকে,
তুমি ত পাওনি ভয়, ভীমকর্ম্মা বীর!
অবলা বাঁচাবে বলে, প্রবলা পদ্মার জলে,
অবহেলে বিসর্জ্জিলে, ও তনু রুচির।
লভেছ শীতল মৃত্যু, সলিল-সমাধি;
আমরা বুঝি না তাহা, মুগ্ধজীব কাঁদি। ৬।

সলিলে সোণার দেহ, খুঁজিয়া পায়নি কেহ,
মানবের বৃথা চেষ্টা, ব্যর্থ সে সন্ধান।
বিমূর্চ্ছিত বৃকোদরে, একান্ত আগ্রহ ভরে,
নাগবালা রসাতলে, দিয়াছিল প্রাণ।
"প্রবাল পালঙ্কে" সুখে, রসাতলে গিয়া,
নাগবালা শুশ্রূষায় আছ বা বাঁচিয়া!। ৭।

অথবা, অনন্তশায়ী লক্ষ্মীহৃদি মধুপায়ী
ওদেহ কৌস্তুভ ভাবি করেছ গ্রহণ।
কিংবা, ওই দেহলাগি, শ্মশানে মশানে জাগি,
যোগেশ্বর করিয়াছে তারে যোগ্যাসন।
মানব ওদেহ হতে হইবে বঞ্চিত,

শুধু দু'দিনের তরে, এসেছিল ধরা'পরে,
কার্য্যশেষে, নিজবাসে গেছে সে চলিয়া।
গর্ভে ধ'রে ছিলে হায়, পুত্র নহে, দেবতায়,—
তাই ত চলিয়া গেল, মায়া কাটাইয়া।
অনন্ত পথের যাত্রী দেব পুত্র তরে,
জননি! কেঁদনা বৃথা সকরুণ স্বরে। ৯।

এইরূপ মহাপ্রাণ, জন্মে যার সুসন্তান,
সে-ই মাতা কাঁদিয়াছে সারাটি জীবন।
সেত মা দেয়নি ফাকি, গিয়াছে আদর্শ রাখি,—
সেই সুখে, অশ্রুজল কর সম্বরণ।
কৌশল্যা, যশোদা, শচী, সব মাতৃগণ
কাঁদিয়াছে রাম, কৃষ্ণ, নিমাই কারণ। ১০।

জাতীয়-সংবাদ।

শ্রীমান্ কুমুদবন্ধু সেন গুপ্তের নিবাস যশোহর জেলার অন্তর্গত কালিয়া গ্রাম। ইনি হিন্দুস্কুল হইতে গত বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া এখন প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতেছেন। ইনি শুধু প্রথম হয় নাই, সর্ব্ববিষয়ে প্রথম হইয়া চারিটী স্বর্ণমেডেল, দুটী রৌপ্য মেডেল এবং পঞ্চাশ টাকা মূল্যে পুস্তক পুরস্কার পাইয়াছেন।

শ্রীমান্ যুগলানন্দ বরাট আমাদের একজন পরমাত্মীয়। ইনি ভারত-প্রসিদ্ধ অভ্রব্যবসায়ী খৃষ্টান কোম্পানীর প্রতিনিধি-স্বরূপে কলিকাতার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। শ্রীমান্ যুগলানন্দ দিন দিন কার্য্যে যশস্বী হইবেন, আমরা এরূপ আশা করি।

কলিকাতা ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাস গুপ্ত মহাশয় এতদিন্ এই পদে প্রতিনিধিস্বরূপ ছিলেন; সম্প্রতি পাকা হইয়াছেন। আমরা আশা করিয়াছিলাম, তিনি জজের পদে উন্নীত হইবেন। কারণ, বিচারকার্য্যে তাঁহার সুখ্যাতি যথেষ্ট আছে। তিনি ধীর, সদালাপী মিষ্টভাবী এবং স্বধর্ম্মনিরত। বর্ত্তমান দ্বিতীয় জজ শ্রীযুক্ত পানিয়টী সাহেবের অবসর গ্রহণ করিবার সময় নিকটবর্ত্তী; সেই সময় বিপিন বাবুকে স্থায়ী জজরূপে দেখিতে পাইব, আমরা এরূপ আশা করি।

গত ১লা মাঘ মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যার সহিত স্বর্গীয় সিভিলিয়ান বিহারীলাল গুপ্তের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান চারুচন্দ্র গুপ্তের শুভ উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়াগিয়াছে। শ্রীমান্ চারুচন্দ্র চট্টগ্রামের ডেপুটী ছিলেন, সম্প্রতি সেরাজগঞ্জে বদ্‌লী হইয়াছেন। আমরা নবদম্পতীর সর্ব্বাঙ্গীন সুখ-শান্তি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

অদ্যাপি যাঁহাদের নিকট ধন্বন্তরির প্রথম বর্ষের মূল্য বাকী রহিয়াছে, দয়া করিয়া তাঁহারা মণি-অর্ডার যোগে পাঠাইয়া দিবেন। অন্যথা আমরা ক্রমে ক্রমে ভিঃপিতে তাঁহাদের নিকট ধন্বন্তরি পাঠাইব। আশা করি, ভিঃ পি গ্রহণ করিয়া সকলে 'বিদ্বৎসভা', তথা বৈদ্যসমাজকে কৃতার্থ করিবেন। ইহা ছাড়া আর কি বলিব? কাগজের মূল্য যে তিনগুণ বাড়িয়াছে, ইহা দেশবিদেশের সকলেই অবগত আছেন। বৈদ্যসন্তানগণের কষ্ট-দত্ত ভিক্ষা দ্বারা, ধন্বন্তরি প্রকাশ করিয়া বৈদ্য-সন্তানগণকেই এতদিন যোগান হইতেছে। যাহাতে সেই ভিক্ষালব্ধ অর্থের অপচয় না হয়, বৈদ্যসন্তানগণ মাত্রেরই এ বিষয়ে দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য। যাঁহাদের ধমনীতে বৈদ্য-শোণিত প্রবাহিত হয়, তাঁহারা অন্যথা করিবেন,এরূপ কল্পনাও কোন বৈদ্যসন্তানের হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না।

ধন্বন্তরি।

মাসিক পত্র

২য় বর্ষ, } ফাল্গুন, ১৩২৩, ইং ১৯১৭ ফেব্রুয়ারী, মার্চ্চ, } ৫ম সংখ্যা।

শিবপূজা।

[অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, এম্, এ।]

শঙ্কর-শিরে সলিলের ধারা ঢালিয়া করাব স্নান।
ক্ষুদ্র আমার ক্ষুদ্র মনেতে জাগিল এ অভিমান॥
এতটুকু ঘটে এতটুকু জল—তাহাতে কাহার স্নান!
ভাবিয়া সহসা উঠিনু চমকি—চমকি উঠিল প্রাণ॥
সংশয় মনে হইল উদয়—এই বা কেমন হয়?
বিশ্ব-বিভূতি, বিশ্বের পতি, বিশ্ব যাঁহাতে লয়—
জগতের পাপে তাপিত মূরতি—ব্যথিত পরাণ তাঁর
এতটুকু জলে করিব শীতল—এমনি অহঙ্কার!
হয় সুশীতল ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল—হয় সুশীতল হর।
(যদি) প্রেম-গঙ্গাজল বহায়ে নয়নে, চরণে
ঢালিতে পার॥

কদাচারে-সদাচার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

[ডাঃ শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন শর্ম্মা।]

অতএব যে কোন প্রকার আচারভ্রষ্টই হউক না তাহার দশ দিনের অতিরিক্ত অশৌচ হইতে পারে না।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন মূর্দ্ধাভিষিক্তাদির যে মাসাশৌচ ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা অব্যবস্থা, এবং বৈদ্যগণ যে পক্ষাশৌচ ও মাসাশৌচ প্রতিপালন করিয়া থাকেন তাহাও অব্যবস্থা। উপনীত হউন, অনুপনীতই হউন, ভ্রষ্টাচার হউন, কোন বৈদ্যেরই দশাহাতিরিক্ত অশৌচ হইতে পারে না।

পক্ষাশৌচ পালনকারী উপনীত বৈদ্যগণ একাদশ দিনের কর্ত্তব্য আদ্যশ্রাদ্ধ পতিত করিয়া ষোড়শ দিনে করিয়া থাকেন, এবং অনুপনীত বৈদ্যগণ একাদশ দিনে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ পতিত করিয়া একত্রিশ দিনে করিয়া থাকেন। উভয়েরই আদ্য-শ্রাদ্ধ লোপ হওয়াতে সপিণ্ডকরণ পর্য্যন্ত ষোড়শ শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হয় না; কারণ বারটি মাসিক শ্রাদ্ধ, দুইটি ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ, এবং একটি সপিণ্ডকরণ একুনে পনরটি মাত্র শ্রাদ্ধ হয়,

ষোড়শ শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হয় না। প্রেতের আদ্যশ্রাদ্ধাদি ষোড়শ শ্রাদ্ধ না করিলে, শত শত শ্রাদ্ধ করিলেও তাহার পিশাচত্ব দূর হয় না। ইহার প্রমাণ সংহিতায় লিখিত আছে যথা—

নবশ্রাদ্ধং ত্রিপক্ষে বা দ্বাদশস্বেব মাসিকং
ষণ্মাসৌচাব্দিকঞ্চৈব শ্রাদ্ধান্যেতানি ষোড়শ
যস্যৈতানি ন কুর্ব্বীত একোদ্দিষ্টানি ষোড়শ
পিশাচত্বং স্থিরং তস্য দত্তৈঃ শ্রাদ্ধশতৈরপি।

আদ্যশ্রাদ্ধ বা ত্রিপক্ষ শ্রাদ্ধ দ্বাদশ মাসিক শ্রাদ্ধ, ষাণ্মাসিক দুই শ্রাদ্ধ এবং সপিণ্ডকরণ মোট ষোলটি শ্রাদ্ধ। যাহার এই ষোলটী শ্রাদ্ধ না হয়, তাহার শত শত শ্রাদ্ধ করিলেও পিশাচত্ব দূর হয় না।

এই অব্যবস্থার ফলে কেবল যে বৈশ্যগণেরই ক্রিয়া পণ্ড হইতেছে তাহা নহে, বর্ত্তমান কালেও অর্থলোলুপ ব্রাহ্মণদিগের অব্যবস্থায় অনেক শূদ্রও দ্বিজাচার গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদের পিতৃপুরুষের পিণ্ডোদক লোপ করিতেছেন; কারণ তাঁহারাও একত্রিশ দিনের কর্ত্তব্য আদ্যশ্রাদ্ধ, কেহ ক্ষত্রিয়বৎ ত্রয়োদশ দিনে, কেহ বা ব্রাহ্মণবৎ একাদশ দিনে সম্পন্ন করিয়া পণ্ড করিতেছেন; সুতরাং তাঁহাদেরও ষোড়শ শ্রাদ্ধ সিদ্ধ না হওয়ায় পিতৃপুরুষের প্রেতত্ব দূর হইতেছে না।

আর যাঁহারা তৈলবটের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া এই সকল কদাচারের প্রশ্রয় দিতেছেন, তাঁহারাও যে প্রত্যবায় ভাগী হইতেছেন না, তাহা কে বলিল?

শাস্ত্রে আছে;—

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাঞ্চ পুরাণং ধর্ম্ম নির্ণয়ং।
বিনা শাস্ত্রেণ যোব্রূয়াৎ তমাহু ব্রহ্মঘাতকং॥

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা, পুরাণ এবং ধর্ম্মনির্ণয় যিনি শাস্ত্র না জানিয়া করিবেন, তাঁহাকে ব্রহ্মহত্যা পাতকী জানিবে।

শাস্ত্রালোচনার অভাবেই মূর্খতা বাড়িতেছে, এবং এই মূর্খতার ফলেই আজ ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষের

দীর্ঘকালজাত এই কুব্যবস্থার ফলে জনসাধারণের চিত্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে; এখন অন্যরূপ কিছু শুনিলেই তাঁহারা বিস্মিত হইয়া পড়েন। মূর্খতা এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এসকল বিষয়ের সত্যানুসন্ধানের আবশ্যকতাও কেহ উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। তাই যাঁহার মুখে যাহা আসিতেছে তিনি তাহাই বলিতেছেন; কিন্তু এরূপ বলাতেও যে গুরুতর পাপ আছে সেকথা কেহ স্মরণ করিয়া দেখেন না।

মনু বলিয়াছেন,—

যং বদন্তি তমোভূতা মূর্খা ধর্ম্মমতদ্বিদঃ
তৎ পাপং শতধা ভূত্বা তদ্বক্তৄ নমুগচ্ছতি।

যিনি যে ধর্ম্ম জ্ঞাত নহেন তিনি তাহাতে মূর্খ; তিনি তমোগুণে মত্ত হইয়া সেই ধর্ম্ম যাহাকে বলেন, সে সেই ধর্ম্ম পালন করিলে তাহার যে পাপ হয় সেই পাপ শতগুণ হইয়া সেই ধর্ম্মবক্তার অনুগমন করে।

এই সমস্ত পাপের কথা জানিয়াও, যিনি যে শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ; তিনি সেই শাস্ত্রের স্বযুক্তিকল্পিত ব্যবস্থা দিতেছেন, কেহ বা শাস্ত্রের যথার্থতা বলিয়াও যথার্থ ব্যবস্থাদানে কুণ্ঠিত হইতেছেন, ইহা কি সাধারণ পরিতাপের বিষয়?—

যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট জাতি গুণযুক্ত, তাহাকে তাহা না বলিয়া অন্যরূপ বলিলে তাহাতেও ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপ হয়; এ কথা মনু স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন।

অনৃতঞ্চ সমুৎকর্ষে পৈশুন্যং রাজগামি চ
গুরোশ্চালীক নির্ব্বন্ধঃ সমানিব্রহ্মহত্যয়া।

যে ব্যক্তি সমুৎকর্ষবিষয়ে অর্থাৎ জাতিতে গুণেতে কি ক্রিয়াতে উৎকৃষ্ট, তাহাকে তাহা না বলিলে, রাজার বিষয় খলতা করিলে এবং গুরুর সম্বন্ধে মিথ্যাকথা বলিলে ব্রহ্মহত্যা তুল্য পাপ হয়।

মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠগণকে ব্রাহ্মণ না বলিয়া বৈশ্য কিম্বা শূদ্র, বর্ণশঙ্কর বলা কি মিথ্যাভাষণ

এই মিথ্যাভাষণ অজ্ঞানকৃতও আছে জ্ঞানকৃতও আছে।

অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু জ্ঞানকৃত পাপ হইতে নিষ্কৃতি নাই। তাহাই মনু ব্রহ্মহত্যাদির প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশবার্ষিকী ব্রতাদির বিষয়ে বলিতেছেন,—

ইয়ং বিশুদ্ধিরুদিতা প্রমাপ্যাকামত দ্বিজং
কামত ব্রাহ্মণবধে নিষ্কৃতির্ণ বিধীয়তে।

অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যা করিলে এই প্রায়শ্চিত্ত কহিলাম, কিন্তু জ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যা করিলে তাহার নিষ্কৃতি নাই।

এখন অনৃতবাদীরা এইসকল শাস্ত্রবাক্যের কি উত্তর করিতে চান?

ধর্মভয় থাকিলে কখনই সত্যের অপলাপ করিতে দেখিতাম না, স্বেচ্ছাচারিতায় সমাজেরও আজ এতদ্দশা ঘটিত না।

এতদিন না হয় শাস্ত্রব্যাখ্যাকর্ত্তাদিগের ত্রুটীতে সমাজে কদাচার প্রবেশ করিয়াছে; কিন্তু এখন তাহা বুঝিতে পারিয়াও তাহার সংস্কারের চেষ্টা হয় না কেন?

যদি কেহ বলেন, গঙ্গাধর কবিরাজের শাস্ত্র-ব্যাখ্যা আমরা মানি না। যদি না মানেন, তাঁহার ব্যাখ্যার ত্রুটী প্রদর্শন করেন না কেন?

পণ্ডিত গঙ্গাধরের কোন ব্যাখ্যাই স্বকপোল-কল্পিত নহে। তিনি শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া, শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় সমস্ত শাস্ত্রের একবাক্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন; ইহাই তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যার বিশেষত্ব, এবং ইহাতেই তাঁহার সর্ব্বশাস্ত্রদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। আজ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার অকাট্য যুক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হয় নাই। তাঁহার যুক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইলে, শাস্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হয়; কারণ তাঁহার একটি প্রমাণও শাস্ত্রবহির্ভূত নহে। তাঁহার ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিতে হইলে শাস্ত্রব্যাখ্যার যুক্তিহীন বিচার দ্বারা ধর্মহানি করা সঙ্গত নহে। ইহাতে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, এবং ঈর্ষ্যা বিদ্বেষের সৃষ্টি করে।

সমাজে যে মাঝে মাঝে জাতীয় উৎকর্ষাপকর্ষের অধিকার অনধিকারের বিষয় লইয়া বিচার বিভ্রাট উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহার মূলেও অনভিজ্ঞতা, ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষের ভাব পরিস্ফুট।

প্রত্যেক জাতিরই ধারাবাহিক আচার ব্যবহার উৎকর্ষাপকর্ষের সাক্ষ্যদান করিয়া থাকে। বৈদ্য-জাতি বিধিবিড়ম্বনায় নানাপ্রকারে হীনপ্রভ হইয়া পড়িলেও এখনও আচার ব্যবহারে, সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, একথা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহাই কি ঈর্ষ্যা বিদ্বেষের কারণ? তাহাদিগকে ইতর জাতির সহিত তুলনাই কর, আর তাহাদিগকে হাড়ি, ডোম, চণ্ডালই বল, তাহাতে তাহাদিগের কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। বস্ত্রাচ্ছাদিত অগ্নি কখনই ছাপা থাকিবে না। পতন হইলেই উত্থান আছে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। বৈদ্যজাতির পতন হইয়াছে সত্য, উত্থানের দুন্দুভিও বাজিয়া উঠিয়াছে, উত্থান অবশ্যম্ভাবী; সত্যের গতিরোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। সত্যের অপলাপ করিয়া কেবল প্রত্যবায়ভাগী হওয়া মাত্র।

গত অগ্রহায়ণের 'ধন্বন্তরি' পত্রে "নায়ক" সম্পাদকের বৈদ্যজাতির প্রতি যেরূপ কটাক্ষ এবং তাঁহার যেরূপ শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তিনি হিন্দুসমাজের নায়কত্ব করিবার উপযুক্ত পাত্রই বটেন! যিনি এতকাল বৈদ্যদিগের মধ্যে বাস করিয়া আসিতেছেন, বৈদ্যজাতির সম্বন্ধে এত আন্দোলন, আলোচনা দেখিয়া আসিতেছেন, তিনি যে বৈদ্যজাতির ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, একথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। জানিলে কি হইবে? যে জাগিয়া ঘুমায়, তাহার

উন্মিলিত হইবে না। নচেৎ আর কালমাহাত্ম্য কাহাকে বলে!

উপরে থুথু নিক্ষেপ করিলে যে তাহা নিজের গাত্রে আসিয়া পড়ে, এ জ্ঞান 'নায়ক' সম্পাদকের থাকিলে এতটা ধৃষ্টতা দেখাইতে তিনি কখনই সাহসী হইতেন না। শুধু নায়ককেই বা বলি কেন, 'বঙ্গবাসী' 'বসুমতী' 'হিতবাদী' প্রভৃতি কেহই তো সময় সময় এরূপ শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিতে কসুর করেন না।

এ জাতি ত কাহারও অনিষ্ট করে নাই, তবে কেন এ জাতির উপর এত আক্রোশ—এত বিদ্বেষ। এ জাতি চিরকালই হিন্দুসমাজের উপকার করিয়া আসিতেছে। হিন্দুরাজ্য স্থাপনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যে বৈদ্যের প্রভাব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হিন্দু সমাজকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে আজ সেই বৈদ্যজাতির উন্নতির পরিপন্থী হইলে এ সমাজ কে রক্ষা করিবে?

এক সময়, বৈদ্য বংশীয় মহারাজ আদিশূরই বৌদ্ধগণকে বিতাড়িত করিয়া বেদাগ্নি বিরহিত, আচার ভ্রষ্ট ক্রিয়াকলাপবর্জ্জিত বঙ্গদেশে কান্যকুব্জ হইতে ঋষিকল্প পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারই বংশধর বৈদ্য বল্লাল সেন ব্রাহ্মণাদির কুলধর্ম্ম নিরূপণ করিয়া সেই হিন্দুসমাজে সদাচার প্রতিষ্ঠা করিয়া ধর্ম্মভাব জাগ্রত রাখিয়াছিলেন। তাহার পর যবন রাজত্বের সময়েও মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মধুর বৈষ্ণবধর্ম্ম সঞ্জীবিত রাখিবার মূলে, বৈদ্য,—কবিরাজ গোস্বামী, মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপুর প্রভৃতি পরম ভাগবতের প্রভাবই দেখিতে পাই। তাহার পর অতীতের কথা ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমান ইংরাজ রাজত্ব কালেও বিধর্ম্ম প্লাবিত দেশে আর্য্য ধর্ম্ম রক্ষাকল্পে, বৈদ্যপ্রতিভাই অগ্রণী দেখিতে পাই।

একই সময় তিনটী বৈদ্য প্রতিভার জলন্ত আচার্য্য কেশব চন্দ্র সেন ও পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী।

যে সময় পাশ্চাত্য শিক্ষাস্রোতে দেশের যুবকবৃন্দের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার কলুষিত হইতে লাগিল, অনেক যুবক, খৃষ্টান মিশনারীদিগের কুহকে পড়িয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল, সেই সময় কেশবচন্দ্র সেনের আবির্ভাব হইল। একদিকে যেমন তিনি তাঁহার নববিধানের পতাকা তুলিয়া শত শত যুবকবৃন্দকে আশ্রয় দান করিয়া বিধর্ম্মীর কবল হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন, অন্য দিকে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন তাঁহার অমৃতনিষ্যন্দিনী বক্তৃতা প্রভাবে সমগ্র বঙ্গদেশে মাতাইয়া তুলিলেন; হিন্দু ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মে যুবকগণের মতি গতি ফিরাইতে লাগিলেন; আবার তাহাদের হিন্দু ধর্ম্মে আস্থা জন্মিতে লাগিল।

কেশব চন্দ্রের নববিধান যে ধর্ম্মই প্রচার করুক না, শত শত হিন্দুর সন্তান যে ইহার প্রভাবে বিধর্ম্মীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

আবার অন্য দিকে পণ্ডিত গঙ্গাধর বেদের শ্রেষ্ঠতম আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের উদ্ধার কল্পে নীরবে নিভৃতে বসিয়া বেদব্যাসের ন্যায় লেখনী সঞ্চালন করিতেছিলেন। তাঁহারই প্রসাদে আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের উদ্ধার হইয়াছে। সমাজে যত কিছু অশাস্ত্রিকতা, অব্যবস্থা চলিতেছে, তাহা তিনি তন্ন তন্ন করিয়া নির্ভীকভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম, বৈদ্যই একদিন বঙ্গে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, বৈদ্যই ব্রাহ্মণাদির সদাচার জাগ্রত রাখিয়াছিল, এবং সেই বৈদ্যপ্রতিভাই আজ পর্য্যন্ত অধঃপতিত সমাজে ধর্ম্মভাবের স্ফুলিঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় জীবিত রাখিয়াছে, একথা অস্বীকার করিবার যো নাই।

আবার যদি এ সমাজ জাগে, এই জাতির অভ্যু-

বলিয়া বোধ হইতেছে। সেইজন্যই বোধ হয় সর্ব্ব শাস্ত্রের উদ্ধার কল্পে পণ্ডিত গঙ্গাধরের আবির্ভাব।

শাস্ত্রজ্ঞানবিরহিত, অসদ্ব্যাখ্যাপ্লাবিত ক্রিয়া-কলাপ লুপ্ত, সদাচারভ্রষ্ট সমাজের উদ্ধারের জন্যই গঙ্গাধর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তিনি ধর্ম্ম শাস্ত্রের উদ্ধার কল্পে যেরূপ নির্ভীকতা এবং সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বৈদ্যবংশ ব্যতীত অন্য বংশে সম্ভবে না। মুমূর্ষুর জীবন সঞ্চার করিতে উপযুক্ত বৈদ্যেরই আবশ্যক। উপযুক্ত বৈদ্যের ব্যবস্থায় ঔষধ নিরূপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ঔষধ গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি কই?

বৈদ্য এবং ঔষধের প্রতি বিশ্বাস ভক্তি না জন্মিলে, ঔষধের কার্য্যকারিতা উপলব্ধি হইবে না। ঔষধের উপকারিতা, বৈদ্যের নিজের সমাজে সর্ব্বাগ্রে পরীক্ষা করিয়া দেখাইতে হইবে; ইহাই সেই আদর্শ বৈদ্যের ইঙ্গিত বুঝিতে হইবে; নচেৎ জার্ম্মন বৈদ্য হানিম্যানের হোমিওপ্যাথি প্রচারের ন্যায় স্বদেশে লাঞ্ছিত হইলে সত্য প্রচারে বিলম্ব ঘটিবে।

ব্যাধিতে মস্তিষ্কের বিকৃতি না ঘটিলে ঔষধ প্রয়োগ কঠিন ব্যাপার হইত না। মস্তিষ্কের বিকৃতিতেই সমাজ শরীরের অন্যান্য অঙ্গ স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদনে অপারগ। মস্তিষ্কের এক অংশ পক্ষাঘাত গ্রস্ত (paralysis) অপরাংশ আরোগ্যসাধিনী শক্তি লইয়া বিরাজিত; কি প্রকারে শক্তি বিকশিত হইয়া সমগ্র দেহে বল সঞ্চারিত করিবে সেই চিন্তায় ব্যস্ত।

আর একটু খোলসাভাবে বলিতেছি,—একই ব্রাহ্মণের দুইটি সন্তান। জ্যেষ্ঠ নানাপ্রকার ব্যাধি-গ্রস্ত, কনিষ্ঠ বৈদ্যরূপে তাহার চিকিৎসায় নিযুক্ত,—সুব্যবস্থা ও উপযুক্ত ঔষধ লইয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান। জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থা ও ঔষধ গ্রহণে নারাজ; তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, কনিষ্ঠকে বিদ্বেষ ও সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছেন,—পাছে তাঁহার স্বত্বাধিকার কাড়িয়া লয়! কনিষ্ঠকে উপেক্ষা করিয়া ইতর পাঁচ জনকে নিজের আসনে বসাইতেছেন, এবং নিজের স্বত্বাধিকার লিখিয়া দিতেছেন। অনধিকারী এবং অপাত্রে ন্যস্ত হইলে মূল্যবান সম্পত্তির যে দুর্গতি হয়, আজ তাহাই হইতে বসিয়াছে।

বিকৃত মস্তিষ্কে যাহাকে তাহাকে পৈতৃক সম্পত্তি লিখিয়া দিলে নিজের স্বত্বই লোপ পাইবে, কিন্তু পৈতৃক স্বত্বে স্বত্ববান্ প্রকৃত অংশীদার কনিষ্ঠ কখনই বঞ্চিত হইবে না। সে তাহার লুপ্তাধিকার পুনরুদ্ধার করিবেই করিবে। কারণ আইনতঃ যে অধিকারী বহুকাল পূর্ব্বে উচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে প্রধান বিচারপতি মনু প্রমুখ বিংশতি জন বিচারকের ফুল বেঞ্চের বিচারে যাহার স্বত্ব সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার স্বত্ব লোপ হইবার নহে;—পুনরুদ্ধার করিতে যাহা কিছু বিলম্ব হইবে মাত্র।

মান।

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র সেন গুপ্ত।]

জগৎ মানময়। মানের স্রোতে বিশ্ব-সংসার প্লাবিত;—প্রাবৃটের পূর্ণকায়া প্রবাহিনীর ন্যায় মানের খরপ্রবাহ অবিরাম কল-কল্লোলে দুই কুল ভাসাইয়া চলিয়াছে। কোথাও মানের হাস্য-কৌতু- কালমেঘের ন্যায় মানের ভৈরব হুঙ্কারে বিকম্পিত,—কোথাও বা পদ্মার ঘূর্ণিপাকের মত মানের ভীষণ আবর্ত্তে সংহার-মূর্ত্তিময়ী! গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় প্রতিদিন অসংখ্য লোক এই ঘোর ঘূর্ণিপাকে

কায়ক্লেশে জীবন বাঁচাইয়া আপনাকে ধন্যজ্ঞান করিতেছেন।

আমাদের বাঙ্গালাদেশে এখন মানের ঘূর্ণিপাক গর্জ্জিতেছে। চলিতে-বলিতে মান,—বাড়ীতে-গাড়ীতে মান,—স্কুলে কলেজে মান,—সংবাদপত্রে মান,—নবদম্পতির প্রণয়পত্রে মান,—বিবাহ-ব্যবসায়ে বর-পণ্যের পণ নিরূপণে মান,—দরিদ্র বৈবাহিকের সরল তত্ত্বান্বেষণের ক্রটি বিচ্যুতির অহেতুকী সূত্র অবলম্বনে বরের জনক-জননীর অপরিমাণ মান!—মান চারিদিকে, যেন গঙ্গায় পূর্ণিমার কোটালের বান ডাকিয়াছে!! মান এত ভঙ্গ-প্রবণ যে উহাতে ফুলের ঘা—বাতাসের ভর সহে না! কিন্তু তাহা হইলে কি হয়;—প্রাসাদ বাসী, কমলার প্রিয়পুত্র নৃপতি হইতে তরুতলাশ্রিত নিরন্ন ভিখারী পর্য্যন্ত সকলেই মানের মোহে মত্ত! মানে প্রাণে সুখের উৎস ছোটে,—মানসসরোবরে কমলদল প্রস্ফুটিত হয়,—হৃদয়-কুঞ্জে বসন্তানিল সংস্পর্শে নব রস-কলাপী কোকিল কুহুতানের তরঙ্গ তুলিয়া দেয়! আবার পক্ষান্তরে মানে বন্ধুবিচ্ছেদ হয়,—প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমের বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়,—শারদ-জ্যোৎস্নাবিধৌত নির্ম্মল নীলাকাশ অকস্মাৎ অমানিশার নিবিড়-অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে!! এই প্রাকৃতিক বৈষম্যের গোলক-ধাঁধায় পড়িয়া মানুষ সর্ব্বদা আত্মহারা এবং মরু-পার-প্রয়াসী পথিকের মত মানের মোহ-মরীচিকায় মুগ্ধ হইয়া আপন পরিণাম বিষময় করিয়া তোলে!

যাহার মান নাই, জগতে তাহার কিছুই নাই। মানের অভাবে লোক দেশের নিকট,—দশের নিকট ঘৃণিত পশুর মত বাস করে, এবং সেরূপ ঘৃণিত, অপদার্থ জীবন ধারণ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র, ইহাই আজকাল পনের আনা সাড়ে তিন পাই লোকের দৃঢ় বিশ্বাস। কি প্রকারে মান লাভ হইবে,—কি উপায়ে উপার্জ্জিত মান চির-অটুট থাকিবে,—কি করিলে দশের মুখে তাঁহার অগাধ ঐ সকল লোক সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত। অন্তরে মান-তুষানল নিশিদিন ধিকিধিকি জ্বলিতে থাকে, কেবল কার্য্যের অনুকূল বাতাসে ও ব্যবহারের নীরস ইন্ধনে সে অগ্নি ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠে, এবং তাহার প্রচণ্ড উত্তাপে কর্ত্তব্যজ্ঞান একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যায়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, অধুনা আপামর সাধারণ সকলেই মানের জন্য লালায়িত; কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে কে কিরূপ মানের অধিকারী, এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের মানের পরিমাণ কত, তাহা সহজে নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। যতক্ষণ তুমি কাহারও মান নাশ না কর, ততক্ষণ তাঁহার মান-কুণ্ডের গভীরতা বুঝিতে পারিবে না; আর কিসে যে মাননাশ ঘটে, সেটা বোঝা ত একেবারেই দুঃসাধ্য! হয় ত তুমি একদিন সরল বিশ্বাসে, অকপট অন্তঃকরণে তোমার প্রতিবাসী পুঁটে বাবুকে কিছু সদুপদেশ দিতে ইচ্ছা করিলে; কিন্তু সে উদ্দেশ্য হয় ত তাহার প্রবৃত্তির বিরোধী হইল, অথবা হয় ত তোমার সাধু উপদেশ তাহার স্থূল-বুদ্ধির অভিগম্য হইল না; আর তুমি যাও কোথা? চারিদিকে জগঝম্প বাজিয়া উঠিল,—আইন-শাস্ত্র-সমুদ্র আলোড়ন-বিলোড়নে উকিল-ব্যারিষ্টারগণের আহার নিদ্রা বন্ধ হইল,—মন্ত্রমুগ্ধ মৃগের মত অচিরাৎ তোমাকে মানহানি অভিযোগের মহাজালে জড়িত হইতে হইল! ব্যবহারাজীব-গণের গভীর গবেষণার ফলে কেহ বলিলেন,—হৃতমানের মূল্য পাঁচ হাজার টাকা,—কেহ বলি-লেন,—বর্ত্তমান বাজার দরে অন্ততঃ সাড়ে সাত হাজার টাকা,—অবশেষে সর্ব্ববাদি সম্মতিক্রমে মূল্যটা দশ হাজারে দাঁড়াইল,—তখন জানা গেল, পুঁটে বাবুর মানের মূল্য পুরোপুরি দশ হাজার টাকা!! হয় তুমি পুঁটে বাবুকে ঐ টাকা কড়াক্রান্তিতে গণিয়া দাও, নচেৎ বিনা-বাক্যব্যয়ে পিতার সুপুত্র হইয়া কয়েকমাস কারা-

সকলের প্রতি সমান প্রযুজ্য। হস্তপদাদিবিশিষ্ট, ইন্দ্রিয়নিচয়শালী মনুষ্যমাত্রেই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি, ও সকলেরই মান পাংশু-প্রচ্ছন্ন; কেবল প্রয়োজন মত সে মানের আবির্ভাব হয় ও আদালতের হাটে যাচাই করিয়া সে মানের মূল্য নিরূপিত হইয়া থাকে।

কথা হইতেছে, যে মান একবার কোন কারণে নষ্ট হইয়া যায়, তাহার পুনরুদ্ধার হয় কি না,—হইলেও তাহা পূর্ব্ববৎ সমভাবে থাকে কি না। শাণিত অস্ত্রের তীক্ষ্ণধার দেখিতে অতি চিক্কণ; কিন্তু দৈবাৎ যদি তাহার কোন অংশ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে পুনরায় পূর্ব্বাবস্থায় আনা নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। সুনিপুণ শিল্পীর কারুকৌশলে যদিও সে ভাঙ্গাটুকু কোন প্রকারে জোড়া দেওয়া যায়, কিন্তু সামান্য আঘাতেই আবার যে সেইস্থান ভাঙ্গিয়া যাইবে ইহা একরূপ অবিসংবাদী সত্য। সেইরূপ উকিল, মোক্তার ও বিচারকের শিল্পনৈপুণ্যে ভাঙ্গামান জোড়া লাগিলেও অতি সামান্য কারণে সেই জোড়া পুনরায় ভাঙ্গিয়া যায়।

মান পাকা সোনা। যিনি প্রকৃত মানী, তাঁহার মান কেহ কখনও নষ্ট করিতে পারে না, অথবা তিনি রাজদ্বারে মানের পরীক্ষায় উচ্চাসন লাভের আকাঙ্ক্ষা রাখেন না। মানীর মান স্বয়ং ভগবান রক্ষা করেন। দুর্য্যোধনের প্ররোচনায় আথিত্য-তৃপ্ত দুর্ব্বাসা যখন দ্রৌপদীর ভোজন শেষে ষষ্টিসহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে পাণ্ডবাশ্রমে অতিথি হইয়াছিলেন, তখন ধর্ম্মনাশ-ভয়ে-ভীত পাণ্ডবেরা কেবল সেই চিন্তামণিকে চিন্তা করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের নীরব কাতর-আহ্বানে ও অসাধারণ ধ নিষ্ঠা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া লজ্জানিবারণ শ্রীমধুসূদন স্বয়ং পাণ্ডবদিগের মান রক্ষা করিলেন। যদি পাণ্ডুপুত্রগণ সেই সময় ধৈর্য্যচ্যুত অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সমূহ বিপদ-

শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে নিদারুণ পদাঘাত করিলেন! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপন অঙ্গের ব্যথা উপেক্ষা করিয়া মুনির চরণে আঘাত লাগিয়াছে কি না তাহাই বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যিনি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম,—যাঁহাকে ধ্যানে ধারণা করিবার জন্য শত সহস্র মুনিঋষি অনন্তকাল যোগাসনে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন,—যাঁহার কটাক্ষে কত কোটি কোটি যোগী ঋষির উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় হইতেছে, সেই পরমপুরুষ অনায়াসে বক্ষে পদাঘাত-যন্ত্রণা সহ্য করিলেন। যদি তিনি এরূপ বিবেচনা করিতেন যে ইহাতে তাঁহার মানের লাঘব হইয়াছে, তাহা হইলে ত তৎক্ষণাৎ তিনি সে অপমানের সমুচিত প্রতিশোধ লইতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি মানের মর্য্যাদা সমধিক বাড়াইয়া দিলেন!! রাজ্যসম্পত্তির তুল্যাংশাধিকারী পাণ্ডু-ভ্রাতৃগণকে সূচ্যগ্রপরিমাণ ভূমি প্রদানে অসম্মত দাম্ভিক কুরুপতি দুর্য্যোধনের অভিমানের গতি-পরিণতি মহাভারতের প্রতি পংক্তিতে পূর্ণ প্রতিভাত!!

তোষামোদ মানীর মান রক্ষার পথে আর একটি প্রবল পরিপন্থী। তোমাকে কেহ অপমান সূচক কোন কথা কহিলে হয় ত তুমি আপন চরিত্রবলে সে অপমান সহাস্যে উপেক্ষা করিতে পারিতে; কিন্তু তোমার তোষামোদকারিগণের চাটু বাক্যে ও ক্রমিক প্ররোচনায় অগত্যা তোমাকে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। যদি সহচরীবৃন্দের উত্তেজনা না থাকিত, তাহা হইলে শ্রীরাধিকার মনে কখনই সময়ে সময়ে সেরূপ ভীষণভাব ধারণ করিত না ও মানময়ীর মান ভাঙ্গিতে রাধারমণকে ততদূর ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত না। মানভঞ্জনের সাধারণ উপায় ব্যর্থ হইল দেখিয়া সুচতুর শ্যামচাঁদ শেষে "দেহিপদপল্লব মুদারম্" বলিয়া চরণ-ভিক্ষা চাহিলেন, তবে মানিনীর মানের অবসান হইল। এইসকল দৃষ্টান্ত

আমি বিবেচনা করি, মানের দায়ে নন্দদুলালকে বহুবার অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইত!!

মানী কখনই মাননাশের আশঙ্কা রাখেন না, অথবা মানহানি হইলেও তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন না, ইহাই চরমোৎকর্ষলব্ধমানব চরিত্রের আদর্শ নিদর্শন। মানী জানেন,—যাহা স্বকীয় সম্পত্তি, তাহা অন্যের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলি করিতে দেওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। যেমন সদ্যবিকশিত, অনাঘ্রাত পরিমল পবিত্র প্রসূনের সমাদর দেবতায় করেন, তেমনি মানের মর্য্যাদা মানী রাখেন। অন্তঃসারবিহীন লঘুচেতা লোকেরাই মানের আকর্ষণ-বিকর্ষণে অধীর হইয়া চারিদিকে ছুটিয়া বেড়ায় ও প্রতিমুহূর্ত্তে মাননাশের আশঙ্কায় ত্রিভুবন অন্ধকার দেখে। ইহাদিগের মান বেলোয়ারি বাসন,—বহু যত্নে ও বহু সাধনে এ বেলোয়ারি-মান রক্ষা করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে, তথাপি আমরা প্রতিনিয়ত পথে ঘাটে অপমানের গড়াগড়ি দেখিতে পাই! ইহার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল নিজ নিজ কর্ম্মফলের দোষ মাত্র! মানার্জ্জনের এ বিকট বাসনা ও মানরক্ষার এ অদ্ভুত পদ্ধতি পরিণামে পরিতাপে পরিণত হয়। কবি গাহিয়াছেন—

"কারও দোষ নয় গো মা,
"আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

মহাকবির এ মহাগীতি প্রকৃতই সত্য ও লোকশিক্ষাপ্রদ। আশা করি এ মহাগীতির প্রত্যেক বর্ণ সকলেরই হৃদয়ের কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রতিধ্বনিত হইবে!!

জিজ্ঞাসা।

[অধ্যাপক শ্রীহরিপদ সেন শাস্ত্রী, এম্, এ,]

এই বিচিত্র জগতের নানা বিষয়িণী বিচিত্রতার পর্য্যালোচনা করিলে, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই অন্তঃকরণ এক অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া থাকে। এই মনোরম অথচ ভয়ঙ্কর, স্থির অথচ সততযায়ী, কোটিযুগের পুরাতন অথচ নিত্য নূতন, স্বপ্নবৎ অথচ গভীর সত্য সংসার-ঘটনাচক্র কাহার চিত্তে যুগপৎ ভীতি ও শান্তভাবের উদ্রেক না করে? আবার, যখন আমরা এই বহির্জগতের কথা ভুলিয়া, এক বা ততোধিক বিশাল ও দুর্জ্ঞেয় অন্তর্জগতের কথা আলোচনা করি, তখন একেবারে স্তম্ভিত, পুলকিত ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি।

বেদ-বেদান্তাদির দিব্য জ্যোতিঃ সহস্র সহস্র যুগ যে ভারতের মোহান্ধকার দূর করিয়া একদিন অপূর্ব্ব প্রভায় চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়াছিল, সেই ভারতবাসী ভারতসন্তানের হৃদয়ে আজ অকাল অমানিশা কালপ্রভাবে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে! আজ আমরা কালবশে হৃতসর্ব্বস্ব ও শক্তিহীন। এখন আর সেই জ্ঞানপিপাসা—সেই জ্ঞানলাভের জন্য ব্যাকুলতা দেখা যায় না। সেই যুগযুগান্তের নিত্য জ্ঞাতব্য তত্ত্বের জন্য কাহাকেও লালায়িত দেখি না।

আজি ভারতের লক্ষ লক্ষ বৎসরের ক্লেশোপার্জ্জিত ধন বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। ভারতবাসীরা আপনারা এই দুর্লভ সামগ্রীকে আপনাদের বলিয়া চিনিতেছে না। সেই শোণিতে শোণিতে প্রবাহিত, স্বীয় প্রাণে প্রাণে অনুভূত, পুরাণ আত্মকথা—'তত্ত্বজিজ্ঞাসা' 'ভারতবাসীর হৃদয় হইতে চিরকালের মত অন্তর্হিত হইতে বসিয়াছে। অতীতের সামগ্রী অতীতের ক্রোড়ে কোথায়

ভাসিয়া যাইতেছে। হৃদয়ের অনাবিল আনন্দ-মন্দাকিনী-ধারা রুদ্ধ ও পঙ্কিল হইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু বেদবিদ্যাপ্রসূ পুণ্য ভারতভূমিতে জন্ম-গ্রহণ করিয়া এই স্বতঃজাগ্রতী 'জিজ্ঞাসা'কে বিসর্জ্জন দিলে চলিবে না। উহাকে সযত্নে হৃদয়ে পোষণ করিতে হইবে। এখনও হতাশ হইবার কারণ নাই। সময় থাকিতে চেষ্টা করিলে, আমরা অল্পচেষ্টাতেই মহাফল প্রাপ্ত হইব। মহাপ্রভাব তত্ত্বদর্শী ঋষিদিগের বংশে ধর্ম্মানুশীলন ও আত্ম-তত্ত্বের জিজ্ঞাসা বিষয়বিতৃষ্ণার সহিত আপনি জাগিয়া উঠে। তাহাতে চেষ্টা ও যত্ন থাকিলে, অদ্ভুত ফল ফলিয়া থাকে। ইহার সত্যতা প্রতি মুহূর্ত্তেই স্ব স্ব হৃদয়ে অনুভূত হয়।

বদ্ধ জীব স্বভাবতঃই মুক্তির জন্ম ব্যাকুল। ব্যাকুলতা ও বৈরাগ্য জন্মিলে চৈতন্ত মোহমুক্ত ও নির্ম্মল হয়। তখন ভক্তি ও জ্ঞান স্ফুরিত হইতে থাকে এবং অচিরাৎ উজ্জল আলোকচ্ছটায় হৃদয়া-ভ্যন্তর আলোকিত হয়। তখন প্রাণের আবেগে বলি——"নিমজ্জতোঽনন্তভবার্ণবান্ত—

শ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ।
ত্বয়াঽপি লব্ধং ভগবন্নিদানী—
মনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ॥

হে ভগবন্, অনন্ত ভবার্ণব গর্ভে মগ্ন হইতে হইতে তোমাকে আমি কূলরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন তুমি দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা কর। দয়ার এমন উপযুক্ত পাত্র আর পাইবে না।"

এই স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা বা তত্ত্বার্থ-জানিবার বাসনা শৈশব হইতেই বীজরূপে মানবহৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে দেখা যায়। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহা পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া বহুবিষয়িণী হয়, শিশু তখন হয় ত যুবক বা পরিণত বয়স্ক হইয়াছে। তাহার মন একাগ্র এবং বুদ্ধি বিচার-পটু হইয়াছে। তখন সে বাল্যের তুচ্ছ ক্রীড়নক অথবা যৌবনের অকিঞ্চিৎকর উপভোগ লইয়া জ্ঞাতব্য বিষয়ে মনোনিবেশ করে। যে মন বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গণের সহিত বহির্বিষয় গ্রহণেই এত দিন ব্যস্ত ছিল—সে এখন তাহাদিগকে উপসংহৃত ও সংযত করিয়া অন্তর্ম্মুখ হয় এবং নিজেই নিজের বিষয় পর্য্যালোচনায় চেষ্টা করে। তখন বিবিধ মনোবৃত্তির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনের পরিচয় হয়। ক্রমে তদ্বিষয়ে কৌতূহল জন্মিলে আত্মতত্ত্বে জিজ্ঞাসার উদয় হয়।

শৈশবেই তত্ত্বজ্ঞানলাভ প্রাক্তনের ফল। সকলেই শুকদেবের ভাগ্য লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন না। কোটিজন্মের অবিরাম সাধনার এরূপ দুর্ল্লভ ফল, সুকৃতের বলেই লাভ হইয়া থাকে। 'তত্ত্বজ্ঞান' শব্দের অর্থ কি? বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ এতদুভয়ের সম্পূর্ণ সত্যজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। অন্তর্জ্জগৎ চিন্তা ও বুদ্ধিগ্রাহ্য। বহির্জ্জগৎ মন ও বুদ্ধিগ্রাহ্য ত বটেই—অধিকন্তু প্রত্যক্ষগোচর। এই জন্যই প্রথমে প্রত্যক্ষ বিষয়ে জিজ্ঞাসা হওয়াই সমীচীন। সেই জন্ম 'আমি কে', 'আমার-স্বরূপ কি', 'আমি কোথা হইতে আসিলাম' ইত্যাদি প্রশ্ন মনোমধ্যে উদিত হইবার পূর্ব্বেই আমরা জিজ্ঞাসা করি—এই সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহনক্ষত্রাদি-বিরাজিত, নদনদী-গিরি-কানন-পরিশোভিত অনন্তরূপ অনন্ত আনন্দ-নিকেতন 'জগৎ' কোথা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইল? কোথায় ইহার অন্ত? কে ইহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন? সেই নির্ম্মাতার স্বরূপ কি? ক্রমে যখন জড় দেহের প্রতি দৃক্পাত করিয়া ভাবি, এই একাদশ ইন্দ্রিয়গ্রাম সমন্বিত শরীর লোষ্টপাষাণাদি অপর জড়দেহ হইতে কত বিভিন্ন—কত কৌশলে, কি অপূর্ব্ব উপাদানে এই চিৎ-জড়াত্মক দেহ গঠিত—কিরূপ ইহার স্বভাব? এই দেহই কি 'আমি'? 'আত্মা' কিরূপ বস্তু? দেহ ও আত্মার কিরূপ সম্বন্ধ,—তখন ক্রমে ক্রমে বাহ্য জগৎ হইতে আমাদিগের দৃষ্টি অপসৃত হইয়া পড়ে, এবং আমরা যে এই স্থূল দেহ মাত্র নহি, একজন চেতন ভোক্তা

তিনি যে দেহ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ—এই তত্ত্ব নিদিধ্যাসনপর আর্য্যহৃদয়ে ক্রমশঃ আপনি স্ফুরিত হইতে থাকে। তখন আমরা তাঁহার স্বরূপ নির্ণয়ে যত্নবান্ হই। দেহাদিব্যতিরিক্ত 'আত্মা' রূপ পদার্থটি কিরূপ? কেন ইহার সংসারগতি? কেন এই সুখদুঃখাত্মক চক্র-ভ্রমি? কি উপায়ে ইহা হইতে মুক্তিলাভ করা যায়? এবম্বিধ জিজ্ঞাসা তখন হৃদয়কে ব্যাকুলিত করিয়া তুলে।

তখন মন অন্তর্মুখ হইয়া এক অজ্ঞাত অপরিচিত লোকে উপস্থিত হয়। এই সময়ে শ্রুতি-স্মৃতি-নির্দ্দিষ্ট গুরুবোধিত মার্গে বিশ্বাসভরে চলাই মানবের পক্ষে কর্ত্তব্য। যে মহাত্মারা আধ্যাত্মিক রাজ্যের অভিনব মার্গে কিয়দ্দূর অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন, তাঁহাদের আহ্বান শুনিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলে ততদূর ভয়ের কারণ থাকে না। নচেৎ একাকী কোথায় কুপথে গর্ত্ত কান্তারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে নৈরাশ্যে ও অবসাদে মরিবার সম্ভাবনা। একাকী ঘনতিমিরাবৃত বিশাল তামিস্রলোকে প্রবেশ করিয়া ভয়ে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। সেখানে সূর্য্যের আলোক নাই, চন্দ্রের জ্যোৎস্না নাই, দীপালোকের ক্ষীণ রশ্মি নাই। সেখানে আকাশে নক্ষত্র নাই, শূন্যে খদ্যোতিকার মুহূর্ত্ত স্ফুরণও নাই। সেই সূচীভেদ্য নিবিড় তমোরাশি কতযুগ ধরিয়া মানবের মুক্তির পথ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, কে বলিবে? মানব তত্ত্বান্বেষী হইয়াও কতযুগ সেই তত্ত্বের অনুসন্ধান পায় নাই, পথ ভুলিয়া ব্যাকুল ও অবসন্ন হইয়া তিমিরগর্ভে নিরাশ হৃদয়ে কত কাঁদিয়াছিল, তাহা এখন কে স্মরণ করিবে? সেই অন্ধকারেই বুঝি আত্মা পরমাত্মার সহিত মিলন বাসনায় অভিসারোদ্যত! তাই আমরা আজিও শুনি—"চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্—ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী"। চল, সখি সেই তিমিরপুঞ্জে আবৃত সেই কুঞ্জে গমন করি—সেই হৃদয়কুঞ্জ যে সেবিত স্থানে অধিষ্ঠিত। সেখানে সেই তিনি যে—"নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদুবেণুম্" নামগ্রহণপূর্ব্বক, অতি আদরে মৃদু মৃদু বেণুধ্বনি-সহকারে আহ্বান করিতেছেন। তাহারই সহিত সঙ্গমেচ্ছায় কাতর আত্মা—"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বন-ভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃনক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়"—এই উপদেশ মত হৃদয়যমুনার কূলে সেই শ্রীমন্দিরে কতই না কেলি করিয়াছিল! কিন্তু সাধারণ মনুষ্য ঐ তিমিরান্ধ মার্গে চলিতে ভয় পায়—শক্তির অভাবে পদস্খলন হইয়া থাকে। তখন অন্ধ বুদ্ধি আত্মার ভ্রান্তি ও ব্যাকুলতা বৃদ্ধি করে। প্রিয়তমের নিকট অভিসারে সে সখীর কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। তখন মোহ তাহাকে আচ্ছন্ন করে, অবিশ্বাস তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। এইরূপে কতকাল কতযুগ হাহাকারে কাটিয়া যায়। অবশেষে একদিন কোথা হইতে দূরস্থ দীপ্তরশ্মির ন্যায় কি যেন চক্ষে ঠেকে—ধ্রুবতারার একটি কোমল সূক্ষ্ম স্বর্ণকিরণ প্রপাতের ন্যায় কি যেন হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া আলোকিত করে। বিশ্বাসের বর্ত্তি পুনরায় জ্বলিয়া উঠে। আশার সঞ্চার হয়। তখন অপার্থিব নয়নে চাহিয়া দেখি, কোথায় সে অন্ধকার? কোথায় সে নৈরাশ্য ও বিভীষিকা? তখন বিমল স্নিগ্ধ আলোকে দশদিক্ হাসিতেছে, যেন শত শশধর গগণে সমুদিত। কোটি বসন্ত কুসুমামোদে চতুর্দ্দিক আমোদিত, অনাবিল আনন্দস্রোতের মন্দ সমীরণে দেহ মন তৃপ্ত, অনন্ত সত্য সঙ্গীতধারা কর্ণযুগল আপ্যায়িত করিতেছে। তখন বুঝিতে পারি, সে অন্ধকার অজ্ঞানের। তাহা বাস্তব নহে। সে অন্ধকার দিব্যদৃষ্টির বিঘাত উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। যাহারা প্রেমময় ভগবানের প্রতি প্রেমযুক্ত নহে, তাহারা তাঁহার উজ্জ্বল চরণপ্রভায় বঞ্চিত হইয়া মনের অন্ধকার দূর করিতে কদাচ সমর্থ হয় না। তাহারা পেচ-

যাহারা জ্ঞানভক্তিশূন্য, যাহাদের ইহলোকই সর্ব্বস্ব, পরলোকে যাহাদের অনাস্থা, যাহারা নাস্তিক, অবিশ্বাসী, কুতার্কিক, বেদ ও স্মৃতি মানে না— অনাত্মজ্ঞ, আত্মঘাতী, তাহারাই ঐ অনন্ত অস্থর্য্য অন্ধতামিস্রগর্ভে চিরমগ্ন থাকে। তখন বুঝিতে পারি যে, তত্ত্বজ্ঞানী ভগবদ্ভক্তের জীবন সত্যতত্ত্বের নিত্যজ্যোতিতে চির উদ্ভাসিত।

এই মহাতত্ত্বের মীমাংসা ও প্রচার আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কত যুগের সাধনায় আমাদিগের— কেবল আমাদিগের কেন, মানব মাত্রেরই মুক্তির জন্য করিয়া গিয়াছেন। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের সমগ্র তত্ত্ব—সৃষ্টি ও আত্মতত্ত্ব আর্য্যশাস্ত্রের প্রতিপৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে। দেশ বিদেশে মুক্তকণ্ঠে আত্মপর-নির্ব্বিশেষে এই মহাবাণী আদিকাল হইতে ঘোষিত হইয়াছে। তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র আশ্রয় করিয়া কত দেশ, কত জনপদ ধন্য হইয়াছে। কত জাতি তাহা ঈশ্বরের বাণী বলিয়া মাথায় তুলিয়া লইয়াছে। আর আমাদিগের দেশে ঐ মহাদান অকাতরে অজস্রধারে তপোবনে তপোবনে আশ্রমে আশ্রমে বিতরিত হইয়াছে। অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্ঞানলহরী পূত মন্দাকিনীধারার ন্যায় অবিরল প্রবাহে বহিয়া গিয়াছে! ঋষিগণ দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ঐ পুণ্য জ্ঞানামৃত আপামর সর্ব্বসাধারণকে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন; উহা যে হতভাগ্য অসহায় জীবের একান্ত এবং অনন্য শরণ—ভবপারের একমাত্র উপায়, সংসারের আবর্ত্তভীষণ তরঙ্গবিক্ষোভিত সমুদ্রবক্ষে সহস্রক্ষেপণীবাহিত অচঞ্চল তরণী! পুরাণের গল্পকথায়, ইতিহাসের উপদেশে, স্মৃতির শিক্ষায় ঐ অমূল্য অভয়বাণী তূর্য্যধ্বনির ন্যায় নিনাদিত। বুঝি অনন্তজ্ঞান, অনন্ত সত্যের ধারণা করিতে সামান্য মনুষ্য অক্ষম বলিয়া, অনন্তের কৃপায় উহার অনন্ত বিকাশ! সেই সত্যজ্ঞানময় অনন্ত কোথায় ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ মানব-মনের উপযোগী তাঁহার বিরাট্ বিশালতায় মহাতাপসের গ্রহণযোগ্য বিরাট্‌মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। সেই পরম জ্যোতিঃ তাঁহার পরম করুণায় আমাদের নয়নসমক্ষে অভীষ্ট দেবতারূপে নিত্য প্রতিভাত রহিয়াছেন। পাছে আমরা চক্ষু না মেলি, পাছে নয়ন অন্যদিকে ফিরাইয়া লই, তাই বুঝি শব্দরূপ ধারণ করিয়া বাঙ্ময় হইয়া, প্রতিমুহূর্ত্তে কর্ণগোচর হইতেছেন। করুণাময় পিতার ন্যায় অবোধ আমাদিগের পরিত্রাণের জন্য, আমাদিগকে আদরে আহ্বান করিয়া কত অতীতযুগে কত কি বুঝাইয়াছেন, কত কি শুনাইয়াছেন, আজিও সে বাণী নীরব হয় নাই, আজিও সেই শ্রুতি শ্রূয়মাণ রহিয়াছে এবং চিরকাল থাকিবে। সেই অনন্তকণ্ঠে গীয়মান অনন্ত সঙ্গীতোচ্ছ্বাস মানবের কর্ণে আজিও প্রবেশ করিতেছে! ঐ শুন শব্দব্রহ্মের অপূর্ব্ব বিবর্ত্ত পরমকরুণাময় ভগবানের স্বর্গীয় আশ্বাসবাণী— মনুস্মৃতি, গীতা ও উপনিষৎ—এখনও জগদ্বাসীর মুগ্ধকর্ণে অনুরণিত হইতেছে। আমরা অদ্য কেবল মনুস্মৃতি সম্বন্ধেই দুই একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। মনুস্মৃতিতে কি আছে? বেদানুবাদিনী এই স্মৃতিখানিতে সনাতন বেদগীতির মূর্চ্ছনা মধুররাগে বাজিয়াছে। মানবের আদি জ্ঞেয়তত্ত্ব এই স্মৃতিমধ্যে গীত হইয়াছে। মনুস্মৃতিতে প্রথমেই সৃষ্টিতত্ত্বের উল্লেখ আছে, এবং তাহা অতি বিশদভাবে বুঝান হইয়াছে। এমনটি বুঝি আর কোথাও নাই! সৃষ্টির যে গূঢ়তত্ত্ব জানিবার জন্য মহর্ষিরা যুগযুগান্ত ধরিয়া প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, সেই সৃষ্টিরহস্য মনুসংহিতায় স্পষ্টভাষায় পূর্ণভাবে বিবৃত হইয়াছে। যে আত্মতত্ত্ব জীবের মুক্তির একমাত্র হেতু, তাহাও এই গ্রন্থের দ্বাদশাধ্যায়ে এবং সৃষ্টিপ্রসঙ্গে প্রথমাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

মনুস্মৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ। অধার্ম্মিককে ধর্ম্মে প্রবৃত্তি, ধার্ম্মিককে ধর্ম্মের বিশেষ জ্ঞান এবং চিত্তশুদ্ধি

মোক্ষোপদেশ দান করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। দুঃখের প্রহাণেচ্ছা অত্যাধিক বলবতী হইলে, স্বর্গাপবর্গ-কামীব্যক্তিগণের জন্য সকাম ও নিষ্কাম ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং তাহাদের ফল-পার্থক্য শিক্ষাদান করাই স্মৃতির একমাত্র উদ্দেশ্য। শমদমাদি সাধন সম্পৎ, ভোগবিরাগ এবং জিজ্ঞাসা, এই সকল না থাকিলে আত্মতত্ত্বোপদেশফলবান্ হয় না। ধর্ম্মাধর্ম্মের পরিজ্ঞান, ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং অধর্ম্মের অননুষ্ঠান অনাসক্ত চিত্তের নির্ম্মলতা সম্পাদন করিয়া জীবকে মোক্ষের অধিকারী করে। অতএব স্মৃতি-শ্রেষ্ঠ "মনুসংহিতা" যথাযথরূপে অধ্যয়ন করা প্রত্যেক আর্য্যসন্তানেরই একান্ত কর্ত্তব্য। এই গ্রন্থে অতি দুরূহ সৃষ্টিতত্ত্ব যেমন বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তৎপ্রসঙ্গে আত্মতত্ত্বেরও সেইরূপ সুন্দর আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থের আরম্ভে ও অবসানে আত্মজ্ঞানোপদেশ সর্ব্বতোভাবে মনুস্মৃতির উপযোগী হইয়া উহার আদর শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছে। মনু ধর্ম্মোপদেশ কালে চাতুর্ব্বর্ণ্যের উৎপত্তি, চাতুর্ব্বর্ণ্যের মধ্যে কোন বর্ণের কিরূপ সংস্কার, চাতুর্ব্বর্ণ্যগত মূল ৩৬ জাতি এবং তাহাদের পরস্পর মিলনে উৎপন্ন অসংখ্য জাতি নিচয়ের কাহার কোন্ বর্ণীয় সংস্কার হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কি প্রকারে, কোন্ সময়ে ঐ সংস্কার কর্ত্তব্য, চাতুর্ব্বর্ণ্যের পরস্পর সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্য কি, তৎসমস্তই মনুসংহিতায় বিবৃত হইয়াছে। ধর্ম্ম কি, সদাচার কাহাকে বলে, অধর্ম্মই বা কি, তাহা এই গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। অধর্ম্ম হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে হইলে, সদ্বৃত্ত, সদাচার ও ধার্ম্মিক হইতে হইলে, সংসারের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়োচিত বুদ্ধিলাভ করিতে হইলে—এক কথায় প্রকৃত 'মানুষ' হইতে হইলে এবং মানুষ হইয়া পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে হইলে, প্রত্যেক আর্য্যসন্তানেরই ধর্ম্ম ও পরমধর্ম্ম নির্দ্দেশক মনুর শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

পরন্তু করুণাময় ভগবান মনু নিখিল সংসারের

ভাগ কর্ম্মী পূর্ব্বপুরুষগণের ফলে আমরা—অকৃতী, অধন্য, অপুণ্য হইয়াও এই অমূল্য নিধির অধিকারী হইয়াছি। কিন্তু কালবশে ঐ নিধি অপহৃত হইবার উপক্রম হইয়াছে। দরিদ্র আর উহাকে আপনার বলিতে পার না। শত সহস্র ধর্ম্ম-পিপাসু নরনারী আজি উহার দর্শন-সৌভাগ্য হইতেও বঞ্চিত। তাহাদের প্রাণের বাসনা উত্থানমাত্রেই বিলীন হয়। আবার কত হতভাগ্য ব্যক্তি উহার আদর না বুঝিয়া, উহাকে হাতে পাইয়াও, মস্তকে ধারণ করিবার পরিবর্ত্তে, তুচ্ছজ্ঞানে অবজ্ঞার সহিত দূরে নিক্ষেপ করে। এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন অত্যাবশ্যক। আমরা মনুসংহিতা এবং অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থের উল্লেখ করিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেরই এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। অদ্য মনুসংহিতাই আমাদিগের আলোচ্য। ভবিষ্যতে অন্যান্য গ্রন্থের কথা উত্থাপন করিব। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ যেন মানবধর্ম্ম-পিপাসিতের পিপাসা শতগুণ বর্দ্ধিত করে। আমাদিগের ইহাই উদ্দেশ্য যে, যেখানে আজ এই অমূল্য গ্রন্থের অনাদর ও অমর্য্যাদা দেখিতেছি, যেন অনতিকালের মধ্যে সেইস্থানে এই গ্রন্থের প্রতিষ্ঠা, সমাদর ও পূজা দেখিতে পাই। সংসারের মোহ-আবর্ত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে একবারের জন্য ও যেন লক্ষ্য স্থির করিতে পারি, লক্ষ জীবনের লক্ষ্যীভূত সেই এক লক্ষ্যের দিকে ক্ষণকালের জন্যও যেন মন আকৃষ্ট হয়, সংসারের শত চিন্তার মধ্যেও যেন আত্মচিন্তা একেবারে বিসর্জ্জন না দিই। কে আমি, কোথা হইতে উৎপত্তি, কে আমার ও এই পরিদৃশ্যমান জগতের স্রষ্টা, কি করিলে তাঁহাকে পাইব, সন্তান আমি, আমার সেই করুণাময় জগৎপতি পিতার নিকট কিরূপে যাইব? হৃদয়ের প্রেম ও ভক্তি কবে অঞ্জলি পূরিয়া তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া জীবন ধন্য করিব?—ইত্যাদি চিন্তা যেন মনোমধ্যে উদিত হয়। এরূপ ভাবমাত্রেও জীবন

না পারি, তাহা করিবার আকাঙ্ক্ষা যেন পরিত্যাগ না করি। পাঠকগণের মধ্যে বোধ হয় সকলেই কোন না কোন সময়ে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, একটু পরমার্থ-বিষয়ক চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হইলেই, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার একটি ক্ষীণ ক্ষুদ্র লহরী হৃদয়ে উত্থিত হইলেই, আমরা কত আনন্দ ও কিরূপ অনির্ব্বচনীয় পূর্ণতা অনুভব করি। তখন আমাদের হৃদয় আমাদের অজ্ঞাতসারেই স্ফীত, পূর্ণ ও প্রসারিত হইয়া পড়ে। মহত্ত্ব ও পুণ্যের প্রশান্ত উদার ভাব আমাদিগের হৃদয় যেন প্লাবিত করে,—আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়া পুলকিত হই। কলুষ-নিগড় আপনি খসিয়া পড়ে এবং মুহূর্ত্তের জন্যও আপনাকে অকলঙ্ক, পবিত্র ও দেবতুল্য মহাভাগ্যবান্ বলিয়া জ্ঞান হয়। সে এক মহাসুখ—মহা আনন্দের অবস্থা; "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভম্ মন্যতে নাধিকং ততঃ"—পৃথিবীতে তাহার তুলনা নাই। সে বুঝি বিমল ব্রহ্মানন্দেরই অস্পষ্ট অনুভূতি, চিদানন্দসাগরের দূরাগত বেলাবিলীন ক্ষীণ লহরী। আমরা ঐ আনন্দ সাগরের পথ হারাইতে বসিয়াছি, কিন্তু তাহা হারাইলে চলিবে না—আমরা তাহা হারাইতে দিব না—অন্ধ, খঞ্জ, বধির, যে যেমনই হই না কেন, পরস্পরের সাহায্যে যেরূপে পারি, পথ চিনিয়া লইব। আইস, অগ্রসর হই; "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"— সুতরাং ভয় কি?

দ্বিরাগমনের ফর্দ্দ।

[শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী, কবিরাজ।]

বাঁচিয়া থাকিলে অনেক দেখা যায়, অনেক ঠকিতে হয়, অনেক শিখিতেও পারা যায়! আমার এই অর্দ্ধশতাব্দী পরিমিত জীবনের ভিতর,দ্বিরাগমনের ফর্দ্দ কখনও দেখি নাই—শুনিও নাই! এমন নুতন জিনিষটা আত্মীয় স্বজনদিগকে বঞ্চিত করিয়া, কেবল নিজে উপভোগ করিলে অধর্ম্ম হইবে। তাই এই নূতন আবিষ্কারের আবিষ্কারক মহাত্মাকে আমার অল্লাধিক ধন্যবাদ দিয়া, ধন্বন্তরির পাঠকবর্গকে তাহা অবগত করাইবার জন্য, সেই আবিষ্কার-তত্ত্ব প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অবান্তর কথায় পাঠকের উৎকণ্ঠা বাড়াইব না। সর্ব্বাগ্রে সেই অদ্ভূত আবিষ্কার—অপূর্ব্ব সামগ্রী ফর্দ্দখানি দেখুন—

"মাননীয়া বৈবাহিকা ঠাকুরাণী। * * * শ্রীমতী * * * দেবী মাতার শুভ দ্বিরাগমন জন্য এ পর্য্যন্ত দিনস্থির করিতে পারি নাই। দ্বিরাগমনের দিন নাই, তবে স্বামির সঙ্গে আইলে কোন দোষ হয় না। বাবাজীবন পরিক্ষার এধারে কদাচ জাইবে না। তজ্জন্যে কিছু এ পর্য্যন্ত নিশ্চয় করিতে পারি নাই। তবে এইমাত্র আপনাকে জানাইয়া রাখিতেছি—ফাল্গুন মাহার শেষ নাং যে কোন তাং শুভ দিন নিশ্চয় করিয়া ইহার পর আপনাকে সংবাদ লিখিব। * * * * ফলে আপনি তাহার অনুষ্ঠানে থাকিবেন। আমার মাশতুতো ভাইয়ের * পুত্রবোধুকে দ্বিরাগমন করাইয়াছে তাহারা যেমতভাবে দ্রব্যাদি দিয়াছে তাহার কম করিয়া দিলে আমাকে বড় গঞ্জনা সহ্য করিতে হইবে সম্ভবত তাহারা ২০০৲ টাকার দ্রব্যাদি দিয়াছে। আপনি দ্রব্যাদি যাহা দিবেন তাহা ছাড়া ভারের (মিষ্টান্নের) জন্য অন্তত ১০০৲ শত টাকা দিবেন। আপনি না দিলে আমাকে অনেক কথা সহ্য করিতে হইবে। আমি এ

বিষয়ে পাইবার আশা করি নাই তবে জন সমাজে কথা বলিতে ছাড়িবে না। আপনি বিবেচক, আপনার বিবেচনায় কোন বিষয়ে ত্রুটী হইবে না আশা করি।

পুঃ—গ্রামের ব্রাহ্মণীগণ আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবে তাহাদিগকে অবস্থাবিশেষে প্রণামী দেওয়া হয়।"

কেমন? নূতন জিনিষ নহে কি? পত্রখানি পড়িয়া মনে হয় না কি,—ইনি আর 'এক নম্বর বরের বাবা?' এত কাল বরের বাবা পুত্রের বিবাহ কালেই প্রাপ্যগণ্ডার ফর্দ্দ দিতেছেন। কন্যাকর্ত্তাও তাহা অবশ্য দেয় ভাবিয়া, পৈত্রিক ভিটা মাটী উৎসন্ন করিয়াও তাহা দিতে বাধ্য হইতেছেন! আবার পাড়ার পাঁচজন বরের বাবার অত্যাচারের কথার আলোচনা করিলে, কন্যাকর্ত্তাই তাহার প্রতিশোধ-ক্রিয়া পর্য্যন্ত নীরবে সহ্য করিতেছেন! এ সব অবশ্য পুরাতন ও 'গা-সহা' হইয়া গিয়াছে! কিন্তু এই নম্বরটী যে নূতন প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা একালের এই সুশিক্ষিত—সুসভ্য (?) সমাজেরও অদৃষ্টপূর্ব্ব—অশ্রুতপূর্ব্ব—অচিন্তিতপূর্ব্ব!

ইনি পুত্রের বিবাহ দিবারকালে ক'নের বাবার কাছে পঁহুছিতে না পারিয়া, কন্যার বিধবা মাতাকেই নগদ এক হাজার টাকার ও দেড় হাজার টাকার ফর্দ্দ দিয়া, এফ্, এ, পড়া পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন! দান সামগ্রী প্রভৃতি তাঁহাদের উপরি লাভ! গরীব বিধবা তাহাও যথাসাধ্য দিতে ত্রুটী করেন নাই। তথাপি তাহা বাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্রই না কি প্রবল প্রতাপ 'বেয়ান ঠাক্রুন' পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া স্বয়ং ক্রোধাগারে আত্মগোপন করিয়াছিলেন! চব্বিশ পরগণা হইতে বাঁকুড়া পর্য্যন্ত ফুলশয্যার দ্রব্য-সম্ভার লইয়া যাওয়ার অসুবিধা ভাবিয়া, বরকর্ত্তা তাহার দাম হিসাব করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাহাও না বেচারী পুনর্ব্বার ফুলশয্যার দ্রব্য পাঠাইয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে দুর্জ্জয় ক্রোধ তাহাতেও দূরীভূত হয় নাই! তাহারই ফলে বর-কন্যা ফুলশয্যার আনন্দভোগে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। আজ প্রায় দুই বৎসর এই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। প্রতি পর্ব্বে বিধবা শাশুড়ী জামাতার তত্ত্ব করিতে ত্রুটী করিতেছেন না। কিন্তু বরের বাপ-মা এতাবৎকাল কখন কোনরূপে বধূর তত্ত্ব লইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই! শুনিতে পাইতেছি,—বর বেচারা নিতান্ত আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও পিতামাতার শাসনে অদ্যাপি স্বকীয় সপ্তদশ বর্ষীয়া যুবতী পত্নীর সহিত পরিচিত হইবারও অবসর পাইতেছে না! তারপর মেয়ের মা মেয়ের দ্বিরাগমনের প্রার্থনা জানাইয়া, তাহার মহামহিম বৈবাহিকের নিকট হইতে যে উত্তর পত্র পাইয়াছেন, তাহাই আমরা উপরে অবিকল প্রকাশ করিয়াছি।

এহেন কীর্ত্তিমানের নাম-ধাম গোপন করিয়া, আমরা তাঁহার নিকট অপরাধী হইতেছি, সন্দেহ নাই। আশা করি, এ ত্রুটী তিনি ক্ষমা করিবেন। পাঠকগণ এইটুকু জানিয়াই তৃপ্ত হইবেন যে, এই বৈবাহিক ঠাকুরটী বাঁকুড়া জেলা অলঙ্কৃত করিয়াছেন! 'বি, এন, আরের' অনুগ্রহে এখন বাঁকুড়া কাহারও অপরিচিত নহে। কিন্তু অল্প দিন আগেও লোকে জংলা দেশ বলিয়া বাঁকুড়ার প্রতি অবজ্ঞা করিত, এবং অসভ্য আচার-ব্যবহারের জন্য সে দেশে কন্যা পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত হইত না। সেই শাল-বনশোভিত অসভ্য বাঁকুড়া, জানি না, কোন্ পুণ্যফলে এহেন রত্নলাভে ধন্য হইতে পারিয়াছে! বৈদ্য সমাজের অবিদিত নহে যে, এই অসভ্য বাঁকুড়াসমাজ একদিন বরপণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া, সমস্ত সভ্য সমাজকে লজ্জিত করিয়াছিল! বলিতে কি, এই বরের বাবাটীও তখন কন্যাদায়ের তাড়নায় সেই বরপণনিবারিণী সভার

বস্তুতঃ বরপণ নিবারণ বাঁকুড়া সমাজেরই অনায়াসসাধ্য ; কেন না, সে দেশের লোক আমাদের মত অন্নহীন নহে। আমাদের এই বৈবাহিকপ্রবরটীও প্রায় শতাধিক বিঘা জমীর অধীশ্বর। তাঁহার উপর জাতীয় বৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জনও অল্প করেন না। এই অর্থলোভই বুঝি ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে ? অথবা, উহার পত্রের প্রতি ছত্রে যেরূপ লাঞ্ছনা-গঞ্জনার আশঙ্কা দেখা যায়, তাহাতে মনে হয়,—তিনি তাঁহার কর্ণধারের পীড়নেই হয়ত বৈদ্যত্ব, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছেন! কারণ যাহাই হউক, লোকে তাহার অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিতে নিবৃত্ত হইবে কেন ? দুইবৎসর পরেও তাঁহার নিকট-কুটুম্ব বিধবা বৈবাহিকার আর্থিক অবস্থা জানিতে বাকী আছে কি ? বিবাহকালে কন্যার মাসী যে সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া ভগ্নীকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহাও বোধহয় তাঁহার কর্ণগত হইয়াছে ? তথাপি কোনও ভদ্রসন্তান তাঁহার এইরূপ ভয়ঙ্কর আদেশের সমর্থন করিতে পারিবেন কি ? কন্যাপক্ষ সমর্থ হইলেও, এরূপ দাবি ভয়ঙ্কর না হইতে পারে, কিন্তু তাহাও যে অভদ্রোচিত বলিয়া নিন্দনীয় হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু হায়রে স্বার্থ! আর হায়রে অর্থ !!

এখন এই মহাপুরুষকে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারিনা কি,—তিনি তাঁহার কন্যাদায়ে কত টাকা নগদ, কত টাকার গহনা দিয়া, কত টাকারই বা দ্বিরাগমন করাইয়াছিলেন ? তিনি ত এই কন্যার বিধবা মাতার, বা কেরাণী ভ্রাতার মত অর্থহীন ও অসমর্থ নহেন! নিজে যাহা পারেন নাই, পরের প্রতি সেই পীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা মনুষ্যোচিত হয় কিনা, তাহাও আমরা তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি। আর তিনি যেমন কোন আশা না করিয়াই কেবল লোকনিন্দা ভয়ে তাঁহার করিয়াছেন, আমরাও তেমনি এই সদাশয় ও সহৃদয় বৈবাহিক ঠাকুরের নিকট কোনরূপ প্রতিশোধের প্রত্যাশা না রাখিয়াই কেবল লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে এই ঘটনা প্রকাশ করিতেছি। এই পোড়া পৃথিবীতে মানুষের রকমেরও অভাব নাই! কত বীরপুরুষ বাহিরে অবজ্ঞাত হইয়া, শেষে ঘরের লোকের উপর অযথা অত্যাচার দ্বারা সেই ক্রোধের উপশম করেন! আমাদের এই 'বৈবাহিক' পুঙ্গবটীও আমাদের আলোচনায় উত্যক্ত হইয়া পাছে তাহার নিরপরাধা নববধূটীর প্রতি অত্যাচারের অভিপ্রায়ে পুত্রের পুনর্বিবাহের আয়োজন করেন, সেই আশঙ্কায় আরও একটী কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি।

'বৈবাহিক' মহাশয়ের পত্রখানি যে এইরূপে প্রচারিত হইল, তাহা তাঁহার 'বৈবাহিকা' অথবা তৎপক্ষীয় কোন আত্মীয়-স্বজন আজিও বোধ হয় জানিতে পারেন নাই। পত্রখানি খোলা পোষ্ট-কার্ডে লিখিত ছিল বলিয়াই, এই দুর্মুখের দৃষ্টিতে অনায়াসে পতিত হইয়াছিল। বৈদ্যসমাজের দুর্ভাগ্যবশতঃ এখনও কোন দেশে দ্বিরাগমনের ফর্দ্দ প্রচলিত হয় নাই। এই পত্রের আদর্শ সমাজে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে এবং আমার প্রবঞ্চক বৈবাহিককে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে, এই অপূর্ব্ব পত্র অপহরণ ও মুদ্রিত করিবার লোভ পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। অতএব এই অপরাধের জন্য একমাত্র আমি ভিন্ন আর কেহ দায়ী নহে। প্রকাশের স্থান দান করিয়া, ধন্বন্তরি সম্পাদকও হয় ত সেই অপরাধের অংশভাগী হইলেন। অতএব 'বৈবাহিক' মহাশয়ের প্রতি আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে—তাঁহার রুষ্টলোচনের উষ্ণতাপ যেন আমাদিগকে ছাড়িয়া অন্যত্র না নিক্ষিপ্ত হয়। পত্রের প্রতি ছত্রে তাঁহার সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়াছি। আশা করি, আমাদের এই সত্য কথাও তিনি বিশ্বাস করিতে

মহারাজ রাজবল্লভ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

[শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী কবিরাজ।]

একালের ধনকুবেরগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, যে মহারাজ রাজবল্লভ ধনৈশ্বর্য্যের ও সম্মানগৌরবের চরম সীমায় উপনীত হইয়াও, কখন বিলাস-ব্যসনের ছায়া স্পর্শ করিতেন না।

পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত একটী কিংবদন্তী শুনিলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা,—"একদিন পুত্রাদির সহিত রাজবল্লভ মধ্যাহ্নে আহার করিতে বসিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রথমা পত্নী শশীমুখী তাহাদিগকে পরিবেশন করিতেছেন। রাজবল্লভের চতুর্থ পুত্র রতনকৃষ্ণের পাতে সরু চাউলের ভাত দেখিয়া, রাজবল্লভ বিদ্রূপের স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'রতনের পাতে নারকোল কোঁড়া কেন গো?' পত্নী লজ্জিতা হইয়া স্বামীকে জানাইলেন,—'মোটা চাউলের ভাতে রতনের অসুখ হয়, এইজন্যই সরু চাউলের ভাত দেওয়া হইয়াছে।' বলা বাহুল্য রাজবল্লভ ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, রতনকৃষ্ণকে নিজের কাছে রাখিয়া মিতাচার শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহার সংসারের আচার ব্যবহারে যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না কি? ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠান ও বৃদ্ধি পাইতেছিল। লক্ষ শিব, কোটী শিব* প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানাবিধ সৎকার্য্যের পরে প্রভূত অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যয় কিরূপে হইবে, পণ্ডিতগণের নিকট তাহার উপদেশ প্রার্থনা করায়, কর্ণাট দেশীয় কোন পণ্ডিত তাঁহাকে অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম ও বাজপেয়াদি যজ্ঞ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। তিনিও তাহাতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, লালা রামপ্রসাদ সেনের সাহায্যে রাজোচিত আয়োজন করিলেন, এবং সমস্ত দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, রাজা, মহারাজ প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সমাগত ব্রাহ্মণগণ মধ্যে দাক্ষিণাত্য ও কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ, রাজবল্লভকে উপবীত হীন দেখিয়া তাঁহাকে শূদ্রবোধে নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করিতে উদ্যত হইলেন, ও নিরুপবীতের যজ্ঞ কার্য্যে অধিকার নাই বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন। রাজবল্লভ তখন নিজেকে অম্বষ্ঠ জাতীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক বল্লাল-লক্ষণ সেনের বিবাদ ফলে তাহাদের উপবীত ত্যাগের বিবরণ জানাইলেন, ও তাহাদের নিকটেই ইহার প্রতিকার প্রার্থী হইলেন। তখন সকল দেশের সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত একবাক্যে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত গ্রহণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত যজ্ঞ সমাপন করিতে উপদেশ দিলেন। তদনুসারে রাজবল্লভ নিজের জ্ঞাতি-কুটুম্বগণের সহিত যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিলেন এবং স্বদেশীয় বহু অনুগত নিরুপবীতকেও নিজের ব্যয়ে উপনীত করিয়া দিলেন। একদিন জাতিনাশের ভয়ে লক্ষণ সেন তাঁহার অনুগত স্বজাতিবৃন্দকে উপবীত ত্যাগে বাধ্য করিয়া পরিণামে তাহাদের জাতি নাশেরই কারণ হইয়াছিলেন! লক্ষণসেনের সেই ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য আজ আবার রাজবল্লভ সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্যসমাজকে উপনীত করিবার জন্য অসাধারণ যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি"। রামের পাশে রাবণ, কৃষ্ণের পাশে কংস, যুধিষ্ঠিরের পাশে দুর্য্যোধন, ইহাই বুঝি বিধাতার ব্যবস্থা? তাই রাজবল্লভের

---

* কুড়াশী নামক গ্রামে যে এককোটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা রাজবল্লভের কীর্ত্তি বলিয়াই পরিচিত। কেহ কেহ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মৃত্যুঞ্জয়কে এই কীর্ত্তির অনুষ্ঠাতা

হইলেন। তাঁহারাও রাজবল্লভের স্বজাতি, স্বদেশী, সমধর্ম্মী ও প্রতিবেশী। তথাপি ঈর্ষ্যার তাড়নায় তাঁহারা রাজবল্লভের অনুষ্ঠিত এই মহৎ উপকারেরও প্রতিকূল আচরণে প্রবৃত্ত হইয়া শূদ্রবৎ নিরুপবীত থাকাই শ্লাঘার বিষয় মনে করিলেন! সেই অদূরদর্শী অসূয়াপরবশগণের বাধা না ঘটিলে, এখন পর্য্যন্ত আর উপবীতহীন বৈদ্যসন্তান পূর্ব্ববঙ্গে দেখিতে হইত না!

সে যাহা হউক, রাজবল্লভের অনুষ্ঠিত এই সমস্ত যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন হইলে, তিনি যাজ্ঞিক পুরোহিত দিগকে তিন লক্ষ টাকা দক্ষিণা দিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের বিদায়-দক্ষিণা প্রত্যেককে পাঁচ শত মুদ্রা প্রদত্ত হইয়াছিল। সেকালের সেই সংস্কৃতচর্চ্চার প্রশস্ত সময়ে সমস্ত ভারতে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কত ছিলেন, তাহা বোধ হয় গণনায় নির্দ্দেশ করাও অসম্ভব। তাঁহাদের মধ্যে কোন দেশের কোন প্রধান পণ্ডিতই রাজবল্লভের অনিমন্ত্রিত ছিলেন না। সুতরাং পাঁচ শত টাকা হিসাবে প্রত্যেকের বিদায়-দক্ষিণার সমষ্টিও সম্ভবতঃ তিন লক্ষের কম হইবে না। রবাহুত ভিক্ষুকদিগকেও তিনি একালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রধান পণ্ডিতের বিদায় কুড়ি টাকা করিয়া প্রত্যেককে দান করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন হস্তী, অশ্ব, গো, নৌকা, পাল্‌কী প্রভৃতি যান-বাহন ও বসন-ভূষণ প্রচুর প্রদান করিয়া, কীর্ত্তিকাহিনী জলন্ত অক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন।

আধুনিক ঐতিহাসিকগণ, প্রস্তরফলকের সাক্ষ্য ব্যতীত কোন কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না! তাঁহাদের বিশ্বাস স্থাপনের জন্য, শ্রীখণ্ডে রাজবল্লভ প্রতিষ্ঠিত ভূতনাথ মন্দিরে যে প্রস্তরফলক আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার প্রতিলিপি এস্থানে প্রকাশ করিতেছি। যথা,—

“প্রাসাদং সমকারয়ৎ নবমমুং শ্রীভূতনাথস্য বৈ
যোঽগ্নিষ্টোমা মহাধ্বরাদি মযজদ্ যো বাজপেয়ী

দাতা শ্রীযুক্ত রাজবল্লভনৃপোঽম্বষ্ঠারবিন্দার্য্যমা
শাকে তর্কমহীগ্ররাগ রজনীনাথে চ মাঘে সিতে॥
১৬৭৬ শকাব্দা ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দ।

শ্রীখণ্ড সমাজে প্রবাদ প্রচলিত আছে,—“রাজবল্লভ, রাঢ়ীয় বৈদ্যসমাজের নিকট উপনয়ন প্রথা জানিবার জন্যই শ্রীখণ্ডে, কড়ুই ও ধাত্রীগ্রাম প্রভৃতি স্থানে আগমন করিয়াছিলেন, এবং সেই সময়েই শ্রীখণ্ডে ভূতনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠায় অভিলাষী হইয়াছিলেন।” অভিলাষ যখনই হউক, তিনি যে উপনীত হইয়া যজ্ঞাদি সমাপনের পর ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত শ্লোক দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে। বিক্রমপুর অঞ্চলের প্রবাদ,—রাজবল্লভ শ্রীখণ্ডেও একটী বিবাহ করিয়াছিলেন এবং সেই শ্বশুরালয়েই ঐ শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজবল্লভের অনন্তরবংশীয় এক বৃদ্ধও নাকি সেই রাজবল্লভপত্নীকে কাশীবাস করিতে দেখিয়াছেন। আজ সে বৃদ্ধ জীবিত নাই। সুতরাং রাজবল্লভের শ্রীখণ্ডে বিবাহ সম্বন্ধে প্রমাণ করিবারও এখন কোন উপায় নাই। শ্রীখণ্ড সমাজে কিন্তু এই বিবাহকথা একেবারেই অপ্রচলিত। অথচ, এইরূপ সমাজবিরোধী বিবাহের ফলে শ্রীখণ্ডেই তাহার অধিক আন্দোলন সম্ভবপর! বঙ্গজ সমাজে কন্যাদানের জন্য শ্রীখণ্ডের কোন বৈদ্যবংশকেও অদ্যাপি সমাজে কোনরূপ গ্লানিভোগ করিতে দেখা যায় না। ভূতনাথ মন্দির রাজবল্লভের শ্বশুরগৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিলে, কোন বৈদ্যসন্তানই আজিও ভূতনাথ দেবের সেবক অথবা তাঁহার দেবোত্তর সম্পত্তির অধিকারী থাকিতেন না কি? এই বিবাহের কারণনির্দ্দেশের জন্যও অনেকে বলিয়া থাকেন,—মেল বন্ধনের কদর্য্য প্রথা নষ্ট করিবার জন্যই রাজবল্লভ ভিন্ন ভিন্ন সমাজে এক একটী বিবাহ করিয়াছিলেন! ইতিহাসে শ্রীখণ্ড সমাজের এই একটী সন্দিগ্ধ বিবাহের উল্লেখ ব্যতীত অপর কোন সমাজের নাম পর্য্যন্ত দেখা যায় না। তাঁহার আর তিনটী বিবাহ বঙ্গজ

সমাজেই হইয়াছিল। সুতরাং একথাও ঐতিহাসিক সত্যের সম্মানলাভের অযোগ্য। তবে, তাঁহার ন্যায় জাতীয় উন্নতিকামীর সদাচারনিষ্ঠ রাঢ়ীয় সমাজের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন অবশ্যই স্পৃহনীয় হইতে পারে, এবং অর্থবলে কোন অপুত্রকের কন্যার পিতাকে কন্যাদানে বাধ্য করাও অসম্ভব নহে। কিন্তু ইহা বিশ্বাস করিবার মত কোন প্রমাণ নাই।

ধর্ম্মপ্রাণ উন্নতচরিত্রের একাধিক বিবাহ, একালের শিক্ষিত সমাজে অবশ্যই নিন্দনীয়। কিন্তু মুসলমান রাজত্বকালে ইহা দোষের বলিয়া বিবেচিত হইত না। তখনকার আমীর-ওমরাহ সমাজে বহুবিবাহ গৌরবের বিষয় ছিল। কেবল সেকালে নহে, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও ধনশালিগণ একাধিক বিবাহের পক্ষপাতী থাকা শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাতেই মনে হয়, রাজবল্লভ মুসলমান আমীরের অনুকরণে একে একে চারিটী বিবাহ করিয়া থাকিবেন। তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহ সম্বন্ধে একটী প্রবাদও পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত ছিল। কোন সময়ে রাজবল্লভ কল্পতরু ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। প্রার্থীর যে কোন প্রার্থনা অবিচলিতচিত্তে পূর্ণ করিতে হইবে, ইহাই এই ব্রতের প্রধান অনুষ্ঠান। ব্রতভঙ্গ করিবার জন্যই হউক, অথবা তাঁহার দৃঢ়তা পরীক্ষার অভিপ্রায়েই হউক, এক ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রথমা পত্নী শশিমুখীকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। রাজবল্লভও ব্রাহ্মণকে হৃষ্টমনে পত্নী সমর্পণ করিয়া ব্রতপালন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ব্রাহ্মণ দান লইয়া যখন বাহিরে আসিতেছিলেন, সেই সময়ে দ্বারদেশে রাজবল্লভের কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণদাস, লক্ষ মুদ্রা মূল্য দিয়া ব্রাহ্মণের নিকট হইতে মাতার উদ্ধার সাধন করেন। কিন্তু দত্তাপহারী হইবার আশঙ্কায় রাজবল্লভ আর শশিমুখীর সংসর্গ না রাখিয়া, দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই কিংবদন্তী অমূলক হইলেও, বিবাহ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, তবে তাহার জন্যও তাঁহার প্রতি কোন দোষারোপ করিতে পারা যায় না।

বস্তুতঃ রাজবল্লভ-চরিত্র আলোচনা করিলে, কোন কার্য্যের জন্যই তাঁহাকে অপরাধী বলিবার উপায় নাই। বিধাতা তাঁহাকে লোভনীয় রূপের অধিকারী করিয়াছিলেন! তথাপি, চরিত্রহীনা ঘেসেটী বিবির নিকটেও তিনি যেরূপ পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষেই সম্ভবপর। অবশ্য, বিদ্বেষান্ধ কৈলাস সিংহ এই প্রসঙ্গে রাজবল্লভের কলঙ্কপ্রচার করিতে ত্রুটি করেন নাই। ১২৮৯ সালের 'বান্ধব' পত্রিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন,—"নিবাইশ মহম্মদ অকালে পরলোক গমন করিলে, আলিবর্দ্দি দুহিতাকে স্বামীর সিংহাসনে স্থিরতর রাখিলেন। এইসময় রাজবল্লভ প্রধান রাজপুরুষ। ক্রমে তাঁহার সহিত বিধবা শাসনকর্ত্রীর একটী ঘৃণিত সম্পর্ক সৃষ্ট হইল। জনৈক বিখ্যাত ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন—'নিবাইশের পত্নীর সহিত রাজবল্লভের যেসম্পর্ক হইয়াছিল, তাহা জাতি-ধর্ম্ম-ব্যবহার ও বিধিবিরুদ্ধ বটে।" এখানে কৈলাস বাবু যে বিখ্যাত ঐতিহাসিকের দোহাই দিয়াছেন, তিনি বোধ হয় অর্ম্ম সাহেব। কারণ অর্ম্ম সাহেবের ইতিহাসে আছে—'লোকে অনুমান করে,—রাজবল্লভের সহিত ঘেসেটী বিবির যেরূপ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, তাহা ঘেসেটী বিবির পদ ও রাজবল্লভের ধর্ম্মানুমোদিত নহে।' কৈলাস বাবু কিন্তু অর্ম্ম সাহেবের 'লোকে অনুমান করে' কথাটী পরিত্যাগ করিয়া, যথেষ্ট সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন! বস্তুতঃ অর্ম্ম সাহেবের কথাও নিতান্ত প্রমাণহীন। যেহেতু সায়র মোতাক্ষরীণে ঘেসেটীর প্রণয়াস্পদগণের নাম পর্য্যন্ত লিখিত আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে রাজবল্লভের নাম দেখা যায় না। বিশেষতঃ নিবাইশের জীবন কালেই ঘেসেটী বিবি যে হোসেনকুলির সহিত অবৈধ প্রণয়াসক্ত ছিলেন,

আকার সাদৃশ্যবশতঃ নজরআলির প্রণয়াসক্ত হইয়াছিলেন, ইহাও সায়র মোতাক্ষরীণে স্পষ্টই লিখিত আছে। সুতরাং লোকের অনুমান বা অর্ম্ম সাহেবের কোনটীকেই সত্য বলা যায় না। প্রধান পুরুষ বা মন্ত্রিপদাভিষিক্ত রাজবল্লভের সহিত ঘেসেটীর অবৈধ সংস্রব থাকিলে, সেই সময়েই তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী নজরআলি সেনাপতির সহিত ঘেসেটীর ঐরূপ সম্পর্ক একবারেই অসম্ভব হইত না কি ?

ঘেসেটীকে বালবিধবারূপে পরিচিতা করিবার জন্য কৈলাসবাবু যে নিবাইশের অকালমৃত্যু ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহাও ইতিহাস বিরুদ্ধ। নিবাইশের মৃত্যুর দুই তিন মাস পরেই তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়দ মহাম্মদের মৃত্যু হয়। সায়র মোতাক্ষরীণ প্রণেতা গোলামহোসেন ইহাঁকে লক্ষ্য করিয়া একস্থানে লিখিয়াছেন,—"তিনি ৬০ বৎসর বয়স্ক প্রবীণ ব্যক্তি" অতএব নিবাইশ যে বৃদ্ধ বয়সেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তৎপত্নী ঘেসেটী বিবিও যে সে সময়ে পরিণত বয়স্কা, তাহাও এই বাক্যেই প্রমাণিত হইতেছে। রাজবল্লভও এই সময়ে প্রৌঢ়। অর্ম্ম সাহেবও লিখিয়াছেন—"নিবাইশের মৃত্যুর পর ঘেসেটী বিবিও এই প্রবীণ কর্ম্মচারী—রাজবল্লভের পরামর্শ মতেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।" প্রসিদ্ধ প্রামাণিক ইতিহাস 'রিয়াজুস্ সেলাতিন' গ্রন্থেও রাজবল্লভের এই অপবাদ সম্বন্ধে কোন আভাস পর্য্যন্ত লিখিত নাই। মুর্শিদাবাদ-কাহিনী লেখক নিখিল বাবুও এই অপবাদ ভিত্তিশূন্য বলিয়াছেন। রাজবল্লভের সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ, সকলেই তাঁহাকে 'শুদ্ধাচারী নিষ্ঠাবান্' বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। তথাপি কৈলাস বাবু যে কি অভিপ্রায়ে এইরূপ কলঙ্ক রটনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহা বোধ হয় বিবেচকগণ অনায়াসেই অনুমান করিতে পারিবেন।

'বান্ধব' পত্রিকায় কৈলাস বাবু লিখিয়াছেন,—"বিশ্বাসঘাতক নরাধম রাজা রাজবল্লভ, ঢাকার রাজকীয় ধনাগার হইতে দুই কোটী টাকা অন্যায়-রূপে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। সিরাজ যখন ঢাকার নেয়াবতীর নিকাশ ও রাজস্ব তলব করেন, তখন কৃষ্ণদাস সেইসকল লইয়া কলিকাতায় পলায়ন করেন। এখন পাঠকগণ বিচার করিয়া বলুন—সিরাজ দুর্ব্বৃত্ত, কি রাজবল্লভ ও তাহার পুত্র কৃষ্ণদাস দুর্ব্বৃত্ত।" আমরা দেখিতেছি—প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ই রাজবল্লভকে কলঙ্কিত করিবার জন্য অসত্য প্রচার করিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্ব্বৃত্ততার পরিচয় দিয়াছেন। অতীত ঘটনা অবগতির জন্য কোন ইতিহাস, প্রবাদ, বা যুক্তির প্রয়োজন হয়; কিন্তু কৈলাস বাবুর এই কথা কোনও মুসলমান ইতিহাসে বা ইংরাজলিখিত ইতিহাসে ইঙ্গিত-আভাসেও উল্লেখিত নাই। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ বা কলিকাতা কোন দেশেই এইরূপ কিংবদন্তীও কেহ কখন শুনিয়াছেন কি না সন্দেহ। যুক্তিবিচারেও ইহা প্রমাণিত হইবার আশা দেখি না। কারণ, আলিবর্দ্দি জীবিত থাকিতেই ঢাকার নাজিম নিবাইশের মৃত্যু হয়, এবং জামাতার পদেই কন্যা ঘেসেটী বিবিকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে তাঁহার দেওয়ানি কার্য্যে নিযুক্ত করেন। সুতরাং নেয়াবতীর নিকাশ তলবের প্রয়োজন হইলে, সিরাজ তাহার জন্য ঘেসেটীকে তলব না করিয়া কৃষ্ণদাসকে হাজির হইতে বলিতেন না। কৃষ্ণদাসও ঘেসেটীর অনুমতি ব্যতীত সে নিকাশ দিতে বাধ্য ছিলেন না। কৃষ্ণদাসের পলায়ন সংবাদ পাইয়া যে সিরাজ তাঁহার অনুসরণার্থ কলিকাতায় যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, তাহারও উদ্দেশ্য কেবল ঘেসেটীর পক্ষচ্ছেদ ব্যতীত আর কিছু মনে হয় না।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র

ছেন,—"আলিবর্দ্দির যখন জীবনাশা ফুরাইয়াছে, সিরাজ মাতামহের কণ্ঠলগ্ন হইয়া শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন, রাজবল্লভ বুঝিলেন,—ইহাই উপযুক্ত সময়। তিনি কৃষ্ণবল্লভকে সংবাদ পাঠাইলেন যে আর কি দেখিতেছ? ঢাকার ধনসম্পদ ও পরিবার লইয়া নৌকাপথে কলিকাতা অঞ্চলে পলায়ন কর।" এই কথাও আমরা কৈলাস বাবুর অনুকূল মনে করিতে পারি না। এখানে 'ঢাকার ধন-সম্পদ' অর্থে নবাবের ধনাগারের ধন নহে, ইহা তাঁহাদিগের নিজের ধনসম্পত্তি। মহারাজ রাজ-বল্লভের ধনাগারও তখন ধনশূন্য ছিল না। তাঁহারা যে ঘেসেটী বিবির পরামর্শদাতা এবং সিরাজের বিরুদ্ধাচারী, তাহা সিরাজও অবগত ছিলেন। এইজন্যই আলিবর্দ্দির মৃত্যুর পর সিরাজের হস্তে তাঁহাদের লাঞ্ছনা অবশ্যম্ভাবী ভাবিয়া তৎপূর্ব্বেই ধনপ্রাণ-মান লইয়া পলায়নের জন্য রাজবল্লভের পুত্রকে সংবাদ দিয়াছিলেন। অতএব এতগুলি যুক্তিপ্রমাণে উপেক্ষা করিয়া, কৈলাস বাবু মিথ্যা কাহিনী প্রচার করাতেই তাঁহার আচরণ সাধু-জনোচিত বলা যায় না।

এবিষয়ে কৈলাস বাবুর উদ্যম ও অধ্যবসায় অপরিসীম। তিনি 'নব্যভারতের' ষষ্ঠ সংখ্যায় আবার লিখিয়াছেন, "(দিল্লীর বাদসাহ) সাহ আলমের সহিত মীরণের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে রাজবল্লভের কোন সংস্রব নাই।" কিন্তু রাজবল্ল-ভের জীবনী লেখক ৺চন্দ্রকুমার রায় লিখিয়া-ছেন—"রাজবল্লভ এই যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন ও সম্রাট্ হইতে 'সমরজঙ্গ' উপাধি পাইয়াছিলেন।" কৈলাস বাবু কিন্তু ইহাতে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া, "এরূপ নির্লজ্জ গ্রন্থকার কুত্রাপি দেখি নাই" বলিয়া যথেষ্ট শিষ্টা-চার দেখাইয়াছেন! মুসলমানবিবরণ জানিবার জন্য যাহা প্রধান ও প্রথম অবলম্বন, সেই বিখ্যাত প্রাচীন ইতিহাস 'রিয়াজুসেলাতিন' ও 'সায়র প্রদত্ত তরবারি খানি এবং সেই তরবারির মূলদেশে খোদিত "আলিগহর" নাম পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করি-য়াছেন, এমন প্রাচীন লোক এখনও দুইএকজন পূর্ব্ববঙ্গে বিদ্যমান আছেন। 'রাজবল্লভ' গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত বি, এল, মহাশয়ও রাজবল্লভ বংশীয়া জনৈক বধূরাণী হর্ম্যমণির গৃহে সেই তরবারি ভগ্ন অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছেন; কিন্তু অত্যন্ত 'জঙ্গ' ধরিয়া মলিন হওয়ার জন্য তাহাতে 'আলিগহর' নামের অস্তিত্ব বুঝিতে পারেন নাই। জপ্‌সা নিবাসী বৃদ্ধ আনন্দকুমার রায় মহাশয় রসিক বাবুকে বলিয়াছেন—"রাজ-বল্লভের সহিত জপ্‌সার রামমোহন কোঠারির পারস্য ভাষায় চিঠি পত্রের আদান-প্রদান হইত, সেই চিঠিতে রাজবল্লভের 'সমরজঙ্গ' উপাধি আমি নিজে দেখিয়াছি।" রামমোহন কোঠারির আবাসস্থল এখন কীর্ত্তিনাশা গর্ভে, সুতরাং সে চিঠি পত্র আর দেখিবার উপায় না থাকিলেও, বৃদ্ধবাক্যে অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ দেখা যায় না। অতএব 'নির্লজ্জ' চন্দ্রকুমার রায়, কি, কৈলাস বাবু, পাঠকগণই তাহা বিবেচনা করিবেন।

সায়র মোতাক্ষরীণে লিখিত আছে,—"১৭৬০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে, মীরকাশেম রাজবল্লভকে বিহারের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করেন।" তথাপি কৈলাস বাবু কোন প্রমাণ না দেখাইয়া, ঐ 'নব্য-ভারতে' লিখিয়াছেন,—"রামনারায়ণ এই সময়ে পাটনার গভর্ণর ছিলেন, তৎপরে সিতাব রায় ঐ পদ প্রাপ্ত হন।" অর্থাৎ রাজবল্লভ ঐ পদে কখনই নিযুক্ত ছিলেন না, ইহাই কৈলাস বাবুর উক্তির উদ্দেশ্য! সায়র মোতাক্ষরীণ প্রণেতা গোলামহোসেন সাহেব স্বয়ং স্বীকার করিয়া-ছেন,—"এই সময়ে রাজবল্লভের চর কর্ত্তৃক ভাগল-পুরের পলায়িত ফৌজদারপুত্র ক্রমে ধৃত হইয়া,

হইবে এ আশা তিনি কেমন করিয়া করিলেন! হায় বিদ্বেষ! কোন্ কুহকে তুমি শিক্ষিত লোককেও এমন বিভ্রান্ত কর, বুঝিতে পারি না!!

ঐতিহাসিক সত্য পদদলিত করিয়া, কৈলাস বাবু আরও একটী অপবাদ রটাইবার অভিপ্রায়ে ঐ 'নব্যভারতেই' লিখিয়াছেন,—"লালা রামপ্রসাদ রায় বোজরগ উমেদপুর ক্রয় করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজবল্লভ চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে "তপে আবদুল্লাপুর ও "আর কয়েকখানি গ্রাম দিয়া, উক্ত পরগণা আত্মসাৎ করেন।" পাঠকগণ পূর্ব্বোক্ত জীবনী পাঠেই অবগত হইয়াছেন যে, রাজবল্লভের সকল কার্য্যেই লালা রামপ্রসাদ রায় দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন—চক্রান্ত করিয়া তাঁহার সম্পত্তি আত্মসাৎ করিলে, তিনি রাজবল্লভের ঐরূপ অনুগত থাকিতে পারিতেন কি? প্রমাণ স্বরূপ আরও একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি,—১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর তারিখে, রাজা নবকৃষ্ণ গবর্ণর জেনারলের নিকট লিখিয়াছিলেন,—"আলিবর্দ্দির শাসনকালে রাজবল্লভ বোজরগ উমেদপুর পরগণার জমীদারী স্বত্ব খিলাত স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" তথাপি, কৈলাসবাবু গায়ের জোরে রাজবল্লভকে এইরূপ কদর্য্য চিত্রে চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সেসমস্ত অমূলক চেষ্টার প্রতিবাদ করিতেও আর প্রবৃত্তি হইতেছে না। বস্তুতঃ রাজবল্লভকে যেরূপ প্রকৃতি দিয়া ভগবান গঠিত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধে ঐ সকল কদর্য্য অভিযোগ নিতান্তই অবিশ্বাস্য। শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে যে রাজবল্লভ নজরাণার জন্য ইংরাজ বণিক্ প্রভৃতির প্রতি অত্যাচার করার কথা লিখিয়াছেন, তাহাও আমরা সত্য বলিয়া মনে করিতে পারি না। ইহা সত্য হইলে, কৃষ্ণদাস ইংরাজের নিকট আশ্রয় লাভ করিতে পারিল্লেন কেন? আর যদি তৎকালনির্দ্দিষ্ট নজরাণা প্রতি কোনরূপ অত্যাচারই করিয়া থাকেন, তবে তাহাকেও বোধ হয় কর্ত্তব্যপালনে দৃঢ়তা ব্যতীত অযথা অত্যাচার বলা যায় না! বিবিধ যাগ, যজ্ঞ, দান, বৃত্তি, দেবপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অসংখ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান দেখিয়া রাজবল্লভের যেরূপ ধর্ম্মপ্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে সেই মহাপুরুষের হৃদয়ে অত্যাচারপ্রবৃত্তি কখনই স্থান পাইতে পারে না!

আজিও গয়াধামের পাণ্ডাগণ "মাছুয়া কান্দা" নামক তালুকের অধিকারী থাকিয়া এবং পুরী ধামের পাণ্ডাগণ "বিহারিপুর" নামক তালুক ভোগ দখল করিয়া, রাজবল্লভের অসাধারণ বদান্যতারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন! ইহা ভিন্ন বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তিনি বৃত্তি দান করিয়া সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলন করাইতেন। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন কিনা, সে কথা ইতিহাসে না থাকিলেও, তাঁহার সংস্কৃত বিদ্যার বিশেষ অনুরাগের বিবরণ সকল লেখকই লিখিয়া রাখিয়াছেন। ঢাকা, জঙ্গিয়া, মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, মুঙ্গের ও বারাণসী প্রভৃতি যে যে স্থানে তাঁহার আবাস বাটী ছিল, তাহার সর্ব্বত্রই তিনি অতিথিশালা নির্ম্মাণ করিয়া, আগন্তকগণকে আশ্রয় প্রদান করিতেন। অতিথিদিগকে শীতকালে শীতবস্ত্র ও গ্রীষ্ম-বর্ষার আতপত্র (ছত্র) দিবার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমরা জানি—অক্ষত যোনি বালবিধবার দুঃখে মানবদেবতা বিদ্যাসাগর মহাশয়ই প্রথম দুঃখিত হইয়াছিলেন! কিন্তু রাজবল্লভের জীবনী পাঠে জানা যাইতেছে,—রাজবল্লভই সর্ব্বপ্রথম বালিকা বিধবার পুনর্ব্বিবাহ প্রদানের বিধিব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়া, তাহার অভয়া নাম্নী বিধবা কন্যার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমস্ত দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী ইহাকে সম্মতি দান করিলেও, কেবল নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ অসম্মত হওয়ায়, এবং সেকালে দেশাচারের প্রভাব একালে হইতেও অধিক থাকায়,

বিখ্যাত বিদ্যাসুন্দর ও অন্নদামঙ্গল প্রণেতা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, তাহার 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"রাজবল্লভের কার্য্য—কীর্ত্তিচন্দ্র নিল রাজ্য, মহারাজা রাখিলা স্থাপিয়া।" ইহার ঘটনা-কাহিনী এইরূপ প্রচারিত আছে, যথা,—ভারত চন্দ্র প্রথমতঃ সম্পন্ন জমীদার ছিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্র কোন কারণে তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার জমীদারী বাজেয়াপ্ত করেন। ভারতচন্দ্র রাজবল্লভের নিকট তাহার বিচারপ্রার্থী হইলে, তিনি কীর্ত্তিচন্দ্রকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

রাজবল্লভের আর একটী কীর্ত্তি—"তালতলার খাল।" তিনি নিজের ব্যয়ে এই খাল কাটাইয়া রাজনগর হইতে ঢাকা যাওয়ায় নৌকাপথ অতি সুগম করিয়াছিলেন। সংস্কার অভাবে সেখাল এখন মজিয়া আসিয়াছে। তথাপি আজিও তাহার প্রবাহের অস্তিত্ব এই কীর্ত্তিমান মহাপুরুষের কীর্ত্তি কাহিনী ঘোষণা করিতেছে। রাজবল্লভের রাজ-প্রাসাদ ও রাজনগর এবং রাজনগরের প্রধান সৌন্দর্য্য পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, সতেররত্ন, একুশ রত্ন, রঙমহল, দেওয়ানখানা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অট্টালিকা সমুহ আজ কীর্ত্তিনাশা গর্ভে! তাঁহার বংশধরগণও এখন ফরিদপুর জেলার পালঙ্গ নামক গ্রামে বাস করিতেছেন! রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস, মীর কাশেমের অত্যাচারে পরলোক গমন করিলে, রাজবল্লভের তৃতীয় পুত্র গঙ্গাদাস পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। এই সময়ে কার্ত্তিকপুরের মুসলমান জমিদারগণ ও 'ড্রবিন' নামক ইংরাজ কুঠিয়াল বহু সম্পত্তি অন্যায়রূপে অধিকার করেন। গঙ্গাদাসের মৃত্যুর পর রাজবল্লভের পঞ্চম পুত্র গোলককৃষ্ণ সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। তিনি স্বার্থান্ধ হইয়া মাতা ও ভ্রাতুস্পুত্রগণকে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করেন। তাহার ফলে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইয়া, সম্পত্তির অধিকাংশ নষ্ট হয়। তৎপরে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে টমসন সাহেব, রাজবল্লভের বংশধর-দিগকে সম্পত্তি বাটোয়ারা করিয়া দেন। কিন্তু তিনি যেরূপ গুরুতর রাজস্বের বিধান করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে বাকী রাজস্বের দায়ে পরগণাসমূহ নীলামে উঠিয়াছিল। নীলামে কেহই তাহা খরিদ করিতে অগ্রসর না হওয়ায়, কোম্পানী ১৲ টাকা মূল্যে সেই নীলাম খরিদ করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে রাজবল্লভের বিপুল ঐশ্বর্য্যও তদ্বংশীয়গণের হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে। আছে কেবল সেই কীর্ত্তিমান পুরুষের বিস্তৃত কীর্ত্তির ক্ষীণ রেখামাত্র! ভগবৎ কৃপায় আজিও তাঁহার বংশধরেরা বর্ত্তমান আছেন, ইহাই বৈদ্যজাতির মহা সৌভাগ্য।

একটী প্রস্তাব।

[শ্রীহেমচন্দ্র সেন গুপ্ত।]

আমি বিদ্বৎসভার একজন অকিঞ্চিৎকর সভ্য। কাহারও অনুরোধ-উপরোধে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হই নাই। কার্য্য উপলক্ষে দূরদেশে বাস করি ; কিন্তু

ছিল, বিদ্বৎসভা ও ধন্বন্তরি পত্রের দ্বারা বৈদ্যসমাজের কতকটা উপকার হইবার সম্ভাবনা, এবং এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই ৮ মাস যাবৎ বিদ্বৎ-সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছি। যে অনুষ্ঠানে ব্যয়

নায়ক,—রায় বিপিনবিহারী গুপ্ত, এম,এ ; আমেদপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী এম, এ বি, এল ; অগ্রদ্বীপের জমীদার রায় রমাপ্রসাদ মল্লিক বাহাদুর, সুয়াপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত কুলদাকিঙ্কর রায়, বি, এল, বাঁচির উকীল সরকার রায় রাধাগোবিন্দ চৌধুরী বাহাদুর—কীর্ত্তিপাশার জমীদার শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার রায় চৌধুরী এবং ঢাকার প্রখ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, তাঁহার সহকারী, সে অনুষ্ঠানে সাফল্য লাভ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে করা দুরাশা নহে। বিদ্বৎসভা যেকয়টী বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, এহেন পদস্থ বৈদ্যসন্তানগণের অধিনায়কত্বে এবং সমগ্র বৈদ্যসন্তানগণের সহানুভূতিতে, এসকল বিষয়ের সুসাধন বড় বেশী কষ্টকর বলিয়া মনে করা উচিত নহে।

তবে বরপণ ও যৌতুকের তিরোধান কল্পে ধন্বন্তরি পত্রে যেরূপ আলোচনা হইতেছে, তাহাতে দেশময় বৈদ্যসন্তানগণের মধ্যে যে একটা আন্দোলনের স্রোত বহিতেছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে ; কিন্তু ইহাতে কতটা সাফল্য লাভ হইতে পারিবে, তাহা বলা দুষ্কর। দেখিতে পাওয়া যায়, যখন যাঁহার কন্যাটি বিবাহের যোগ্যা হইয়া উঠেন, তখন তিনি বরপণও যৌতুকের দোষপ্রদর্শন করিয়া ইহার তিরোধানের অনুকূলে বেশ দশকথা বলেন ; কিন্তু ছেলেটীকে একটা পরীক্ষায় কোনরূপে উত্তীর্ণ হইতে দেখিলে সে কথাটী ভুলিয়া যান,—কেহ তদ্রূপ কোন প্রসঙ্গ তুলিলে বরং অন্য কথা উত্থাপন করিয়া সে কথাটা চাপা দিবারই প্রয়াস পান! মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন লোকদিগের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনই এইরূপ মন্ত্রে দীক্ষিত।

স্নেহলতার আত্মহত্যার অব্যহিত পরে এই বরপণ সমাজ হইতে তিরোহিত করিবার কল্পনার ঘন ঘন সভাসমিতির সংবাদ খবরের কাগজে পড়িয়াছি ; তাহাতে দেখিয়াছি,—বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া কলিকাতার হইয়াছিলেন! যিনি বরপণ গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে সমাজচ্যুত করা হইবে,এরূপ কথাবার্ত্তা পাকাপাকি হইয়াছিল,—নয়? কিন্তু এহেন মনস্বীরাও একটী অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাদের এই উক্তির সার্থকতা প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় পদমর্য্যাদা রক্ষার প্রয়াস পাইলেন না! আজকাল জননায়ক সুরেন্দ্রবাবু 'প্রজাপতি' সমিতি নামক একটা বৈবাহিক সমিতির অধিনায়ক বলিয়া সংবাদপত্রে দেখিতে পাই ; কিন্তু ইহা যে একটী 'সত্যশূন্য সমিতি' খবরের কাগজে ইহাও প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ কুমার ইহার সেক্রেটরী বলিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার হইতে দেখি। সত্যমিথ্যা ঠিক বলিতে পারি না, কলিকাতাবাসী বন্ধুবান্ধবের মুখে শুনি, ইহা জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার নামক একজন সদ্গোপবংশসম্ভূত যুবকের একটী অনুষ্ঠান ; তাহার দুই একটী আত্মীয় ইহার সংশ্রবে আছে। সুযোগ বুঝিয়া সেক্রেটরী মহাশয় সহরে ও মফস্বলে এক একটী অধিবেশন করেন—আর কলিকাতা হইতে বক্তা লইয়া গিয়া বক্তৃতা করেন। সহরে পেশাদারী বক্তার নাম যাহা খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়, তাহার সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। সুতরাং এ সকল হুজুগে বক্তাও যুটিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা বক্তৃতা করেন, তাঁহাদের কথা ও কাজে ঐক্য থাকে কিনা, তাহা দেখাইতে গেলেই গোলমাল,—বন্ধুবিচ্ছেদ, দলাদলি, পরস্পর মুখ দেখাদেখি বন্ধ,—ইত্যাদি ঘটে! জনসাধারণ যে এসকল সংবাদ রাখেন না এরূপ নহে ; কিন্তু ঐশ্বর্য্যশালী মহাশয়েরা চাটুকারের চাটুকারিতার প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া আসল কথা ভুলিয়া যান, এবং অনর্থক অর্থের অপচয় করেন। আমরা শুনিয়া থাকি,—স্থলবিশেষে দৃষ্টান্ত দ্বারাও বুঝিতে পারি যে, 'প্রজাপতি সমিতি'র জ্ঞানেন্দ্র নাথের চেষ্টায় বিনা বরপণে একটী বিবাহ হইয়াছে বলিয়াও শুনা যায় নাই, বরং স্থানে স্থানে কতকগুলি 'ঘটকালীর

আড্ডা দ্বারা বরং বরপণ আদান-প্রদানের পথ কতকটা সুগম হইতেছে! কোন বিষয়ে একটা হুজুক তুলিলে অর্থাগমের পথ যে একটু খোলাসা হয়,আমরা বাঙ্গালীজাতি তাহার সন্ধান বেশ অবগত আছি। হুজুকে গা ঢালিয়া দিতে আমরা বেশ মজবুত।

এসকল বাজে কথার উল্লেখ করিয়া পাঠক-বর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটান আমার উদ্দেশ্য নহে। মূল কথা এই যে, যদি সত্য সত্যই সমাজ হইতে বরপণ ও যৌতুকের অত্যাচার তিরোহিত করা শিক্ষিত সমাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে কোনরূপ সামাজিক শাসনের অনুষ্ঠান করা একান্ত প্রয়োজন। বিদ্বৎসভার সভ্যরূপে বিদ্বৎসভার নিকট আমি নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছা করি। আশা করি, সভা এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা নিরাকরণ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। প্রস্তাবটী এই ;—

বিদ্বৎসভা যে সকল অনুষ্ঠানের অবতারণা করিয়াছেন, বরপণ ও যৌতুক প্রথার তিরোধান তাহার অন্যতম। বলা বাহুল্য, যাঁহারা বিদ্বৎ-সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত আছেন, তাঁহারা যে বরপণ ও যৌতুকগ্রহণ প্রথার বিরোধী, একথা অবশ্যই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে বিদ্বৎসভার সভ্যগণ যদি সকলে এক-মত হইয়া এরূপ বিধি প্রণয়ন করেন যে, যাঁহারা বরপণ অথবা যৌতুক গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের সহিত তাঁহারা আদান প্রদান বন্ধ রাখিবেন, সামাজিক কোনরূপ সংস্রব রাখিবেন না, তাহা হইলে এই নিষ্ঠুর প্রথা সমাজ হইতে বিদূরিত করিবার পথ কতকটা সহজ হইতে পারে। বিদ্বৎ-সভার উভয় বঙ্গীয় সভ্যবৃন্দের এরূপ একতায় সমাজের এই মহা অনিষ্টকর প্রথার তিরোধানের ইহা প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়াই আমার মনে হয়।

আর একটী কথার উল্লেখ করিয়াই আমার

৭০৲ টাকা বেতনে দূরদেশে কার্য্য করি। আমার দুইটী কন্যা ; এপর্য্যন্ত একটিরও বিবাহ হয় নাই। পরিবারস্থ সকলকে লইয়া এই দূরদেশে বাস করিতে হইলে খরচা কুলায় না। সুতরাং দেশেও বিদেশে দুইটী সংসার পুষিতে হয়। পাঁচ টাকা বেতনে চাকরী করিয়া দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি বার মাস বার ক্রিয়া করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার দিন অনেককাল ঘুচিয়া গিয়াছে। তাই ভাবিতে হয়, সমাজের বর্ত্তমান বরপণ ও যৌতুকের নিপীড়ন অক্ষুন্ন থাকিলে আমার ন্যায় শত শত দুস্থ ভদ্রসন্তানের দশা কি দাঁড়াইবে ? এজন্যই এতগুলি কথা বলিলাম। কোনরূপ ত্রুটী হইয়া থাকিলে পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

প্রবন্ধ লেখকের প্রস্তাবের যৌক্তিকথার প্রতি-কূলে কোন কথা বলা যায় বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, এরূপ একটা বাঁধাবাঁধি, কষাকসি সমীচীন বলিয়া বোধ হইলেও কয়জনে এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে অগ্রসর হইবেন তাহাও বলা যায় না। কারণ, স্বার্থের প্রতি প্রখর দৃষ্টিটা,ধনী-নির্ধন সকলেরই অল্প বিস্তর আছে।আজ যিনি ক'নের বাবা রূপে বিরাজমান,—জুজুটীর মত 'আপকে ওয়াস্তে' মন্ত্রের উপাসক,—কাল তিনি যখন বরের বাবারূপে ধিঙ্গী হইবার সুবিধা পাইবেন, তখন তিনি 'সাইলকের' প্রপিতামহ! এক পাউণ্ড মাংস ক'নের বাবা উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেও পরিতৃপ্তি নাই! স্থল বিশেষ এহেন বরের বাবার পুত্র মহাশয়েরা কিরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, গত সংখ্যা ধন্বন্তরির 'মর্ম্ম-স্পর্শী চিঠি' খানা পাঠ করিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। কোন কোন বর বাবাজী এরূপও মনে করিয়া থাকেন যে, এরূপভাবে ক'নের বাবাকে নিষ্পেষিত করিয়া পাণিগ্রহণপূর্ব্বক যেন কনের বাবার মাথাটী ক্রয় করিয়া বসিয়াছেন! কোন কার্য্য, যতই ঘৃণিত,

কনের বাবা যদি তাহার পোষকতা করিতে কুণ্ঠিত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে সম্যক্ শিক্ষা দিবার জন্য আস্ফালন করিতেও কেহ কেহ লজ্জা বোধ করেন না! কিন্তু স্ত্রীকে পিত্রালয়ে যাইবার অধি-হইতে বঞ্চিত করা, অথবা সরলা অবলা বালিকা-দিগকে অন্যান্য প্রকারে নির্য্যাতন করা ব্যতীত শ্বশুরের উপর আর কি অধিকার থাকিতে পারে, সে কথাটা বিবেচনা করিয়া দেখিবার ও তাঁহাদের সামর্থ্য নাই! স্বাধীনতাহীনা অন্তঃপুরবাসিনী বালিকা অথবা কিশোরী এহেন গুণধরদিগের হস্তে নীরবে যে সকল যাতনা সহ্য করে, তাহা দেখিলে নিশ্চয়ই মনে হয় যে, কন্যাদায় মুক্ত হইবার অছিলায় অবলা সরলা বালিকাগুলিকে এরূপভাবে বিলি করা অপেক্ষা নৃশংসতা আর কিছুই নাই। বিশ্ববিদ্যা-লয়ের পুচ্ছ থাকিলেই সে ছেলে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই অনেকে পৈত্রিক ভদ্রাসন পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া চড়াদরে বর ক্রয় করেন; কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এরূপ পুচ্ছধারীদিগের মধ্যে এহেন নৃশংসতার জীবন্ত ছবির অভাব নাই! ইহাদের পুচ্ছ, দীর্ঘই হউক আর লঘুই হউক, মনে মনে ধারণা—ন্যায়-অন্যায়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার-শক্তিটা যেন ইহাদের একচেটিয়া! সুতরাং এহেন গুণধর-দিগের নিকট হইতে আর বেশী কি প্রত্যাশা করিতে পারা যায়?

মা সঃ

৺কবি প্যারীমোহনের "কুমারসম্ভব" হইতে

মৈনাক ও উমা।

[অধ্যাপক শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী, এম্, এ,]

মনোরমা রামা সঙ্গে নাগরাজ নানারঙ্গে
মাতিলেন বিচিত্র বিহারে।
যুবতী মেনকা সতী কালে হৈলা গর্ভবতী
প্রসবিলা সুকান্ত কুমারে॥ ১৯
মৈনাক তাহার নাম নয়নের অভিরাম
নাগকুলকামিনী-মোহন।
বারিধির বক্ষোনিধি বক্ষরূপে নিরবধি
সিন্ধু যারে দিলা আলিঙ্গন॥
আজিও পাতাল পুরে তুচ্ছ করি বজ্রধরে
উচ্চশিরে করে বিচরণ।
দুই পক্ষ স্বর্ণময় বজ্র হইতে নাহি ভয়
বজ্রাঘাত না জানে কেমন।
নাগপুরে নাগরাজে পূজা কৈল গিরিরাজে
সুতা দিল তাঁহার নন্দনে।
ধরাতলে সিন্ধুমাঝে কীর্ত্তি তাঁর সদারাজে
ধন্য ধন্য করে দেবগণে॥ ২০
হেথা সতী দক্ষসুতা হর-পত্নী পতিব্রতা
পিতৃবাক্যে অভিমান ভরে।
যোগবলে ত্যজি কায়া জনমিতে মহামায়া
প্রবেশিলা মেনকা উদরে॥ ২১
নীতি যদি দোষমুক্ত পৌরুষেতে হয় যুক্ত
নিখিল মঙ্গল ফল ধরে।
সেইমত সুনিয়তা গিরিপত্নী গিরিরতা
মঙ্গলারে ধরিলা উদরে॥
অটল উৎসাহ বলে নীতি যদি নাহি টলে
ভ্রমে যদি ভ্রম নাহি হয়।
তাহ'লে পুরুষপাশে সম্পৎ আপনি আসে
কমলা অচলা হয়ে রয়॥

সাধনা ও পুণ্য বলে কামনা অচিরে ফলে—
গিরিরাজ লভিল সন্তান।
ত্রিলোক-পাবনী মাতা হইলেন তাঁরি সুতা
জগতের মঙ্গল-নিদান ॥ ২২

শুভদিনে কন্যা প্রসবিলা গিরিজায়া।
মুদিত সবার চিত, হৃষ্ট হৃদি কায়া ॥
মৃদু মৃদু বহিতে লাগিল সমীরণ।
নির্ম্মল হইল দশদিক্ সুশোভন ॥
শঙ্খ ঘণ্টা আদি বাজে বিবিধ বাজন।
দেবগণ হর্ষে করে পুষ্প বরিষণ ॥ ২৩
হেরিয়া কন্যার রূপ পুরবাসিগণ।
ভাবে বুঝি শশী হল ভূতলে পতন ॥*
কে কোথায় দেখিয়াছে এমন রূপসী।
উদয় হয়েছে যেন কোটি পূর্ণশশী ॥*
বৈদূর্য্য মণির খণি মণির ছটায়।
নবীন অম্বুদনাদে যথা শোভা পায়
অপূর্ব্ব প্রভায় পূর্ণ হইল ভবন।
তরল তরঙ্গে যেন তড়িৎ প্লাবন ॥ ২৪
লাবণ্যে ললিতকান্তি বাড়ে গিরিবালা।
মনে হয় সুতা নয় এযে শশিকলা ॥
শশধরে ধরে অঙ্ক হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
অকলঙ্ক উমাশশী নাহি সেই দায় ॥ ২৫
পর্ব্বত কন্যার নাম পার্ব্বতী রাখিল।
পরে উমা আদি নাম জনে জনে দিল ॥ ২৬
তনয়ারে রাখে গিরি নয়নে নয়নে।
হারাতে নয়নতারা ভয় হয় মনে ॥
ফেলিয়া সকল ফুল আমের মুকুলে।
ভ্রমরের পঙ্‌ক্তি যথা রমে কুতুহলে ॥
সেইমত মহীধর উমারে বিশেষে।
সকল সন্তান হতে অতি ভালবাসে ॥ ২৭
দীপ যথা শিখাযোগে পূত শোভা ধরে।
সুরধুনী স্বর্গধাম বিভূষিত করে ॥
শুদ্ধা বাক্ হেতু যথা সুধী শোভা পায়।
ধরাধর ধন্য তথা লভি তনয়ায় ॥ ২৮

ক্রমে পঞ্চবর্ষ উমা হইল যখন।
সখীসঙ্গে নানা রঙ্গে খেলেন তখন ॥
গড়িয়া বালির বেদি মাটির পুতলী।
আনন্দে আনন্দময়ী খেলে কুতূহলী ॥
যেজন সৃজন কৈল এই ত্রিভুবন।
পুতলী লইয়া খেলি আনন্দিত মন ॥
ভবানীর মায়া ভবে কে বুঝিতে পারে।*
বুঝে ভব ত্যজি সব বিভব সংসারে ॥
যাঁহার ইচ্ছায় এই ত্রিভুবন চলে।
পুতুলের বিভা তিনি দেন কুতূহলে ॥
যাঁহার ইঙ্গিতে ভ্রমে শশী দিবাকর।
ভাঁটা ঘুরাইয়া তাঁর সানন্দ অন্তর ॥ ২৯

যাঁহা হইতে হৈল বেদ আদি বর্ণচয়।
করিতে হৈল তাঁর বর্ণপরিচয় ॥
যেইমত নিশাকাল উপস্থিত হলে।
প্রকাশে আপন জ্যোতিঃ ওষধিমণ্ডলে ॥
শরতের আগমনে যথা হংসমালা।
আপনি গঙ্গায় আসি করে জলখেলা ॥
শিখিবার কালে তথা পূর্ব্ব বিদ্যা তাঁর।
উদিল হৃদয়ে আশি যেমন সংস্কার ॥ ৩০

বালিকা-বয়স ক্রমে হল অন্তর্দ্ধান।
যৌবন যৌতুক লয়ে হর্ষে আগুয়ান ॥ ৩১

ফুটিল কমলদল রবির প্রভায়।
কি কব সে কায়া ছায়া, ভাষা না যুয়ায় ॥
তুলিকাতে আঁকা যেন ছবি একখানি।
পূর্ণিমার চাঁদ সহ পূর্ণিমা রজনী।
যৌবন বিলাসে অঙ্গ সকলি পূরিল।
ঢল ঢল করি রূপ উছলি পড়িল ॥ ৩২

চরণ নখর আভা কিবা সুবিমলা।
দশ খণ্ড হয়ে যেন রহে শশিকলা ॥
মরি কিবা সুকোমল রাঙ্গা পদতল।

---

* মণির খনি যেমন মণিপ্রভায় উদ্ভাসিত হয়, যেরূপ

নূপুর ঝঙ্কার শুনি কলহংসগণ।
সেই মত চাহে তারা করিতে কূজন ॥
বিনিময়ে বুঝি তাই শিখিবার তরে।
হংসগণে হংসগতি শিখাল উমারে ॥ ৩৪
আহা কি সুচারু উরুযুগ মনোহর।
তুলনা দেখিনা তার ভুবন ভিতর ॥ ৩৫
ছিল করিবর-কর উপমা কহিতে।
কি কব কর্কশ তাই লজ্জা পাই চিতে॥
ভাবিলাম রামরম্ভা তুল্য হবে তার।
একান্ত শীতল সে যে স্পর্শ করা ভার ॥ ৩৬
বুঝহ নিতম্ব-দম্ভ সেই রমণীর।
রমণীয় বলি শূলী কৈল যারে স্থির ॥ ৩৭
অপরূপ নাভিকূপ রোমাবলী তায়।
ইন্দ্রনীলমণি-প্রভা সম শোভা পায় ॥ ৩৮
শৈবালে বেষ্টিত যেন পদ্ম সরোবরে।
রোমরাজি সহ সাজি কিবা রূপধরে ॥*
কেশরীর কটি যদি হবে সুগঠন।
তবে কেন লবে তাঁর চরণ শরণ ॥*
মধ্যদেহে বহে বালা ত্রিবলি সুন্দর।
কামের সোপান যেন গাঁথা পর পর ॥ ৩৯
বস্তু বিনা বাস্তু এক রচিল যৌবন।
বাস্তুবিদ্যা-বিশারদ কে আছে এমন ॥*
তার ঊর্দ্ধে দুটি ক্রীড়া শৈল মনোহর।
যেথা কাম পূর্ণকাম বৈসে নিরন্তর॥
এমনি তাঁহার সেই বক্ষোজ বিস্তার।
মধ্যে মৃণালের সূত্র না পায় সঞ্চার ॥ ৪০ †
চপলা তাহারে যদি জিনিবে ছটায়।
উমা পানে উঁকি মারি কেন সে পলায় ॥*
স্বর্ণ যদি লতা হয়ে হইত সচল।
তবে হৈত তাঁর অঙ্গ উপমার স্থল ॥*
ভুজনাল হেরিয়া মৃণাল শিহরিয়া।
জলেতে করিল বাস অঙ্গ ডুবাইয়া ॥*
কত বা কোমল হবে শিরীষের ফুল।
নহে তাঁর সুকুমার বাহুসমতুল ॥
কোমল সে বাহুপাশে বাঁধি দৃঢ়তর।
নিগ্রহ করিবে হরে আশা করে স্মর ॥ ৪১
কনক চম্পক-কলি হেরি অঙ্গুলীরে।
বিষাদে ঝরিছে হায় টুপ্ টুপ্ করে ॥*
চারুকণ্ঠে শোভে চারু মুকুতার হার।
ভূষণ ভূষিত হল হেন চমৎকার ॥ ৪২
হারি হার অবশেষে মানিলেক হার।
সে অবধি ‘হার’ নাম হইল তাহার ॥*
সুধাকরে পদ্মগন্ধ নাহি কদাচন।
কমলে শশীর শোভা না থাকে কখন ॥
উমার গুণের কথা কহিব কাহারে।
একাধারে পদ্ম আর চন্দ্রগুণ ধরে ॥ ৪৩
পক্ক বিম্ব হেরে যাই উমা-ওষ্ঠাধরে।
লজ্জায় খসিয়া পড়ে ভূমির উপরে ॥*
অধরে মধুর হাস্য কিবা সুবিমল।
নির্ম্মল প্রবাল পরে যেন মুক্তাফল ॥
অরুণ পল্লব পরে রহে শুভ্রফুল।
তবে তার এতটুকু হয় সমতুল ॥ ৪৪
মরি কি মধুর কণ্ঠে সুধারাশি ঝরে।
যে শুনেছে সে কঠোর ভাবে পিকবরে ॥
সেই দুঃখে পিকবর ব্যাথা পেয়ে মনে।
উহু উহু করে মরে কাননে কাননে ॥*
অধিক কি কব যেই শুনেছে সে স্বর।
বীণার ঝঙ্কার নাহি লাগে মনোহর ॥ ৪৫
চকিত চঞ্চল দৃষ্টি উৎপল-তুলনা।
নাহি জানি কোথা পেলে এই সুলোচনা ॥
হয়েছে হরিণী হ'তে হরিণী-নয়না।
হরিণী হয়েছে কিম্বা—নামে যায় জানা ॥ ৪৬
যে অবধি দেখিয়াছে ভুরুযুগ তার।
দর্পকের সে অবধি দর্প নাহি আর ॥ ৪৭
কামধনু কিসে হবে ভুরুর সমান।
গুণ যোগে তবে ত সে হয় গুণবান্ ॥*
কটাক্ষের শর তাতে যোজিত দেখিয়া।

শ্রবণে ভূষণ দোলে কেন বা হরষে।
ভূষিত হইতে বুঝি অঙ্গের পরশে॥*
ব্রজপুরে হরি বুঝি লীলা সমাপিয়া।
গেছেন নাসিকারূপী বাঁশীটি ফেলিয়া॥
সুচারু ললাটে শোভিতেছে আধ চাঁদ।
অলকের খেলা তাতে মদনের ফাঁদ॥*
বেণী হেরি ফণী দেহ সঙ্কুচিত করে।
শরণ লইল শিবে চরণেতে ধরে॥
পার্ব্বতী যতনে শিরে ধরে কেশপাশ।
চমরী চামর তুচ্ছ-পুচ্ছেতে বিকাশ॥ †

† পার্ব্বতীর শিরঃস্থিত চারু কেশপাশের তুলনা নাই। চমরীর পুচ্ছভার তাহার উপমাস্থল হইতে পারে না।

তথাপি গরবে তাহা নাড়ে বার বার।
কি কব পশুর কথা লজ্জা নাহি তার॥ ৪৮
বিশ্বের সুষমা বিধি দেখিতে বিরলে।
অনুপম উমা ধনে গড়িল কৌশলে॥
নিখিল উপমা দ্রব্য করি সমাহার।
সাজায়ে রেখেছে বুঝি অঙ্গে অঙ্গে তার॥ ৪৯
পৃথিবীতে হেনরূপ নাহিক কোথায়।
কি কাজ বর্ণনা করি ব্যর্থ উপমায়॥*

(১) চমরীর চামর তুচ্ছ ; পুচ্ছেতে (তাহার) বিকাশ।

(২) চমরীর চামরের বিকাশ তুচ্ছ পুচ্ছে ; অতএব উহা কদর্য্য।

বঙ্গীয় বৈদ্য-বান্ধব সমিতি।

গত ১৯শে ফাল্গুন শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় ১৯১ লোয়ার চিৎপুররোডস্থ কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের ভবনে "বঙ্গীয় বৈদ্য-বান্ধব-সমিতি"র এক সাধারণ অধিবেশন হইয়াছে। আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেন বি, এল মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাস্থলে সমাগত সভ্যের সংখ্যার অল্পতা দেখিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি! এই অধঃপাতিত বৈদ্যসমাজের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে যত অনুষ্ঠানই হউক না কেন, সে সকলই যে সমাজের মঙ্গলজনক তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু এই সকল অনুষ্ঠানে বৈদ্যসন্তানগণের যোগদান সম্বন্ধে ঔদাস্য ও অবহেলা বৈদ্যসন্তানের পক্ষে দুরপনেয় কলঙ্কের কথা। সাধারণতঃ বৈদ্য-সন্তানগণের মধ্যে অধিকাংশই যে শিক্ষিত এবং পদস্থ, নিতান্ত বিদ্বেষভাবাপন্ন না হইলে একথা অস্বীকার করিবার যো নাই। কিন্তু এসকল গুরুতর বিষয়ে তাঁহাদের ঔদাস্যকে অমার্জ্জনীয়

সভার গত বর্ষের কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ, সমিতি আলোচ্য বর্ষে অনাথা বিধবা এবং দুঃস্থ ছাত্রবর্গের সাহায্যে তিন শত টাকা দিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই সাহায্যের অধিকাংশই বিক্রম-পুর সমাজান্তর্গত বৈদ্যবিধবা ও দুস্থ ছাত্রদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে। বিক্রমপুরস্থ কোন সদাশয় মহাত্মা 'সরোজিনী' বৃত্তি নামক মাসিক ৩০৲ টাকার একটী বৃত্তি সমিতির হস্তে অর্পণ করিয়া-ছেন। শুদ্ধ বিক্রমপুরবাসী দিগের সাহায্যকল্পে এই অর্থ ব্যবহৃত হইবে, ইহাই দাতার অভিপ্রায় ; কার্য্যতঃও তাহাই হইতেছে। দাতা স্বীয় নাম ধাম প্রকাশ করিতে অভিলাষী নহেন। দাতার এরূপ ইচ্ছা নিতান্তই প্রশংসনীয় ; কিন্তু এই অর্থে বিক্রমপুর ব্যতীত অন্যস্থানের লোককে সাহায্য করা হইবে না, বৈদ্যসাধারণের নিকট ইহা অনু-মোদনীয় বলিয়া পরিগণিত হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। কারণ, 'বঙ্গীয়' কথাটী সমিতির নামের পূর্ব্বে থাকিলে, উহা শুধু পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্য বুঝাইবে

হইল, তখন দাতার এই ব্যবস্থাটীতে উক্ত বিশেষণের তিরোধানের সার্থকতা রহিল না। জানি না, শুধু পূর্ববঙ্গের বৈদ্যদের মঙ্গলকল্পেই এই সমিতির প্রতিষ্ঠা কি না।

সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির গঠনপ্রণালী দেখিয়া অনুমান হইল, দুই তিনটী রাঢ়ীয় বৈদ্য-ব্যতীত ঢাকা-বিক্রমপুরের বৈদ্যসন্তানগণই ইহার অন্তর্ভুক্ত। চট্টগ্রামেরও দুই একটী আছেন। ইহা দেখিয়াই, সম্ভবতঃ, সভাপতি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, বৈদ্যসাধারণের মঙ্গলকল্পে এই অনুষ্ঠান হইয়া থাকিলে অপর সভার (বিদ্বৎসভার) সহিত একযোগে কার্য্য করাই সমীচীন, এবং তদ্দ্বারা অনুষ্ঠানের সফলতা সম্বন্ধে বেশী আশা করা যাইতে পারে। দলাদলির মত একটা ভাবের অস্তিত্ব রাখিয়া কার্য্য করিলে ততটা আশা করা যায় না। আমাদের পরম সুহৃদ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্, এ, বি, এল্ মহাশয়, সভাপতি মহাশয়ের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়া বলেন যে, শুভানুষ্ঠান কল্পে কর্ম্মকর্ত্তাদিগের স্বাতন্ত্র্য সমধিক ফলপ্রদ। বৈরীভাববিহীন স্বাতন্ত্র্যে কার্য্যক্ষেত্রের পরিসর বৃদ্ধি পায়। কথাটা কিয়ৎপরিমাণে সত্য।

কিন্তু একটা প্রধান কথা হইয়াছে,—এই জাতিটার নাম লইয়া। শিক্ষিত বৈদ্যসন্তানেরা এখন 'বৈদ্য' জাতিটা কি,—সমাজে ইহার স্থান কোথায়, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য নিতান্ত সমুৎসুক। বৈদ্য-শোণিতের পবিত্রতা রক্ষায় ইহাঁরা কৃতসঙ্কল্প। গোয়ালা দুধে, পানা-পুকুরের জল হইতে আরম্ভ করিয়া, পাতকুয়া, চৌবাচ্ছা, ইন্দারা,—এমন কি, হোসের জল পর্য্যন্ত মিশাইয়া টাকায় চারিসের হইতে দশ সের পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় করে; বলিতে কি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ মিশ্রিত পদার্থের রঙ্‌টা শাদা থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহা 'দুধ' বলিয়াই চালায়। শিক্ষিত বৈদ্যসন্তানগণ সাহস করেন না। এখানেই যে একটু বিষম অন্তরায় বর্ত্তমান, বৈদ্য-বান্ধব-সমিতি'র সভ্যদিগের মনে সে ধারণা আছে বলিয়া বোধ হইল না। সভাপতি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ই স্বয়ং বৈদ্য-শোণিতের পবিত্রতা রক্ষার একজন প্রধান অগ্রণী। সেদিনকার সভায় তাঁহার মুখ হইতে এসম্বন্ধে দুই একটী কথা শুনিতে পাইব, এরূপ আশা করিয়াছিলাম।

বৈদ্যজাতির উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে যত অনুষ্ঠানই হউক না কেন, 'বৈদ্যত্ব' রক্ষা করা, এবং তদনুকূলে যথাযোগ্য প্রবৃত্তি ও চেষ্টা যে সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, বিবেচক মাত্রেই একথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত 'জাতিতত্ত্ববারিধি' নামক গ্রন্থে দেখা যায় যে, অসবর্ণ বিবাহে বৈদ্যের সংখ্যা অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। ত্রিপুরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম এবং ময়মনসিংহ জেলার কোন কোন অংশের বৈদ্যদিগের সামাজিক অবস্থা দেখিয়া এই কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়। এই শ্রেণীর বৈদ্যদিগের সহিত সামাজিক সম্বন্ধ রক্ষণ অথবা স্থাপন সম্বন্ধে রাঢ় ও বঙ্গের অধিকাংশ শিক্ষিত ও পদস্থ বৈদ্যসন্তানই যে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। বৈদ্যসমাজে এইরূপ মতদ্বৈধতাকে যদি কেশব বাবুর উক্ত 'বৈরীভাব' বলিয়া মনে করিতে হয়, তাহা হইলে 'বৈরীভাব' যে অনিবার্য্য, তাহার সন্দেহ নাই। এরূপ মতদ্বৈধতার তিরোধানের আশা নিতান্তই দুরাশা বলিতে হইবে।

একমাত্র উপনয়ন সংস্কারের অভাবেই পূর্ব্ব-বঙ্গের, এমন কি, বিক্রমপুর, কালিয়া, সেনহাটী প্রমুখ সমাজের বৈদ্যসন্তানগণের সহিত রাঢ়ীয় বৈদ্যগণ, ইচ্ছাসত্ত্বেও, সর্ব্বতোভাবে সমন্বয় রক্ষা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ইহার পর যদি 'মুড়ী-মিছরী' একদরে ফেলিয়া জাতীয় পুষ্টিসাধন অথবা সমন্বয় রক্ষার প্রয়াস পাওয়া যায়, সে প্রয়াস

পারে কি ? সুতরাং আমাদের মনে হয়, বৈদ্যের জাতীয়তার পবিত্রতা রক্ষা করাই যেন সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। এই সম্বন্ধে "বৈদ্য-বান্ধব-সমিতি"র কোনরূপ যত্ন ও চেষ্টা আছে কি না,—অন্ততঃ এবিষয়টী সমিতির আলোচনার বিষয়ীভূত কি না, আমরা তাহা বুঝিবার সুবিধা পাই নাই।

যাহা হউক, দুঃস্থ বৈদ্যসন্তানের সাহায্য করা সম্বন্ধে সমিতির চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়। কিন্তু বৈদ্যজাতির দিন দিন অধঃপতনের হেতু কি, তাহার অনুসন্ধান করা বৈদ্য-হিতৈষী মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। রোগের নিদান স্থির করিয়া ঔষধ প্রয়োগ না করিলে রোগ সারে না। বৈদ্যজাতি যে দিন দিন দুরবস্থাপন্ন হইতেছে তাহার কারণ নির্দ্দেশের প্রতি কাহারও লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের অনুমান হয়, আধুনিক বর-পণ ও যৌতুকের অমানুষিক নিষ্পেষণই বৈদ্যসমাজের এরূপ দরিদ্রতার একমাত্র কারণ। বৈদ্যসন্তান জীবনধারণের জন্য কোনরূপ নিকৃষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। বৈদ্যসমাজে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা, তুলনায়, অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বেশী হইলেও বর্ত্তমানকালে অর্থোপার্জ্জনের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও অনেকে পরিবার প্রতিপালনোপযোগী অর্থোপার্জ্জনে অসমর্থ, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এরূপ অবস্থায় বিবাহে বর-পণ ও যৌতুকের প্রাচুর্য্যে যে মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন বৈদ্যসন্তানগণ দরিদ্রতাকে আলিঙ্গন করিতেছে, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন ? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সমাজ হইতে এই রাক্ষসী প্রথার তিরোধানের ব্যবস্থা করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য নহে কি ? সমাজের অনাথা বিধবা ও দুঃস্থ শিক্ষার্থীর সংখ্যা এত অধিক যে, সভাসমিতির এরূপ মুষ্টিমেয় সাহায্যে তাহার কিছুই হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদের নিকট দুইশতের উপর এরূপ সাহায্য-প্রার্থী বিধবার আবেদনপত্র আছে যাঁহারা অপরিণত বয়স্ক পুত্রকন্যা লইয়া দিনান্তে একবার উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিতেছেন না ! ইহাঁদের কন্যাগণ বিবাহের যোগ্যা হইলে ইহাদের অবস্থা কি দাঁড়াইবে, তাহা চিন্তা করিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হয় ! কোন্ সভাসমিতি অর্থ সাহায্য করিয়া এহেন দুস্থ দিগের দুঃখ বিমোচনের আশা করিতে পারেন ? তাই বলিতেছিলাম, সমাজে দরিদ্রতার প্রবেশ-দ্বার রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করুন—সমাজ হইতে বর-পণ ও যৌতুক প্রথা সমূলে নির্ম্মূল করিবার উপায় উদ্ভাবন করুণ, ধীরে ধীরে দরিদ্রতা বিমোচনের পথ আপনি প্রশস্ত হইয়া আসিবে।

সদাচার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন বি, এল।]

যোগীই আদর্শ মানব। তিনি বিশ্বপ্রেমিক, সর্ব্বভূতে সমদর্শী, তিনি সকল কর্ম্ম করিয়াও কিছু করেন না। তিনি যাহা কিছু করেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের হিতের জন্য, জগৎপ্রাণ বাসুদেবের জন্য 'ছোট আমি' বা অহং মমাকার জ্ঞান-বিদূরিত হইয়াছে সর্ব্ব জগতে তিনি এক বাসুদেবময় দেখেন, অন্য কিছুই দেখেন না ; তাঁহার আত্মপর ভেদ জ্ঞান নাই, তাঁহার কাছে 'আমি', তুমি, তিনি যাহা

পরিব্যাপ্ত অতএব সকলেই তাঁহার আপনার বা সকলেই তিনি আত্মদর্শন করেন। তিনি সর্ব্বত্র থাকিয়া ও সর্ব্বকার্য্য করিয়াও বায়ুর ন্যায় অসঙ্গ। তিনি যেরূপে বিচরণ করেন তৎসম্বন্ধে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ বলিয়াছেন ঃ—

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন গচ্ছন স্বপনশ্বসন্ ॥
প্রলপন্ বিসৃজন গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥
ব্রাহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেভ্যঃ পদ্মপত্র মিবাম্ভসা ॥
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্মকুর্ব্বন্তি সঙ্গংত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥
যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতিনৈষ্ঠিকম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তোনিবধ্যতে ॥
সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখংবশী।
নবদ্বারে পুরেদেহী নৈবকুর্ব্বন্নকারয়ন্ ॥

গীতা ৫।৭—১৩ ॥

যিনি যোগী তিনি বিশুদ্ধচিত্ত, বিজিতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয়, তিনি সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করেন, এতাদৃশ ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মে লিপ্ত বা বদ্ধ হন না। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন নিদ্রা, শ্বাসপ্রশ্বাস, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, নিমেষ ও উন্মেষ করিয়াও তিনি আত্মাভিমান শূন্য হন। কেন না তিনি জানেন তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের স্ব স্ব ব্যাপারে চেষ্টিত হইতেছে মাত্র, তিনি কিছুই করেন না। (অধিকন্তু) যোগী সকল কর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণ পূর্ব্বক করেন সেইজন্য তিনি কর্ম্ম করিয়াও পাপে (ও পুণ্যে) লিপ্ত হয় না পদ্মপত্র যদ্রূপ জলে থাকিয়াও জলে লিপ্ত হয়না তদ্রূপ। কর্ম্মে অভিনিবেশ শূন্য হইয়া ও কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক কেবলমাত্র কায়মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে যোগীগণ (ভোগ দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় পূর্ব্বক) আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন। যোগী বা জ্ঞানী কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলেও ব্রহ্মনিষ্ঠোৎপন্না পরা শান্তিপ্রাপ্ত হন; কিন্তু যিনি যোগী নহেন, তিনি কামনা প্রবৃত্তি হেতু ফলে আসক্ত হইয়া নিয়ত বদ্ধ হয়। জিতেন্দ্রিয় যোগী ব্যক্তি বিবেকযুক্ত মন দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম (ফল ব্রহ্মে) সংন্যাস পূর্ব্বক নবদ্বারবিশিষ্ট নগরস্বরূপ এই শরীরে স্বয়ং কর্ম্ম না করিয়া এবং অপর দ্বারা না করাইয়া সুখে বাস করেন।

এইরূপ অবস্থাকেই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি বলে ঃ—

অসক্ত বুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিং পরমাং সংন্যাসেনাধিগচ্ছতি।

গীতা ১৮।৪৯

সকল বিষয়ে অনাসক্ত, জিতাত্মা ও নিস্পৃহ (কর্ম্মযোগসিদ্ধ যোগী) ব্যক্তিগণ অনাসক্তি ও কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন।

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথাব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধমে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠাজ্ঞানস্য যা পরা ॥
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্যচ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাব কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগ পরোনিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষুভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

গীতা ১৮। ৫০—৫৫ ॥

ক্রমশঃ

টীকা-টিপ্পনী।

গত মাঘ সংখ্যার জাতীয়সংবাদে হিন্দুস্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্ব প্রথম ছাত্রটীর নাম কুমুদবন্ধু সেন গুপ্ত না হইয়া শ্রীমান কুলদাচরণ দাশ গুপ্ত হইবে। এই বালকটী কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব খ্যাতনামা স্বর্গীয় কবিরাজ কৈলাসচন্দ্র সেন মহাশয়ের দৌহিত্র।

লাহোর আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরমোহন মজুমদার কাব্যতীর্থ কবিভূষণ মহাশয় সম্প্রতি কলিকাতা রাজানবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের ৩।১ নং ভবনে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কবিরাজ হরমোহন বিজ্ঞ এবং বহুদর্শী চিকিৎসক, সংস্কৃত ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন; চিকিৎসা ব্যবসায়ে পঞ্জাবে বেশ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের ইনি অন্যতম অধ্যাপক পদে বরিত হইয়াছেন। কলিকাতায় আরও একজন সুচিকিৎসকের স্থিতি দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

নিখিল-ভারতের আয়ুর্ব্বেদ-সম্মেলনের বৈঠক এবারে বোম্বে-প্রেসিডেন্সীর পুনা নগরে হইয়াগিয়াছে। কোচিনের অধিপতি স্যর রাম বর্ম্মা সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের বকেয়া রাজধানী কলিকাতা হইতে মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন মহাশয় ব্যতীত অপর কেহ এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছেন বলিয়া শ্রুতিগোচর হয় নাই! অন্ততঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে যাঁহারা অধিনায়কত্ব করিয়াছেন, এবং যাঁহারা সুপণ্ডিত ও সুচিকিৎসক বলিয়া পরিচিত এবং গবর্ণমেন্টের সম্মানলাভের প্রত্যাশী, তাঁহাদের এক্ষেত্রে যোগদান করা একান্তই উচিত ছিল।

বঙ্গদেশকে আয়ুর্ব্বেদের জন্মস্থান অথবা পীঠস্থান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এইখানেই আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি, বিস্তার এবং পরিপুষ্টি। পাশ্চাত্য চিকিৎসাপ্রণালীর অভ্যুদয়ে ইহা কিছুকাল নিষ্প্রভ হইয়া থাকিলেও বাঙ্গালীই ইহাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইহার পুনরভ্যুদয়ও বাঙ্গালীর যত্ন ও চেষ্টাতেই হইয়াছে, ইহা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। অতএব এই আয়ুর্ব্বেদ অবলম্বন করিয়া দূরদূরান্তরে কোনরূপ আন্দোলন আলোচনা হইতে দেখিলে বাঙ্গালী—বিশেষতঃ বৈদ্যসন্তান মাত্রেরই পুলকিত হওয়া উচিত। ইহার পরিবর্ত্তে কোনস্থলে যদি বিষাদের ছায়াও পরিলক্ষিত হয়, তাহা নিতান্তই মর্ম্মান্তিক।

আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র উপলক্ষ করিয়া যাঁহারা জীবনধারণ করিতেছেন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র উপলক্ষে যাঁহাদের মান-সম্মান ও ঐশ্বর্য্যের সত্তা, এহেন আন্দোলনের সাফল্য লাভকল্পে বঙ্গের কৃতী আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণেরই পুরোবর্ত্তী হইয়া যত্ন ও চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহার বিপরীত অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি! আমাদের আশা ছিল, কবিরাজশিরোমণি শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি, প্রবীণ বিজ্ঞ ও বহুদর্শী কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন গুপ্ত কবিরত্ন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ বৈদ্যরত্ন এম, এ, প্রমুখ কবিরাজবর্গকে এই সম্মেলনক্ষেত্রে উপস্থিত দেখিতে পাইব,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় এম্, এ, এম্, বি প্রমুখ মনস্বীবর্গ বঙ্গের যাবতীয় কবিরাজকুল সমভিব্যাহারে এই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বঙ্গের মুখোজ্জ্বল করিবেন। কিন্তু কই, তাহার কোনরূপ পরিচয় পাওয়া গেল না কৈ?

ধন্বন্তরি।

মাসিক পত্র

২য় বর্ষ, } চৈত্র, ১৩২৩, ইং ১৯১৭ মার্চ্চ, এপ্রেল, { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

চারণ।

[অধ্যাপক শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী, এম্, এ,]

চারণ মন! চল বিচরণে
আজিকে আপন কাজে—
যেথা মোহের আঁধার
ঘিরে চারি ধার
নিশার সমান রাজে;
যেথা, সুপ্ত চেতনা
লুপ্ত বেদনা
বিষয় বাসনা মাঝে,
অমৃতের গান
মুরলীর তান
হৃদয়ে নাহিক বাজে

আজি সে শ্মশানে
বসা'য়ে আসনে
পূজিব প্রেমের রাজে,
জোছনা হাসিয়া
উঠিবে ভাসিয়া
স্বরূপ সুষমা সাজে।
সেথা দেবগণে
শুনাইব গানে
ভূলোক দ্যুলোক মাঝে,
শুনিব দুজনে
শুনাইব আর
বিশ্বের রাজ-রাজে।

আয়ুর্ব্বেদ-সম্মেলন।

এবার বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পুনা-নগরে নিখিল ভারতের আয়ুর্ব্বেদ-সম্মেলনের দুন্দুভি বাজিয়াছিল, কলিকাতা হইতে মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন মহাশয় যখন পুনায় উপস্থিত হন, তখন তাঁহার হইয়া 'বেঙ্গলী' পত্রে-মুদ্রিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার পর আর এই সম্মেলনের কোন উচ্চবাচ্য শুনা যায় নাই! কলিকাতা হইতে আর কোন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন

গত বর্ষে যখন মান্দ্রাজে আয়ুর্ব্বেদ-সম্মেলনের অধিবেশন হয়, তখন কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন বৈদ্যরত্ন বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহোদয় এবং তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ ব্যতীত অপর কেহ যান নাই! গতবারে যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই এবারে যান নাই। এই ব্যবস্থা দেখিয়া মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের লোকে কি মনে করিয়াছে, অথবা কি মনে করিতেছে, কবিরাজ মহাশয়দিগের মনে অবশ্যই তাহার একটা ধারণা হইয়াছে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে সকলেরই লজ্জাবোধ হইবে! লোকনিন্দাটাকে এতদূর তুচ্ছ বলিয়া মনে করা বৈদ্যসন্তানের পক্ষে অসঙ্গত কথা। এই ব্যবস্থায় যে বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজের সুধু গৌরবের হানি হইয়াছে এরূপ নহে,—মুখে চুণ-কালি পড়িয়াছে, কে তাহা অস্বীকার করিতে সাহসী হইবেন?

আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, আয়ুর্ব্বেদের সৃষ্টি, পরিপুষ্টি ও তাহার বিস্তৃতি একমাত্র বঙ্গীয় বৈদ্যসন্তানেরই কৃতিত্বে। বঙ্গীয় বৈদ্যসন্তানগণ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থপ্রণেতা; সেইসকল গ্রন্থের দোহাই দিয়া, হিমালয় হইতে কুমারিকা, এবং করাচি হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগের অধিবাসী আয়ুর্ব্বেদবিদ্ বলিয়া পরিচয় দেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে,সেই বঙ্গীয়-বৈদ্যসন্তানগণ আজ অর্থের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের জাতীয়-শাস্ত্রের আলোচনা-ক্ষেত্র হইতে শত যোজন তফাতে! বৈদ্য-সন্তানদিগের হৃদয় যে কুসীদখোর ইহুদী সাইলকের হৃদয়ের অনুকরণে গঠিত হইয়াছে এ ধারণা আমাদের ছিল না। এমনটী কস্মিনকালে হইতে পারিবে,—বৈদ্য-সন্তানের হৃদয় এত দুর্ব্বল,—ধারণাতেও একথা কখনও মনে আসে নাই! আজ কিন্তু সহরের খ্যাতনামা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাব্যবসায়ী বৈদ্যসন্তানগণ তাহা অবলীলাক্রমে প্রত্যক্ষ করাইলেন! ইহা অপেক্ষা আর জাতীয়কলঙ্ক কি হইতে পারে?

দলাদলি সম্বন্ধে আমাদের আর আপসোস্ করিবার কিছু রহিল না! লোকে ঘরে ঘরে হিংসা-দ্বেষসঙ্কুল যেকার্য্যই করুক না কেন,সে ব্যাপার গণ্ডীর বাহিরে যাইতে দিতে কাহারই প্রবৃত্তি হয় না ; হওয়া উচিত নহে। নিজের দেশে দলাদলি-রেষারেষি যতই থাকুক না কেন, তাহা তিন চারিটী দিনের জন্য কষ্টেস্রষ্টে চাপা দিয়া রাখিয়া বিদেশে জাতীয় একতার একটু পরিচয় দিলে কাহারও বিশেষ কোন ক্ষতির আশঙ্কা ছিল না। যাঁহাদের পসার জমিয়া গিয়াছে,তাঁহারা ৩৷৪ দিন স্থানান্তরে থাকিলে পসারের হানি হইবার আশঙ্কা নাই। অনেকে ডাকেও ত অনেক সময় ৩৷৪ দিনের জন্য স্থানান্তরে যাইয়া থাকেন। তবে একটা কথা এই হইতে পারে যে, এরূপ ব্যাপারে যে তিনি চারি দিন অনুপস্থিত থাকিতে হয়, তাহাতে অর্থের প্রত্যাশা নাই। একথার উত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রত্যাশা করিলে এই স্বার্থটুকু বিসর্জ্জন দেওয়া দরকার। কৃতিত্বের অভিমান যাঁহাদের আছে, অপরের উন্নতিতে তাঁহাদের প্রাণে একটুকু ব্যথা বোধ করা অস্বাভাবিক নহে। এই ব্যথাকে হিংসাপ্রসূত ব্যথা বলা সমীচীন না হইলেও, সরলভাবে সাধারণ্যে স্ব স্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া এই ব্যথার কুভাবটীকে সুভাবে পরিণত করিবার প্রয়াস পাইতে হানি কি? এইসকল সভা-সম্মেলনই তাহা প্রদর্শন করিবার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। এই সুযোগ,অভিমান বশতঃই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, যাঁহারা পরিহার করেন,তাঁহাদের এই ব্যথা হিংসা, দ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতায় পরিণত হইয়া পড়ে। কোন্ লজ্জায় বলিব যে, আমাদের কৃতী আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ এই স্থূল কথাটী হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ?

বাস্তবিক পক্ষে এইসকল আত্মনিন্দা,আত্ম-কুৎসা ঢাক-ঢোল বাজাইয়া জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে দুঃখ ও লজ্জা দুই-ই হয়। সাম্প্রাদায়িকতার

যাঁহারা আমাদিগের এই সকল কথাগুলি শত্রু-ভাবের কথা বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের নিকট করপুটে, নিতান্ত বিনীতভাবে নিবেদন, তাঁহারা মন হইতে এই কালকূট বিদূরিত করিয়া সরলতা অবলম্বন করুণ—চিকিৎসা ব্যবসায়ী মাত্রকেই ভ্রাতৃ-ভাবে আলিঙ্গন করিয়া বৈদ্যজাতির অতীত গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হউন।

কালাচাঁদের পিনিক!

শ্রীকালাচাঁদ শর্ম্মা। বঃ—শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী কবিরাজ।

(ব্যঙ্গ-রঙ্গ।)

আমি কালাচাঁদ। কালার সহিত চাঁদের বা চাঁদের সহিত কালার কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া যে কালাচাঁদ কথাটাই নিরর্থক, ইহা কেহ মনে করিও না। অবশ্য দুই-দশটা অনর্থও আমার কল্যাণে ঘটিয়াছে—ঘটিতেছে; তাই বলিয়াই কি আমি অনর্থক হইব? আমি সার্থক কিনা, তাহা ঐ দীর্ঘজীবী—জীর্ণ—গ্রহণী-রোগীকে জিজ্ঞাসা করিও। তোমরা নূতন—নবীন—নব!—নিতুই নব! নিত্যই যে সব নব নব পদার্থের আবির্ভাব—তিরোভাব হইতেছে, তাহাদের সহিত তোমাদের পরিচয় সম্ভবপর বটে। কিন্তু আমি ত নূতন নহি। আমি যে পুরাতন—সনাতন—প্রাচীনতম! অর্ব্বাচীনেরা এই প্রাচীনের পরিচয় পাইবে কোথায়? তোমাদের পিতা-পিতামহ প্রভৃতি যাঁহারা প্রাচীন ছিলেন, তাঁহারা জানিতেন এই কালাচাঁদ শর্ম্মা কে? সেকালে কালাচাঁদের সহিত কেহ অপরিচিত থাকিলে, আমাদের বাবাজী মহারাজ তাহার কণ্ঠী ছিঁড়িয়া দিতেন! এই পঞ্চাশ বছর আগেও যে, কালার মৌতাত না করিয়া কেহ 'বাবু' হইতে পারিত না, তাহাও কি তোমরা গল্পে শোন নাই?

হিন্দুর বেদের মত প্রামাণ্য পুরাণ মহাভারতের নাম শুনিয়াছ কি? একালের 'ছোট্ট মহাভারত'

নহে! 'তালপুকুরের' মত সার্থকনামা, বিখ্যাত বান্ধা বটতলার শীতল ছায়ায় বসিয়া, স্বয়ং বেদ-ব্যাস ঠাকুর যে মহাভারত-কাব্য গণেশ দাদাকে ধরিয়া লেখাইয়া লইয়াছিলেন, সেই অষ্টাদশপর্ব্ব—বিপুল—বিশাল আসল মহাভারত পড়িয়া দেখিও। তাহাতেই বড় বড় অক্ষরে আমার জন্মবৃত্তান্ত লেখা আছে। বাঙ্গালার আদি কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের ভায়রা-ভাই * কাশীরাম দাস তাহার অনুবাদ করিয়াছেন, যথা—

দেবাসুরে কৈল যবে সমুদ্রমন্থন।
বাসুকীর অঙ্গ তাতে হৈল সংঘর্ষণ॥
তার মুখ হতে পৈল ফেণ রাশি রাশি।
সেই ফেণে আবির্ভাব কালা কৈল আসি॥

অর্থাৎ কিনা, দেবাসুরের সমুদ্র মন্থন কালে যে বাসুকী ফণী মন্থন-রজ্জুর কাজ করিয়াছিলেন, অতিশ্রমে তাঁহার মুখপদ্ম হইতে যে অমৃত-ধারার মত ফেণরাশি নির্গত হইয়াছিল, তাহাই ঘনীভূত ও বিশুষ্ক হইয়া, যে অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় ও অপ্রাপ্য রত্ন উৎপন্ন হইল, তাহাই, বা সেই রত্নরাজই হইয়াছি আমি। এ ঘটনা কবেকার জান ত? তখন মানুষ হয় নাই, কেবল দেবতা আর অসুরের

---

* এই সম্বন্ধতত্ত্ব একজন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাই কায়স্থ লেখকগণ কৃত্তিবাস ওঝাকে

দল মারামারি করিয়া বেড়াইত! দেবতারা আমার জন্মবৃত্তান্ত জানিতেন বলিয়াই ব্রহ্মাঠাকুর তাঁহার বেদের ভিতর আয়ুর্ব্বেদ-অধ্যায়ে আমাকে অহিফেন—ফণিফেন প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। এখন বুঝিলে ত, আমি কে?

হাসিয়া উঠিলে যে? হাসিয়া কি আমায় উড়াইয়া দিতে পারিবে? আমি তো তোমাদের মত হাল্‌কা যুগের হাল্‌কা মানুষ নই! তার উপর অনেক দুধ-ঘি আমার এই শুষ্ক পেটে হজম হইয়া আছে! তাহারই গুণে আমি কতখানি দমভারি, তাহা যাঁহারা দমফোলা রোগের জ্বালায় আমার শরণ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারাই ভাল বলিতে পারিবেন। "এক মণ তুলা ভারী, কি এক মণ লোহা ভারী" এই প্রশ্ন যখন এখনও তোমাদের মনে উঠে, তখন আমার ভারের পরিমাণ তোমরা কেমন করিয়া বুঝিবে? হাল্‌কা লোকে রতি মাষা দিয়া আমায় ওজন করে বলিয়াই বুঝি আমাকে তোমরা হাল্‌কা ভাবিয়াছ? কিন্তু মনে রাখিও—যাঁহারা হাল্‌কা মাল বোতল বোতল পার করিতে পারেন, তাঁহারাও আমার এক রতির প্রতাপ সহ্য করিতে অসমর্থ! আগেকার কালে আত্মশ্লাঘা মহাপাপের মধ্যে গণ্য ছিল। এখন কিন্তু আত্ম-গৌরব প্রচার ব্যতীত আত্মোন্নতির অন্য উপায় নাই! অতএব আমার মহিমা আমি বলিতেছি বলিয়া, তোমরা আমায় অবজ্ঞা করিতে পার না।

বিশেষতঃ এখনকার দিনে নিজের জীবন-কথা নিজে লিখিয়া দেওয়াই আদর্শ শিষ্টাচার! উদাহরণ যথা,—বিদ্যাসাগরের জীবনী, নবীনবাবুর 'আমার জীবন,' রবিবাবুর 'জীবন স্মৃতি,' নাটোর মহারাজের 'শ্রুতিস্মৃতি' ইত্যাদি! তবে তফাৎ এই যে, ইহাঁরা সমর্থ থাকিতে থাকিতে নিজের হাতে লিখিয়াছেন, আর আমি অসমর্থ হওয়ার পর অপর লোক দ্বারা লেখাইতে বসিয়াছি। বয়স বেশী হইলে অনেকের হাত কাঁপে—মাথা কাঁপে, তাহা সেই দুর্দ্দশাই উপস্থিত হইয়াছে। তাই নিজে কলম ধরিতে না পারিয়া, একটী ভক্ত শিষ্যকে বকল্‌মা দিয়া ইহা লেখাইয়া লইতে বাধ্য হইয়াছি! ইহারও অবশ্য নজীর আছে;—ব্যাসদেব ভীমের পিতামহ হইলেও, স্বয়ং মহাভারত লিখিতে পারেন নাই; চার্ হাতে চট্ পট্ লিখিয়া দিবার জন্য গণেশের কৃপাপ্রার্থী হইয়াছিলেন!

এতক্ষণ এত কথা শুনিয়া, আমার গৌরব-গর্ব্বের কারণটা কিছু বুঝিতে পারিয়াছ কি? কালাচাঁদের কৃপা ব্যতীত কাহারও বুদ্ধির ধার সূক্ষ্ম হয় না! কাজেই তোমরা 'হাঁ' বলিলেও, আমি তাহাতে বিশ্বাস করিতে পারি না। অতএব আমার পরিচয়-তত্ত্বটা শুনিবার জন্য অতঃপর অব-হিত হও। তাহা হইলে, পরকালে বা শেষ বয়সে তোমরা আমার চরণে শরণ লইয়া, নিরাপদ হইতে পারিবে। শুনিতে পাই,—ইংরাজী শিখিয়া তোমাদের একটা মস্ত দোষ জন্মিয়াছে,—তোমরা কোন বড় লোকের সহিত তুলনা না করিয়া, আর একজনকে বড় বলিতে চাও না! সুতরাং আমিও আমার পরিচয়টী একজন সর্ব্বজন-স্বীকৃত বিশিষ্ট বড় লোকের সহিতই তুলনায় সমালোচনা করিয়া, তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছি।

শুনিয়াছ কি,—আমারই মত আর এক কালাচাঁদ, এক যুগ আগে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? লোকে তাঁহাকে 'ব্রজের কালা' বলিত। তিনি যে গুণে-জ্ঞানে কোন দিকেই আমার অপেক্ষা একটুকুও বড় ছিলেন না, ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। তবে তাঁহারও আমার জন্ম ও জীবনকথা অনেকটা এক রকমের। পণ্ডিতগণ বলেন,—সকল মহাপুরুষেরই জীবন-ঘট-নায় এইরূপ সাদৃশ্য চির দিন ঘটিতেছে! সাদৃশ্যের দোষে তোমরা পাছে ত্যাস্তা করিয়া ফেল, এইজন্য আমিও তাঁহাকে 'ব্রজের কালা' বলিয়াই উল্লেখ করিব।

গ্রহণ করিয়া, নন্দ রাজার রাজপ্রাসাদে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, আমারও তেমনি জন্মস্থানটী চিরবন্দী ভারতবাসীর রুদ্ধ কারায়! তারপর সদ্যোজাত কালার মতই আমাকেও আমার জন্মদাতা, রাজার আশ্রয়ে রাখিয়া যান। সেখানে নন্দ-যশোদার মত কত দরদী লোকের আদরযত্নে দিন দিন শশিকলার স্থায় বৃদ্ধি পাইয়া, যখন গোষ্ঠে যাইবার মত পুষ্ট হইয়া উঠি, তখন মা-যশোদা আমাকে ধড়াচুড়া পরাইয়া, বণিক্-রাখালদের হাতে সঁপিয়া দেন। দুরাত্মা কংস নাকি নিজের প্রাণরক্ষার আশায়, কতবার কত অসুর পাঠাইয়া, ব্রজের কালাকে মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল। পাছে নেশার রাজা ব্রাণ্ডি-হুইস্কির প্রাণনাশ হয়, সেই ভয়ে আমাকে মারিবার জন্তও কত রাজপুরুষ,কত কমিশনেরও কত লাইসেন্সের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তাহা তোমরাও হয় তো শুনিয়া থাকিবে! পরিশেষে কালার হাতেই যেমন কংসনিপাত হইয়াছিল, তেমনি এই প্রবলপ্রতাপ খোদ কালাচাঁদও যে একদিন সেরি-স্যাম্পেন প্রভৃতি মস্ত-মদিরার দলকে সাগর-পারে তাড়াইতে পারিবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? ব্রজের কালা কংসকে মারিয়া, বৃদ্ধ উগ্রসেনকে মথুরার রাজত্ব দিয়াছিলেন। আমিও যে আমার বিদ্বেষীদিগকে বঞ্চিত করিয়া, বৃদ্ধের দলকেই রাজ্যসুখ দিয়া থাকি, তাহা তাঁহারাও বোধ হয় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। কালার হাতে শিশুপাল নষ্ট হইলেও, তিনি জরাসন্ধের কাছে পরাজিত হইয়াছিলেন। আমার প্রতাপেও শিশুর পাল এক নিমেষে বিনষ্ট হইতে পারে। কিন্তু জরাজীর্ণের কাছে আমি নিতান্তই পরাজিত!

তবে, প্রতাপ অপেক্ষা প্রেমটাই না কি কালাচাঁদের বেশী প্রসিদ্ধ। নামের দোষেই বুঝি আমারও ঐ দোষটা মজ্জাগত রহিয়াছে! প্রেমের দায়েই আমি চিরদিন নিজে মজিয়া আছি, পরকেও কেমন হইয়াছিল, তাহা ভাগবতে আছে। আর আমার প্রেমে মজিয়া, মুসলমান-রাজত্ব—বাঙ্গালীর ঐশ্বর্য্য কেমন উড়িয়াছে, তাহার ইঙ্গিত-আভাস ইতিহাসে পাইবে। আরও কিছুদিনের পুরাণ হইলে, হয় তো সেইসব কাহিনী লইয়া বেদব্যাস আর একখানি পুরাণ তৈয়ারী করিতেন। কালার প্রেমে গোকুলের গোপগণও না কি গোপীভাবে বিভোর হইয়াছিলেন! তবে, আমার প্রেমে পড়িয়া পুরুষেরা যদি পুরুষত্ব বিসর্জ্জন করে, তাহাতে তোমরা আমাকে দোষী কর কেন? কালার প্রেমে গোপীগণ স্বেচ্ছায় সর্ব্বস্ব ছাড়িয়াছিলেন। আর আমার প্রেমেও যে কত কত ধনী, কত সাধ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, তাহা একবার চন্দনগর, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ খুঁজিলেই দেখিতে পাইবে! কালার প্রেমে রাধার দশম দশার কথা, ভাগবতের দশমস্কন্ধে বর্ণিত আছে। আমার প্রেম অযথারূপে সহসা আত্মসাৎ করিয়া, কত শত প্রেমোন্মাদিনী যে দশম দশায় পড়িয়াছেন, তাহারও হিসাব পুলিশরেকর্ডে পাইতে পারিবে। কালার প্রেমের তুলনা নাই—সীমা নাই। সে পীরিতে যে মজিয়াছে, সেই জানে সে প্রেম কেমন! ওগো! আমারও এই অসীম অতুলনীয় প্রেমে যাহারা মজিয়াছে, তাহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করি—তোমরা এ প্রেমের রহস্য কেহ বুঝাইয়া বলিতে পারিবে কি?

শুনিতে পাই, সে কালাকে লোকে অন্তিমের সহায় বলে। মানুষের অন্তিম বয়সে আমি কালাচাঁদও যে কতটা সহায়তা করে, তাহা তোমাদের বাপ-দাদাকে একবার জিজ্ঞাসা করিলেই তো জানিতে পারিবে। লোকে বলে,—সে কালাকে নির্ভর করিতে পারিলে, সকলের সকল অভাব পূর্ণ হয়। আর এই কালাচাঁদকে যাহারা জীবিকারূপে অবলম্বন করিয়াছে,তাহাদের সংসারে কেহ কখনও কোনরূপ অভাব দেখিতে পাইয়াছ কি? ভক্তগণ বলেন,—কালাভক্তগণ কালার বলেই বলীয়ান্—ও

চাহিয়া দেখেন না, যে আমার প্রেমিকগণও আমার অভাবে কেমন দুর্ব্বল—কতখানি অবসন্ন হইয়া পড়েন! তবে আর কত বলিব গো? আমার কীর্ত্তি-কথাতো বলিয়া-লিখিয়া শেষ করিবার নহে! যাহা শুনিয়াছ, তাহাতেই এখন তৃপ্ত হইয়া, অতঃ-পর আমার অভেদাত্মা 'পিনিকের' পরিচয় কিঞ্চিৎ শ্রবণ কর।

'পিনিক্' কথাটা শুনিয়াই অমন ফিক্ ফিক্ করিয়া উঠিলে কেন? বুঝিলে না বুঝি? বুঝিবার উপায়ই বা কি আছে! পিনিকের প্রতিশব্দ তো অভিধানে নাই। ব্যাকরণও ইহার ব্যুৎপত্তি দেখাইতে পারে কই! এ যে বিশ্ববিদ্যালয়েরও বাহিরের কথা! তবু কিন্তু 'পিনিক' কথাটা বাঙ্গালাভাষার মধ্যেই চিরকাল বস বাস করিয়া আসিতেছে। পল্লীসমাজে বা চাষার সংসারে ইহার গতিবিধি ও প্রসার-প্রচলন বড় অল্প নহে। প্রত্নতত্ত্ব-বিদেরা তাহার প্রমাণের প্রয়োজন বোধ করিলে, প্রাচীন প্রেমিকদের কাছে প্রশ্ন করিবেন। তাঁহারা অবশ্যই পিনিকের বিস্তৃত বিবরণ বলিয়া, 'বিশ্ব-কোষের' বার পাতা পূর্ণ করিয়া দিতে পারিবেন! আমি শুধু তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত করিয়াই পিনিকের পরিচয় প্রদান করিতেছি।

এক কথায় বলিতে হইলে, 'পিনিকই' কালা-প্রেমের চরম পরিণতি—পরম পদ! পিনিকের জন্যই কালাচাঁদ এবং কালাচাঁদের জন্যই পিনিক, এসংসারে আবির্ভূত হইয়াছেন! অতএব, কালার সহিত পিনিক ও পিনিকের সহিত কালা, 'বাগার্থাবিব' নিত্যসম্পৃক্ত জানিবে। বৈষ্ণবের সাধ্যশিরোমণি রাধাকৃষ্ণতত্ত্বের সংবাদ রাখ কি? ভক্তগণ বলেন,—সেই রাধাকৃষ্ণের মতই পিনিকে ও আমাতে শক্তি ও শক্তিমানের অচিন্ত্য ভেদা-ভেদ! এতাবত ইহাও প্রমাণিত হইল যে, শক্তিই শক্তিমানের সর্ব্বস্ব। স্ত্রীর অভাবে যেমন পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গ পূর্ণ হয় না, শক্তিহীন শক্তিমানের প্রতিষ্ঠা স্বর্গে মর্ত্তে পাতালেও নাই। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মানস-পুত্রের কথা, পুরাণের কেচ্ছামাত্র। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ বাহির হইয়াছিল, একথাও কি এই বৈজ্ঞানিক যুগে কেহ বিশ্বাস করিতে পারিবে? বস্তুতঃ ব্রহ্মাণী ব্যতীত ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্য্যটাই অসম্ভব। এইরূপ সর্ব্বসংহারকারী শিব ও শক্তির অভাবে শববৎ অশক্ত হইয়া পড়েন! লক্ষ্মীছাড়া বিষ্ণুর এবং অন্নপূর্ণাহারা মহা-দেবের দুর্দ্দশা কেমন হইয়াছিল, অশ্লীল বলিয়া অন্নদামঙ্গল না পড়—গল্পেও কি সে সব কথা কখনও শুনিতে পাও নাই?

ধনীর ঘরে সোফার উপর নব্যা-ভব্যা বউমণির মত কমলবনে ফুল্ল-কমলের উপর যে বীণাপাণি ঠাকরুণটী শুধু বীণা বাজাইয়া ও পুস্তক পড়িয়া স্ফূর্ত্তি করেন, তাঁহারও শক্তি নেহাৎ অল্প মনে করিও না। সরস্বতীর পতিদেবটী কে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কেহ বলে মধুসূদন, কেহ বলে আশুতোষ, কেহ বলে গণনাথ, আবার কেহ কেহ বলিতেছে—ব্রহ্মা প্রথম পক্ষের পিতা হইয়াও, দ্বিতীয় পক্ষে সরস্বতীর পতিত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন! তাহা না হইলে, সকল গ্রন্থের আদি—সমস্ত শাস্ত্রের প্রমাণ—সমগ্র হিন্দুর সর্ব্বস্ব—বেদচতুষ্টয় কি কেবল চারিটী মাথার জোরে ব্রহ্মার মস্তিষ্কে গজাইতে পারিত? এমন অকাট্য প্রমাণ সত্ত্বেও যে ব্রহ্মা-সরস্বতীর সম্বন্ধ সম্বন্ধে এখনও এত মতভেদ আছে, ইহাই আশ্চর্য্য!

তা যিনিই পতি হউন, সরস্বতীর সঙ্গগুণেই যে তিনি বিদ্যা-বুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া গণ্য-মান্য, ইহা তাঁহারা নিজে স্বীকার না করিলেও অন্য কেহ অস্বী-কার করিবেন না। তোমরাও তো দেখিয়াছ,—মেসের বাসায় বাস করিবার কালে, তোমার প্রতি-বেশিনীগণ তোমাকে 'বাসাড়ে' বলিয়া কেমন অবজ্ঞা করিত? আবার সেই তুমি-আজ পরিবার সহ তাঁহাদেরই পাড়ায় থাকিয়া, দেখিতে পাইতেছ

টানিতেছেন? অতএব ঐ স্ত্রীরত্নটীই যে তোমার শক্তি—সম্পদ—সম্ভ্রম—ইজ্জৎ, এক কথায়—তিনিই তোমার সর্ব্বস্ব, তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে? এই শক্তির কল্যাণেই আমরা সংসার পাতিয়া সংসারী হই; তাঁহারই প্রভাবে আমরা পুত্র-কন্যাদি লইয়া গৃহস্থাশ্রমের সুখভোগ করি; আবার সেই অজেয় শক্তির জোরেই আমরা আমাদের বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে ও অক্ষম ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতিকে দূরে তাড়াইয়া, নিষ্কণ্টক হইতে পারি! বলিতে কি, কেহ কেহ নাকি ভাগ্যবলে এই শক্তিটাকে একটু বেশী ঝক্‌ঝকে পাইয়া, অনায়াসেই চাকরীর প্রমোশন বাড়াইয়া লইয়াছেন, এবং বড় সাহেবেরও বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছেন! কত বড় বড় জজ্-বাহাদুরও যে এই শক্তির বিভাবলে 'রায়' লিখিয়া জজিয়তিতে অক্ষয় নাম রাখিয়া গিয়াছেন, সে প্রবাদও এদেশে অবিদিত নহে।

তা' অপরে যে যাহাই করুন, আমি কালাচাঁদ শর্ম্মা, আমার আত্মগ্লানি ভয়ে কখনই সত্য গোপন করিব না।—যে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাটী দিয়া, আমি তোমাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতে আসিয়াছি, সে শলাকাটী যে আমার নিজের নহে, তাহা আমি অকপটেই তোমাদের কাছে স্বীকার করিতেছি! অর্থাৎ, যেসব নূতন তত্ত্বকথা, অতঃপর আমার মুখে শুনিতে পাইবে, সে সব কথা আমার নিজের বলিয়া কেহ মনে করিও না। নিশ্চয় জানিও, কপাটের আড়ালে কর্ত্তাঠাকুরাণীর মত আমার পিছনে আমারই শক্তিশালিনী পিনিক প্রেয়সী দাঁড়াইয়া, তাহা আমার মুখ দিয়া প্রকাশ করিতেছেন!

তোমরা বাঙ্গালী পণ্ডিত। রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের উপর আর কোন তত্ত্বের অস্তিত্বই বোধ হয় স্বীকার কর না! কিন্তু অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের পরেও বৈষ্ণবেরা যে নূতন পঞ্চতত্ত্বের সন্ধান দিয়াছেন, তাহার কোন সংবাদ রাখ কি? সকলে না হউক, একটা দলও যখন সেই পঞ্চতত্ত্বের কাছে মাথা নোয়াইতেছেন, তখন অষ্টাবিংশতি মাত্রই যে তত্ত্বকথার শেষ সীমা নহে, ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে। অতএব ইহাও তোমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছ যে, অনেক তত্ত্ব এখনও 'গুহায়াং নিহিতং' রহিয়াছে। সে অন্ধগুহা হইতে সেসব তত্ত্ব টানিয়া বাহির করিবার শক্তি 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির'ও নাই! সুতরাং এই শক্তি ও শক্তিমান্—অচিন্ত্যশক্তি 'পিনিক' সুন্দরী ও তৎ-সর্ব্বস্ব কালাচাঁদ শর্ম্মাকেই সেই দুঃসাধ্য সাধনে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। তোমরা অকৃতজ্ঞ হইলেও, আশা আছে 'নিরবধি কালের কোনও শুভ মুহূর্ত্তে, বিপুলা পৃথিবীর একটী প্রান্তেও একজন সমজদার একদিন জন্মগ্রহণ করিয়া, এইসকল নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য আমাদিগের শত ধন্যবাদ করিবে। শুধু সেই আশাতেই বুক বান্ধিয়া, আমরা এই গুরুশ্রমসাধ্য আবিষ্কার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু, কোন মৌলিক গ্রন্থ লিখিতে হইলে, একবারে ঝুপ্ করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করাটা সনাতন রীতি নহে। আমার এই নূতন তত্ত্বগুলি উত্তরসাধকের সহায়তা পাইলে, মৌলিকত্বে রঘুনন্দনের নব্যস্মৃতি অপেক্ষাও যে অধিক উচ্চ আসন অধিকার করিবে, তাহাতে আমার সন্দেহ মাত্র নাই। এইজন্যই গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে আমাকেও এই উপোদ্ঘাত অধ্যায় লিখিতে হইল। ইহাতে গ্রন্থকারের পরিচয়, প্রতিদ্বন্দ্বী লেখকের প্রতি আক্রমণ ও গ্রন্থের 'প্রয়োজনাভিধেয়সম্বন্ধাঃ' পাঠকগণ অবগত হইতে পারিবেন।

ইতি উপোদ্ঘাতো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ছেলের ব্যবসা।

গত ৪ঠা মার্চ্চ রবিবার ১৯১ নং লোয়ার চিৎপুর রোডস্থ কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের ভবনে সমগ্র বঙ্গের বৈদ্যসন্তানগণের এক সম্মেলন হইয়াছিল ; সম্মেলনক্ষেত্রে কলিকাতা ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাশ গুপ্ত এম্, এ, বি এল্, হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী এম্, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেন বি, এল, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত এম্, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র গুপ্ত এম্, এ, বি, এল, কবিরাজ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন, এম্, এ প্রমুখ অনেক শিক্ষিত ও পদস্থ বৈদ্যসন্তান উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার এম্, এ, বি, এল, মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মাননীয় সভাপতি মহাশয় স্বীয় অভিভাষণে পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বৈদ্যসন্তানগণের সমন্বয় ও আদান-প্রদান, এবং পৈশাচিক বর-পণ প্রথা সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছিলেন তাহাই উল্লেখযোগ্য। এবিষয়ে তাঁহার অভিভাষণের সারমর্ম্ম এই যে, যে কারণেই পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বৈদ্যসন্তানগণের আচার-বৈলক্ষণ্য বিদ্যমান থাকুক না কেন, তাহার সমন্বয় করিয়া উভয় বঙ্গের মধ্যে আদান প্রদান প্রচলিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। অধুনা বর-পণের প্রাচুর্য্যে সমাজ যেরূপ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে এরূপ সমন্বয় যে নিতান্ত বাঞ্ছনীয় এবং অবশ্যকর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। অধুনা দিন দিন বরপণের মাত্রা যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা দেখিয়া স্বতঃই মনে হয়, ইহা ছাগল, ভেড়া, শূয়র প্রভৃতি পশু বিক্রয়ের রূপান্তর মাত্র। বৈদ্যজাতির কুল কন্যাগত। আবহমান কাল হইতে বিবাহে কুলোচিত পণ ৬৲ টাকার অধিক প্রচলিত ছিল না। এখন আর সেই কুলজির দোহাই "পাশের" পরিমাণানুসারে মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে। স্থলবিশেষে দেখা যায় যে, প্রত্যেক 'পাশের' মূল্য হাজার টাকাও অতিক্রম করিয়া উঠে ; ইহাতে কুলীন-মৌলিকে ইতর বিশেষ নাই। এখন 'পাশ'ই কুল। সভাপতি মহাশয় এইসকল বিষয় আলোচনা করিয়া যুবক দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, **তোমরা তোমাদের পিতা মাতাকে যথাসাধ্য অনুনয় বিনয় করিয়া—তাঁহাদের পায় ধরিয়া এই ভিক্ষা মাগিবে—তাঁহারা যেন তোমাদিগকে এরূপভাবে বিক্রয় না করেন।**

তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে,—'বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হইয়া যদি এরূপ পৈশাচিক প্রথার প্রশ্রয় দিতে কুণ্ঠাবোধ না কর, তাহা হইলে তোমাদের এই শিক্ষাকেও ধিক্!' সমাগত বৈদ্যসন্তানগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন,—'আপনারা সমাজের এই সমস্ত পৈশাচিক ঘটনাবলী যতদূর সংগ্রহ করিতে পারেন প্রকাশ্য সংবাদ পত্রে তাহা প্রকাশ করিয়া সাধারণের গোচর করেন, ইহা আমার একান্ত অনুরোধ।'

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের পূর্ব্বোল্লিখিত উক্তিগুলি যে সমাগত বৈদ্যসন্তানগণের সকলেরই প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল একথা মনে করা যায় না। যাহা হউক, ধন্বন্তরি পত্রের প্রচারকাল হইতে এ পর্য্যন্ত বরপণের অত্যাচার সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হইয়া আসিতেছে,—অত্যাচারের অনেক দৃষ্টান্তও প্রদর্শিত হইতেছে,—তাহা দেখিয়া মফস্বলস্থ কোন মহকুমার একটী উকীলবাবু বিদ্বৎসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেন বি, এল, মহোদয়কে একখানি চিঠি লিখিয়াছেন। চিঠিখানি ইংরেজী ভাষায় লিখিত। যতীন বাবু হাইকোর্টের উকীল হইলেও বাঙ্গালী-

নিকট ইংরেজী ভাষায় চিঠিপত্র আদান-প্রদানে, অথবা কথাবার্ত্তায় বিজাতীয় ভাষা প্রয়োগ করাটা তিনি পছন্দ করেন না। অধিকন্ত 'ধন্বন্তরি' পত্র জাতীয় পত্রিকা, জাতীয় ভাষায় পরিচালিত; এতল্লিখিত কোন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে জাতীয় ভাষায় আলোচনা করাই শ্রেয়ঃ। পত্রলেখক মহাশয়ও একজন বি, এল,—উকীল। লেখা পড়ায় ইংরেজী ভাষা প্রয়োগ না করিলে অনেকে বি, এল, উপাধির, সম্মানের লাঘব হয় বলিয়া মনে করেন। সম্ভবতঃ এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি ইংরেজী ভাষায় চিঠি লিখিয়াছেন। নতুবা বাঙ্গালা মাসিকপত্রে বাঙ্গালা ভাষায় আলোচিত বাঙ্গালীসন্তান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের আলোচনায় বাঙ্গালীসন্তান বিজাতীয় ভাষা প্রয়োগ করিবেন কেন! উকীলবাবুর চিঠি খানি এইজন্যই অবিকল প্রকাশ না করিয়া, আবশ্যকীয় বিষয়গুলি উদ্ধৃত করা গেল। আমাদের বিশ্বাস, ইহা দ্বারাই পাঠকবর্গ উকীল বাবুর যুক্তিতর্কের সারবত্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

উকীল বাবুর প্রেরিত পত্রের মুখবন্ধে লিখিত আছে,—

I have read your article 'বরের বাপের অভিমান' published in the Paush issue of your "Dhanvantari." I am well acquainted with both * * Babu & * * Bu. the father of the bride-groom and bride respectively in this case. Your attack on * * Bu. is highly unwarranted. That gentleman had a marriageable daughter when the proposal of his son's marriage with * * Babu's daughter was going on. * * Babu's son was a student reading for the Intermediate Examination at that time. * * Babu is himself a medical man and entertains strong views against marriage at an early age. But in spite of these considerations he had to marry his son, and for without that the gentleman was quite helpless as regards his daughter's marriage, and it was with the dowery which his son received that he had to marry his daughter. * * * Babu was also at that time eager to get his daughter married and it was to the mutual advantage of both the parties that this match was settled and * * Babu gave Rs. 700 to * * Babu's son.

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, পৌষের ধন্বন্তরি-পত্রে 'বরের বাপের অভিমান' শীর্ষক আপনার প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি। আমি এই ঘটনার বর ও কনের পিতা * * বাবু এবং * * বাবুর সহিত বিশেষ পরিচিত। বরের পিতাকে এরূপ ভাবে আক্রমণ করা আপনার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। এই ভদ্রলোকের একটী বিবাহযোগ্যা কন্যা ছিল। যখন * * বাবুর কন্যার সহিত * * * বাবুর পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছিল, তখন * * * বাবুর পুত্র ইণ্টারমিডিয়েট পড়িত। * * * বাবু একজন ডাক্তার; তিনি অপরিণত বয়সে বিবাহের ঘোরতর বিরোধীসত্বেও এসময়ে পুত্রের বিবাহ না দিলে তাঁহার কন্যার বিবাহের অন্য উপায় ছিল না। সুতরাং তাঁহার পুত্র যে যৌতুক পাইয়াছিল তদ্দ্বারা কন্যার বিবাহ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। * * * বাবুও এই সময় তাহার কন্যার বিবাহের জন্য নিতান্ত আগ্রহান্বিত ছিলেন; সুতরাং উভয়ের সুবিধাক্রমে বিবাহের প্রস্তাব স্থিরীকৃত হয়, * * * বাবু * * * বাবুর পুত্রকে ৭০০৲ টাকা দেন।

ধন্বন্তরির পাঠকবর্গ অবশ্যই 'বরের বাবার অভিমান" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, এবং এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা যে এত শীঘ্র বিস্মৃত হইয়াছেন তাহা মনে করিতে পারি না। যাহা হউক, উকীল বাবুর পত্রের ভাবে বুঝা যায়,এই ক্ষেত্রে কনেরবাবা

বরের বাবা মহাশয় নিজের কন্যাদায় মুক্ত হইয়াছেন। অতএব এবিষয় অবলম্বন করিয়া বরের বাবাকে কোন কথা বলা 'ঘোরতর অন্যায়সঙ্গত!' আজকাল কন্যার বিবাহের প্রস্তাব লইয়া বরের বাবাদের নিকট উপস্থিত হইলে, কোন কোন বরের বাবা বলিয়া থাকেন,—'এ সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা; পণ অথবা যৌতুক স্বরূপে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করা আমার নিকট গোরক্ত-গোমাংস! আমি এ সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না, আমার গৃহিণীই ছেলের কর্ত্তা; তাহার নিকট যান, তিনি যাহা করেন তাহাই হইবে।" কেহ কেহ বরের পিতৃব্যের কর্ত্তৃত্বে ছেলেকে ছাড়িয়া দিয়াও এ হেন উদারতা দেখাইতে প্রয়াস পান! আমাদের এই পত্রলেখক উকীলবাবু, দেখিতেছি, বরের বাবার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে যাইয়া খোদ বরের স্কন্ধে এই দোষটী চাপাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন! পত্রলেখক উকীল বাবু বোধ হয় জানেন না যে, উক্ত প্রবন্ধলেখকের অনেক আত্মীয়-স্বজন বিবাহক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, এবং বিবাহের প্রস্তাব হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাবতীয় সংবাদ তাঁহার অগোচর নাই। নগদ ৭০০৲ টাকা নহে, ৯০০৲ টাকা যে বরের বাবা মহাশয় স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, বর বাবাজি গ্রহণ করেন নাই, ইহা কি তবে মিথ্যা কথা?

উকীল বাবুর পত্রে ইহাও আছে যে,—

"Over and above this amount he had to pay Rs. 50၁ more in hard cash to get his daughter married, and besides had to undertake the charge of the Education of his son-in-law. * * * Babu is a Sub Asstt. Surgeon on a monthly pay of Rs. 55 only. What do you suggest a man of his means and position should have done."

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে,—'এই টাকার উপরেও বরের বাবা আরও ৫০০৲ টাকা নগদ দিয়া বাবাজীর শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। * * বাবু (বরের বাবা) মাসিক ৫৫৲ টাকা বেতনে একজন সব এসিষ্টাণ্ট সার্জন। এরূপ অবস্থাপন্ন লোকের ইহা ছাড়া আর কি করা কর্ত্তব্য বলিয়া আপনি মনে করেন?"

উকীল বাবুর চিঠির এই অংশটুক পাঠ করিয়া আমাদের ইহাই মনে করিতে ইচ্ছা হয় যে,—তিনি যে বরের বাবার পক্ষসমর্থন করিতেছেন, তিনি যে তাঁহার বৈবাহিকের স্কন্ধে স্বীয় পুত্রের শিক্ষার ভার চাপান নাই, ইহাতে বরং যথেষ্ট উদার প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন! ইহাই মনে করিয়া লইতে হইবে কি? পত্রলেখক উকীল বাবুর ব্যবস্থা যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে সমাজ, বরের বাবার প্রতি ততটা উদারতা প্রদর্শন করিতে নিতান্তই অসমর্থ। আজকাল কলেজী বিদ্যা বড়ই দুর্ম্মূল্য; মাসিক ৩০৲।৩৫৲ টাকার কমে একটী ছাত্রের খরচা কুলায় না। যিনি এরূপ গুরুতর ভার গ্রহণ করিতে সমর্থ, তিনি নিজ কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রতিকূলে অল্পবয়স্ক পুত্রকে বর সাজাইয়া সামান্য ৯০০৲ টাকা গ্রহণ না করিলেও পারিতেন! অন্ততঃ তাঁহার ন্যায় একজন পদস্থ লোকের তাহা করাই উচিত ছিল। তিনি পুত্রের বিনিময়ে ৭০০৲ কি ৯০০৲ গ্রহণ করিয়া ১২০০৲ টাকা দ্বারা আর একটী ক্রয় করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার উদারতা সমাজের চক্ষে প্রতিপন্ন হইতেছে না বলিয়া আমরাও দুঃখিত।

উকীল বাবু অপর একস্থানে লিখিয়াছেন,—

"I say nothing in support of the practice of extorting doweries now-a-days prevalent in our society. But why publish virulent and obsence attacks on gentleman who are the victims of the practice rather than its supporters."

অর্থাৎ—সমাজে নিপীড়নপূর্ব্বক পুত্রের বিবাহে পণ ও যৌতুক গ্রহণপ্রথার আমি পক্ষপাতী নহি।

থাকুক বরং নিপীড়নে নিপীড়িত, সেই সকল ভদ্রলোকদিগকে তীব্র ও অশ্লীল ভাষায় আক্রমণ করা কেন?

পত্র লেখক মহাশয়ের এই উক্তির সার্থকতা তাঁহার নিজ কথাতেই পণ্ড হইয়াছে দেখিয়া আমরা আরও দুঃখিত! যাঁহার কন্যা আছে, তিনি পুত্রের বিনিময়ে অর্থগ্রহণ করিলে তাহা দোষের হইবে না, অপরে হইবে, তিনি বরের বাবার পক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন! অতএব তিনি যে সমাজের এই নিষ্ঠুর প্রথার পৃষ্ঠপোষক নহেন, একথা বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেছেন কেন, বুঝিতে পারা যায় না। যাহা হউক, সত্য কথা যে অনেকের নিকটেই অপ্রিয় বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক; কিন্তু তাহা বলিয়া যাঁহারা সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী, সমাজ হইতে কুপ্রথা তিরোধানে যাঁহারা সচেষ্ট, তাঁহারা সমাজের—সামাজিকের আচরিত দুষ্ক্রিয়াগুলি সমাজের চক্ষে ধরিয়া দিলে কুণ্ঠাবোধ করিলে চলিবে কেন? ইহাকে যিনি virulent (উগ্র) বলিয়া মনে করেন, তিনি নিরপেক্ষ নহেন। উকীলবাবু আলোচ্য প্রবন্ধকে obscene (অশ্লীল) বলিয়া উল্লেখ করিতে যাইয়া নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসুর 'বাবু' প্রহসনের বাঞ্ছারামের কথাটী মনে করিয়া দিয়াছেন! বাঞ্ছারাম সাধুখাঁর পিতার নাম প্রাণকৃষ্ণ সাধুখাঁ। লোকে তাহাকে 'পরাণে কলু' বলিয়া ডাকিত। দুই পাতা ইংরেজী পড়িয়া বাঞ্ছারাম 'ধর্ম্মধ্বজ বাবু' হইয়া দেশোদ্ধারক দলের একজন চাঁই হইয়াছিলেন! বাঞ্ছারাম 'নিরাকার পিতার' উপাসক বলিয়া সাকার পিতা 'প্রাণকৃষ্ণকে' ডাইভোর্স করিয়াছিলেন। কেহ তাহার সাকার-পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন,—'নামটা বড় অশ্লীল'—অর্থাৎ নামে 'প্রাণ' শব্দটী আছে,—এই শব্দটীই অশ্লীল। 'বরের বাবার অভিমান' শীর্ষক প্রবন্ধে এরূপ বাঞ্ছারামী

না। তবে যে সকল বাঙ্গালীসন্তানের মাতৃভাষা বাঙ্গালাভাষাটা অরুচিকর, তাঁহাদের শ্লীলতা ও অশ্লীলতার সহিত জনসাধারণের সম্বন্ধ অতি সংকীর্ণ।

পত্র লেখক উকীল বাবু উক্ত প্রবন্ধের সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন,—

"The article is couched in highly offensive language and shows very bad taste."—একথাটী আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। যাঁহারা ছেলের ব্যবসায় অর্থাগমের প্রত্যাশী, এবং যাঁহারা তাঁহাদের মতের পোষকতা করেন, তাঁহাদের নিকট এসকল প্রবন্ধের ভাষা বিরক্তিকর না হইয়া পারে না। যাঁহারা সমাজের হিতকাঙ্খী, ছেলের ব্যবসাকে যাঁহারা কসাইয়ের ব্যবসা বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের রুচির সহিত উক্ত শ্রেণীর লোকের রুচি ঢের তফাৎ।

উকীল বাবুর সুদীর্ঘ পত্রের যাবতীয় কথাগুলির সমালোচনা এই ক্ষুদ্রকলেবর ধন্বন্তরিপত্রে বিস্তৃতভাবে হওয়া অসম্ভব। অতএব এ সম্বন্ধে আর দুই একটী কথা বলিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। উকীল বাবু লিখিয়াছেন,—I had a personal talk with * * * Babu on the subject and he is surprised to find such publications finding place in your paper., অর্থাৎ আমার সহিত * * * বাবুর এসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, এবং তিনি আপনার কাগজে ইহা স্থান পাইয়াছে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন।

ফলে তাঁহার বিস্মিত হইবার কতকটা কারণ আছে বই কি! * * * বাবু অর্থাৎ বরের বাবা এবং কনের বাবা যে, প্রবন্ধলেখকের সহিত অল্পবিস্তর সম্পর্কিত ইহা বরের বাবা মহাশয় অবগত আছেন। এরূপ স্থলে তাঁহার অপ্রীতিকর কোন কথা প্রবন্ধে স্থান পাইলে তাঁহার বিস্ময়োৎ-

বিষয় এই যে, প্রবন্ধলেখক সমাজের দাস; সমাজের কল্যাণ সাধনে আত্মপর তারতম্য করিয়া কথা বলিলে নিরপেক্ষতা রক্ষা পায় না। একথা 'মেডিক্যাল জুরিস্পুডেন্সে' না থাকিলেও 'লিগেল অথবা মর্যাল জুরিস্পুডেন্সে' আছে বলিয়া মনে করা যায়।

উকীল বাবুর আর একটী উক্তি দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি! তিনি বলেন,—"We have got evidence to show that a gentleman who is not friendly to either of the parties is pulling the wire from the background and getting these things published simply to annoy * * * Bu.—and * * * Bu into false position. That gentleman has actually written a card threatening such publication in future if some private difference are not settled." ইহার মর্ম্মার্থ এই যে,—আমরা এরূপ প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারি যে, এই উভয় বাবুকে (বরের বাবা ও কনের বাবা) অপদস্থ করিবার জন্য ইহাঁদের শত্রুস্থানীয় কোন ভদ্রলোক যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া এ সকল কার্য্য করিতেছেন। এই ভদ্রলোকের সহিত যে মনোমালিন্য আছে, তাহার মীমাংসা না হইলে তিনি এরূপ আরও অনেক কথা প্রকাশ করিবেন এরূপ শাসাইয়া এক কার্ড লিখিয়াছেন।

আলোচ্য প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, নিজ মতলব হাসিল করিবার জন্য যবনিকার অন্তরাল হইতে উস্কাইয়া দিবার জন্য কোন লোকের সাহায্য গ্রহণ করা হয় নাই, অথবা কাহারও প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ধন্বন্তরিতে এই প্রবন্ধ স্থান পায় নাই। উক্ত প্রবন্ধলেখক যে উভয় পক্ষেরই অল্পবিস্তর সম্পর্কিত, পূর্ব্বেই এ কথা বলা হইয়াছে। তিনি উভয় পক্ষেরই ঘরের ঘটিতেছে, তাহার সমস্ত সমাচার জানিবার সুবিধা পান। তিনি যাহা জানিবার সুবিধা পান, তাহাতে অতিরঞ্জিত কিছু থাকিবার সম্ভাবনা নাই। উকীল বাবু সম্ভবতঃ তাহা জানেন না; তাই তাঁহাকে গুটি দুই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি,—ছেলের মূল্য বাবদ ৯০০৲ টাকার স্থলে ৭০০৲ টাকা গ্রহণের কথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন! কিন্তু (১) কনের বাবা ধন্বন্তরি কার্য্যালয়ে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন বলিয়া বরেরবাবা-বাবু তাঁহাকে নির্য্যাতন এবং ছেলেকে পুনর্ব্বিবাহ করাইবেন বলিয়া শাসাইয়াছেন কিনা?

(২) তিনি তাঁহার পুত্রবধূকে পিত্রালয়ে চিঠি পত্র লিখিতে বারণ করিয়াছেন কিনা?

এতদ্ভিন্ন উকীল বাবুকে আরও অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিবার ছিল, আপাততঃ তাহা হইতে বিরত রহিলাম।

উকীল বাবু অবশ্যই অবগত আছেন যে, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর পক্ষে চামড়া, জুতা, ছাগল, ভেড়া, গরু, শূকর প্রভৃতির ব্যবসা করা নিষিদ্ধ। আজ কাল কিন্তু তাহার প্রাবল্য ও বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দেখিয়া যদি দশজনে দশ কথা বলে, তাহা হইলে তাহাদের মুখে চাপা দিবার যো নাই। ছেলের বিবাহটা আজকাল 'ছেলের ব্যবসার' মধ্যেই দাঁড়াইয়াছে! এই ব্যবসায় বাঁধাবাঁধি একটা দর নাই, highest bidder যিনি, তিনিই ক্রয় করিতে পারেন। কিন্তু এই বেচা-কেনার ক্রেতা, ক্রীত দ্রব্যের অধিকারী হন না, সুতরাং বিক্রেতার দ্বিগুণ লাভ। কনের বাবা বরের বাবার ছেলেকে লেখা পড়া শিখাইবেন,—উপর্জ্জিত অর্থ ভোগ করিবেন বরের বাবা মহাশয়! এরূপ লাভজনক ব্যবসার প্রতিকূলে যাঁহারা কথা বলেন, অথবা এরূপ ব্যবসা বন্ধ করিবার জন্য যাঁহারা প্রয়াস পান, ব্যবসাদার মহাশয়েরা যে তাহাতে সন্তোষ লাভ করিতে পারেন

'বিদ্বৎসভা' এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীগণের প্রতিকূলে অভিযান করিতেছেন এবং করিবেন।

আমাদের বিশ্বাস, পত্রলেখক উকীল বাবু তাঁহার লিখিত যাবতীয় কথারই উত্তর পাইয়াছেন। তিনি স্বয়ং একজন বৈদ্যসন্তান, শিক্ষিত এবং পদস্থ। সমাজ হইতে এই শুক্রবিক্রয় প্রথা তিরোহিত করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্বৎসভা যেটুকু প্রয়াস পাইতেছেন, তাহাতে তাঁহার সহানুভূতির আশা করা দুরাশা নহে। আমরা এই আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে বিদ্বৎসভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে অনুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করিলাম না। আশা করি, তিনি সম্মতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক আমাদিগের সহায় হইতে কুণ্ঠিত হইবেন না। কোন বিশেষ কারণে আমরা বর ও কনের বাবা এবং পত্রলেখক উকীল বাবুর নাম প্রকাশে বিরত রহিলাম।

ব্যবসায় জাতীয়তা রক্ষা।

স্বজাতির সম্মানরক্ষা, এবং তৎপ্রতি উদারতা ও দয়া প্রদর্শন যে সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু স্থল বিশেষে তাহার বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই বৈলক্ষণ্য ন্যায়ানুমোদিত কিনা, তাহার মীমাংসা নিতান্ত জটিল না হইলেও, অবস্থা ও বিষয়ভেদে তাহা কিয়ৎপরিমাণে জটিল বলিয়া বোধ হয়।

সম্প্রতি বিদ্বৎসভার একজন বিশিষ্ট সভ্য কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন,—"অমুক কবিরাজ আমার কোন আত্মীয়ের বাটী হইতে দর্শনী ১৬৲ টাকা ও মটর গাড়ীর ভাড়া বাবদ ২৲ টাকা গ্রহণ করিয়াছেন; বৈদ্যসন্তানের নিকট হইতে বৈদ্যসন্তানের এরূপ দর্শনী ও গাড়ী ভাড়া গ্রহণ করা ন্যায়সঙ্গত নহে।"

কথাটা শুনিয়া সত্য সত্যই একটু খট্‌কা লাগিল। কথাপ্রসঙ্গে অপর একটী সভ্যের নিকট এই কথাটীর উল্লেখ করিলে, তিনি বলিলেন,—"এই নীতির পথপ্রদর্শক অমুক কবিরাজ মহাশয়। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে স্বজাতীয়ের নিকট হইতে দর্শনী গ্রহণ করিয়াছেন। যিনি আপনাকে এই কথাটী বলিয়াছেন, তিনি তাঁহারই দলের লোক, এবং তিনি এই সমাচার সম্যক অবগত আছেন।"

এই কথাটী স্থানীয় বৈদ্যসমাজের মধ্যে বেশ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এবং ভিন্ন ভিন্ন লোকে স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী মতামত প্রকাশ করিয়া নিরস্ত হইতেছেন; কিন্তু কোনরূপ একটা ন্যায়-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে দেখা যাইতেছে না। বাস্তবিক বিষয়টী একটু জটিলই বটে।

এই কথা উপলক্ষ করিয়া একটী উদীয়মান ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"আজ আমার ৬টী professional call ছিল, কিন্তু স্বজাতীয়ের বাটীর রোগী দেখিয়া, মাত্র দুইটী ডাকে যাইতে পারিয়াছি, আর চারিটীতে পারি নাই।" এইটা কিন্তু সাংঘাতিক কথা! এরূপ ব্যবস্থায় যে নিজের রুটীর উপর হাত পড়ে! সারাদিন যদি স্বজাতীয় রোগীর প্রতি উদারতা অথবা দয়া প্রদর্শন করিয়াই বেড়াইতে হয়, তাহা হইলে ত আর পেট চলিবার ব্যবস্থা থাকে না!

যে সকল স্বজাতীয় রোগী প্রকৃত প্রস্তাবে দুরবস্থাপন্ন,—কায়ক্লেশে যাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন চলিতেছে, তাহারা দয়ার পাত্র,—তাঁহাদের প্রতি দয়াপ্রদর্শন না করিলে, হয়ত, চিকিৎসার অভাবে

স্থলে দয়া প্রদর্শন না করা নিতান্ত নৃশংসতার কার্য্য। কিন্তু যাঁহারা অবস্থাপন্ন,—স্বজাতীয় চিকিৎসকের অভাবে যাঁহারা অপর চিকিৎসক ডাকিতেও কষ্ট অনুভব করেন না, তাঁহারা স্বজাতীয়ের নিকট এরূপ উদারতা অথবা দয়ার প্রত্যাশা না করিলেও বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা যায় না।

যে স্থলে রোগী ও চিকিৎসক উভয়েই সম্পন্ন এবং পরস্পর প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ, সেস্থলের ব্যবস্থা আরও একটু স্বতন্ত্র। এক্ষেত্রে চিকিৎসককে দর্শনী অর্পণ করিতে রোগী যেমন সঙ্কোচ বোধ করেন, অপরদিকে চিকিৎসকও তাহা গ্রহণ করিতে অসঙ্কুচিত হইতে পারেন না। ইঁহারা বিবাহাদি শুভকর্ম্মে যৌতুকাদির আদান-প্রদানে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিয়া যান। এসকল ক্ষেত্রে চিকিৎসক মহাশয়েরা রোগী দর্শনেও যতটা তৎপরতা প্রদর্শন করেন, অন্যত্র,—এমন কি যেস্থান হইতে যথাযোগ্য দর্শনী পাইবার প্রত্যাশা আছে, সেস্থলেও ততদূর নহে। আমাদের বিশ্বাস, যদি মানবজাতির প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রদর্শন করাই ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে যেস্থলে অর্থের প্রত্যাশা একেবারেই নাই, অথচ রোগীও গত্যন্তরবিহীন, সেস্থলেই তৎপরতা প্রদর্শন করা সর্ব্বথা ন্যায় ও ধর্ম্ম সঙ্গত।

আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের বিধানানুসারে রোগীকে ঔষধ বিতরণের ব্যবস্থা থাকিলেও সে ব্যবস্থা অনেককাল সমাজ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে! এখন যাঁহারা স্বীয় আলয়ে বসিয়া ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও যে কেবল ঔষধের মূল্য গ্রহণ করিয়াই রেহাই দেন, এরূপ নহে; কেহ কেহ এই ব্যবস্থা প্রদানেও অর্দ্ধেক দর্শনী গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না! এসমস্ত ব্যবহারগুলি এখন চলৃতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং এসম্বন্ধে আপসোস্ করা বৃথা।

আরও একটী উল্লেখযোগ্য কথা আছে। বৈদ্যসন্তানমাত্রেই যদি বৈদ্য-চিকিসকের নিকট হইতে এরূপ উদারতা অথবা সমবেদনার প্রত্যাশা করেন, তাহা হইলে ব্যবসা চলে না। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা বৈদ্যসন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া স্বজাতির প্রতি সমবেদনা প্রদর্শন, অথবা স্বজাতীয় অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করিতে কুণ্ঠিত, তাঁহাদের প্রতি কোন বৈদ্যসন্তানের সমবেদনা প্রকাশ করা উচিত নহে। যাহারা এরূপ স্বভাবাপন্ন বৈদ্যসন্তানের নিকট সমবেদনার প্রত্যাশা করা তাঁহাদের পক্ষে ঘোরতর স্বার্থপরতা!

স্বর্গীয় অনারেবল গুরুপ্রসাদ সেন।

[শ্রীচিন্তাহরণ সেন শর্ম্মা।]

বিক্রমপুর ডোমসার গ্রামে ১২৪৯ সনের ৮ই চৈত্র স্বর্গীয় অনারেবল গুরুপ্রসাদ সেনের জন্ম হয়। গুরুপ্রসাদ সেনের এক বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতা কাশীচন্দ্র সেনের মৃত্যু হয়। কাশীচন্দ্র সেনের আর্থিক অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল না থাকায় তাঁহার দিয়া গ্রামস্থ জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাধানাথ সেনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সারদাসুন্দরী যেমন বুদ্ধিমতী তেমনই তেজস্বিনী, শুদ্ধাচারিণী এবং পরদুঃখকাতরা ছিলেন। মাতার শিক্ষার গুণে সুসন্তান প্রায়ই ভাল হইয়া থাকে। গুরুপ্রসাদ সেন যে উত্তরকালে

গিয়াছেন, তদীয় জননীর বুদ্ধি ও চরিত্র বলই তাহার প্রধান কারণ। মাতুল রাধানাথ সেনের কোনও পুত্র-সন্তান ছিল না। তিনি গুরুপ্রসাদ সেনকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন।

তৎকালে বিক্রমপুরে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হয় নাই; প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রামে পার্শী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শিক্ষার পাঠশালা ছিল। অতএব গুরুপ্রসাদ সেনও বাল্যকালে এইরূপ এক পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন। বিদ্বান বলিয়া তদীয় মাতুল রাধানাথ সেনের সর্ব্বত্র খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল এবং তিনি ময়মনসিংহ জজ আদালতে ওকালতী করিয়া করিয়া যথেষ্ট অর্থ ও খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তিনি নিজে ইংরাজী অভিজ্ঞ ছিলেন না, কিন্তু তিনি ইংরাজীবিদ্যার ক্ষীণ আভা চতুর্দ্দিকে প্রচলিত দেখিয়া ইংরাজী বিদ্যাশিক্ষার নিতান্ত আবশ্যকতা বোধে ভাগিনেয়কে ইংরাজী বিদ্যায় শিক্ষিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, এবং নিজ কার্য্যস্থল ময়মনসিংহ ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দেন। গুরুপ্রসাদ সেন অতিশয় মেধাবী ছিলেন; তথায় তিনি বিশেষ সুখ্যাতির সহিত এণ্ট্রান্স পাশ করেন। তৎপর তিনি ঢাকা কলেজ হইতে যথাসময়ে এফ, এ পাশ করিয়া ২০৲ টাকা বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। ইহার পর তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে যথাসময়ে সুখ্যাতির সহিত বি, এ, পাশ করেন এবং ঐ কলেজ হইতেই ঢাকা ডিভিসনের মধ্যে প্রথম হইয়া এম্, এ, পাশ করেন। গুরুপ্রসাদ সেন বিক্রমপুরের প্রথম বি, এ; তাঁহার পূর্ব্বে বিক্রমপুরের আর কেহই বি, এ, পাশ করেন নাই। কথিত আছে যে, তিনি বাড়ী আসিলে বিক্রমপুরের অধিকাংশ গ্রামের লোকই তাঁহাকে দেখিতে আসিত, এবং এত ভিড় হইত যে তাঁহার নিকটে যাওয়া সকলের পক্ষে সম্ভবপর হইত না।

তদনন্তর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রফেসারের কার্য্য গ্রহণ করেন এবং তথা হইতেই বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। তৎপর তিনি ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে কৃষ্ণনগরে যান এবং তথা হইতে বাঁকীপুর বদলী হন। বাঁকীপুর যাইয়াই তাঁহার সৌভাগ্যসূর্য্য উদিত হয়। তিনি অতীব ন্যায়পরায়ণ, স্বাধীনচেতা ও স্বার্থত্যাগী লোক ছিলেন। তিনি বাঁকীপুরে যখন ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে পাটনার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত কোন বিষয়ে মতদ্বৈধতা ঘটায় তিনি ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী চাকুরী স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া, উক্ত বাঁকীপুরেই ওকালতী ব্যবসা আরম্ভ করেন। তথায় তিনি তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ যাপন করিয়া তদঞ্চলের যথেষ্ট উন্নতি বিধান করিয়া গিয়াছেন। তিনি বাঁকীপুরের একজন প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ উকিল ছিলেন এবং তাহাতে তাহার পসার প্রতিপত্তিও যথেষ্ট ছিল। তিনি ওকালতী করিয়া অনেকানেক সৎকার্য্য করিয়া সকলের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

নীলকর সাহেবগণ যে কিরূপ অত্যাচারপরায়ণ ছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন। তৎকালে বিহারঅঞ্চলে নীলকর সাহেবদিগের অত্যন্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। তিনি অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রমে নীলকরদিগের অত্যাচার প্রশমিত করেন। এতদ্ভিন্ন তত্রত্য রাজপুরুষগণ অনেক সময়ে খামখেয়ালী প্রভৃতি দ্বারা প্রজাগণকে অযথা অত্যাচারে উৎপীড়িত করিতেন; তিনি এই সমস্ত অত্যাচার কাহিনী গভর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করিয়া অত্যাচারের প্রতীকার করেন। তত্রত্য জমীদারবৃন্দের নানাবিষয়ে অসুবিধা নিবারণ কল্পে Behar Landholder's Association নামক এক সভা স্থাপন করিয়া তত্রত্য ভূস্বামীগণের রাজনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে অনেকানেক উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি জীবনের শেষসময় পর্য্যন্তও সেই সভার সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত থাকিয়া অতিশয় যোগ্যতার সহিত উহার পরিচালন করিয়া বিহার অঞ্চলের জমীদারবৃন্দের অনেক

অসুবিধা দূরীভূত করেন। তৎপর বেহারঅঞ্চলের সকলের অভাব অভিযোগ প্রভৃতি গভর্ণমেণ্টের নিকট জানাইবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ Behar Herald নামক ইংরাজী সংবাদপত্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহাই তদঞ্চলের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান সংবাদ-পত্র। উক্ত পত্রিকাখানি আজ পর্য্যন্তও বর্ত্তমান থাকিয়া মহাত্মা গুরুপ্রসাদ সেনের নাম সকলের নিকট জাগরূক রাখিতেছে। রাজপুরুষগণ কি অন্য কোনও প্রকারে কাহারও দ্বারা কোনও অত্যাচার কি অবিচার প্রভৃতি হইলে তিনি নিজেই উহাতে তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। এইসব কারণে সকলেই তাঁহাকে বিশেষ ভয় করিত।

তৎকালে বেহার অঞ্চলে কোনওরূপ ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল না, সুতরাং সেখানে উচ্চশিক্ষালাভের সুবিধা ছিল না। তিনি সেই অভাব দূরীকরণ মানসে বাঁকীপুরে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহার পরিচালনের ভার কোনও এক সুযোগ্য ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করেন। পরিশেষে উক্ত স্কুলটী বর্ত্তমান T. K. Ghosh's Academyর সহিত মিলিত হয়।

তাঁহার অন্তঃকরণ প্রকৃত মহত্ত এবং উদারতা পূর্ণ ছিল এবং তিনি পরদুঃখকাতর ছিলেন। ছোট বড় সকলকেই তিনি সমান আদর করিতেন, এবং এত বড় লোক হইয়াও তিনি নিরভিমানী ছিলেন। দীন দরিদ্র প্রভৃতির জন্য সর্ব্বদাই তাহার প্রাণ কাঁদিত। যাহাতে দরিদ্রগণ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল করিতে পারে তিনি সততই তৎপ্রতি দৃষ্টি ও সচেষ্ট ছিলেন। তিনি অনেক দরিদ্রদিগকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন! এমন কি, তিনি নিজ বাড়ীতে রাখিয়াই অনেক গরীবের প্রতিপালন ও বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান রাজভক্ত এবং দেশের প্রকৃত উপকারী লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার জনহিতৈষণার কথা বেহার অঞ্চলের কেহই ভুলিতে পারিবে না। সুদূর প্রবাসে থাকিয়াও তিনি দেশের কথা একেবারে ভুলিয়াছিলেন না। তিনি দেশীয় এবং স্বজাতীয় দরিদ্রদিগকেও অনেক সাহায্য করিয়াছেন এবং দূরে থাকিয়াও দেশের অনেক হিতকর কার্য্যে যোগদান করিতেন; এতদর্থে তাহাই যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হইয়াছে। কাঁচাদিয়া গ্রাম সর্ব্বগ্রাসী পদ্মার কুক্ষিগত হইলে অধিবাসী বৈদ্যগণ কামারখাড়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। গুরুপ্রসাদ সেনও সেই সঙ্গে থাকিয়া কামারখাড়া গ্রামে বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন, এবং কামারখাড়া গ্রামে প্রথমে মাইনর স্কুল এবং পোষ্ট আফিস সংস্থাপন করেন। উক্ত মাইনর স্কুলটী ক্রমে ইংরাজীবিদ্যালয়ে পরিণত হইয়া অদ্যাপিও তাহার কীর্ত্তিঘোষণা করিতেছে। তৎপরে কামারখাড়া হইতে রাজাবাড়ী পর্য্যন্ত একটী রাস্তা নির্ম্মাণ করেন। এতদ্ভিন্ন গ্রামের অনেকানেক হিতজনক কার্য্যে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

তিনি একজন সরলবিশ্বাসী ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্তু সমাজের কোনও হিতজনক কার্য্যে যোগদান করিতে কিছুমাত্র ভীত বা কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি বিদ্যাশিক্ষার্থ নিজ পুত্রগণকে এবং দুই জামাতাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন এবং তিনি নিজেও শেষ বয়সে দেশভ্রমণার্থ ইয়োরোপ গমন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি যে সাহিত্যচর্চ্চা না করিতেন এমত নহে। তিনি ইংরাজীতে কয়েকখানা পুস্তক রচনা করেন এবং বাঙ্গালা ভাষাতেও তৎকালীন সোমপ্রকাশ নামক পত্রে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

দেশের অনেক হিতজনক কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া বাং ১৩০৭ সনের ২৮ আশ্বিন তারিখে দেশের ও বিদেশের দুঃখী দরিদ্রদিগকে অকূলসাগরে ভাসাইয়া এবং নিজ আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি সকলকে কাঁদাইয়া ৫৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাহার সুযোগ্য পুত্রগণ বাকীপুরে [illegible]

করেন। শ্রাদ্ধে দেশীয় বিদেশীয় অনেক লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

গুরুপ্রসাদ বাবু যখন তদীয় মাতুলালয়ে থাকিয়া বিদ্যার্জ্জন করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার মাসতুতো ভ্রাতা ৺দ্বারকানাথ গুপ্তও তথায় থাকিয়া বিদ্যার্জ্জন করেন। তাঁহাদের মধ্যে স্নেহ ও ভালবাসা সমধিক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। গুরুপ্রসাদ বাবু কাষারখাড়া গ্রামে আসিবার সময় উক্ত দ্বারকানাথ গুপ্তকেও তাহার সঙ্গে নিয়া আসেন, এবং নিজ বাড়ীতেই বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। বর্ত্তমানে উক্ত দ্বারকানাথ গুপ্তের বংশধরগণই গুরুপ্রসাদ বাবুর বাটীতে বাস করিতেছেন।

সদাচার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন বি, এল।]

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "হে কৌন্তেয় নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেরূপে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, যাহা জ্ঞানের চরম, তাহা সংক্ষেপেই আমার নিকট শ্রবণ কর। বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া (কর্ম্মযোগলব্ধ) স্মৃতি দ্বারা মনকে স্থিরীকৃত করিয়া শব্দাদি বিষয় সকল পরিত্যাগ এবং রাগদ্বেষ অপসারিত করিয়া, নির্জ্জন স্থানবাসী মিতভোজী, বাক্য শরীর ও মনঃসংযতকারী ব্যক্তি সর্ব্বদা ধ্যান যোগ পরায়ণ হইয়া বৈরাগ্যকে সম্যগ্‌রূপে আশ্রয় করতঃ অহঙ্কার বল, দর্প, কাম, ক্রোধ এবং পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ম্মল অর্থাৎ দেহাদিতে অহং মমত্বভাব বর্জ্জিত হইয়া সমগুণ প্রাপ্ত ব্যক্তি ব্রহ্মই হইয়া যান। ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্ন চিত্ত ব্যক্তি (নষ্ট বস্তুর জন্য) শোক করেন না এবং (অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য) আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি সর্ব্বভূতে সমান ভাবাপন্ন হইয়া অতিশ্রেষ্ঠ মদ্‌ভক্তি লাভ করেন এবং তাঁহারা বস্তুতঃ আমি যেরূপ সর্ব্বব্যাপী এবং যাহা (অর্থাৎ বাক্য ও মনের অগোচর অব্যক্তের ও অব্যক্ত) আমাকে সেইরূপ জ্ঞান লাভ করেন; অনন্তর আমাকে স্বরূপত জানিয়া পরে আমাতে প্রবেশ করিয়া আমিই হইয়া যান।

যে কর্ম্মযোগ ভিন্ন নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি ও তদনন্তর পরাগতি প্রাপ্ত হইবার অন্য উপায় নাই সেই যোগ ও ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতিরেকে অপ্রাপ্য সেই হেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন ঃ—

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥

গীঃ ৬।৩৬

যাঁহার চিত্ত সংযত নাই তাঁহার পক্ষে যোগ (সিদ্ধি) দুষ্প্রাপ্য ইহা আমার মত কিন্তু সংযত চিত্ত ব্যক্তি যত্নবান হইলে (প্রাণায়াম কৌশলরূপ) উপায় দ্বারা যোগ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

সংযম বলিতেই ইন্দ্রিয় ও মনের বিষয় ভোগবিলাষ নিবৃত্তি বুঝায়—

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি॥

মনু ২।৯৩

ইন্দ্রিয়গণের বিষয়াসক্তিই হইতেই মনুষ্য দূষিত হয় ইহাতে কোন সংশয় নাই। অএব তাহা-

দিগকে সংযত করিতে পারিলেই সমুদায় সিদ্ধি নিশ্চয় লাভ হয়।

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষপহারিষু।
সংযমে যত্ন মাতিষ্ঠে দ্বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাম্॥

মনু ২।৮৮

সারথি যেমন অশ্বগণকে সংযত রাখে বিদ্বান্ ব্যক্তি তদ্রূপ আকর্ষণশীল বিষয় সমূহে স্বতঃই (ভোগার্থে) ধাবমান ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে সচেষ্ট হইবেন।

ইহারা অতিশয় দুর্দ্দান্ত ইহাদের আয়ত্ত করিবার জন্য কোন চেষ্টাই অতিরিক্ত হইতে পারে না—

যততোহপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥

গীঃ ২।৪০

হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়গণ এত দুর্দ্দমনীয় যে, অজ্ঞানী লোকের ত দূরের কথা, বিষয় লিপ্সার দোষ সম্যক প্রকারে বিচার দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছেন এইরূপ অসাধারণ বিবেকী ব্যক্তিরও মনকে ইহারা বল পূর্ব্বক হরণ করিয়া বিষয়াকৃষ্ট করে।

সেই জন্যই ভগবান্ দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয় সকলকে সর্ব্বাগ্রে সংযত করিতে বলিয়াছেন। ইহারা সকলেই সমান দুর্দ্ধর্ষ সকলেই তুল্য বিক্রমশালী; কোনটীই অন্যতরটী অপেক্ষা হীন বলশালী নহে এবং প্রত্যেকটীই একক মনুষ্যের সর্ব্বনাশ সাধনে যথেষ্ট।

ইন্দ্রিয়াণাস্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।
তেনাস্য ক্ষরতিপ্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্॥

মনু ২।৯৯

উদকপাত্রে যেমন একমাত্র ছিদ্রের দোষেই জলমগ্ন হয় অধিক ছিদ্রের আবশ্যক করে না, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণের কোন একটি স্খলিত হইলে তাহার দোষেই মনুষ্যের পরম জ্ঞানের নাশ হইয়া থাকে তদধিক ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্যের প্রয়োজন হয় না।

সংযত করিবার প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র। ইহাদের সকলগুলিকেই এক সময়েই সমানভাবে সংযত করিতে হইবে। কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে দমন করিয়া বিষয় উপভোগ করিতে না দিলেই যে ইন্দ্রিয়গণ সংযত হয় তাহা নহে, ইহা সংযমের একাংশ (দম) মাত্র, যেহেতু তখনও অন্তঃকরণের বিষয়ভোগ স্পৃহা বলবৎ থাকে; যখন অন্তঃকরণ হইতেও বিষয় বাসনা সমূলে দূরীভূত হইয়া অন্তরিন্দ্রিয়গণ শান্ত হইবে তখনই প্রকৃত সংযম নতুবা কেবল কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে বিষয় উপভোগ না করিতে দিয়া মনে মনে বিষয় সকল স্মরণ করিলে কেবল মিথ্যাচারই হয়।

অতএব যখনই ইন্দ্রিয় সকল বিষয় ভোগাকৃষ্ট হইবে তখনই বহিরিন্দ্রিয়গুলিকে আকর্ষণশীল বিষয়ভোগ হইতে ক্ষান্ত করিয়া, মনে মনে বিচার দ্বারা, বিষয় লিপ্সার দোষ দেখাইয়া, অন্তরিন্দ্রিয়গণকে শান্ত করাই বিধেয়! প্রাণায়াম ও বিচার দ্বারায় বৈরাগ্যের উদয় হইলে ইন্দ্রিয়গণ ভালরূপ উপশান্ত হইয়া থাকে—

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তু মসেবয়া।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ॥

মনু ২।৯৬

জ্ঞানালোচনার দ্বারা বিষয়ভোগের দোষ দেখাইয়া যেমন ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ভোগ বৈরাগ্য আনিয়া উহাদিগকে উপশান্ত করা যায়, কেবলমাত্র বিষয় ভোগোন্মত্ত ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় ভোগ হইতে ক্ষান্ত রাখিয়া তাহাদিগকে তদ্রূপ সংযত করা যায় না।

বিচার দ্বারা মনের বিষয় বৈরাগ্য হয়। মন বিষয় বিরত হইলে সকল ইন্দ্রিয়ই সংযত হয় যেহেতু মনই ইন্দ্রিয়ের রাজা।

একাদশং মনো জ্ঞেয়ং স্বগুণেনোভয়াত্মকম্।
যস্মিন্ জিতে জিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌগণৌ॥

মনু ৬।৯২

মন একাদশ ইন্দ্রিয় বলিয়া বিবেচিত হয়।

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও কর্ণ, ত্বক্‌, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এই উভয়ের আত্মা স্বরূপ ইহাকে জয় করিতে পারিলেই পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়-গ্রাম জিত হয়।

কিন্তু চঞ্চল মনকে অচঞ্চল করাত বড় সহজ নহে, অর্জ্জুন সেইজন্য বলিয়াছেন

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্‌।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্‌॥

গীতা ৩৪।

হে কৃষ্ণ মন (স্বভাবতঃ) চঞ্চল দেহেন্দ্রিয়ের ক্ষোভকর, অজেয় ও দৃঢ় আমি তাহার নিগ্রহ বায়ুর নিরোধের ন্যায় সুদুষ্কর মনে করিতেছি।

ইহার উত্তরে ভগবান্‌ বলিয়াছেন ঃ—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্‌।
অভ্যাসেনতু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে॥

গীঃ ৬।৩৫

হে অর্জ্জুন! তুমি ঠিকই বলিয়াছ। মন দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল তাহাতে কোন সংশয় নাই। কিন্তু হে কৌন্তেয় কর্ম্মযোগাভ্যাস ও (শুভাশুভ নিত্যানিত্য তত্ত্বাদি বিচারের ফলস্বরূপ) বৈরাগ্য দ্বারা মনকে নিগৃহীত করা যায়।

আমরা দেখিলাম, শাস্ত্র কর্ম্ম প্রবৃত্তি রুদ্ধ করে না। শাস্ত্রোক্ত নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি পুরুষার্থ সাধনের পরিপন্থি নহে—

বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্ব্বান্‌ সংসাধয়েদর্থান ক্ষিণ্বন্‌ যোগত স্তনুম্‌॥

মনু ২।১০০

শরীরকে কঠিন তপস্যাদি দ্বারা পীড়া না দিয়া (প্রাণায়ামাদিদ্বারা) ইন্দ্রিয়গণকে আত্মবশীভূত ও মনকে সংযম পূর্ব্বক যোগস্থ হইয়া সকল প্রকার পুরুষার্থই সাধন করা যায় তাহাতে কোন দোষ হয় না।

আমরা নিবৃত্তিমার্গের নৈষ্কর্ম্ম্যসাধনের অল্প-বিস্তর আলোচনা করিয়া দেখিলাম হিন্দু শাস্ত্রাচার প্রবৃত্তি পথরোধক নহে। রাগমার্গের ত কথাই নাই। অতএব এক্ষণে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি হিন্দু শাস্ত্রাচার পালনে কেহ অকর্ম্মা হইতে পারে না। শাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্য্য করিবার সময়, লোকে নিজে অপকর্ম্মের সমর্থন জন্য শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া শাস্ত্রের দোহাই দেয়, তাহাতে শাস্ত্র নাচার, ধর্ম্ম নাচার। হিন্দু শাস্ত্রাচার রজস্তম গুণপ্রসূত দোষ-সমূহকে উন্মূলিত করিয়া মানবকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সর্ব্বত্র আত্মদর্শী এক আদর্শ মানব করিয়া তুলে। শাস্ত্র প্রদর্শিত আচারের সম্যগ্‌ অনুষ্ঠান ভিন্ন রজস্তম প্রসূত দোষ সমূহে সমূলে উৎপাটন করিবার অন্য উপায় নাই।

যে ইন্দ্রীয়াধীন সেই পরাধীন, তাহার স্বাধীনতার অভাবপ্রযুক্ত তেজস্বিতা থাকিতে পারে না। যিনি সদাচারী তিনিই প্রকৃত স্বাধীন নির্ভীক ও তেজস্বী। রজস্তমগুণাতীত যোগী লোভপ্রমাদ প্রতারণাদি দোষ হীন, তিনি ত্রিভুবনের আত্মীয়, সুতরাং তাঁহার ন্যায় অন্য কোন্‌ ব্যক্তি তেজস্বী হইতে পারেন? কঠিন বা অযথা পরুষ বাক্য ব্যবহার বা পরপীড়নেচ্ছা যদি তেজের পরিচয় হয় তাহা হইলে সদাচার তেজস্বিতার অন্তরায় বটে নতুবা নহে।

পৌষ মাঘ মাসের দুরন্ত শীতের দিনে স্বেচ্ছাচারী শাস্ত্রে অশ্রদ্ধ ব্যক্তি সূর্য্যোদয়ের পরও কিছু চা বিস্কুটাদি পানভোজন না করিয়া শয্যাত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত ও অশক্ত হন। পরন্তু সেই দুরন্ত শীতের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শাস্ত্রাচার পরায়ণ ব্যক্তি শৌচ স্নানাদি সমাধান্তে সন্ধ্যাবন্দনাদি ও যোগ প্রাণায়ামাদি দ্বারা ঈশ্বরোপাসনায় রত হন। বলুন ত উক্ত দুইজনের মধ্যে কে অলস, নির্জ্জীব ও অশক্ত আর কেই বা কর্ম্মঠ, সজীব, সতেজ ও শক্ত? হিন্দুশাস্ত্রাচার মানবকে নির্জ্জীব, নিস্তেজ ও অসল করিয়া তুলে একথা সম্পূর্ণ অসত্য। প্রকৃতির ধর্ম্ম জড়ত্ব ও মিথ্যা; ইহা নয় কে হয় বলিয়া ভ্রম জন্মায়। আলস্য, দীর্ঘসূত্রতা, নিদ্রা, ভয়, শোক, মোহ, নির্জ্জীবতা, নিস্তেজস্বিতা, লোভ,

ক্রোধ, দম্ভ, হিংসা, অহঙ্কার, মমত্ব ও অসত্য বিষয়ে স্পৃহা প্রভৃতি মানুষের প্রকৃতিজাত স্বাভাবিক গুণ। এইগুলি রজস্তমগুণ হইতে প্রসূত হয়। যাহারা প্রকৃতিজ দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট অতএব ইন্দ্রিয়াধীন তাহারাই এইসকল দোষে দুষ্ট হইয়া পড়েন। কিন্তু শাস্ত্র যাঁহাদের সত্বগুণ বৃদ্ধি করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে জ্ঞানোদ্ভাসিত করিয়াছে তাঁহারা প্রকৃতিজয় করিতে সমর্থ হন। হিন্দুশাস্ত্রে এমন সকল বিধি ব্যবস্থা আছে যে যাঁহারা তাহার অনুগামী হন তাঁহারা সমস্ত দিন এমন কি রাত্রিকালের অনেক সময় পর্য্যন্ত অনেকগুলি আচরের অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য হন। তদ্দ্বারা তাঁহাদের স্বাভাবিক আলস্য সমূলে বিদূরিত হয়, শরীর সুস্থ, কর্ম্মোপযোগী ও সহিষ্ণু হয়, ভয়, শোক, মোহ, মমতা, অহঙ্কার, কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ ও মাৎসর্য্য, জিত হয়, মন ও দেহ সতেজ হয়, চিত্ত বিশুদ্ধ ও বিষয়ে অনাসক্ত হয়, আত্ম পর, সুখ দুঃখ ও শীতোষ্ণাদি ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়, আত্মজ্ঞান উদ্ভাসিত হয়, ইন্দ্রিয়গণ আত্মবশীভূত হয়, চরিত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে গঠিত হইয়া জগতের সুখদ হয় ও সর্ব্বলোক হিতকর অনুষ্ঠানে ও সত্য বিষয়ে আস্থাবর্দ্ধিত হয়। ক্রমশঃ।

হিন্দুসমাজের কলঙ্কের কথা।

গত ২০শে মার্চ্চ মঙ্গলবারের 'বেঙ্গলী' পত্রে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছে ;—

AN APPEAL.

To the Editor of the "Bengalee."

Sir,—I being a Mahomedan consider it my duty to help my brethern irrespective of caste or creed. The present appeal is in connection with the marriage of two poor Brahman girls. I hope all sympathetic gentlemen especially orthodox Hindus, will not turn a deaf ear to it.

One of the girls is fourteen years old. Babu Purna Chandra Mukherjee, Head Master of Sudderbazar school, Nowgong Bundelkhand C. I. has asked me for help. The girl's home is in the surubs of Calcutta.

The other girl is the daughter of one Soshi Bhusan Chakrabarti of village Rangilabad of Mograhat Thana 24 Perganahs. The father is a 'guru' in a village 'Pathsala' and gets only Rs. 5-8 a

A member of the bar or a merchant or a Zamindar alone can take in the matter and render the help needed. However my appeal is to the general public and I trust they will come forward voluntarily and contribute their mite at an early date.

I shall be glad to call at any place if required with the original letters of the applicants or they can be seen by the enquired or his agent at my quarters. Any contribution howeversmall shall be gratefully acknowledged.

Leakut Hossain Khan,
22-4 Mechua Bazar Street.
Anjuman Katra, Calcutta.

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে,—আমি একজন মুসলমান, জাতিও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আমার ভ্রাতৃবর্গকে সাহায্য করা আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া মনে করি। দুইটী দুস্থ ব্রাহ্মণবালিকার বিবাহ উপলক্ষে আমি জনসাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি যাবতীয় সহৃদয় ভদ্রসন্তান, বিশেষতঃ স্বধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুসন্তানগণ আমার প্রার্থনায়

মধ্য ভারতের বুন্দেলখণ্ড জেলার অন্তর্গত নওগাঁ সদরবাজার স্কুলের হেড্‌মাষ্টার বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একটী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। এই বালিকার বাসস্থান কলিকাতার উপকণ্ঠে।

অপর বালিকাটী ২৪ পরগণার মগরাহাট থানার অন্তর্গত রঙ্গিলাবাদ গ্রামবাসী শশিভূষণ চক্রবর্ত্তীর কন্যা। শশিভূষণ গ্রাম্য পাঠশালায় মাসিক ৫।৷৹ টাকা বেতনে গুরুমহাশয়ের কার্য্য করেন।

একজন উকীল অথবা ব্যারিষ্টার, সওদাগর অথবা জমীদার, ইচ্ছা করিলে, এই ব্যাপারের প্রয়োজনীয় সাহায্য একাই করিতে পারেন। যাহা হউক, আমি সর্ব্বসাধারণের নিকটেই বিনীত প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি, তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যথাশক্তি সাহায্য করিয়া অবিলম্বে ইহাদিগকে উদ্ধার করিবেন।

এসম্বন্ধে কাহারও বিশেষ কিছু জানিবার ইচ্ছা হইলে আমি মূল পত্রাদি লইয়া উপস্থিত হইতে পারি, অথবা কেহ ইচ্ছা করিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার বাসাবাটীতে আসিয়াও দেখিতে পারেন। নিতান্ত সামান্য দানও সাদরে গৃহীত হইবে। লিয়াকৎ হোসেন খাঁ
২২।৪মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,অঞ্জুমান্ কাট্‌রা,কলিকাতা।

কন্যাদায়গ্রস্ত অনেক ভদ্রসন্তানকে আত্মীয়-স্বজনের নিকট—স্বজাতীয়ের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত এপর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় নাই। হিন্দুসন্তান ভিন্ন জাতীয়—ভিন্নধর্ম্মীয় লোকের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইয়া কন্যাদায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, এরূপ ঘটনা শ্রুতিগোচর হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না! তাই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, হিন্দুসমাজ কি সত্য সত্যই রসাতলে গিয়াছে?

ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে বড়লোকের সংখ্যা খুব বেশী। [illegible]বী রাজা, মহারাজ, জমীদার, উচ্চ বেতনভোগী রাজকর্ম্মচারীর সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। প্রকাশ্য সংবাদপত্রে এইরূপ ঘটনা প্রকাশিত হইতে দেখিয়া মনে হয় না কি যে, বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে? যাঁহারা মৌলবী লিয়াকৎ হোসেনের কৃপাপ্রার্থী হইয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে, লিয়াকৎ একজন ধনবান ব্যক্তি নহেন, তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বিপন্নের সাহায্য করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা লিয়াকতের হৃদয়বত্তারই পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। কিন্তু আলোচ্য ঘটনা দেখিয়া কি ইহাই মনে হয় না যে, যাঁহারা লিয়াকতের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন, তাঁহারা, শুধু ব্রাহ্মণজাতি কেন, হিন্দুসমাজান্তর্গত কোন জাতির মধ্যেই এরূপ একজন হৃদয়বান লোক পাইতে পারেন নাই? এতবড় বিরাট হিন্দুসমাজের মধ্যে এরূপ একজন হৃদয়বান লোকের অভাব হইল, ইহা অপেক্ষা সমাজের অধঃপতনের পরিচয় আর বেশী কি হইতে পারে? হিন্দু-ধনকুবেরগণ বিলাস-ভোগ-বাসনায় মুগ্ধ হইয়া যে জাতীয়সম্মান, জাতীয়-মর্য্যাদা, কর্ত্তব্যজ্ঞান, স্বজাতীয়ের প্রতি হিন্দুজাতি-সুলভ বিশ্ববিশ্রুত সমবেদনা বিসর্জ্জন দিয়াছেন, ইহা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নহে কি? হিন্দুর পক্ষে ইহা অপেক্ষা কলঙ্কের কথা আর কি হইতে পারে?

কন্যাদায়ে হিন্দুসন্তানের অবস্থা দিন দিন কিরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে, ইহা তাহার একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। যাঁহারা হিন্দুসন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করেন,—হিন্দুর দয়া-দাক্ষিণ্য, উদারতা ও পরদুঃখকাতরতা জগতের যাবতীয় জাতি অপেক্ষা গরিয়সী বলিয়া যাঁহারা গর্ব্বিত, উল্লিখিত অশ্রুতপূর্ব্ব দৃষ্টান্তটী দেখিয়া তাঁহাদের শুধু লজ্জিত ও মর্ম্মাহত হওয়া উচিত নহে, যাহাতে এই সমাজবিধ্বংসী বরপণ ও যৌতুক প্রথা সমাজ হইতে অচিরাৎ বিলুপ্ত হয়, তাহার চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

টীকা-টিপ্পনী।

বিদ্বৎসভার গত বর্ষের কার্য্যবিবরণী ও আয়-ব্যয়ের হিসাব মেম্বরগণের নিকট প্রকাশার্থ একটী সাধারণ অধিবেশনের চেষ্টা অনেক দিন হইতেই চলিতেছে, কিন্তু সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুরের উপস্থিত থাকিবার সুবিধা ঘটিতেছেনা বলিয়া বিলম্ব ঘটিতেছে। যদি চলিত মাসে তাঁহার উপস্থিত থাকিবার অবসর না ঘটে, তাহা হইলে একজন সহকারী সভাপতির অধিনায়কত্বে আগামী মাসের প্রথম ভাগে সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।

প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব এবং সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ গুপ্ত ব্যার-এ্যাট-ল, বিলাত প্রত্যাগত হইলেও জাতীয় সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিতান্ত আস্থাবান। স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের গৌরবরক্ষায় তিনি যেরূপ তৎপর, বৈদ্যসন্তান দিগের মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা খুব অল্প। তাঁহার ন্যায় ক্ষমাশীল লোকের সংখ্যাও যে আজকার দিনে নিতান্ত দুর্লভ, নিম্নলিখিত ঘটনাটী দ্বারা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

কবিরাজ গণনাথ সেন সরস্বতী এম্, এ যখন 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রাপ্ত হন, তখন বসুমতী পত্রে বৈদ্যজাতির বাপান্ত যথেষ্টই হইয়াছিল। ঐ সকল উক্তি পাঠ করিয়া বৈদ্যসন্তান মাত্রেই হৃদয়ে ব্যথা পাইয়াছিলেন। এই বসুমতীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিতান্ত বিপন্ন হইয়া সম্প্রতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ গুপ্তের আশ্রয় গ্রহণ করেন। দাশ মহাশয় বসুমতীর ঐ উক্তির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, নিজে ৪৫ হাজার টাকার দায়িত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বিপন্মুক্ত করিয়াছেন। প্রাচীন কালের বৈদ্য-মনীষীগণের চিত্তরঞ্জনের এই ক্ষমতাশীলতা ও উদারতা তাঁহার সহিত তুলনায় কোন অংশে ন্যূন নহে।

বৈদ্যসন্তানের নিকট সদ্যউপকৃত শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিন্তু সদ্যসদ্যই কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন! যে কারণেই হউক, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ গুপ্ত মহাশয়ের সম্পাদিত "নারায়ণ' পত্রের মুদ্রাঙ্কন ও পরিচালন ভার মুখুয্যে মহাশয় স্বয়ং, অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারী 'শ্রীমান্ খোকা' ওরফে শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রহণ করিবামাত্রই কর্ম্মকর্ত্তা বৈদ্যসন্তান শ্রীযুক্ত বামাচরণ সেন পদচ্যুত হইয়াছেন! স্বজাতিবৎসল চিত্তরঞ্জন বাবুর জ্ঞাতসারে, অথবা অনুমোদন ক্রমে ইহা ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, শ্রীমান খোকার এই কার্য্যে 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়' প্রবাদ বাক্যটী বেশ সপ্রমাণিত হয়!

বসুমতী, বঙ্গবাসী এবং হিতবাদী, এই তিন খানি সংবাদপত্রই বাঙ্গলা সংবাদপত্রের মধ্যে আয়তনে ও প্রচারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গৌরব করিবার অধিকারী। কিন্তু বৈদ্যের সাহায্যপ্রাপ্তির অভাব হইলে এই তিনখানির অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিত কিনা সন্দেহ। কয়েকখানি পত্রের সৃষ্টি ও সংহারের পর যখন উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'বসুমতী'র কাঠামো গঠন করেন, তখন স্বর্গীয় কবিরাজ হরলাল গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গুপ্তের নিঃস্বার্থ কায়িকশ্রম, এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের অর্থানুকূল্যের অভাব হইলে আজ বসুমতীর নাম সাধারণের স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া যাইত! রাজদ্রোহিতার অভিযোগে যখন 'বঙ্গবাসী' অভিযুক্ত হয়, তখন স্বর্গীয় [illegible]প্রসাদ

বিজয়রত্ন সেন মহোদয়দ্বয় লক্ষটাকার জামীন না হইলে 'বঙ্গবাসী' আজ কোথায় থাকিতেন কে বলিতে পারে! কিন্তু বৈদ্যসন্তানের সম্মানলাভে এই উভয় পত্রই কিরূপ বিদ্বেষ-বিষ উদ্‌গীড়ন করিয়াছিলেন ধন্বন্তরির পাঠকগণ সম্ভবতঃ তাহা বিস্মৃত হন নাই।

তারপর "হিতবাদী"র কথা। লিমিটেড কোম্পানীর হস্ত হইতে ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত রোগীর ন্যায় কঙ্কালাবিশিষ্ট হইয়া হিতবাদী পাঁচ হাতুড়ের হাতে পড়ে এবং মরণোন্মুখ হয়। তখন কলুটোলার খ্যাতনামা কবিরাজ স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেনের আশ্রয় লাভ করে। ইহাঁদের আনুকূল্যে হিতবাদী আজ সাধারণ্যে গৌরব করিবার অধিকারী। কিন্তু বৈদ্যজাতির প্রতি আজকাল এই হিতবাদীর বিদ্বেষ ভাবটীর পরিচয়ও জনসাধারণ বেশ পাইয়াছেন! এই তিন ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব বেশী এবং বৈদ্য-বিদ্বেষের প্রাবল্য ও কৃতঘ্নতার অপূর্ব্ব বিকাশ! কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বৈদ্য সতত ক্ষমাশীল। শ্রীযুক্ত কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় প্রকৃতপক্ষে হিতবাদীর সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়াও, স্বজাতীয়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া সম্পাদকের প্রতি প্রাচীন বৈদ্যজাতিসুলভ ক্ষমাশীলতা প্রদর্শনে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী পুনা আয়ুর্ব্বেদ-সম্মেলন হইতে দাক্ষিণাত্যের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া কলিকাতা প্রত্যাবৃত হইয়াছেন। তিনি মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরের আয়ুর্ব্বেদীয় শিক্ষালয়াদি পরিদর্শনের জন্য তত্রত্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি মান্দ্রাজে স্থানীয় ডাক্তারবর্গ কর্ত্তৃক [illegible]রুদ্ধ হইয়া 'ত্রিদোষ-বিজ্ঞান' সম্বন্ধে

দাতব্য চিকিৎসালয়গুলি পরিদর্শনার্থও তিনি আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেখানে তিন চারিটী দাতব্য আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসালয় পরিদর্শন করিয়াছেন। এই সকল চিকিৎসালয়ে প্রতিদিন প্রায় দুই সহস্র রোগী চিকিৎসিত হইতেছে। স্থানীয় ধনবান মহাত্মারা লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়া এই সকল বিদ্যালয় ও ঔষধালয়ের ব্যয় সঙ্কুলান করিতেছেন। আর আয়ুর্ব্বেদের জন্মস্থান আমাদের এই বঙ্গদেশে ধনকুবেরগণ বিলাস-ব্যসনে মত্ত হইয়া ভুয়া মান ক্রয়ের জন্য অকাতরে অর্থ বৃষ্টি করত ঐশ্বর্য্যের সদ্ব্যবহার করিতেছেন! আমরা বাঙ্গালী যে ভগবানের সৃষ্টির অতুলনীয় সৃষ্ট পদার্থ!

ঘরের কথা পরকে বলিতে গেলে,—ঘরের নিন্দা পরকে শুনাইলে আত্মদ্রোহিতার পরিচয় দেওয়া হয়। কিন্তু ঘরের কথা ঘরের লোককে বলিলে সংশোধনের প্রত্যাশাই করা হয় বলিয়া আমাদের ধারণা। আজকালকার স্বেচ্ছাচারিতার রাজত্বে ন্যায় ও ধর্ম্মপরায়ণতা যে মানবহৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত হইতেছে, তাহার পরিচয় পদে পদেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, সুতরাং সংশোধনের আশা দুরাশায় পরিণত হয়। আমাদের বৈদ্যসমাজের অধঃপতনের কারণ কতকটা ইহাই। নতুবা যে জাতির নরনারীর মধ্যে শতকরা ৮৫ জন শিক্ষিত এবং অবশিষ্ট ১৫ জনও নিরক্ষর নহে বলিয়া গত আদমসুমারীতে স্থিরীকৃত হইয়াছে, সে জাতির এরূপ দুর্দ্দশা কেন?—সেই জাতির মধ্যে শতকরা ৮০ জন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য হাহুতাশে দিন যাপন করে কেন? আরও একটু খোলাসা করিয়া বলিবার প্রয়াস পাইব।

যে সকল কারণে বৈদ্যজাতির দিন দিন অধঃপতন হইতেছে, তাহা যে বৈদ্যসন্তান মাত্রেই অল্পবিস্তর উপলব্ধি করিতে অক্ষম, বৈদ্যজাতির মধ্যে

হইলে কি হইবে? আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী মানুষকে এতই স্বার্থপর করিয়া তোলে যে, ন্যায় ও ধর্ম্মপরায়ণতা কাছে ঘেঁসিতে পারে না। বৈদ্য-সমাজ হইতে ইহা নিরাকৃত করিবার উদ্দেশ্যে *রাঢ় ও বঙ্গের কতিপয়* প্রবীন, বিজ্ঞ এবং বহুদর্শী বৈদ্যসন্তানের উদ্যোগে "বিদ্বৎসভার" প্রতিষ্ঠা। অন্যান্য জাতির সহিত তুলনায় বৈদ্যের সংখ্যা কম হইলে ও ভারত ও ব্রহ্মের নানা স্থানে অনেক শিক্ষিত বৈদ্য সন্তান বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে অবস্থিতি করিতেছেন। এই সকল বৈদ্যসন্তানগণের সহানুভূতি লাভের প্রত্যাশায় ঐ সকল স্থানে বিদ্বৎসভার অনুষ্ঠাতৃবর্গের স্বয়ং উপস্থিত হওয়া, অথবা প্রতিনিধি প্রেরণ করা অসম্ভব। এইজন্য সর্ব্বাগ্রে সভার মুখপত্র স্বরূপ 'ধন্বন্তরি' পত্রের অনুষ্ঠান। সভার উদ্দেশ্য ব্যতীত, জাতীয় অভাব অভিযোগ বৈদ্যসন্তান মাত্রেরই গোচর করা ধন্বন্তরি প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে ১৩২২ সালের কার্ত্তিক মাস হইতে ধন্বন্তরির প্রচার আরম্ভ হয়, এবং অশেষ চেষ্টায় বিদেশীয় শিক্ষিত পদস্থ বৈদ্যসন্তানগণের নাম সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের নিকট 'ধন্বন্তরি' প্রেরিত হইতে থাকে। ইহাতে অনেক স্বজাতিবৎসল মহাত্মা মেম্বর শ্রেণীভুক্ত, অনেকে ধন্বন্তরি পত্রের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া অনুষ্ঠাতৃবর্গের সহায় হইয়াছেন। গত দেড় বৎসর যাবৎ ধন্বন্তরি পত্রের প্রচার আরম্ভ হইয়াছে, অনুষ্ঠাতৃবর্গ এই দুর্দ্দিনে কাগজের দুর্ভিক্ষের সময়েও প্রকাশের সময়নিষ্ঠা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, মফস্বলস্থ কোন কোন শিক্ষিত ও পদস্থ বৈদ্যসন্তান ১৭ মাস কাল কাগজ গ্রহণ করিয়াও বার্ষিক মূল্য দুইটী টাকা দিয়া সভাকে অনুগৃহীত করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছেন!

আদমসুমারি নির্দ্ধারিত ৮০ হাজার বৈদ্যসন্তান যে সকলেই একমতাবলম্বী হইবেন, অথবা ইহাঁদের সকলেই যে বিদ্বৎসভার অনুষ্ঠিত বিষয়গুলি সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করিবেন, এরূপ আশা করা যায় না। কিন্তু তাহা হইলেও, যে বিষয়গুলি জাতীয়তা রক্ষার অনুকূল, যদ্দারা সমাজের দুঃখ দারিদ্র্য মোচন হইবার সম্ভাবনা, সেগুলিতে মতদ্বৈধ হইবার কোন হেতু দেখি না! তবে যদি কেহ বলেন,—"আমি জাতীয়তা চাই না, বৈদ্য-সমাজ গোল্লায় যাক, তাতে আমার কি,—তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁহারা এরূপ মত হৃদয়ে পোষণ করেন, তাঁহাদের অকপট হওয়াই উচিত। তাহা হইলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না। যাঁহারা দেড়বৎসর ধন্বন্তরি গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, ফেরৎ দেন নাই, অথবা তদনরূপ একটী কথাও জ্ঞাপন করেন নাই,তাঁহাদের নিকট অতীত বৎসরের মূল্যের আশা করা বিদ্বৎসভার পক্ষে দুরাকাঙ্ক্ষা নহে। কাগজে লিখিয়া—পোষ্টকার্ড দ্বারা প্রার্থনা করিয়া, পরে ভি পি পাঠান ব্যতীত দূরদেশে তাগাদা করিবার অন্য উপায় নাই। নিতান্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, মফস্বলস্থ কোন কোন বৈদ্যসন্তান ভিঃপিঃ ফেরৎ দিবার কালে লিখিয়া দিতেছেন, Not for me, সুতরাং বাধ্য হইয়াই এগুলিকে বিকৃতশিক্ষাপ্রণালী প্রসূত ফল বলিতে হয়!

যাঁহারা এরূপ করিতেছেন, তাঁহাদের স্বীয়পদমর্য্যাদার সম্মান রক্ষার জন্যও গৃহীত সংখ্যাগুলির মূল্য দেওয়া উচিত এবং তাহাই শিষ্টাচার সম্মত। তাঁহাদের মনে করা উচিত যে, বৈদ্যসন্তানগণের কষ্টার্জ্জিত অর্থে ধন্বন্তরি প্রকাশিত হইয়া তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে, এক একখানি ধন্বন্তরি বৈদ্যসন্তানগণের শোণিতবিন্দু সমষ্টি। ধন্বন্তরি কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। অনুষ্ঠাতৃবর্গ, আত্মীয় স্বজন যখন যাহাকে পান, তখনি তাঁহাকে ধরিয়া দলপুষ্টির প্রয়াস পান। এরূপ কষ্ট-সংগৃহীত

অর্থের এরূপ ভাবে অপচয় করা বৈদ্যসন্তানের পক্ষে বড়ই কলঙ্কের কথা! আমরা আশা করি, যাঁহাদের জন্য এতগুলি কথা বলা হইল, তাঁহারা এই হতভাগ্য বৃদ্ধের কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কার্য্য করিতে অবহেলা করিবেন না।

কন্যাদায়ে পড়িয়া বরপণ ও যৌতুকের কসুনীতে মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তানগণ যেমনই চক্ষে সর্ষপফুল দেখিতেছেন, মতলববাজ লোকেরা তেমনি এই সুযোগে এক একটা হুজুগ তুলিয়া দু'পয়সা উপার্জ্জনের রাস্তা করিয়া লইতেছেন! কন্যাদায়ে পড়িয়া অনেক সুচতুরলোক যে বুদ্ধি হারা হয়, মতলববাজ মহাশয়েরা তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন, তাই এই মহানগরী কলিকাতায় 'ম্যারেজলীগ', 'ম্যারেজ-ইউনিয়ন' 'প্রজাপতি সমিতি' প্রমুখ কয়েকটী ঘটকালী আপীসের আবির্ভাব হইয়াছে! তন্মধ্যে সদ্গোপকুলধুরন্ধর শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার নামক একটী যুবক-প্রতিষ্ঠিত 'প্রজাপতি সমিতিটী' সকলের উপর টেক্কা দিবার প্রয়াসী!

দেশমান্য সুরেন্দ্রবাবুর নাম 'সভাপতি' রূপে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে দেখিয়া, আমাদের জনৈকবন্ধু 'প্রজাপতির'মেম্বর হইবার অভিলাষী হন, এবং সমিতির সম্পাদক বলিয়া পরিচয়দাতা শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রকুমারকে পত্র লিখেন। জ্ঞানেন্দ্রকুমার ধন্বন্তরি-কার্য্যালয়ে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বলেন,—সমিতির মেম্বরাদি কিছু নাই, (donation) এককালীন দান যাহা পাওয়া যায়, তাহা দ্বারাই সমিতির কাজ এবং 'প্রজাপতি' পত্রের খরচ চলে। অতঃপর গত ৩১শে জানুয়ারি জ্ঞানেন্দ্রনাথের প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সর্ত্তানুযায়ী, দুইটী পাত্রের সন্ধানের জন্য ঘটক পাঠাইবার অনুরোধ করিয়া আমরা এক পত্র লিখি। জ্ঞানেন্দ্রনাথ নিজে সই করিয়া চিঠি রাখিয়াছিলেন। তাহার পর এপর্য্যন্ত আর কোন উচ্চবাচ্য নাই!

খোদ বেঙ্গলীপত্রে জ্ঞানেন্দ্রনাথের বিজ্ঞাপন এবং তাহার 'প্রজাপতি' পত্রের খোসনামী মাঝে মাঝে বাহির হয়। ইহা দেখিয়া জ্ঞানেন্দ্রনাথের সত্তা অস্বীকার করিবার সুবিধা নাই। সম্প্রতি ২৭শে মার্চ্চের বেঙ্গলীপত্রে 'প্রজাপতি সমিতির' কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এক তালিকা বাহির হইয়াছে। তাহাতে পৃষ্ঠপোষকের তালিকায় বঙ্গের রাজা, মহারাজা, রায়বাহাদুর, রায়সাহেব, খাঁটী অ-খাঁটী সর্ব্বশ্রেণীর জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি পদস্থ কোনও লোকের নাম বাদ পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তবে মুর্শিদাবাদের নবাব, নবাব সমসল হুদা, নবাবআলী চৌধুরী প্রভৃতির নাম বাদ পড়িয়াছে! সেক্রেটরী খোদ জ্ঞানেন্দ্রকুমার ব্যতীত আরও দুই চারিটীর নাম বাহির হইয়াছে! দেশশুদ্ধ যাবতীয় বড়লোক যখন 'প্রজাপতি'র পৃষ্ঠপোষক, তখন কনের বাবারা কনের সংখ্যা পৌনঃপুনিকে ফেলিতে থাকুন, পণ-যৌতুকের ভাবনাটা অকাতরে ভুলিয়া যান! নগদ তিন পয়সা দিয়া ২৭শে মার্চ্চের একখানি বেঙ্গলী ক্রয় করিয়া রাখিয়া দিন। মেয়ে বিবাহের যোগ্য হইবামাত্র প্রত্যেক পৃষ্ঠপোষকের নিকট একখানি কার্ড লিখিবেন! দেখিবেন, টাকা গড়গড়্ করিয়া আসিয়া পড়িবে! যদি ইহাও না-হয়, তাহা হইলে, যে বরের বাবা আপনার নিকট পণ ও যৌতুক চাহিবেন, এ সমস্ত বড়লোকেরা হয় তাহাদের কণ্ঠী ছিড়িবেন, নয়ত একঘরে করিয়া ছেড়ে দিবেন! জ্ঞানেন্দ্রনাথের বিজ্ঞাপন দেখিয়া ত মনে হয়, শ্রীমান যেন বর-কনের একটী 'পিঞ্জরাপোল' প্রতিষ্ঠিত করিয়া বসিয়াছেন!

ভক্তি ও পুরুষকার।

[অধ্যাপক শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী, এম্, এ,]

মানব যতদিন বহির্বিষয়লোলুপ ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে না পারে, ততদিন অমৃতত্বের প্রতি তাহার বলবতী স্পৃহা হয় না। যাঁহারা ঐ অমৃতত্বের অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছেন বা তজ্জন্য কাতর, তাঁহারাই এই দুরন্ত ইন্দ্রিয়ের দল ও মনকে কথঞ্চিৎ স্থির রাখিতে পারিয়াছেন। ভোগের দ্বারা ক্ষণিক বিতৃষ্ণা হইতে পারে, আত্যন্তিক অনাশক্তি হয় না। এই জন্য ঋষিরা বলিয়াছেন, বিষয় উপভোগের দ্বারা তৃষ্ণার নিবৃত্তি দূরের কথা, তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। বায়ু এবং বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল মন ও ইন্দ্রিয়গণকে বশে আনিতে পারিলে, বুদ্ধি সুখদুঃখে অবিচলিত হইয়া পরমপুরুষার্থের প্রতি ধাবিত হয়। তখন কর্ত্তব্যজ্ঞানে কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া শ্রীভগবানের প্রীতিকামনায় অনাশক্তভাবে তাহা সম্পাদন ও তাঁহাকে ভক্তিভরে নিবেদন করিয়া মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভ হয়। তখন আর কিছু আকাঙ্ক্ষার বিষয় থাকে না। সর্ব্ব বিষয়ে তৃপ্তি ও শুদ্ধি জ্ঞান আসে, কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানে দৃঢ় পুরুষকার আরও দৃঢ়তর হয়। লীলাময় পরমপুরুষের অতি প্রিয়বস্তু পুরুষকার। সেই লীলাময়কে কর্ম্ম ও কর্ম্মফল অর্পণ করিতে হইলে কর্ম্মকে তাঁহার গ্রহণযোগ্য করিতে হইবে। নচেৎ তিনি লইবেন কেন? ভক্ত তাঁহার প্রাণ-মন উৎসর্গ করিয়া যাহাতে তাহার কর্ম্ম ভগবানের গ্রহণযোগ্য হয়—যোগ্যতম হয়,—ভগবান্ যাহাতে আনন্দে আদরে উহা গ্রহণ করেন, তজ্জন্য চেষ্টা করিবে। এই জন্য উৎকট প্রযত্ন, তপস্যা, পুরুষকারের প্রয়োজন। পুরুষকার ব্যতীত ভক্তিমার্গে একপদও অগ্রসর হইবার যো নাই।

যাহারা বলে, কাঁদিয়া কাটিয়া ভক্তি করিতে সমাজ অলস, অপদার্থ মূর্খ ভণ্ডদিগের দ্বারা পূর্ণ হয়, তাহারা একান্ত ভ্রান্ত। যাহারা বলে,—ধর্ম্মের জন্যই কর্ত্তব্যে অবহেলা আসিয়া পড়ে, তাহারা ধর্ম্ম কি তাহা বুঝে না। যাহারা বলে, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ চৈতন্যাদি প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রবল বন্যার প্লাবিত হওয়াতেই ভারত, ঐহিক শ্রী ও সম্পদ্ চিরকালের মত হারাইয়াছে, ধর্ম্মাচরণ করিতে গিয়াই ভারতের সর্ব্বনাশ ও অধঃপতন হইয়াছে, তাহারা কৃপারপাত্র। ভারতের অধঃপতন—ভারতের সর্ব্বনাশ, ধর্ম্মকে পালন করিয়া হয় নাই—ধর্ম্মত্যাগ করাতেই হইয়াছে। ধর্ম্মের ভানে অধর্ম্মের সেবা করাতেই ভারতের এই অধোগতি হইয়াছে। যে ভারতে শ্রীভগবানের সুপরিস্ফুটবাণী একদিন ভক্তকে অঙ্কুশতাড়নায় পুরুষকারে প্রণোদিত করিয়াছিল, আলস্য, মোহ, কর্ম্মত্যাগ ও অজ্ঞানকে দৃঢ়তার সহিত পরিহার করিয়া পুরুষকার ভক্তি ও জ্ঞানের অবিচলিত সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে বারংবার উপদেশ দিয়াছিল, সেই ভারতে আজি সেই উপদেশ পদে পদে অবহেলিত! রাণা প্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজি, প্রতাপাদিত্য ও রণজিতের দেশে কর্ম্মত্যাগ জনিত দুরাচার ও অধর্ম্মই এক্ষণে আধিপত্য লাভ করিয়াছে। হিন্দুর সকল শাস্ত্রেই ভগবানের অমূল্য উপদেশ অনুরণিত রহিয়াছে। হিন্দুকে হিন্দুর শাস্ত্র প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতি পংক্তিতে কর্ম্মত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছে। কিন্তু হিন্দু সে উপদেশ আজি মানে না, তাহা মানিয়া চলিতে চাহে না। উহাতে যে ক্লেশস্বীকার, ত্যাগস্বীকার, ইন্দ্রিয়সংযম, প্রভৃতির কথা আছে! আরামী আমোদপ্রিয় বিষয়ব্যসনে মগ্ন আধুনিক হিন্দু কোনওরূপে দুটাদিন সুখে, আমোদে, স্ফূর্ত্তিতে কাটাইয়া যাইতে চাহে। তাহারা কর্ত্তব্যের অত ধার ধারে না।

সব ভগবানের স্কন্ধে চাপাইয়া অদৃশ্য অদৃষ্টকে সম্বোধন পূর্ব্বক গালি দিয়া মনের জ্বালা নিবারণ করে?

অদৃষ্ট কি? অদৃষ্ট অ-দৃষ্ট, কেমন করিয়া বলিব উহা কি? উহা ভগবানের দৃষ্ট, ত্রিকালজ্ঞ পরম যোগিগণের দৃষ্ট, মাদৃশ সাধারণ লোকের উহা অ—দৃষ্ট। আমরা উহাকে 'ভাগ্য', 'দৈব' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করি। কিন্তু এরূপ স্থলে একটি শব্দের পরিবর্ত্তে আর একটি শব্দ ব্যবহার করিলেই জিনিষটি কি তাহা বুঝা যায় না। অদৃষ্ট আমাদিগের দৃষ্টিগোচর না হইলেও, যাহাদিগের দৃষ্টিগোচর সেই ত্রিকালজ্ঞ মহাযোগীদিগের উপদেশ অনুসারে অদৃষ্ট কি তাহা বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত পুরুষ-কার, সেই প্রাক্তন জন্মার্জ্জিত সংস্কার ও প্রাক্তন জন্মকৃত কর্ম্মের ঢেউ যাহা আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যায় তাহাই দৈব, তাহাই ভাগ্য, তাহাই অদৃষ্ট তাহাই—প্রাক্তন। সুতরাং দেখা যাইতেছে তাহা পুরুষ-কার ব্যতীত আর কিছুই নহে। এক্ষণে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, দৈব ও পুরুষ-কার এক বস্তু হওয়াতে—দৈববাদ ও পুরুষকারবাদের মধ্যে কোন বিরোধ থাকিতেছে না। সুতরাং 'আমরা দৈব মানি, পুরুষ-কার মানি না,' অথবা 'পুরুষ-কার মানি, দৈব মানি না'—ইত্যাদি প্রকারের মতবিরোধ এক আশ্চর্য্য অসম্ভব বস্তু হইতেছে। পুরুষ-কার 'রাশি' হইলেই অদৃষ্ট হয়। ঐ অদৃষ্ট নূতন জীবনের নবীন পুরুষকারের গতি ও সাফল্য কতকাংশে নির্ণীত বা রূপান্তরিত করে মাত্র, উহার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অপহরণ করিতে পারে না। প্রত্যেক জীবনে জীব স্বকৃত কর্ম্ম ও ভোগদ্বারা সঞ্চিত অদৃষ্টের ক্ষয়, বৃদ্ধি বা রূপান্তর সাধন করিতে পারে। আমাদের উচিত, শুভ পুরুষকারের বলে অশুভ অদৃষ্টকে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করা। অশুভাদৃষ্ট যতই প্রবল হইবে, তাহার খণ্ডনেও ততই প্রবল পুরুষকারের প্রয়োজন। অশুভ অদৃষ্ট একান্ত প্রবল ও ফলোন্মুখ হইলে নবীন পুরুষকার দ্বারা তাহার নিবারণ করা যায় না। যেমন অদৃষ্টবশতঃ নীচ জন্ম হইলে তাহার উপর আর হাত চলে না, ঐরূপ জন্মান্ধ, বধির, খঞ্জ, কুষ্ঠী প্রভৃতির অদৃষ্টজাত—অন্ধতা, বাধির্য্য, খঞ্জতা ও রোগাদি কেবল ভোগ দ্বারাই ক্ষয় করিতে হয়। ঐরূপ শুভাদৃষ্টও অত্যন্ত প্রবল ও ফলোন্মুখ হইলে, তাহা নিশ্চিতই ঘটিয়া থাকে। জ্যোতিষীরা কোষ্ঠী কর রেখাদি পরীক্ষা পূর্ব্বক প্রবল পূর্ব্বপুরুষকারেরই অমোঘ ফলগুলি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। লোকে উহাকে দৈব বলে। কিন্তু প্রত্যেকেরই স্মরণ রাখা উচিত,—ঐ অদৃষ্টের ভোগ এক জন্মেই শেষ হয় না, শত সহস্র জন্মে ভোগ হয়। সুতরাং অদৃষ্টের প্রভাবে বর্ত্তমান জন্মে কৃতশুভ পুরুষকারের তাদৃশ ফল উপলব্ধি না হইলেও, উহা যে কদাচ নিষ্ফল হয় না, অনন্তের অনন্ত হিসাবের খাতায় উহার যে হিসাব লিখিত থাকে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এইজন্যই পুরুষকারের প্রয়োজন। ভাবী শুভাদৃষ্ট সৃজন করিবার জন্য নবীন শুভ পুরুষকারের একান্ত প্রয়োজন। সংসারে অতি ঘৃণিত স্বভাব মহাপাপীরাও রাজার মত সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, তাহার ফলোন্মুখ শুভাদৃষ্ট একান্ত প্রবল। উহার অবসান না হইলে পাপের ফল ফলিবে না।

এক্ষণে আমরা দেখিতেছি যে, আপন আপন অদৃষ্ট গঠন জীবের আপনার হাতের মুঠার মধ্যে। এতদ্দ্বারা কেহ যেন এমন মনে না করেন, যে পুরুষকারের ষোল আনা ফলই যখন বাহিরে গিয়া পড়িতেছে, পর জন্মে ফলিবে শুনিতেছি, তখন এজন্মে কেন বৃথা পুরুষকার করিয়া মরি। বস্তুতঃ আমরা অহোরাত্র যে কার্য্য করি, তাহার ফল ত এখানেই প্রতি মুহূর্ত্তেই ভোগ করি। অর্থ ব্যয় পূর্ব্বক দুনিয়ার সুখ আমরা ইচ্ছা করিলেই ভোগ করিতে পারি। পরোপকার ও বিদ্যার্জ্জনের বিমল

আনন্দ ইহ জন্মেই ভোগ করি। ভাল মন্দ ফল মোটামুটি এখানেই ভোগ হয়। সুতরাং পুরুষ-কার সকলেরই অবলম্বনীয় হইতেছে। ফলোন্মুখ শুভ অদৃষ্ট দুর্ব্বল হইলে, তাহাকে নবীন পুরুষ-কার দ্বারা সাহায্য করিতে হয়। নচেৎ পুরুষের অবস্থা এক চক্রে হীন দ্বিচক্রগোযানের ন্যায় হইয়া থাকে। একদিকে চলিবার মত কিছুই না থাকায়, অন্যদিকের একমাত্র চক্র উহাকে স্থির ভাবে রাখিতে বা সোজা লইয়া যাইতে পারে না। ঐ সময়ে ফলোন্মুখ বিষাতক দুরদৃষ্ট না থাকিলে, পুরুষকার দ্বারা অনায়াসে শুভ সম্পদ লাভ করা যায়। প্রতি জীবনেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং এ বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

সুখ, সমৃদ্ধি বা দুঃখের নিবৃত্তিই সকলে প্রার্থনা করে। দুঃখে অভিভূত হইলে শরীর, মন ও আত্মার স্ফূর্ত্তি হয় না, মস্তিষ্ক, হৃদয় ও মন ব্যাকুল হইয়া তমোভাব প্রাপ্ত হয়, তখন অশুভ পুরুষ-কার দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তি করিতে গিয়া মানব ঘোরতর দুরদৃষ্টেরই সৃষ্টি করে। এইজন্য শুভ পুরুষকারের প্রয়োগ পূর্ব্বক দুঃখ নিবৃত্তি করিতে যত্ন করাই সকলের কর্ত্তব্য। সুখ ও দুঃখে সমদৃষ্টি মহাত্মারা দুঃখে অভিভূত বা সুখে উন্মত্ত হন না। তাঁহারা অবিচলিত ভাবে বিশ্বের হিতের জন্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক বিশ্বের আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিরই কামনা করেন। যাহাতে সংসারের অন্ধকার পূর্ণ বিপজ্জাল কাটিয়া যায়, সম্পদের অবিরল সুধাধারায় ধরা হাস্যময়ী হইয়া উঠে, দুঃখ, দৈন্য, আর্ত্তি, যাহাতে কোথাও না থাকিতে পায়, আনন্দময়ের সংসার আনন্দময় হয়, পাপের বিভীষিকা, বিষনদীর তরঙ্গ, লালসার অনল শিখা অধর্ম্মের নৃত্য যাঁহাতে চিরতরে শান্ত হইয়া যায় তাহাই সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সুখ ও দুঃখে তুল্য জ্ঞান, ঈশ্বরের প্রতি প্রবলা ভক্তি, তাঁহারই প্রীতির জন্য তদীয় কর্ম্মে কায়মনোবাক্যে

প্রাণপণে জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদন, সর্ব্বজগতে আত্মবোধ ইহাই ঐ সাধনার মূলমন্ত্র। এই মন্ত্রে সিদ্ধি ইহ জন্মের এবং অতীত জন্মের পুরুষ-কার সাপেক্ষ। এইজন্যই আমি সেই শ্রীভগবানের শ্রীচরণ রেণু লাভ ও ভক্তের ভক্তি মধুর পুরুষ-কার সাপেক্ষ বলিয়া বিবেচনা করি। ভক্তি শ্রীভগ-বানের দান হইলেও উহা ভিক্ষারূপ পুরুষ-কারের অপেক্ষা করে।

ভগবান্ ত্রিকালজ্ঞ। সামান্য মনুষ্যের ত্রিকাল বিষয়ক পরিস্ফুট ধারণা করিবার ক্ষমতা নাই। আমরা ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন ভাগে ভাগ করিয়া তিন দিক্ হইতে ঐ মহাকাল কালের একটু ছায়ামাত্র দেখিতে সমর্থ হই। একখানি গুটান কোষ্ঠীপত্র দক্ষিণ হাতে ধরিয়া বাম হস্তে একটু একটু খুলিতে খুলিতে গুটাইতে আরম্ভ করিলে যেরূপ দেখায়, কাল আমাদের নিকট অনেকটা তদ্রূপ। উহার দুইদিকে অনন্ত কুণ্ডলীতে কুণ্ডলীকৃত। একদিক এখনও খুলে নাই; কে জানে উহার ভিতরে কি আছে? অন্যদিক খুলিয়া গুটাইয়া গিয়াছে, কে তাহার হিসাব রাখি-য়াছে? আমরা কেবল এতটুকু 'বর্ত্তমান' লইয়াই বিস্ময়ে বিহ্বল হই। আমাদের ক্ষমতা নাই বলিয়া সমগ্র কালকে এক অবিচ্ছিন্ন সত্তারূপে গ্রহণ করিতে পারি না। কেবল ভগবান্ এবং ভগবত্তুল্য ব্রহ্মভূত ঋষিগণ অনাদি অনন্ত কালকে এক অখণ্ড সত্তারূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ। এই জন্য তাঁহাদের নিকট ভূতভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান যুগপৎ পটে অঙ্কিতের ন্যায় স্পষ্ট প্রতিভাত। কাহার কিরূপ অদৃষ্ট এবং কাহার কিরূপ পুরুষকার হইবে সকলই ভগবান্ জানেন। তিনি যে কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর! তাঁহার কাছে কিছুই লুকান থাকে না। এইজন্য তিনি তাঁহার ভক্ত অর্জ্জুনকে বলিয়া-ছিলেন—"দেখ, অর্জ্জুন, এই রাজগণ সকলে নিহত হইয়াই রহিয়াছে। তুমি যাহা দেখিতেছ কি? দিব্য চক্ষে আমার কৃপায় যাহা দেখিলে,

সামান্য মানুষ তাহার মনুষ্য বুদ্ধিতে বা স্থূল চক্ষুতে তাহা দেখিতে পায় না। এক্ষণে পুরুষকার প্রয়োগ করিয়া তুমি তাহাদের নিধনে নিমিত্তমাত্র হও। ইহাতে দুঃখের বা সুখের কিছুই নাই, কেবল কর্ত্তব্যের কঠোর অনুষ্ঠান আছে। এক্ষণে পুরুষকার প্রয়োগ করা বা না করা তোমার আয়ত্ত। তুমি পুরুষকার প্রয়োগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য করিলে কীর্ত্তি যশ প্রভৃতি আনুষঙ্গিক সুফল লাভ করিবে; না করিলে অযশ, অপ্রতিষ্ঠা, অগৌরব প্রাপ্ত হইবে। আমি তোমাকে কীর্ত্তি বা যশের জন্য লালায়িত হইতে বলিতেছি না, উহারা আনুষঙ্গিক মাত্র। পুরুষকার প্রয়োগ না করিলে অগৌরব, অকীর্ত্তি, অশান্তি আনুষঙ্গিক-রূপে আসে। কিন্তু কর্ত্তব্য কর্ত্তব্যের অনুরোধেই করিতে হয়—ইহা তোমাকে বলিতেছি। ইহা পেক্ষা জগতে আর উৎকৃষ্ট শিক্ষা নাই। যিনি জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারও সংসারে যে সকল কর্ত্তব্য আসিয়া উপস্থিত হয়, পূর্ণকাম আমি যেমন কর্ত্তব্য করিতেছি, তাঁহারও তদ্রূপ করা উচিত। অতএব তুমি আমার পরামর্শ শ্রবণ কর। মুক্তি পথের প্রধান উপদেশকে অগ্রাহ্য করিও না। জয়াশায় উৎফুল্ল হইয়া নৃত্য করিবার প্রয়োজন নাই, স্বজনগণের মৃত্যু ও পরাজয় দুঃখ করিবারও প্রয়োজন দেখি না, কেবল সমস্ত কার্য্যের ফল আমাকে সমর্পণ করিয়া আমার সন্তোষের জন্য সর্ব্বপ্রথমে প্রাণপণে কর্ত্তব্য সম্পাদন কর। আমার শ্রেষ্ঠ উপাসনা ও সর্ব্বোত্তম সন্তোষবিধান এইরূপেই হইয়া থাকে। তুমি ঐরূপে আমার ভজনা করিয়া চিত্ত-নির্ম্মল কর এবং আমার প্রতি ভক্তি দ্বারা আমার অনুগ্রহ লাভ কর।"

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে,—ভগবান্ যদি ত্রিকালজ্ঞ তাহা হইলে, অর্জ্জুন কি করিবেন না করিবেন,—কেবল অর্জ্জুন কেন,প্রত্যেক জীবই কে কিরূপ পুরুষকার করিবে না করিবে,—কাহার কিরূপ [illegible] জন্মে গতি, সুখ দুঃখভোগ হইবে, না হইবে, সকলই তিনি জানেন, অর্থাৎ সকলই পূর্ব্ব হইতে স্থিরীকৃত নাটকের মধ্যে নটদিগের ন্যায় আপন আপন পালায় কে কি করিবে, পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়া আছে। তবে জীবের স্বাধীনতা কোথায়? এতদুত্তরে এই বলা যায় যে, এই বিশ্ব-নাট্যের মহানাট্যকর্ত্তা সূত্রধার স্বয়ং ভিন্ন ভিন্ন নটের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া নাট্যে প্রবৃত্ত হইলেও, তাঁহারই মায়া প্রভাবে তাহারা সেই বিশ্বকর্ত্তার কর্তৃত্ব একেবারে বিস্মৃত হইয়া আপনারাই স্বাধীন কর্ত্তা ও স্বকর্ম্মের ফলভোক্তা বলিয়া মনে করে। এতদবস্থায় তাহাদের কৃত পাপ ও পুণ্যের জন্য তাহারাই দায়ী হয়। সংসারে এই কর্তৃত্ব কর্ম্ম-ত্বাদির ভান, অর্থাৎ আমি মারিলাম, আমাকে মারিল ইত্যাদিরূপ জ্ঞানের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া দুষ্কর। জীবের যখন ধারণাই হইতেছে যে, আমি স্বাধীন ও কর্ত্তা, তখন সে স্বাধীন ও কর্ত্তা হওয়ার ফলভোগ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব কোটিযোনি পরিভ্রমণ পূর্ব্বক জীবন্মুক্ত অবস্থা পর্য্যন্ত এই কল্পিত স্বাধীনতা ও পুরুষকারের প্রসঙ্গ প্রবল রহিতেছে। অতএব পুরুষকারকেই অবলম্বন করিয়া শুভ পুরুষকারে যত্ন করা সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইতেছে। জীবন্মুক্ত বা ব্রহ্মভূত ব্যক্তিই সংসারের প্রকৃত তত্ত্ব বিশ্বরূপ ভগবানের লীলা, কল্পে কল্পে সেই একই অভিনয় সেই নান্দী, প্রস্তাবনা অঙ্কের পর অঙ্ক ও যবনিকা-পতন বুঝিতে পারেন—প্রত্যক্ষ দেখিতে পান। তাঁহাদের নিকট পুরুষকার বলিয়া কিছুই নাই; দৈব, অদৃষ্ট, ভাগ্য বলিয়াও কিছুই নাই। সকলই মহাকালের নিষ্ঠুর খেলা।

আমরা সংসারী, আমাদের স্বতন্ত্র নিয়ম। আমাদের বদ্ধ অবস্থার মধ্যে মুক্ত অবস্থার 'তত্ত্ব' কথা প্রকাশ করিয়া বুদ্ধি বা মোহ উৎপাদন করিলে চলিবে না। সুতরাং সকলই নির্দ্ধারিত আছে, যাহা নির্দ্ধারিত আছে তাহাই ঘটুক বলিয়া চুপ চাপ কর্ম্মত্যাগ করিলে চলিবে না। উহাতে

আলস্য, উদ্যমশূন্যতা কর্ম্মত্যাগরূপ মহাপাপে নিশ্চয়ই লিপ্ত হইতে হইবে। আমি বদ্ধ জীব। অহংকারের সংসারে বাস করি। আমার কর্তৃত্ব জ্ঞান ঘুচিবার নহে। অকর্ম্ম কুকর্ম্ম সুকর্ম্ম আমাদিগের সকল প্রকার কর্ম্মের জন্য আমাদিগকেই দায়ী হইতে হইবে। এইজন্য কুকর্ম্ম ও অকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সুকর্ম্ম করাই প্রথমতঃ সুবিবেচনার কার্য্য। শুভকর্ম্ম সকলের পক্ষেই হিতকর। উহা বিশ্বের হিতকর এবং কর্ত্তার সম্পদের ও সুখের হেতু। উহাই শুভ অদৃষ্ট সৃষ্টি করে। শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ইহলোক ও পরলোকে স্বর্গসুখ ভোগ হয়। কিন্তু যাঁহারা ভগবানের অনুগ্রহের ভিখারী, যাঁহারা স্বর্গসুখকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অনন্ত আনন্দলাভ করিতে চান, যাঁহারা সেই অমৃত আস্বাদ করিতে চাহেন, যাহা পাইলে অন্য কোনও বস্তুর জন্য আর আকাঙ্ক্ষা হয় না, তাঁহারা সেই সুকর্ম্ম সেই শুভকর্ম্ম সেই কর্ত্তব্য কর্ম্মের ফল নিজেরা প্রার্থনা করেন না। কর্ম্মের ফলভোগে বাসনা থাকিলে, আমি কর্ত্তা জ্ঞান থাকিলে, কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় ; তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক। কিন্তু কর্ম্মফল যদি কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবান্‌কে সমর্পণ করা যায় তাহা হইলে আর ফলভোগ করিতে হয় না। এই জন্যই কর্ম্মযোগীরা সমস্ত কর্ম্মফল তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া অনাসক্ত হইয়া কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে তাঁহার প্রীতির জন্য কার্য্য করিয়া যান। এইরূপ অনুষ্ঠানে চিত্ত নির্ম্মল হয়, অহঙ্কারের মূলোৎপাটন হয়, বুদ্ধি মোহমুক্ত হয়, আত্মানন্দ উপভোগ হয়।

সংক্ষেপে ইহাই বলা যায় যে, যে অহঙ্কার বা অভিমান হইতে এই সংসারের উৎপত্তি সেই অহংকারের মূলোচ্ছেদ এবং সংসারকে স্বর্গে পরিণত করিতে হইলে, জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্যের মধ্যে অহঙ্কারের ছায়াকেও আসিতে দিবে না। পুরুষকার অহং বিবর্জ্জিত হইলেই পরমপুরুষে লয়প্রাপ্ত হয়, ফলদান করে না। কিন্তু মিথ্যা রজ্জু হইতেও উহাতে সর্পজ্ঞান হইলে, যেমন সত্য সত্যই ভয় কম্প প্রভৃতি হয়, ঐরূপ লীলাময়ের রঙ্গমঞ্চে আপনাকে নট বলিয়া মিথ্যা অভিমান জন্মিলে সংসারের সুখদুঃখ ও অনন্ত পরিভ্রমণের অবসান থাকে না। কিন্তু রজ্জুতে রজ্জু জ্ঞান হইলেই যেমন সমস্ত ভয় কম্প প্রভৃতির নিবৃত্তি হয়, ঐরূপ নিজে নিজের স্বরূপ বুঝিয়া অভিমান বিসর্জ্জন পূর্ব্বক লীলাময়ের কর্ম্ম লীলাময়কে সমর্পণ করিলেই, আর তাহার কোনও বন্ধকত্ব থাকে না। বন্ধনের অভাবই মুক্তি। অতএব দেখা যাইতেছে, সংসারীর পক্ষে মুক্তির একমাত্র উপায় পুরুষকারে নির্ভর। পুরুষকারে স্বীকার না করিলে, সমাজ বা সংসার এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারে না। জগৎ পুরুষকারের উপর প্রতিষ্ঠিত। পুরুষকার সৃষ্টির ও সৃষ্টজগতের মূলমন্ত্র। ভক্তের জন্য ভগবানের যুগে যুগে ব্যাকুলতা প্রকাশ ও ভগবানের জন্য ভক্তের চিরকাল ব্যাকুল ক্রন্দন ও আত্মনিবেদন সকলেরই মূলে পুরুষকার।

শিশু পরিচর্য্যা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[কবিরাজ শ্রীরাখালদাস সেন কাব্যতীর্থ]

উদরাময়।

সদ্যোজাত শিশু প্রথমে মায়ের স্তনদুগ্ধ খাইয়া যে দিনে চার পাঁচ বার কি ছয়বার পর্য্যন্ত মলত্যাগ করে তাহাকে সাধারণতঃ পেটের অসুখ বলা হয় না। কেন না তখন পাঁচ ছয় বার মলত্যাগই

স্বাভাবিক। যদি তাহার বেশী মল হয়, পেট-কামড়ায়, সে জন্ত শিশু প্রায়ই কাঁদিতে থাকে অথবা পেট ফাঁপে, কখন কখন বা দুধ খাইয়াই ছানা ছানা বমি করিয়া ফেলে। শাদা শাদা কিংবা সবুজ সবুজ অথবা নানা রঙের বহুবার মলত্যাগ করে ও শিশুর মুখ চোক বসিয়া যায় বা ম্লান হয়, তবেই শিশুর উদরাময় হইয়াছে বলিয়া জানিবে।

উদরাময় হইলেই শিশুর আহারের দিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। যেহেতু আহারের দোষেই সাধারণতঃ শিশুদিগের পেটের অসুখ হইয়া থাকে। এজন্য স্তন্যপায়ী শিশুর পেটের অসুখ হইলেই স্তন্যদাত্রী জননী অথবা ধাত্রীর আহার সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম পালন করিতে বলিবে, এবং যাহাতে তাহাদের মানসিক কোনও প্রকার অশান্তি বা চিন্তা প্রভৃতি না জাগে, সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখিবে।

চিন্তা, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, শোক, গুরু-পাকদ্রব্য ভোজন, ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হইতেই পুনরায় ভোজন প্রভৃতি নানাবিধ অহিতকর আচরণের দ্বারা জননীগণের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের বিকৃতি ঘটিয়া থাকে এবং সেজন্য তাঁহাদের স্তনদুগ্ধ ও বিকৃত হইয়া থাকে। সেই বিকৃত দুগ্ধপান করিলে শিশুরও উদরাময় প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাধির উৎপত্তি হয়। সুতরাং শিশুর স্বাস্থ্যভগ্ন হইলেই সর্ব্বপ্রথমে স্তন্যদাত্রী জননী বা ধাত্রীর স্বাস্থ্য কিরূপ আছে দেখিতে হইবে এবং আবশ্যক-মত তাঁহাদের আহারাদির বিশেষ পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হইবে।

যে সকল সন্তান বেশীর ভাগ গোদুগ্ধ অথবা বিলাতী খাদ্যের উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করে। তাহাদের যদি পেটের অসুখ দেখা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ গোদুগ্ধ বা বিলাতী দুগ্ধ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। অনেক সময়ে বিলাতী খাদ্য বা টিনের দুগ্ধ বন্ধ করিয়া দিতেই শিশুর উদরাময় নিবৃত্তি হইতে দেখা গিয়াছে। বিলাতী খাদ্য বা দুগ্ধ সবসময়েই যে অবিকৃত অবস্থায় এদেশে আসিয়া থাকে, এমন তো মনে হয় না।

যে সকল বালকের গোদুগ্ধ ব্যতিরেকে অন্য-প্রকার খাদ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, তাহাদিগের পেটের অসুখ হইলে, গোদুগ্ধের দ্বিগুণ জল ও দুগ্ধ এবং তাহাতে একটুকরা বেলশুঁঠ (কচিবেল খণ্ড খণ্ড করিয়া শুকাইয়া লইলেই বেলশুঁঠ হয়) আর গোটাকতক যোয়ান ন্যাকড়াতে বাঁধিয়া সবগুলি সিদ্ধ করিতে দিবে এবং খানিকটা জল থাকিতেই দুগ্ধটা নামাইয়া লইয়া বেলশুঁঠ ও যোয়ান তাহা হইতে তুলিয়া ফেলিয়া দিবে। সেই দুধ একটু বার্লি, সাগু বা শটীর পালোর সহিত মিশাইয়া বারে বেশী ও মাত্রায় কম করিয়া খাইতে দিলেই আহারের জন্য আর শিশুর কোন প্রকার পেটের অসুখ হইবার ভয় থাকিবে না।

উদরাময়ের চিকিৎসা।

বিকৃত মাতৃদুগ্ধ পান করাতে যে সকল শিশুর পেটের অসুখ দেখাদেয় এবং শরীর ও একটু জ্বর জ্বর বলিয়া মনে হয়; তাহাদিগকে,—

১। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কণ্টকারী ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকটী ৵০ দুই আনা পরিমাণে লইয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া শিলে ছেঁচিবে এবং একটী মাটির পাত্রে আধপোয়া জল দিয়া কাঠের জ্বালে সিদ্ধ করিবে। যখন জল মরিয়া আধছটাক আন্দাজ অবশিষ্ট থাকিবে, তখন উহা নামাইয়া ছাঁকিয়া একবারে অথবা দুই তিন বারে শিশুকে পান করাইয়া দিবে। অথবা,—

হরিদ্রা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, গজপিপুল, বৃহতী, কণ্টকারী চাকুলে ও শুল্ফা, এই সকলের চূর্ণ সমান পরিমাণে লইয়া উত্তম রূপে মিশাইবে এবং তিনরতি হইতে ছয়রতি মাত্রায় দিনে তিন-বার মধুদিয়া বালককে খাওয়াইবে। যে সকল শিশু বহুদিন হইতে পেটের অসুখে কষ্ট পাইতেছে, শরীর খুব দুর্ব্বল ও কিছুই খাইতে চায় না, তাহাদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

২। ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধনে, লোধ, ইন্দ্রযব ও বালা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমান ভাগে লইয়া মিশাইবে এবং আধখানা হইতে একখানা,—অথবা বালকের একটু বয়স হইলে দুই আনা পর্য্যন্ত মাত্রায় দিনে তিনবার মধুদিয়া চাটাইয়া খাওয়াইয়া দিবে। ইহাতেও বালকের পেটের অসুখ, বমি ও জ্বর প্রভৃতির বিশেষ উপকার হয়। শিশুর জ্বর না থাকিলেও এই ঔষধ দিতে পারা যায়। অথবা,—

৩। মুথা, পিপুল, আতইচ ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশাইবে এবং একআনা মাত্রায়, দিনে তিনবার মধুর সহিত মিশাইয়া শিশুকে লেহন করাইবে। ইহাতে জ্বরাতিসার অর্থাৎ জ্বরের সহিত পেটের অসুখ বমি ও কাসি প্রভৃতি অচিরে আরোগ্য হয়। অথবা—

৪। আমড়ার ছাল, আমছাল ও জামছাল, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া একআনা মাত্রায় দিনে তিনবার অথবা দুইবার মধুদিয়া বালককে সেবন করাইলে শিশুদের পেটের অসুখ ভাল হইয়া থাকে। অথবা—

৬। যে সকল শিশু অনবরত ভেদ ও বমিতে বিশেষ কাতর হইয়া থাকে, তাহাদিগকে,—

কুল, আমরুল, কাকমাচী ও কয়েদবেল,—ইহাদের পাতা বাটিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে অচিরে আরোগ্যলাভ করিয়া থাকে।

শিশুর উদরাময়ে জননীর পথ্যাপথ্য।

যে সকল জননীর সন্তানের পেটের অসুখ হইয়াছে, তাঁহাদিগকে যদি ঐ পীড়িত সন্তানকে স্তনদুগ্ধ পান করাইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহারা নিম্নলিখিত পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।—

পথ্য—প্রাতে দেড় প্রহরের মধ্যে অর্থাৎ দশটা আন্দাজ সময়ের মধ্যে,—পুরাতন চালের বেশ সুসিদ্ধ ভাত, মসুরীর দাল অথবা কৈ মাগুর মাছের ঝোল এবং পটোল কচি বেগুন, কাঁচকলা, ডুমুর ও মোচা প্রভৃতির তরকারী খাইতে পারিবেন। মাছের ঝোলের সঙ্গে গোটাকতক গন্ধভাদ্রলের পাতা বাটিয়া দিয়া তৈয়ারী করিয়া লইতে পারিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ইচ্ছা করিলে ভাতের সঙ্গে ঘোল ও খাইতে পারেন। আর রাত্রিতে,—শটীর পালো, বার্লি, যবের মণ্ড কিংবা পানিফলের পালো খাইবেন। জলখাবারের মধ্যে,—সকালে মিছরীর গুঁড়া দিয়া বেলপোড়া অথবা দাড়িম, কেশুর ও পানিফল এবং বৈকালে বেলের মোরব্বা।

অপথ্য—ঘৃতপক্ক ও গুরুপাকদ্রব্য, লঙ্কার ঝাল অধিক জলপান, গম, মাষকলায়, শাক, আকের-গুড়, নারিকেল অধিক লবণাক্তদ্রব্য গায়ে বেশী করিয়া তেল মাখা, রাত্রিজাগরণ 'পিটে' ও ভাজা-পোড়া দ্রব্য, দুই বেলা স্নান বা গা ধোয়া প্রভৃতি।

যাঁহারা সন্তানের সুদীর্ঘজীবন ও অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য কামনা করেন, তাঁহারা ছেলের অসুখে নিজের কর্ত্তব্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। কেহ যেন চিকিৎসক ও ধাত্রীর উপর শিশুর ভার দিয়া মাতৃকর্ত্তব্য হইতে নিশ্চিন্ত না হয়েন।

ধন্বন্তরি।

মাসিক পত্র

২য় বর্ষ, } বৈশাখ, ১৩২৪, ইং ১৯১৭ এপ্রেল, মে, { ৭ম সংখ্যা

সিন্ধুপারে।

[শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় ব্যাকরণতীর্থ।]

সন্ধ্যাবেলায় সিন্ধুবেলায় একলা বসে আছি।
সঙ্গে সাথী নাইক আমার
সম্মুখে যে অপার পাথার
নাইক কড়ি, নাইক তরী, নাইক দাঁড়ি-মাঝি।
বিশ্ব-ব্যাপী নিবিড় নিশা আসছে আঁধার-রাজি॥

বইল বেগে বিষম বাতাস উঠ্‌ল তুফান নাচি।
জুটল নিকষ মেঘের মালা,
ছুটল তড়িৎ উঠ্‌ল জ্বালা,
চম্‌কে উঠে জীমূত-স্বনে বিশ্ব-জগৎ আজি।
টুটল নিখিল বাঁধন ঘটল মহা প্রলয় বুঝি॥

শিথিল শরীর অঙ্গ অবশ কাতর জীবন আজি।
সুদূর হ'তে পড়্‌ছে টান,
আধার হল অলস প্রাণ,
কে যেন ঐ আস্‌ছে বুঝি, পার কর গো বাঁচি।
সন্ধ্যা বেলায় সিন্ধুবেলায় একলা বসে আছি॥

অর্ঘ্য।

[শ্রীহেমচন্দ্র সেন গুপ্ত।]

(১)

সংসারে যাহার তরে নিশিদিন ঘু'রে মরে
সে কভু ভুলেও তারে ফিরে নাহি চাহিল;
জনম জনম্‌কাল ঘুচিলনা মোহজাল
সাধনার পথে হায় বিধি বাদ সাধিল!

(২)

প্রতিদিন মনে করি চাহিবনা কভু ফিরি
তুই যত বিপদের—অনর্থের মূল;
কিন্তু পোড়া বিধি তায় এ ভীম সংসারে হায়
দাঁড়ায় এঘোর পথে সাজিয়া শার্দ্দূল!

(৩)

ভাবি সদা মনে মনে চাহিবনা তোর পানে
নয়ন মুদিয়া রব, ওহে লুব্ধমন!
পশ্চাতে সংসার ঘোর ঠেলিয়ে সে মোহ-ঘোর
তোর পানে নেয় টেনে করিয়ে মগন।

(৪)

হে তুমি রজত খণ্ড কর বিশ্ব লণ্ডভণ্ড
অসীম ক্ষমতা তব করিয়া বিস্তার,—
অসাধ্য সাধনা যত করিতেছ সমাহিত
তোমা ভয়ে কম্পিত এ অসীম সংসার।

(৫)

কভু মনে আশা আসে বহু অর্থ পেলে বশে
দীর্ঘ বরষের ক্লান্তি সকলিত ঘুচিত;
সে মুহূর্ত্ত জীবনের আসিয়াছে অনেকের
কভু কি হয়েছে পূর্ণ সেই আশা বাঞ্ছিত?

(৬)

তাই মম মুগ্ধ-আশা কেন কর বৃথা আশা
যা ল'য়ে রয়েছ তুমি তাতে রহ হর্ষিত,—
অল্প লয়ে যেই রহে সুখ দুঃখ সদা স'য়ে
শান্তিদাতা করে তাঁর শান্তিবারি বর্ষিত!

জাতি ও বর্ণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন বি, এল।]

একণে আমরা সমগ্র ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তটী নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি :—

ওঁ পুরুষসূক্ত মালা মন্ত্রস্য নারায়ণঋষি
রনুষ্টুপ্ ছন্দো জগদ্বীজপুরুষদেবতা॥১
সহস্রশীর্ষঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বা ত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥২
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চভাব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনা তিরোহতি ॥৩
এতাবানস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥৪
ত্রিপাদূর্দ্ধ মুদৈতৎ পুরুষ পাদোঽস্যেহা ভবৎ
পুনঃ।
ততো বিশ্বং ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥৫
ততো বিরাড়জায়ত বিরাজোঽধিপুরুষঃ।
স জাতোঽত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমি মথো পুরঃ ॥৬
তস্মাদ্‌যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যম্।
পশূং স্তাশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যাং গ্রাম্যাংশ্চ যে ॥৭
তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি যজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥৮
তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হি জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥৯
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষণপুরুষং জাত মগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যায়শ্চ ঋষয়শ্চ যে ॥১০
যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমাসীৎ কিং বাহু কা উরু পাদা
উচ্যতে ॥১১
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূরাজন্য কৃতঃ।
উরুতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাংশূদ্রো অজায়ত ॥ ১২
চন্দ্রমা মনসো জাত শ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়তঃ।
শ্রোত্রাদ্বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নি রজায়ত ॥১৩
নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তয়ত।
পদ্ভ্যাং ভূমি র্দ্দিশঃ শ্রোত্রং তথা লোকান
কল্পয়ৎ ॥১৪
সপ্তাস্যাসন্ পরিচয় স্ত্রিসপ্ত সমিধঃ কৃতঃ।
দেবা যদ্‌যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ ॥১৫
যজ্ঞেন যজ্ঞ মজন্তদেবা স্তানি ধর্ম্মানি প্রথমা-
ন্যাসন্।
তেহনাকং মহিমানং সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ
সন্তিদেবাঃ ॥১৬

অন্বয়ার্থ।—পুরুষসূক্তমালা মন্ত্রের নারায়ণ ঋষি, অনুষ্টুপ ছন্দ ও জগদ্বীজ পুরুষ দেবতা। ১। এই (জগদ্বীজ) পুরুষ অনন্ত মস্তক (জীবাত্মা), অনন্ত চক্ষু, (জ্ঞানেন্দ্রিয়) অনন্ত পদ (কর্ম্মেন্দ্রিয়) বিশিষ্ট।

পরিদৃশ্যমান জগৎ যাঁহার দেহ স্বরূপ, যাহা মানবদেহের সাদৃশ্যানুসারে চতুরশীতি অঙ্গুলি পরিমাণ কল্পিত হইয়া থাকে, তাহার দশ অঙ্গুলি পরিমিত মস্তকাংশ স্বঃপাদ বা কারণ শরীর তন্নিম্নে ও নাভির ঊর্দ্ধে চতুর্বিংশতি অঙ্গুলি পরিমিতাংশ ভুবঃ পাদ বা সূক্ষ্মশরীর, যাহাতে নাভির দশাঙ্গুল উপরে হৃৎপদ্ম বিরাজিত, এবং নাভির নিম্নে বক্রী পঞ্চাশৎ অঙ্গুলি পরিমিত দেহ ভূঃ পাদ বা স্থূল শরীর) সেই জগৎ কারণ পুরুষ সমস্ত ভূমি অর্থাৎ স্থূল শরীরের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকিয়াও তাহার (অর্থাৎ নাভির) দশ অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে অতিক্রম পূর্ব্বক সূক্ষ্ম শরীর ভুবঃ পাদে যথায় হৃদ্‌পদ্ম অবস্থিতি তথায় বিদ্যমান আছেন। ২। অতীত বর্ত্তমান ও অনাগত কালের গর্ভে যাহা কিছু হইয়াছে, আছে বা হইবে সেই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষই সেই সমস্ত, অর্থাৎ তিনি ত্রিকালগোচর অবিকৃতস্বরূপ বা কাল অপরিচ্ছিন্ন। ইনিই সেই অমৃত ও রসের প্রভু, অন্নরসময় জীবন চরাচর জগজ্জীব সেই পুরুষের রূপ। ৩। (অর্থাৎ তিনি বিশ্বাসুগ) সর্ব্বদেশ কালব্যাপী ভোগাপবর্গের প্রভু সেই পুরুষের এতাদৃশী মহিমা [পাছে কেহ মনে করেন জগতই পরমেশ্বরের রূপ, তাই বলিতেছেন] যে তিনি বিশ্ব হইতে মহত্তর অর্থাৎ বিশ্বাতিগ, যেহেতু অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ভূত পদার্থ তাঁহার একপাদ অর্থাৎ সামান্য অংশ মাত্র এবং অবশিষ্ট তিন অর্থাৎ অনন্তাংশ দেশ কাল ও বস্তুর অপরিচ্ছিন্ন, নিত্য ও স্বপ্রকাশিত। ৪। সেই পরব্রহ্মের ত্রিপাদ, মায়াধীন কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বিশিষ্ট নশ্বর-চরাচর বিশ্বের বহির্ভূত তাঁহার একপাদেই জগৎ কার্য্য পুনঃ পুনঃ ফলভোক্তা মনুষ্যও অভোক্তা অপর জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জাদি সমস্তকেই ব্যাপিয়া আছেন। ৫। সেই ব্রহ্ম পুরুষের মায়াধীন একপাদ, আদি ব্রহ্মা হইতে সজলস্থল নভঃ ও সর্ব্বজীবরূপে চরাচর বিশ্বে পরিণত হইয়াছেন। সেই কার্য্যব্রহ্ম বা বিরাট পুরুষ হইতে অধিপুরুষ বা স্বায়ম্ভুব মনু উৎপন্ন হন। সেই মনুরই (মৈথুন প্রভব) বংশাবলী দ্বারা পশ্চাৎ পৃথিব্যাদি সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে। বিরাটপুরুষই ব্রহ্মপুরুষের মায়াধীন একপাদ কার্য্য ব্রহ্ম বা স্থূলাংশ যাহাতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে বক্রী দুই পাদ আতিবাহিক দেহের একার্দ্ধ সূক্ষ্মশরীর বা হিরণ্যগর্ভ ও অপরার্দ্ধ কারণ শরীর যাঁহাকে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা বলে। ৬। ব্রহ্ম পুরুষের সর্ব্বযজ্ঞ স্বরূপ একপাদ (বিশ্বপ্রাণ বিরাট) হইতে জগতের উপাদান কারণ হবিঃ (মন দশেন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্রা ও পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হইলেন, সেই হবিঃ পৃষৎ জলকনা দধি ও ঘৃত হইতে বায়ব্য আরণ্য ও গ্রাম্য যজ্ঞীয় পশু সকল সৃজন হইয়াছিল অর্থাৎ জীব সমষ্টি বা বিরাট পুরুষ যজ্ঞীয় পশুরূপে কল্পিত হইলেন সুতরাং জীব মাত্রেরই সর্ব্ববিধ যজ্ঞ করিবার অধিকার আছে। ৭। সেই সর্ব্বযজ্ঞ স্বরূপ পুরুষ হইতে ঋক্, সাম, যজুঃ ও ছন্দ (অথর্ব্ববেদাদি) উৎপন্ন হইয়াছিল যেহেতু জগদ্‌জীব এই চতুর্ব্বেদের মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞ করিবে, অর্থাৎ জীব মাত্রেই বেদমার্গে বিচরণ করিবে। ৮। সেই সর্ব্বযজ্ঞ স্বরূপ পুরুষ হইতে অশ্ব ও দুই পংক্তি দন্তবিশিষ্ট জন্তু সকল, গো, ছাগ ও মেষ প্রভৃতি পশু যজ্ঞার্থ সৃষ্টি হইয়াছিল। ৯। সেই ব্রহ্ম পুরুষের (বিশ্ব প্রাণরূপ) একপাদ যানাং যজ্ঞ সাধনভূত পশুস্বরূপ কল্পিত হইয়াছে ও জগদ্রূপে প্রকাশিত আছেন। তাঁহাকে (প্রাণায়ামাদি দ্বারা) হোমাগ্নিতে সংস্কৃত করিয়া দেবগণ, সাধ্যগণ ও মরীচ্যাদি মহর্ষিগণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এবং ব্রহ্মপুরুষের (জগদ্বিভূতি রূপ) একপাদ অতিক্রম করিয়া ত্রিপাদ অমৃতধামে

য়াম রূপ যজ্ঞে যোগসমাধি লব্ধ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা জগদ্রূপ বাসনা ভস্মীভূত করিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন। ১০। সেই ব্রহ্মৈকপাদ জগদ্রূপে প্রকাশিত বিরাট পুরুষের কার্য্য বুঝিবার জন্য) মহর্ষি বেদ ও সাধ্যগণ বিশ্বরূপ পুরুষ শরীরকে বা জগৎ প্রাণকে যে যজ্ঞীয় পশুভাবে কল্পনা করিয়া বিভাগ করিয়াছিলেন তাহা কয় প্রকারে করিয়াছিলেন? তাঁহার মুখ কি (হইয়াছিল) অর্থাৎ মুখের স্বরূপ জগতের কোন বস্তু কল্পিত হইয়াছিল? বাহুদ্বয় কি অর্থাৎ বাহুদ্বয় স্বরূপ কোন বস্তু কল্পিত হইয়াছিল? উরুদ্বয় স্বরূপ কোন বস্তু কল্পিত হইয়াছিল? এবং পাদদ্বয় স্বরূপ কোন বস্তু কল্পিত হইয়াছিল? ১১। (উত্তর) ব্রাহ্মণবর্ণ তাঁহার মুখের স্বরূপ, ক্ষত্রিয় বর্ণ বাহুদ্বয় স্বরূপ বৈশ্যবর্ণ উরুদ্বয় স্বরূপ ও শূদ্রবর্ণ তাঁহার পদদ্ব য়স্বরূপ হইয়াছিল। ১২। চন্দ্র তাঁহার মনস্বরূপ, সূর্য্য তাঁহার চক্ষু স্বরূপ, বায়ু প্রাণস্বরূপ, অগ্নি মুখস্বরূপ। ১৩। আকাশ নাভিস্বরূপ, মস্তক দ্যুলোক স্বরূপ, পৃথিবী পদস্বরূপ এবং দিক্‌সকল কর্ণ স্বরূপ কল্পিত হইয়াছিল। ১৪। জগতের উপাদান হবি (বাসনা) যাঁহার শরীর সেই হবির আহুতি দ্বারা (অর্থাৎ বাসনা ক্ষয় ও দেহাত্ম বুদ্ধি জগজ্জ্ঞান ধ্বংশ করিয়া) যে (প্রাণায়াম মনন ধ্যান ধারণা নিদিধ্যাসনাদি বিশিষ্ট) যজ্ঞ (অর্থাৎ যোগ) করিয়াছিলেন তাহাতে বসন্ত ঘৃত স্বরূপ, গ্রীষ্ম ঋতু সমিধ স্বরূপ এবং শরৎকাল পুরোডাশ স্বরূপ হইয়াছিল। (অর্থাৎ শরৎ বসন্ত ও গ্রীষ্মকাল যজ্ঞ ও প্রাণায়ামাদি যোগের প্রশস্ত সময়। ১৫। সপ্ত (সমুদ্র) সেই যজ্ঞভূমির পরিধিস্বরূপ ও একবিংশতি ছন্দ তাহার সমিধ হইয়াছিল। এই (প্রাণায়ামাদি) যজ্ঞে মহর্ষি দেব ও সাধ্যগণ পশুরূপী কার্য্য ব্রহ্মপুরুষকে (অর্থাৎ বাসনা যাহা জগৎ রচনা করে তাহাকে) বধ (অর্থাৎ জয়) করিয়াছিলেন। ১৬। এই প্রথমানুষ্ঠিত (প্রাণক্রিয়ারূপ) যজ্ঞ দ্বারা দেবতাগণ যজ্ঞ অমৃতধামে গিয়াছিলেন, যথায় সাধ্য ও মহর্ষিগণ পূর্ব্বে ছিলেন। ১৭।

ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তের প্রতিপাদ্য বিষয় জগদ্বীজ পুরুষ। ইহাতে জাতিসৃষ্টি বিষয়ক কোন কথাই নাই। বরং উহা হইতে দেখা যায়, ব্রহ্মা কোন মানবই সৃষ্টি করেন নাই। মনুই সৃষ্টিকর্ত্তা, মনুর বংশাবলীর দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিপূরিত হইয়াছে। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ ব্রহ্মৈকপাদ কার্য্য ব্রহ্ম যিনি ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত সেই বিরাট পুরুষের বিভূতি বুঝিবার জন্য নরদেহ সাদৃশ্যে বিশ্বপ্রাণ বিরাট পুরুষকে মুখাদি অবয়ব বিশিষ্ট একটী যজ্ঞীয় পশু কল্পনা করিয়া তাঁহাকে যজ্ঞে যেন বলিদান দিয়া অনেক খণ্ডে বিভাগ করিলেন। তদনন্তর এই পশুর এক একটি অবয়বের সহিত জাগতিক পদার্থের তুলনা দিয়া বলিতেছেন তাঁহার মুখটি যেন ব্রাহ্মণবর্ণ হইল, বাহুদ্বয় যেন ক্ষত্রিয়বর্ণ হইল, উরুদ্বয় যেন বৈশ্যবর্ণ হইল ও পদদ্বয় যেন শূদ্রবর্ণ হইল, চক্ষু যেন সূর্য্য হইল, মন যেন চন্দ্র হইল, নাভি যেন আকাশ হইল, মস্তক যেন দ্যুলোক (দেবতা নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কাদি) হইল, কর্ণ যেন দিক সকল হইল, এবং পদদ্বয় যেন পৃথিবী (অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত স্থাবর এবং অস্থাবর জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ প্রাণী সকল ও অপ্রাণী সকল চর ও অচর যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই) হইল। ইহা সমস্তই একটি রূপক। জগদ্বীজ পুরুষের বিভূতি বর্ণন মাত্র। ব্রহ্মা ত নহেই, বিরাট ও সত্য সত্য একটি পশু ছিলেন না ও ঋষিগণ তাঁহাকে যজ্ঞে বলিদানও দেন নাই এবং তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদনও করেন নাই। কল্পনায় বা রূপকে বিভূতি বর্ণনোদ্দেশ্যে বলা হইল যে সেই বিরাট স্বরূপ কল্পিত পশুর মুখাদি অবয়ব ব্রাহ্মণাদি বর্ণ এবং চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার মন ও চক্ষু ইত্যাদি অতএব মুখজ ইত্যাদি বাক্য কেবল কল্পনায় কৃত হইয়াছে। এরূপ কল্পনার

যে অঙ্গ জাত বলা হইবে তাহার শ্রেষ্ঠতা ও জ্যেষ্ঠতা বুঝিতে হইবে শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টাক্ষরে তাহাই উক্ত হইয়াছে মনুও রূপকে তাহাই বলিয়াছেন যথা—

ঊর্দ্ধং নাভেঃ মেধ্যতরঃ পুরুষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ মেধ্যতমং ত্বস্য মুখমুক্তং স্বয়ম্ভুবা॥
উত্তমাঙ্গোদ্ভবাৎ জৈষ্ঠ্যাৎ ব্রাহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ।
সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ॥

মনু ১।৯২-৯৩

"নাভির উর্দ্ধে পুরুষ দেহ পবিত্রতর কথিত হইয়া থাকে। স্বয়ম্ভু বলিয়াছেন তন্মধ্যে মুখই পবিত্রতম। বেদ ধারণহেতু ও উত্তমাঙ্গোদ্ভব (বলায়) ব্রাহ্মণবর্ণ জগতের প্রভু হইতেছেন।"

ক্রমশঃ

স্বর্গীয় জজ অভয়কুমার দত্ত গুপ্ত।

[শ্রীচিন্তাহরণ সেন শর্ম্মা।]

যাঁহারা শূন্যগর্ভ বক্তৃতাদি দ্বারা দেশহিতৈষণা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা, নাম ও যশের কাঙ্গাল না হইয়া যাঁহারা অশেষবিধ মঙ্গলজনক কার্য্যের চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় করিয়া দেশের প্রকৃত কল্যাণ-সাধন করেন, তাঁহারাই প্রকৃত দেশহিতৈষী পদবাচ্য। বিক্রমপুর জৈনসার গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় জজ অভয়কুমার দত্ত গুপ্ত মহাশয় একজন সেই শ্রেণীর দেশহিতৈষী ছিলেন।

শাণ্ডিল্য গোত্রসম্ভূত প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীপতি দত্তের বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ বিক্রমপুর বৌলাসার গ্রামে আগমন করেন। কালক্রমে কীর্ত্তিনাশার উত্তাল তরঙ্গাঘাতে উক্ত বৌলাসার গ্রাম নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইলে উক্ত বংশোদ্ভব রতিনাথ দত্ত বিক্রমপুর-জৈনসার গ্রামে বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। জৈনসারের দত্তবংশে অনেক কৃতিলোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহারা বিক্রমপুরে কুলক্রিয়ার জন্য প্রসিদ্ধ। বিজ্ঞ রতিনাথ দত্তের উত্তরপুরুষ রাজচন্দ্র দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় মহাত্মা অভয়কুমার দত্ত ইংরাজী ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফাল্গুন বুধবার জৈনসার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিক্রমপুরের সর্ব্বত্র "জজ বাবু" নামে পরিচিত ছিলেন। অভয়কুমার শৈশবেই অতিশয় মেধাবী ও ধীশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। তৎকালে বিক্রমপুরে কোনও ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল না; কেবল প্রধান প্রধান গ্রামে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ছিল; তথায় বাঙ্গালা শিক্ষা দেওয়া হইত। অতএব তিনি বাড়ীতে থাকিয়াই ৭ বৎসর বয়সে গুরুমহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন।

তৎপর তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে নোয়াখালী লইয়া যান, এবং তৎকালের নিয়মানুযায়ী পার্শী ভাষা শিক্ষা করিতে দেন। সেই সময়ে তিনি কোনও এক বন্ধুর নিকট ইংরাজী পুস্তক দেখিয়া উক্ত ভাষা শিক্ষা করিবার অভিলাষী হয়েন, এবং অসাধারণ পরিশ্রম ও যত্নের সহিত ক্রমে তিনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন।

তৎপর তিনি আইন শিক্ষা করিয়া তৎকালের নিয়মানুযায়ী মুন্‌সেফী পরীক্ষা দেন, এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট তারিখে ২৪ বৎসর বয়সে মুন্‌সেফী কার্য্য গ্রহণ করিয়া বিচারাসনে উপবিষ্ট হয়েন। তিনি অতিশয় কর্ম্মঠ ও সুদক্ষ কর্ম্মচারী ছিলেন; তিনি যখন যেখানে গমন করিতেন, সেইখানেই অতীব দক্ষতার সহিত কাজ করিতেন। তিনি যখন মুন্‌সেফী কার্য্য গ্রহণ করেন, তখন মুন্‌সেফী কার্য্য অত্যন্ত জটিল ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ছিল। এজন্য তিনি উক্ত

আইন সংশোধন মানসে এক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন। গভর্ণমেণ্ট উক্ত পাণ্ডুলিপি সাদরে গ্রহণ করিয়া আইনে পরিণত করেন। উহাই আজ পর্য্যন্তও ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ২৬ আইনরূপে বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। রাজকার্য্যে তিনি অতীব যশ ও সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া পরিশেষে ঢাকা স্মলকজ্-কোর্টের জজের পদে উন্নীত হয়েন, এবং তাহা অতীব সুখ্যাতির সহিত সম্পন্ন করেন।

অভয় বাবু দেশের যথেষ্ট হিতজনক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। দেশে ধর্ম্মনীতি, স্বাস্থ্য বিধান ও শিক্ষাপ্রচারে তিনি অনেক অর্থ ব্যয় ও চেষ্টা করিয়াছেন; উহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান লোকহিতকর এবং গৌরবজনক কার্য্য,—জৈনসার গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ইহা সংস্থাপিত হয়, এবং ডিসপেন্সেরীর সাহায্যার্থ হাজার টাকা মূল্যের একখণ্ড ভূসম্পত্তি দান করেন। তৎপর তিনি জৈনসার হইতে ইছাপুরা পর্য্যন্ত এক রাস্তা নির্ম্মাণ জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করেন। তৎকালে দেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যা নিতান্ত কম থাকায় লোকের বিদ্যা শিক্ষার অনেক অসুবিধা হইত; উক্ত অসুবিধা নিবারণার্থে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে নিজ বাড়ীতে গভর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত একটী বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করেন; ক্রমে ইহা ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। তৎকালে বিক্রমপুরে পোষ্ট আফিসের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল; তিনি সেই অসুবিধা দূরীকরণ মানসে অনেক চেষ্টা ও যত্নে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে নিজ বাড়ীতে পোষ্টাফিস স্থাপন করিয়া গ্রামবাসীদের পত্র চলাচলের অনেক সুবিধা করিয়া দেন।

তিনি যখন ঢাকা স্মলকজ-কোর্টের জজরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ে নিজ ব্যয় ও যত্নে জৈনসার স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত রাজমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে, দেশে জ্ঞানবিস্তার মানসে 'পল্লীবিজ্ঞান' নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিয়া দেশের অনেক উপকার সাধন করেন।

অভয়বাবু অত্যন্ত অতিথিবৎসল ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে একটী অতিথিশালা ছিল; তাহাতে অনেক অর্থব্যয় করিতেন। একবার চাউলের দর বৃদ্ধি হওয়াতে দেশে অত্যন্ত অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি সেই সময় দরিদ্রদিগকে অকাতরে অন্নদান করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল। আত্মীয়স্বজন ও দেশের দীন-দরিদ্রদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া বাঙ্গলা ১২৭৭ সনের ২৬ ভাদ্র শনিবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনি দেহ ত্যাগ করেন।

৺কবি প্যারীমোহনের 'কুমারসম্ভব' হইতে

মদন-প্রয়াণ।

[অধ্যাপক শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী, এম্, এ,]

সাজিল মদন লয়ে শরাসন
কামিনীর ভুরু-রেখা।
কটাক্ষের শর নিল খরতর
কজ্জল-গরল মাখা॥

নিল মধুকরে দিল মধু করে
সহকার ফুলবাণ।
করি সহকার দর্পে অনিবার
চলিলেন ফুল-বাণ॥+২।৬৪।

+ মধুকর—ভ্রমর। মধু-করে—বসন্তের হস্তে। সহকার ফুলবাণ—আম্রমুকুল-রূপ মদনের পুষ্পশর। করি সহকার—সঙ্গে লইয়া। ফুল-বাণ—মদন।

শ্রীপ্যারীমোহন বলিছে বচন
চলেছ মদন বটে ॥
মনে হয় ভয় দেখ বা কি হয়
বুঝি বা বিপদ ঘটে ॥

* * * *

তৃতীয় সর্গ।

হেথা আসি হাসি হাসি মনোবাসী বীর।
ভক্তিভরে বজ্রধরে নত করে শির ॥
সুরপতি দেখি অতি হৃষ্ট-মতি হৈল।
সযতনে সে মদনে স্ব-সদনে লৈল ॥১
কার্য্য তরে অনুচরে করে করে ধরি।
নিল সঙ্গে সে অনঙ্গে রীতি ভঙ্গ করি ॥
দেবরাজ পাশে আজ রতিরাজ বৈসে।
কহে ফিরে সুরবীরে ধীরে ধীরে হেসে ॥২
কহে স্মর—কেন স্মর, "বজ্রধর" বল।
ভৃত্যজন প্রয়োজন কি কারণ হল ॥
আজ্ঞা কর পুরন্দর আজ্ঞা-কর প্রতি।
কৃপা তব শিরে লব ধন্য হব অতি ॥৩
কহ বাণী বজ্রপাণি নাহি জানি সার।
এইবার হৈল কার মরিবার বার ॥
মরি লাজে বিশ্ব মাঝে একি সাজে তার।
তাঁর বাস করে আশ আমি দাস যাঁর ॥
ভূমণ্ডল মাঝে বল কেবা বল ধরে।
যে তোমার অধিকার অধিকার করে ॥
কোন্ জন করে মন ভবাসন তরে।
জানে না যে রণসাজে সুবিরাজে স্মরে ॥৪
কোন্ হত মুনিব্রত মুক্তি-পথ চায়।
যোষিতের কটাক্ষের দেই ফের তায় ॥৫
বিদ্যা আর বুদ্ধি তার অবিদ্যার বোঝা।
মায়া ডোরে বাঁধি চোরে দিব জোরে সাজা ॥
অর্থ-ধর্ম্ম যদি মর্ম্ম কাটি বর্ম্ম সেই।
পঞ্চ বাণ লয় প্রাণ ইথে আন নেই ॥
জলধির সম ধীর, সে অধীর হলে।

কোন্ সতী রূপবতী কুলবতী রবে।
নিজে আসি হাসি হাসি তব দাসী হবে ॥৭
কোন্ নারী মানে ভারী সৈতে নারি দোষ।
অঙ্গে রতি হেতু অতি করে মতি রোষ ॥
এইবার করি তার মরিবার কল।
হাহাকার হবে সার ছারখার বল ॥৮
যদি বীর কোন বীর করে স্থির যুদ্ধ।
প্রমদার রণে হার হবে তার অদ্ধ ॥
রাখ, ধীর, ধনু তীর হও স্থির এবে।
ফুলশরে শক্র মেরে কার্য্য সেরে দিবে ॥৯
সুরবর, বাক্য ধর, আমি চর যাঁর।
কোন ছার সঙ্গে তাঁর করে সম্প্রহার ॥
ধরি শর মনোহর পুষ্পধর বটে।
তবু ভয় মহাশয় কারে নয় ঘটে ॥
এর মাঝে ঋতুরাজে যদি কাজে পাই।
মৃত্যুঞ্জয় করি জয়—পরাজয় নাই ॥১০

কামের বদনে শুনিয়া শ্রবণে
মৃত্যুঞ্জয় পরাজয়।
কহে আখণ্ডল জানি হে সকল
অসম্ভব কিছু নয় ॥
পুন ধীরে ধীরে সহর্ষ অন্তরে
কহিলেন এই বাণী।
উরু পর হতে রাখি পাদ-পীঠে
রাতুল চরণখানি ॥১১
কুলিশ প্রখর তুমি পুষ্প-শর
অসীম প্রভাব ধর।
তোমরা দুজন মম প্রহরণ
সদাই সহায় মোর ॥
তপোবলে বলী হয় যে সকলি
কুলিশ কুণ্ঠিত তায়।
কিন্তু তুমি স্মর বড় গুণধর
নিয়ত তোমার জয় ॥১২
মারিয়া মার না পরাণ লহনা

কুসুম কুলিশে মধুময় বিষে
জগৎ ব্যাকুলতম ॥
জানি তব ভাল যে বল কৌশল
তাই ত তোমাকে ধরি।
শক্তি দেখি শেষে শক্তিমান্ শেষে
শয্যা করিল হরি ॥১৩

ফুল ধনুঃ-শরে হেলায় শঙ্করে
জিনিবে বলেছ নিজে।
রাখিও মদন আপন বচন
সেই সে দেবের কাজে ॥১৪

চাহে দেব যত শিব-তেজে জাত
সেনানী বিজয়ী বীর।
শিব নির্ব্বিকার চিত্ত সদা তাঁর
সমাধি-মগন স্থির ॥১৫

সেই মহেশ্বরে ফুলশর মেরে
টলাতে যদি হে পার।
ভুবন-মোহিনী পর্ব্বত-নন্দিনী
কামিনী হইবে তাঁর ॥
বলেছেন ধাতা সে যে বিশ্বমাতা
বিশ্বের ভাবনা তাঁরি।
রুদ্র-তেজ ধরে বিশ্ব-রক্ষা তরে
সেই সে একেলা নারী ॥১৬

মহা যোগীশ্বর বটে সে শঙ্কর
ধৈর্য্যের শিখর-ভূমি।
হিমাদ্রির পরে মহাতপ করে
পেয়েছি সংবাদ আমি ॥
শুনেছি আবার আদেশে পিতার
কুমারী পর্ব্বত-সুতা।
নিত্য সেথা আসি সেবে সেবাদাসী
চরণে অঞ্জলি-যুতা ॥১৭

সুযোগ এমন হবে না কখন
জানিও জানিও সার।
যেইরূপে পার উমার উপর

সুর-কার্য্য কর যাও হে সত্বর
কর হরে আকর্ষণ।
অঙ্কুর উদয় বীজেতে নিশ্চয়
জলে তবু প্রয়োজন ॥১৮

তোমা হতে আজ হবে এই কাজ
তুমিই জগতে ধন্য।
না পারে অপর হেন কাজে নর
হয় ধরা পরে ধন্য ॥১৯

দেবগণ যাচে ত্রিভুবন বাঁচে
ধর হে কুসুম চাপ।
হিংসা কার্য্য নয় নিমেষেতে হয়
সাবাস্ মদন বাপ্ ॥

বসন্ত সুধীর সখা তব ধীর
নিকটে সদাই রয়।
অগ্নি-সহচর বায়ু নিরন্তর
হুকুমে কাহার হয় ?২১

প্রভুর বচন ধরিল মদন
যেন ফুলহার শিরে।
বাসব তাঁহারে স্নেহময় করে
পরশিল ধীরে ধীরে ॥২২

প্রভুর পরশে অসীম হরষে
চলিল মদন বীর।
শিবেরে জিনিতে তুলিল তুণেতে
অমোঘ কুসুম তীর ॥*

কুসুমের চাপ লয়ে বীরদাপ
করিয়া চলিল আগে।
ভাবে দেবগণ জিনিবে মদন
সংশয় নাহিক লাগে ॥*

প্রিয় সহচর বসন্ত সুন্দর
চলিল সখার পাছে।
রতি ভীতমতি কিবা করে পতি

ভাবে ভীতা রতি জানি পশুপতি
সে যে কালান্তের কাল।
পরে বাঘছাল গলে হাড়মাল
ভ্রুকুটী-ভীষণ ভাল॥*
ভূত প্রেত যত তার অনুগত
তাহার কথায় ফেরে।
কিলি কিলি ধায় শ্মশানে বেড়ায়
ঘাড় মট্‌কাব ধরে'॥*
দুইটা নয়ন রবি হুতাশন
তৃতীয় নয়ন ভালে।
করে জল্ জল্ উগারে অনল
মরে না তবু ত জলে॥*
গিলে হলাহল তবু নাহি ম'ল
এমন কঠিন প্রাণ।
কালে খেতে চায় হল বড় দায়
কমেনে বাঁচিবে প্রাণ॥*
গাঁজা টেনে ভোর সদাই অঘোর
চেনে না আপন পরে।
পড়িলাম দায় ভয়ে প্রাণ যায়
না জানি আজি কি করে॥*
মহাশূল করে শুনে ভয় করে
প্রলয় হুঙ্কার হাঁকে।
না করি বিচার পরাণ আমার
পড়িল বিষম পাকে॥*
এইরূপে রতি হয়ে ভীতমতি
চলিল প্রিয়ের সনে।
হর তপোবনে ক্রমে কতক্ষণে
উত্তরিল তিন জনে॥*

নরবলির প্রতীকার।

[অধ্যাপক শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী, এম্, এ,]

বৈশাখমাস আগত। চতুর্দ্দিকে ঘণ্টা কাঁসর ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে—নরবলি আরম্ভ হইয়াছে! চৈত্রমাস নরমেধ যজ্ঞে অকাল। তাই চৈত্র মাসের অবসানে সমাজের জিঘাংসাবৃত্তি দ্বিগুণ উৎসাহে জ্বলিয়া উঠিয়াছে!

পাঠককে বোধ হয় বুঝাইয়া দিতে হইবে না যে, এই নরমেধের নামান্তর বিবাহ। বাঙ্গালার হতভাগ্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থকুলে যে সকল হতভাগিনীরা জন্মগ্রহণ করে, তাহাদেরই শুভবিবাহে তাহাদের পিতা মাতা ও অভিভাবকবর্গের মহামাংসদ্বারা ঐ যজ্ঞ-কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়! কন্যার পিতা সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া, ভিটামাটি বিক্রয় করিয়া, কাবুলীর নিকট ঋণ করিয়া, চাষার মহাজনের নিকট গায়ের চামড়াখানা পর্য্যন্ত বন্ধক দিয়া—হাড়িকাঠে গলা বাড়াইয়া দেয়। তারপর বিবাহদিবসে উহার বরযাত্রিকেরা ঐ শুভ বলিদান দেখিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া কন্যাকর্ত্তার গৃহে বাদ্যোদ্যম সহকারে সানন্দে আগমন করেন এবং তাঁহাকে বধ করিয়া তাঁহার গর্দ্দান্, মুড়া, কলিজা, পাঁজর প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত কোর্ম্মা কাবাবাদি বিবিধ রকমারিতে উদর পরিতৃপ্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, ওঃ লোকটা যেন শিবী, বেটা স্বশরীরে স্বর্গে যাবে।" আবার কেহ বা "কোর্ম্মাটায় ঘি কম হ'য়েছিল, চপ্‌টার মাংসটা যেন শুক্‌না শুক্‌না" ইত্যাদি নানা কথায় অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া, নিজের ভোগস্পৃহা ও পরপীড়নেচ্ছা তাহাতেও চরিতার্থ হয় নাই, ইহা জানাইয়া যান। হতভাগ্য বঙ্গসমাজের এই অবস্থা! একে একে গৃহস্থকুল নির্ম্মূল হইতেছে, একটি একটি করিয়া বাঙ্গালীর সংসার ছারখার

হইতেছে, চতুর্দ্দিকে হাহাকার, তথাপি নরবলি অবাধে চলিতেছে! এই নরমাংসভোজন-প্রথা, এই ক্যানিবল্‌-লীলা কোন্ পাপে ভারতে প্রবেশ করিল? এখন যে সকলেই চতুর্দ্দিকে রক্তদন্ত বিকাশ করিয়া লোলরসনায় পরস্পরের অস্থি চর্ব্বণে ও শোণিতপানে পরস্পরের প্রতি ধাবমান! আজি সেই পবিত্র ঋষিবংশে কেবল দলে দলে রাক্ষস জন্মিতেছে! নিষ্কাম কর্ম্মভূমি ভারতে স্বার্থের বিকট শ্মশান-দৃপ্ত হাস্য করিতেছে! এই ঘোরতর বিপদের সময়ে কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে?

সদাশয় ভারত গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া সতীদাহ নিবারণ করিয়াছেন। দেশের অনেক কুপ্রথা, অনেক পাপাচারণ রাজদণ্ডের ভয়ে বন্ধ হইয়াছে। আমরা তজ্জন্য ইংরাজ রাজচক্রবর্ত্তীর নিকট চিরকৃতজ্ঞ—ইংরাজ-শাসনের একান্ত পক্ষপাতী। মধ্যযুগের প্রলয়-বিষবিসর্পে যখন ভারতের চৈতন্য আচ্ছন্ন, হৃদয় ও মস্তক অবসন্ন, ভারত যখন মরিতে বসিয়াছিল, তখন করুণাময় ভগবান্ কৃতী ইংরাজের হস্তে ভারতের চিকিৎসা-ভার অর্পণ করেন। ইংরাজও বিচক্ষণতার সহিত চিকিৎসা করিয়া দৃঢ় অস্ত্রোপচারে সমস্ত বিষ শরীর হইতে দূর করিয়া দিলেন। ভারত বাঁচিল। শত যুগের রাশীকৃত পাপ জাহ্নবীবারিতে ধৌত হইয়া গেল! কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সকল আশার বিলোপ করিয়া এক মহা অনর্থ, এক নূতন পাপ দেখা দিল! ইংরাজজাতির সহিত ইয়ুরোপের এক অতি দুষ্ট রোগ জাহাজে করিয়া ভারতে চলিয়া আসিয়াছিল। উহা মহামোহ। ঐ রোগের প্রকোপে লোকে ইহকালকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিতে লাগিল, ভোগস্পৃহা অত্যন্ত বলবতী হইল, স্বার্থপরতা ও ক্রূরতা প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিল। উহা সরলপ্রকৃতিক নিরীহ যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট ধার্ম্মিক ভারতবাসীকে কুটিল, সর্ব্বগ্রাসী ও ঘোরতর অধার্ম্মিক করিয়া তুলিল। উহারই প্রভাবে আজ নরবলির বিভীষিকা ঘরে ঘরে প্রত্যক্ষ করিতেছি। পরের প্রাণবধ করিয়া, পরের ঘাড় মট্‌কাইয়া, সেই উষ্ণশোণিতে নিজের ক্ষণিক তৃপ্তিসাধন, রাক্ষস ভিন্ন আর কে করিতে পারে? আমরা সকলে আজ রাক্ষস হইয়াছি। রাক্ষসেরাও পরস্পরকে ভক্ষণ করে না, আমরা তাহাও করিতেছি! ইহাপেক্ষা ঘৃণার কথা আর কি হইতে পারে? তুমি যে কন্যাকে গৃহে আনিয়া বংশরক্ষার আশা করিতেছ, সেই কন্যার পিতৃবংশকে নির্ম্মূল করিতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত নহ!! ইহা পৈশাচ বিবাহেরও অধম—এইদৃশ্য চক্ষে সহ্য হয় না!

তাই আমরা আজ কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করিতেছি, সদাশয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আর একবার ভারতকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হউন! তাঁহারা অতুল অধ্যবসায়ে ভারতকে ঠগীদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, আর এইবার নররূপী রাক্ষসদিগের কবল হইতে ভারতকে রক্ষা করুন। দেশের লোকেরা এখন ঠগীদিগের অপেক্ষাও ঠক্‌বাজ, নিষ্ঠুর ও পাপিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে শীঘ্র প্রতীকার করুন, নহিলে সমস্ত প্রজাকুল নির্ম্মূল হইবে, গবর্ণমেণ্টের প্রজাপালক নামে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে।

জাতীয় অস্তিত্বের যাহারা উচ্ছেদকারী, তাহারা নিজেরাই উচ্ছিন্ন হইবার উপযুক্ত। মূর্খ ভারতবাসিগণ পরস্পরের প্রতি রাক্ষসোচিত ব্যবহারের দ্বারা সমগ্র জাতির যে মহা সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, তাহা ভাবিতেও ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। অধিকদিন এইরূপ চলিলে, ভারতভূমি এক মহাশ্মশানে পরিণত হইবে। সোণার ভারতে সোণার বাঙ্গালায় কিসের অভাব ছিল? পূর্ব্বে এখানকার লোক অল্পে তুষ্ট এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিল; নিজে একমুঠা মাত্র পাইলেও, তাহা হইতে পরকে কিছু কিছু না দিয়া খাইত না। ইহাদিগের বিলাসিতা ছিল না, বলিলেই চলে; একজন উপায় করিলে বিশ জনের চলিয়া যাইত। কিন্তু আজ

জঘন্য বরপণ-প্রথা সমগ্র ভারতটাকে ছারখার করিতে উদ্যত হইয়াছে! এখন, কন্যা হইবে এই আশঙ্কায় যুবকেরা বিবাহ করিতেই চাহে না। আর যদিই বিবাহ করে, তাহা হইলে ঐ কন্যার জন্মের সহিত মৃত্যুর কালছায়া তাহার মুখের উপর দেখা দেয়! তাহার বলির ঘণ্টা বাজিয়া উঠে! হৃদয়ানন্দ-দায়িনী নন্দিনী এখন কালবশে পিতামাতার কালরূপিণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে! তখন সেই পিতা কি করিবে ভাবিয়া পায় না, ভাবিয়া ভাবিয়া শুখাইয়া মরে। যাহার উপার্জ্জন কিছু অধিক, সে সেই দিন হইতেই ঠগীদিগের ভয়ে বাপ মাকেও বঞ্চিত করিয়া, আত্মরক্ষার জন্য অর্থসঞ্চয়ে ব্যস্ত হয়। না খাইয়া, না পরিয়া কন্যার করুণাময় শ্বশুর ঠাকুরের জন্য "সুধা সংগ্রহ" করিতে তৎপর হয়! অপর কাহাকেও একমুষ্টি অন্ন, একখানি বস্ত্র, এতটুকু সাহায্য করিতে সে তখন ভয় পায়। দেশ হইতে দয়া, মায়া, সহানুভূতি, পরোপকার, মানুষের চরিত্রে যা কিছু উৎকৃষ্ট, সমাজের পক্ষে যা কিছু মঙ্গলকর, সমস্তই ঐ এক পাপে নষ্ট হইতে বসিয়াছে। এই নূতন শ্রেণীর ঠগীদিগের অত্যাচারে ভারত-বাসী চরিত্রহীন 'পশুবৎ' স্বার্থপর ও জঘন্য হইয়া উঠিতেছে! উহারা যেন মূর্ত্তিমান্ লোভ, মূর্ত্তিমান্ পাপ, সয়তানের অবতার! সমগ্র ভারতবর্ষে কি এমন কেহ নাই, যে ইহাদের বিনাশ করিতে পারে? উহাদের বিনাশে পাপ নাই। স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন—

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ॥"

গীতা, ১৬।২১॥

তিনি আরও বলিয়াছেন—"পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনম্ জ্ঞানবিজ্ঞান-নাশনম্" ৩।৪১। লোভের উৎকট তাড়নায় সমাজ নরকের দ্বারে উপনীত হইয়াছে। কে উহার উচ্ছেদ করিয়া সমগ্র দেশের ত্রাণ করিবে? গবর্ণমেণ্ট যদি এই কুপ্রথা রোধ করিতে অগ্রসর না হন, উহা সামাজিক ব্যাপার বলিয়া যদি উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে না চাহেন, তাহা হইলে উহা কি প্লেগ ও ম্যালেরিয়ার মতন অব্যাহত ভাবে এদেশের সর্ব্বনাশ করিতেই থাকিবে? যদি তাই হয়, তোমরা দেশের ধুরন্ধর যুবকেরা মিলিয়া কি লোভিষ্ঠ পাপাত্মাদিগের শাসন করিতে পার না? তোমরা কি কেবল কুকর্ম্মই করিতে পার? রাজকার্য্যে নিযুক্ত নিরীহ পুলিশ কনেষ্টবল, ইন্‌স্‌পেক্‌টার মারিয়া বীরত্ব দেখাইতে ও কর্ত্তব্য সমাপন করিতে চাও? তোমাদের বাপ্ দাদারাই ত দেশটাকে উৎসন্ন দিতেছে; দেখিতেছ না? কেন, ধরনা তাহাদের টুঁটি টিপিয়া। অর্জ্জুন কি অধর্ম-পর ভ্রাতা, পিতৃব্য, পিতামহ, গুরু সকলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে ভগবান্ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হন নাই? ইহাতে কোন পাপ নাই। যে ভারতের সুসন্তান হইতে চাও, ভারতবাসীকে রক্ষা করিতে চাও, আর্য্য নাম রক্ষা করিতে চাও, ভারতের গৌরব উদ্ধার করিতে চাও, এস অগ্রসর হও, বরপণ প্রথা উঠাইয়া দাও—বিরুদ্ধবাদী পিতৃ পিতামহাদির বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা কর। ভারত তোমাদের নিকট চির-ঋণী চির-কৃতজ্ঞ থাকিবে, শত "ডবল কোম্পানি"র পূর্ব্বে তোমাদিগের নাম উচ্চারিত হইবে,—ভারতে শান্তির সুধাবৃষ্টি হইবে। একতা, একান্নবর্ত্তিতা ও ধর্ম্ম গৃহে গৃহে বিরাজ করিবে। গৃহস্থের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিবে। তোমরাই এ সকল ঘটাইতে পার। গ্রামে গ্রামে সুখের ও শান্তির স্বর্গরাজ্য তোমরাই প্রতিষ্ঠা করিতে পার। বৃথা বিলাস-ব্যসনে ধনের অপব্যয় তোমরাই বন্ধ করিতে পার। দেশের পূর্ব্ব গৌরব ও পূর্ব্ব কীর্ত্তির পুনঃ সূচনা তোমরাই করিতে পার।

চিকিৎসা সমস্যা।*

[শ্রীজীবনকালী রায় বৈদ্যরত্ন।]

জগতের আদি সভ্য জাতির জ্ঞান-গবেষণা-চিন্তাপ্রসূত সর্ব্ব প্রথম যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রকাশ, যাহার অতুলনীয় যুক্তি স্মরণাতীত কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতবাসীর স্বাস্থ্যানুকূল ও ব্যাধিনিগ্রহে উপযোগী এবং আদরনীয় হইয়া রহিয়াছে, যে চিকিৎসা ভারতের এই অবনতির যুগেও বর্ত্তমান কালের উন্নতিশীল জাতির চিকিৎসার নিকট হীনশক্তি হয় নাই, ভারতবাসীর নিজস্ব ও অতুলনীয় সেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় বর্ত্তমান সময়ে যে সমুদয় বিপ্লব উপস্থিত হইয়া আমাদের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা হইয়াছে, তাহার সমাধান জন্য 'চিকিৎসাসমস্যা' প্রবন্ধের অবতারণা।

বংশপরম্পরালব্ধ জ্ঞান, কৌশল, চিন্তা ও বহুদর্শিতা হইতে নির্দ্দোষভাবে কার্য্যের প্রচার সম্ভাবনা জন্য প্রাচীন আর্য্যগণের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচার; যাহার ফলে ভারতে জাতিগত কার্য্য প্রচলিত হইয়াছিল। সহায় সম্পদহীন দুর্ভাগ্যপীড়িত ভারতবাসী কালবশে সেই উচ্চ আদর্শ ত্যাগ করিয়া, বংশগত শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য হারাইয়া আজ দরিদ্র ও গৌরবহীন হইয়া পড়িয়াছে। যে প্রচার-প্রচলন ফলে অম্বষ্ঠগণ স্মরণাতীত কাল হইতে একমাত্র চিকিৎসাকার্য্যে আপনাদের শিক্ষা, চিন্তা, জ্ঞান, চেষ্টা, সমুদয় অর্পণ করিয়া একসময় ইহার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, সেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আচরণ হইতেই আমাদের এই চরম দুর্দ্দশার দিনেও বংশগত অভিজ্ঞতালাভ জন্য একমাত্র এই জাতিই ভারতীয় চিকিৎসা-বিদ্যার কথঞ্চিৎ গৌরব রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। তাই আজিও রাজকীয় সাহায্যপ্রাপ্ত উন্নতিশীল জাতির চিকিৎসকগণের সহিত সমানভাবে অর্থ ও সম্মান লাভ একমাত্র অম্বষ্ঠ জাতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ সম্মান লাভ বোধ হয় অধিক কাল থাকিবে না। ভারতের সকল জাতি যেমন স্ব স্ব বৃত্তি হারাইয়া আজি লাঞ্ছিত ও পদদলিত, ভারতের চিকিৎসক জাতির ও আজি সেই সম্ভাবনা হইয়াছে। বৈদ্য সম্প্রদায়ের অবনতির জন্য বৈদ্যজাতির যে ক্ষতি হইবে, তাহাতে অন্য জাতির ক্ষোভের কারণ না থাকিতে পারে, কিন্তু অর্থনীতি অনুমোদিত ভারতের একমাত্র স্বদেশীয় ব্যবসাটি যদি রক্ষা না হয়, তবে সকলেরই ক্ষতির কারণ হইবে। আজ ইউরোপের ভীষণ লোক-ক্ষয়কর যুদ্ধের জন্য বিদেশীয় ঔষধগুলি নূতন করিয়া প্রস্তুত হইতেছে না। যাহা পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিল, তাহাও প্রয়োজন মত পাওয়া যাইতেছে না। যাহা পাওয়া যাইতেছে, তাহা পুরাতন হেতু হীন শক্তি এবং অল্পতাহেতু বহু মূল্য বিশিষ্ট। এই দুঃসময়ে যদি দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচলন না থাকিত, তাহা হইলে নিত্য রোগপীড়িত ভারতবাসীর কি বিপদ উপস্থিত হইত তাহা চিন্তা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আরও একটি বিবেচ্য বিষয় এই যে, বিদেশীয় চিকিৎসার প্রভূত প্রচলন সত্ত্বেও দেশীয় চিকিৎসায় আমাদের স্বাস্থ্য ও অর্থ এত দিন কিছু কম রক্ষা হইতেছিল না। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার হীনতায় মাত্র বৈদ্যের ক্ষতি

---

* এই প্রবন্ধটি হিতবাদীতে প্রকাশ জন্য দেওয়া হইয়াছিল এবং ইহার কিয়দংশ ২৫শে ফাল্গুন ও ৩রা চৈত্রের হিত- [illegible] প্রকাশিত হয়, তাহাতে প্রবন্ধ প্রকাশের উদ্দেশ্য হানি হয় বলিয়া তখন তাহার অবশিষ্ট অংশ প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার সম্পূর্ণ প্রচার আবশ্যক বোধে

হইবে না, ভারতের সকল জাতিরই প্রভূত ক্ষতির কারণ হইবে।

যে কারণে হউক, বহুদিন পূর্ব্ব হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার পূর্ব্বগৌরব হ্রাস হইয়াছে। অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদের আজ 'শল্যতন্ত্র' ক্রিয়াহীন; 'রসায়ন,' বাজীকরণ বিধিহীন: 'কৌমারতন্ত্র' "ভূতবিদ্যা," 'অগদতন্ত্র' লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। কেবল 'কায়-চিকিৎসা' ও 'শালক্যতন্ত্র' লইয়া আজ আয়ুর্ব্বেদের যাহা কিছু প্রচার। কিন্তু এখনও আমরা ইহার যে অংশটুকু লইয়া চিকিৎসা কার্য্য পরিচালনা করিতেছি, দেশবাসীর উপযোগিতায় ও উপকারিতায় তাহা সকল জাতির চিকিৎসার আদর্শ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কায়চিকিৎসা ও শালক্যতন্ত্রের অধিকৃত বিষয়—জ্বর, অতিসার, পাণ্ডু, কামলা, রক্তপিত্ত, কাস, হৃদ্রোগ, মূত্রাশয় পীড়া, শিরোরোগ, কর্ণরোগ, প্রভৃতি যাবতীয় পীড়ায় আয়ুর্ব্বেদের ঔষধ-পথ্যের আশু উপকারিতা ও নির্দ্দোষ আরোগ্য দানের ক্ষমতা অন্য কোন চিকিৎসায় দেখিতে পাওয়া যায় না। রসায়ন বাজীকরণ তন্ত্রের ক্রিয়া বিধিহীন হইলেও আয়ুর্ব্বেদীয় রসায়ন ঔষধগুলি স্বাস্থ্য বৃদ্ধি ও দীর্ঘ স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগিতায় এখনও সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত রহিয়াছে। যে সম্প্রদায়ের উপর অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি ও রক্ষাভার অর্পিত হইয়াছিল, আয়ুর্ব্বেদের অবনতির জন্য মূলতঃ তাঁহারা দায়ী হইলেও আর আর যাঁহাদের দোষে আয়ুর্ব্বেদ আজ শ্রীহীন, তাঁহাদের দোষের কথা কেহই উল্লেখ করেন না। পরন্তু তাঁহারা দোষী হইয়াও সকল দোষ চিকিৎসক সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত করেন। চিকিৎসকগণের দোষের কথা বর্ত্তমান কালে নিত্য আলোচনার বিষয় হইয়াছে; সুতরাং সে সকল পুরাতন কথার পুনরালোচনায় অধিক সময় নষ্ট না করিয়া, দেশীয় চিকিৎসার বর্ত্তমান ক্ষতিকর অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করিব।

ঔষধ ও চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রচার সকল দেশেই আবশ্যক হইয়াছিল। ব্যাধি প্রতিকারে ঔষধের প্রয়োগ-কৌশল সকলের পক্ষে জানিয়া রাখা সম্ভবপর হয় না। সর্ব্বদা ঔষধ প্রয়োগের অবকাশ না পাইলে ঔষধের সম্যক্ গুণাগুণ অবগত হইতে পারা যায় না: এজন্য সকলকেই একশ্রেণীর লোকের উপর ব্যাধি প্রতিকারের ভার অর্পিত রহিয়াছে। বর্ণাশ্রম প্রথার প্রচলন ফলে ভারতীয় চিকিৎসা-কার্য্যের ভার অম্বষ্ঠ জাতির উপর অর্পণ করা হইয়াছিল, এবং এই কার্য্যের পরিশ্রম-বিনিময়ে লব্ধ অর্থই তাহাদের জীবিকা রূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। চিকিৎসক জীবিকার জন্য যে অর্থগ্রহণ করিতেন, তাহা ঔষধের মূল্য বলিয়া নহে; কারণ, ঔষধের প্রকৃত মূল্য কিছু থাকিতে পারে না।

যাহাদিগকে লইয়া মানুষ সংসারী, সেই নররূপী সাক্ষাৎ দেবতা পিতা-মাতা, প্রাণাধিক ভ্রাতা, প্রিয়তমা পত্নী, স্নেহের ধন পুত্রকন্যা যাহারই হউক না কেন, অসহ্য ব্যাধিযন্ত্রণা যে ভেষজে দূরীভূত হইয়া সংসারে সুখশান্তির প্রতিষ্ঠা করে, কিঞ্চিৎ রজত বা তাম্রখণ্ডের দ্বারা কি তাহার প্রকৃত মূল্য নির্ণীত হইতে পারে? আমাদের বাসস্থানের চতুষ্পার্শ্বে যে সকল স্বভাবজাত সহজলভ্য অনন্ত গুণের আকর ভেষজ দ্রব্য জনসাধারণের অবহেলার যোগ্য হইয়া পড়িয়া আছে, তাহারই অপরিসীম শক্তি প্রভাবে চিকিৎসকগণ অধিকাংশ সময় মানবের অশেষ যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিসমূহের প্রভাব হানি করিতে সমর্থ হন। মূল্যবান অন্নবস্ত্র অলঙ্কারাদির ন্যায় এই সকল তুচ্ছ দ্রব্যের কি মূল্য লইতে পারা যায়, যাহা হইতে চিকিৎসকগণের অন্ন বস্ত্রের অভাব মোচন হইতে পারে? এজন্যই এ অর্থ গ্রহণ ঔষধের মূল্য বলিয়া নহে, বরং চিকিৎসকের জ্ঞান ও কার্য্যকুশলতার মূল্য স্বরূপ বলিতে পারা যায়। এ অর্থ প্রদান করিবে ধনীদরিদ্র সকলেই; —তবে ধনী,দরিদ্র,মধ্যবিত্ত সকলেই স্বীয় অবস্থানু-

কিছু দিন পূর্ব্বেও যখন ভারতের হিতকর এই প্রকার ব্যবস্থার প্রচলন ছিল, তখন এদেশে ঔষধের মূল্য কিছু ছিল না বা রোগী পরিদর্শন জন্য দুই চারি বা ষোড়শ মুদ্রার আদান প্রদান আবশ্যক হইত না। লোকের অবস্থা ও জীবনের মূল্যের উপর চিকিৎসকের পরিশ্রমের মূল্য নির্ণীত হইত, এবং অল্প অর্থেই সদাচারী ব্রাহ্মণের অনুকরণে অত্যন্ত অনাড়ম্বর চিকিৎসকজীবনের অর্থাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইত। তখন দরিদ্রের পক্ষে অসাধ্য মূল্যবান উপাদানে প্রস্তুত ঔষধগুলি ধনীর অর্থে প্রস্তুত হইয়া ধনী-দরিদ্র সকলেরই ব্যাধির জ্বালা দূর করিত।

কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। তখন দরিদ্র স্বীয় অবস্থানুরূপ অবশ্যকর্ত্তব্যে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইত না; ধনী ধর্ম্মের জন্য, পরোপকারের জন্য অর্থব্যয় সদ্ব্যয় মনে করিতেন। আর এখন ধনী দরিদ্র সকলেই বিলাসের জন্য, ক্ষণিক সুখপ্রদ লালসা চরিতার্থ জন্য অর্থব্যয় করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া জীবন ধারণের উপায় স্বরূপ বিশুদ্ধ খাদ্যের জন্য অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন; তখন আর ঔষধের জন্য কি অর্থ ব্যয় করিতে পারেন? তাই আজ সস্তা দুগ্ধ ঘৃতাদির ন্যায় সস্তা ঔষধের প্রয়োজন হইতেছে। তাই আজ বিদেশীয় অনুকরণে মাত্রা হিসাবে, সের হিসাবে ঔষধের মূল্য প্রচলন হইয়াছে, ধনী দরিদ্র সকলেই একদরে পড়িতেছে। বর্ত্তমান মূল্য প্রথা ভাল কি মন্দ, তাহা চিন্তাশীল মনীষীগণ স্থির করিবেন; কিন্তু পূর্ব্বতন প্রথা সম্বন্ধে কোন কোন সাম্যবাদী বলেন,—দরিদ্রের ঔষধের জন্য ধনী অপরিমিত অর্থ ব্যয় করিবেন কেন? এ কথার উত্তর,—সমগ্র দেশের অপরিমেয় দরিদ্রের পরিশ্রম ও চেষ্টায় উপার্জ্জিত অর্থেই সংখ্যা বিশিষ্ট ব্যক্তির ধন; যাহাদের অর্থ অল্প বা বিনা আয়াসে লইয়া ধনী ধন সঞ্চয় করিতেছেন, তাহাদের স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষার জন্য কিঞ্চিৎ সঞ্চিত অর্থব্যয় করা কি তাঁহাদের উচিত নহে?

যে ব্রাহ্মণ মানবের কল্যান জন্য নিজে দরিদ্রতা বরণ করিয়া লইয়াছেন, যিনি নিজের পরিমিত অন্নের অংশ দিয়া শিষ্য প্রতিপালন, জ্ঞান ও শিক্ষাদানে জগতে পরার্থপরতার আদর্শ হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে বা তাঁহার পরিবার বর্গকে স্বাস্থ্যদান করা কি ধনীর কর্ত্তব্য নহে? যে কৃষক গ্রীষ্মের দারুণ রৌদ্রে, বর্ষার বারিধারা পাতে, শীতের শীতলবায়ুতে কম্পমান দেহে মানবের অন্ন সংগ্রহ করিতে নিজে ভগ্ন স্বাস্থ্য হইতেছে, তাহার রোগে ঔষধ দান কি অর্থবানের কর্ত্তব্য নহে? যিনি যত সুলভ মূল্যেই ঔষধ বিক্রয় করুন না কেন, দেশে এমন অসহায় দরিদ্রের অভাব নাই যাহারা একটি তাম্রমুদ্রার বিনিময়েও ঔষধ বা পথ্য সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে। ইহারা সকলেরই দয়ারপাত্র —বিশেষতঃ ধনীর। আমরা নিজেদের স্বার্থের জন্য যাহাই বলিনা কেন, যাঁহারা ধন-ধান্যের অধীশ্বর, সেই রাজন্যবর্গের নিকট চিরদিনই অর্থহীনগণ দয়ারপাত্র বলিয়া বিবেচিত রহিয়াছে; তাই দরিদ্রের জন্য রাজকীয় ব্যয়ে সকল দেশেই দাতব্য ঔষধালয়ের ব্যবস্থা রহিয়াছে। অবশ্য আমাদের দেশেও দাতব্য ঔষধালয় আছে; কিন্তু অধিক সংখ্যক দরিদ্রের বাসস্থান পল্লীতে এখনও ইহার অভাব রহিয়াছে। আরও এক কথা,—এদেশের দাতব্য ঔষধালয়ে দেশীয় ঔষধ প্রদানের কোন ব্যবস্থা নাই, সাধারণে দেশীয় ভেষজের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া বিনা-মূল্যে বিদেশীয় ঔষধ পাইবার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও দেশীয় ঔষধের জন্য আমাদের ন্যায় দরিদ্র চিকিৎসকের দ্বারস্থ হইয়া থাকে। দাতব্য ঔষধালয় সমূহে এই অভাব লক্ষ্য রাখিয়া দেশীয় ঔষধ বিতরণের ব্যবস্থা করিলে আমাদের ঘরে ঘরে দাতব্য ঔষধালয় খুলিবার কোনই আবশ্যক ছিল না। ইচ্ছা করিয়া নিজেদের অর্থ ও পরিশ্রমসাধ্য ঔষধগুলি কে দান করিতে পারে? নিরুপায়

দরিদ্রের কাতর প্রার্থনাই আমাদিগকে এ কার্য্যে বাধ্য রাখিয়াছে।

রাজকীয় ব্যবস্থায় যে সমুদয় ঔষধ দান করা হয়, তাহা তাঁহাদের বিশ্বাসমত তাঁহাদের দেশীয়। ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞান ও ঔষধ সমূহ পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা অথবা সুযোগ তাঁহাদের হয় নাই; হইলেও তাঁহারা সকল জাতীয় চিকিৎসার জন্য অর্থব্যয় করা অপেক্ষা একটির উন্নতির জন্য চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। বোধ হয় এই কারণেই বৃটিশশাসনকর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের দেশীয় এ্যালোপ্যাথী, আমেরিকাবাসিগণ হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার বিস্তার ও উন্নতি জন্য অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। তথাপি ভারতবাসীর অর্থে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় দাতব্য ঔষধালয় সমূহে দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষিত দেশীয় ঔষধ অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণ বিতরণের ব্যবস্থা করা রাজপুরুষগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সকল দেশীয় সম্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দেশের অভাব অভিযোগে সর্ব্বদা রাজপুরুষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তাঁহাদের এবিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। রাজকীয় মন্ত্রণাসভার মাননীয় দেশীয় সদস্যগণ, দেশের সম্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এ বিষয়ের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া সদাশয় শাসন কর্ত্তৃপক্ষগণকে আমাদের এই প্রকৃত অভাবটি বুঝাইয়া দিতে পারিলে দেশের প্রকৃত হিত সাধন হইবে,—আর সেই সঙ্গে সাধারণ্যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রচার হইয়া ইহার কার্য্যকারিতা ও উপকারিতা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়া আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি ও বিস্তারের পথ মুক্ত করিবে। দেশীয় চিকিৎসার উন্নতি বিধানে রাজপুরুষগণের কোন সাহায্য নাই, দেশের শিক্ষিত বা ধনী সম্প্রদায়ের কোন চেষ্টা-উদ্যোগ নাই। দরিদ্র চিকিৎসক সম্প্রদায় যে সকল প্রতিকূল ব্যাপারের সহিত সংগ্রাম করিয়া নিজেদের জীবিকা সংগ্রহের পর, য়াছেন, তাহাই একক্ষণে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কমলার বরপুত্রগণ বিদেশীয় ঔষধালয় স্থাপন জন্য, বিদেশীয় চিকিৎসার উন্নতি ও প্রচার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। ইংরাজী দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন বা তদর্থে অর্থ দান করিলে সহজে রাজপুরুষগণের কৃপা লাভ হয় সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে দেশীয় চিকিৎসার উন্নতি কল্পে কিয়ৎপরিমাণে চেষ্টা ও অর্থ দান করিলে গুণগ্রাহী বৃটিশ জাতির নিকট হতাদর হইতে হইবে, এরূপ মনে করা অন্যায় নহে কি? যে চিকিৎসায় ভারতের আদিম যুগ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত স্বাস্থ্যরক্ষা ও ব্যাধি নিরাকরণ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া আসিতেছে, যাহার সাহায্যে নির্ধন ভারতের বহু অর্থ রক্ষা হইয়া ধনী দরিদ্রের ঘরেই পুনরায় ফিরিয়া যাইতেছে, তাহার উন্নতি ও রক্ষা জন্য সাধ্যমত চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় করা কি সকলের কর্ত্তব্য নহে?

ধনী সম্প্রদায়ের যদি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার আবশ্যক না হইত, তবুও বা তাঁহারা নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহাদের যে আবশ্যক হয় না একথা বলিতে পারা যায় না; ধনবান ব্যতীত দৈনিক ষোড়শ মুদ্রা ব্যয়ে দেশীয় চিকিৎসকগণকে কে আহ্বান করিতেছে?

যখন দেশীয় চিকিৎসার সহিত তাঁহাদের ধন, প্রাণ, সুখ, শান্তির সম্বন্ধ আছে, তখন ইহার উন্নতি চেষ্টায় নিশ্চেষ্ট থাকিয়া অর্থহীন চিকিৎসকগণকেই ইহার অবনতির জন্য দায়ী করিলে চলিবে কেন?

ভারতবাসী সকল বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী। যে যে বিষয়ে নিজস্ব কিছু আছে, তাহাও তাঁহাদের চেষ্টার অভাবে দিন দিন হীনতা পাইতেছে। নতুবা দেশীয় আচারানুষ্ঠানের একান্ত পক্ষপাতী পুণ্যকর্ম্মা ধীমান্ দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান সার্থকনামা ভূদেব যে আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য ঔষধালয়ের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, সেই পুণ্য ও শ্রেয়স্কর কার্য্যে দেশের

দেশীয় চিকিৎসকগণ জীবন সংগ্রামে পরিম্লান হইয়াও একাল পর্য্যন্ত ঔষধ বিতরণের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া যথাসাধ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও দরিদ্র ব্যক্তিগণের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ করিয়া আসিতেছেন। এ কার্য্যের জন্য সেকালের মত অর্থবানের নিকট অপ্রত্যাশিত অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় না, অথচ নিজেদেরও দিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং নির্দ্দিষ্ট ঔষধের মূল্যের ভিতর দিয়া এই সাহায্য সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। অন্যের প্রকাশ্য সাহায্য ব্যতীত এইপ্রকার বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণ ফলে হিতে বিপরীত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই ব্যাপারে অনেকের ধারণা হইতেছে, কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুতে কোন ব্যয় নাই, সেজন্যই ঔষধ বিতরণে কোনও ক্ষতি হয় না, অথচ এই সকল ঔষধই কবিরাজগণ উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করেন; আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ব্যবহার করা অর্থ ব্যয় সাপেক্ষ ইত্যাদি।

সাধারণের এই প্রকার মতিগতি বুঝিয়া উপায় হীন জন কয়েক ব্যবসাদার সুলভে বিস্তৃত ঔষধ প্রচার করিয়া এবং ইহাদের অনেক ঔষধ প্রস্তুতের একটা ভুল হিসাব দেখাইয়া এই ধারণা বদ্ধমূল করিতেছে। ইহাদের দ্বারা আয়ুর্ব্বেদের কিরূপ ক্ষতি হইতেছে, তাহাও আলোচনা করিবার সময় হইয়াছে। কিন্তু সে কথা বলিবার পূর্ব্বে যাঁহারা মনে করেন, কবিরাজগণ ঔষধের উচ্চ মূল্য গ্রহণ করেন, তাঁহাদের একটি কথা চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। চিকিৎসা করিয়া দেশের কয়জন চিকিৎসক অতুল বিষয় বিভবের অধিকারী হইয়াছেন? চিকিৎসা ব্যবসায়ে যদি চিকিৎসকের জীবিকা সংস্থান না হয়, তবে চিকিৎসা করিবে কে? বর্ত্তমান কালের প্রচলিত রোগী পরিদর্শনের অর্থ না পাইলে মাত্র ঔষধের লাভে চিকিৎসকদের জীবিকা সংগ্রহের কোন উপায় থাকিত না। কর্ত্তব্য বোধে দেশীয় চিকিৎসকগণ আপনাদের এই বহু আয়াসলব্ধ অর্থের সাধ্যমত কিয়দংশ দরিদ্রের চিকিৎসা ও বিনামূল্যে শিক্ষাদানের জন্য ব্যয় করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহাদের বংশগত সংস্কার,—ইহা ভারতবাসীর স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম; গৃহে অন্ন না থাকিলেও যে অতিথি বিমুখ করিতে পারে না। কিন্তু জন কয়েক উপায় হীন স্বার্থপর ঔষধ বিক্রয়কারী চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া, চিকিৎসকের দায়িত্ব বোধগম্য না করিয়া জনসাধারণকে সস্তা ঔষধের প্রলোভনে মুগ্ধ করিতেছে, আর সাধারণে সুলভের মোহে মূল্যবান উপাদান হীন-অশাস্ত্রীয় ঔষধ ব্যবহার করিয়া স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তে ভবিষ্যৎ ব্যাধির কারণ সঞ্চয় করিতেছেন, এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় দিন দিন শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িতেছেন। অবশ্য কোন পীড়িত ব্যক্তি ইহাদের ব্যবস্থা বা ঔষধে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। তাহা পারিলে আর চিকিৎসকের নিকট অর্থ ব্যয় করিয়া ব্যবস্থা এবং মূল্যবান ঔষধ লইতে আসিতেন না। তবে যাহারা শরীর পুষ্টি বা স্বাস্থ্য বৃদ্ধির জন্য আয়ুর্ব্বেদের রসায়ন-বাজীকরণোক্ত—'চব্যনপ্রাশ,' 'মকরধ্বজ' প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক, অথবা কোন লজ্জাকর গোপনীয় ব্যাধির প্রতিকারপ্রার্থী, তাহাদেরই মধ্যে কেহ কেহ ইহাদের বাকচাতুর্য্যে ও সস্তার প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া থাকেন। কিন্তু ইহাদিগকে বিফল প্রযত্ন হইয়া পুনরায় চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে, অথবা আয়ুর্ব্বেদের ঔষধে বীতশ্রদ্ধ হইতে দেখা যায়। ব্যবস্থাহীন অশাস্ত্রীয় ঔষধের পরিণাম এই প্রকারই হওয়া স্বাভাবিক। শাস্ত্রেও উল্লেখ হইয়াছে,—

যোগাদপি বিষং তীক্ষ্ণং উত্তমং ভেষজং ভবেৎ।
ভেষজং বাপি দুর্য্যুক্তং তীক্ষ্ণং সম্পদ্যতে বিষং॥

অর্থাৎ সম্যক্ প্রযুক্ত হইলে তীক্ষ্ণ বিষ ও উত্তম ভেষজ হয়; আর ভেষজও যদি অযথা প্রযুক্ত হয়, তবে তীক্ষ্ণ বিষের ক্রিয়া সম্পাদন করে।

বিজ্ঞাপনের ঔষধের গুণ পড়িয়া ঔষধ স্থির করিতে পারা যায় না। মকরধ্বজ, চ্যবনপ্রাশ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ঔষধও সকলের পক্ষে যে সকল

ব্যাধিতে সমগ্র ফলদায়ক হয় না। বৃহৎ কস্তুরী-ভৈরব জ্বরের শ্রেষ্ঠ ঔষধ হইলেও সকল জ্বরে ইহার প্রয়োগ সুফলপ্রদ হয় না। শাস্ত্রজ্ঞান না থাকিলে ভেষজতত্ত্ব সম্যক অবগত হইতে না পারিলে রোগীর যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে পারা যায় না। অবশ্য অসাধ্য ব্যাধির—জগতের কোন চিকিৎসাতেই প্রতিকার নাই সত্য, কিন্তু সত্যপরায়ণ ঋষিগণ বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া যে সকল ব্যাধিও লক্ষণ সাধ্য সুখসাধ্য বলিয়া গিয়াছেন, নির্ভুল ব্যবস্থা ও বিশুদ্ধ ভেষজে চিরদিনই তাহা সত্য রহিয়াছে। কিন্তু এই ঋষিবাক্য ও আজ অসাধুচিত্ত ঔষধ বিক্রয়কারিগণের ব্যবস্থাহীন বিকৃত ভেষজে মিথ্যায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। ইহা অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদেরও দেশের আর অধিক দুর্দ্দশা কি হইতে পারে?

মানবের এই প্রকার স্বাস্থ্য ও অর্থ অপহরণ-কারিগণের অন্যায় কার্য্যের প্রতিবিধান করিবার কোন রাজবিধান নাই, দেশের লোকের ও কোন চেষ্টা নাই। চিকিৎসক সম্প্রদায় জানেন, কোন পীড়িত ব্যক্তি কখন ইহাদের নিকট যাইবে না, এই বিশ্বাসেই তাঁহারাও কোন প্রতিকারের চেষ্টা করেন না। কিন্তু ইহার বিষময় ফল এখন ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে, চিকিৎসার জন্য ইহাদের সাহায্য না লইলেও অনেকেই ইহাদের হিসাব ও ঔষধের মূল্য লইয়া চিকিৎসকগণের অর্থ ও পরিশ্রম সাধ্য ভেষজের মূল্যের সহিত তুলনা করিয়া অনুযোগ করিতেছেন। কিন্তু ইহাদের হিসাব যে ভুল তাহা কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ পান না।

ক্রমশঃ।

চড়ক পূজা।

[অধ্যাপক শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী, এম্, এ,]

সন ১৩২৩ সালের আজ শেষ দিন। দেখিতে দেখিতে একটি বৎসর অনন্তকাল সমুদ্রে কোথায় মিশাইয়া যাইবে! অনন্ত আকাশে শ্মশানের শেষ চিতাধূমের ন্যায় অতীতের কালগর্ভে উহা কোথায় বিলীন হইবে, মনুষ্য আর উহাকে খুঁজিয়া পাইবে না!

একটা অস্পষ্ট স্মৃতি কাহারও কাহারও মনে জাগিবে বটে, কিন্তু তাহাই বা কতদিনের জন্য? বর্ষের পর বর্ষ মরিতেছে, জন্মিতেছে। আমরা কতগুলি বর্ষের জীবনচরিত স্মরণ করিয়া রাখিতে পারি? নানা কার্য্যে আমরা সর্ব্বদাই ব্যস্ত, নানা বিষয়ে আমাদের মন সদাই ছুটাছুটি করিতেছে। এ অবস্থায় বৎসরগুলির জীবন কাহিনী পরে পরে অবিকল স্মরণ করিয়া রাখিবার সম্ভাবনা কই? চিরকালের মত ডুব দিব, ইহা স্পষ্ট দেখিতেছি, তখন কে কাহার স্মৃতিবহন করিবে?

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। চারিদিকে জনকোলাহল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মাঠে পথে লোকে লোকারণ্য; যেন সকলে অনন্ত আকাশ-তলে মুমূর্ষু বৎসর দেবতার সহিত শেষ দেখা করিবার জন্য আসিয়া দাঁড়াইল! হরিধ্বনির ন্যায় "হর হর, ব্যোম ব্যোম, মহাদেব "শব্দে" গগন বিদীর্ণ হইতেছে! ধর্ম্মপ্রাণ বঙ্গবাসী এই অবসরে দার্শনিকের আসনে বসিয়া ভক্তের কুসুমদামে মহাকালের পূজা করিবে। এই পূজাই চড়কপূজা।

ঘোর, ঘোর, ঘোর! ক্যাঁ—ক্যাঁ শব্দে ডাকিয়া উপরে ও কি ঘুরিতেছে? একটি নিষ্পত্র বিরাট বৃক্ষের ন্যায় প্রকাণ্ড দারুময় স্তম্ভ ঊর্দ্ধে উত্থিত,

থাকিয়া চক্রবৎ ঘূর্ণিত হইতেছে। শেষোক্ত দণ্ডটির দুই প্রান্তে জীবন্ত মানুষ বাঁধা, উহারাও উহার সহিত ঘুরিতেছে! ইহারই নাম চড়কগাছ। সন্ন্যাসীরা চড়কগাছে ঘুরপাক খাইতেছে। প্রতি-বৎসর সংক্রান্তির দিন বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে চড়ক-পূজা হইয়া থাকে। চড়কচক্র মহাকাল শিবের অলঙ্ঘ্য শাসন চক্রের প্রতিমূর্ত্তি। করুণাময় পিতার কঠোর শাসনচক্রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অহরহঃ ঘূর্ণিত হইতেছে। বৎসরান্তে পৃথিবীস্থ মানবের নিকট উহার এক আবর্ত্তন পূর্ণ হয়—তখন সন্ন্যাসীর দল তাঁহার সেই রৌদ্রসংহরণ শক্তির ক্রীড়ায় মাতিয়া উঠে। অতীত বৎসরকে বিদায় দিতে যখন আমাদের মন চায় না, তখন সেই শেষ মুহূর্ত্তে প্রিয় বন্ধুটির বিয়োগ-ভয়েই যেন আমাদের হৃদয় কাঁদিয়া উঠে। ভাবপ্রবণ বাঙ্গালি হায় হায় করিয়া অস্থির হয়। তখন সন্তানদিগকে প্রবোধ দিবার জন্যই যেন শিবের প্রচ্ছন্ন মহাশক্তি পল্লীতে পল্লীতে জাগিয়া উঠে। সন্ন্যাসীরা নির্ব্বিকার। সংসারী মানুষ কাতর হইলে সন্ন্যাসীদিগের নিকটে ছুটিয়া যায়, তাঁহাদিগের নিকটে সে বিশ্রাম এবং সান্ত্বনা পায়। মহাকাল শিব এইরূপেই জগৎকে তাঁহার অপার করুণার কঠোর শাসনের মধ্য দিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে রক্ষা করিতেছেন। বৎসরান্তে শিব-ভক্তেরা বাজনার তালে তালে নাচিয়া নিত্য ও অনিত্যের বিচিত্র লীলা সম্মুখে আঁকিয়া ধরিয়াই যেন, "ব্যোম ব্যোম হর হর" ধ্বনিতে যুগপৎ আমাদের হৃদয়ে সেই বিশ্বনিয়ন্তা ও তাঁহার অলঙ্ঘ্য শাসনের কথা জাগাইয়া তুলে, এবং শান্তিবারি বর্ষণ করিয়া তাপিত হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করে। আমরা ব্যাকুলতা ও মোহের মধ্যে আশ্বস্ত হই।

সন্ন্যাসীরা চড়কবৃক্ষে আরোহণ করিয়া বদ্ধ অবস্থায় ঘুর খাইতে থাকিলে সংসারে বদ্ধজীবের অবস্থা দৃষ্টিমাত্রই সহস্র দর্শকের মনোমধ্যে সুস্পষ্ট উদিত হয়। অসহায় জীবের সংসারচক্র ভ্রমি বুঝি ইহাপেক্ষা স্পষ্টরূপে বুঝান যাইতে পারে না। তখন সহস্র কণ্ঠে ব্যাকুলভাবে জীবগণ "হর হর হর" ধ্বনি করিতে থাকে, ঘূর্ণন বন্ধ হয় বদ্ধজীব মুক্তিলাভ করে।

আমরা মহাকালের ক্রোড়ে একটি বৎসরকে প্রত্যক্ষ বিলীন হইতে দেখিলাম এবং নূতন বৎসরে নূতন শিক্ষা গ্রহণ করিয়া নূতন জীবন আরম্ভ করিবার জন্য সোৎসাহে গৃহাভিমুখে ফিরিলাম।

একখানি পত্র।

পাংলং, ২৮শে চৈত্র ১৩২৩ সাল।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ধন্বন্তরি-সম্পাদক মহাশয়

—মান্যবরেষু—

আপনার ধন্বন্তরী মাসিক পত্রখানি বঙ্গদেশ মধ্যে একমাত্র বৈদ্যজাতির জাতীয় কাগজ। বৈদ্য-জাতির সকল রকম দুর্নীতি দূর করা এবং সুনীতি প্রবর্ত্তন জন্য অনেক কৃতবিদ্য বৈদ্যসন্তান ইহাতে নিয়মমত প্রবন্ধ লিখিতেছেন। বঙ্গদেশের সকল বৈদ্য মহোদয়গণ সমবেত হইয়া যাহাতে এই বৃদ্ধি হইয়া বৈদ্যজাতির গৌরব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, তৎপক্ষে বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। বৈদ্যজাতি সংখ্যায় খুব কম এবং দরিদ্র। ইহা-দের মধ্যে যাহারা সক্ষম তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ধন্বন্তরীর গ্রাহক হওয়া সঙ্গত। বার্ষিক ডাকমাশুল সহ ২।৶০ আনা মাত্র মূল্য দিতে অনেকেই সক্ষম।

করিলেই একখানা মাসিকপত্র অনায়াসে চলিতে পারে। যাহারা কৃতবিদ্য তাঁহারা সুপ্রবন্ধ দ্বারা, যাহাতে সকলের পাঠ করিবার জন্য মন আকৃর্ষিত হয় তাহাও করা উচিৎ।

বৈশ্যজাতির স্থান আগে কত উচ্চে ছিল, ক্রমে ক্রমে এখন কি হইতেছে, তাহা সকলেই বুঝিতেছেন। শিক্ষায়, শিষ্টাচারিতায়, নিঃস্বার্থপরতায় এবং স্বজাতিপোষকতায় বৈশ্যজাতির সর্ব্বোপরি স্থান ছিল। আগের তুলনায় যে কিছুই নাই, তথাপি এখনও যাহা আছে, তাহা অন্য জাতির মধ্যে বিরল। যাহাতে বৈশ্যজাতির মধ্যে আবার ঐসব বিষয়ে উন্নতি হয় তাহা করিতে হইবে। আগে কোন হীন কার্য্যে প্রাণান্তেও বৈশ্য যাইত না। এখন আর তাহা নাই। দুরবস্থাই ইহার প্রধান কারণ। বৈশ্যদের সম্ভবাতিরিক্ত ব্যয়ই ইহার অন্যতম কারণ। জমিদার শ্রেণী এখন প্রায় লোপের মধ্যে। এখন অনেক নিজেদের পরিবার পোষণ করিয়াও উঠিতে পারে না, দুরাবস্থাপিত স্বজাতির সাহায্য আর কি প্রকার করিবে। সমস্ত জিনিষ অগ্নিমূল্য এখন আর অল্প আয়ে কিছুতেই চলিতে পারে না। যাহাতে অবস্থার উন্নতি হইতে পারে, তৎপ্রতি সকলেরই চেষ্টা ও মনোযোগ আবশ্যক। জাতীয়ব্যবসার প্রতি অনেকেরই বিতশ্রদ্ধা। নেহাৎপক্ষে যে ছেলেটি স্কুল-কলেজে কিছু না জন্মে ; তাহাকেই জাতীয় ব্যবসা শিখিতে দেওয়া হয়। স্কুল-কলেজে পড়িয়া উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হউক আর না হউক বাবুগিরি শেখাটা যথেষ্টই হইয়া থাকে। এদিকে জাতীয় ব্যবসা ক্রমে ক্রমে অন্য জাতি অধিকার করিয়া বসিয়া অবস্থার উন্নতি করিতেছে। মেয়ের বিবাহেই অনেক পরিবার অতি শোচনীয় অবস্থার পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে। এই ভয়ানক কুপ্রথা কি প্রকারে যে দুর হইবে তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মোটেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি

বিবাহে কন্যাপক্ষকে যে ভয়ানক অত্যাচার করিতেছেন তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। শুধু বিবাহের সময়েই অত্যাচারের শেষ নয় ; বিবাহের পরেও বরপক্ষের মনযোগাইতে ও আবদার রক্ষা করিতে অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন। তাহা না করিলে তাহার ফল বিষময় হয়। মেয়ের বাপ-মা কি তাই মেয়ের পরিধেয় কাপড়, সেমিজ, শীতনিবারণ জন্য শীতবস্ত্র, এমন কি চিঠিখানা লিখিবার কাগজ কলম জিনিষ ত দিবেই,—মেয়ে কোন ব্রতাদি করিলে তাহার খরচ, এমন কি ঐ, দিন মেয়ে যাহা খাইবে তাহার পয়সাও দিতে হয়। বিবাহের সময় ঘরবাড়ী বিক্রয় করিয়া যথাসর্ব্বস্ব দিলেও বরপক্ষ সন্তুষ্ট হইবেন না। যতপায় তত চায়, আরও যে কতরকম অত্যাচার হয় তাহা লিখিতেও ভয় হয়। আমার ইহার একটি কথাও অতিশয়োক্তি মনে করিবেন না। অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ দেখিতে পাইবেন। মেয়ের বাপের অবস্থা যদি একটু ভাল হয়, তাহা হইলে ত আর কথা নাই। তখন বর পক্ষীয়রা মনে করে তাহার যাহা কিছু আছে ক্রমে ক্রমে সবই আনিতে হইবে। মেয়ে বিবাহের সময়, মাসে মাসে পড়ার খরচ দেওয়া অনেকে অসুবিধা মনে করিয়া, বিবাহ সময় এককালীন যথেষ্ট পরিমাণ টাকা নিয়া থাকেন। বরপক্ষের তখন টাকার মাত্রা বেশী করিতে কোন চেষ্টায় ত্রুটি হয় না। দু চার মাস না যাইতেই মাসিক পড়ার খরচ দাবি করিয়া সেন। তখন বলেন, আমাদের সাধ্য নাই যে আর পড়াইতে পারি, এখন পড়া বন্ধই করিতে হইবে।" তবে আপনার জামাতা, আপনি যদি পড়াইয়া লিখাপড়া শিক্ষা করান, পরে আপনার মেয়েই সুখী হইবে, আর না পারেন আপনার মেয়ে কষ্ট পাইবে।' তখন মেয়ের বাপ বাধ্য হইয়াই আবার মাসিক খরচ দিতে থাকে।

আবার মেয়েটিকে যে কাছে আনিয়া রাখিবে তাহারও যো নাই। ব্যারাম পীড়া হইলেও তাহার চিকিৎসার খরচ পাঠাইয়া দিতে হইবে। একান্ত যদি ও মেয়ে আনিতে পারা যায়, খরচ দিয়া আনিতে হইবে আবার খরচ দিয়া পাঠাইতে হইবে। মেয়ের যাওয়ার সময় নানা রকম ফর-মাইসের জিনিষপত্র খরিদ করিয়া মেয়ের সঙ্গে দিয়া মেয়ে দিয়া আসিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে স্বায়ত্বশাস ন দেন না কেন, বলিয়া আমরা কাগজে লিখিয়া থাকি, গলা-বাজিও যথেষ্ট করিয়া থাকি। সাহেবদের মধ্যে অনেকে, আমরা স্বায়ত্বশাসন পাইবার এখনও উপযুক্ত হই নাই বলায় আমরা তাহাদের উপর রাগ করি। আচ্ছা এই বিবাহের অত্যাচারে ত আমরাই আমাদিগকে পীড়ন করিতেছি, এবং আমরা ইচ্ছা করিলেই ত ইহা নিবারণ করিতে পারি! কার্য্যটি যে কত ভয়ানক হইতেছে, তাহা সম্ভবতঃ কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু কিছু করিতেছি কি? তবে আর অনুপযুক্তকে অনুপ-যুক্ত বলায় এত অন্তর্দাহ কেন?

ধন্বন্তরিতে কেহ প্রস্তাব করিতেছেন, ছেলে মেয়ের বিবাহে কেহই টাকা দিতে নিতে পারিবেন না বলিয়া যাহারা সম্মত হন তাঁহারা প্রতিজ্ঞবদ্ধ হউন। ছেলের বিবাহে টাকা লইব না বলা যায় কিন্তু মেয়ের বিবাহে টাকা দিবনা কি প্রকারে বলা যায়। পারত পক্ষে কেহই টাকা দিতে চাহেনা কিন্তু বিনা টাকায় ছেলে না যুটিলে টাকা দিয়া বিবাহ না দিলে মেয়ের ত আর বিবাহ হইবে না! অনেক মেয়ে টাকার অভাবে নিশ্চয়ই অবিবাহিত থাকিবে। তবে যে বাপ মার শক্তিতে কুলায় সে আর কি প্রকারে মেয়েকে বিবাহ না দিয়া রাখিতে পারে। এই বিষয়ে নিম্নে আমাদের গ্রাম হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি।

রাজনগর পদ্মার গর্ভে যাওয়ার পর মহারাজা মধ্যে অধিকাংশ পালংগ্রামে আসিয়া বাস্তব্য করিতেছেন। তাহার মধ্যে চন্দ্রকান্ত বাবু তাঁহার ছেলের বিবাহে কোন বাবদ কিছুই গ্রহণ করেন নাই, কুলোচিৎ পণ দিয়া মেয়ে আনিয়া বিবাহ করাইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার চারি মেয়ের বিবাহে যথেষ্ট টাকা দিতে হইয়াছে। তাঁহার চারিপুত্র। শ্রীযুত কালীচরণ সেন প্রভৃতি তাহাদের ১৩।১৪টি মেয়ে এককালিন বিবাহ সময় যথেষ্ট টাকা দিয়া বিবাহ দিয়াছেন। পড়ার খরচ দেওয়ার কথা ছিল না, কিন্তু অধিকাংশ জামাতাকেই নিয়ম মত পড়ার খরচ পরে দিতে হইয়াছে। তাঁহাদের ছেলেরা এখন অবিবাহিত বয়স অল্প। তাঁহাদের বিবাহ সময় কোন প্রকার দাবি দাওয়া করিবেন না। শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র সেন মহাশয় ও এই ভাবে তাঁহার তিন মেয়ের যথেষ্ট টাকা দিয়া বিবাহ দিয়াছেন কিন্তু ছেলেদের বিবাহে একটি পয়সাও গ্রহণ করেন নাই। দানসামগ্রী গয়নারও কোন দাবি করেন নাই। অবস্থাপন্ন লোকের মেয়ে সাধ্য সত্বেও সাধারণ অবস্থার লোকের মেয়ে আনিয়াছেন। শ্রীযুত পরেশনাথ সেন মহাশয় তাঁহার ভাতিজায় বিবাহে কিছুই গ্রহণ করেন নাই, অথচ তাহার মেয়ে ও ভাইঝিদিগকে যথেষ্ট টাকা দিয়া বিবাহ দিয়াছেন। শ্রীযুত সারদারঞ্জন সেন মহাশয় শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়েরা দুই ভাই। শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সেন মহাশয়, শ্রীযুত জ্ঞানচন্দ্র সেন মহাশয় শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়েরা তিন ভাই আরও অনেকে বিবাহ সময় একটি পওয়াও গ্রহণ করেন নাই, অথচ প্রায় সকলেরই ভগ্নী ভাইঝি দিগকে বিবাহ দিতে যথেষ্ট টাকা দিতে হইয়াছে। কেহ মনে করিবেন না যে আমাদের গ্রামের কেহ ছেলের বিবাহে টাকা লন না, তাহা দেখাইবার জন্য এই সব কথা লিখিলাম। আমাদের গ্রামে অনেকেই টাকা লইয়া থাকেন, তবে তুলনায় সংখ্যা কিছু কম।

মনে আসিল বড় দুঃখে লিখিলাম। সঙ্গত বোধ করিলে আপনার ধন্বন্তরীতে স্থান দিবেন।

শ্রীকিশোরীমোহন সেন গুপ্ত।

পত্রখানি অবিকল প্রকাশিত হইল। পত্র লেখক লিখিয়াছেন মেয়ের বিবাহে টাকা দিতে না চাহিলে পাত্র যুটিবে না। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, যাঁহারা টাকা আদান প্রদান না করা সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে কি ছেলে থাকিবে না? দুই জন চারি জন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে অবশ্যই কোন কার্য্য হইবেনা; কিন্তু এই বিশাল বৈদ্য সমাজের চতুর্থাংশ বৈদ্যসন্তান প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়া যদি সমাজে সামাজিক শাসন প্রবর্ত্তন করিতে প্রয়াস পান, তাহা হইলেও এই নিষ্ঠুর প্রথার তিরোধান কতকটা সহজ হইয়া পড়িতে পারে। ধঃ সঃ।

বৃদ্ধের খতিয়ান।

[শ্রীআত্মারাম শর্ম্মা]

"পাখাখানি আমার হাতে দিন্! আমি বাতাস কর্‌চি" বলিয়া সুবোধবাবু বেলা ঠিক সাড়ে তিনটার সময় বৃদ্ধের শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান। বৃদ্ধ সটান লম্বা হইয়া বৈঠকখানায় শুইয়া আছেন, সপ্তম বর্ষীয়া একটী নাত্‌নী পদসেবা করিতেছে। গরমের চোটে ঘুম হইতেছে না, তাই বৃদ্ধ এ-পাশ ওপাশ করিতেছেন, আর হাতে পাখা চালাইতেছেন। নাত্‌নীকে বলিয়াছিলেন,—'আমার পাকা চুল বেছে দে'। নাত্‌নি কিন্তু গোটা মাথাটী শাদা দেখিয়া "জিজ্ঞাসা করিল,—দা'মশায় কোন্‌গুলি পাকা?" দা'মশায় নিরুত্তর!

সুবোধবাবুর বয়স বেশী নহে। সওদাগরী আপীশে চাক্‌রী করেন, বৃদ্ধের নিকট আসা-যাওয়াটা তাঁহার একটু ভাল লাগে, তাই তিনি মাঝে মাঝে ছুটী-ছাটা হ'লেই আসেন। সে দিনটা রবিবার ছিল, গরমের চোটে সাপ্তাহিক বিশ্রামটা সম্ভোগ করা আর ভাগ্যে ঘটে নাই, তাই বৃদ্ধের কাছে দুই একটা খেয়ালের কথা শুনে ঠাণ্ডা হবার আশাতেই আসা।

বৃদ্ধ বেজায় শুরুক খোর। ষ্টীম ছাড়া যেমন এঞ্জিন চলে না, ধূমপান ছাড়াও বৃদ্ধের কোথাও যাতায়াত চলে না! ঘরে যতক্ষণ থাকেন, হুক্কের একটা বন্দোবস্ত চাই। পয়সার তেমন সচ্ছলতা নাই, কাজেই চুরুট-সিগারেট যোটান শক্ত। তাই ১৯০৫ সালের আবিষ্কৃত বিড়িতেই ষ্টীমের অভাবটা মোচন হয়। স্বদেশী আন্দোলনের ইজ্জতটা কিন্তু এই এক বিড়িতেই আজ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছে। সস্তাও খুব, —এক পয়সায় দশটা। সুবোধবাবু পকেটে করিয়া দশটা বিড়ি আনিয়াছিলেন। বৃদ্ধ গাত্রোত্থান করিবামাত্রই সুবোধ পকেটে হাত দিয়া বলিলেন —'আপনার জন্যে একটা সওগাদ এনেছি।' এই কথা বলিয়াই হাত বাড়াইয়া ১০টী বিড়ি দিয়া খুব এক গাল হাসিয়া ফেলিলেন। বৃদ্ধ বলিলেন,—"হাস্‌চ কেন ভায়া! এ যে চুরুটের 'বটতলা'র সংস্করণ!

সুবোধ সত্য সত্যই সুবোধ বালক। বালকই বা বলা যায় কিরূপে! সুবোধেরও যে বালক-বালিকা আছে, তবে বৃদ্ধের নিকট তুলনায় বালক বলিলে সুবোধের মানহানি করা হয় না। মানুষটী ছোটখাটোর উপর একহারা গঠন, ফ্রেঞ্চকাটের দাড়িও আছে, তার চুলটা সাম্‌নে বড় পিছনটা একদম গড়ের মাঠ নয়! কথাবার্ত্তায় আলাপ-সালাপে বেশ ভাল ছোক্‌রাটী ব'লেই বোধ হয়। তবে ভেতরে কি আছে কে জানে।

যাহাহউক বৃদ্ধের সঙ্গে সুবোধবাবুর বেজায়

অন্ততঃ মুখে তেমনি ভাবটা দেখান! সময়ে সময়ে বৃদ্ধের আড্ডায় এসে এটা-ওটা জিজ্ঞেস করেন। সেদিন কথায় কথায় জিজ্ঞেস কল্লেন,—'মশায় দেশের গতিকটা কেমন দেখ্‌চেন?'

বৃদ্ধ।—আমি ত তেমন মন্দ দেখ্‌চি না। তোমার মনে কেমন বোধ হচ্চে?

সুবোধ।—আমাদের ভাল মন্দটুত এক পেট্‌টি নিয়ে। তার যোগাড়ের এদিক্ ওদিক্ হ'লেই ভাব্‌না ঢোকে! আপীশওয়ালারা দশ লাখ টাকা লড়াই-ঋণে দান করে ইজ্জত রক্ষা কল্লেন। শুন্‌চি ছোট বড় সব কেরাণীদের মাইনে থেকে শতকড়া দশটাকা ক'রে কেটে নেবেন। যদ্দিন তক এক বছরের মাইনেটা না হবে, তদ্দিন এই কাটাকাটি চল্‌বে। তা হইলেই ত চক্ষু স্থির!

বৃদ্ধ।—এতে আর আপ্‌সোস্ করবার কিছু নেই ভাই। রাজা যখন ঋণ কত্তে নেবেছেন,—আর যে ঋণটা হচ্চে,—এটা যখন তোমাদের দেশের দশের মঙ্গলের জন্যেই রাজাকে লড়াই কত্তে হচ্চে, তখন সকলেরি ত কিছু কিছু দেওয়া দরকার। তা মাইনে থেকে মাস মাস কেটে নিলে ত তোমারি সুবিধে—ঘর থেকে বের কর্ত্তে হ'ল না। তুমি মনে করে নেবে,—তোমার মাইনে ঐ ক'টা টাকা কমেছে। তা ছাড়া তোমার টাকাটা ত, মনে করে দেখ, মারা যাচ্ছে না। এক সময় সুদে-আসলে পাবেই ত? তবে আর এতটা ভাবনা কেন।

সুবোধ।—যখন পাবার তখন ত পাব্বই, এখন খাই কি?

বৃদ্ধ।—রাজার দেশে যে সকলে আধ্‌পেটা খাচ্ছে,—সেখানে যে নিক্তির মাপে রুটী-মাংসের ব্যবস্থা হয়েছে, সে কথাটা ভাব্‌লে দোষ কি ভায়া।

সুবোধ।—আপনার মুখের কাছে দাঁড়ায় এমন সাধ্যি কার আছে? তা যাক্, এখন দুনিয়ার খবরটা বলুন, খানিক্‌টা শোনা যাক্।

বৃদ্ধ।—যে কথাটা হচ্ছিল, এটা কি দুনিয়া ছাড়া? রাজা তোমাদের দেশ—তোমাদের ধন-মান-প্রাণ রক্ষা কর্‌বার জন্যে দেনা কত্তে যাচ্ছেন; তুমি একটা সামান্য প্রজা, তোমার দুয়ারে এসে হাত পেতেছেন, সুদ দেবেন—গোটা সাম্রাজ্যটা তোমাদের কাছে জামীন রেখে প্রজারক্ষার জন্যই প্রজাদের ঠেঙ্গে ঋণ কর্ত্তে নেবেছেন, তার উপর আবার কথা চলে কি ভায়া! আমি যে আমি,—পয়সার অভাবে সব নেশা ছেড়ে এখন সিদ্ধিটাকে ধ'রে আছি, এক পয়সায় দু দিন চালাই, এতেও ত সাড়ে সাত টাকা ধার দিতে তৈয়েরী হয়েছি। সেভিংব্যাঙ্কে একবার ক'টা টাকা রেখেছিলুম, তুলে তুলে ২৸৶ দুই টাকা বার আনা নয় পাইতে ঠেকেচে; কাল আর একটা টাকা জমা দিয়েচি। নাগাত আষাঢ় পর্য্যন্ত বাকী টাকা কটার একটা কিনারা ক'রে একটা 'বণ্ড' কিন্‌তে হবেই। নইলে মনটাকে বোঝাতে পাচ্ছি কই?

সুবোধ।—আমার ঝকমারি হয়েছে দাদা! একথাটা না তুল্‌লেই ছিল ভাল। তা একথাটা ছেড়ে দিয়ে অন্য কথা থাকে ত বলুন। বলি বিদ্বৎসভার আপীশে এখন যাতায়াত আছে ত?

বৃদ্ধ।—থাক্‌বে বই কি ভায়া! যতীন বেচারী ত দিন্ রাত্ ঐ নিয়েই আছে। ঘাটে-পথে যেখানে যার সঙ্গে দেখা হয়, সেই এক কথা। বদ্দির ছেলে দেখ্‌লেই বল্‌বে—"মেম্বর হও।" ইস্কুল ইস্কুল ক'রে ত লোকটা যেন ক্ষেপে উঠেছে। একটা তৈয়েরী স্কুল নিয়ে নিজেদের মতন গ'ড়ে নেবে ব'লে আজ তিন-চার্ মাস থেকে গলদঘর্ম্ম হচ্চে, এখনো পাকা ক'রে উঠ্‌তে পারে নি। তা কর্‌বেই-বা কি ছাই। আমরা যে আজ কাল মুখে যা বলি, কাজে তা করি না।

সুবোধ।—তাতো বটেই। আমিও ত সভার একজন মেম্বর আছি। আমার কাছে প্রায় চার মাসের চাঁদা বাকি পড়েছে। কি করি দাদা, সামান্য মাইনে পাই, পুষ্যি অনেক, এতেও মাসে একটা টাকার কম দিতে লজ্জা বোধ হ'ল। এত-দিন ত একরূপ চালিয়ে এসেছি। মনে ক'রে-

ছিলুম, এখন থেকে আট আনা ক'রে দেব; কিন্তু কেমন্ কেমন যেন ঠেকে, তাই মনে করেচি—রোজ না হয় বাজার খরচ থেকে একটা পয়সা বাঁচাব, তবু দেখ্‌বো—এ অধঃপেতে জাত্‌টা উঠ্‌বার একটা পথ পড়ে কি না।

বৃদ্ধ।—তুমি ত একজন সামান্য কেরাণী,তোমার মনে এমনতর ভাব হ'লেও তাতে কথা চলে না; কিন্তু ভায়াহে! এই সহরে এমনতর জনকতক বদ্দির ছেলে আছেন, যাঁদের কেউ ডাক্তার, কেউ অধ্যাপক, কেউ এটর্নী, কেউ হাইকোর্টের উকীল; তাঁরা কিন্তু বেশ! ডুব দিয়ে পালাবার জন্য ফাঁক খুঁজে বেড়ান। তুমি তাদের খবর কিছু রাখ কি?

সুবোধ।—একটু একটু শুনেছি বটে, কিন্তু তেমন কিছু জানি না। আপ্‌নি কিছু শুনেচেন নাকি?

বৃদ্ধ।—নেহাৎ শুনি নাই, একথা বল্‌তে পারি না। যতীন ভায়া ত আর তেমন লোক নন যে, সব কথাই ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বলে বেড়াবেন! কেহ কেহ অনেক রকমে অনেক খেলাই খেল্‌চেন; কিন্তু যতীন ভায়ার ধারণা,—এরা ঠিক সোজা হ'য়ে আস্‌বে। তা ছাড়া বদ্দিসন্তানেরা নিন্দা দশজনে শুন্‌বে, এতে তার ভয়ানক আপত্তি। শুনলুম,—তার নাম কর্‌ব না,—একজন ডাক্তার নাকি চাঁদার টাকা চাইতে গেলে,লিখে পাঠিয়েছেন, —"আমি অনবসর বশতঃই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, সভায় যোগদান করিতে পারি না, সুতরাং চাঁদা দেওয়াটা অপব্যয় মনে করি।"

সুবোধ। এমন সন্ন্যাসী মহাপুরুষটী কে দাদা?

বৃদ্ধ। গোড়াতেই বলেচি, নাম কর্‌বো না। তবে এটুকু বলি,—লোকটার একটী ডাক্তারখানা আছে, এম্‌নি পসারও মন্দ নয়, সহরে দশ জনে জানে, বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করে। বাড়ীর মেয়েদের থিয়েটার দেখানও আছে।

সুবোধ। তাঁর এমন মতিগতি কেন দাদা? দোহাই মানে ভায়া? এই দেখনা কেন, ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রার বিপিন বাবু একজন পাকা সব জজ; বিচার আচারে বেশ সুখ্যাতিও আছে। জজ ডব্বিন সাহেব ছুটী লওয়ায় তাঁরি জজ হবার কথা ছিল; কিন্তু তাঁর হ'ল না, হ'ল বাইরের এক জনকার! তাঁর নাম মেস্তর এন্, সি, সেন। তিনি একজন কৌসলী, স্যর্ কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্তের জামাই।

সুবোধ। এ যে আপনার নেহাৎ অন্যায় কথা দাদা! মিঃ এন্, সি, গুপ্তকে আপনি জানেন না, তাই একথা বল্‌চেন! ইনি একজন এম্, এ, তার উপর বারিষ্টার, বয়সও বেশী নয়। তা ছাড়া স্যর কে, জি, গুপ্তের জামাই। দাবিটা কার বেশী বলুন দেখি?

বৃদ্ধ। আমরা ভাই সেকেলে লোক! এ-মে, বি-য়ে বুঝি না। আমরা বুঝি,—বিচার-আচারে পাকা লোক বাহাল হ'লেই আহেল-মামলার পক্ষে ভাল। কেন, বিপিন বাবুও ত শুনেছি এ-মে, বি-এল, মুনসেফী ও সব জজীয়তী করে করে চুল পাকিয়েছেন। তা ছাড়া রেজিষ্টরেরাইত জজ হ'য়ে থাকে। এই যে তোমার যে ডব্বিন সাহেব ছুটী নিলেন, ইনিও ত ঢের দিন রেজেষ্টারী করে, উঠতে উঠতে এখন তেসরা ঘরের জজ হয়েছেন! বলি, বিপিন বাবুকে জজ ক'রে, তোমার এই কচ্‌মা বারিষ্টার মেস্তর সেনকে রেজিষ্টার কল্লে, কি মহাভারত অশুদ্ধ হ'ত,—না দেখ্‌তে শুন্‌তে খারাপই দেখাত? স্যর কে, জি, গুপ্তের জামাই হ'লে কি রেজেষ্টারী কত্তে নাই? তাঁর ছেলে যতীন গুপ্তও ত গোড়ায় রেজেষ্টরী করেচেন! সে কথা আর কি বল্‌ব ভাই। বদ্দির কপাল কিনা, তাই এমনতর ব্যবস্থা।

সুবোধ। কেন দাদা, মিঃ এন্, সি, সেনও ত বদ্দির ছেলে, বিয়ে করেচেনও বদ্দির মেয়ে।

বৃদ্ধ। সে কথা জানি হে ভায়া জানি!

তাঁকেও জানি, আর তোমার স্যর কে, পি, গুপ্তের বাপ কালীনারায়ণ রায় (গুপ্ত) কেও জান্‌তুম। আর রেজেষ্টার বিপিনবাবুকেও জানি। বিপিন বাবু কপালে চন্দনের ফোটাটী লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌চ কি ? যত নষ্ট করেচে ঐটীতে! জাতি-ধর্ম্মে যাঁদের আস্থা আছে, আজকাল তাদের ভাগ্যে অমনি ঘটে।

সুবোধ। আচ্ছা দাদা,আর একটা কথা জিজ্ঞেস কচ্ছি,—এবারকার ইউনিভারসিটী পরীক্ষায় যে প্রশ্ন চুরি হ'য়ে দুই দুইবার পরীক্ষা নাকচ হল, এর ব্যাপারটা আপনার কাছে কেমনতর বোধ হচ্চে ?

বৃদ্ধ। রক্ষে কর ভায়া! ওসব কথা বলে আবার ঘাটাচ্ছ কেন ? সাতটা বেজে গেছে,—সিদ্ধির মৌতাতের সময় হয়েছে ; আজ্‌কের মত রেহাই দেও ভায়া, আর এক দিন না হয় এ কথা বল্‌বো। তা আমরা আর এ খবর বেশী রাখ্‌বই বা কি,— ব্যাপার বুঝ্‌বই বা কি! আমরা তো আর তোমার ইউনিভারসিটীর কাছে ঘেস্‌তেও পারি না,—কোন খবর রাখ্‌তেও পাই না,—কাজেই কোন একটা সিদ্ধান্তও কত্তে পারি না।

সুবোধ। ঘেস্‌তে না পাল্লেও দশ জনের মুখেও ত শুনতে পান, 'নায়ক' পত্রেও ত দেখ্‌তে পান! আসল কথাটা কি, মনে মনে একটা ঠাওর হয়েচেত ?

বৃদ্ধ। দশের মুখে থেকে খুটে খুটে নিয়ে কোন একটা সিদ্ধান্ত করা চলে না ভাই। তবে নায়কের কথা যে বল্‌চ, তার কথা আজা-মুড়া বাদ দিয়ে অনেকটা নিতে হয়। এই দেখনা কেন, সেদিন একটা কথা লিখ্‌লে কি যে,—২২শে এপ্রেল একটা উল্কাপিণ্ড ছুটে এসে পৃথিবীকে টর্পেডোর মতন ঘা মারবে। এই ঘা টা আমেরিকার মেক্সিকোতে লাগ্‌বে, তাতে গোটা পৃথিবীটী গুঁড়া হ'য়ে যাবে। আমার ত মনে হ'য়েছিল,—এবার বাঁচলুম। পয়সার ভাব্‌না ত আর ভাব্‌তে হ'বেই না,— তা ছাড়া বাড়ী ঘর-দোর মেরামত কত্তে হবে না,— চাল-ডাল তেল নুনের দরকার হবে না—বয়ের বাবার টাকার টানের ভাব্‌না ভাব্‌তে হবে না,— এমন কি, নিজের বেরাম-পীড়ার জন্যেও আর কষ্ট পেতে হবে না! কিন্তু ২২শে এপ্রেল তারিখে দেখ্‌লুম, সব ফাঁকা! তবে ইউনিভারসিটীর কথা নায়ক যা বলেচে, এই উল্কাপিণ্ডের ঘায়ের মত যদি ষোল আনা ফে'সে না যায়, তা'হলে মনে হয়,—স্যর আশু মুখুয্যে যেন সত্যি সত্যি কি যাদু জানে! তাঁর যাদুর চোটে প্রফুল্ল রায় থেকে সুরু ক'রে যে কয়টা নামজাদা তোমার সিণ্ডিকেট্-সেনেট আছে, সব গুলির দাম ক'মে গেল! শুন্‌লে না সেদিন ?— যখন গোলদিঘীর পারে হাজার হাজার ছেলে পরীক্ষার তারিখ জান্‌বার জন্যে জমায়েৎ ছিল, সেনেটহল থেকে বেড়িয়েই সরস্বতী ঠাকুর হেসে হেসে সকলকে বল্লেন,—'বাছাধনেরা তোমাদের ত বেশ সুবিধেই হয়েছে,—গোটা তিনটে মাস ভাল ক'রে পড়্‌তে পাবে, এবারে কেউ ফেল হবে না।" ছেলেগুলি যে দুইবার পরীক্ষা দিয়ে, পরীক্ষা নাকচ হওয়ায় বেজায় সুখভোগ কল্লে, একথাটা স্যর আশু মুখুয্যের মুখ থেকে শুন্‌বার সাধ অনেকেরি ছিল, কিন্তু ঘট্‌ল না, এই দুঃখু! তবে এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, সময়ে স্যর আশু মুখুয্যেই মূর্ত্তিমান ইউনিভারসিটী হ'য়ে দাঁড়াবেন! যেরূপ গতিক দেখা যাচ্ছে,তাতে দেশের লোকে যে আর কালেজী বিদ্দে শিখ্‌তে পার্‌বে, এমন ত মনে হচ্চে না। সরস্বতীর আবদারে নাকি সব পরীক্ষার ফি-ই বাড়্‌তে চল্‌লো! বইয়ের বোঝা ব'য়ে ত ছেলেদের স্কুল-কালেজে যাওয়া একরূপ বন্ধ হবার যো-ই হয়েচে, মাইনা ও ফিয়ের কস্নী তার ওপর চেপে যে বাছাদের একবারে অচল ক'রে তুল্‌বে তার আর কথা নেই। তখন এক একটী ক'রে যদি স্কুল-কালেজগুলি, পড়ার অভাবে, উঠে যায়, তখন খোদ্ ইউনি-

নিজস্ব ক'রে নিচ্ছে, স্কুল-কালেজ ও তেমনি হবে। তখন গোলদিঘীর পার থেকে ভবানীপুরে জগুবাবুর বাজারের দক্ষিণ পর্য্যন্ত স্থানটুকু বিশ্ববিদ্যালয়ের দরকার পড়্‌বে। স্যর আশু মুখুয্যে সরকার বাহাদুরকে এ কথাটা বল্‌লে আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব হবে না, অম্‌নি'একোয়ার'হয়ে যাবে। শর্ম্মা ত এ ব্যাপারের এইটুকুই ঠাউরিয়েচেন। বলি সুবোধ ভায়া! দিনটা কয়েক সবুর করনা কেন, আপনা আপনি সব বেরিয়ে পড়্‌বে। যাদুর ক্ষমতা আর কয় দিন ঠেক্‌বে ভায়া? শেষে, কিন্তু অনেক মিয়াই পস্তাবেন, আর পাঁচু ভায়া সীতেরাম ঘোষের গলি থেকে তাঁর মামুলি বুলি ঝাড়্‌বেন। আজ আসি ভায়া, ফিরে রোব্‌বার আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

শিশুপরিচর্য্যা।

[কবিরাজ শ্রীরাখালদাসসেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ]

শিশুর ভেদ ও বমন।

শিশুর পক্ষে ভেদ ও বমন অত্যন্ত আশঙ্কাজনক রোগ। এজন্য রোগ হইবামাত্র বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। অনেক সময় উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

এই রোগ দেখা দিলেই শিশুর নানাবর্ণের তরল মলভেদ হইতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বমিও দেখা দেয়। অত্যধিক পরিমাণে মলভেদ ও বমি হইতে আরম্ভ হইলে, বালক অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে এবং প্রবল পিপাসার জন্য কেবল স্তন্যপান করিতে চাহে। মুখ বিবর্ণ ও ম্লান হইয়া যায়, চক্ষু বসিয়া যায় এবং ক্রমে রোগ উৎকট অবস্থায় উপনীত হইলে বালক অবসন্ন হইয়া পড়ে, নাড়ীর গতি মন্দ হয়, হাত পা ঠাণ্ডা হইতে দেখা যায়। মস্তকের তালুদেশ বসিয়া যায়, প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায় এবং একপ্রকার অস্বাভাবিক তন্দ্রা আসিয়া শিশুকে অলস ও মুহ্যমান করিয়া তুলে। কখন কখন বা শিশু নিদ্রিতপ্রায় অবস্থায় চম্‌কাইয়া উঠে বা চীৎকার করিয়া উঠে। এই রোগের অন্তিম অবস্থায় প্রায়ই হিক্কা অথবা আক্ষেপ

শিশুর ভেদ-বমির প্রতীকার।

সাধারণতঃ গো-দুগ্ধের দোষে, অথবা যথেচ্ছাচারিণী জননী বা ধাত্রীর স্তনদুগ্ধের দোষে শিশুর এতাদৃশ রোগ হইতে দেখা যায়। যাঁহারা আকস্মিক ভেদ-বমির আক্রমণ হইতে শিশুকে রক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহাদের শিশুর আহারের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা উচিত। অনেক সময় সহরের গোয়ালারা রাত্রিতে দোহা দুগ্ধ পরদিন বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে। সেই বিকৃত দুগ্ধ অল্পজালে সিদ্ধ বা গরম করিয়া শিশুর জননী বা পরিচারিকা সন্তানকে পান করাইয়া থাকেন, এবং উহা যথা সময়ে সম্যক প্রকারে জীর্ণ না হইতেই, অথবা অন্য কোন কারণে বালক কাঁদিতে থাকিলে, ক্ষুধা পাইয়াছে ভাবিয়া পুনরায় বালককে ঐদুগ্ধ পান করান হইয়া থাকে। ইহাতে শিশু অল্পকালের মধ্যেই উৎকট উদরাময়ে আক্রান্ত হইয়া পড়ে,এবং রোগের প্রাবল্য হইলে ভেদ ও বমি একসঙ্গে আসিয়া শিশুকে কাতর করিয়া ফেলে। পক্ষান্তরে পল্লীগ্রামের অনেক সন্তানবৎসল মুগ্ধ জননী শীঘ্র

খাঁটি গোদুগ্ধ অথবা ঈষৎ জল মিশ্রিত গোদুগ্ধ পান করাইয়া সন্তানের রোগ ডাকিয়া আনেন। এতদ্ভিন্ন অনেক সময় পূর্ণগর্ভা গাভীর দুগ্ধ ও দোহন করিয়া অর্থলোভে গোয়ালারা বেচিয়া থাকে। তাদৃশ দুগ্ধ ও দুষ্পাচ্য বলিয়া শিশুর নানাপ্রকার ব্যাধি ঘটিয়া থাকে, পেটের অসুখতো হয়ই। এই সকল কারণে আমাদের মনে হয়,—যদি স্তন্যদাত্রী জননীর স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধি করাইতে পারা যায়, এবং জননীকে যদি বিশেষ নিয়মে রাখিতে পারাযায়, তাহা হইলে বহুল পরিমাণে শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারা যায়। আমরা স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধির উপায় সকলও ইতি পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি।

শিশুর ভেদ-বমির চিকিৎসা।

১। শিশুর ভেদ ও বমন হইতে আরম্ভ করিলে, অথবা প্রবল অতিসার (তরল মলভেদ) হইতে থাকিলে তাহাকে দুধ খাওয়ান বন্ধ করিয়া দিবে এবং ধনে, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, শালপানি, চাকুলে বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর ও আকনাদি এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকটী তিন আনা পরিমাণে লইয়া বেশ করিয়া জলে ধুইয়া শিলে ছেঁচিয়া একসের জলে সিদ্ধ করিতে দিবে। পরে এক পোয়া আন্দাজ জল অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে এবং তাহাতে দুই তোলা আন্দাজ টাট্কা ভাজা খৈ ফেলিয়া দিয়া বেশ করিয়া চট্কাইবে ও একখণ্ড পাতলা পরিষ্কার ন্যাকড়া দ্বারা ছাঁকিয়া মণ্ড বাহির করিয়া লইবে। সেই তরল ঔষধ সিদ্ধ মণ্ড একটা পরিষ্কার বোতলে পুরিয়া রাখিয়া দিবে এবং মাঝে মাঝে, অথবা শিশুর পিপাসা বা ক্ষুধা বিবেচনা করিলেই এক এক ঝিনুক করিয়া খাওয়াইতে থাকিবে এবং আবশ্যক বিবেচনা করিলে পুনরায় বৈকাল বেলায় ঐরূপ প্রস্তুত করিয়া রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত শিশুকে খাইতে দিবে। ইহা দ্বারা শিশুর সর্ব্বপ্রকার অতিসার ও বমন

২। যদি পূর্ব্বোক্ত সমস্ত দ্রব্যগুলি সংগ্রহ করিতে না পারা যায়, তবে যতগুলি সংগৃহীত হইতে পারে, ততগুলিই মিলিত দুইতোলা পরিমিত লইয়া পূর্ব্ববৎ জলে সিদ্ধ করিয়া খৈএর মণ্ড প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইবে অথবা,—

৩। বেলশুঁঠ একতোলা এবং আমের আঁটির ভিতরকার কুশী একতোলা জলে ধুইয়া ও শিলে ছেঁচিয়া একসের জলে সিদ্ধ করিবে ও একপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেই লবণজলে দুই তোলা খৈ দিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিয়া লইবে এবং একটু একটু করিয়া শিশুকে পান করাইবে। ইহাও একটী অত্যুৎকৃষ্ট শিশুর ভেদবমি নাশক মুষ্টিযোগ।

৪। শিশুর ভেদ ও বমনের সহিত যদি তৃষ্ণা ও দাহ থাকে, সেজন্য শিশু অস্থির হইয়া পড়ে এবং জিহ্বা শুষ্ক হইতে থাকে। তাহা হইলে,—ধনে ও বালা অথবা ধনে, বালা ও আকনাদি—মিলিত দুইতোলা লইয়া একসের জলে সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট একপোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহাতে দুইতোলা খৈ দিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিয়া একটু একটু করিয়া খাওয়াইবে। ইহাতে শিশুর ভেদ, বমন, তৃষ্ণা, দাহ ও অস্থিরতা প্রভৃতি অচিরে দূরীভূত হইয়া যাইবে। অথবা—

৫। ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধনে, লোধ, ইন্দ্রযব ও বালা এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমান পরিমাণে লইয়া মিশাইবে এবং ঐ মিশ্রিতচূর্ণ দুই তিন আনা পরিমাণে লইয়া একটা কাচ অথবা পাথরের বাটিতে মধুদিয়া মিশাইয়া ঢাকিয়া রাখিয়া দিবে এবং মাঝে মাঝে আঙুলে করিয়া শিশুকে একটু একটু চাটাইয়া দিবে। ইহাও শিশুর জ্বর ভেদ ও বমিনাশক একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৬। পূর্ব্বোক্ত উপায় সকল ছাড়া ঐ সঙ্গে আর একটী ব্যবস্থা করিতে পারিলে শিশুর ভেদ ও বমন এবং তজ্জন্য নানাবিধ উপসর্গ সকল বিনষ্ট

মূল, আকনাদিমূল, জামছাল ও আমছাল সমান পরিমাণে লইয়া জলে বাঁটিবে এবং প্রলেপের মত করিয়া শিশুর হাতের ও পায়ের তলায় মাথার তালুদেশে, হৃদয়ে ও নাভিতে প্রলেপ দিয়া দিবে। অথবা—

৭। কুলপাতা, আমরুলশাক, কাকমাচীর পাতা ও কয়েদবেলের পাতা সমপরিমাণে লইয়া জলে বাঁটিয়া পীড়িত শিশুর মস্তকের তালুদেশে পুরু করিয়া প্রলেপ দিয়া দিবে। ইহাতে বালকের দুর্নিবার অতিসার, বমন, হিক্কা, পিপাসা ও অস্থিরতা প্রভৃতি অতি সত্বর দূরীভূত হইয়া থাকে।

৮। অতিরিক্ত ভেদ প্রভৃতির জন্য শিশুর মূত্ররোধ হইলে, কতকগুলি সোরা জলে ভিজাইয়া সেই জলে পুরুমত জলপটী করিয়া নাভির নিম্ন-প্রদেশে লাগাইয়া দিবে। ইহাতে অল্পকালের মধ্যে প্রস্রাব হইয়া যাইবে। অথবা—

৯। তেলাকুচার মূল কাঁজিতে বাঁটিয়া কিংবা পাথরকুচার পাতা সোরার জলে বাঁটিয়া শিশুর নাভিতে প্রলেপ দিয়া দিবে। ইহাও মূত্ররোধের ঔষধ।

পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা সকলের দ্বারা শিশুর রোগ আরোগ্য হইয়া গেলেও কিছুদিন পর্য্যন্ত তাহাকে বিশেষ নিয়মে রাখিতে হইবে। শিশু যদি কেবল স্তনদুগ্ধ খাইয়া দিনযাপন করে, তবে তাহার স্তন্যদাত্রী জননীকে উদরাময়োক্ত পথ্যাদি সেবন করিতে হইবে। আর যদি শিশুকে গোদুগ্ধ খাওয়ান অভ্যাস করান হইয়া থাকে, তবে—গোদুগ্ধে সমান পরিমাণে জল ও খানকতক বেল-শুঁঠ, শুঁঠ ও যোয়ান ন্যাকড়ার পুটুলীতে বাঁধিয়া ঐ সঙ্গে দিয়া মৃদুজ্বালে সিদ্ধ করিতে হইবে এবং দুগ্ধে একটু জল থাকিতে নামাইয়া ঐ দুগ্ধ কিছু ও তাহাতে পৃথকরূপে প্রস্তুত বার্লি বা এরারুট কিংবা শটীর পালো বা বৈএর মণ্ড মিশ্রিত করিয়া একটু একটু করিয়া সমস্ত দিনে খাওয়াইতে হইবে। এরূপ স্থলে মণ্ডের অপেক্ষা দুগ্ধের মাত্রা কম হওয়া আবশ্যক। তরল মলভেদ ও পিপাসা প্রভৃতি কম হইয়া গেলে, পথ্যের মণ্ড অপেক্ষাকৃত ঘন করিয়া খাইতে দিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

মানের-কান্না।

[অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত এম, এ]

(১)

ভাজনঘাট নিবাসী বৈষ্ণববংশোদ্ভব স্বর্গীয় কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয় "বিচিত্র-বিলাস" নামক একটী যাত্রার পালায় একটী কথোপকথনে বলিয়াছেন,—

"মান না আছে কার্ না,
তাতে কেন এত কান্না ?"

শ্রীমতী রাধিকার মানের দায়ে শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলে যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের অভাবে ক্রন্দন আরম্ভ করেন, তখন সখী ললিতা ঐ কথাটী বলিয়াছিলেন।

কান্না আরম্ভ হইয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হইল।

১নং কান্না।

"ভবানীপুরে প্রবীণশিয়াল কন্‌ফারেন্সের বৈঠক আজ বসিবে। এবার শিয়ালরাজা, আমাদের চিত্তপ্রিয় শ্রীমান চিত্তরঞ্জন দাস। শ্রীমান এবার বাঙ্গালা ভাষায় নিজের অভিভাষণ লিখিয়াছেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী দাদা মহাশয় বোধ হয় বাঙ্গালায় সমাগত-গণকে আপ্যায়ন জ্ঞাপন করিবেন। এই বৈশাখের

আমাদিগকে কেহ নিমন্ত্রণ করে নাই, উপস্থিত থাকিবার জন্ত অনুরোধ উপরোধও পাই নাই, অতএব প্রবীণ-শিয়াল সভায় হাজির থাকিতে হইবে না। কারণ শ্রীমান চিত্তরঞ্জন অনুরোধ করিলে আমরা সে অনুরোধ এড়াইতে পারিতাম না। ভায়া ভখন ভুলিয়াছেন, তখন বাঁচিয়াছি, ঘরের দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া নিদ্রা দিব। উহার পরে কেহ ধর-পাকড় করিতে আসিলে মান করিয়া বসিয়া থাকিব, কিছুতেই ঘরের বাহির হইব না। শ্রীমান চিত্তরঞ্জন কিংবা দাদা ব্যোমকেশ আমাদের ধরিয়া টানিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে কি হইবে! —দাদা সুরেন্দ্র নাথের নৈরেকায়েরও নিরাকারের দল, বাবু ভুপেন্দ্রনাথের চিরপ্রিয় পৃথ্বীশ প্রভৃতি আমাদের দুইজনকে—সুরেশ ও পাঁচুকে—দলে লইতে-চাহেন না, ফাঁকতালে আমাদিগকে বাদ দিতে পারিলে তাঁহারা ছাড়েন না। আমরাও দলাদলি করিতে বেজায় নারাজ। তাই যখন হালে পানী পায় না, তখন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত আস্তাকুড়ের ঝাঁটার মতন বাবুরা আমাদিগকে মাথায় তুলেন, তখন আমরা ধুলা ঝাড়িয়া দিই বটে, সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন বাবুর মুখে শতমুখীর প্রলেপ দিতে ভুলি না। এই হেতু তেলে জলে মিশ খায় না—আমরা চিরদিন দলের বাহিরেই রহিলাম।"

"নায়ক"—৯ই বৈশাখ।

মুলকথা,—প্রাদেশিক সমিতিতে অনাহুত বলিয়াই এই মানের কান্না। নহিলে এরূপ হইত না বলিয়াই মনে হয়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় দেখিতেছি রাস্তা ভুলিয়া নারিকেল গাছে উঠিয়া এখন আর নামিতে পারিতেছেন না!

২ নং কান্না।

মহারাজের ক্রোধ।

"বোধহয় মান্তবর মহারাজ স্তর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী আমাদের উপর খুব চটিয়াছেন, অথবা তাঁহার মোসাহেবের দল তাঁহাকে চটাইয়া তুলিয়াছে। প্রমাণ, তাঁহার কন্তার বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রের সমালোচনার পরে, মহারাজকুমারের বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র আমরা পাই নাই। ইহার পূর্ব্বে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের রাজবাটীর কোন শুভকর্ম্মে আমরা কখনই নিমন্ত্রণ পাইতাম না, একরকম ছিলাম ভাল। যত গোল ঘটাইয়াছে দীঘাপতিয়ার রাজা এবং কুমার শরৎকুমার। কলিকাতায় হিন্দু সমাজ মরিয়া আছে, একটা পচা মাংসের ঢিবি হইয়া আছে, নহিলে—সজীব সমাজ থাকিলে কলিকাতার কোন গৃহস্থ ব্রাহ্মণ-কায়স্থ মহারাজ নন্দীর এমন অসামাজিক নিমন্ত্রণ পত্র গ্রাহ্যই করিত না। এখন টাকায় শাসিত সমাজ, স্বর্ণগর্দ্দভে যাহা করিবে, যাহা বলিবে বাবু সমাজ তাহাই সহিবে। বিশেষতঃ বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই মধুচক্রে খোচা মারিয়া মধু সংগ্রহ করেন নাই, এমন মতলব-বাজ লোক কলিকাতায় বিরল আছে। ফলে, এক হিতবাদী ছাড়া আমাদের কথায় প্রতিধ্বনি আর কেহ করিল না। হিতবাদী যে এখনও ব্রাহ্মণ-শাসিত। কথাটা কি জান,—

—"জলপান করিয়া সুখী করিবেন"—নিমন্ত্রণ পত্রে মহারাজের এই উক্তিটি শিষ্টাচার-সম্মত হয় নাই। একত অনেক ব্রাহ্মণে তাঁহার বাটীতে জলপান করিবেই না; তাহাদিগকে এমন অনুরোধ করিলে তাহারা অপমানিত বোধ করিবেই। যে সকল ব্রাহ্মণে নবশাখের বাটীতে বিবাহাদি কার্য্যে জল পান করে, তাহাদিগকে কেবল পত্রাঘাতে জলপানের নিমন্ত্রণ করিলে তাহারা চটিবে। তাহাদিগকে জলপানের নিমন্ত্রণ করিতে হইলে স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ করা কর্ত্তব্য ছিল। কলিকাতার দক্ষিণ রাঢ়ীয় মুখ্‌খী কুলীন কায়স্থগণও এমন নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া এত বড় একটা সামাজিক কার্য্যে নবশাখের বাটীতে পাত পাতিয়া জলপান করিবেন না। তবে কথা এই, নিমন্ত্রণ করিতেছেন মান্তবর মহারাজ স্তর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর। তিনি ছাপার অক্ষরে, রাঙ্গা কাগজে ছাপাইয়া চিঠি পাঠাইয়াছেন, আর কি রক্ষা আছে —সবাই এ নিমন্ত্রন রক্ষা করিবে। মহারাজ 'তু'

বলিয়া ডাকিলেও লোকাভাব ঘটিত না। কিন্তু আবার বলিব, এমন নিমন্ত্রণ শিষ্টাচার সম্মত নহে, বাঙ্গালার ভদ্র সমাজের পরিচায়ক নহে।

নায়ক, ১৬ই বৈশাখ।

এই কান্নার পর মহারাজের বাড়ী হইতে নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছেন বলিয়া নায়ক সম্পাদক মহাশয় কবুল জবাব দিয়াছেন।

১নং কান্নার জের।

বাবু পলিটিক্স ও চিত্তরঞ্জন।

ইন্দ্রনাথ একবার আমাদের বলিয়াছিলেন যে, "ইংরাজী লেখাপড়ার প্রতাপে যে আসর বাঙ্গালায় গড়িয়া উঠিতেছে, সে আসরে খাঁটি বাঙ্গালা লিখিলে কেহ তোমার কথা বুঝিতে পারিবে না। কারণ খাঁটি বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন একেবারেই কমিয়া যাইতেছে! পুরাতন বাঙ্গালা শব্দের অর্থ আর বাঙ্গালীর ছেলে মনে রাখিতেছে না। অন্তে পরে কা কথা, ভারতচন্দ্র এবং দাশুরায়ই বাঙ্গালীর ছেলে মন দিয়া পড়ে না, তাঁহাদের লেখা তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করে না। তাহার উপর যদি খাঁটি বাঙ্গালী হিসাবে রসরঙ্গ কর, একটু উৎপ্রেক্ষা একটু ব্যজস্তুতি, একটু কাকুর উপর দ্ব্যর্থ চালাইতে চেষ্টা কর, তাহা হইলেই প্রমাদ ঘটিবে। যখন গোবিন্দ অধিকারী গান করিত, দাশুরায়ের পাঁচালী হইত, গোপাল উড়ের যাত্রা চলিত তখনকার বাঙ্গালীর ছেলে আমরা, আমরা গোড়ায় যাহা লিখিয়াছি, এখন তাহা লিখিতে পারি না। বিকায় না। হেমচন্দ্রের বাজী মাৎ, আমার ভারত উদ্ধার এখন আর চলে,না।"

গুরুদেব ইন্দ্রনাথ যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা খুব খাঁটি কথা। এখন বাঙ্গালা শব্দ যোজনা করিয়া ইংরেজি লিখিতে হইবে। এখনকার কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ গোটা বিলাতী ভাবকে বাঙ্গালী ঢঙ্গের—এখনকার বাবু-বাঙ্গালী ঢঙ্গের পোষাক পরাইয়া সমাজে ছাড়িতেছেন। ভবানীপুরের দাসকে করা হইল। আমরা ঐ সমাচার শুনিয়া একটু শিহরিয়া উঠিলাম। ভাবিলাম শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন খাঁটি বাঙ্গালী হইবার চেষ্টা করিতেছে, ভাবে ও ভাষায় পুরাণা কালের বাঙ্গালীর পথে চলিবার চেষ্টা করিতেছে, শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জনের এ উৎকট মান ত বাবু-সমাজে, বাবু রাজনীতিক্ষেত্রে বিকাইবে না। তবে চিত্তের প্রতি এ সমাদর কেন? এক ব্রাহ্ম বন্ধুর কাছে এই অঘটন ঘটনার একটা ব্যাখ্যা পাইলাম, তাহা এই,—

"সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের হিসাবে চিত্তরঞ্জন হাত ছাড়া হইয়াছে, তাহার উপার্জ্জিত অর্থ আর তেমন ভাবে সমাজের সেবায় লাগিবে না। সেই ভুল শোধরাইবার জন্ত রাজনীতির পথ দিয়া চিত্তরঞ্জনকে ঘুরাইয়া আনিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কারণ তুমি ত জান, সুরেন্দ্রনাথকে সম্মুখে রাখিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃগণ রাজনীতির পথ দিয়া নিজেদের প্রভাব দেশে বিস্তীর্ণ করিবার চেষ্টায় আছেন। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জনকে সেই কলে ফেলিয়া হাত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার অভিভাষণ শুনিয়া অনেক ব্রাহ্ম বাবুর চৈতন্যোদয় হইয়াছে। তাই তাহাদের একজন তাড়াতাড়ি তোমার কাছে যাইয়া বলিয়া আসিয়াছিল যে, চিত্তরঞ্জন প্রাদেশিক সমিতির সকল ব্যয় ভার বহন করিবে বলিয়া রাজী হওয়াতে তাহাকে সভাপতি করা হইয়াছিল।" নায়ক, ১৭ই বৈশাখ।

ইন্দ্রনাথের শিষ্য মহাশয় ইন্দ্রনাথকে যে চক্ষে দেখেন, সমাজ তাঁহাকে সে চক্ষে দেখেন নাই, একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। 'বঙ্গবাসী'র স্কন্ধে আরোহণ করিয়া তিনি যে হিন্দুয়ানীর চাল চালিয়াছেন, তাহা খাঁটী হিন্দুসমাজের অনুমোদিত নহে। ইন্দ্রনাথ খাঁটী হিন্দু ছিলেন কি? এক 'বঙ্গবাসী'র অনুষ্ঠিত বিষয় ব্যতীত অন্যত্র কোন সামাজিক অথবা রাজনীতিক কার্য্যে তিনি কল্কে পাইতেন কি? যাহাহউক, সম্পাদক

সাধারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, একথা বলিয়া লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার দিন আর নাই। সুতরাং এরূপ ভাবে শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা করা বৃথা। তাঁহাকে ত জনসাধারণ বেশ ভালরূপেই চিনিয়াছে। কিন্তু তাঁহার ভাবাটা চিনে নাই!

টীকা-টিপ্পনী।

মনুসংহিতা সম্বন্ধে সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ শাস্ত্রী উহার এক অভিনব সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। স্থানান্তরে তাহার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে। "মনুসংহিতা"র এরূপ সহজপাঠ্য সংস্করণ আর নাই। আমরা বৈদ্যসন্তান মাত্রকেই ইহার এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়া রাখিতে অনুরোধ করি।

বৈদ্যসন্তানের পদবীতে 'দাশ' শব্দের তালব্য 'শ' দেখিয়া নায়ক-সম্পাদক "বাঁশে"র ভয়ে ভীত হইয়াছেন! আমরা বলি,—কুচ্ পরোয়া নেই।—একটু শ্রম স্বীকার করিয়া ৫১ নং শিমলা ষ্ট্রীটে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিকট যাও, তিনি বাঁশের ভয় ঘুচাইয়া দিবেন, জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা শিখাইয়া চক্ষু ফুটাইয়াও দিতে পারিবেন।

'জাতীয়তার ঘোঁট' দেখিয়াও দেখিতেছি, 'নায়ক' আৎকে উঠিয়াছেন। শুধু আৎকে ওঠাইবা বলি কেন, কোথায় কে গোপনে কি "রোষ্ট-গোস্ত" উদরস্থ করিতেছেন, তিনি আবার তাহা মুখে করিয়া দশজনকে দেখাইতেছেন—জানাইতেছেন। ভায়ার এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন, বুঝি না! হাতে-মুখে খাঁটী ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় দিয়া কায়স্থ সোণার-বেনের সঙ্গে এক টেবিলে লুচি-তরকারী ভক্ষণে অসঙ্কোচ, নায়কসম্পাদক মহাশয় এরূপ ব্রাহ্মণও ত দেখিয়াছেন? এরূপভাবে 'শ্রীক্ষেত্র-ব্যবস্থা'যে বৈদ্যসন্তান পরিহার করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাহা ও তিনি ভুলেন নাই।

শাস্ত্রের সংজ্ঞানুযায়ী প্রকৃত ব্রাহ্মণ আজ কাল আছে বলিয়া বোধ হয় না। ব্রাহ্মণগন্ধবিশিষ্ট বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই যে তিনি ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র এ কথা বলে না। ব্রাহ্মণ জন্মগত হইতে পারে না, ক্রিয়াগত। সে ব্রাহ্মণ কোথায়? কৌলিক ক্রিয়াকলাপাদির অনুসরণ করিয়া, ব্রাহ্মণের অবশ্য-করণীয় কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিয়া—এম্, এ, বি এ পাশ করিলে, অথবা মুন্সেফী, ডেপুটীগিরি, কেরাণীগিরি কিংবা ওকালতী করিলে ব্রাহ্মণত্বের হানি হয় না। রকমওয়ারী সঙ্ না সাজিলে—অথবা কর্ত্তব্যে অনাস্থা বা অবহেলা প্রদর্শন না করিলেই জাতিরক্ষা হয়। যাঁহারা শাক্ দিয়া মাছ ঢাকা দিতে চান, এসব ঘোঁটাঘুটী তাহাদেরই খেলা!

চাতুর্ব্বর্ণ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহাদের সম্যক্ অভিজ্ঞতা না আছে, তিনি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলেও জাতি ও বর্ণ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা। অধুনা দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে যাঁহার সামান্য জ্ঞানও নাই—হিন্দুর শাস্ত্র গ্রন্থাদি যাঁহার নেত্রপথে পতিত হয় নাই, তিনিও হিন্দুর ধর্ম্ম, আচার নিষ্ঠা লইয়া কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না! গলায় যজ্ঞোপবীত, মাথায় টিকি, আর গায় নামাবলী,—এই ট্রেড্‌মার্ক থাকিলেই যে তিনি ব্রাহ্মণ, একথা স্বীকার করা যায় না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, ইহারাই ব্রাহ্মণ-ত্বের দাবী করিয়া সমাজের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইবার প্রয়াসী! আজকার দিনে মেকী চালান বড়ই শক্ত কথা। এখন সকলেই যে সেয়ানা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

স্থানান্তরে "চিকিৎসা-সমস্যা" শীর্ষক একটী প্রবন্ধের কিয়দংশ এবারে প্রকাশিত হইল, বারান্তরে অবশিষ্টাংশ প্রকাশিত হইবে। প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত জীবনকালী রায় বৈদ্যরত্ন বহরমপুরের একজন লোকপ্রিয় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক। ইনি কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠিত কবিরাজ বৈদ্যরত্ন শ্রীযুক্ত কালিদাস বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ভাগিনেয় এবং শিষ্য। কবিরাজ জীবনকালী রায় বিদ্বৎ-সভার একজন সভ্য। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধটী সময়োচিত এবং সাধারণের সমালোচনার বিষয়ীভূত বলিয়া ইহা প্রকাশিত হইল। আশা করি চিকিৎসা ব্যবসায়ী বৈদ্যসন্তানগণ প্রবন্ধের ঔচিত্যানুচিত্য সম্বন্ধে স্ব স্ব বক্তব্য ধন্বন্তরিতে প্রকাশার্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। প্রবন্ধোক্ত বিষয়গুলির সুমীমাংসা একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়াই ইহা অবিকল প্রকাশিত হইল। এসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পরে প্রকাশ করিব।

গত ২১শে ও ২২শে এপ্রিল ভবানীপুর হরিশ মুখার্জীর ষ্ট্রীটে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। স্বনামখ্যাত ব্যারিষ্টার বৈদ্যবংশসম্ভূত শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ গুপ্ত মহাশয় সভাপতির আসনগ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিবেশনের নির্দ্ধারিত দিনে আপীশাদি বন্ধ না থাকা সত্ত্বেও বঙ্গের যাবতীয় স্থান হইতে শিক্ষিত পদস্থ প্রতিনিধিগণ সমাগত হইয়া অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। এবারকার অধিবেশনে অনেকটা নূতনত্ব আছে। প্রথমতঃ সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ বাঙ্গালা ভাষায় পঠিত হইয়াছে। ইহা একটী শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে করিতে হয়। ইংরেজী শিক্ষাটা বাঙ্গালীর উপর এতটা আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে যে, আজকাল, আহারে-বিহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে আলাপ-আপ্যায়নে সর্ব্বত্রই ইংরেজীভাব, ইংরেজী বিষম সমস্যার স্থলে যে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের অধিনায়কত্বে মাতৃভাষার সম্মান রক্ষিত হইয়াছে, ইহা এক অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার বলিতে হইবে। যাহা হউক, ধন্বন্তরিতে অভিভাষণের সম্যক্ সমালোচনার স্থান হওয়া নিতান্ত অসম্ভব হইলেও আমরা বারান্তরে আবশ্যকীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমাদের মতামত প্রকাশ করিব। তবে এ সম্বন্ধে কোন মহাপ্রভু যে খুঁৎ বাহির করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, সেসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া রাখা উচিত।

অধিবেশনে উপস্থিত হইতে বলা হয় নাই বলিয়া জনৈক বাঙ্গালা সংবাদপত্র সম্পাদক অভিমানে আট-খানা হইয়াছেন। এই অভিমানটুকু চাপিয়া রাখা আর তাঁহার সামর্থ্যে কুলায় নাই! যখন কলিকাতায় ন্যাসন্যাল কংগ্রেশের প্রথম অধিবেশন হয়, তখন বঙ্গবাসী সম্পাদক কলকে পাইয়াছিলেন না বলিয়া ক্ষিপ্ত শৃগালবৎ উত্তেজিত হইয়াছিলেন, অদ্যাপি সে রোগ দূর হয় নাই। এই সম্পাদকটীও দেখিতেছি প্রায় তদ্রূপই হইবার উপক্রম হইয়াছেন। বলিতে কি, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় কন্‌ফারেন্সের সমস্ত ব্যয় বহন করিয়া সভাপতিত্ব লাভ করিয়াছেন, এরূপ অমূলক কথা প্রকাশ করিতে তিনি লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করেন নাই! অমূলক অথবা ভিত্তিহীন কথা অবলম্বনপূর্ব্বক একটা হৈ চৈ করিয়া লজ্জাহীনতা প্রদর্শন করায় যে তাঁহার একচেটিয়া অধিকার, এই সুখ্যাতি তাঁহার চিরকালই আছে। নির্লজ্জতার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ বশতঃ তিনি এজীবনে অনৃতবাদিতার মায়া ত্যাগ করিতে প্যারিলেন না। সাধু! সাধু!!

বলিতে পারিনা, এই মহাপুরুষ সত্যবাদিতার প্রতি এতটা হতশ্রদ্ধ কেন,—অকারণের মানীর

এতটা আমোদ উপভোগ করিতে প্রয়াসীইবা কেন! শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় বিলাত প্রত্যাগত হইলেও, স্বজাতির প্রতি, স্বধর্ম্মের প্রতি এবং দেশের জনসাধারণের প্রতি তাঁহার যেরূপ অনুরাগ, এবং প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনের অভিভাষণে সেই অনুরাগের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিয়াও যে মহাপুরুষ 'ইংরাজি শিক্ষিত বাবু" বলিয়া তাঁহার প্রতি উপহাসের বাণ নিক্ষেপ করিতে অকুণ্ঠিত, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবার ভাষা আমাদের নাই। চিত্তরঞ্জন বিলাত প্রত্যাগত বারিষ্টার, ব্যবসাক্ষেত্রে তাঁহার পসার প্রতিপত্তি অতুলনীয়; তাহার সমশ্রেণীর ব্যবসায়ীগণের মধ্যে তাঁহার ন্যায় স্বধর্ম্মনিরত, স্বজাতিবৎসল এবং পরদুঃখকাতর লোক খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। পানভোজনে, বিলাসব্যসনে, পোষাক পরিচ্ছদে, তাঁহাকে হিন্দুবাঙ্গালী সন্তান বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ হয় না। তিনি মাতৃভাষার অকপট সেবক, সুকবি ও সুসাহিত্যিক। বিলাতপ্রত্যাগত বাঙ্গালী সন্তানদিগের মধ্যে মাতৃভাষার অনুরাগী বলিতে হইলে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এবং শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহোদয়ের নামই উল্লেখ করিতে হয়। ইঁহারা উভয়েই বৈদ্যবংশ সম্ভূত।

চিত্তরঞ্জন ক্ষমাশীল এবং দাতা। যিনি এতগুলি সদ্‌গুণের আধার, যাঁহার চরিত্র অনুকরণীয় বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে, প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে এ হেন মনীষীকে নেতৃত্ব প্রদান করিয়া দেশের লোক প্রকৃত গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু যে বাঙ্গালা সংবাদপত্র সম্পাদক সমিতির অধিবেশনে উপেক্ষিত হইয়া এ হেন মনীষীকে আক্রমণ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করেন না, তাঁহার মনুষ্যত্বের সত্তা স্বীকার করা মহা পাপ। ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া যাহারা এ হেন আদর্শচরিত ব্যক্তির নিন্দাবাদে অসঙ্কোচ, তাহারা সমাজের বর্জ্জনীয়, একথা বলিলেও ধৃষ্টতা প্রকাশ পায় না। চিত্তরঞ্জনের অভিভাষণে গোঁড়ামীর লেশমাত্র পরিলক্ষিত হয় না; কিন্তু যিনি তাঁহার অভিভাষণের দোষ প্রদর্শন করিতে যাইয়া হিন্দুত্বের গোঁড়ামী প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহার নিজের আচরণে জাতীয় কর্ত্তব্য কতটা প্রতিপালিত হইতেছে, জাতি ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা তাঁহা দ্বারা কি পরিমাণে রক্ষা পাইতেছে, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার সামর্থ্য অথবা অবকাশ তাঁহার থাকিলে, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে নিশ্চয়ই লজ্জাবোধ করিতেন।

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ভুয়ামানের প্রত্যাশায় কোন কার্য্য করিতে অভ্যস্ত নহেন। ব্যবহারাজীবের আসনে আসীন থাকিয়া তিনি যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নহে। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার ফলেই আজ দেশের লোকে তাঁহাকে তাঁহার যোগ্য পদে বরণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তাই বলিতে ইচ্ছা হয়, যাঁহারা তাঁহাকে এহেন সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহারা তোমা ও আমা অপেক্ষা হীনবুদ্ধি নহেন। সামান্য রজতখণ্ডের বিনিময়ে তাঁহারা দিবা ও রাত্রিতে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিতে শিখেন নাই। তাঁহারা যবনিকার অন্তরালে অভক্ষ্য ভক্ষণ করতঃ প্রকাশ্যে সতী সাজিবার উদ্দেশ্যে উপবীত এবং টিকী ট্রেডমার্কার অনুবলে ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াসীও নহেন। তাঁহাদের লুকোচুরী—সদর, মফস্বলী নাই, সব খোলাসা। অবস্থা যখন এরূপ, তখন সত্য মিথ্যা বিচার না করিয়া একটা বাজে হৈ চৈ করাটা অপদার্থের কার্য্য বলিয়া লোকে মনে করে।

ধন্বন্তরি।

মাসিক পত্র।

২য় বর্ষ, } জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪, ইং ১৯১৭ মে, জুন, { ৮ম সংখ্যা

প্রতীক্ষায়।

[শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় ব্যাকরণতীর্থ।]

সারাটি দিন ধ'রে বসিয়া পথ ধারে
যাপিনু, জীবনটী ভাবিয়া সুখময়!
রহিনু কত আশে তাহারি তরে ব'সে
ভাসিনু অবশেষে
নয়ন নীরে হায়॥

মনে তো করেছিনু আসিবে এই পথে,
কহিব কত কথা শুনাব মন সাথে,
হেরিয়া কাতরতা এলনা, লাগে ব্যাথা
নিবিড় নিরাশায়
কোমল এ হিয়ায়॥

কণক আসন গো নিভৃতে রাখি পাতি'
রাখিনু সযতনে মতির মালা গাঁথি
কত না উপহার সাজা'নু তরে তার
এল না একবার
সকলি বৃথা যায়॥

বুঝি বা অবহেলে এল না এই পথে
অথবা গেছে চ'লে হেরিয়া দুর হ'তে
যদি সে আসে পথে ধরিব তার পদে
সাধের মতি মালা
ছিঁড়িয়া দিব পায়॥

আসিব ব'লেছিল গোপন পথ দিয়া
লইবে সাথে যোজে, এখনো নাচে হিয়া
ভাবিয়া তার কথা ভুলিনু সব ব্যথা
আসিবে নেবে সাথে
রহিনু প্রতীক্ষায়॥

নববর্ষের নূতন খাতা। *

[শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী কবিরাজ।]

দেখিতে দেখিতে জীর্ণ পত্রের মত পুরাতন একটী বৎসর খসিয়া পড়িল,—আবার নূতনসাজে নববর্ষের আবির্ভাব হইল! ব্যবসায়ীর ঘরে লাল-খেরো'-মোড়া নূতনখাতা, আর গাছে গাছে রাঙ্গা রাঙ্গা নবীন পাতা, এই দুইটীই যেন নববর্ষের উৎসব-পতাকা। এদেশে নববর্ষের উৎসব, শুধু

---

* গত মাসে নূতন খাতার উৎসব-উল্লাসে পুরাণ খাতার অভিমান করিবার অবসর হয় নাই। সেই জন্য এই

ব্যবসায়ীর ঘরেই সীমাবদ্ধ! কেহ বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য, কেহ নূতন গ্রাহক পাইবার আশায়, কেহ বা বাকী পাওনা আদায়ের অভিপ্রায়ে,—যে উদ্দেশ্যেই হউক, প্রায় সকল ব্যবসায়ীই এদেশে নূতনখাতার উৎসব করে। অন্য দেশের মত এদেশে সাধারণের সহিত এই উৎসবের কোন সংস্রব নাই। তবে ভাবিয়া দেখিলে, এখনকার কালের সকল মানুষকেই যেন ব্যবসায়ী বলা যায়। যে কাজ লাভের আশায় অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই তো ব্যবসায়? পিতামাতা পুত্র পালন করেন,শেষবয়সে প্রতিপালিত হইবার আশায়! পুত্রের অন্নাশন-উপনয়ন উৎসব, নিমন্ত্রিতের নিকট কিঞ্চিৎ আদায়ের প্রত্যাশায়! পুত্রের বিবাহ দেওয়া তো এদেশের একটা বিরাট ব্যবসায়! দুই খানি করিয়া হাত-পা থাকিলেই সে পুত্রের দাম এখন হাজার টাকা। হা বিধাতঃ! মানুষ তো পক্ষী নহে, তবে তা'দের দু'খানির অধিক পা না দিয়া, এত ক্ষতি কেন করিলে প্রভু? হাত-পায়ের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপায় যাহাদের লেজ গজাইয়াছে, তাহাদের দর আবার লেজের প্রতি গাঁটের উপর হাজার—দু'হাজার বেশী! সুতরাং মানুষমাত্রেই এখন এই সাধারণ ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভবান্!

লাভ তো যথেষ্ট হইতেছে! কিন্তু কন্যার দায়ে যখন সেই লাভের অতিরিক্ত অর্থ পরের পায়ে ঢালিয়া দিতে হয়, তখন বরপণের লাভটাকে আর সত্যই লাভ বলা যায় কিনা, সে কথা কেহ এবার নূতন খাতায় খতিয়ান তুলিবার সময় খতাইয়া দেখিয়াছেন কি? কন্যার দায়ে খরচ নাই, কেবল পুত্রের ব্যবসায়ে লাভ করিতেছেন,এমন ভাগ্যবান জগতে অতি বিরল বলিয়াই, তাঁহাদের কোন কথা তুলিবার প্রয়োজন বুঝিলাম না। কিন্তু যাঁহারা লাভ-লোকসানের অনুপাত এইরূপ সমান ভাগে ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে একবার ইহা ভাবিয়া দেখিতে বলা উচিত নহে কি? সেই সঙ্গে গ্রহণে যদি শুক্রবিক্রয়ের মহাপাতক হয়, তবে পুত্রপণ লইলে সেই মহাপাপ স্পর্শ করিবে না কেন?

কেবল পুত্রের ব্যবসায় নহে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বর্গেরও একটা না একটার ব্যবসায় না করে কে? ধর্ম্মের ব্যবসায়ে হাতে হাতে লাভ নাই দেখিয়া, যদিও অনেকে তাহা তুলিয়া দিয়াছেন, তথাপি সৌখীন ব্যবসায়ী সখের ধর্ম্ম-ব্যবসায় তো আজিও ছাড়িতে পারেন নাই! সখের কাজে নাকি লাভ-লোকসানের হিসাব থাকে না। তাই সখের ধর্ম্মব্যবসায়ী, সভা-সমিতি-সঙ্ঘ-সম্মেলন কত কিসের ধুমধাম করিয়া, কত হাজার হাজার টাকা হাসিমুখে উড়াইয়া দিতেছেন। তাহাতে তাঁহাদের আপত্তিও নাই—বিরক্তিও দেখি না! কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত দীন-দরিদ্রকে একটী পয়সাও খাইতে দিয়া প্রকৃত ধর্ম্ম করিতে তিনি নিতান্তই ক্ষতি বোধ করেন! সখের ধার্ম্মিক, সখ করিয়া গেরুয়া পরেন, তিলক করেন, মালা জপেন! কেহ কেহ বা ধর্ম্মের ধ্বজা ঘাড়ে করিয়াও দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়ান! লাভের আশা—সাধারণের কাছে সুখ্যাতি পাইবেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—সে আশা পূর্ণ হইয়াছে কি? সারা জীবনের পুরাতন খাতা ঘাঁটিয়া, সখের ব্যবসায়ে কিছুমাত্রও লাভের অঙ্ক দেখিতে পাইলেন কি? পাইবেন কেন? যাহা হইবার নহে, তাহা হইবে কেন? শুধু বাহিরের বেশ-ভূষায় বা প্রণামী আদায়ের জন্য পূজার ঘটায়, কিংবা কেবল কঠোর বিধি-নিষেধ পালনেই যদি ধর্ম্ম হইত, তবে আর সংযম-সাধনার, প্রেম-করুণার প্রয়োজন কি? তাই বলিতেছি,—এবার নূতনখাতায় সেই হিসাবটা বুঝিয়া লেখ, সখের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়টাকে বৈরাগী কর, তবেই সখের ব্যবসায়ও বৃথা হইবে না;—সকল ক্ষতিই পূর্ণ হইবে!

অর্থের ব্যবসায়ে এখন আর কাহাকেও আমরা

ছিল, একের ব্যবসায় অন্যে করিলে জাতিচ্যুত হইত, সেকালেও এদেশের লোক বিরাট-ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া দেশ-দেশান্তর হইতে অর্থ সংগ্রহ করিত। সে তুলনায় এখন তো আমরা সবলুট্! ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ ছাড়িয়া, চামারের ব্যবসায় করিতেছে! চামার চামড়ার কাজ তুলিয়া, চণ্ডীপাঠ করিতেছে! পিরু খানসামার হোটেল প্রিয় মুখুয্যে কিনিয়া লইতেছেন! তিনু ভট্টাচার্য্যির পৈত্রিক টোলে ঘোষ-বংশধর পাঠ দিতেছেন! ধোবার ছেলে আফিসের বড়বাবু হইতেছে! আবার চাটুয্যেদের বড়বাবু 'ডাইং ক্লীনিং' আফিস খুলিতেছে! অর্থের আশাতেই তো এই অধঃপতন! ইহাই চরম নহে! কেহ কেবল কথার জোরেই হীরার দরে কাচ বেচিতেছে! কেহ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের সুদ—তস্য সুদ কষিয়া, গৃহস্থকে পথের ভিখারী করিতেছ! আবার কতজন একত্র 'যৌথ কারবার' খুলিয়া' শতজনের টাকা আত্মসাৎ করিতেছে! কোন ব্যবসায়ই তো কেহ আজ বাকী রাখি নাই! অর্থের ব্যবসায়ে অনর্থ ডাকিতেও ত্রুটী করি নাই! উকীল-বারিষ্টারের ভোগরাগে, মোক্তার-এটর্ণির পূজার দায়ে, পেয়াদা-বাক্সীর খোসামোদে, বা বিজ্ঞাপনের বাজে বাবদে অর্থব্যয়ও অল্প হয় নাই! কিন্তু হে অর্থলোভী, তাহাতে প্রকৃত লাভ কিছু করিতে পারিয়াছ কি? ব্যবসায় ছাড়িয়া, বাড়ী লইয়া যাইবার মত কিছু জমিল কিনা, একবার চাহিয়া দেখিয়াছ কি? বলিবে,—বাক্সে-সিন্দুকে বা ব্যাঙ্কে লোনে ছেলেপুলের জন্য অনেক রাখিয়াছি। রাখিয়াছ—রাখিতেছ সত্য, রাখিবার জন্য আত্মবঞ্চনা—পরপ্রতারণা, অনেক করিয়াছ—তাহাও মিথ্যা নহে। কিন্তু নিজের লাভ তাহাতে কি হইল, একবার ভাবিয়া দেখিলে না কেন? অর্থ সঙ্গে যায় না, তাহা তুমিও জান, আমিও জানি; কিন্তু অর্থ দিয়া কিছুও তুমি তোমার বিপুল অর্থের কিঞ্চিন্মাত্র দিয়া কিনিলে না কেন ভাই? তাহাই যে তোমার অর্থের ব্যবসায়ে প্রকৃত লাভ! নূতন খাতার এক একটী অঙ্কের পরে সারি সারি শূন্য বসাইয়া, অনেক লাভের আনন্দ পাইতেছ সন্দেহ নাই; কিন্তু সে সব শূন্য যে সত্য সত্যই শূন্য নহে, তাহা তোমায় কে বলিল? ভাবিলে বুঝিবে, শুধু শূন্যের দায়েই সারা জীবনটা তোমার শূন্য করিয়াছ! লাভের অঙ্ক নূতন খাতায় কিছুই তুলিতে পার নাই!

কামের ব্যবসায়ে আবার ততোধিক মজিয়াছ মনে করি। শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় কাম ও কামনা এক জিনিষ! আমরা কিন্তু দু'টীকে পৃথক্ বলিয়া জানি। কাম বাস্তব, আর কামনা যেন আকাশকুসুম! কাম উদ্দাম-উদ্ধত-দুষ্ট-দুরন্ত বলিয়া ব্যাকরণ তাহাকে পুংলিঙ্গ বলিয়াছে! আর কামনা, কামিনীর মতই মোহিনী—মনোরমা—লোভনীয়া-সুদুর্ল্লভা! তাই কামনা স্ত্রীলিঙ্গ! সে যাহা হউক, কামই বল, আর কামনাই বল, অর্থ ব্যতীত কাহারও উপভোগে তৃপ্তি হয় না। কামী, কামের ব্যবসায়ে অর্থব্যয়ে কাতর নহেন। কেহ সোণাগাছীতে নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া, দশ বিশ হাজার টাকা উৎসর্গ করিতেছেন! কেহ 'বাগানপার্টিতে' বিপুল উৎসব করিয়া আনন্দের স্রোতে হাজার হাজার টাকা ভাসাইয়া দিতেছেন! আবার কেহ বা তাঁহার কৃষ্ণপক্ষের সারা অঙ্গে সোণা মুড়িয়া দিয়া, বড় কীর্ত্তির বড়াই করিতেছেন! কিন্তু সকলেই বল দেখি ভাই, যে ব্যবসায়ে এত ব্যয়,—যাহার ফলে নিজের দেহ-প্রাণ অধঃপতিত করিয়া, মূলধন পর্য্যন্ত হারাইতে হইয়াছে, তাহারও কি লাভ-লোকসানের হিসাব আজিও বুঝিতে বাকি আছে? সে ব্যবসায়ের আর নূতনখাতা করিয়া কাজ নাই। ব্যবসায় তুলিয়া দাও, এখনও বাঁচিতে পারিবে। কামের মত কামনার ব্যবসায়ে অর্থব্যয় করিতে

সৌধে শুইয়া রাজপ্রাসাদের, ছ্যাক্ড়া গাড়ীতে চড়িয়া 'মোটর কারের', বা ছ্যাঁড়া কাঁথায় বসিয়া লাখটাকার কল্পনায়, যে ভবিষ্যৎ সুখস্বপ্নের ঘোরে বর্ত্তমান হারাইয়াছ, তাহাতেও তো তোমার ক্ষতি কম হয় নাই! কিন্তু সে ক্ষতির পরিবর্ত্তে কি লাভ হইল, এই নূতনখাতায় তাহারও একটা হিসাব বুঝিয়া দেখিলে না কেন? এখনও দেখ—সাবধান হও, এখনও ব্যবসায় তুলিয়া ব্যবসাদারী ছাড়িলে মঙ্গল হইবে সন্দেহ নাই।

মোক্ষের ব্যবসায়তো একবারেই ঘুচিয়া গিয়াছে। তাহাতে যে আরাম নাই—আনন্দ নাই উৎসবও নাই! আছে কেবল ত্যাগ! ত্যাগ তো একালের ভোগী মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে! তাই মোক্ষের ব্যবসায় এ সংসার হইতে উঠিয়া গিয়াছে। যাহার ব্যবসায় নাই, তাহার নূতন খাতারও আবশ্যক নাই। সুতরাং তাহার আলোচনা-বিবেচনাও অনাবশ্যক।

এখন তুমি ধন্বন্তরি! বুঝাইয়া বল দেখি,—এই যে দুই বৎসর ধরিয়া উৎসন্ন বৈদ্যসন্তানের সংস্কার-সুবিধার জন্য তুমি এত চেষ্টা করিয়া আসিতেছ, তোমার সেই ব্যবসায়ের কোন লাভ এবার নূতনখাতায় তুলিতে পারিয়াছ কি? অনেক মেম্বর-গ্রাহক পাইয়া, তোমার অর্থাগম অধিক হইয়া থাকিতে পারে, অথবা অনেকে এক আধ টাকাও স্বজাতির কল্যাণার্থ দিতে আপত্তি করায় তোমার আর্থিক আয় কমিয়া যাইতে পারে, সে কথা আমার জানিবার প্রয়োজন নাই। আমার জিজ্ঞাস্য,—যে উদ্দেশ্যে তোমার আবির্ভাব, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও তুমি সফল করিতে পারিয়াছ কি? যে বরপণের বিরুদ্ধে আজন্ম চিৎকার করিতেছ, তোমার একটী সভ্য—একজন গ্রাহকও সে কথায় কর্ণপাত করিয়া, বরপণ গ্রহণে বিরত হইয়াছেন কি? স্বজাতির কদাচারে ও স্বজাতির অধঃপাতে ব্যথিত হইয়া, তাঁহাদের পূর্ব্বগৌরব পুনরুদ্ধারের আলোচনা করিয়াছ, তাহাতে কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিয়াছ কি? বৈদ্যবালকের সচ্চরিত্রতা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় বোর্ডিং প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহাতেই বা কতটুকু অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছ? এ সব বিষয়ের কোন লাভ যদি এ বৎসরের নূতন খাতায় উঠিয়া না থাকে, তবে তোমারও ব্যবসায় যে বৃথা হইল তাই!

বলিবে,—বঙ্গে সে বৈদ্যসন্তান আর নাই! বৈদ্যের স্বজাতিবাৎসল্য এখন গল্পের বিষয়! আমিও বলিতেছি—সে কথা অতি সত্য। বৈদ্যের জন্য একটী বৈদ্যেরও প্রাণ আর কাঁদিয়া উঠে না। স্বজাতি দূরের কথা, স্বজনের জন্যও বৈদ্যসন্তান আর মনোযোগী নহেন। কিন্তু তাই বলিয়া তোমার হতাশ হওয়া চলিবেনা। বৈদ্যের বৈদ্যত্ব তোমাকেই আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে। মিষ্ট কথায়, বা রুক্ষভাষে, যাঁহাকে যতটুকু তাঁহার অধঃপতনের কথা জানাইতে পারিয়াছ, তাহাই তোমার নূতন খাতায় লাভের অঙ্ক জানিবে। সৎকার্য্যের ভগবান সহায়। উদ্যম থাকিলে, অল্প দিনে না হউক বহুদিনেও তোমার সকল সঙ্কল্প অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। তখন সারা জগৎ মুক্তকণ্ঠে বলিবে,—তোমার ব্যবসায় ব্যর্থ নহে, সার্থক হইয়াছে।

কালিদাস ও টীকাকার।

(অধ্যাপক শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী, এম্, এ)

(১) "যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা"

মহাকবি কালিদাসের "সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ" বেশ বুঝিতে পারি, কিন্তু "যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা" কোনও টীকাকারের টীকা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম না। বোম্বাই হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত টোলের বা ইয়ুনিভার্সিটির ছাত্রদিগের উপযোগী 'অভিজ্ঞান শকুন্তল'-নাটকের যতগুলি সংস্করণ ছাপা হইয়াছে, কোন খানিতেই উহার প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করা হয় নাই। কলিকাতার শ্রীযুক্ত এস্ রায়, ঢাকার শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয়, বোম্বাইয়ের রাঘবভট্ট, ট্রিভেণ্ড্রামের রাজারাম, কলিকাতা সংস্কৃতকলেজের পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর ও প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, পূর্ব্বস্থলীর কৃষ্ণনাথ তর্কপঞ্চানন—কেহই এই বাক্যাংশের প্রকৃত অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই, ইহা কম আশ্চর্য্যের কথা নহে!

তারপর, ছোট বড় যেখানে যে পণ্ডিতের কাছেই যাও, ঐ একই কথা। সকলেরই ব্যাখ্যা "যাহা স্রষ্টার প্রথম সৃষ্টি" এবং সঙ্গে সঙ্গে মনুর "অপ এব সসর্জ্জাদৌ" এই অংশটুকু উদ্ধার করিয়া ঐ ব্যাখ্যার সমর্থন! কেহ এতটুকু অনুসন্ধান করিয়াও দেখেন না যে, মনুর মুখ হইতে তাঁহারা যে কথা বাহির করাইতে চাহেন, মনু কদাচ তাহা বলেন নাই। মনু স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ একটি অধ্যায় প্রণয়ন করিবার পরেও, ভবিষ্যৎ দিগ্‌গজ পণ্ডিতগণ, "অপ্ স্রষ্টার প্রথম সৃষ্ট বস্তু" এই কথা মনু বলিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিতে অণুমাত্র দ্বিধা বোধ করিবেন না! পাঠক মহাশয়কে বলিয়া রাখি, মনুর মতে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা (স্রষ্টা) আকাশ, বায়ু, অগ্নি ও অপের সৃষ্টি না করিলেও, তিনি ব্রহ্ম হইতে তাদৃশ তত্ত্বান্তর আমরা তাঁহাকেও অবাদির সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। কিন্তু এই "স্রষ্টু" নাম লইয়া বিবাদ নহে। অপের 'আদ্যত্ব' লইয়াই আমাদের এই সমালোচনা।

যিনি মনুসংহিতা ভাল করিয়া পড়িয়াছেন, তিনিই অবগত আছেন যে, "আদৌ" শব্দটি ঐ স্থলে (মনু, ১।৮) 'পরবর্ত্তী কালে কৃত পৃথিবী-সৃষ্টির আদিতে' অর্থাৎ "পৃথিবীর পূর্ব্বে" এই অর্থে বলা হইয়াছে, "সর্ব্বাদৌ বা সকলের আদিতে" এ অর্থে বলা হয় নাই। কুল্লূক এস্থলে কি বলিয়াছেন দেখুন, "আদৌ স্বকার্য্যভূমিব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টেঃ প্রাক্। অপাং সৃষ্টিশ্চ ইয়ং মহদহঙ্কারতন্মাত্র ক্রমেণ বোদ্ধব্যা, মহাভূতাদি ব্যঞ্জয়ন্ ইতি পূর্ব্বাভিধানাৎ, অনন্তরম্ অপি মহদাদিসৃষ্টেঃ বক্ষ্যমাণত্বাৎ।" মনু প্রথম অধ্যায়ের ৬-৮, ১৪-১৫, এবং ৭৪-৭৮ শ্লোকে ঐ মহদাদিক্রমে সৃষ্টি এবং আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ্ এবং অপ্ হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি বলিয়াছেন।

সৃষ্টিক্রম একরূপ। উহার বিকল্প অসম্ভব। দ্বিদলা বা ত্রিদলা দূর্ব্বাদির ন্যায় বিভিন্ন প্রকারের সৃষ্টি বলা যাইতে পারে না। ব্রহ্মসূত্র, শঙ্করভাষ্য, দ্বিতীয় পাদ, তৃতীয় অধ্যায়, ১-১১ সূত্র-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

তৈত্তিরীয়োপনিষদে দেখিতে পাই—"তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাৎ বায়ুঃ, বায়োঃ অগ্নিঃ, অগ্নেঃ আপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী"। ইহাই অব্যাহত শ্রৌত সৃষ্টিক্রম। এখন যদি কেহ বলেন, তবে 'তৎ তেজঃ অসৃজত', 'তস্য অর্চতঃ আপঃ অজায়ন্ত' ইত্যাদি বাক্যের কিরূপ গতি

হইবে? ইহার স্পষ্ট উত্তর শঙ্কর দিয়াছেন,—"এ সকল স্থলে আকাশাদিক্রমেই সৃষ্টি বুঝিতে হইবে, তেজ কি অপ্ 'সর্ব্বাদিতে' সৃষ্টি হইয়াছিল, এরূপ অর্থ-প্রতিপাদক কোনও শব্দ এখানে নাই। যিনি আকাশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনিই বায়ু, বহ্নি, অপ্ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সুতরাং "তৎ তেজঃ বলিলে কোনও বিরুদ্ধ কথা বলা হয় না। যদি কোনও পাচক পূর্ব্বে ভাত রাঁধে, এবং পরে মাছের ঝোল রাঁধিয়া শেষে পায়স প্রস্তুত করে, তাহা হইলে "অমুক পায়স করিয়াছে" বলিলে, সে ভাত ও ঝোল রাঁধে নাই, বুঝায় কি? না, পায়স 'সর্ব্বাগ্রে' রাঁধিয়াছে বুঝায়? এবং সেই পাচক "ভাত রাঁধিয়া 'আগে' ঝোল রাঁধিয়াছিল", বলিলে, পায়সের অগ্রে ঝোল রাঁধিয়াছিল, বুঝাইবে, না, সর্ব্বাগ্রে ভাতেরও পূর্ব্বে ঝোল রাঁধিয়াছিল, এই বিরুদ্ধ প্রতীতি হইবে?" অথবা, ভাতের কথা বলিবার আবশ্যকতা না থাকায়, কেবলমাত্র "অমুখ আগে ঝোল রাঁধিয়াছিল" বলিলেই, 'পায়সের পূর্ব্বে' না বুঝিয়া 'ভাতের ও পূর্ব্বে' এইরূপ উল্টা বুঝিতে হইবে? (ব্রহ্মসূত্র, ২পাদ, ৩য় অধ্যায়, সূত্র ১-১১)।

তস্য অর্চ্চতঃ আপঃ অজায়ন্ত"—বৃহদারণ্যকের এই বাক্যের শাঙ্করভাষ্য এইরূপ—"তস্য অর্চ্চতঃ আপঃ রসাত্মিকা অজায়ন্ত। অত্র আকাশ-প্রভৃতীনাম্ ত্রয়াণাম্ উৎপত্ত্যনন্তরম্ ইতি বক্তব্যম্, শ্রুত্যন্তরসামর্থ্যাৎ বিকল্পাসম্ভবাৎ চ সৃষ্টিক্রমস্য।"

"ততো রাত্রিরজায়ত, ততঃ সমুদ্রঃ অর্ণবঃ" —ঋক্ সং; "আপো বা ইদম্ অগ্রে—সলিলম্ আসীৎ"—তৈ, ব্রা, ১।১।৩, ঐ—তৈ, সং, ৭।১।৫—ইত্যাদি যত বাক্যই থাকুক না, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যার পর আর কাহাকেও উহাদের সামঞ্জস্য পূর্ব্বক সদর্থ করিতে কষ্ট পাইতে

ঐতরেয়োপনিষৎ দেখুন—"স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি॥ ১॥ স ইমান্ লোকান্ অসৃজত।" এই লোকসৃষ্টির পূর্ব্বেও সেই আকাশাদিক্রমে হইয়াছিল, ইহা ভুলিলে চলিবে না। তাই শঙ্কর শঙ্খনাদ পূর্ব্বক বলিতেছেন—"কান্ লোকান্ অসৃজত ইত্যাহ।............আকাশাদিক্রমেন অণ্ডমুৎপাদ্য.........লোকান্ অসৃজত।"

ভবিষ্যপুরাণে আছে—"সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষু বিবিধাঃ প্রজাঃ। অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ।" অগ্নিপুরাণে আছে—"ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ সিসৃক্ষু বিবিধাঃ প্রজাঃ। অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীর্য্যমবাসৃজৎ"; ব্রহ্মপুরাণেও ঐরূপ। মৎস্যপুরাণে আছে—"যঃ শরীরাৎ অভিধ্যায় সিসৃক্ষুর্বিবিধং জগৎ। অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ।" এইরূপে সকল পুরাণেই ঐ মনূক্তির প্রতিধ্বনি; সুতরাং সর্ব্বত্র আকাশাদিক্রমেই অপসৃষ্টি, ইহা বুঝিতে হইবে।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদসংহিতা ও ব্রাহ্মণের বিখ্যাত মন্ত্র "আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ"—ঐ "আগে ঝোল রাঁধার" মত। মনুর "অপ এব সসর্জ্জাদৌ" ও তাহাই। কারণ কোনও বাক্যই, তৈত্তিরীয়োপনিষৎ বাক্যের বিরুদ্ধ হইতে পারে না। কথাই আছে, "সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন যুজ্যতে।" মনু ত স্পষ্টই ৭৪—৭৮ শ্লোকে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং আমরা বেদ, উপনিষৎ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতির কোথা ও অপের 'আদ্যত্ব' দেখিতে পাইতেছি না। সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, স্থূল হইতে স্থূলতর ক্রমে জাগতিক পদার্থের বিকাশ, এরূপ ক্ষেত্রে অপের 'আদ্যত্ব' তর্কদ্বারাও নিরস্ত হইতেছে। আকাশের গুণ বায়ুতে, বায়ুর গুণ অগ্নিতে, অগ্নির গুণ অপে দৃষ্ট হয়, পরন্তু অপের রসবত্তা আকাশাদিতে দৃষ্ট হয় না। এস্থলে পঞ্চীকরণের বা ত্রিবৃৎকরণের কথা অপ্রাসঙ্গিক।

মহাশক্তি প্রথমে আকাশ (Ether) এবং

সূক্ষ্মতম অবস্থা হইতে ক্রমে ঘনীভূত অবস্থা হইতে থাকিলে, তেজ (Heat বা Light) আবির্ভূত হয়। আরও ঘনীভূত হইলে তরল জলীয় অবস্থা 'অপ্' (Liquid state) এবং শেষে কঠিন পৃথিবী (Solid) উৎপন্ন হয়। এস্থলে দেখা যাইতেছে, অমূর্ত্ত আকাশ ও বায়ুকে পরিত্যাগ করিলে মূর্ত্ত তিনটী দৃশ্য বা স্থূল ভূত—তেজ, অপ্ ও পৃথিবীর মধ্যে প্রকৃত পক্ষে 'অপ্'ই প্রথম ; কারণ তেজ বা তাপের পৃথক্ সত্তা নাই—"অগ্নেঃ পার্থিবং বা আপ্যং ধাতুম্ অনাশ্রিত্য ইতরভূতবৎ স্বাতন্ত্র্যেণ আত্মলাভো নাস্তি।" কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, যেখানে সকল মহাভূতের নামই একত্র পাশাপাশি উল্লিখিত হইয়াছে, সেখানে আকাশ, বায়ু ও অগ্নির 'আদ্যত্বের' দাবী অগ্রাহ্য করিয়া অপ্‌কে "আদ্যা সৃষ্টি" বলিয়া বর্ণনা করা অতীব অন্যায় হয়।

যদি বলেন, মনু যেমন 'পৃথিবীর পূর্ব্বে' বুঝাইতে 'আদৌ' পদ ব্যবহার করিয়াছেন, কালিদাস ও ত অবিকল সেই অর্থে 'আদ্যা' পদ ব্যবহার করিতে পারেন, সুতরাং বিশেষ দোষ কি ? তাহার উত্তরে ইহা বলা যায় যে, মনুবচনের মধ্যে 'আদৌ' শব্দটির যে বড় সাধু প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কেবল মাত্র "অপ এব সসর্জ্জাদৌ" শুনিলে সৃষ্টি-ক্রম সম্বন্ধে গুরুতর ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকে, আদ্যোপান্ত ধারাবাহিক বিবরণ শুনিলে তবে প্রকৃত অর্থ-গ্রহ হয়। এক্ষেত্রে মনুর বাক্যার্থের অনুকরণে কবি "যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা" লিখিয়াছেন, এরূপ বলা কদাচ সঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং মহাকবির স্কন্ধে ঈদৃশ দোষারোপ করিয়া টীকাকারগণ অতীব অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। বস্তুতঃ টীকাকারদিগের মনোমধ্যে মনুর "অপ এব সসর্জ্জাদৌ" সদাই জাগিতেছিল, কিন্তু উহার প্রকৃত অর্থ তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এইজন্যই টীকার মধ্যে ঈদৃশ ভ্রম হইয়া থাকিবে।

বর্গের প্রতি করুণাবশতঃ একটি একটি করিয়া সৃষ্ট বস্তুর নাম উল্লেখ পূর্ব্বক অনুলোমে ও প্রতিলোমে ধারাবাহিক সৃষ্টি বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন (প্রথম অধ্যায় শ্লোক ৬-৮, ১৪-১৫, ৭৪-৭৮) এবং উহারই একস্থলে (৮ম শ্লোকে) পৃথিবী সৃষ্টির পূর্ব্বে (এবং অগ্নিসৃষ্টির পরে) অপ সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা বুঝাইতে "অপ এব সসর্জ্জাদৌ" এরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু "কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রম্" বলিয়াই কি কাব্য-টীকাকারগণ একবাক্যে উহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না ? যা তা একটা অর্থ মনুর মুখ হইতে প্রকাশ করাইয়া নিজেদের টীকালেখা সার্থক করিলেন!

টীকাকর্ত্তারা দেখিলেন না যে, শকুন্তলার ঐ শ্লোকটিতে সমস্ত মহাভূতগুলি একে একে উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে বাপ্-দাদারা হাঁ করিয়া পড়িয়া রহিল, আর বাচ্চা অপ্ 'আদ্যা সৃষ্টি' হইয়া গেল, এ কেমন কথা ? অদ্যাপি অভিজ্ঞতার ভান করিয়া কেহ কেহ বলেন, মন্বাদির মতে 'অপ্' আদ্যা সৃষ্টি কিনা, তাই শ্লোকের—আদিতেই উহার উল্লেখ হইয়াছে ; কেহ বলেন—'নাটকীয় শ্রেষ্ঠবস্তু শকুন্তলাকে ইঙ্গিতে বুঝাইতে গিয়া প্রথমেই জলরূপা সৃষ্টির উল্লেখ করা হইয়াছে, কারণ জলই আদ্যা সৃষ্টি, এ কথা মনু বলিয়াছেন! পাঠক আরও দেখুন, এইস্থলে মহাভূতগুলিকে নামদ্বারা নির্দ্দেশ করা হয় নাই। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্, পৃথিবী—ইত্যাদি নামগ্রহণ না করিয়াও যাহাতে পাঠকের বা শ্রোতার বুঝিবার পক্ষে কষ্ট না হয়, এজন্য অগ্নির পরিবর্ত্তে "যাহা বিধিহুত হবিকে দেবতাদিগের নিকট বহন করিয়া লইয়া যায়", বায়ুর পরিবর্ত্তে "যাহাদ্বারা প্রাণিগণ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস করিয়া জীবিত আছে," আকাশের পরিবর্ত্তে "শব্দ যাহার গুণ" ইত্যাদি প্রকারে স্পষ্ট ভাষায় প্রৌঢ়োক্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন মহাভূতকে নির্দেশ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা ইহাই অনুমান হয় যে,

করিয়াছিলেন, যাহাতে লোকের মনে আর কোনও গোল থাকিতে না পায়, সকলেই নিঃসংশয়রূপে বুঝে যে অপ্‌কেই বুঝান হইতেছে। কিন্তু টীকাকারদিগের বুদ্ধির বাহাদুরি দেখিলেন, উঁহারা "অপ্‌ সকলের আদিতে সৃষ্ট হইয়াছিল" এই মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিয়া, সকলকে বিশ্বাস করাইতে চাহেন, যে, কালিদাস ঠিক শাস্ত্রানুযায়ী সত্য কথাই লিখিয়াছেন!

আমরা বলি, শকুন্তলারূপ নাটকীয়-বস্তুর সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন হওয়াতে, এবং অপ্‌ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকাতে অপ্‌কে "যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা" বলিয়া বর্ণনা করা কবির পক্ষে যথার্থই সঙ্গত হইয়াছে। "স্রষ্টারও পূর্ব্বেতে ছিল যেই সৃষ্ট বস্তু!"—ইহা কবিজনোচিত অলঙ্কারগর্ভ বাক্য—বিরোধাভাসের নিদর্শন। স্রষ্টার পূর্ব্বে সৃষ্টবস্তুর বর্ত্তমান থাকা অসম্ভব; কিন্তু অপের সৃষ্টিকর্ত্তা ঐ স্রষ্টা ব্রহ্মা নহেন, অতএব বস্তুতঃ বিরোধ রহিল না। "স্রষ্টুঃ আদ্যা"র অর্থ 'স্রষ্টার অব্যবহিত পূর্ব্বে বর্ত্তমান, "স্রষ্টুরাদৌ ভবা, ততঃ প্রাক্‌ বর্ত্তমানা'—এইরূপ করিতেই হইবে।

পাঠক, স্মৃতি ও পুরাণাদির সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিলেই দেখিবেন, আকাশাদিক্রমে অপ্‌ উৎপন্ন হইলে, সেই অপে ব্রহ্মাণ্ডোৎপাদনক্ষম পরমেশ্বরের ইচ্ছারূপ বীজ নিহিত হইলে, তদীয় ইচ্ছায় ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণ্ড—সৃষ্টিকর্ত্তা ও চরাচর বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছিল। এই ব্যাপারটিই মহার্ণবে শয়ান নারায়ণের নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তিকথার বীজ।

সত্য বটে, কালিদাসের সময়ে ভাষ্যকার শঙ্করও ছিলেন না, শঙ্করের ভাষ্য ও ছিল না; কুল্লূকাদি মনুসংহিতার প্রসিদ্ধ টীকাকারগণ তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে লুক্কায়িত; কিন্তু তাই বলিয়া মহাকবির সৃষ্টিসম্বন্ধে ধারণা ভুল ছিল, ইহা বলা যায় না। হয় ত, তিনি যে সম্প্রদায়ের ছিলেন, তাহা শঙ্করাচার্য্যাদি কর্ত্তৃক ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া থাকিবে, কিন্তু যতক্ষণ আমরা কবির উক্তির অনুরূপ অন্বয় করিয়া সমর্থন করিতে পারিতেছি, ততক্ষণ তাঁহাকে শুদ্ধ সম্প্রদায়েরই মতাবলম্বী ধরিয়া লইব, এবং তিনি যে শঙ্করাদির ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে "অপ্‌ স্রষ্টার আদি সৃষ্ট বস্তু" বলেন নাই, ইহা জানিয়া তৃপ্তি অনুভব করিব। এ বিষয়ে কুমারসম্ভবের ২য় সর্গের ৫ম শ্লোক মহাকবির পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। দেবগণ চতুরানন ব্রহ্মার নিকটে গিয়া তাঁহার স্তুতি করিয়া বলিতেছেন,—"আপনি (ব্রহ্মরূপে) অভিধ্যান পূর্ব্বক যে অমোঘ বীজ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে এই চরাচর বিশ্ব; আমরা এবং বিশ্বস্রষ্টা আপনিও সেই ইচ্ছাবীজেরই ফল।" এস্থলে অপ্‌ বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল, বলা হইয়াছে; ঐ অপ্‌ হইতেই ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছিল। এক্ষণে আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে শাকুন্তল নাটকের যেসকল সংস্করণ বাহির হইবে, সেগুলিতে যেন এ বিষয়ের যথোচিত আলোচনা হয়। গতানুগতিকতার গড্ডলিকাস্রোতে যেন গ্রন্থকারগণ ভাসিয়া না যান। হিন্দুর অবশ্যজ্ঞাতব্য সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধে যেন ছাত্রদের ভুল ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া না হয়। বর্ত্তমানে শিক্ষার এতাদৃশী অধোগতি হইয়াছে, যে বলিবার কথা নয়। বেদ বেদান্তাদির রীতিমত অধ্যয়ন অধ্যাপনা ত পরিত্যক্তই হইয়াছে। স্মৃতি বিস্মৃতির অতল তলে নিমগ্ন। ভট্টাচার্য্যের ভ্রমপূর্ণ তত্ত্ব-কথাই এখন স্মার্ত্তের আর্ত্তি-হরণ করিতেছে। বিশ্বাস না হয়, যে কোনও কাব্য বা স্মৃতিতীর্থ ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করুন, "বাপু, বলিতে পার, কোন্‌ বস্তু প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছিল?" সে অমনই অম্লান বদনে উত্তর করিবে, "কেন, 'অপ্‌,—কালিদাসই ত বলিয়াছেন—"যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুঃ আদ্যা!" মনুসংহিতাতেও আছে—"অপ এব সসর্জ্জাদৌ ইত্যাদি"! পাঠক, যদি ঐ ছাত্র-

গম্ভীরস্বরে বলিবেন—"সন্ধ্যার মন্ত্রেই রহিয়াছে, "ততঃ সমুদ্রঃ অর্ণবঃ"—এটা আর বুঝ্‌তে পাচ্ছেন্ না? "'বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ' ওতে আর দোষ কি? তার পর, বাড়ীর সব ভাল ত?"

পরিশেষে বঙ্গদেশীয় তাবৎ অধ্যাপকমণ্ডলীর নিকট আমার বিনীত নিবেদন, অতঃপর তাঁহারা টীকাগুলির ভ্রম স্বীকার করিয়া কবিবাক্যের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করুন, অথবা, কবি কালিদাসও মনুর "অপ এব সসর্জ্জাদৌ" বাক্যের আপাত অর্থ দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়া, টীকাকারদিগের ন্যায় ভুল করিয়াছেন, এই দোষারোপ করিয়াও মন্বর্থের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করুন। স্মৃতি বা শ্রুতির অবমাননা বা অসদর্থ করিয়া যেন পাপ অর্জ্জন না করেন।

বৈদ্য সন্তানের অধঃপতন।

এখনকার এই ভীষণ জীবন-সংগ্রামের দিনেও, বৈদ্যগণ কোন হীনকর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন না, ইহাই তাঁহাদের প্রধান জাতীয় গৌরব। বৈদ্যসন্তান মাত্রই এই গৌরবগাথা সর্ব্বদা স্মরণ ও কীর্ত্তন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। কিন্তু কালের দোষে বা আদর্শের দোষে আমাদের সেই নিজস্ব গৌরবটুকু আর বুঝি রক্ষা পায় না! সহরের ধনি-সম্প্রদায় পয়সার জোরে যথেচ্ছাচারী হইয়াছেন, আচার-ব্যবহারের উপর বৃত্তি-ব্যবসায়েও জাতি-ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছেন! ইহা দুঃখের কারণ হইলেও বিস্ময়ের বিষয় নহে। কিন্তু যে দীন-দুর্ব্বল পল্লীসমাজকে আশ্রয় করিয়া আজিও জাতি-ধর্ম্ম জীবিত রহিয়াছে, সেখানেও যদি ঐরূপ দুষ্প্রবৃত্তি প্রবেশ লাভ করে, তবে তাহা সমস্ত বৈদ্যসন্তানেরই নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। বিশেষতঃ যে বাঁকুড়া জেলা আজিও সরলতার ও ধর্ম্মপ্রাণতার প্রধান ক্ষেত্র বলিয়া বাঙ্গালায় সুপরিচিত, সেই অনাবিল স্থান হইতেই পুনঃ পুনঃ আমরা নানা দুষ্কার্য্যের সংবাদ পাইয়া অতিমাত্র মর্ম্মাহত হইয়াছি। বাঁকুড়ার বৈদ্য প্রতারণা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে, ইহা বোধহয় বিশ্বাস করিতেও অনেকের প্রবৃত্তি হইবে না! কিন্তু যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে তো আর অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। পাঠকগণের অবগতির জন্য ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত বিগত মাঘ কি ফাল্গুন মাসে, ঠিক স্মরণ হইতেছেনা, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের নিকট একখানি প্রার্থনা পত্র আসিয়াছিল। তাহাতে সরলাবালা দেব্যা তাঁহার কন্যাদায়ের জন্য অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়া, বাঁকুড়ার উকীল শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয়ের নিকট সেই সাহায্য পাঠাইবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদনুসারে নগেন্দ্র বাবু বিপন্না বিধবার সাহায্যার্থ পাঁচটী টাকা উক্ত উকীল মহাশয়ের নিকট মনিঅর্ডার করিয়া, স্বজাতি বাৎসল্যের পরিচয় দিতে অবহেলা করেন নাই। ইহার কিছুদিন পরে প্রশংসিত উকীল মহাশয় সেই মণিঅর্ডারের টাকা ফেরৎ পাঠাইয়া, নগেন্দ্র বাবুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, আমরা এস্থলে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

মান্যবরেষু— বাঁকুড়া।
২৩—৩—১৭

সবিনয় নমস্কার নিবেদন মিদং

মহাশয় কিছুদিন পূর্ব্বে আপনি আমার নামে মনিঅর্ডার করিয়া ৫৲ টাকা পাঠাইয়াছিলেন। কেন যে টাকা পাঠাইয়াছিলেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। এক্ষণে অনুসন্ধানে কতক কতক জানিয়াছি যে, ঐ টাকা আপনি কোন দরিদ্রা স্ত্রীলোকের কন্যার বিবাহের সাহায্য জন্য পাঠাইয়া

করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অধিক জানিবার আবশ্যক নাই। আপনি মহানুভব বদান্য, আমাদের বৈদ্যসমাজের একজন শীর্ষস্থানীয়। আপনি আপনার কর্ত্তব্যই করিয়াছেন। এক্ষণে ঐ টাকা আমি প্রতারকের হস্তে না দিয়া আপনাকে ফিরাইয়া দিতেছি। আমি প্রতারণাকার্য্যে কোনরূপ সংস্পৃষ্ট ছিলাম না ও নাই। অধিক লেখা বাহুল্য। ইতি

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার মজুমদার।
বাঁকুড়া।

অতঃপর আমাদেরও অধিক লিখিবার কিছু নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,—দুর্ব্বৃত্তেরা তাহাদের প্রতারণার সুবিধার জন্য একটী সজ্জন-সম্মান-বিশিষ্ট ভদ্রলোকের নামও প্রচার করিতে সাহস করিয়াছে! ততোধিক বিস্ময়ের বিষয়,—ব্রজেন্দ্রবাবু ব্যবহারজীবী হইয়াও তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। এই ক্ষমা ধর্ম্মজীবনের অনুকূল হইতে পারে, কিন্তু সংসারী জীবের নিতান্তই ক্ষতিকারক। দুষ্টের দমনে উপেক্ষা করিলে, তাহারা এবং তজ্জাতীয় অন্য সকলে প্রশ্রয় পাইয়া জগতের অমঙ্গল করিবে সন্দেহ নাই। অতএব ব্রজেন্দ্র বাবুর নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ এই যে, তিনি অচিরাৎ প্রতারকদিগকে সমুচিত দণ্ড দিবার উপায় অবলম্বন করুন। পত্রের ভাষাতেই বুঝা যাইতেছে, তাহারা তাঁহার অপরিচিত নহে। কিন্তু তাহাদের প্রতি এইরূপ উপেক্ষা প্রদর্শন তাঁহার সম্মান-গৌরবের উপযুক্ত নহে। দণ্ডের বিবরণ আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা তাহা সাদরে পত্রস্থ করিব।

বৈদ্যসন্তানের অধঃপতনের অন্যরূপ দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন করিলেও সম্ভবতঃ এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ধন্বন্তরির পাঠকবর্গ অবশ্যই অবগত আছেন যে, বিদ্বৎসভার প্রস্তাবিত বিষয়গুলি বৈদ্যসাধারণের নিকট প্রচার, এবং তাহাতে বৈদ্য-[illegible] পত্রের অনুষ্ঠান সর্ব্বাগ্রে হইয়াছে। নানাবিধ উপায়ে দেশ-বিদেশের বৈদ্যসন্তানগণের নাম সংগ্রহ করিয়া গত ১৩২২ সালের কার্ত্তিক মাস হইতে তাঁহাদের নিকট ধন্বন্তরি পত্র প্রেরিত হইতেছে। ইহাতে অনেক বৈদ্যসন্তান বিদ্বৎসভার মেম্বর শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, কেহ কেহ বা ধন্বন্তরি পত্রের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া স্বজাতিপ্রীতির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু জনকয়েক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীর ব্যবহার দেখিয়া ইহাদিগকে কোন্ শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে, বুঝিতে পারা যায় না। আজ একটী সামান্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

দিনাজপুর-লাহিড়ীর স্বজাতিবৎসল ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন গুপ্ত বিদ্বৎসভার একজন অকপট সেবক; বৈদ্যজাতির উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিকল্পে তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা যথেষ্ট। তিনি দিনাজপুর সহরস্থ কালিতলা পল্লী নিবাসী জনকতক পদস্থ বৈদ্যসন্তানকে সভার সভ্যশ্রেণী করিবার আশায় ধন্বন্তরি পত্র প্রেরণ করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে একবৎসরের ঊর্দ্ধকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের নিকট ধন্বন্তরি প্রেরিত হইয়া আসিতেছে। যাঁহারা মাসিক চাঁদা বা ভিক্ষা দিয়া সভ্য হইতে অক্ষম অথবা অনিচ্ছুক, তাঁহারা ইহার বার্ষিক মূল্য ২৲ দুইটী টাকা দিয়া ধন্বন্তরির গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইলেও স্বজাতির হিতকল্পে সাহায্য করা হয়। যাঁহারা এক বৎসরের ঊর্দ্ধকালের মধ্যে পত্রিকা ফেরৎ না দিয়া যথারীতি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা যে মূল্যের দুইটী টাকা দিবেন, বিদ্বৎসভা তাহাদিগকে এতটুকু বিশ্বাস করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতে পারেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কার্য্যতঃ এই বিশ্বাস দুরাশায় পরিণত হইল! বৎসরান্তে যখন কেহই পত্রিকার মূল্য প্রেরণ করিলেন না, তখন অগত্যা বাধ্য হইয়া পত্রিকা ভিঃ পিতে পাঠান হইল, কিন্তু তাহার অধিকাংশই ফেরৎ হইল!

যাঁহারা ফেরৎ দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বি, এল উপাধিধারী উকীল, দুই এক-

জন ডাক্তারও আছেন; কিন্তু ইঁহারা কোন্ সমাজান্তর্ভুক্ত বৈদ্যসন্তান তাহা আমরা এখনও অবগত নহি। তবে ডাক্তার যোগেশচন্দ্র যাঁহাদিগকে মনোনয়ন করিয়াছিলেন,তাঁহারা যে বিশুদ্ধ-শোণিত বৈদ্যসমাজের বহির্ভূত, একথা মনে করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত ধৃষ্টতা। কিন্তু আমরা গত বৎসর হইতে দেখিতে পাইতেছি যে, বিদ্বৎসভা যে স্থানের বৈদ্যদিগকে অসবর্ণ-বিবাহ-দুষ্ট বলিয়া পরিহার করিতে সঙ্কল্পিত, সে সকল স্থানের বৈদ্যগণ বিদ্বৎসভায় যোগদান্ করিতে সমধিক সচেষ্ট। এই সকল স্থানের অনেক বৈদ্যসন্তান স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ধন্বন্তরির গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতেছেন, এবং বিদ্বৎসভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

যাঁহারা বিশুদ্ধ-শোণিত বৈদ্য বলিয়া গর্ব্বিত, তাঁহাদের পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যবহারের সহিত তুলনা করিতে গেলে, বিদ্বৎসভা যাঁহাদিগকে অসবর্ণ বিবাহ-দুষ্ট বলিয়া তফাৎ রাখিতে চান, এতদুভয়ের মধ্যে কাহাদিগকে স্বজাতিবৎসল বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে? খাঁটি বৈদ্যসন্তান বলিয়া অভিমানীদিগের এরূপ ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিলে ইহাই মনে করিতে হয় না কি যে, এই শ্রেণীর বৈদ্যসন্তানেরাই বৈদ্যসমাজের গৌরব রক্ষায় উদাসীন,—ইঁহারাই বৈদ্যসমাজের উন্নতির পরিপন্থী, এবং ইহারাই সমাজের প্রকৃত শত্রু।

কথাটা একটু রূঢ় হইল বলিয়া পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। এরূপ রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইলাম কেন, তাহার কৈফিয়ৎ দিতেছি। যে সকল বৈদ্যসন্তানকে বিদ্বৎসভার সদস্যরূপে আলিঙ্গন করিবার জন্য অনুষ্ঠাতৃবর্গ দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা সকলেই শিক্ষিত এবং পদস্থ, এবং দৈনিক 'দুইটী পয়সা' অর্থাৎ মাসিক 'একটী টাকা' অথবা দৈনিক'একটী পয়সা' অর্থাৎ মাসিক 'আট আনা' এই জাতীয় অনুষ্ঠানে ব্যয় করিতে সমর্থ। অন্ততঃ ধন্বন্তরির বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা, অর্থাৎ মাসিক 'এগারটী পয়সা' এই জাতীয় অনুষ্ঠানে ব্যয় করিতে কেহই অসমর্থ নহেন। সামর্থ্য সত্ত্বেও যাঁহারা এই সামান্য ত্যাগ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত, বৈদ্যসমাজের অধঃপতনের তাঁহারাই যে প্রধান উপাদান, একথা অকপটভাবে বলিলে কোন অপরাধ হয় না।

রাঢ় ও বঙ্গের কতিপয় স্বজাতিবৎসল বৈদ্যপ্রদত্ত মাসিক ভিক্ষায় সামান্য কয়টী বিধবা ও ছাত্রের যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য, এবং প্রচারোদ্দেশ্যে ধন্বন্তরির প্রচার চলিতেছে। ধন্বন্তরি প্রচারে ছাপার মূল্য কাগজ, দপ্তরী, একজন পিয়ন, আপীশ ভাড়া ও টিকিট অব্যতীত অপর কোন বাবদে এক কপর্দ্দকও ব্যয় হয় না,—সম্পাদক, কেরাণী, কার্য্যাধ্যক্ষ, লেখক প্রভৃতি সমস্তই অবৈতনিক। তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন কোন কোন বৈদ্যসন্তানের মনে হইতে পারে যে ইহা দ্বারা কেহ লাভবান হইতেছেন! যাঁহার অথবা যাঁহাদের মনে এরূপ ধারণা হইয়া থাকে, তিনি কিম্বা তাঁহারা ভ্রান্ত।

এইজন্যই উপসংহারে বলিতে ইচ্ছা হয় যে, যে কয়টী লোকের নিঃস্বার্থ-শ্রমে সমাজ সম্বন্ধে এই সামান্য চেষ্টাটুকু চলিতেছে,—সমাজের মঙ্গল হইবে আশা করিয়া যাঁহারা এতটা স্বার্থত্যাগ করিতেছেন, তাঁহাদের শ্রমলব্ধ অর্থ অবহেলায় যে সকল বৈদ্যসন্তান অপচয় করিতে অকুণ্ঠিত, সে সকল বৈদ্যসন্তান যে 'বৈদ্য' বলিয়া পরিচয় দিবার অযোগ্য, একথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ হইবে কেন?

৺কবি প্যারীমোহনের কুমারসম্ভব হইতে

হরতপোবনে মদন ও বসন্ত।

[অধ্যাপক শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী, এম্, এ]

বসন্ত জাঁকিয়া দল-বল নিয়া
হল সেথা অবিভূর্ত।
সরস হরষে মনোমত রসে
মাতিল সকল ভূত॥
কাম-ক্রিয়া যত হেরি বিপরীত
আকুল তাপসগণ।
ভাবে মনে মনে রাখিব কেমনে
সংযম অতুল ধন॥২৪
কোকিল ঝঙ্কার করি অনিবার
শাখায় শাখায় গায়।
মলয় পবন বহে অনুক্ষণ
জুড়া'য়ে তাপিত কায়॥ *
বসি সারি সারি যত শুক সারী
কূজনে হরিছে মন।
নাচিছে খঞ্জন বরণে অঞ্জন
নাচিছে হরিণগণ॥ *
চতুর্দ্দিকে সরোবর শতদলে শোভাকর
হংস-হংসী ক্রীড়া করে কত।
কিবা জলে কিবা স্থলে মদন-আদেশ চলে
কোথাও সে নহে প্রতিহত॥ *
ফুটে নানাজাতি ফুল আকুল বিহঙ্গকুল
জাতিকুল কে রাখিবে আর।
স্মর হৈল প্রতিকূল না পায় বিপদে কূল
বল-বুদ্ধি হৈল ছারখার॥ *
কুসুমপতন ছলে অবিরত মহীতলে
পড়ে যত তীক্ষ্ণ কামবাণ।
সৌরভে ব্যাপিল বন বিরহে দহিল মন
মুনিগণ ভুলিলেন ধ্যান॥ *
ভ্রমর গুঞ্জরে তায় ধনুর টঙ্কার প্রায়
শুনি মন কাঁপে উরঃস্থল।
বিবশ হইল কায় প্রাণে বাঁচা মহা দায়
প্রাণিগণ হইল বিহ্বল॥*
ভূতলে ভূচর যত কামে কৈল শির নত
বারিগর্ভে যত বারিচর।
বায়ুপথে ধায় যারা তারাও আপনা হারা
স্বরগেতে দেবতা কাতর॥ *
উত্তরে উত্তরা-পাশে যান রবি নব আশে
ত্যাগ করি দক্ষিণা-অয়ন।*
বুঝি সেই দুঃখ ভারী দক্ষিণা সহিতে নারি
ত্যজে নারী নিশ্বাস পবন॥
পরশি রবির কর হিমঘন নিরন্তর
হিমালয়ে গলে অবিরত।
উত্তরা উত্তরা-নারী অঙ্গে যেন স্বেদবারি
পতিসঙ্গে † হয় আবিভূর্ত॥২৫
তাপে তপ্ত হল দিন রজনীও হ'ল ক্ষীণ
যেন দ্বন্দ্ব করে পরস্পর।
সেই কালে কামানলে জীবগণ যায় জ্বলে
দিনে দিনে শীর্ণ কলেবর॥ *
ফুটিল অশোক ফুল শোভার নাহিক তুল
তরুদেহ কুসুমে ভরিল।
নূপুর শিঞ্জন আর পদাঘাত প্রমদার
কাব্য-কথা কাব্যেতে রহিল॥‡
রসাল মুকুল ধরে নব পত্রে শোভা করে
চূত যেন পক্ষযুত বাণ।¶

---

* উত্তরা ও দক্ষিণা দুটি দিক্। সূর্য্যের নিকট দুটি স্ত্রীর ন্যায়।

† প্রিয়স্পর্শে।

‡ বসন্তের প্রভাবেই অশোকতরু পুষ্পিত হইল; কবি-প্রসিদ্ধ প্রমদা-পদাঘাতের অপেক্ষা করিল না।

¶ রসাল—আম্র। আম্রমুকুল কামের প্রসিদ্ধ পুষ্পশর। আম্রতরুর নবীনপত্র উহার পক্ষ এবং ভ্রমর যেন নামাক্ষর। পূর্ব্বকালে বাণে যোদ্ধাদিগের নাম লেখা থাকিত। কাম-

বসি তাহে মধুকর গুপ্ত যেন নামাক্ষর
দেখে উড়ে বিরহীর প্রাণ ॥২৭
ফোটে ফুল কর্ণিকার বর্ণ কিবা চমৎকার
দুঃখ এই গন্ধ নাহি তায়।
বিধি নহে সুনিপুণ না দেয় সকল গুণ
ধিক্ ধিক্ ধিক্ বিধাতায় ॥২৮
পলাশ লোহিত ফুল নবশশি-সমতুল
বাঁকা যেন বাল-ইন্দুমত।
বনস্থলী বক্ষে এসে মধু যেন রতিরসে
রস লাগি নখে কৈল ক্ষত ॥২৯
ফুটেছে তিলক ফুল তাহে বসি অলিকুল
বনশোভা কিবা মনোহর।
চন্দন-তিলক 'পরে কজ্জলের বিন্দু পরে'
যেন নারী সাজিল সুন্দর ॥
অরুণ পল্লব তায় আহা কিবা শোভা পায়
যেন ওষ্ঠে তাম্বূলের রাগ।
নড়ে শাখা বায়ুভরে যেন করভঙ্গী করে
কুহুস্বরে করে অনুরাগ ॥৩০
বহে মলয়ের বায় মদে মাতি মৃগ ধায়
বনপথে বায়ু-বিপরীতে।
পিয়াল-পরাগ বিঁধে সহসা নয়ন ধাঁধে
জীর্ণপত্র চূর্ণ ক্ষুরাঘাতে ॥৩১
চূতাস্বাদে মধুস্বর কুহরিছে পিকবর
কাঁপে প্রাণ শুনিয়া ঝঙ্কার।
মানিনীর মানহর সে যে কাম-কণ্ঠস্বর
মধুমাখা কোমল হুঙ্কার ॥৩২
মধুর পঞ্চম সুরে মানিনীর মান হরে
পঞ্চ স্বরে গাহে পিকবর।
মনে হয় ধনু করে পঞ্চশর পঞ্চ শরে
বিরহীরে করে জর জর ॥*
বসন্ত আসিলে কান্ত দুষ্ট শীত হল শান্ত
মুখকান্তি নিতান্ত ফুটিল।
অধর ধরিল শোভা গণ্ডে হেরি পাণ্ডুআভা
ঘর্ম্মজাল আননে জুটিল ॥৩৩

অকালে উদয় মধু বনময়
দেখিয়া সভয় তাপসগণ।
শিব বনবাসী যত মুনিঋষি
সমাধিতে বসি বাঁধিল মন ॥৩৪
চলে রতিপতি হর-জয়ে মতি
সাথে লয়ে রতি সশর চাপ।
যত জীবজাতি প্রেমরসে মাতি
সুখী দিবারতি না জানে তাপ ॥৩৫
কোথা দেখি প্রেমভরে মধুকরী মধুকরে
এক ফুলে মধু করে পান।
বৃক্ষ তলে মৃগ বসি প্রিয়া-অঙ্গে শৃঙ্গ ঘষি
স্পর্শ-সুখে মিলিত নয়ান ॥৩৫
করিণী লইয়া জল পদ্মগন্ধি নিরমল
দেয় প্রেমে প্রিয়ের বদনে।
চক্রবাক মনসুখে মৃণাল তুলিয়া মুখে
ভুক্ত-শেষ দেয় প্রিয়াননে ॥৩৭
কিন্নরী গাহিয়া গান পুষ্পমধু করে পান
মধুকণ্ঠী শ্রমেতে কাতর।
স্বেদবারি ঝরে কায় যতনে মুছায়ে তায়
চারু মুখে চুমিছে কিন্নর ॥৩৮
অনঙ্গের জয় গান পুলকিত করে প্রাণ
স্মিতাননে শুনিছে কিন্নর।
মধুপানে মত্ত আঁখি কামেতে কাতর দেখি
কামাতুরা চুমিল অধর ॥*
কি কব চেতন কথা অচেতন তরুলতা
কামাতুর হইল সহসা।
তাই বুঝি পরস্পরে লতা আর তরুবরে
আলিঙ্গনে পুরাইছে আশা ॥
পুষ্প আভরণ পরে জড়াইয়া তরুবরে
পুষ্পগুচ্ছ স্তন মনোহর।
কিসলয় রক্তাধর বল্লরী কোমল কর
পরবশ কম্প নিরন্তর ॥৩৯
শুনি অপ্সরার গান কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ

মৃদু হাসি হাসি হর হইলেন ধ্যানপর
বাহ্ন বিঘ্নে বাহিরে রাখিয়া ॥
এক মনে যোগাসনে যে বিভু বসিয়া ধ্যানে
ভাবিছেন মূর্ত্তি আপনার।
সকলি অধীন যাঁর কিবা বাধা বিঘ্ন তাঁর ?
নির্ব্বিকার তিনি বিশ্বাধার ॥৪০
অন্য প্রাণী সেথা যত মদনেতে মত্তচিত
চপলতা কত প্রকাশয়।
দেখি বিঘ্ন তপস্যার করিবারে প্রতিকার
নন্দিদেব হলেন উদয় ॥
দণ্ড ধরি নন্দিভৃঙ্গী ইঙ্গিতে করিয়া ভঙ্গী
ভূতগণে করিল শাসন।
আজ্ঞামাত্র ভূতগণ সবে হৈল শান্তমন
চপলতা কৈল পলায়ন!
নড়ে না বৃক্ষের পত্র স্থির ভৃঙ্গ যত্র তত্র
ডাকে না ভয়েতে পিকচয়।
মাতঙ্গ পতঙ্গ পঙ্গ তুরঙ্গ কুরঙ্গ ভৃঙ্গ
অনঙ্গ-প্রসঙ্গ ছাড়ি রয় ॥
নন্দীর আদেশ শুনি হরিষে বিষাদ গণি
প্রাণিজাত হইল বিহ্বল ॥
সকলে হইল চুপ দেখি কিবা অপরূপ
চিত্রসম অরণ্য নিশ্চল ॥৪২
নন্দীর বিষম দৃষ্টি করিবে অনর্থ সৃষ্টি
ভয়ে তাই এড়াইতে তাঁয়।
দুই এক পদ যায় ভয়ে ফিরে ফিরে চায়
মনে ভাবে কি করি উপায় ॥
গুপ্ত ভাবে গুপ্তভাবে স্মর তুমি কোথা যাবে
গোপ্তা কাছে গুপ্ত সে কেমন ?
তবে যদি গুপ্ত রবে যুক্ত কর কর ভবে
ভবভয় না রবে কখন ॥
পাছে হয় পরাভব এই ভয়ে মনোভব
ভবভব সম্মুখ ছাড়িয়া।
পশ্চাতে করিয়া গতি দেখিলেন ভূতপতি
ধ্যানগৃহে ধ্যানেতে বসিয়া ॥৪৩

কালাচাঁদের পিনিক।

(সংসার-তত্ত্ব।)

শ্রীকালাচাঁদ শর্ম্মা।

অলঙ্কারশাস্ত্র, নিবিড় নিশীথেই অভিসারের উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু আমার পিনিক্-প্রেয়সী বলেন,—ইহা কি চোরের অভিসার যে রাত-দুপুরে আঁধারে আত্মগোপন করিয়া তোমার কাছে আমায় আসিতে হইবে? তাই তিনি গোধূলি-লগ্নেই নিত্য আমার কাছে আসিয়া থাকেন। ‘কাণাছেলের নাম পদ্মলোচনের’ মত এই পূত-স্নিগ্ধ-মধুর-মনোরম সন্ধ্যাকালের নাম কোন্ মহামূর্খ যে ‘প্রদোষ’ রাখিয়াছিল, জানি না। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় দুষ্ট ‘কালব’শেখী আসিয়া, ঐ নামটাকে যেন অনেকটা সার্থক করিয়া তুলিয়া ছিল! শিলা-ভিজিয়া হিম হইয়া উঠিল। সে যেন উত্তরমেরুর তুষার-সম্পাত! তাহার স্পর্শ আমার সর্ব্ব অঙ্গের চর্ম্মমাংস ভেদ করিয়া, হাড়গুলিকে পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিল! তবে, প্রাণের ভিতর বিরহের আগুন আর মাথার উপর কল্কের আগুন নিয়ত জ্বলিতে-ছিল বলিয়াই, তখনও এই জর জর প্রাণটা জমিয়া বরফ হইয়া যায় নাই! এমন কাঁপুনি কতক্ষণ ছিল, জানি না। কখন্ যে আমার পিনিক-প্রেয়সী চুপি চুপি আসিয়া, তাঁহার কমল-করে আমার আঁখিপদ্ম চাপিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহাও আমি বুঝিতে পারি নাই।

বুঝি আমার বিরহের ব্যথাটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি সহানুভূতির করুণ-ধারায় তাঁহার কণ্ঠস্বর সিক্ত-স্নিগ্ধ করিয়া, গদগদ ভাবে আমার কাণে কাণে শুধাইলেন—কি ভাবিতেছ? আমি তাঁহার দর্শন স্পর্শন ও সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত হইয়া বলিলাম—"আর কি ভাবিব বল? যে সংসারজ্বালায় নিয়ত জ্বলিতেছি, তাহা ছাড়া আর কিছু ভাবিবার অবসর কই?" প্রেয়সী তখন বিকট বৈজ্ঞানিকের মত গম্ভীরভাবে আবার শুধাইলেন,—"সংসারতো ভাবিতেছিলে! বল দেখি—সংসার কথাটার অর্থ কি?"

জীবনে কখনও পরীক্ষা-মন্দিরে প্রবেশের অধিকার পাই নাই। প্রশ্ন শুনিয়া ঘরের গৃহিনীকেও কঠোর-পরীক্ষকের মতই ভয়ের কারণ মনে হইল! তথাপি কোনরূপে সাহসেবুক বান্ধিয়া বলিলাম,—"সংসার? সংসার মানে? তাও কি তোমায় বলিয়া দিতে হইবে? কেহ প্রথম পক্ষে, কেহ দ্বিতীয় পক্ষে, কেহ বা তৃতীয় পক্ষে,—আবার ততোধিক ভাগ্যবানেরা চতুর্থ-পঞ্চম পক্ষেও সংসার আনিয়া ঘরে ঢুকাইতেছে, ইহা নিত্য দেখিয়াও তোমার কি সংসারের অর্থ বুঝিতে বাকী আছে?"

প্রেয়সী উপেক্ষার হাসিতে আমায় হতবুদ্ধি করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"মূর্খ! সংসারটা কি তবে তোমাদেরই পক্ষের ভিতর? এমন জ্ঞান না হইলে, সব ছাড়িয়া সেই সংসারকেই সর্ব্বস্ব ভাবিবে কেন? তোমরা তাঁহার পদনখরে বিশ্বরূপ দর্শন করিলেও, বস্তুতঃ তাহাই সংসার নহে। সংসার জিনিষটা অতি বড় বিরাট পদার্থ। তার ভিতর বহুতত্ত্ব নিহিত আছে। সে সব কথাতো একদিনে বলা যায় না। তবে, কথাটা উঠিল যদি, শুধু সংসার নামের ভিতরেই কত তত্ত্ব আছে, তাহাই আজ তোমায় বুঝাইয়া দিতেছি। মনে রাখিয়া, সভা-সমিতিতে বা কাগজ-পত্রে এসব প্রচার করিতে পারিলে, তুমিও একজন "প্রত্নতত্ত্ববারিধি" নামে জাহির হইতে পারিবে।

"দেখ, সংসারে না ভুগিলে, কাহারও সংসারের ব্যুৎপত্তিবোধ হয় না। তাই, বনবাসী পাণিনি ঋষিও সংসারের ব্যুৎপত্তিতে ভুল করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"সংসরতীতি সংসারঃ" অর্থাৎ যে সরিয়া যায়, সেই সংসার! এ অর্থে তোমাদের প্রথম-দ্বিতীয় পক্ষের সংসার পাওয়া যায় বটে! কিন্তু সরেনা কে বাবু? ঝাঁটা ধরিলে, তোমাকেও যে এখনই এখান হইতে সরাইতে পারি! তাই বলিয়া, তোমাকেও সংসার বলিতে হইবে কি? অতএব পাণিনির এ অর্থ প্রকৃত নহে। তবে যদি তিনি "সংসরতি যত্র বা যস্মাৎ" এমন একটা কিছু করিতেন, তাহা হইলেও কতকটা অর্থবোধ হইতে পারিত। কারণ সাধারণ সঙ্ একস্থানে থাকিলেও, সংসারের সঙ্ নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায়! বিশেষতঃ এই সঙেরা যে সর্ব্বদাই সরিতে চায়, ইহারও প্রমাণের অভাব নাই। যে ঘরে পাঁচজনের গোলযোগ, যেখানে দশ জনকে দিয়া খাইতে হয়, দশের মুখপানে তাকাইয়া সংযত থাকিতে হয়, পাঁচ-পরের দায়ে নিজের স্বার্থ কমিয়া যায়, সঙের জাত সেখানে থাকিতে পারেনা—সরিয়া দাঁড়ায়। কত সঙ প্রেমের দায়ে পড়িয়া একবারেই চম্পট দেয়! আবার অভিমানের আবেগেও অনেক সঙ আফিং খায়,—কেরোসিন জ্বালায়! অতএব এইরূপ অর্থ করিলেও, পাণিনির ইজ্জত থাকিত বলিতে পারি।

কিন্তু ইহাতেও সংসারের অর্দ্ধাঙ্গ মাত্রেরই অর্থবোধ হয়, পূর্ণাঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায় না। এইজন্য আমার মতে সং ও সার এই দুইটীর সমাহার দ্বন্দ্ব করিয়াই, সংসার শব্দ নিষ্পন্ন করা উচিত। এখন সং কি, তাহা বুঝাইয়া দিতেছি। যাত্রার দলের কালুয়া—ভুলুয়া, অথবা চৈত্রসংক্রান্তির জেলেদের সঙ্ যে আমার লক্ষ্য নহে, তাহা বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না। সে সব সং তো সংসারের আধখানা নহে! সুতরাং তাহার প্রসঙ্গও এখানে অনাবশ্যক। সংস্কৃত ভাষায় সংকে উপসর্গ মাত্র বলে। সব সং-ই উপসর্গ না হইলেও, অনেক

সংএর সঙ্গে যে উপসর্গের সম্বন্ধ আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ এ সঙের আসল অর্থ সংস্কৃত অভিধানে নাই; ইহা অভিধানকার-দিগেরই বিশেষ ত্রুটী! নূতন বাঙ্গালা অভিধান-লেখক যোগেশবাবু হয়তো এই ত্রুটীর সংশোধন করিয়া থাকিবেন! আমি বলি,—সঙের অর্থ পুত্তলিকা-বিশেষ! এখানে টীকাকারেরা বলিয়া-ছেন,—পুত্তলিকার 'আকার' দেখিয়াই বুঝিতে হইবে সং-মাত্রই স্ত্রীলিঙ্গ। এতাবতা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, কৃষ্ণনগরের কারিকরের মত, স্বয়ং বিধাতাপুরুষ যাহাদিগকে স্ত্রীমূর্ত্তিরূপে গড়িয়া-ছেন, যাহারা সাজগোছ করিয়া 'গ্ল্যাসকেসের' ভিতরেই থাকিতে চায়, আমরাও যাহাদিগকে বসনভূষণ দিয়া সর্ব্বদা সাজাইয়া রাখিতে ভালবাসি, যাহাদিগকে দেখিয়া দেখিয়া—আবার দেখিয়াও দেখিবার সাধ পূর্ণ হয় না, অবস্থা ও অবস্থান-বিশেষে যাহাদিগকে দেখিবার জন্য রাসতলার মতই কাতারে কাতারে লোক জমায়েৎ হয়, তাহারাই সং।

বলিতে পার,—তবে আর সংকে পুত্তলিকা বল কেন? বিদ্যাসাগর বলিয়াছেন,—"পুত্তলিকার চক্ষু আছে, দেখিতে পায়না; কাণ আছে, শুনিতে পায় না; পা আছে চলিতে পারে না; ইত্যাদি।" এ সঙের সহিত এ সব লক্ষণ মিলিতেছে কই?

মিলিবে বই কি? যে সং পাশের ঘরে অনশন-ক্লিষ্ট বা ব্যাধিপীড়িত নিজের আত্মীয়-স্বজনের দিকেও ফিরিয়া চায় না, অথবা পাঁচজনের সহিত একত্র খাইতে বসিয়াও যে নিজের পাতে মাছের মাথা—দুধের বাটী লইতে সঙ্কুচিত হয় না,—তাহার দৃষ্টিশক্তির অস্তিত্ব কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? এইরূপ যে সঙের নিন্দাগীতি ঘরে বাহিরে জনে জনে গাহিয়া, তাহার আত্মীয়-স্বজনকে লজ্জিত করিতেছে, সেই নিন্দা যে সেই সঙের কাণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, ইহা তাহার কোন ব্যবহারে তাহার শ্রবণশক্তিরই বা প্রমাণ কই? বিদ্যাসাগ-রের তিনটী লক্ষণের মধ্যে দুইটী লক্ষণ তো মিলিয়া গেল! বাকী একটী, তাহা না মিলিলেও কোন দোষ হয় না! এইরূপ লক্ষণের ব্যভিচার সর্ব্বত্রই আছে। কিন্তু ইহাও মিলিবে।

বিদ্যাসাগর বোধ হয় সঙের পায়ের 'বেড়ি' দেখিয়াই, "পা আছে, চলিতে পারে না" লিখিয়া থাকিবেন। পায়ে বেড়ীর কথাটা বিস্ময়ের বিষয় হইল বুঝি? তবে তাহা বুঝাইয়া বলি শোন। ঐ যে সং জাতির শ্রীপদপল্লবে আজ্ মলের যোড়া রুনু ঝুনু বাজিয়া পুরুষের আঁখি-প্রাণ চঞ্চল করিতেছে, ইহা অল্প দিন আগেও কঠিন নিগড়ের মত মোটা সোটা নিরেট দুই গাছি মলরূপেই ঐ পায়ে ঝুলিয়া থাকিত; তাহাতে বুঝি তাহাদের নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারের সুবিধা হইত দেখিয়া, হুঁশিয়ার পুরুষের দল পরে তাহা চিঁরিয়া চারিগাছি করিয়াছে! সে যাহা হউক, সেই দুইগাছি মলেরও আবার পূর্ব্ব সংস্করণ একটা ছিল। সভ্যসমাজ তাহাকে দেশান্তরিত করায়, উড়িষ্যাদেশে আজিও তাহা আত্মগোপন করিয়া আছে। এখন বুঝিয়া দেখ,—সেই বেঁকি মল, পায়ের বেড়িরই অপভ্রংস কি না? আদিযুগে ইহাঁদের চলনের দৌড়টা কিছু বেয়াড়া বাড়াবাড়ি রকমের ছিল বলিয়াই, বোধ হয় পায়ে বেড়ি-শিকল দিয়া ইহাঁদিগকে বান্ধিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। একালের তোড়া, পেটী, পাঁয়জোর প্রভৃতি সখের গহনাগুলি সেকালের সেই শৃঙ্খলের স্মৃতিই মনে জাগাইয়া দেয় না কি? তার পর কবে যে ইহাঁদিগকে পোষ মানিতে দেখিয়া, বেড়ি-শিকল কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে, সে ইতি-হাস বাঙ্গালীর ঘরে পাইবার উপায় নাই। অভ্যাস দোষটা না কি নিতান্তই অচ্ছেদ্য! তাই, বেড়িকাটা, নগ্ন পা দু'খানি দেখিতে বড় বিশ্রী হওয়ার জন্যই যে শেষে মল প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে,

যে সব দুর্দান্ত জীবকে মানুষ একগাছা দড়ায় বা একটা শিকলে বান্ধিয়া আটক রাখিতে পারে না, তাহাদের জন্য বন্ধনের সংখ্যাই বাড়াইতে বাধ্য হয়। সঙের প্রকোষ্ঠে বলয়-ব্রেস্‌লেট্‌ বা তাহার কম্বুকণ্ঠে হার-নেকলেস, আজ হীরা-মতি-চুনি-পান্নায় খচিত হইয়া, সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্যের প্রকট বিকাশ করিলেও, তাহাদের পূর্ব্ব সংস্করণ যে হাতের হাতকড়ি ও গলার শিকল রূপেই ব্যবহৃত হয় নাই, তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব ? বলিতে দুঃখ হয়, ইহাঁদের নোলক, নথ, বেশর প্রভৃতি দেখিয়াও, আমার তাহাদিগকে নাকে দড়ির রূপান্তর বলিয়া মনে হয়।

সং যে সত্য সত্যই পুত্তলিকা, তাহা তাহাদের হৃদয়-হীনতা ও প্রাণের অভাব দেখিয়াও অনুমান করা যায়। প্রাণ থাকিলে, কেহ প্রাণ ধরিয়া নিজের নাসা-কর্ণে শত ছিদ্র করিতে পারে কি ? হৃদয়হীনতারও অনেক প্রমাণ তাহাদের প্রতি কার্য্যেই প্রকাশ পাইতে দেখি। জরাজীর্ণ বৃদ্ধ শ্বশুর, মধ্য রাত্রিতে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া দশবার চিৎকার করিলেও, যদি যুবতী পুত্রবধূ তাঁহাকে এক গেলাশ জল দিতে না উঠেন,—বৃদ্ধা বিধবা শাশুড়ীকে বা বালবিধবা ননদিনীকে দ্বাদশীর সকালে একটু জল খাইতে না দেন,—নিরাশ্রয়া জা-ননদকে কিংবা অক্ষম ভাশুর-দেবরকেও যদি দু'টী অন্ন দিতে আপত্তি করেন,—দ্বারে ভিক্ষুক আসিলেই যদি 'হাত বন্ধ' করিয়া বসিয়া থাকেন; তবে তাহাদিগকে হৃদয়হীন বলিব না কেন? একটা মোটা কথা বুঝিয়া দেখ,—যাহার নিজের হৃদয় আছে, সে কি তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ দিয়া পরের হৃদয় বিদ্ধ করিতে পারে? অতএব পুত্তলিকার কোন লক্ষণেই ব্যভিচার দেখিতেছি না।

অবশ্য আকৃতি-প্রকৃতি ভেদে সঙের প্রভেদও নানাপ্রকার আছে। কেহ রাজমহিষী বা রাজকন্যা সাজিয়া, মরণকাঠী-জীওনকাঠী হাতে ভানুমতী হইয়া পুরুষের দলকে ভেড়া বানাইতেছেন! কেহ হীরামালিনী! কেহ রায়বাঘিনী! কেহ 'খেঁদি'—'ভোঁদা'! কেহ 'উদমদোঁড়া!' কেহ বিলাস-ব্যসনে আলস্য-আরামে হিষ্টিরিয়া-অম্বলের কষ্টভোগ করিতেছেন! আবার কেহ বা স্নেহ-মমতা—শান্তি-করুণার প্রতিমূর্ত্তিরূপে গৃহধর্ম্ম পালন করিয়া নারীজন্ম সার্থক করিতেছেন! তা' যেমনই সং হউক, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে হীরক ও কয়লা একজাতীয়! প্রভেদ কেবল সৌধ-কুটীরে আর বসন-ভূষণে! কিন্তু সকল সংই যে 'সারের' মাথার উপর, এবং সকল 'সার'ই যে সঙের পদলুণ্ঠিত, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সারের দল যে সংকে উত্তমাঙ্গ না বলিয়া অর্দ্ধাঙ্গ বলেন, তাহা তাঁহাদের বৃথা লজ্জা বা বুদ্ধিভ্রম! অর্দ্ধাঙ্গও যে হর-গৌরী ও নর-সিংহ, আকার ভেদে দুই রকমেই হইতে পারে, ইহাও বুঝি তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই! কিন্তু সঙেরা যে এইটুকু বুঝিয়া, 'সার'দের সেই দুর্ব্বলতা ক্ষমা করিয়াছেন, এজন্য আমিও তাঁহাদের ধন্যবাদ করিতেছি।

যাক্, শুধু সঙের কথায় আমিও আর পুঁথি বাড়াইব না। সারের তত্ত্ব না শিখিলে, তুমিও যে একালের পুরুষজাতির মত অর্দ্ধাঙ্গসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িবে! সেটা তো পিনিক্-পতি কালাচাঁদের গৌরবের কথা নহে! অতএব ঝিমুনি ছাড়িয়া মনোযোগ দাও। 'সং' আর 'সার' এই দুইটী লইয়াই যখন সংসার, তখন 'সার' কাহাদিগকে বলিতেছি, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ ? বস্তুতঃ যাহারা অর্থে সামর্থ্যে, বুদ্ধিতে বিবেচনায় সংসারের সকল কর্ত্তব্য সাধন করে, তাহাদিগকে 'সার' বলিতে হইবে বই কি ? অতএব পুরুষ জাতিটাই আমার মতে 'সার' পদবাচ্য। কিন্তু সকল পুরুষের যেমন পৌরুষ থাকে না, তেমনি সকল 'সার'ই প্রকৃত 'সার' নহে। বলিতে কি, আজ্ কাল্ সারের ভিতর অসারের প্রসারই অত্যধিক। তাহা

মানুষের যেটুকু সার থাকার প্রয়োজন, তাহাও যে এখন অনেকের নাই। তাই, প্রসারের প্রশস্তিতে অসারকেই তাহারা সার মনে করে! আর বজ্রসার শাল-তালের মত প্রকৃত সারের উপর কারিকরের পালিশ-খোদ্‌কারি চলেনা বলিয়াই তাঁহাদিগকেই তাহারা অনাদর করিয়া থাকে!

বলিতে কি, এ কালটাই যেন কেবল পালিশের কাল! পালিশের অভাবে অম্বরচুম্বী বিশাল শালও আর সহরের সৌধে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না! পালিশের জোরেই পল্লীর বন কাঁঠাল কাঠও শেগুন-মেহগিনির সহিত সমান আসন অধিকার করে! আবার পালিশ চলে না বলিয়াই পাকা সোণা হীরা-জহরতের সঙ্গ-সুখে বঞ্চিত হইয়া, দরের সোণার ঝক্‌মকিতে লজ্জায় আত্মগোপন করিতে বাধ্য হয়! গুণ নাই,—জ্ঞান নাই—"যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে"র দল, কেবল পোষাকের পালিশে ও গাড়ী-ঘোড়ার জৌলুষে, গুণী জ্ঞানী সারবান্ মহাত্মাদিগকে তেমনি অবনত ও অপদস্থ করিয়া রাখে নাই কি? তথাপি যেমন পাকা সোণার দর কমে নাই, সোঁসার 'শাল—তালও যেমন পল্লীকুটীরের মাথার উপর আজিও আসন পাইতেছে, সেইরূপ অসারের প্রসার-প্রতিপত্তি যতই বেশী হউক না কেন, তথাপি সারের আদর অসারের অনেক অধিক। সংএর সহিত সার না থাকিলে যে সংসারের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না! শিশু-সারও সংসারে বহু কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু বৃদ্ধ বটবৃক্ষ সারভাগের অভাবে শীতল ছায়া ব্যতীত আর কিছুই দিতে পারে না!

তবে, অসার দিয়াও একটা কাজ হইতে দেখা যায়! কুম্ভকারের মাটীর সঙের মত, অনেক সূত্রধরও অসার কাঠ দিয়া সঙ্ গড়িয়া থাকে। অসার ভিন্ন সার কাঠ তো সঙের প্রয়োজনমত বাঁকিয়া ঘুরিয়া কিম্ভূত-কিমাকার হয় না! সঙের একাকী থাকিবার প্রয়োজন হইল, আবদার ধরিলেন, 'এই কাঁটকী শাশুড়ী লইয়া ঘর করিব না।'

অসার বলিলেন—'তথাস্তু, এখনি বুড়ীকে বিদায় করিতেছি।' সং বলিলেন—'জা-ননদের জ্বালায় আমি তো আর এখানে থাকিতে পারি না!' অসার বিব্রত হইয়া 'হাঁ হাঁ' করিয়া উঠিলেন! বলিলেন,—'তুমি না থাকিলে, আমি থাকিব কোথায়? তুমি থাক, তাহাদিগকেই তাড়াইয়া দিতেছি!' সং যদি বলেন,—তোমার এই রক্ত জল করা টাকাগুলা যদি এই সব দেওর—ভাসুর আর তাহাদের শূয়ারের পাল পুষিতেই নষ্ট করিবে, তবে তোমার আমার পরকালের উপায় কি?' অসার অমনি বলিবেন—'বটেইতো! কে কার? সব দূর কর!' তখন সেই অসার স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইয়াই সং তাহাদিগকে পদাঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না! আর অসারও তাহা দেখিয়া—আহ্লাদে আটখানা হইয়া ভাবিবেন—এই তো চাই! 'মিলিটারি' বটে! এমন না হইলে সংসার চলিবে কেন? কবি তো স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব,
গভীর দু'খে দু'খী দু'জনে মুখোমুখী
আঁধারে মিশে গেছে আর সব!"

আবার এই জবরদস্ত সংকে ও নাচাইয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, এমন বাহাদুর অসারও অনেক আছে। কেহ রাজার রাণী বা গৃহের গৃহিণীকে পথের ভিখারিণী করিয়াছে! কেহ ধনশালিনীকে স্ববশে আনিয়া তাহার সর্ব্বস্ব শোষণ করিতেছে! কেহ বা কোন রাণী—উপরাণীকে হাত করিবার আশায় তাহার দুয়ারে হত্যা দিয়া পড়িয়া আছে! তবে পোড়া বিধাতা—এখনও কেবল অসার দিয়া সংসার চলিবার কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই! এবং সারা সংসারটাকে শুধু সঙের প্রয়োজনেও পর্য্যবসিত করেন নাই! তাই সংএ ও অসারে 'সংসার' সম্পন্ন হইবার কোন সূত্রও কেহ কিছু বাহির করিতে পারিতেছে না! সুতরাং দায়ে পড়িয়া, সারের প্রয়োজনও সকলকে স্বীকার করিতে

হইতেছে! তবে, মুস্কিলের বিষয় এই যে, আকার দেখিয়া, সার কি অসার চিনিবার উপায় নাই। শাখা-প্রশাখাহীন শীর্ণদেহ তালগাছটীকে সারে পরিপূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়; আবার—"বিশালঃ শল্মলী তরুঃ" সাত কাঠা জমি যুড়িয়া শাখাপত্র বিস্তার করিলেও, তাহার কোন স্থানে একটুকু সার জন্মে না! যখন বিপুল-বিশাল রাধাচূড়া গাছগুলি রাই-রাজার মত মাথায় মোহন চূড়া বান্ধিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তখন আকৃতি দেখিয়া কেহ তাহাদিগকে অসার মনে করিতে পারে কি? এইরূপ লম্বশাট-পটাবৃত—বিপুলনিতম্ব—বিশালোদর নরপুঙ্গবেরাও যখন লম্বা লম্বা বাক্যবিন্যাস করিয়া আত্ম-গৌরবের বিজ্ঞাপন প্রচার করে, তখন কে তাহাদিগকে সার ব্যতীত অসার মনে করিবার সুবিধা পায়?

বুদ্ধি-বিবেচনা থাকিলে, কেবল দুই একটী লক্ষণ দেখিয়া, অনেকস্থলে সার ও অসার নিশ্চয় করা যায়। জলাভূমির গাছগুলি যেমন অনায়াসে প্রচুর রস পাইয়া শাখা-প্রশাখায় বহুবিস্তৃত হইলেও, সারগর্ভ হয় না, সেইরূপ সংসারের সারজাতির মধ্যেও যাঁহারা পৈত্রিক সম্পত্তির পর্য্যাপ্ত রসে আজন্ম ডুবিয়া থাকেন, অথবা কেবল ভাগ্যের জোরে অনায়াসে প্রচুর অর্থ অধিকার করেন, তাঁহাদের দেহের পরিধি, পোষাকের পরিপাটী, বিলাসের ছড়াছড়ি, মোসাহেবের হুড়াহুড়ি প্রভৃতি যতই ডাল-পালার বিস্তার হউক না কেন, ভিতরে তাঁহাদের সারভাগের অভাব অত্যন্ত অধিক। আবার শুষ্ক রুক্ষ ভূমির শীর্ণ বৃক্ষগুলির অধিকাংশই যেমন সারবান্ হয়, তেমনি অন্নবস্ত্রহীন দরিদ্র-সন্তানগুলি, বিদ্যা ও অর্থ উপার্জ্জন করিতে শীর্ণ বিবর্ণ হইলেও, তাহারা প্রায়ই সারপূর্ণ হইয়া থাকে। ইহা প্রত্যক্ষ সত্য, অপলাপ করিবার উপায় নাই। কিন্তু সারে বা অসারে ব্যভিচার সর্ব্বত্রই আছে। পাকা লক্ষণ নির্দ্দেশ অসম্ভব বলিয়াই, মহর্ষি মনু অন্য প্রসঙ্গে একটী বিশ্বতোমুখ

"প্রচ্ছন্না বা বিবিক্তা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ"।

আশা করি, ইহাতেই তুমি সং ও সার দুইটীকেই চিনিতে পারিয়াছ। অতঃপর ইহাদের দ্বন্দ্ব কথা বুঝাইয়া দিয়াই আজিকারমত আমি বিশ্রাম লইব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—সং ও সার এই দুইটীর সমাহার দ্বন্দ্ব ফলে 'সংসার' হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রকর্ত্তারাও দ্বন্দ্বসমাহারকেই সংসার-সৃষ্টির কারণ বলিয়াছেন। অতএব আমার কথাটা যে শাস্ত্রছাড়া বা সৃষ্টিছাড়া নহে, তাহা বোধ হয় বিশ্বাস করিতে পারিবে! এই সমাহার-দ্বন্দ্বের ফলেই হউক, অথবা দ্বন্দ্বসমাহারের পরিণতিতেই হউক, সঙে ও সারে অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষে নিত্যই দ্বন্দ্ব লাগিয়া আছে। সে দ্বন্দ্বের কারণও নাই, বিরামও নাই। সার, চখে'র জল চখে' রাখিয়া হাসিমুখে সংসার পাতেন! আর সং তাঁহার অশ্রুধারা সদাই ঢালিয়া, সব সংসার ভাসাইয়া দেন! তাঁহার শ্রীমুখ-পঙ্কজ সদাই বাঁকা! সে স্বরলহরী সদাই রোখা! তাঁহার হৃদয়-তন্ত্রী সপ্তমে বাঁধা! সে করপল্লব দু'খানি হইলেও দশ প্রহরণে সমান সাধা! সার হয়তো শান্তিপ্রিয়, সঙের অকারণ আস্ফালনে অশান্তি দেখিয়া যদি তাহাকে শান্ত থাকিতে বলেন, সং অমনি 'যাও যাও, তুমি আর বকিও না' বলিয়া ফোঁস করিয়া উঠেন! সঙের অযথা আধিপত্যে সার যদি অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন, সং তখন মুখভার করিয়া বলিলেন,—"আমার কথা তোমার ভাল লাগিবে কেন? আমি তো বাঁদী-দাসী ভিন্ন আর কিছু নই!" সার অন্ন উপার্জ্জনের জন্য চাকর-পাচক রাখিতে অসমর্থ। সং তাহাতেও বিরক্ত হইয়া বলেন,—"এমন হতভাগার হাতেও আমি পড়েছি, যে দিন রাত্রি বাসন ঘষিয়া আর হাঁড়ী ঠেলাইয়া প্রাণটা গেল!" সার যখন নাম-যশের আশায় অর্থব্যয়ে অগ্রসর হইতেছেন, সং তখন নগদ—গহনার পুটুলি বান্ধিবার জন্য তাহা কাড়িয়া লইতেছেন! সার সকলে মিলিয়া একত্র থাকিতে

সার দু'টীতে 'সংসার' নাম সার্থক করিতে বলেন! এই দ্বন্দ্ব লইয়াই সংসার। ইহার অন্যথা যেখানে, সে স্থান সংসার নহে—বৈকুণ্ঠ! অতএব ইহাই জানিবে প্রকৃত সংসারতত্ত্ব। এ তত্ত্ব গোপ্যাৎ গোপ্যতম! তাই কোন ঋষি—মহর্ষি বেদ—বেদাঙ্গের ভিতরে বা মহেশ্বর—মহাদেবও তাঁহার তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে ইহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই! আজ আমিই ইহার আদি বক্তা, আর তুমিই ইহার প্রথম শ্রোতা। এখন ঘুমাইগে চল; রাত্রি অনেক হইয়াছে। এই বলিয়াই পিনিক প্রেয়সী আমার বীচ বিচ্যুত শূন্য কলসের মত আন্দোলিত মাথাটী তাকিয়ার উপর ঠেলিয়া দিলেন। আমিও আমার ভবকর্ণধারের আজ্ঞা লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া, তখন শয্যাগ্রহণে বাধ্য হইলাম।

চিকিৎসা সমস্যা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীজীবনকালী রায় বৈদ্যরত্ন।]

কিছুদিন পূর্ব্বে স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আমার নিকট অনুযোগ করেন,—অনেক বিজ্ঞাপনে মকরধ্বজ ৪৲ টাকা ভরি, চ্যবনপ্রাশ ৩৲ টাকা সের দেখিতে পাওয়া যায়, আর—আপনারা প্রায়ই ১৬৲ টাকা ভরি, আট টাকা সের মূল্য লইয়া থাকেন, ইহার কারণ কি?

ইহার কারণ বলিতে হইলে ত অনেক কথা বলিতে হয়; তথাপি সংক্ষেপে উত্তর দিতে হইল যে, এই শ্রেণীর বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ীদের অনেকেই কর্ম্মান্তর হীন হইয়া নিরুপায় ভাবে ঔষধ বিক্রয়ের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে; চিকিৎসা ও শাস্ত্রজ্ঞান-হীন ইহাদের নিকট কোন চিকিৎসার্থী যাইবে না, তাই ইহাদের বিজ্ঞাপনের সাহায্যে ও সুলভের প্রলোভনে যে সকল ঔষধ সুস্থ শরীরে ব্যবহার চলে, বা লোকে আমোদের জন্য যে সকল মোদ-কাদি ব্যবহার করে, তাহাই বিক্রয় করিতে হয়। তবে সস্তায় অঙ্গহীন ঔষধ যেমন হইবার তাহাই হইয়া থাকে। আমার এই প্রকার উত্তরে তাঁহারা সন্তুষ্ট না হইয়া একখানি বিজ্ঞাপনের মূল্য তালিকা বাহির করিলেন। উক্ত বিজ্ঞাপনী ঢাকার শক্তি ২।১টি ঔষধ প্রস্তুতের একটা খরচের হিসাব দিয়া জনসাধারণকে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছে যে, এ সকল ঔষধ প্রস্তুতের খরচ অতি সামান্য, এবং তাহারা যে মূল্য গ্রহণ করে তাহাই প্রকৃত, কবিরাজগণ অতিশয় অসাধু, অতি উচ্চমূল্য গ্রহণ করে ইত্যাদি।

ইহাদের হিসাব যে ভুল, তাহা মৌখিক বলিলে প্রশ্নকারিগণের বিশ্বাস না হইতে পারে, একারণ তাঁহাদের সন্তোষসাধন জন্য আমি প্রশ্নকারীগণের সমক্ষে মকরধ্বজ প্রস্তুত করিয়া শক্তি ঔষধালয়ের চাতুরী ও ঔষধের অবস্থা বুঝাইয়া দিই। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া বহরমপুর কলে-জিয়েট স্কুলের অন্যতম শিক্ষক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র সরকার B. A. মহাশয় মকরধ্বজ প্রস্তুতের খরচাদি সম্বন্ধে আমার প্রদত্ত হিসাব শক্তিঔষধালয়ের অধ্যক্ষ মথুর বাবুর নিকট পাঠাইয়া দেন। সকলের অবগতির জন্য শক্তি ঔষধালয়ের প্রদত্ত মকরধ্বজ প্রস্তুতের হিসাব, আমার প্রদত্ত হিসাবের সহিত সতীশবাবুর পত্রের মর্ম্ম এবং মথুর বাবুর উত্তর

শক্তি ঔষধালয়ের মকরধ্বজ প্রস্তুতের খরচের হিসাব
(তাঁহাদের বিজ্ঞাপন পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

"শোধিত স্বর্ণ ১ তোলা ২১৲ টাকা +হিঙ্গুলোত্থ পারদ ৮ তোলা ৪৲ টাকা+শোধিত আমলাসা গন্ধক ১৬ তোলা ২৲ টাকা+কাষ্ট ৫৲ টাকা বোতল বালি হাঁড়ী ইত্যাদি ১৲ টাকা+ একটি দক্ষ লোকের পারিশ্রমিক ২৲টাকা মোট ৩৫৲ টাকা।" ইহাতেও খরচ বেশী ধরা আছে বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে। তাহারপর মকরধ্বজ প্রস্তুতের অবশিষ্ট স্বর্ণভস্ম গলাইয়া বিক্রয় করিলে ২৩৲ টাকা পাওয়া যায় বলিয়া উক্ত খরচ হইতে ২৩৲ টাকা বাদ দিয়া ১২৲ টাকাতে ৭ ভরি মকরধ্বজ প্রস্তুত হয় লেখা আছে। মোট কথা প্রতি তোলা মকরধ্বজ প্রস্তুতে ২৲ টাকার কম খরচ হয় বলিয়া ৪৲ টাকা ভরি বিক্রয় করাই ধর্ম্মসঙ্গত, ইহাই প্রমাণের চেষ্টা করা হইয়াছে।

সতীশ বাবু যে পত্র দিয়াছিলেন তাহার
সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।

১৩০৮ সালের শক্তিঔষধালয় স্থাপিত হইয়াছে, ঐ সময় হইতে স্বর্ণের বাজার দর পরীক্ষা করিলে মকরধ্বজ প্রস্তুতোপযোগী ১নং চীনাপাত স্বর্ণের নির্দ্দিষ্ট মূল্য ২৫৲ টাকার উর্দ্ধ হওয়াই উচিত। শোধিত স্বর্ণের মূল্য—২৬৲ টাকার কম নহে। (অবশ্য) বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য ইহার মূল্য আরও অনেক বেশী হইবে।)

মকরধ্বজ প্রস্তুতের জন্য আপনারা ১৲ টাকার কাঠ ধার্য্য করিয়াছেন, এবং ঢাকাতে টাকায় ৪/০ মণ কাঠ পাওয়া যায়, তাহা বিজ্ঞাপক পুস্তকে স্বীকার করিয়াছেন। ঢাকাতে টাকায় ৪/৹ মণ কাঠ পাওয়া গেলে ১৲ টাকায় বা উক্ত ৪/০ মণ কাঠে আপনাদের মকরধ্বজ প্রস্তুত হয় স্বীকার করিতে হইবে। মকরধ্বজ ৩ দিবা রাত্রির জ্বালে পাক করা শাস্ত্রের বিধান। উক্ত প্রত্যক্ষ দেখা গেল ২০/০ মণের অধিক জ্বালানীর প্রয়োজন হয়। উহার মূল্য মথুর বাবুর কথা মত ঢাকাতে ৫৲ টাকা, স্থানীয় দরে প্রায় ৭৲ টাকা কলিকাতায় বোধ হয় ১২৲ টাকা পড়িবে। এক্ষেত্রে সকল দেশের চিকিৎসকগণের সুবিধা লক্ষ্য রাখিতে হইলে ইহার জন্য ১০৲ টাকা খরচ নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। সকল দেশে সমুদয় দ্রব্য সমান সুলভ হয় না। কলিকাতায় বণিজ দ্রব্যের মূল্য সুলভ, কিন্তু কাঠ ও সংগৃহীত দ্রব্যের মূল্য অত্যধিক। সেইপ্রকার কোন কোন দ্রব্য ঢাকাতে সুলভ বা দুর্মূল্য, অন্য দেশেও সেই প্রকার সুলভ দুর্মূল্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। এরূপক্ষেত্রে সকল দেশের চিকিৎসকের সুবিধার প্রতি লক্ষ রাখিয়া খরচ নির্দ্দিষ্ট না হইলে যে স্থানে যে দ্রবের মূল্য অধিক জন্য যে ভেষজের মূল্যাধিক্য ঘটিবে, সেখানে তাহা প্রস্তুত বা ব্যবহার করা সম্ভবপর হইবে না, এবং ইহাতে চিকিৎসায় ক্রটী হইবে।

মকরধ্বজ পাকের পারিশ্রমিক ২৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মকরধ্বজ প্রস্তুতের পূর্ব্বে প্রথমে স্বর্ণকে ৮ গুণ পারদের সহিত মিশ্রিত করিয়া পরে দ্বিগুণ গন্ধকের সহিত মিশ্রিত ও উত্তমরূপে কজ্জলী প্রস্তুত করিতে হয়। শক্তি ঔষধালয়ের তালিকায় ইহার জন্য কোন পৃথক খরচ ধার্য্য হয় নাই। এই কার্য্য বিশেষজ্ঞ ভিন্ন অন্যের দ্বারা হইবে না, এবং ২।৩ দিনের পরিশ্রম ভিন্ন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। এই কার্য্যের পারিশ্রমিকই অন্ততঃ ২৲ টাকা হওয়া উচিৎ।

শক্তি-ঔষধালয়ের হিসাবে মকরধ্বজ পাকের জন্য একটি মাত্র দক্ষ লোক ও তাহার পারিশ্রমিক ২৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে। ৩ দিবা রাত্রি সমান ভাবে অগ্নিসন্তাপে অবস্থান ও জাগরণ করিয়া একটি মাত্র লোকে মকরধ্বজ

হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। তাহার পর এই কঠোর পরিশ্রমের মূল্য ২৲ টাকা হইতেই পারে না।

প্রতিদিন ৪।৫ জন লোকের সাহায্য ব্যতীত এই ঔষধ পাক করিতে পারা যায় না। এক্ষেত্রে ৬ ঘণ্টা অন্তর লোক নিযুক্ত করিলে ৩ দিবা রাত্রে ১২ জন সাধারণ লোক ও দুই জন বা একজন বিশেষজ্ঞের আবশ্যক হইবে। রাত্রি জাগরণ ও অগ্নিসন্তাপে কার্য্য করিবার জন্য সাধারণ ১২জনের মজুরী গড়ে ॥০ আনা হিসাবে ৬৲টাকা হয়। বিশেষজ্ঞের মজুরী খুব কম পক্ষে ১০৲টাকা হওয়া উচিৎ।

স্বর্ণ গলাইয়া বিক্রয়ের জন্য যে ২৩৲ টাকা বাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রকৃত মূল্য কম হইবে। যেহেতু পারদের সহিত মিশ্রিত স্বর্ণের কজ্জলী প্রস্তুতকালে ও মকরধ্বজ পাককালে কিঞ্চিৎ স্বর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। ১ তোলা স্বর্ণ কোন কালেই পাওয়া যায় না। এই ভস্ম-স্বর্ণ গলাইবার খরচ আছে। চীনাপাত অপেক্ষা এই চাপ-স্বর্ণের মূল্য কম হয়। এই সমুদয় কারণে খুব বেশী পাইলেও ২০৲ টাকার অধিক পাওয়া যায় না, অনেক সময় ১৭৲ ১৮৲ টাকাও হয় না।

তিন দিনের জ্বালে পাক করিয়া ৭ ভরি মকরধ্বজ কোন কালেই প্রস্তুত হয় না। ৭ ভরির কম প্রত্যক্ষ দেখা গেল, অনেক সময় ৬ ভরিরও কম হইয়া থাকে।

শক্তি-ঔষধালয়ের যেখানে অধিক পক্ষে ৩৫৲ টাকা খরচ হইতেছে, সেখানে অন্ততঃ পক্ষে শোধিত স্বর্ণ ১ তোলা ২৬৲টাকা+হিঙ্গুলোথ পারদ ৮ তোলা ৪৲ টাকা+শোধিত আমলাসা গন্ধক ২৲ টাকা+কজ্জলী প্রস্তুত খরচ ২৲ টাকা+বোতল হাড়ী বালি ইত্যাদি ১৲+কাঠ ১০৲ টাকা+পারিশ্রমিক ১৬৲ টাকা মোট ৬১৲ টাকা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।*

ইহা হইতে স্বর্ণের মূল্য ২০৲ টাকা বাদ দিলেও ৪১৲ টাকাতে গড়ে ৬ ভরি মকরধ্বজ পাওয়া যাইবে। সুতরাং প্রায় ৭৲ টাকা ভরিপ্রতি খরচ পড়িতেছে।

ইহার পর মকরধ্বজের আরও ১টি খরচ ধরিতে হয়। ৩ দিবা রাত্রির জ্বালে কাচের বোতল গলিয়া গিয়া হাঁড়ির তলস্থ ছিদ্রপথে মূল্যবান স্বর্ণাদি পদার্থ বাহির হইয়া দ্রব্য ও পরিশ্রম সমুদয় নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য শতকরা অন্ততঃ ১০ বোতল ক্ষতি ধরিলে প্রতি বোতলে অর্দ্ধ তোলার অধিক বাদ যাইয়া প্রতি বোতলে আরও ৪৲ টাকা খরচ বেশী পড়িবে।

তাহার পর ঔষধ বিক্রয়কারীগণের বিজ্ঞাপনের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় হইয়া ঔষধের মূল্য অধিক হইয়া যাইবে। চিকিৎসকগণেরও দান-দাতব্য, মূল্য অনাদায় প্রভৃতির জন্য খরচ বেশী হইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে ৩৲কেন ৮।১০৲ টাকা ভরি বিক্রয় করাও সম্ভবপর হইবে না।

অবশ্য ৪ প্রহরের জ্বালে প্রস্তুত রসসিন্দুর অল্প পরিশ্রমে ও খরচে প্রস্তুত হয় বলিয়া অল্প মূল্যে দিতে পারা যায়, এবং মকরধ্বজ বলিয়া বিক্রয় করিলেও ধরিবার উপায় নাই। কিন্তু ১৲ টাকা ভরির রসসিন্দূর ৪৲ টাকা ভরি বিক্রয় করা ন্যায় বা ধর্ম্ম সঙ্গত হইতে পারে না।

অধ্যক্ষ মথুর বাবু নিজেদের বিজ্ঞাপনের ভাবায় প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, 'যদি কোন কবিরাজ বলিতে প্রয়াসী হন যে, মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতে প্রতি তোলায় ২৲টাকার অধিক খরচ পড়ে, তবে আমরা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছি যে তাঁহার কথা সত্য নহে।' কিন্তু তাঁহাদের এই প্রতিজ্ঞা কার্য্যতঃ প্রমাণের কোন চেষ্টা নাই। সতীশবাবু ও আমি

চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, এসময়ের দর ধরিলে আরও অধিক

যে সকল পত্র দিয়াছি,—এবং তাঁহারা সে পত্রের যাহা উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে আমাদের হিসাব ভুল এবং তাঁহাদের হিসাবই ঠিক, এরূপ কোন প্রমাণই তাঁহারা দিতে পারে নাই। মথুরবাবু শিক্ষিত ও ব্রাহ্মণসন্তান হইয়া কিরূপে সত্যের অপলাপ এবং জনসাধারণকে বিড়ম্বিত করিতেছেন, তাহারও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। ইহা হইতেই তাঁহাদের ব্যবসায়ের ও বাক্যের সততা সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। বিজ্ঞাপন পুস্তকে তাঁহারা জানাইতেছেন যে, "আমরা উৎকৃষ্ট মুর্শিদাবাদী হিঙ্গুল হইতে বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা পারদ বাহির করিয়া প্রথম নম্বরের স্বর্ণকে পরিশোধিত করিয়া শোধিত পারদের সহিত ঠিক আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিধানানুসারে বিশুদ্ধ মকরধ্বজ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছি।"

মুর্শিদাবাদী হিঙ্গুলের কারবার শক্তি-ঔষধালয় স্থাপনের বোধ হয় ২০ বৎসর পূর্ব্বে উঠিয়া গিয়াছে, একথা ঢাকার মথুর বাবুর জানা নাই। অথচ তিনি নিজের ঔষধের উৎকর্ষতার প্রমাণও জনসাধারণকে মুগ্ধ করিবার জন্য এই সুদীর্ঘকাল 'মুর্শিদাবাদী হিঙ্গুল' ব্যবহার করেন, এরূপ বলিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা যে কেমন আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিধানে মকরধ্বজ প্রস্তুত করেন, তাহা তাঁহাদের পত্রের ভাষাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। সাধারণের অবগতির জন্য তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল।

সতীশ বাবুর পত্রের উত্তরে
শক্তি ঔষধালয়ের পত্র।

শক্তিঔষধালয় ঢাকা—
মান্যবরেষু— ২রা মাঘ ১৩২৩।

আপনার পত্র যথা সময়ে পাইয়াছি। ৭২ঘণ্টা জাল দিয়া মকরধ্বজ প্রস্তুত কারক কবিরাজ মহাশয়ের নাম ধাম ও ঠিকানা লিখিয়া জানাইবেন এবং তিনি যে অধ্যাপকের নিকট কবিরাজি অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহার নাম ও লিখিয়া জানাইবেন।

সতীশবাবু তাঁহাদের জ্ঞাতব্য বিষয়ের কোনও উত্তর না পাওয়ায় তিনি আর উত্তর দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই। কর্ত্তব্যবোধে আমি যে পত্র দিয়াছিলাম তাহাও এখানে উদ্ধৃত হইল।

"শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয় আপনাদের মকরধ্বজের মূল্যাদি সম্বন্ধে যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহার অদ্ভুত উত্তর পাইয়াছেন। আপনাদের পত্রের ভাবে বুঝিলাম, তিন দিবারাত্রির জালে কেহ মকরধ্বজ প্রস্তুত করেন না, বা করিতে পারেন না। যদি সেই বিশ্বাসই আপনাদের থাকে, তবে বিজ্ঞাপন পুস্তকে '৩ দিন পাক করিবে' এরূপ অনুবাদ দিবার প্রয়োজন কি? ইহা বোধ হয় 'মুর্শিদাবাদী হিঙ্গুলের' ন্যায় জনসাধারণকে প্রলোভিত করিবার জন্য। ৭২ ঘণ্টা জালের মকরধ্বজ প্রস্তুতকারীর নামধাম ঠিকানা চাহিয়াছেন, স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় শাস্ত্রবিধানে ৩ দিবারাত্রির জালে মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতেন। তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ সেই ভাবেই করিয়া থাকেন। আমি স্বয়ং এই বিধানে মকরধ্বজ প্রস্তুত করিয়া থাকি, প্রয়োজন হইলে প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারিব। এক্ষণে আপনি পূর্ব্ব পত্রের অন্যান্য বিষয় গুলির উত্তর দানে বাধিত করিবেন। ন্যায়ের মর্য্যাদা রাখিয়া উত্তর দিবেন; আমরা এরূপ উত্তরের প্রত্যাশী নহি।"

এই পত্রের উত্তরে ৮ই মাঘ তারিখে মথুর বাবু লিখিয়াছেন, "আপনি কি নিয়মে কি পরিমাণ স্বর্ণ, গন্ধক ও পারদ দ্বারা 'মকরধ্বজ' তৈয়ারী করেন জানাইবেন। আপনি ভদ্রোচিত ভাষায় পত্রাদি লিখিতে চেষ্টা করিবেন। তবেই উত্তর পাইতে পারিবেন, নতুবা উত্তর দেওয়া হইবে না। ইতি"।

প্রশ্ন কর্ত্তার লিখিত বিষয়ের উত্তর না দিয়া অনাবশ্যক প্রশ্ন করা এবং একজন চিকিৎসকের ও তাহার অধ্যাপকের নাম ধাম ঠিকানা জানিবার

এরূপ অনাবশ্যক পত্র লেখায় কোন কার্য্য হইতেছে না বলিয়াই আমাকে বাধ্য হইয়া প্রকাশ্য আন্দোলন করিতে হইল। উভয় পক্ষেরই হিসাব দেওয়া হইয়াছে, মথুর বাবুর যদি কোন বক্তব্য থাকে বা আমার যদি কোন ভুল হিসাব থাকে, তিনি জানাইলে সাধারণে ইহার প্রকৃত রহস্য অবগত হইতে পারিবে। আমরা মকরধ্বজের কথাই এখানে উল্লেখ করিলাম। যদি কোন সত্যানুসন্ধী আবশ্যক বোধ করেন, তবে আমি স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া দেখাইতে পারিব যে, চ্যবনপ্রাশ, পঞ্চতিক্ত ঘৃত, কৃষ্ণচতুর্ম্মুখ, ত্রিশতী প্রসরণী তৈল, বৃহৎ বিষ্ণু তৈল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঔষধগুলি এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীগণ যেমূল্যে বিক্রয় করিতেছে, শাস্ত্রানুযায়ী প্রস্তুত করিতে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যয় হইয়া থাকে। এই সকল ব্যবসায়ীগণ কিরূপ চাতুরীর সহিত ঔষধের মূল্য নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিলে ইহাদের ক্ষমতা সম্যক অবগত হইতে পারা যাইবে। আয়ুর্ব্বেদের যে সকল ঔষধ অতুলনীয় গুণে মানবমাত্রেরই পরিচিত, তাহারই কয়েকটির মূল্য অতি সুলভ রাখিয়া ইহারা অন্যান্য ঔষধ উচ্চ মূল্যেই বিক্রয় করিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা এই ঔষধালয়েরই 'বৃহৎ গুড়পিপ্পলী' নামক একটি সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধের উল্লেখ করিতে পারি। এই ঔষধটিতে বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুড়, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, সমুদ্র ফেন, চই, গজপিপুল, কৃষ্ণজীরা, তাল জটা—কুমড়ার ডাঁটা, অপামার্গ, তিন্তিরিও চিতামূলের ক্ষার প্রত্যেক সমভাগ, দ্বিগুণ গুড় ও গুড়ের সমান পিপুল চূর্ণ আবশ্যক হয়।

যদি পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যগুলি ১ তোলা হিসাবে লওয়া যায়, তবে গুড় ও পিপুল চূর্ণ প্রত্যেকটির ৪ তোলার সহযোগে পৌনে দুই সের ঔষধ প্রস্তুত হইবে। উপরোক্ত দ্রব্যগুলির প্রত্যেকটির মূল্য গড়ে ৵০ আনা করিয়া ধরিলেও অধিক ধরা হয়, পিপুল চূর্ণ ও গুড়ের জন্য ৸০ টাকা ধরিলে যথেষ্ট হইবে। সুতরাং ৩৲ টাকাতে পৌনে দুই সের ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। যে ঔষধ প্রস্তুতে প্রতি সেরে পৌনে দুই টাকা খরচ হইতেছে, তাহাই ইহারা প্রতি সের ১৬৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতেছে। কি চমৎকার শস্তা!

বাজারে সাধারণ গব্য ঘৃত ২৲ টাকা সের বিক্রয় হয়, বিশুদ্ধ ঘৃত সংগ্রহ করিতে হইলে আরও অধিক মূল্য পড়ে। এই ঘৃতকে ঔষধের ব্যবহারোপযোগী পুরাতন করিতে অন্ততঃ ৫ বৎসর রাখিতে হইলে (শত করা ১৲ টাকা সুদ মাত্র খরচ করিলে) ঘৃতের মূল্য ৩৲ টাকার অধিক হইবে। পঞ্চতিক্ত ঘৃত প্রস্তুত করিতে ঘৃতের মূর্চ্ছা পাক ও ঔষধ পাকে সের প্রতি তিন ছটাক হইতে এক পোয়া ঘৃত কম হইবে। ঔষধের মসলা, জ্বালানী, পরিশ্রম কিছু না ধরিলেও এক্ষেত্রে প্রতি সের ঘৃতের ৪৲ টাকা মূল্য হইতেছে, অথচ ইহারা সেই ঘৃত ৪৲ টাকা সের বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভবান হইতেছে। ঔষধি সিদ্ধ 'পঞ্চতিক্ত' ঘৃত ৪৲ টাকা সের বিক্রয় যাহারা করিতেছে, তাহারাই পুনরায় পুরাতন ঘৃত ৮৲ সের বিক্রয় করিতেছে। ।০ আনা সের গুড় কিঞ্চিৎ পুরাতন হইলেই ইহাদের নিকট ৫৲ টাকা সের হয়। ইহার অধিক আর কি আশ্চর্য্য হইতে পারে!

ইহাদের সকল ঔষধ লইয়াই আলোচনা করিতে পারা যায়; কিন্তু এই দুএকটি হইতেই ইহাদের কার্য্যকলাপ বুঝিতে পারা হইবে। সাধারণের প্রাণ ও অর্থ লইয়া যে ব্যবসা, তাহাতে এরূপ গলদ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। সেজন্যই আমাদের এই সকল অপ্রিয় সত্যের আলোচনা করিতে হইল।

সুলভ ঔষধের ব্যাপার ত এই প্রকার। এখন যাঁহারা সুলভে ঔষধ খরিদ করিতে সুখানুভব করেন, তাঁহাদিগকে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিলাম না। সুলভে ঔষধ লইতে

সকলে ত সমান শস্তা দেয় না। যখন প্রিয় পরিজন রোগ-যন্ত্রণায় কাতর, তখন গয়া, বারাণসী, ঢাকা, কলিকাতার ঔষধ-সংগ্রহ-ব্যাপার কি সম্ভবপর হইবে? এই যে ৪৲ টাকা ভরির মকরধ্বজ বিক্রেতা মথুর বাবু, তিনিও জ্বরের যে 'সুদর্শন চূর্ণ' ৭ পুরিয়া ৷৷০ আনায় বিক্রয় করিতেছেন, 'কল্পতরু আয়ুর্ব্বেদ ভবনে' তাহার ৪০টির মূল্য ।৵০ আনা, আবার তাহার সহিত একটি শিশি 'ফাও' আছে। শক্তি ঔষধালয়ে তালিশাদি চূর্ণ ।০ আনায় ৭টি, আর এখানে ।৴০ আনায় এক কুড়ি।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বর, শঙ্খবটি, সুদর্শনচূর্ণ, তালিশাদি, ভাস্কর লবণ, মধুরবিবেচক, এই ছয়টি ঔষধ 'কল্পতরুর' নিকট প্রার্থী হইলে ১৸৵০ টাকাতে মায় শিশি, সুদৃঢ় বাক্স ও একখানি গৃহচিকিৎসার পুস্তকের সহিত প্রত্যেক ঔষধ ২০টি করিয়া পাইবেন, —যাহার সাহায্যে জ্বর, কাসি, অজীর্ণ, উদরাময়, অম্লপিত্ত, অম্লশূল, কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য দুই চারি বা ষোড়শ রজত মুদ্রা ব্যয় করিয়া চিকিৎসক ডাকিবার আবশ্যক হইবে না। কিন্তু মকরধ্বজ লইতে হইলে ২৪৲ হইতে ৫০৲ টাকা ব্যয় পড়িবে। চ্যবনপ্রাশের মূল্যে 'কল্পতরু' নামের সার্থকতা রক্ষা হইয়াছে। ৮৲ টাকা ৪৲ টাকা সের যিনি যাহা চাহিবেন, 'নম্বর' অনুযায়ী তিনি তাহাই পাইবেন? তবে যদি আরও সুলভ আবশ্যক হয়, সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন দেখিবেন,—২৲ টাকা সেরের চ্যবনপ্রাশ, ৩৲ টাকা ভরি মকরধ্বজের অভাব হইবে না।

এক্ষণে কল্পতরুআয়ুর্ব্বেদভবনের প্রতিষ্ঠাতা-শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয়কে একটি কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। অধ্যক্ষ মথুর বাবু না হয় শিক্ষকতা হারাইয়া ঔষধ বিক্রয়ের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। ঔষধ-বিজ্ঞানে তিনি অনভিজ্ঞ, তাই তিনি প্রায় সকল ব্যাধিরই ঔষধ নির্দ্দেশের পূর্ব্বে 'মকরধ্বজের' উল্লেখ করিয়াছেন,

সেবন করিতে পারেন, তাহার জন্য সুলভ সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ চিকিৎসকের ঔষধের সুলভ সংস্করণ* বাহির করিয়া আয়ুর্বিজ্ঞানহীন মানবমাত্রকেই চিকিৎসক করিবার চেষ্টা উচিত হইয়াছে কি? ছয়টি মাত্র ঔষধ লইয়া ৭টি জটিল পীড়ার চিকিৎসা করিতে চিকিৎসকগণ ও সাহসী হইবেন না, সেই কার্য্যে জনসাধারণকে পরামর্শ দেওয়া তাঁহার ন্যায় ধীমান চিকিৎসকের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। ঔষধের অপপ্রয়োগ হইতে কি প্রকার বিপত্তি উপস্থিত হইতে পারে, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত নহে। তাঁহার ন্যায় প্রকৃত শাস্ত্রার্থবেত্তাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে,—

"ভেষজং বাপিদুর্যুক্তং তীক্ষ্ণং সম্পদ্যতে বিষম্ ॥"

হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার ন্যায় গৃহে গৃহে কবিরাজী ঔষধের প্রচারে কবিরাজী চিকিৎসার প্রচার হানি ভিন্ন বৃদ্ধি হইবে না। অল্প খরচে আরোগ্য লাভের আশায় বঙ্গে প্রতি গৃহেই আজ কাল হোমিওপ্যাথী গৃহচিকিৎসার বাক্স দেখিতে পাওয়া যায়। চিকিৎসা জ্ঞানহীন জনসাধারণ ব্যাধি লক্ষণ প্রকাশ মাত্রেই প্রথমে এই সকল ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন; সামান্য ব্যাধি, ঔষধ গুণেই হউক, আর স্বভাবতঃই হউক, আরোগ্য হয়, কিন্তু একটু কঠিন হইলেই তখন আর হোমিওপ্যাথী ঔষধে বিশ্বাস না রাখিয়া অন্যবিধ চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করে। এই উপায়ে হোমিওপ্যাথী ঔষধ আশাতীত বিক্রয় হইলেও চিকিৎসার গৌরব বৃদ্ধি হইতেছে না।

যদি কেহ আয়ুর্ব্বেদের প্রকৃত হিত ইচ্ছা করেন, তবে সাধারণকে সুলভের মোহে মুগ্ধ না করিয়া চিকিৎসক সম্প্রদায় যাহাতে সুলভে ঔষধ প্রাপ্ত হন, তাহার ব্যবস্থা করিলে প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত

* কল্পতরু আয়ুর্ব্বেদ ভবনে সকল ঔষধই যদি সুলভ হইত, তবে আমাদের বলিবার কিছু ছিল না। ইহারাও

হইবে। জনসাধারণ সুলভে ঔষধ পাইলেও, অর্থ ব্যয় করিয়া অন্যের নিকট ব্যবস্থা প্রার্থী হইতে হইবে। ঔষধ বিক্রেতা দূর হইতে সকলের কিছু নির্ভুল ব্যবস্থা দিতে পারিবেন না। অনেক রোগে রোগী না দেখিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিতে পারা যায় না। প্রতিদিন শত শত রোগীর রোগের বিষয় চিন্তা করিয়া ঔষধ বিক্রয় সম্ভবপর হয় না। কিন্তু চিকিৎসক সম্প্রদায় যদি সুলভে সকল প্রকার ঔষধ পান, তবে পরিশ্রমের অভাবে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে ঔষধ দিতে পারিবেন, এবং ঔষধ প্রস্তুতের সময় যাহা তাঁহারা অবকাশ পাইলেন, সে সময়ে অধিক সংখ্যক রোগী পরিদর্শনে আয় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

চিকিৎসকগণের গৃহে গৃহে ঔষধ প্রস্তুতের জন্ম খরচ অনেক বেশী পড়ে; সকলের পক্ষে সকল প্রকার ঔষধ প্রস্তুত রাখা সম্ভবপর হয় না। সময় অভাব জনিত অসুবিধাও ভোগ করিতে হয়। এ সকল কারণে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতের কারখানার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। এই কার্য্যে অনেক স্বার্থ ত্যাগের ও প্রভূত অর্থের আবশ্যক হইবে। ধনীর অর্থ ও চিকিৎসক সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টা ভিন্ন এ কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। এইরূপ ঔষধালয় স্থাপিত হইলে তাহার লব্ধ আয় হইতে আয়ুর্ব্বেদ বিশ্ববিদ্যালয়, দাতব্যঔষধালয় স্থাপনের সুযোগ উপস্থিত হইবে। ভারতের ভাবী চিকিৎসকগণ এই বিদ্যালয়ে পূর্ব্বকালের ন্যায়—নিজ অভিরুচি মত শল্য-শালক্যাদি বিভিন্ন তন্ত্রের শিক্ষা পাইবেন, ঔষধালয়ের কার্য্যাবলী স্বহস্তে সম্পাদন করিয়া ঔষধ শিক্ষায় ও প্রস্তুত ঔষধের বিশুদ্ধতায় নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন। দাতব্য ঔষধালয়ের উপস্থিত রোগীগণের চিকিৎসা দেখিয়া আয়ুর্ব্বেদের সংখ্যাতীত উৎকৃষ্ট ঔষধ সমূহের গুণাগুণ পরীক্ষা করিতে পারিবেন। সাধারণেও ইহাদিগকে সুশিক্ষিত বিবেচনা করিয়া নির্ভয়ে

যদি কখন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সম্প্রদায় নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া ভারতের চিকিৎসকবহুল স্থানে এই প্রকার ঔষধালয় ও বিদ্যালয় স্থাপনা করিতে পারেন, যে দেশে যে জাতীয় ভেষজ দ্রব্য উৎকৃষ্ট ও সুলভ, তাহা সেখান হইতে শাস্ত্রনির্দেশ মত সংগ্রহ করিয়া ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতে পারেন, তবে সাধারণের কবিরাজী ঔষধের অবিশুদ্ধতা জনিত অশ্রদ্ধা দূর হইয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার আদর বৃদ্ধি হইবে। একযোগে ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারিলে চিকিৎসার ব্যয় হ্রাস হইয়া সাধারণের প্রকৃত উপকার হইবে, এবং দেশীয় চিকিৎসার প্রচার ও অধিক হইবে।

ঔষধালয় ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি হইলে কোন চিকিৎসকই সে ঔষধালয়ের ঔষধ ব্যবহার করিতে সাহসী হইবে না। সকলেরই মনে ধারণা হইবে, অর্থাকাঙ্ক্ষা বশে যে ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠা সেখানে সুলভ প্রচার জন্ম ঔষধ প্রস্তুতে যথাযোগ্য অর্থ ব্যয় না হইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদের ক্ষতির জন্ম আজ যাঁহাদের প্রতি কটাক্ষপাত করিলাম, তাঁহারা নিজেদের কৃতকার্য্যের সমালোচনা করিয়া আমার প্রতি সন্তোষ অসন্তোষ যাহা ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারেন। কাহার ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতির উদ্দেশ্যে আমি কোন কথা বলি নাই, আয়ুর্ব্বেদ, দেশ ও সমাজের স্বার্থরক্ষার জন্ম আমাকে এই সকল অপ্রিয় সত্যের আলোচনায় বাধ্য করিয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—এই প্রবন্ধে যে একটী গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে, তাহার সুমীমাংসা হওয়া আবশ্যক বোধে আমরা ইহা পত্রস্থ করিলাম। যাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা, তাঁহাদিগের নিকট, এবং কৃতবিদ্য কবিরাজমণ্ডলীর নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ, এসম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত সাধারণ্যে প্রচার করিবার জন্ম আমাদিগকে জ্ঞাপন করেন। এসকল

উচিত নহে। প্রবন্ধ লেখকের ভাষা, স্থানে স্থানে অপেক্ষাকৃত সংযত হওয়া উচিত ছিল। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ক্ষেত্রে মথুর বাবুর অনধিকার প্রবেশের অভিযোগ মিথ্যা নহে। অতএব তাঁহার বক্তব্য সাধারণের গোচর হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ধঃ সঃ

টীকা-টিপ্পনী।

বৈশাখের মরশুমে অনেক নরবলি হইয়াছে, অনেকের পৈত্রিক ভদ্রাসন বাঁধা পড়িয়াছে,—অনেকে উচ্চহারে সুদ দিয়া কাবুলীর নিকট ঋণ করিয়া বরের বাবার পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়াছেন,—অনেক ছেলেওয়ালা, এই সুযোগে, হাতের নোয়া সোণায় বাঁধাইয়া সক মিটাইয়া লইয়াছেন!

শুনাযায়, এই শ্রেণীর বরের বাবাদের সম্প্রতি একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। আজকাল "নায়ক" পত্র দেশের দশের ঘরের খবরটা কিছু বেশী রাখেন। কাহার ঘরে কত টাকা আছে, কে কত টাকা কি ভাবে পাইতেছে,—কি বাবদে ব্যয় করিতেছে, এসকল সমাচার রাখিবার চেষ্টা তাঁহার কিছু অধিক। আমাদের বিশ্বাস, সমর-ঋণের মরশুমে বরের বাবাদের প্রাপ্তিটা সম্বন্ধে একটা খতিয়ান প্রকাশ করিলে, 'নায়ক' একটা মহৎকার্য্য সাধন করিবেন!

আর একটী কথাও ভাবিবার বিষয় বটে। এই সমর-ঋণের অজুহাতে বরের বাবা মহাশয়েরা বরের দরটা কিছু চড়াইবার সুযোগ খুঁজিবেন না কি? জন্ম হইতে বিবাহের বয়স পর্য্যন্ত ছেলেকে প্রতিপালন করিবার খরচাটা ত এখন, মূল্য ধার্য্যের সময়, একপ্রকার বলিয়া কহিয়াই ধরিয়া লওয়া হয়। সমর-ঋণটা যখন একটা অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত, তখন বরের মূল্যের উপর এই বাবদে শতকরা একটা কিছু ধরিয়া লইলে, সম্ভবতঃ কাহারও বলিবার কিছু থাকিবে না। বরের বাবারা তাঁহারা যদি ভুলিয়া রহেন, 'নায়ক' সম্পাদক মহা-মহাশয় সম্ভবতঃ এ কথাটা স্মরণ করাইয়া দিতে ভুলিবেন না।

রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ গুপ্ত একজন খাঁটী সিভিলিয়ান। রংপুর জেলার উন্নতি বিধান কল্পে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার অদম্য চেষ্টায় সম্প্রতি রঙ্গপুরে 'কারমাইকেল কলেজ'এর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এজন্য শুধু রঙ্গপুর কেন, উত্তর বঙ্গের জনসাধারণ তাঁহাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে। কিন্তু সমর-ঋণ সংগ্রহে তিনি প্রজা সাধারণের উপর অত্যাচার করিতেছেন বলিয়া "নায়ক" এই লোক-প্রিয় ম্যাজিষ্ট্রেটকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য কমিশনর এবং বঙ্গের গভর্ণরের দোহাই দিতেছেন! যিনি পব্লিক্-সর্ব্বিস্-কমিশনে সাক্ষ্য দান কালে স্পষ্টবাদিতা প্রদর্শনে অনুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, গভর্ণমেণ্টের খয়েরখাঁ-গিরি দেখাইবার জন্য যে তিনি সমর-ঋণ সংগ্রহে প্রজার উপর অত্যাচার করিবেন, 'নায়ক' সম্পাদক ব্যতীত অপরের মুখে একথা শোভা পায় কি? এই বাঁদরামীর প্রতিকূলে যে একটা সভা হইয়াছে!

প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্সের সমস্ত ব্যয় বহন করিয়া শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ গুপ্ত মহাশয় সভাপতিত্ব ক্রয় করিয়াছিলেন, 'নায়ক-সম্পাদক' মহাশয় এরূপ কথা প্রকাশ করিতেও লজ্জা-বোধ করেন নাই! তাঁহার এই উক্তির প্রতিবাদ যখন প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তখন,—

রসের ভাষা এখনকার লোকে বুঝিতে অক্ষম,—একজন ব্রাহ্ম আমাকে বলিয়াছিল," ইত্যাদি কথায় শাক দিয়া মাছ ঢাকিতে যাঁহার লজ্জাবোধ নাই, তাঁহার মনুষ্যত্বে আস্থা স্থাপন করা কতকটা বেয়াকুবী। ইনি অর্চ্চনা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্. এ, বি এল্‌কে সম্প্রতি যেরূপ ভাষায় গালি দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া তাঁহাকে কি বিশেষণে অভিহিত করা কর্ত্তব্য, অভিধানে তদ্রূপ শব্দের সম্পূর্ণ অভাব।

গালাগালির হেতুও অলৌকিক এবং অশ্রুত-পূর্ব্ব! কেশববাবুর লিখিত একটী গল্পের সমালোচনা করিতে যাইয়া শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় কিয়ৎ পরিমাণে নিরপেক্ষতা ও ন্যায়-পরতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছিলেন। সংসর্গ দোষেই সমাজপতি মহাশয়ের এই পদস্খলনটুকু ঘটিয়াছে। নতুবা "নায়ক-পত্রের" সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ঘটিবার পূর্ব্বে কখনও এরূপ দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। সমালোচনায়, তাঁহার ভাষার তীব্রতা সময়ে সময়ে পরিলক্ষিত হইয়া থাকিলেও সেই তীব্রতাতে একটা মধুর ভাব অনুভূত হইত,—মেছোহাটার ভাষা প্রয়োগে তাঁহাকে নিয়তই পরাঙ্মুখ দেখিতাম। এখন "দাদা"র সহকারিত্বে তাঁহার এই পট-পরিবর্ত্তনটুকু দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার ন্যায় একজন নিরপেক্ষ সমালোচকের এরূপ পদস্খলন দেখিয়া আমরা হতাশ হইয়াছি!

কেশববাবু তাঁহার 'অর্চ্চনা-পত্রে' এই সমালোচনার একটী প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। এই প্রতিবাদ প্রকাশে কেশব বাবু, ভাষা ও ভাবে প্রতিযোগিতা প্রদর্শন না করিলেই ছিল ভাল। তাহা করিয়া তিনি বৈদ্যজাতির স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমাশীলতার অপব্যবহার করিয়াছেন। যাহা হউক, কেশববাবুর এই অপরাধে নায়ক সম্পাদক বলিয়াছেন,—

"আমাদের সুরেশচন্দ্রকে চাবাধোপা-পাড়ার একটা খেকী কুকুর কামড়াইয়া দিয়াছে। তায়া তাহার ল্যাজে পা দিয়া ফেলিয়াছিলেন। কেলে কুকুরটার গলায় কলার আছে। বোধ হয়, ও পাড়ার কোনও লক্ষহীরার পোষা কুকুর। শুনিলাম, কিছুদিন পূর্ব্বে বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটের এক বৈদ্য গৃহস্থের বৈঠকখানায় ঢুকিয়া কামড়াইতে গিয়াছিল। তাহারা লাঠী পেটা করিয়া তাড়াইয়া দেয়। ভায়াকে এত বলি, একটা লাঠী হাতে রেখো। সে কথা ত কানে তুলিবে না। এখন যাও গোঁদলপাড়ায়—ছোট কসৌলীতে।"

নায়ক সম্পাদকের নিকট হইতে এতদপেক্ষা অধিক ভদ্রতার আশা কেহ কখনও করে নাই, করেনা, করিতে পারিবেও না। বিশেষতঃ বৈদ্যের গন্ধ পাইলে তিনি যেন একটু সপ্তমে চড়িয়া উঠেন। বৈদ্যের 'লবণ' তাঁহার উদরস্থ হয় নাই, একথা তিনি বলিতে পারেন না। তাহা হইলেই বা কি? যে 'বঙ্গবাসী'র কৃপায় তিনি মানুষ বলিয়া পরিচয় দিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন,—যে বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহাকে ভ্রাতৃস্নেহের অধিকারী করিয়াছিলেন,—তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াও যিনি অলৌকিক সত্যনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আজ সেই 'বঙ্গবাসী' এবং সেই যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের পুত্রদিগের প্রতি তিনি কিরূপ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা জনসাধারণের অগোচর আছে কি? যাহা হউক, সামান্য অর্থের মায়ায় শ্রদ্ধাস্পদ সমাজপতি মহাশয়কে এহেন মহাপুরুষের সাহচর্য্যে পদস্খলিত দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি! দেখিতেছি, তাঁহাকে সত্য সত্যই পেঁচোয় পাইয়াছে!

রঙ্গালয়ের সম্পাদক-মূর্ত্তিতে 'নবযুগ-মানহানি'র মোকদ্দমায় ফরিয়াদী সাজিয়া নায়ক-সম্পাদক মহাশয় যে যশোমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,—তাহার পর কিছু দিন অতিবাহিত হইল, হাবড়ায় মাড়োয়ারি-মানহানি মোকদ্দমায়

আসামী-মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষমা প্রার্থনাপূর্ব্বক যে উদারতা প্রদর্শন করিয়া সেই মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার" করিয়া তাহার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন, সম্ভবতঃ সেই যশের প্রভাবেই আজ কাল মাননীয় ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, দেশপূজ্য বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মনস্বীবর্গের সহিত 'দাদা' সম্পর্ক পাতাইতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করেন না! 'ভায়া' আর 'শ্রীমান্' সম্ভাষণে তিনি এত উদার যে, তাহাতে ছোট-বড় কেহ বাদ পড়েন বলিয়া অনুমান হয় না! এরূপ নীতি অবলম্বন করিয়া কোন কোন মহাপুরুষ নিজের 'দাম' বাড়াইবার প্রয়াস পান; কিন্তু যাহার দাম আদবে নাই,—যিনি অ-মূল্য, তিনি হাস্যাস্পদ হন। এজ্ঞানটুকু সকলের থাকে না।

নায়ক-সম্পাদক আমাদের অতি প্রাচীন সুহৃদ। তিনি যখন স্কুলমাষ্টারী ছাড়িয়া আসিয়া 'বঙ্গবাসী'র আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক আদর্শ বৈষ্ণসন্তান পরিব্রাজক কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের শিষ্যত্বগ্রহণ করতঃ হিন্দুয়ানীর দাগা বুলাইতে আরম্ভ করেন, এবং কিছুকাল পরে ইন্দ্রনাথের শিষ্যত্বগ্রহণ পূর্ব্বক 'কেষ্টকালী'র মোকদ্দমায় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের প্রতিকূলে প্রমাণ-প্রয়োগের সহায়তা করিয়া ন্যায়, সত্যনিষ্ঠা এবং কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করেন, আমরা সেই সময় হইতেই তাঁহার পরিচিত। তখন তিনি সুগোলসুঠাম গোঁফ-হীন উৎকট্ট যুবকমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেন। অধুনা তাঁহার আর সেই প্রকট-মূর্ত্তি নাই; এখন শুকাইয়া আমসীটী হইয়া গিয়াছেন! এ জীবনে গোঁফ গজাইল না বলিয়া স্যর আশুতোষের গোঁপের প্রতি অলৌকিক বিদ্বেষ! এখন গোঁফ জিনিষটা যেন তাঁহার চক্ষুশূল! ফলে এটা তাঁহার দোষ বলিয়া মনে করা যায় না। ভগবান দুনিয়া শুদ্ধ লোকের গোঁফ দিয়া কেবল ইহাঁকেই বঞ্চিত করিলেন কেন! ভগবানের এই অপরাধ অমার্জ্জনীয় হইলেও দুনিয়ার লোকের গোঁফের দিকে দৃষ্টি না করিয়া স্যর আশুতোষের গোঁফের উপর এতটা নেক নজরই বা কেন? তিনি ত আর এক খানা বই লিখিয়াও পাঠ্য করিবার ছলে, অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হইবার প্রার্থনায় স্যর আশুতোষের দ্বারস্থ হইয়া বিফল মনোরথ হন নাই যে, ইহা তাহার একটা ক্ষোভের কারণ হইবে?

একথার উত্তরে নায়ক-সম্পাদকের একটী কথা বলিবার আছে। যখন হারাণচন্দ্র রক্ষিতের 'প্রতিভাসুন্দরী, ও "সাহিত্য-সাধনা" স্যর আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য করিয়াছিলেন, তখন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দোকানে সন্ধান করিয়া 'উমা' নামক উপন্যাস খানির প্রতি দৃষ্টি করেন নাই। হিন্দুর ভাবে 'উমার' প্রতি 'আশুতোষের' প্রীতি থাকিবারই কথা। যখন তাহা ঘটে নাই, তখন আমরা নির্ব্বাক! আশুতোষের মুখেও 'বাক্' থাকিলে কি আর তিনি 'নায়কে'র এহেন কুলজী মুকের মত সহ্য করিয়া যাইতেন? শুধু স্যর আশুতোষই বা বলি কেন, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র, মাহারাজা নসীপুর, রায় সীতানাথ, বাবু সুরেন্দ্র নাথ হইতে আরম্ভ করিয়া, কমিশনর, ম্যাজিষ্ট্রর, লাট-বেলাট প্রভৃতি যাবতীয় লোকের কার্য্য-কলাপাদি সরল ও প্রাঞ্জল মেছোহাটার ভাষায় প্রকাশ করিয়া স্বকীয় প্রকৃতির পরিচয় প্রদানে তিনি কখনো কৃপণতা করেন না! তাঁহার এই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দেখিয়া আমাদের একটী আশঙ্কা জন্মিয়াছে। অধুনা নায়কপত্রে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, গুহ্যনীতি, বাহ্যনীতি, সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বর্ত্তমান রাষ্ট্রবিপ্লবে বিলাতে তাঁহার ডাক পড়িতে পারে। তাহা হইলে কিন্তু নিতান্তই আশঙ্কার কথা! যদি সত্য

সুললিত 'মেছোনী-ভাষায়' বঞ্চিতা হইবেন ! হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গিবার লোক যে আর থাকিবে না !!

পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বড়ই আপ্‌সোস্ করিয়া বলিয়া থাকেন,—'আমাদের বদ্দি জাতের ভেতর বক্তা নাই।' আমরা বলি, না থাকাটা একরূপ ভালই। আজ কাল বক্তৃতা দেওয়াটা একরূপ ব্যবসায় দাঁড়াইয়াছে। অধুনা অনেক ভাড়াটে বক্তার সৃষ্টি হইতেছে। দেশ বিদেশে বক্তৃতা দিবার জন্য কলিকাতা হইতে বক্তা রপ্তানী হইতেছে। এই সকল বক্তাদের Honorarium বা ভাতা বাবদ কিছু প্রাপ্তি আছে কি না, তাহা আমরা জানি না; কিন্তু জগদ্বিখ্যাত বক্তা সুরেন্দ্র বাবু সম্প্রতি ঢাকায় বক্তৃতা করিতে যাইয়া ১১০৲ টাকা পাথেয় গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া 'নায়ক' পত্র বেশ একহাত লইয়াছিলেন। জানি না, সমর-ঋণে ও রংরুট উপলক্ষে নায়ক-সম্পাদক যে পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে গিয়াছিলেন, তাঁহার পাথেয়টা কোন্ তহশীল হইতে খরচা পড়িয়াছে ! নায়ক পত্রের স্বত্বাধিকারী মহাশয় একজন ধনাঢ্য জমীদার। তিনি সমর-ঋণে একটা মোটা টাকা দান করিয়াছেন বলিয়া 'নায়ক' ঘোষণা করিয়াছেন; কিন্তু টাকার পরিমাণটা 'উহ্য' রাখিয়া দেশের রাজা, জমীদার, কবিরাজ, উকীল, কৌন্সলী ব্যবসাদার মহাজন প্রভৃতিকে বেদম চাব্‌কাইতেছেন। অধিকারীর দান সম্বন্ধে পর্দ্দাটা ফাঁক হয়, জনসাধারণের কিন্তু ইহা একান্ত বাসনা।

কবিরাজদিগের সম্বন্ধে নায়ক-সম্পাদক মহাশয়ের অনুগ্রহ ও নিতান্ত অকিঞ্চিতকর নহে। 'তেল বেচিয়া লক্ষপতি হইয়াছেন' এরূপ ভণিতা গাইয়া বৈদ্যসন্তানদিগকে আপ্যায়িত করিতে তিনি কৃপণতা করেন নাই। যাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি এতটা অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা তিনি উপকৃত কি না, সে কথাটা এখন চির অভ্যাস বশতঃ বিস্মৃতির অতলগর্ভে—অথবা সাময়িক খেয়ালে তাহা চাপা দিয়া রাখিয়াছেন। বলিতেছেন ত অনেক কথাই !—সুরেন্দ্র বাবু তাঁহার ছেলেকে,—কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেনের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার ছেলেকে পল্টনে দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু দেন নাই; মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রকে পাঠাইয়াছেন, একটা ছেলে কেন ছাড়ুন না? ইত্যাদি অনেক প্রকার মুরব্বীয়ানাই করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার নিজের দুইটী ছেলের অন্ততঃ একটীকে পল্টনে ভর্ত্তি করিয়া এহেন মুরব্বীয়ানা করিলে বরং মানাইত ভাল ! যাহা হউক, 'দাদা' 'ভায়া' 'শ্রীমান্' বলিয়া যতই মুরব্বীয়ানা চাল চালুন না কেন, তিনি আমাদের বয়োকনিষ্ঠ। তাঁহারও বয়স নিতান্ত কম নহে। সৌভাগ্যক্রমে তিনবার ছাঁদ্‌নাতলায় গিয়া থাকিলেও এখন পৌত্রীর ঠাকুরদাদা। ঠাকুরদাদার কি আর বহুরূপী সাজা শোভা পায়, ভায়া? দলে মিশিয়া যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সোণারচাঁদ নাতিটীর মস্তক মুণ্ডন হইতেছে! নারায়ণ ইহাঁকে রক্ষা করুণ ইহাই প্রার্থনীয়! তিনি যে আমাদের নিতান্ত প্রিয়সুহৃদ্।

গত দেড়বৎসরে সমগ্র বঙ্গে পিতৃমাতৃহীন নিঃসহায় বৈদ্যবালকবালিকার দুর্দ্দশার যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে বৈদ্যজাতির জন্য একটা Orphanage প্রতিষ্ঠা করিলে, জাতীয়তা রক্ষা করিয়া উহাদিগের একটা পথ হইতে পারে। বৈদ্যসমাজ হইতে এরূপ একটা ব্যবস্থা হওয়া উচিত, এবং এতদর্থে-বৈদ্যসন্তান মাত্রেরই সাবাঙ্গ স্বার্থ ত্যাগ করা উচিত। আমাদের বিশ্বাস, সমগ্র বঙ্গের বৈদ্যসন্তানগণ যদি দৈনিক একটী পয়সা করিয়া এই উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন, তাহা হইলেও এই কার্য্যটী সাধিত হইতে পারে। আমরা এজন্য সমগ্র বৈদ্যজাতির মতামত জানিতে বাসনা করি।

বৃদ্ধের খেয়াল।

[শ্রীআত্মারাম শর্ম্মা]

বৃদ্ধ।—কি হে সুবোধ ভায়া! কেমন আছ? কয়দিন দেখ্‌তে পাচ্ছিনা যে?

সুবোধ।—সে কি কথা মশায়! ফিরে রোব্‌বার দেখা হ'বে ব'লে যে কয় রোব্‌বার গেল, আপনার পাত্তাই মিল্‌চে না। বলি সিদ্ধির নেশায় কোন খানা-ডোবায় প'ড়েছিলেন কি?

বৃদ্ধ।—রোজ্ আধ পয়সার সিদ্ধি খাই, সেটাও তোমাদের চোকে ঠেক্‌চে দেখ্‌তে পাচ্ছি। বলি, সন্ধ্যাবেলা মটরগাড়ী চ'ড়ে ময়দানে হাওয়া খেতে খেতে যারা কেল্‌নারের বাড়ী থেকে বোতলে বোতলে হুইস্কী উড়িয়ে দেন, সেটা বুঝি আর চোকে পড়ে না, ভায়া? শুধু চোখে দেখ্‌তে না পাও, চস্‌মা ধর। সেটা ত এখন পোষাক-পরিচ্ছদের সামিল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

সুবোধ।—ছ'আনা দশ পয়সায় যদি সে সক্‌টা মিট্‌তো, তবে কি আর এদ্দিন বাকি থাক্‌তো দাদা! এখন যে 'পেবেল' ছাড়া চস্‌মা হয় না। পেবেল নিয়ে সক্ মেটাতে হ'লেই যে আমাকে 'ভেলুপেবেলে' যেতে হয়। তাতেও আপসোস্ ছিল না দাদা, যদি আপ্‌নি দয়া ক'রে ভারটা নিতেন।

বৃদ্ধ।—কিসের ভার, ভায়া?

সুবোধ।—যে ভার বইয়ে দিন-রাত হাপিয়ে মর্‌চি!

বৃদ্ধ।—বটে! তাহ'লেই বুঝি মেয়ে ক'টাকে বুড়র স্কন্ধে চাপিয়ে বৈতরণী পার কত্তে পার! তুমি সুবোধ নয় কে বল্লে?

সুবোধ।—ঘাট হ'য়েচে দাদা, এই কাণমলা খাচ্ছি। এখন কাজের কথা দুই একটা বলুন, আপীশে গিয়ে গল্প কর্‌বো।

বৃদ্ধ।—কাজের কথা? কাজের কথা ত আজ কাল কারু মুখেই শুন্‌তে পাই না, ভায়া! সকলেই যে যার নিজের কাজের কথা বলে, যে কথায় তোমার-আমার উপকার হবে তেমনতর কথা কেউ বলে কি?

সুবোধ।—কেন খবরের কাগজওয়ালারা?

বৃদ্ধ।—এতদিন দে'খে শু'নে বুঝি তোমার এই বিদ্যে হয়েচে? যেখানে স্বার্থ নাই, সেখানকার চতুঃসীমাও তারা মাড়ায় না। খবরের কাগুজেরা যে বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি! বিধাতা এদের আলাদা মাল-মস্‌লায় গড়েচেন। এরা না পারে সংসারে এমনতর কাজ নেই! এরা জল-জিয়ন্ত মানুষকে মে'রে ফেল্‌তেও দ্বিধা করে না! এই দেখনা কেন, সেদিন নায়ক-সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রীকেই মেরে ফেলেছিল আর কি! সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবাসী আবার সে কাজে সায় দিলেন। ভাগ্যিস্ আর এক জন শাস্ত্রী বাধা দিলেন, নইলে ত শিবকুমারের শ্রাদ্ধটা 'নায়ক' আপীশে এতদিনে হ'য়ে যেত!

সুবোধ।—নায়ক আপীশে শ্রাদ্ধ হ'তো কেন দাদা।

বৃদ্ধ।—শিবকুমারকে 'গুরুদেব' ব'লেচে যে, দেখ্‌তে পাওনি কি?

সুবোধ।—তবে বলুন,—গুরুহত্যা—কর্‌তে যাচ্ছিলেন?

বৃদ্ধ।—শিবকুমারকে যখন শিবলোক পাইয়ে দিচ্ছিল, তখন সে কথাটা বলা নেহাৎ অন্যায় নয়। শুধু কি এইটে, এই একমাস না যেতে ক'টা মিথ্যে কথা রটালে, ভুলে গেছ কি? এই যে রঙ্গপুরের মাজিষ্টর জ্ঞানগুপ্তের পেছনে লেগে কত কথা রটিয়েছে, তার জন্যে সেখানে তাজহাটের রাজা সাধারণ-সভা ক'রে মুখের মতন অষুধ দেবার ব্যবস্থা করেচেন। যাক্ ভায়া! ও লোকটার নাম করে আর মনটা খিচড়িয়ে দিওনা।

সুবোধ।—আচ্ছা আর বল্‌বো না, এই কাণমলা খাচ্চি! কিন্তু বল্‌চি কি, যখন সংসার শুদ্ধই এরূপ বলে বল্‌'চেন, তখন ত কারু নামই কত্তে হয় না! তবে কি কেবল সকাল আটটায় তাড়াতাড়ি চাট্টি ভাত গিলে আপীশ যা'ব, আর সেখান থেকে এসে ঘরে চুপ টী করে বসে থাক্‌ব? ভেবে ভেবে ম'রে যাব যে! ভাবনার ত আর কসুর নেই! এখন থেকেইত মেয়ের বিয়ের ভাবনা ঢুকেচে।

বৃদ্ধ।—দেখ ভায়া, সুবোধ! যাদের আসল কাজ করবার মতলব, তারা ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বেড়ায় না চুপি চুপি কাজ ক'রে যায়। যখন কাজ সিদ্ধি হয়, তখন আপনি ঢাক-ঢোল বেজে ওঠে, দশজনেই বাজায়। একটা ছোট কথা দিয়েই দেখনা কেন,—এই যে তোমাদের 'বিদ্বৎসভা' গত দুই বছর থেকে পাতান হয়েচে,—'ধন্বন্তরি' দেড়-বছরের ওপর থেকে সভার কথা নিয়ে দেশময় ঘু'রে বেড়াচ্ছে, তোমাদের ভেতর সকলেই যে একবারে মনে-প্রাণে এটার দিকে ঝুঁকে আছে, তামা-তুলসী গঙ্গাজল নিয়ে একথা বল্‌তে পা'র কি? কেউবা চক্ষুলজ্জা এড়াতে না পে'রে,—কেউবা মুখের খাতিরে,—কেউবা মনের টানে; সকলেই যার যার খেয়ালের মত এটার সঙ্গে রয়েচে। যতীন ভায়াকে জিজ্ঞেস কল্লে কিন্তু জবাব পাওয়া যাচ্ছে,—'যাদের মাথা বিগ্‌ড়ে গেচে, তাদের শোধ্‌রা'তে একটু সময় নেবে—উৎলা হ'লে বা চট্‌লে চল্‌বে না। দেখুন না, যারা এখন বাঁকিয়ে রয়েচে, তাদের ঠিক সোজা হ'য়ে আসতেই হবে। তখন অনেকের থোতা মুখ ভোতা হবে। ধৈর্য্যের দরকার।" কথাটা কিন্তু মিছে ব'লে মনে হয় না ভাই! এই দেখনা কেন এক খানা কার্ডে পিয়ন ভায়াকে না পেয়ে, দুয়োর আমার হাতেই দিয়ে গেচে।

শ্রীশ্রীজগদীশো বিজয়তে।

পোঃ লহিড়ী, জেলা দিনাজপুর।

মাননীয় ধন্বন্তরি সম্পাদক মহাশয়! আমি একজন ধন্বন্তরির গ্রাহক, ভবিষ্যতে ধন্বন্তরির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারি; জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি ধন্বন্তরি চিরায়ু হইয়া বৈদ্যসমাজের উন্নতি সাধন করিতে থাকুক। আমার একখানি মনুসংহিতা ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইয়া অনুগৃহিত করিবেন। বোধ হয় আমি অর্দ্ধমূল্যে পাইতে পারি, শীঘ্রই পাঠাইলে ভাল হয়। এই সঙ্গে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র-মোহন সেনগুপ্তকৃত বৈদ্যতত্ত্বসংগ্রহ ১খানি পাঠাইবেন। নিবেদন মিতি। ৬।২।২৪ বিনয়াবনত

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সুবোধ।—মফস্বল থেকে এরূপ চিঠি ঢের এসেছে দেখেচি। ফলকথা,—যতীন বাবুর এবারকার চেষ্টা যে সফল হবে, তার প্রমাণ ঢের পাওয়া গেচে।

বৃদ্ধ।—বলি যতীন ভায়া যে গীতার বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ ক'রে বই ছাপ্‌চেন, জান কি?

সুবোধ।—এরূপ কথা একদিন শুন্‌ছিলুম বটে, ছাপ্‌বেন এমনতর কথাই শুনেচি।

বৃদ্ধ।—তার ছাপা যে প্রায় শেষ হয়ে এল বোধ হয় দশ পনের দিনের ভেতর বের হবে। শুনেচি, অনুবাদ না কি খুব সোজা বাঙ্গালা পয়ারে হয়েচে। ছাপ্‌বার আগে অনেক ভাল লোককে দেখিয়েচে, তাঁদের সকলেই খুব সুখ্যাৎ করেচেন। শুনেচি, খরচা বাদে যা উদ্বর্ত্ত হবে, সমস্তই বিদ্বৎ-সভায় দেবে।

সুবোধ।—জাত জাত ক'রে লোকটা যেন একবারে ক্ষেপেচে! এর জন্য ঘরের পয়সাও ঢের খরচ কর্‌চেন। খোসামোদ্‌ আর পরিশ্রমটা ত ফাউ!

বৃদ্ধ।—ভায়া হে! এমনতর হ'য়ে না লাগ্‌লে কোন কাজ হয় না। এ তোমার-আমার কাজ নয় ভায়া, উঠে প'ড়ে লাগ্‌তে হয়, লোকের ভিরকুটীর দিকে চাইতে হয় না, দশজনে দশ কথা বল্লে কাণে আঙ্গুল দিয়ে স'য়ে যেতে হয়। এরূপ সইতে জান্‌লে তবে কাজ কত্তে পারে। তা যাক্‌ ভায়া, আজ রাত হ'য়ে গেচে, ঢের কথা বল্‌বার ছিল, আর এক দিন হবে।

ধন্বন্তরি

মাসিক পত্র।

২য় বর্ষ, } আষাঢ়, ১৩২৪, ইং ১৯১৭ জুন, জুলাই, { ৯ম সংখ্যা।

৺কবি প্যারীমোহনের কুমারসম্ভব হইতে

মদন-ভস্ম।

[অধ্যাপক শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী, এম্, এ]

দারুময় মহাবেদি হিমগিরি-পৃষ্ঠ ভেদি'
উদিয়াছে পর্ব্বত-প্রমাণ।
তদুপরি মহেশ্বর অঙ্গে ভস্ম জটাধর
শিরে গঙ্গা—মূরতি মহান্॥
আসন বাঘের ছাল ভূষণ ভুজঙ্গমাল
কৃত্তিবাস যোগীর প্রধান!
দেখিয়া বুঝিল কাম ব্যর্থ হ'ল মনস্কাম
ভয়ে তার উড়িল পরাণ ॥৪৪

বীরাসনে বেদিপর স্থির ঊর্দ্ধ কলেবর
স্থির-মূর্দ্ধা রজত-ভূধর।
স্কন্ধ দু'টি সন্নমিত করতল অঞ্জলিত
অঙ্কে যেন ফুল্ল ইন্দীবর ॥৪৫

ফণিনদ্ধ † জটাজাল কর্ণে দোলে অক্ষমাল
ভালে দীপ্ত হোমাহুতি-কোঁটা।
নীলকণ্ঠে নীলপ্রভা উত্তরাঙ্গে নীল-আভা
কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম আঁটা ॥৪৬

স্তিমিত বিষম তারা ভ্রূভঙ্গ হয়েছে হারা—
স্পন্দহীন না পড়ে পলক।
নাসিকার অগ্রে দৃষ্টি অধোদিকে বহ্নিবৃষ্টি
ত্রিণয়নে জ্বলিছে আলোক ॥৪৭

দেহমধ্যে বায়ু-স্রোত যোগবলে হ'য়ে রোধ
স্পন্দহীন হয়েছে শরীর।
যেন জলধর ধীর মহার্ণব শান্তনীর
যেন দীপ বিহীনসমীর † ॥৪৮

কপালনয়ন-পথে জ্যোতিঃ ব্রহ্মরন্ধ্র হ'তে
প্রস্ফুরিত মহাদীপ্তিময়।
বিসতন্তু সুকুমার শিরে শশিকর-ধার
ম্লান আভা লক্ষ্য নাহি হয় ॥৪৯

সমাধিতে মগ্ন মন নাহি হয় উচাটন
নব দ্বার বৃত্তি ভুলি রয়।
অক্ষর পরম আত্মা জানে যাঁরে ক্ষেত্রবেত্তা ‡
তাঁরি ধ্যানে হইয়া তন্ময় ॥৫০

হেরি তথাবিধ হর ভয়ে অবসন্ন স্মর
ভাবে হর মনেরও দুর্জ্জয়।
কাঁপে মন, কাঁপে কর খসি পড়ে ধনুঃশর
অলক্ষ্যেতে কাঁপিল হৃদয় ॥৫১

হেনকালে হৈমবতী সঙ্গে সখী জিনি রতি
পশুপতি পূজিতে আইল।

---

† (১) বহুব্রীহি। (২) অথবা, পঞ্চের উক্তি = সমীরবিহীন (নপুংসক)।

দেখি তাঁর রূপগুণ সাহস ফিরিল পুন
ধীরে ধীরে জয় আশা জাগিল ॥৫২

মরি, মরি, অপরূপ না হেরি এমন রূপ
চপলা কি অচলা উদয়?

ভূষণ বসন্তফুল কি দিব তাহার তুল
অলিকুল পর্য্যাকুল হয়॥

জিনি মণি পদ্মরাগ অশোক ফুলের রাগ
মুক্তাহার জিনি সিন্ধুবার।

চমৎকার কর্ণিকার বর্ণিবার শক্তি কার
চামীকর † তুল্য কর যার ॥৫৩

কুচভরে আনমিত কলেবর সুশোভিত
পরিহিত সুরঞ্জিত বাস।

তরুণ অরুণ প্রায় অরুণ বরণ যায়
তনুলতা করেছে প্রকাশ ॥৫৪

মেখলা † বকুলমালা দুলে দুলে করে খেলা
যেন কুসুম-ফুলধনু-ছিলা।

বারে বারে পড়ে সরি ব্যস্ত হয়ে করে ধরি
সরাইয়া রাখে তারে বালা॥

কামের কুসুম ছিলা কটিতটে করে খেলা
হর জয়ে করিয়া নিশ্চয়।

গুণযোগে গুণবতী হ'ল গুণাতীতা সতী
রতিপতি ত্যজিল সংশয় ॥‡ ৫৫

বদন কমলোপম বিম্বাধর মনোরম
সুরভি সে নিশ্বাস-পবন।

মধুলোভে মধুকর ধায় সেথা নিরন্তর
ভয়ে সারা কাতর নয়ন ॥৫৬

রূপসীর শিরোমণি দেহ লাবণির খনি
রূপে জিনি কন্দর্প-রমণী।

দেখি তাঁরে ভাবে কাম হ'বে পূর্ণ মনস্কাম
এই হরি† হর-ধৈর্য্যমণি ॥৫৭

ভাবে কাম, 'মৃত্যুঞ্জয়! দেখিব, আজি কি হয়;
কেমনে ইন্দ্রিয় কর জয়?

মারিব কুসুম বাণ হরিব তোমার মান
জানি তবে নিজমান রয়॥"

ক্রমে গিরিবর-সুতা আসিলেন হর্ষযুতা
শঙ্করের কুটীরের দ্বার।

শঙ্কর সমাধি হ'তে জাগিলেন সে মুহূর্ত্তে
ব্রহ্মজ্যোতিঃ করি সাক্ষাৎকার ॥৫৮

প্রাণ-স্রোত মুক্ত করে' বীরাসন ভাঙ্গি ধীরে
বসিলেন আনন্দে ঈশ্বর।

গুরুতার দেহ-ভরে কাঁপে পৃথ্বী থরথরে
শেষ নাগ হইল কাতর ॥৫৯

হেন কালে নন্দী গিয়া প্রভু পদে প্রণমিয়া
কহিলেন উমা-সমাচার।

ইঙ্গিতে আদর করে অনুজ্ঞা দিলেন তাঁরে
উমা ধীরে হৈল আগুসার ॥৬০

সখী দু'টি চলে সাথে পুষ্প ডালি লয়ে মাথে
প্রণিপাত কৈল আগে গিয়া।

বসন্ত কুসুম শত উমাহস্তে অবচিত
ধন্য হ'ল শ্রীপদে লুটিয়া ॥৬১

গঙ্গাজলে বিল্বদলে শত শত শতদলে
পূজা কৈল শ্রীহরে অপার।

প্রণাম করিল তাঁয় অলক লুটিল পায়
চরণ চুম্বিল কর্ণিকার ॥৬২

শঙ্কর দিলেন বর "বরাননে, তব বর
বরণীয় হবে সবাকার।

চির এক-নারীশ্বর পত্নী-অর্দ্ধ-অঙ্গ হর ‡
অন্য পত্নী না ভজিবে আর॥"

হরষেতে কবি কয় এ কথা বিতথ নয়
কেবা বল করিবে সংশয়?

ঈশ্বরের বাণী তবে কভু না বিফল হবে
ফলিবে সে ফলিবে নিশ্চয় ॥৬৩

হেথা দূরে পঞ্চশর জুড়ি চাপে পঞ্চ শর
অবসর খুঁজে নিরন্তর।

---

† স্বর্ণ। সিন্ধুবার ও কর্ণিকার দুইরূপ পুষ্প।

† কোমরে পরিবার অলঙ্কার (চন্দ্রহার বা গোট)।

‡ জয়বিষয়ে সংশয় রহিল না।

† হরণ করি।

‡ (১) পত্নীর অর্দ্ধাঙ্গহর, (২) পত্নীর অর্দ্ধাঙ্গ হর (মহাদেব)

অনলে দহিতে অঙ্গ   যেমতি করে পতঙ্গ
পরিণাম না ভাবে অন্তর * ॥
জুড়িয়া কুসুম বাণ   ক্ষণে ক্ষণে যারে টান
উমাপরে রাখিয়া নয়ন।
কভু লক্ষ্য করে হরে   এই মারে এই মারে
ধনুগুর্ণ করে আকর্ষণ ॥৬৪
হেনকালে হৈমবতী   শিবপদে করি' নতি
নিজ হাতে গাঁথা জপমালা।
নিবেদিল চমৎকার   প্রেমভক্তি উপহার
গিরিশেরে গিরিবর-বালা॥
কতকাল ধরি' বালা   নিরমিলা সেই মালা
মন্দাকিনী-পদ্মবীজ তুলি।
শুষ্ক করি ভানুকরে   সিক্ত করি অশ্রুধারে
যেন প্রেম-পুষ্প কলি কলি ॥৬৫
আরক্ত কমল-করে   মালা লয়ে ধীরে ধীরে
লাজে উমা হ'ল অগ্রসর।
কল্পতরু ত্রিলোচন   বুঝিয়া ভকত-মন
প্রসারিত করিলেন কর॥
অমনি বুঝিয়া ক্ষণ   বিলম্ব না করি ক্ষণ
পুষ্পধম্বা পূরিল সন্ধান।
সম্মোহন নাম সেই   অমোঘ-প্রয়োগ যেই
বাণমধ্যে সবার প্রধান ॥-৬
ছুটে বাণ সম্মোহন   মোহিল হরের মন
গেল, গেল, গেল ধৈর্য্যধন।
চন্দ্রোদয়ে অম্বুরাশি   ছুটে যথা কূল ভাসি'
উচ্ছ্বাসে † আকুল ত্রিলোচন॥
তৃষাবৃত ত্রিণয়নে   চাহিলেন ঘনে ঘনে
উমামুখে বিম্বাধর প্রতি।
কামেতে কাতর হর   হৃদি কাঁপে থর-থর
জর-জর নহে স্থির মতি ॥৬৭
গিরিজার মনোভাব   হল অঙ্গে আবির্ভাব
কে লুকা'বে অনঙ্গ-তরঙ্গে ?
কণ্টকিত হল কায়   ব্রীড়ানত মুখে চায়
মধুময় অপাঙ্গের ভঙ্গে ॥৬৮

* অন্তরে। † (১) জলোচ্ছ্বাস এবং (২) কামোচ্ছ্বাস।

গঙ্গাধর ছলে কলে   অপূর্ব্ব বশিত্ব-বলে
নিবারিল ইন্দ্রিয়-বিকার!
ভাবিলেন কি কারণ   মন হল উচাটন
কেন প্রাণ বিকল আমার॥
বশী গঙ্গাধর   অনন্ত-ভূধর
মুদি ওষ্ঠাধর ধীরে।
হেতু অন্বেষণে   ঘোর ত্রিনয়নে
চারি দিগঙ্গনে হেরে ॥৬৯
সহসা দেখিল দূরে   চক্রীকৃত চাপ ধরে
পুষ্পচাপ পূরিছে সন্ধান।
আকর্ণ আকৃষ্ট গুণ   পৃষ্ঠে পূর্ণ পুষ্পতূণ
সুনিপুণ আলীঢ় আস্থান ॥৭০
তপোনাশ অত্যাচার   সহু বল হয় কার
কে বা সহে মর্য্যাদা-লঙ্ঘন ?
কামের এ দুই কার্য্য   ভাঙ্গিল শিবের ধৈর্য্য †
মহাক্রুদ্ধ হ'ল ত্রিলোচন॥
বাড়িল বিষম ক্রোধ   ব্যোম-পথ হ'ল রোধ
ঊর্দ্ধ পথে উঠে জটাভার।
রুদ্রতেজঃ হল ক্ষুব্ধ   মহা ব্যোমে বজ্র-শব্দ
অলক্ষ্যেতে গর্জ্জিল হুঙ্কার॥
ভ্রূকুটী কুটিল তায়   দরশনে প্রাণ যায়
চক্ষু হইল অনল-আকার।
লোমকূপে অগ্নি ছুটে   তরাসে মেদিনী ফাটে
দন্তঘর্ষ অশনি বিদার ॥৭১
গগনে অমরগণে   বিষম ভাবিল মনে
গেল গেল বুঝিরে মদন।
আস্তে ব্যস্তে হরে কয়   ক্ষম, ক্ষম, মহাশয়!
সম্বর সম্বর ত্রিণয়ন॥
বলিতে বলিতে ভালে   ক্রোধানল উঠে জ্বলে'
নেত্র হ'তে হইল বাহির।
বজ্র সম বেগে ধায়   নিমেষে দহিল কায়
ভস্ম হ'ল অনঙ্গ-শরীর ॥৭২

† সুতরাং কাম মরিয়াও শিবকে জয় করিল। নির্ব্বিকার শিবের মনে কামভাব ও ক্রোধ জন্মাইয়া উভয় কালে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

স্বর্গে মর্ত্তে হাহাকার কাম বিনা কিবা সার ?
এ সংসারে বাঁচা হ'ল দায়।
ভ্রমর ভ্রমরী কাঁদে কোকিলা নীরব খেদে
মলয়া বিষাদে নাহি বায়॥
দেখিয়া পতির গতি ধরায় পড়িল রতি
ছিন্নতরু ব্রততী আকার।
মনে হয় সে সময়ে মূর্চ্ছা তাঁরে কোলে ল'য়ে
সংজ্ঞা হরি কৈল উপকার॥৭৩
এইরূপে কৃত্তিবাস + কামেরে করিয়া নাশ
বজ্রানলে বনস্পতি প্রায়।
নারী-সঙ্গ ত্যজিবারে স্বগণেরে সঙ্গে করে'
অন্তর্হিত হলেন ত্বরায়॥৭৪
কামের দুর্গতি, হেরিয়া পার্ব্বতী, লাজ ভয়ে অতি,
বিমতি হয়।

+ যিনি উত্তরাঙ্গে গজাজিন পরিধান করেন; শিব।

বিষাদিত চিতে, লাগিল কাঁদিতে, ভবনে ফিরিতে,
মনেতে ভয়॥
নিজের কামনা, পিতার বাসনা, সফল হ'লনা,
ভাবনা এই।
দেখেছে সখীরা, তাই লাজে সারা, নাহিক কিনারা,
কাতরা তেঁই॥৭৫
শুনিয়া কাতর, হিমগিরিবর, শঙ্কিত অন্তর,
সত্বর সেথা।
করি আগমন, করিল ধারণ, মুদিত নয়ন,
আপন সুতা॥
সুরগজ যথা, বহে দন্তে গাঁথা, মৃদু বিসলতা,
মুদিতা অতি।
মহীধর-পতি, অঙ্কে অশ্রুমতী, করিলেন গতি,
বসতি প্রতি॥৭৮

উপনিষৎ।

(১) ঈশোপনিষৎ।

[অধ্যাপক শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী, এম্, এ]

বেদ, শ্রুতি, আম্নায়—এই শব্দগুলি একার্থক। 'বেদ' জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। আর্য্যগণের ধর্ম্মের মূলভূত যে জ্ঞানরাশি ভগবান্ হইতে অপ্রযত্নে এবং লীলাক্রমে প্রকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহাই বেদনামে খ্যাত। গুরুপরম্পরায় উহার অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি শ্রুত হইয়া থাকে, উহার কর্ত্তা কোন মুনি-ঋষি নাই, এই জন্য উহার নাম 'শ্রুতি'। অভ্যাস করিয়া শিক্ষা করা হয় বলিয়া উহাকে 'আম্নায়'ও বলা হইয়া থাকে। বেদের তিনটি কাণ্ড বা বিভাগ আছে; উহাদের নাম কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। যজ্ঞাদি কর্ম্মকলাপের বোধক বেদভাগ কর্ম্মকাণ্ড, "আদিত্যো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত" ইত্যাদিরূপ বেদভাগ উপাসনাকাণ্ড। "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম" ইত্যাদিরূপ বেদভাগ জ্ঞানকাণ্ড। এই কাণ্ড-ত্রয়াত্মক বেদ চারিভাগে বিভক্ত—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ। বেদের কর্ত্তা কোনও পুরুষ না থাকায়, উহাকে অনাদি ও অপৌরুষেয় বলা হয়। বেদমধ্যে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি শব্দ অধিকারবাচক, কোনও ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। ইন্দ্রাদি শব্দও ঐরূপ অধিকার শব্দ। সুতরাং ইন্দ্র, বশিষ্ঠ প্রভৃতি নাম বেদের মধ্যে আছে বলিয়া, বেদ ইন্দ্রাদির আবির্ভাবের পরে আবির্ভূত হইয়াছিল, এরূপ প্রমাণ হয় না। গায়ত্রীর বিশ্বামিত্র ঋষি। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে বিশ্বামিত্র উহার রচয়িতা; কিন্তু পূর্ব্ব কল্পে অধীত এবং বিস্মৃত বেদের বর্ত্তমান কল্পে তিনি স্মর্ত্তা মাত্র, ইহাই উহার অর্থ। ব্রহ্মভূত যোগিগণই প্রকৃত বেদবিৎ ও ব্রাহ্মণ, তাঁহারাই

কল্পে কল্পে লুপ্ত বেদ যোগবলে স্মরণ করিয়া প্রচার করেন।

বেদের কর্ম্মকাণ্ড চিত্তশুদ্ধি করে বলিয়া, এবং উপাসনাকাণ্ড চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করে বলিয়া, উভয়েই জ্ঞানকাণ্ডের উপকারক। এইরূপে অগ্নিষ্টোমাদি কর্ম্মদ্বারা শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি শমদমাদি সাধন সম্পত্তি লাভ করিলে, জ্ঞানকাণ্ডে অধিকারী হইয়া থাকেন। উপনিষৎ সমূহই ঐ জ্ঞানকাণ্ড। উপনিষৎগুলি বেদের অন্ত বা চরমভাগ, এই জন্য উপনিষদের আর একটি নাম বেদান্ত বা বেদান্ত-দর্শন। আস্তিকগণের ছয় দর্শন—ন্যায়দর্শন, বৈশেষিকদর্শন, সাংখ্যদর্শন, যোগদর্শন, পূর্ব্ব-মীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা। নাস্তিক চার্ব্বাক প্রভৃতির কথায় আমাদিগের প্রয়োজন নাই। চার্ব্বাকাদি নাস্তিকদিগের মতে দেহই আত্মা, দেহাতিরিক্ত আর কিছু নাই, দেহ শেষ হইলেই সব শেষ। ন্যায় ও বৈশেষিক এই দুই দর্শনে দেহাতিরিক্ত চেতন সগুণ আত্মার কথা স্বীকার করা হয়। কপিলপ্রবর্ত্তিত সাঙ্খ্যদর্শনে দেহাতিরিক্ত নির্গুণ আত্মা এবং আত্মার বহুত্ব স্বীকৃত হয়। তার পরে যোগদ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হইলে, পূর্ব্বমীমাংসার ধর্ম্মজিজ্ঞাসা পুরঃসর সাধক শুদ্ধচিত্ত ও কামনাশূন্য হন। তদনন্তর উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তবাক্যদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। এই ব্রহ্মতত্ত্বই সমস্ত বেদের মুখ্য প্রতিপাদ্য। বেদান্ত-ব্যাখ্যা চারি প্রকার বিভিন্ন মতে হইয়া থাকে,—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত ও অদ্বৈত। শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতমতানুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই মতে জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নাই। সেই এক আকাশবৎ অপরিচ্ছিন্ন নিত্য আত্মা উপাধিবিশেষে বহু হইয়া এই জগৎরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। বস্তুতঃ, এই সমস্ত জগৎ ও জীবগণের ব্যবহারিক সত্যতা ব্যতীত পারমার্থিক সত্যতা না থাকিলেও, এই ব্যবহারিক সত্যতাই আমাদিগের নিকট আপাততঃ একমাত্র সত্যতা, কারণ পারমার্থিক সত্যতা সম্বন্ধে আমরা কিছুই অবগত নহি। পুস্তকাদি হইতেও তাহা অবগত হওয়া যায় না; কারণ, তাহা ভাবার অতীত। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, সেই সত্য তত্ত্ব অবগত হইলে, ব্যবহারিক জগতের সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যুর হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। এই জন্যই আর্য্যগণ বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। জীবমাত্রেই ত্রিবিধ দুঃখের তাড়নায় অস্থির। সংসারে শরীরজ ব্যাধি অগণিত; তাহাদের যন্ত্রণার কথা স্মরণ করিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। অপরের অত্যাচার, দস্যু-তস্কর-রাজপুরুষাদি কর্তৃক উৎপীড়ন, অগ্নি-বায়ু প্রভৃতি কৃত বিষয়-সম্পত্তি ও দেহের অনিষ্ট, অদৃষ্টক্রমে নানা বিপৎ-পাত, আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু, দেহের বিকলতা, সম্পত্তির নাশ ইত্যাদি কত প্রকারের বিপজ্জাল আমাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। আজ হয় ত বেশ সুস্থ আছি, কাল দেখিব সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এই সকল আলোচনা করিয়া এবং সংসারের অনিত্যতা প্রত্যক্ষ করিয়া নিত্য শান্তি, নিত্য আনন্দ লাভের উপায় মানব খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। সেই উপায় বেদান্তাদি শাস্ত্রে লিখিত আছে। দেহাত্মবিবেক, আত্মার স্বরূপ-জ্ঞান ও জগতের স্বরূপ-বোধ হইলে শান্তিলাভ হয়। ভগবান্ শান্তিময়, অতএব ভগবৎপ্রাপ্তিরই অপর নাম শান্তি। এই শান্তি বা ভগবৎপ্রাপ্তি ভগবানের কৃপা না হইলে, হয় না। ভগবানের স্বরূপ ভগবান্ ভিন্ন অপর কে বুঝাইতে পারে? এই জন্য যতক্ষণ ভগবান্‌কে গুরুরূপে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ শান্তি বা ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে না। ভগবান্ গুরুরূপে দিব্য জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিয়া দিলেই জগতের ব্যবহারিক সত্যতা লুপ্ত হয়, শিষ্য ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হন। কিন্তু তাদৃশ গুরুপ্রাপ্তি আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা ও অনুকূল প্রাক্তন না থাকিলে হয় না। দেহাত্মবুদ্ধি-ত্যাগ, বিষয়বাসনা-বর্জ্জন, ঈশ্বরে প্রেম, নিষ্কাম কর্ত্তব্যপালন, সৎসঙ্গ—এই সকল উপায়ে চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে উহা জ্ঞানবীজ বপন করিবার

উপযুক্ত ক্ষেত্র হয়। গুরু কর্ত্তৃক জ্ঞানবীজ উপযুক্ত-ক্ষেত্রে উপ্ত হইলে এবং অধ্যবসায় সহকারে নবীন অঙ্কুরাবস্থা হইতে পরিণতি পর্য্যন্ত ঐ জ্ঞান-বৃক্ষের সেবায় পরম ভক্তিসহকারে আত্মোৎসর্গ করিলে, এক দিন উহাতে অপূর্ব্ব অমৃতময় মোক্ষফল ফলিতে দেখা যায়। জীব তখন কৃতার্থ হয়। সে সংসারের সুখ-দুঃখ হইতে নিস্তার পাইয়া পরমা শান্তি লাভ করে।

বেদান্ত বা উপনিষৎ জ্ঞানার্জ্জনের জন্য পঠনীয়। গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে শ্রুতির প্রকৃত অর্থ বুঝা যায় না, এবং প্রকৃত জ্ঞান না হইলে মুক্তিও হয় না সত্য, কিন্তু গুরুর উপদেশ পাইবার যোগ্য হইতে হইলে, উপনিষৎ এবং উপনিষৎসমূহের সার গীতার মর্ম্ম লৌকিক ব্যাখ্যার সাহায্যে যতদূর সম্ভব জানিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে চিত্ত শুদ্ধ হয়, মোহটা যেন অনেকটা কাটিয়া যায়।

আমরা প্রধান প্রধান উপনিষৎগুলি বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়া অল্পে অল্পে প্রকাশ করিব। উপনিষদের মোট সংখ্যা ১১৮০। কিন্তু উহাদিগের মধ্যে দশখানি বা বারখানি সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য করা হয়, যথা—

ঈশ কেন কঠ প্রশ্ন মুণ্ড মাণ্ডূক্য তিত্তিরি।
ঐতরেয়ং চ ছান্দোগ্যং বৃহদারণ্যকং তথা॥

'কৌষীতকী' ও 'শ্বেতাশ্বতর' নামে আরও দুইখানি ইহাদিগের সহিত ধরিলে, মোট বারখানি হয়। আমরা এই বারখানিরই অনুবাদ প্রকাশ করিব। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে ঈশোপনিষদের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরাও ঐ ক্রম অনুসারে প্রথমে ঈশোপনিষদের ব্যাখ্যা করিতেছি।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের (যজুর্ব্বেদের দুই ভাগ, শুক্ল ও কৃষ্ণ) অপর নাম "বাজসনেয়-সংহিতা"। ঈশোপ-নিষৎ শুক্ল-যজুর্ব্বেদের অংশ বলিয়া পরিগণিত, এজন্য উহার অপর নাম বাজসনেয়-সংহিতোপনিষৎ। ঈশোপনিষদের যেটি প্রথম শ্লোক, সেই শ্লোকের প্রথম পদ হইতেছে—'ঈশা'। ঐ 'ঈশা' হইতেই গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে।

'উপনিষৎ' শব্দের অর্থ আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা —যে বিদ্যা আচার্য্যের নিকটে গমন করিয়া (উপ —সমীপে, সদ্—গমন করা) লাভ করিতে হয়, যে বিদ্যা নিশ্চয়তার সহিত অনুশীলিত হইয়া অবিদ্যা নাশ করে (নি-নিশ্চয়, সদ্—বিশীর্ণ হওয়া), যে বিদ্যা ব্রহ্ম-প্রাপ্তি ঘটায় এবং যাহার লাভে সংসার-ক্লেশ অবসন্ন হয় (সদ্—গমন করা এবং অবসন্ন হওয়া), সেই বিদ্যাই উপনিষৎ। উপনিষৎ শব্দের মুখ্য অর্থ 'বিদ্যা' হইলেও, গৌণ অর্থে তৎপ্রতিপাদক 'গ্রন্থ'ও বুঝাইয়া থাকে। এই জন্য ঈশোপনিষৎ বলিলে আমরা গ্রন্থবিশেষকেও বুঝি। সেই গ্রন্থের প্রারম্ভে এইরূপ শান্তিপাঠ আছে।—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

সকল উপনিষদেরই প্রারম্ভে ও অন্তে শান্তিপাঠ করা হয়। বেদশাখা অনুসারে শান্তিপাঠ ভিন্ন ভিন্ন। এক বেদশাখার অন্তর্গত উপনিষৎ সমূহে একই শান্তিপাঠ ব্যবহৃত হয়। ঈশোপনিষদে প্রারম্ভে ও অন্তে ঐ শান্তি মন্ত্র ব্যতীত অপর আঠারটি মাত্র শ্লোক আছে। এই আঠারটি মাত্র শ্লোকেই ঈশোপনিষৎ সম্পূর্ণ, কিন্তু শ্লোক-গুলিতে এমন জ্ঞানের কথা আছে যে, পড়িলে মনে হয়, এইগুলি হইতেই উপনিষদের সমস্ত কথা জানিলাম, আর অন্য কিছু জানিবার প্রয়োজন নাই।

উপনিষদের শ্লোকগুলি গভীর ভাবে পরিপূর্ণ। একটিমাত্র বাঙ্গালা শ্লোকে উপনিষদের একটি শ্লোক অনুবাদ বা ব্যাখ্যা করা সকল স্থলে সম্ভবে না। এই জন্য আমরা কোন কোন শ্লোক অনুবাদ করিতে দুই, তিন, চার বা ততোধিক বাঙ্গালা শ্লোক লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। পাঠক শান্তি-মন্ত্রটির অনুবাদটুকু পরীক্ষা করিলেই আমা-দের কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। শান্তিমন্ত্রের 'অদঃ' ও 'ইদম্' পদের অর্থ 'ঐ' এবং 'এই'— কিন্তু ঐ দুইটি শব্দের সাহায্যে জগতের যাহা কিছু

সমস্তই বুঝান যাইতেছে। জাগতিক বস্তু মাত্রেই, ইন্দ্রিয়ের অগোচর অথবা ইন্দ্রিয়ের গোচর, সূক্ষ্ম বা স্থূল, প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ, বুদ্ধিগম্য বা বুদ্ধির অতীত, নিত্য বা অনিত্য, নির্ব্বিকার (ব্রহ্ম) বা বিকারি (জগৎ), নির্গুণ বা সগুণ—সংক্ষেপে 'অদঃ' বা 'ইদম্'। এতগুলি ভাব একটিমাত্র শ্লোকে পরিষ্কার করিয়া বুঝান সম্ভব নহে, এইজন্যই আমাদিগের ব্যাখ্যানুবাদ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইয়াছে। নিম্নে শান্তি-মন্ত্রের সহিত ঈশোপনিষদের শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা ও অনুবাদ দেওয়া হইল—

ঈশোপনিষৎ।

(শান্তি-মন্ত্র)

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

(১)

পূর্ণ সেই মহাব্রহ্ম পূর্ণ চরাচর,
পূর্ণের পূর্ণিমা ভাসে নিখিল সংসারে।
পূর্ণের পূর্ণতা সবে পায় নিরন্তর,
অটুট পূর্ণতা তবু সেই নির্ব্বিকারে॥১॥

সূক্ষ্ম অতিসূক্ষ্ম যাহা ইন্দ্রিয়াগোচর,
স্থূল অতিস্থূল যাহা এ বিশ্ব-মাঝার।
সকলি তাঁহাতে পূর্ণ—তিনি অনশ্বর,
অক্ষয় পরমব্রহ্ম পূর্ণ নির্ব্বিকার॥২॥

পূর্ণ সেই সনাতন কূটস্থ চেতন
পূর্ণ তাঁর অবতার লীলার কারণ।
তথাপি যে পূর্ণ তিনি সেই পূর্ণ র'ন—
পূর্ণতা পূর্ণের হয় নিয়ত লক্ষণ॥৩॥

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্॥

আত্মরূপী পরমেশ ব্যাপিয়া জগৎ
অণু পরমাণু সব তাঁহাতেই স্থিত।
তিনি এক সত্য, বস্তু অপর অসৎ,—
রজ্জুতে সর্পের ভ্রম জানিবে নিশ্চিত॥১॥

ত্যজহ কামনা তবে অসতের তরে,
সত্যজ্ঞানে দূর কর অজ্ঞান আঁধার।
বাসনা বিলয় কর আপন অন্তরে,
পরম কল্যাণ ইথে জানিও আত্মার॥২॥

সর্ব্বাল ব্রহ্মের রূপ জানিয়া নিশ্চয়
বিষয় বুদ্ধির স্থান নাহি দিও মনে।
সেই সত্য ধন আশে কাঁদুক হৃদয়—
নির্লোভ নিস্পৃহ হও পৃথিবীর ধনে॥৩॥

কি কাজ অধিক ধনে, কেন আকিঞ্চন?
জানিও বিষয়ভোগ অনিত্য স্বপন।
ওতপ্রোত যাঁতে এই নিখিল ভুবন
প্রয়োজন মত তোমা পাঠাইবে ধন॥৪॥

মহাশক্তি ঐ দেখ রক্ষিছে জগৎ
করুণা-কঠোর দৃঢ় কর্ম্মের বন্ধনে।
জানিও নিয়ত মনে ওহে, চির-সৎ!
জন্ম-মৃত্যু মিথ্যা বাক্য, সুখ-দুঃখ মনে॥৫॥

পিতা মাতা ধাতা যিনি পিতামহ আর
পারে কি সে দিতে কভু কোন দুঃখ তোরে?
নির্গুণে সগুণ হের মূর্ত্তি করুণার
প্রাণশক্তি জগতের বাঁধা প্রেমডোরে॥৬॥

(ক্রমশঃ)।

অন্তর্দ্দর্শীর অন্তর্দাহ।

'যারে দেখ্‌তে নারি তার চরণ বাঁকা' প্রবাদবাক্যটী যে বর্ণে বর্ণে সত্য, নিম্নলিখিত ঘটনাটী পাঠ করিলে ...

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন দাশ গুপ্ত দিনাজপুর জেলা স্কুলের এসিষ্টাণ্ট হেড্‌মাষ্টার। তিনি

প্রকৃতি, পরদুঃখকাতরতা, ন্যায় ও ধর্ম্মনিষ্ঠা অনুকরণীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শিক্ষকতায় লোকের আর্থিক অবস্থা কতদূর উন্নত হইতে পারে, বিবেচক মাত্রেই তাহা অনায়াসে অনুভব করিতে পারেন; কিন্তু ইহাতেও তিনি কোন কন্যাদায়গ্রস্ত বন্ধু-কন্যার বিবাহে অযাচিত ভাবে ২০০৲ টাকা দান করিয়া বন্ধু-বাৎসল্যের পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। তাঁহার নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ঋণগ্রস্ত বন্ধু-বান্ধবকে ঋণমুক্ত করিবার জন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, এরূপ ঘটনাও আমরা জানি।

ইঁহার পুত্র শ্রীমান্ প্রভারঞ্জন দাশ গুপ্ত বি, এ, আগামী আগষ্ট মাসে ইতিহাসে এম্, এ, পরীক্ষা দিবেন। গত ২২শে বৈশাখ শ্রীমান্ প্রভারঞ্জনের সহিত দিনাজপুর মাইনর স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুষমার বিবাহ হইয়াছে। দক্ষিণাবাবু পণ গ্রহণ করেন নাই, পণ ও যৌতুক বাবদ কোন দাবি-দাওয়া করেন নাই বলিয়া শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন নামক একজন বৈদ্যসন্তান সঞ্জীবনী পত্রে এই সংবাদটী প্রকাশ করেন। গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠের 'সঞ্জীবনীতে' ইহা প্রকাশিত হয়। গত ১লা আষাঢ়ের 'নায়ক' পত্রে ইহার প্রতিকূলে একটী 'প্রাপ্তপত্র' প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রপ্রেরক মহাশয় 'নায়কের 'নায়িকার' অঞ্চলে আত্মগোপন করতঃ 'শ্রী—অন্তর্দ্দর্শী' রূপে অবতীর্ণ হইয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন!

আর 'সঞ্জীবনী' পত্রের নাম শুনিয়াই নায়ক-সম্পাদক মহাশয়ের শ্ব-বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, আর অমনি "—অন্তর্দর্শী" বাবাজির প্রেরিতপত্রের গোড়ায় বড় বড় অক্ষরে "সঞ্জীবনীর অঙ্গে বিনাপণের 'ঢাক'"—শিরোনামা ছাপাইয়া দংশন-প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন! যে 'সঞ্জীবনী পত্রে' সংবাদদাতার পত্রখানি দেখিয়া 'অন্ত-

প্রতিবাদ বা বিদ্বেষবিজৃম্ভিত প্রলাপোক্তিটী সেই পত্রে প্রকাশ করিতে তাহার সাহসে কুলাইল না কেন, ইহার উত্তর তিনি নিজেই দিতে পারেন। তবে একটা কথা এই যে, অমূলক, ভিত্তিহীন, এবং বিদ্বেষপ্রসূত বিষয়ের স্থানের অভাব 'নায়ক' পত্রই পূরণ করিয়া থাকেন। এজন্য শ্রীপাট সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট আজ কাল 'অসত্যের পীঠস্থান' হইয়া দাঁড়াইয়াছে! যাহা হউক, অন্তর্দর্শী বাবাজির পত্রখানি আমূল সমালোচনা না করিলে কর্ত্তব্যত্রুটী হইবে বিবেচনায় নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল।

অন্তর্দর্শী বাবাজি লিখিয়াছেন,—

"বিগত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবারের সঞ্জীবনীতে 'বিনা পণে বিবাহ' শীর্ষক একটী বিবাহের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সংবাদদাতা শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র সেন গুপ্ত মহাশয় যেভাবে এই বিনা পণের ঢাক বাজাইয়াছেন, তাহাতে মনে হয় বরের পিতা শ্রীযুক্ত বাবু দক্ষিণারঞ্জন দাশ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার গুণবান পুত্র শ্রীমান্ প্রভারঞ্জনের বিবাহে নিতান্ত নিঃস্বার্থ পরোপকারীর স্বার্থত্যাগ করিয়া কন্যার পিতা শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত মহাশয়কে কৃতার্থ করিয়াছেন। এখন কথা এই যে, পণের অন্তরালে অন্য বিষয়ে দক্ষিণারঞ্জন বাবুর মন ও লক্ষ্য ছিল কিনা তাহা প্রধান বিবেচ্য বিষয়। যেখানে না চাহিতেই দান মিলে, অথবা যেখানে চাহিবার শক্তি থাকে না, সেখানে চাহিতে যাওয়াই বাতুলতা মাত্র। দক্ষিণা বাবু সুরেন বাবুর নিকট পণ চাহিতে পারেন কি না, অথবা তাঁহার পুত্র শত গুণবান এবং রূপবান হইলেও পণ পাইবার যোগ্য কিনা তাহা সংবাদদাতা বলেন নাই। সেন গুপ্ত মহাশয় এই সব ভিতরের কথাগুলি গুপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন। বিক্রমপুর তেলিরবাগ নিবাসী দক্ষিণা বাবু যে শ্রেণীর বৈদ্য, তাহাতে সেনহাটীর "বিকর্ত্তন" শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত মহাশয়ের কন্যাকে যে পুত্রবধূরূপে গৃহে তুলিতে পারিয়াছেন তাহাই তাঁহার সৌভাগ্য ও গৌরব বলিতে হইবে। দক্ষিণা বাবুর বংশে এইরূপ গৌরবের কাজ ইহাই যে প্রথম তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি পণ চাহিবার যোগ্য নহেন, পণ চাহিবেন কিরূপে? সমাজের এই উচ্চ নীচ তথ্যগুলি আলোচনা করিলে সতীশ বাবু বুঝিতে পারিতেন যে সংবাদপত্রে বিনা পণের ঢাক বাজাইবার কোনই কারণ ছিল না।"

উল্লিখিত কথাগুলি পাঠ করিয়া ইহাই মনে হয় যে, অন্তর্দ্দর্শী বাবাজির বংশে বোধ হয় আজকাল বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত নাই। নতুবা আজকালকার দিনে যাঁহারা কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন,—যাঁহাদের সংসারে ছেলে-মেয়ের বিবাহ দিবার রীতি প্রচলিত আছে, তাঁহারা এরূপ কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন।

অন্তর্দ্দর্শী বাবাজি যখন নিজেই বলিতেছেন, দক্ষিণাবাবু পণ অথবা যৌতুক চাহেন নাই, তখন সুরেন্দ্রবাবুর কন্যার সহিত তাঁহার পুত্র প্রভারঞ্জনের বিবাহ দিয়া যে সুরেন্দ্রবাবুকে কৃতার্থ করিয়াছেন, একথা অন্তর্দ্দর্শী বাবাজির ন্যায় সুক্ষ্মদর্শী (!) জীব ব্যতীত অপরে অস্বীকার করিতে পারে না। এমন কি, স্বয়ং সুরেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলে বোধ হয় তিনিও একথা অস্বীকার করিবেন না।

"পণের অন্তরালে অন্য বিষয়ে দক্ষিণাবাবুর মন ও লক্ষ্য ছিল কিনা তাহা প্রধান বিবেচ্যবিষয়। যেখানে না চাহিলেই দান মিলে, অথবা যেখানে চাহিবার শক্তি থাকে না, সেখানে চাহিতে যাওয়াই বাতুলতা মাত্র।" আজকালকার বাজারে বরের বাবা মহাশয়েরা যে কুলজীকে জাহ্নবীজলে বিসর্জ্জন দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পাশ'কেই কুলের শ্রেষ্ঠ পর্য্যায়রূপে পরিগণিত করিয়াছেন, অন্তর্দ্দর্শী বাবাজির সে জ্ঞানটুকু না থাকিলেও সমগ্র জগৎ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এরূপক্ষেত্রে, যে বরের বাবা পণ যৌতুক না চাহেন, বর-ব্যবসায়ীরা তাঁহাকেই বাতুল বলেন! দক্ষিণাবাবু সুরেন্দ্রবাবুর নিকট পণ অথবা যৌতুক না চাহিয়া এই হিসাবে বাতুলতা প্রকাশ করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু ভদ্র সমাজে তাঁহার উদারতাই প্রকাশ পাইয়াছে। 'পণের অন্তরালে অন্য বিষয় দক্ষিণাবাবুর লক্ষ্য ছিল কিনা, তাহা প্রধান বিবেচ্যবিষয়' বলিয়া যে ব্যক্তি অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিবার প্রয়াসী, তাহার ধৃষ্টতা ও অর্ব্বাচীনতা অমার্জ্জনীয়।

'যদুনন্দন' বংশসম্ভূত। 'যদুনন্দন' 'বিকর্ত্তন' বংশের সমকক্ষ না হইলেও কুলীনবংশ। অল্পবুদ্ধি, সামাজিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ শ্রীমান্ অন্তর্দ্দর্শী বাবাজির এ-সকল বিষয় জানিবার সুবিধা নাই বলিয়া যে সমগ্র বৈদ্যসমাজও অজ্ঞ, এরূপ কথা নহে। দক্ষিণাবাবুর বংশীয়েরা যাহাদের সহিত পংক্তিভোজন করেন না, এরূপ অনেক বৈদ্যবংশের সহিত আদান প্রদানে "বিকর্ত্তন" বংশের যে নাসিকা-কর্ণ বি-কর্ত্তন হইয়াছে, শ্রীমান্ অন্তর্দ্দর্শী তাহার সন্ধান রাখেন কি? শুধু বিকর্ত্তন কেন, অরবিন্দ, বিষ্ণু প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত বংশীয়েরা অর্থের বিনিময়ে যে, যাহার তাহার ঘরে কন্যাদান করিয়াছেন, এ কথাগুলি কি সত্য নহে? দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিতে গেলে হয় ত অন্তর্দ্দর্শীর অস্তিত্ব তখন খুঁজিয়া পাওয়া ভার হইবে। অন্তর্দ্দর্শী বাবাজির পিতা মহাশয় বর্ত্তমান থাকিলে হয়ত, বলিতে পারিবেন যে দক্ষিণা বাবুর বংশে 'বিকর্ত্তন' বংশের কতকগুলি কন্যা রন্ধনশালায় পাচিকার স্থান অধিকার করিয়াছে।

শ্রীমান্ অন্তর্দ্দর্শী বাবাজির আর একটি কথা এই,—

"দ্বিতীয় কথা যৌতুক। যে হিসাবে দক্ষিণা বাবু পণ চাহিতে পারেন না, সেই হিসাবে যৌতুক চাহিবারও তিনি অধিকারী নহেন। অনধিকার চর্চ্চা করিতে গেলে তাহা টিকিবে কেন? এই ব্যাপারেও দক্ষিণা বাবুর মহত্ত্বের প্রশংসা না করিয়া বরং বুদ্ধির প্রশংসা করিলে ভাল হইত। তথাপি বিবাহ সভায় দক্ষিণা বাবুর ভ্রাতা "যৌতুক আন" বলিয়া যে আবদার করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া কেহ হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। বিবাহ সভায় দক্ষিণা বাবুর পুত্রকে যৌতুক দিলে সুরেন্দ্র বাবুর অপমানের সীমা থাকে না। সেই জন্যই বিবাহ সভায় যৌতুক দেওয়া হয় নাই। ঐ স্থানে যৌতুক চাহিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। শেষে সুরেন্দ্র বাবু বহু টাকার যৌতুক দিয়াছেন। তাহা যে তিনি দিবেন বরপক্ষ পূর্ব্বেই জানিতেন। কাজেই তাহা চাহিবারও কোন দরকার ছিল না।

তৃতীয়তঃ বিনাপণের পশ্চাতে অন্য বিষয়ে বরপক্ষের মন ছিল কিনা তাহাও দেখিবার বিষয়। শ্রীমতী সুষমা

যে ভবিষ্যতে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন, এমত বাসনাও তাঁহার আছে বলিয়া কোন সম্ভাবনা নাই। পিতা মাতার আদরিণী শ্রীমতী সুষমা রাণী তাঁহাদের চোখের মণি এবং ভবিষ্যতে সুরেন্দ্র বাবুর বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী। এদিকে সুরেন্দ্রবাবু ও দক্ষিণাবাবু দিনাজপুরে পাশাপাশি বাড়ীতে বাস করেন। সুরেন্দ্রবাবুর বাড়ীর নূতন ইমারত এবং তাঁহার বিষয় সম্পত্তি দক্ষিণাবাবুর ভবিষ্যৎ লক্ষ্য কি না তাহাই বা কে বলিতে পারে। এমত অবস্থায় না চাহিয়া আত্মীয়তা বজায় রাখার পলিসি স্বার্থের খাতিরে ও চালাইতে হয়। এই ধরণের স্বার্থ এবং সামাজিক গৌরবের নিকট দক্ষিণা বাবু তাঁহার গুণবান্ পুত্র প্রভারঞ্জনকে অর্পণ করেন নাই কি? প্রভারঞ্জন যতই গুণবান্ হউক, সুষমার নিকট নিকট সে হীনপ্রভই বটে। সুষমা তাহার ঘরে আসিয়া যে প্রভা বিস্তার করিল, তাহাতে প্রভারঞ্জন কেন তাহার বংশ পর্য্যন্ত গৌরবের প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়াছে। দক্ষিণা বাবু যাহা করিয়াছেন, তাহাতে শত মুখে তাঁহাকে প্রশংসাই করিতে হয়। বাস্তবিক দক্ষিণা বাবুর বিনয় এবং সরলতা তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিয়াই রাখিবে। সুরেন্দ্র বাবু যাহা করিয়াছেন তাহা কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া একমাত্র সুষমার দিকে চাহিয়াই করিয়াছেন। বংশ-মর্য্যাদা এবং সমাজের দিকে তিনি মোটেই দৃষ্টিপাত করেন নাই। যাহা হউক দক্ষিণা বাবু পুত্র-পুত্রবধূ লইয়া, এবং সুরেন্দ্র বাবু ঝি-জামাই লইয়া সুখে ও শান্তিতে জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটাইয়া দিন, এবং নব-দম্পতির মিলন সুখের মিলন হউক, ইহাই আমাদের ভগবানের নিকট প্রার্থনা। ইঁহাদের আত্মীয়তা সুধাময় হউক ইহাই আমাদের প্রাণের কামনা।

শ্রী ———— অন্তর্দ্দর্শী ।"

শ্রীমান্ অন্তর্দ্দর্শী বাবাজির দ্বিতীয় কথায় তাহার মনুষ্যত্বের সত্তা স্বীকার করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়! আজকালকার বাজারে দক্ষিণা বাবু পণ চাহেন নাই, তাঁহার মনুষ্যত্ব আছে বলিয়া। নতুবা যাহারা ছেলের বিবাহকে একটা ব্যবসা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে, তাহারা এম্, এ পড়া ছেলের জন্য পণ-যৌতুক চাহিতে সঙ্কোচ বোধ করেনা। যাহারা এরূপ পণ-যৌতুক চাহিয়া থাকে, তাহাদের দাবি কোন্ ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়? দক্ষিণা বাবুর পুত্র প্রভারঞ্জনকে, যে বিবাহসভায় নারায়ণ [illegible] দিয়া সুরেন্দ্র বাবুর কন্যাটী [illegible] করিতে অপমান বোধ করেন নাই, সেই সভায় যৌতুকটা দেওয়া যে কি অপমানের কারণ হয়, অন্তর্দ্দর্শী বাবাজি ব্যতীত অন্যে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহে। আর একটী কথা অন্তর্দ্দর্শী বাবাজিকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে, সুষমার নিকট প্রভারঞ্জন হীনপ্রভ কোন্ অপরাধে? সুষমা কি রম্ভা না তিলোত্তমা?—অথবা উর্ব্বশী-মেনকা? যাহারা খড়ের ব্যবসা করে, তাহারা গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তুই চিনে, মানুষ চিনিবার অধিকার তাহাদের থাকিবে কিরূপে?

দক্ষিণাবাবু ও সুরেন্দ্রবাবু দিনাজপুরে পাশা-পাশি বাটীতে বাস করেন। সুরেন্দ্রবাবু স্থানীয় মাইনার স্কুলের শিক্ষক, বেতন কত তাহা আমরা না জানিলেও ৩০৲ টাকার বেশী হইবে বলিয়া বোধ হয় না। ইহাতে তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি কি থাকিবার সম্ভাবনা তাহাও অনুমান করা কঠিন নহে। তাছাড়া 'নূতন এমারত' বলিয়া শ্রীমান অন্তর্দ্দর্শী যে আস্ফালন করিয়াছেন সে কথাটা বলিব কি? এই যে 'এমারৎ' তাহার পরিমাণ অনূর্দ্ধ এককাঠা জমীর উপর একটী দরদালান মাঝখানে পার্টিসন করা! যাঁহারা এমারতে বাস-করেন, এরূপ ঘর তাঁহাদের রন্ধনশালার জন্য ব্যবহার্য্য। অতএব কোন্ সম্পত্তি ভোগের উদ্দেশ্যে "পোষ্যপুত্র গ্রহণের" কথাটা অন্তর্দ্দর্শী বাবাজির মনে উদয় হইবার সম্ভাবনা, তাহা বাবাজিই জানেন। কথাটা পাঠ করিয়া যেন মনে হয়, তিনি স্বয়ং এই অসাধারণ সম্পত্তি ভোগ-লালসা তৃপ্তির জন্য কোন প্রকার সুবিধা খুঁজিতে ছিলেন। তাই কি?

বিকর্ত্তন-বংশসম্ভূত সুরেন্দ্রবাবু যখন এরূপ ধনবান্, তখন সেনহাটী অথবা কালিয়া সমাজে কন্যাদান করিবার চেষ্টা না করিয়া বিক্রমপুর সমাজে পাত্রলাভের জন্য এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন কেন? আমরা যতদূর জানি, দুইবৎসরের অধিক-কাল হইতে সুরেন্দ্রবাবু এবং তাঁহার পরিবারস্থ

সকলে প্রভারঞ্জনের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন; ঐকান্তিক অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়াই দক্ষিণা বাবু এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন। নতুবা এম্, এ পাশ করিবার পূর্ব্বে প্রভারঞ্জনের বিবাহ দেন, দক্ষিণাবাবুর এরূপ ইচ্ছা ছিল না।

অন্তর্দর্শী বাবাজীর সকলগুলি কথার বিশ্লেষণ করিতে হইলে পুথি বাড়িয়া যায়, সুতরাং আর একটী কথা বলিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সুরেন্দ্রবাবু স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া যে যৌতুক দিয়াছেন, আজকাল নিতান্ত দরিদ্র বৈদ্যসন্তানও ইহা অপেক্ষা কম দিতে পারে না। এই অবগুণ্ঠনাবৃত 'অন্তর্দর্শীটী' সুরেন্দ্রবাবুর কোন আত্মীয় কিনা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, দক্ষিণাবাবু উদারতা প্রদর্শন না করিলে, এখনকার বাজারে এরূপ সামান্য অর্থব্যয় করিয়া সুরেন্দ্রবাবু এরূপ ছেলের হাতে কন্যা সমর্পণ করিতে পারিতেন না। এজন্য সুরেন্দ্রবাবুর কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা উচিত। একটা বানরের এরূপ বাঁদরামীর প্রতিবাদ না করিয়া যে তিনি স্পন্দহীনের ন্যায় চুপ্ করিয়া আছেন, ইহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি!

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, দক্ষিণাবাবুর ন্যায় অবস্থাপন্ন লোকে যে এরূপ গুণবান্ পুত্রের বিবাহে, আজকালকার বাজারে, নিজ পকেট হইতে চারি পাঁচ শত টাকা ব্যয় করিয়াছেন, ইহা শুধু তাঁহার মহত্বের পরিচায়ক নহে, বৈদ্যসমাজের অনুকরণীয়।

অনুচিত আত্মশ্লাঘা।*

[শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত।]

মানুষ যতই গুণবান্, যতই কৃতী হউক না কেন, নিজের মুখে—নিজের ভাষায় নিজের যশ-কীর্ত্তন করাটা যেন কেমন কেমন দেখায় না? যিনি প্রকৃত কৃতী, তিনি গাম্ভীর্য্যের আবরণে কৃতিত্বকে রক্ষা করেন। মনীষা গাম্ভীর্য্যের আবরণ ভেদ করিয়া আপনি বিকাশপ্রাপ্ত হয়।

---

* ব্যক্তিগত বিদ্বেষ যে বৈদ্যসমাজের অবনতির একটী প্রধান কারণ, এবং এই বিদ্বেষ চিকিৎসাব্যবসায়ী বৈদ্যসন্তানদিগের মধ্যেই যে খুব বেশী, তাহার প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যক করে না। এটা যে একটী জাতীয় কলঙ্ক, শিক্ষিত সদম্ভ চিকিৎসাব্যবসায়ীদিগের মনে সে ধারণা আসবে নাই। কবিরাজ গণনাথ সেন মহাশয় যখন 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রাপ্ত হন, তাঁহার কৃতিত্ব সম্বন্ধে ধন্বন্তরির আলোচিত বিষয় অবলম্বন করিয়া বহরমপুর হইতে জনৈক চিকিৎসাব্যবসায়ী বৈদ্যসন্তান তৎপ্রতিকূলে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। প্রকাশযোগ্য মনে হইয়াছিল না বলিয়া ধন্বন্তরিতে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল না। প্রবন্ধলেখক বিদ্বৎসভার একজন সভ্য। বলাবাহুল্য উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল না বলিয়া প্রবন্ধ লেখকের সহিত যে সকল চিঠির আদান প্রদান হয়, তাহা প্রকাশ করিতে গেলে বৈদ্যসমাজের কলঙ্ক ঘোষণা করা হইত বলিয়া তাহা প্রকাশিত হয় নাই। সেই সময়ে 'ধন্বন্তরি' গণনাথ-সেনের কাগজ বলিয়া মুখে মুখে প্রচার করিতেও কেহ কেহ ত্রুটী করেন নাই। যাহা হউক আধুনিক বৈদ্যসমাজের মধ্যে পরশ্রীকাতর এবং আত্মদ্রোহী লোকের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইল। কবিরাজ গণনাথ যে বৈদ্যজাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, গত ১৩২৩ সালের আষাঢ় ও শ্রাবণের ধন্বন্তরিতে তাহা সম্যক্ বিবৃত হইয়াছে, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপনে কল্পতরু ভবনের ম্যানেজার বিজ্ঞাপনে কি লিখিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া এরূপ প্রবন্ধের অবতারণা করা ঘোরতর বিদ্বেষের পরিচায়ক। কবিরাজ গণনাথ কবিরাজ মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় কিনা, তাহার বিচারের ভার আমরা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি, তবে কর্ত্তব্যানুরোধে ইহা বলিতে ইচ্ছা হয় যে, হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপনোপলক্ষে যখন দিল্লীতে মহা সভা হয়, সেই সভায় কবিরাজ গণনাথের আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধীয় গভীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা যে আয়ুর্ব্বেদের সম্মানরক্ষা করিয়াছে, এবং কবিরাজ গণনাথ ব্যতীত অপর কোন

যিনি নিয়ত আপনার মনে স্বীয় মনীষার শ্রেষ্ঠত্ব পোষণ করেন, এবং সেই শ্রেষ্ঠত্ব জনসাধারণের গোচর করিয়া যশস্বী হইবার প্রয়াসী, তিনি সমাজে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থান পাইতে পারেন কি না বলিতে পারি না, কিন্তু সাধারণের বিদ্রূপ-কটাক্ষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন না।

আমি ঘরের লোক টানিয়া লইয়া আমার এই উক্তির সারবত্তা প্রমাণ করিবার জন্য জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিব। আমি যাহা বলিব, তাহাতে আমার ধৃষ্টতা কিম্বা অর্ব্বাচীনতা প্রকাশ পাইবে, এরূপ ধারণা আমার নাই। ধন্বন্তরির পাঠকবর্গ সমস্তই বৈদ্যসন্তান বলিয়া আমার বিশ্বাস। যে বিষয়টী অবলম্বন করিয়া আমি এই প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি, তাহাও বৈদ্যসন্তান-সংস্পৃষ্ট। আমার এই আলোচনা যদি আমার ধৃষ্টতা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে আমি বৈদ্য সাধারণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আমি একজন বৈদ্যসন্তান,আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা আমার ব্যবসায়। প্রথিতযশা স্বর্গীয় অন্নদাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের পদপ্রান্তে বসিয়া আমার আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষালাভ। প্রকৃতপক্ষে আমার কিরূপ শিক্ষালাভ হইয়াছে, যাঁহারা আমার দ্বারা চিকিৎসিত হইয়াছেন এবং হইতেছেন, তাঁহারাই তাহা বলিতে পারেন ; আমার গুণাগুণ প্রচার তাঁহাদের মুখে। আমি নিজমুখে আমার গুণের কথা প্রচার করিলে সেগুণের মূল্য বেশী হয় বলিয়া মনে হয় না , বরং তাহাতে লোকের সন্দেহ জন্মে।

নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের জাতির অন্যতম গৌরবের পাত্র মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন, সরস্বতী, এম্ এ, এল্ এম্ এস্ মহোদয় এই স্থূল কথাটী অবজ্ঞা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন না। কবিরাজ গঙ্গাধরের সময় হইতে এপর্য্যন্ত অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকধুরন্ধর বঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ, দুর্গাপ্রসাদ, অন্নদাপ্রসাদ, প্যারীমোহন, রমানাথ, শ্যামাদাস, রাজেন্দ্রনারায়ণ, গোপীমোহন, কালিদাস প্রমুখ ভিষক্‌বর্গ "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি প্রাপ্ত না হইলেও, জনসমাজে যে ইঁহারা মহামহোপাধ্যায় রূপে সম্মানিত, একথা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ হইবে। পাথুরিয়াঘাটার দ্বারকানাথ এবং কুমারটুলীর বিজয়রত্ন গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই উপাধি দ্বারা তাঁহারা বেশী লাভবান্ হইয়াছিলেন, অথবা তাঁহাদের গৌরবের মাত্রা একটু বাড়িয়াছিল, তাঁহারা এরূপ মনে করিতেন না। কবিরাজ গণনাথ সেন মহাশয়ের উপাধিলাভে তাহার ঠিক বিপরীত দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। দুঃখের কারণ একটু খোলাসা করিয়া বলিবার প্রয়াস পাইব।

গুপ্তপ্রেস্ পঞ্জিকায় মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন মহাশয়ের কল্পতরু-আয়ুর্ব্বেদ-ভবনের দুই ফর্ম্মা বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে,—

কবিরাজদ্বারা যে সেই গুরুতর কার্য্যটী সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল না, আমরা একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। এতদ্ভিন্ন ঔষধ প্রস্তুত সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখক যাহা বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ঔষধ প্রস্তুত সম্বন্ধে যে অনেক কবিরাজ মহাশয়ই কারচুপী খেলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই শ্রেণীর লোক বাছিয়া বাহির করা কষ্টকর। কারণ, গন্ধবণিক বংশধর রামগতিকুণ্ডু "রামগতি কবিরত্ন" হইয়াছেন। বৈদ্যসন্তানদিগের মধ্যে এরূপ বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন কবিরাজের সংখ্যার অভাব নাই। ইঁহাদের অনেকেই কবিরাজ

নগেন্দ্রনাথ সেনের কবিরাজী-শিক্ষার তৈয়ারী কবিরাজ। মকরধ্বজ, চ্যবনপ্রাশ প্রভৃতির দানসাগর ইহারাই করিতেছেন। এ সকল দেখিয়া 'মকরধ্বজ' প্রভৃতি সম্বন্ধে কল্পতরুভবনের উক্তি দোষের বলিয়া মনে না করাই উচিত। 'প্রায়'শব্দ বিজ্ঞাপনে প্রকাশ থাকায় প্রবন্ধোক্ত কৃতী কবিরাজ বর্গকে যে কটাক্ষ করা হয় নাই, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কবিরাজ গণনাথের বয়সের তুলনায় কৃতিত্বের দাবিতে ক্ষোভের হেতু কিছু নাই। ভগবান্ তাঁহাকে যে প্রতিভা প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রতিকূলে কথা বলা [illegible]

"কল্পতরু আয়ুর্ব্বেদভবন" নামে সুবৃহৎ ঔষধালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই কল্পতরু ভবনের পরিচালক কে?—যিনি নিখিল ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ মহাসম্মিলন ও সমগ্র ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যাপীঠের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, এবং স্বয়ং ভারতগভর্ণমেণ্ট যাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ পাণ্ডিত্যের সম্মান "মহামহোপাধ্যায়" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন, যাঁহার অভিনব সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ "প্রত্যক্ষশারীর" সমগ্র ভারতে আয়ুর্ব্বেদশিক্ষায় যুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছে ও শিক্ষার্থীর অবশ্য-পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে, ডাক্তারী ও আয়ুর্ব্বেদ উভয় শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য যিনি ভারতব্যাপী অতুল যশোরাশিতে মণ্ডিত হইয়াছেন এবং যাঁহার উপযুক্ত ছাত্রগণ ভারতের নানাস্থানে যশস্বী চিকিৎসক বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে, এক কথায় যিনি কেবল বাঙ্গালা দেশে নহে, সমগ্র ভারতবর্ষের কবিরাজমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয়, সেই স্বনামধন্য চিকিৎসক শিরোমণি মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন, সরস্বতী এম্, এ, এল, এম্ এস বৈদ্যাবতংস, বিদ্যানিধি কবিভূষণ মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্নে ও বহু অর্থব্যয়ে তাঁহারই এই বিরাট ঔষধালয় ও শাখা—কবিরাজ মহাশয়ের বাটীস্থ "বিশ্বনাথ নিকেতন" (৬৫, নং বিডন ষ্ট্রীট)—পরিচালিত হইতেছে।"

কবিরাজ গণনাথের এইরূপ উক্তি সমালোচনার বহির্ভূত বলিয়া মনে হয় না। নিখিল ভারতের আয়ুর্ব্বেদ-মহাসম্মিলনে, কবিরাজ যামিনী-ভূষণ রায়, এম্, এ, এম্, বি এবং বৈদ্যরত্ন কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ এম্, এ মহোদয় যথা ক্রমে দুইবার সভাপতিত্ব করিয়াছেন; অতএব এক্ষেত্রে কবিরাজ গণনাথের বৈশিষ্ট্যের ডঙ্কা বাজান কতকটা উপহাসাস্পদ নয় কি? তার পর সমগ্র ভারতের আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যাপীঠের কথা। উহা আমাদের নিকট একটা বাজে হুজুগ বলিয়াই ত অনুমান হয়। কারণ, কিছুদিন হইল, ধন্বন্তরিপত্রে আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যাপীঠের অধীনে আয়ুর্ব্বেদীয় পরীক্ষার এক ঘোষণা প্রকাশিত হয়। তাহাতে উল্লেখ ছিল, বিদ্বৎসভার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট উহার নিয়মাবলী জানা যাইবে। তদনুসারে অনেক পরীক্ষার্থী সেখানে যাইয়া অবগত হন যে, [illegible] তার পর কোন পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে কি না,—বঙ্গের কেহ উক্ত পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছেন কি না, সভাপতি কবিরাজ গণনাথ ব্যতীত অপরে তাহা অবগত নহেন!

আমি চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করিয়া থাকিলেও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে যে আমার যথেষ্ট বাকী আছে, একথা অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু "প্রত্যক্ষশারীর" অবশ্যপাঠ্য বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছে, একথা আমার শ্রুতি-গোচর হয় নাই; আমার পরিচিত শত শত আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার্থীর মুখেও এরূপ কথা শুনিতে পাই নাই! এতদ্ভিন্ন তিনি "ডাক্তারী" ও "আয়ুর্ব্বেদ" উভয় শাস্ত্রে "প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য" অর্জ্জন করিয়া "ভারতব্যাপী" অতুল যশোরাশিতে মণ্ডিত হইয়াছেন', এইরূপ জনশ্রুতিও এ পর্য্যন্ত আমার ন্যায় হতভাগ্যের শ্রুতিগোচর হয় নাই।

"তাঁহার উপযুক্ত ছাত্রগণ ভারতের নানাস্থানে যশস্বী বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছেন", একথাটা আমার নিকট সত্য সত্যই বিস্ময়কর বলিয়াই বোধ হই-তেছে। কেন না, ধন্বন্তরিপত্রের প্রথম বর্ষের নবম সংখ্যায় তাঁহার যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে ১২৮৪ সালের ১৩ই আশ্বিন তাঁহার জন্ম। এই হিসাবে তাঁহার বয়স এখন (আষাঢ়ের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত) ৩৯ বৎসর ৮ মাস ১৮ দিন মাত্র। এই সময়ের মধ্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হইলেন,—আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন,—আবার তাঁহার ছাত্রগণও তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া 'ভারতের নানা স্থানে যশস্বী চিকিৎসক বলিয়া প্রখ্যাত হইলেন'—একথাগুলি কেহ অস্বাভা-বিক বলিয়া মনে করিলে, তাহাকে দোষ দিবার সুবিধা পাওয়া যায় না। এতদ্ভিন্ন—'কেবল বাঙ্গালা নহে, সমগ্র ভারতবর্ষের কবিরাজ মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয়' উক্তিটী শুনিয়া পাঠকমণ্ডলীর মনে

ভারতের কবিরাজমণ্ডলীর শীর্ষস্থানে কে অধিষ্ঠিত করিল? গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যে সমগ্র ভারতের কবিরাজ মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয়, এরূপ সার্টিফিকেট দেন নাই; অথবা তিনি কবিরাজমণ্ডলীর শ্রেষ্ঠ বলিয়াও উপাধিটা পান নাই। অতএব নিজের বিজ্ঞাপনে ঐরূপ একটা অসম্ভব উক্তির সন্নিবেশ করা, তাঁহার উৎকট অসমসাহসিকতার পরিচায়ক। যে দুইজন প্রকৃত প্রস্তাবে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার কৃতিত্বে এই 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিন্তু এরূপ গর্ব্বটি প্রকাশ করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভে প্রয়াস পান নাই!

ঔষধ প্রস্তুত সম্বন্ধে তিনি বিজ্ঞাপনে যে সকল কথা অসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়াছেন এস্থলে তাহারও একটু নমুনা দিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন,—

"কলে ঔষধ কোটা। বিলাত হইতে বহু ব্যয়ে বিশিষ্টপ্রকার আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ কুটিবার উপযোগী যন্ত্রাদি আনাইয়া নানাবিধ পরীক্ষার পর বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে ঔষধগুলি চূর্ণ করা হইতেছে। কলে চূর্ণগুলি অতি সত্বর প্রস্তুত হয় এবং সকল ঔষধেরই গন্ধ, বর্ণ ও গুণ অবিকৃত থাকে। বরং সাধারণভাবে ৫।৭ দিন ধরিয়া ঔষধ কুটিলে যেরূপ স্বাদ, গন্ধ ও গুণের হ্রাস হয়, কলে সত্বর গুড়ান হয় বলিয়া স্বাদ গন্ধ ও গুণ তদপেক্ষা অধিক তীক্ষ্ণ হয়, পারিশ্রমিকও অল্প পড়ে।"

ঔষধের গুঁড়া এবং বটীকা প্রস্তুত করিবার জন্য আজকাল অনেকেই কল আনাইতেছেন। যিনি অর্থসংগ্রহ করিতে পারেন, তিনিই কল আনাইতে পারেন, ইহাতে নিজের কৃতিত্বের বিশেষ কিছু পরিচয় প্রদান করে না; কিন্তু ৫।৭ দিন ধরিয়া ঔষধ কুটিলে 'যেরূপ স্বাদ, গন্ধ ও গুণের হ্রাস হয়', ৺বিশ্বনাথ বিদ্যাকল্পদ্রুম মহাশয়ও তাহা অনুভব করিয়া যাইতে পারেন নাই, অন্যে পরে কা কথা! এতদ্ভিন্ন কলে ট্যাবলেট্ বা চক্রিকা প্রস্তুত হইলে যে, 'অনুপানের বিভ্রাট থাকে না,'—অনুপানের প্রয়োজনিয়তাটা কলের গাত্র স্পর্শেই মিটিয়া যায়, ইহাও এক অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কার।

মকরধ্বজ সম্বন্ধে কবিরাজ গণনাথ তাঁহার বিজ্ঞাপনে বলিতেছেন,—

"কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, বাজারের প্রচলিত মকরধ্বজ প্রায়ই কাঁচা রসসিন্দুর মাত্র, অধিকন্তু ইহাতে প্রায়ই মনঃশিলা প্রভৃতি উগ্র বিষ মিশ্রিত থাকে ইহা আমরা বহুবার রাসায়নিক পরীক্ষা (Chemical Analysis) করিয়া দেখিয়াছি। এজন্য পরিণামে প্রায়ই উহাতে উপকারের পরিবর্ত্তে প্রভূত অপকার ঘটিয়া থাকে। * * * * * যাহারা নানাস্থান হইতে নকল মকরধ্বজ ব্যবহার করিয়া এই অমূল্য ঔষধের নামে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা অন্ততঃ এক সপ্তাহের জন্য 'আমাদের প্রস্তুত যথার্থ সুবর্ণ ঘটিত উৎকৃষ্ট মকরধ্বজ ব্যবহার করিয়া ইহার অসীম উপকারিতা প্রত্যক্ষ করুন।"

সমগ্র ভারতের কবিরাজমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় বলিয়া গর্ব্ব করিবার যাহার আকাঙ্ক্ষা এতদূর বলবতী, সাধারণ কবিরাজ নামধারী ঔষধবিক্রেতাদিগের বিজ্ঞাপনের ভাষা ও ভাবের অনুকরণ করিতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে লজ্জার কথা নয় কি? "বাজারের প্রচলিত মকরধ্বজ 'প্রায়ই' কাঁচা রসসিন্দুর" বিজ্ঞাপনে এই উক্তিটার সমাবেশ করিয়া তিনি, সহরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজমণ্ডলীর,—এমন কি তাঁহার গুরুস্থানীয় কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেন, এবং প্রখ্যাতনামা কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি, কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন কবিরত্ন প্রমুখ চিকিৎসকবর্গের ঔষধ প্রস্তুতপ্রণালীর প্রতি, প্রত্যক্ষে না হউক পরোক্ষে, কটাক্ষপাত করিয়াছেন। এইজন্য কেহ তাঁহাকে ধৃষ্টতাদোষে দুষ্ট বলিলে অপরাধী হয় না। তিনি 'বহুবার রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া' 'বাজারের প্রচলিত মকরধ্বজ' দেখিয়াছেন, এই উক্তির মূলে কতটা সত্য নিহিত আছে, তাহা আমরা বলিতে পারি না বটে, কিন্তু তিনি যে প্রথিতনামা যাবতীয় কবিরাজের ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীর সংবাদ রাখেন, একথা সম্বন্ধেও আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে।

উপরে যে কয়জন মহানুভব কবিরাজের নামোল্লেখ আছে, ঔষধ প্রস্তুতপ্রণালী সম্বন্ধে তাঁহাদের

সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠার প্রতি সন্দেহ করা অর্ব্বাচীনতার পরিচায়ক। এতদ্ভিন্ন আমরা শ্রুত আছি, ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের তীব্রদৃষ্টি আছে বলিয়া, তিনি এক একবারে যে পরিমাণ মকরধ্বজ প্রস্তুত করেন, কল্পতরু ভবনের প্রতিষ্ঠা হইতে এপর্য্যন্ত সে পরিমাণ মকরধ্বজ সেখানে খরচ হইয়াছে বলিয়াও মনে করিতে প্রবৃত্তি হয় না। উপরে যে কয়জন কবিরাজের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, অধিক অর্থব্যয় করিয়া অধিক পরিমাণে, এবং 'যথার্থ সুবর্ণ' দিয়া ঔষধ প্রস্তুতের ক্ষমতা তাহাদের নাই কি? কবিরাজ গণনাথ কি তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক ধনশালী?

কবিরাজ গণনাথ তাঁহার কল্পতরু-ভবনকে "ভারতের শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়" বলিয়া ঘোষণা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই, ইহাও বিস্ময়ের বিষয়। বিজ্ঞাপনের ছটায় নিরীহ মফঃস্বলবাসীদিগকে বিভ্রান্ত করিবার প্রয়াস না পাইলেও, কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ, কবিরাজ শ্যামাদাস, কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ এবং স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র কবিরাজ হেমচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ এবং পুলিনকৃষ্ণের ঔষধালয় অকিঞ্চিৎকর নহে। কবিরাজ গণনাথ যখন তাঁহার কল্পতরু-ভবনকে ভারতের 'বৃহত্তম' ঔষধালয় বলিয়া বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করিতে গিয়াছিলেন, তখন কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ের কথাটা তাঁহার মনে পড়িলে সম্ভবতঃ তিনি ঐরূপ লিখিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন। কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনের ঔষধালয়ে কর্ম্মচারীর সংখ্যা প্রায় ৫০ জন হইবে। ইহাদের বেতনের হার ১২৫৲ হইতে ১২৲ টাকা পর্য্যন্ত। কর্ম্মচারী বর্গের বেতন বাবদ তাঁহাকে মাসিক প্রায় ২৫০০৲ আড়াই হাজার টাকা দিতে হয়। ইহা ছাড়া সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে মাসিক প্রায় ১৫০০৲ টাকা খরচ হইয়া থাকে। ঔষধালয় হইতে বিতরিত বিভিন্ন ভাষায় মূল্যনিরূপক পুস্তিকা, ডায়ারী, পঞ্জিকা প্রভৃতি মুদ্রাঙ্কনের জন্য একটী ছাপাখানা আছে, তাহাতে ১১টী মেসিন সকাল ৮টা হইতে আরম্ভ করিয়া অপরাহ্ন ৭টা পর্য্যন্ত পরিচালিত হইয়া শুদ্ধ ঔষধালয়েরই কার্য্য করিয়া থাকে, বাহিরের কার্য্য কিছু হয় না। ইহা জানিয়া শুনিয়াও যখন কবিরাজ গণনাথ তাঁহার কল্পতরু-ভবনকে 'বৃহত্তম' ঔষধালয় বলিয়া ঘোষণা করিতে অসঙ্কুচিত, তখন তাঁহার উক্তি সমূলক বলিয়া স্বীকার করিতে কাহার সাহস হইতে পারে? জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার বৃহত্তম ঔষধালয়ে কয়টী লোক খাটে?

কবিরাজ গণনাথ উদীয়মান চিকিৎসক; গভর্ণমেণ্ট হইতে তিনি যে উপাধি লাভ করিয়াছেন, তাহার সম্মান রক্ষা করিয়া তাঁহার চলা কর্ত্তব্য। তাঁহাকে উপদেশ দিতে যাওয়া আমাদের ধৃষ্টতা মাত্র। আমার উল্লিখিত উক্তিগুলি তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনোদ্দেশ্যে বিবৃত হয় নাই, শুভ উদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে। তাঁহার নিকট যদি ইহা অন্যরূপ মনে হয়, দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করিলে বাধিত হইব।

কালিদাসের কাব্য

(সমালোচনা)

[শ্রীমান্ বিদঘুটেবুদ্ধি কাব্যবিদ্যামহার্ণব]

বহুকাল হইতে কালিদাসের কাব্যের একটি সমালোচনা বাহির করিব, ভাবিতেছিলাম। অবশেষে একদিন একখানি গ্রন্থাবলী নগদ পাঁচসিকা মূল্যে ক্রয় করিয়া ফেলিলাম। এখন উহা পড়া শেষ হইয়াছে, সমালোচনাও প্রস্তুত, ছাপাইলেই হয়। আজ ধন্বন্তরির সুধী অসুধী পাঠকবর্গের সম্মুখে, উহার কিয়দংশ নমুনাস্বরূপ হাজির করিলাম, যাঁহার যেমন ইচ্ছা গুণ-দোষ পরীক্ষা করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।

আমি কাহারও গোঁড়া নই, অর্থাৎ কাহারও প্রতি অন্ধ অনুরাগ বা বিরাগ আমার নাই। চক্ষে যেমন দেখি, ঈশ্বরদত্ত বুদ্ধিতে যেমন বুঝি, তেমনই সমালোচনা করি—আমি নিরপেক্ষ সমালোচক।

কবি হইবার জন্য অনেকবার চেষ্টা করিয়াও হইতে পারি নাই। কাগজ, কলম, কালিতে অনেক পয়সা অপব্যয় করিয়া, অনেক 'নিশি দিন' আকাশ পানে হাঁ করিয়া তাকাইয়া তাকাইয়াও যখন কবিত্ব ফুটিল না, তখন অগত্যা সমালোচক হইয়া পড়িলাম। বাস্তবিক, এখন ভাবি, কেন মরিতে কবি হইতে গিয়াছিলাম। সমালোচকের স্থান ত কবির স্থান অপেক্ষা ঢের উচ্চে, কাব্য অপেক্ষা সমালোচনার গৌরব অনেক অধিক, ইহা আমি বড় বড় পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি। আমি জানি, এই জন্যই সমালোচক সাজিবার লোভ ছোট বড় অনেক লেখকের দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বঙ্কিম, কেহ মাইকেল, কেহ রবীন্দ্র, কেহ বা অন্য কাহাকে—এক এক জন, এক এক কবিকে লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যকুঞ্জকে মাতাইয়া তুলিতেছেন। আমি কবি কালিদাসকে লইয়া পড়িলাম। দেখি কে বাল্ হয়। কথায় বলে, 'মারি ত গণ্ডার—লুঠি ত ভাণ্ডার'। আমার ছোট

একটা কথা আছে, 'কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্' অর্থাৎ কাব্যের আত্মা বা সর্ব্বস্ব হইল রস। কাব্য যদি রস, তবে কবি যে নিশ্চয় রসগোল্লা, ইহাতে আর সন্দেহ কি? এই রসগোল্লার, পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ ভেদে, রসরাজ (রসকরা) ও রস-রাজ্ঞী (রসমুণ্ডী)—ব্যাকরণের 'রসভঙ্গ' হইল—এই দুইটি পৃথক্ জাতি আছে। সহৃদয় ও সৌভাগ্যবান্ পাঠকগণ, বোধ হয়, সকল প্রকার রসগোল্লার রসেই মজিয়া রসিক হইয়াছেন। আমার কবি কালিদাস কিন্তু শুধু রসিক নহেন, তিনি রসে ডুবিয়া একেবারে গোল্লায় গিয়াছেন, (রসগোল্লা শব্দের ইহাই গূঢ়ার্থ) এবং অনেক পাঠককে গোল্লায় যাইবার পথ দেখাইয়াছেন। কারণ, কবিতা আর কোমল বনিতা একই দরের জিনিষ, মানুষ মজাতে এমন চিজ্ আর নাই। তত্র প্রমাণম্—

> 'কালিদাসকবিতা নবং বয়ো-
> মাহিষং দধি সশর্করং পয়ঃ।
> এনমাংসমবলা চ কোমলা
> সম্ভবন্তু মম জন্মনি জন্মনি॥'—মজান'র

আর বাকি রহিল কি?

কিন্তু কবি কালিদাসকে কোন্ বাজারের রসগোল্লা বলিলে মানায়? বোধ হয়, কেহ বলিবেন বড়বাজারের, কারণ তিনি সকলের বড় কবি কি না। কেহ বলিবেন টিক্‌টিকি কিম্বা টেরিটি-বাজারের, কেন না, টিকিওয়ালার দলই বল, আর টেরিকাটার দলই বল, পরের পয়সায় ইহারা খারাপ জিনিষ পারত-পক্ষে খায় না। কেহ হয় ত বলিবেন, বৌ-বাজারের রসগোল্লার সঙ্গে তুলনা করিলেই কবির কবিত্বের সম্মান রাখা হয়, ইত্যাদি। আমি কিন্তু বাজারের নামে ভুলি না। যদি গুণ দেখিয়া বিচার করিতে চাও, তবে ভাবের

নিভৃত স্থানে আসন পাতিয়া দাও। তখন দেখিবে, বাগ্‌বাজারের বাঘের দুধের (যাহা টাকা দিলেও অন্য বাজারে পাওয়া যায় না) ছানা কাটাইয়া যে রস-সুন্দর তৈরী হন, তিনিই কেবল কালিদাসের পার্শ্বে বসিবার উপযুক্ত—কালিদাসের একমাত্র উপমাস্থল। উভয়েই রসিক, উভয়েই কোমল-হৃদয়, উভয়েই রাজা-রাজড়ার উপভোগ্য হইয়াও পর্ণকুটীরবাসী। ভাগ্যবান্ পাঠককে আর উভয়ের সাদৃশ্য বুঝাইতে হইবে না।

বাগ্‌বাজারের নাম করিতে কবিজীবনের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা মনে পড়িল। কবি উহা রঘুবংশের প্রথম শ্লোকেই ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন। একমাত্র আমিই ঐ বৃত্তান্তটি গুরুপরম্পরায় অবগত আছি, আর কেহ জানেন না। গুরুদেব আমার প্রতি বিশেষ কৃপাবশতঃ একদিন সকলের অসাক্ষাতে আমার নিকট এই গল্পটি করেন। আমি তখন সবে রঘুবংশ ধরিয়াছি। গুরুদেব আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে"-মানে কি জানিস্? জানিস্ না—তবে বলি শোন্—ওর আসল মানে, 'বাঘের গর্ত্তে বাঘের পিত্তিরক্ষার্থে"। আমি শুনিবামাত্র চমকাইয়া উঠিলাম। গুরুদেব বলিতে লাগিলেন—"কালিদাস একদা মাঘমাসের রাত্রিতে আহারাদির পর, রোঘো ডোমেদের বাঁশবনে (সেই জন্যই কাব্যখানির নাম 'রঘুবংশ') বিশেষ প্রয়োজনে প্রবেশ করেন। সেখানে হঠাৎ বাঘের মুখে পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া যান। একটা প্রকাণ্ড 'রয়েল্ বেঙ্গল্' তাঁহাকে বনের মধ্যে 'মহৎ ভোজ্যম্' পাইয়া তাগ্ করিতেছিল! এই ঘাড়ে পড়ে আর কি,—এমন সময় হঠাৎ কবির বিপর্য্যয় অবস্থা দেখিয়া, অপ্রস্তুত হইয়া লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া লইল। কতকদূর গিয়া মনথারাপ করিয়া বসিয়া আছে, ভাবিতেছে, বেটা একবার উঠিলেই হয়, এমন সময় সহসা কবির দৃষ্টি আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। তখন তাঁহার আর কোনও জ্ঞান নাই, কাঁপড় চোপড় ফেলিয়া, 'বাপ রে, মারে, বাঘ্ রে!' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে প্রাণ ভয়ে চোঁচা দৌড়! বাঘটা কেমন হতভম্ব হইয়া পড়িল, কি করিবে, ঠিক করিতে পারিল না, কবিও সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। ভয়ে ও পরিশ্রমে সেই শীতেও কবির গলদ্‌ঘর্ম্ম অবস্থা! বাড়ী পৌঁসিয়া দরজা ঠেলাঠেলি ও 'বাঘ বসে গো', 'বাঘ আসে গো' করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। পাঠক মনে রাখিবেন, আমাদের কবি কালিদাস বাঙ্গালি কবি ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার বিদেশিণী বিদুষী স্ত্রীর সহিত সংস্কৃতেই কথোপকথন করিতেন। তাঁহার স্ত্রী ত আসলে বাঙ্গালা জানিতেন না। কবির চীৎকারে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, কিন্তু তখনও খুব ঘুমের ঘোর, "অস্তি কশ্চিৎ বাগ্-বিশেষঃ?" বলিয়াই আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন। স্ত্রী 'বাঘ বসে' শুনিতে শুনিয়াছেন 'বাগ্‌বিশেষঃ'! যাহা হউক, কবি স্ত্রীর সাড়া পাইয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন, এবং নিজে বাঙ্গালা কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন দেখিয়া বিশেষ লজ্জিতও হইলেন। তখন প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ প্রেয়সীর মুখ-নিঃসৃত 'বাগ্' শব্দটি লইয়াই এক মহাকাব্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। সেই দারুণ শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন, আর কবিতা লিখিতেছেন, এইরূপে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল! কি পত্নী-ভক্তি! এমন না হ'লে কবিত্ব হয়? আমাদের দেশের যত কবি সবই ত বাজে কবি। যদি কেহ আসল কবি হইতে চাও ত, কালিদাসের মত 'বাঘ-বন্দী' খেলায় কেরামতি দেখাও, এবং পত্নীকেও, সেইরূপ ভক্তি করিতে শিক্ষা কর, দেখিবে ভাবের কখনও অভাব হইবে না, তাঁর একটি একটি কথায় ভাবের ফোয়ারা ছুটিবে, এক একখানি কাব্য বাহির হইবে!

গল্প শুনিয়া আমার চক্ষু ফুটিল, ভাবিলাম,—

জোগাইয়াও দিত না, কবির কাব্যও লেখা হইত না! আবার তিনি যদি সেই রাত্রিতে লণ্ঠন হাতে করিয়া স্বামীকে (আমাদের—মত) বাঁশবনে দাঁড়াইতে যাইতেন, তাহা হইলে খুব সম্ভবতঃ কেহই আর ঘরে ফিরিতেন না। একটা ভয়ানক ট্র্যাজেডি ঘটিয়া যাইত। ব্যাঘ্রবর সেই অলসগমনা সুখাঙ্গবপু কবিপত্নীটিকে দেখিয়া কখনই লজ্জা করিতেন না, এবং সেই সঙ্গে আমাদের রসিক কবিটিকেও সেই অশ্লীল অবস্থাতেই সাবাড় করিতেন! দেবভাষা সংস্কৃতের সে দিন কি ফাঁড়াই গিয়াছে! আমাদের বঙ্গভাষার যে তাদৃশী উন্নতি নাই, তাহার কারণ বাঙ্গালার শিশু কবিগণ হাম, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, কলেরা, সর্পাঘাত প্রভৃতিতে দলে দলে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার পর 'সুন্দরবন' ত আমাদের ঘরের কানাচে—সুতরাং, বাঘের কবলেও কত কবি পড়িয়া থাকেন! ভাগ্যে! আমাদের বঙ্কিম, রবীন্দ্র, নবীন, হেম—এঁরা সব ফাঁড়াগুলি কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন, নহিলে বাঙ্গালা ভাষাকে কে পুঁছিত?

এই ঘটনা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, কবি কালিদাস অত্যন্ত নিরীহ শান্তপ্রকৃতিক লোক ছিলেন। এই জন্যই তিনি স্ত্রীর নিদ্রার ব্যাঘাত না করিয়া, কাব্যরচনাতেই রাত্রিটা কাটাইয়া দিলেন। তাঁহার কাব্যকুঞ্জের কবিতারাণী ঘরের ভিতরে লেপমুড়ি দিয়া পরম আরামে নিদ্রা যাইতেছেন—আর তিনি মাঘের শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে অনাবৃত দেহে সমস্ত রাত্রি বাহিরে বসিয়া, আহা, না জানি তাঁহার কত কষ্টই হইয়াছিল! কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে কবি যখন সেই কাব্যখানি তাঁহার কবিতা-দেবীকে নিবেদন করিলেন, এবং যখন সেই ইন্দুবদনা চন্দ্রাননা বলিলেন, 'বাঃ, বেশ ত, খাসা হইয়াছে', অমনি কবির সমস্ত দুঃখ জল হইয়া গেল!

কোন কোন পাঠক হয়ত এই সকল কথা স্থলে শ্লোকটির রচনা ভঙ্গীটুকু পরীক্ষা করিতে বলি, উহা হইতেই প্রমাণ হইবে যে, লেখক লিখিবার সময়ে শীতে ও ভয়ে কাঁপিতেছিলেন। অবশ্য এই সূক্ষ্ম প্রমাণটি বুঝিতে হইলে, একটু সূক্ষ্ম বুদ্ধিরও প্রয়োজন। যাঁহাদের স্থূল বুদ্ধিতে এটি বুঝা কষ্টকর হইবে, তাঁহাদের আর একটি সহজ কিন্তু 'অকাট্য' প্রমাণ দিতেছি। তাঁহারা রঘুবংশের দ্বিতীয় শ্লোকটি একবার স্থির চিত্তে পরীক্ষা করুন। দেখুন, কবি সেই শীতে ঘরের বাহিরে, অন্ধকারে উপবিষ্ট হইয়া, নিজের ভাগ্যের মত ঘনান্ধকার আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, সখেদে কি বলিতেছেন, 'ক সূর্য্য'—অর্থাৎ 'কোথায় সূর্য্য'। সূর্য্য উঠিলে ঐ দুরন্ত শীত ও অন্ধকারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে, কিন্তু হে সূর্য্যদেব! তুমি কোথায়? চন্দ্রদূরে তুমি—"দ্যৌ কশ্চো মহদন্তরং সুচয়তঃ"। ইহার পর অন্য টীকাটিপ্পনী অনাবশ্যক।

কেহ কেহ বলেন, কালিদাস শ্রোতা সংগ্রহের জন্য ফন্দি-ফিকির না ঠিক পাইয়া, গোড়াতেই কোথাও কিছু নাই, "ঐ বাঘরে! বাঘ!" বলিয়া চীৎকার করিয়া দেখিতেছিলেন ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়ায়, আসর জমে কি না? আমাদের দেশের ছেলেরা বাঘের গল্প শুনিতে বড় ভাল বাসে। বিষ্ণুশর্ম্মা ও ইসপের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি 'কথামালা', 'আহ্লাদে আটখানা' প্রভৃতি যাবতীয় শিশুপাঠ্য পুস্তকে বাঘের বেশ পসার। বাঘই আমাদের 'কড়িগাছ' গল্পের নায়ক। প্যারীচরণ সরকারের সেকার্ড বয় বা মেষপালক বালক, "বাঘ! বাঘ!" করিয়া চীৎকার করিয়া লোক জমা করিত। এতদ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, হয় সেই মেষপালক বালক রঘু-কাব্য পড়িয়াছিল, নয় কালিদাস ঐ বালকের কৌতুকের কথা অবগত ছিলেন।

তারপর দিলীপের জন্ম-বৃত্তান্তটি আলোচনা করিব। কবি কালিদাস বড় কবি। তাই তিনিও

লিতে বেশ একটা রসের সম্বন্ধ আছে। একটি অন্যটি ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। সেইজন্য সকল হেঁয়ালিই সচরাচর কবিতাতে বলিবার রীতি আছে, (যথা, তিন অক্ষরে নাম তার, ইত্যাদি) এবং কবিতামাত্রেই কিছু কিছু হেঁয়ালি থাকে (প্রমাণ অনাবশ্যক)। নচেৎ পিতা-দিলীপ কেমন করিয়া পুত্র-রঘুর বংশে জন্মেন? আর তাই যদি জন্মেন, তাহা হইলে রঘুর বংশে যখন জন্মিতেছেন, তখন রঘুর পরেই ত জন্মান উচিত, কিন্তু কবি তাঁহাকে আগে জন্মাইয়া দিয়াছেন! বলিতে পার, এরূপ করায়, দিলীপের বংশে রঘু জন্মিল, না, রঘুর বংশে দিলীপ জন্মিল? অনেকে হয় ত বলিবেন, 'Child is father of the Man' এই নিয়ম অনুসারে, দিলীপের ঔরসে রঘুর জন্ম হইলেও ধর্ম্মতঃ রঘুই দিলীপের বাবা হইতেছেন, সুতরাং এস্থলে বাস্তবিক কোনও গোল নাই, কেবল আমাদের বুঝিবার ভুল। আমি কিন্তু এই দুইটা মতকেই প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করি। না রঘু দিলীপের বাপ্, না দিলীপ রঘুর বাপ্—এসবই নিছক্ কাব্য—কবির কল্পনামাত্র।

কিন্তু দিলীপের জন্মবৃত্তান্তটা যে ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা আমার নিকট সঙ্গত বা বিশেষ কবিত্বের পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয় না। কবি বলিয়াছেন, "দিলীপ ইতি রাজেন্দু রিন্দুঃ ক্ষীর-নিধাবিব", অর্থাৎ ক্ষীরসমুদ্র হইতে চন্দ্র যেমন উত্থিত হইয়াছিলেন, তেমনই দিলীপ সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? ক্ষীরসমুদ্র জিনিষটা কি নির্ভেজাল কাল্পনিক নহে? আর যদি ক্ষীর-সমুদ্র বলিয়া বাস্তবিকই কোনও বস্তু থাকে, তবে চন্দ্রঠাকুর সেই সুখময় ক্ষীর বা সুধা সমুদ্র হইতে তোমার কথাতেই উঠিতে রাজি হইবেন না কি? ক্ষীর জিনিষ এতটুকু ফেলিতে প্রাণ কাটিয়া যায়, আর এ এতটুকু নয়, ততটুকু নয়; ক্ষীরের বাটী

পুকুর নয়, সাক্ষাৎ সমুদ্র—অ-তল, অ থই, তাতে যদি কেউ কখন কোন গতিকে পড়ে, সে কি তাহা ছাড়িয়া উঠিতে পারে? চন্দ্র ঠাকুর কি এমনই বোকা?" তাই ত মনে হয় কালিদাস এখানে পাগলামি করিয়াছেন। যাহাতে ডুবিয়া অপঘাতে মরিলেও কত চৌদ্দপুরুষ—উদ্ধার হইয়া যায়, তাহা তোমার কবির এক তুচ্ছ উপমার খাতিরেই ত্যাগ করিতে হইবে না কি? এমন বদ্ কল্পনার নাম উপ-মা হবে না ত কি"মা" হবে? কালিদাসের কাব্যের মস্ত দোষ তাঁহার তুলনাগুলি কাহারও মনোমত হয় না। প্রমাণ হাতে হাতে দিয়াছি, সুতরাং না বলিবাব জো নাই। এই জন্যই সকলে কবির কাব্যের "উপমা কালিদাসস্য" বলিয়া নিন্দা করে। মনে করিবেন না যে, উহা প্রশংসা—উহার প্রকৃত অর্থ এই যে, কালিদাসের কাব্য এত বাজে জিনিষ যে, উহা কেবল "মা" নহে, উহা "উপ-মা" অর্থাৎ 'মা' (নিকৃষ্ট) হইতেও নিকৃষ্ট। উপ-পত্নী যেমন আসল হইতে নিকৃষ্ট, কালিদাসের কবিতা তেমন আধুনিক অনেক 'মা' শ্রেণীর কবিতা হইতেও নিকৃষ্ট। দেখুন, আমাদের কবি রজনীসেনের ক্ষীর সম্বন্ধে কিরূপ উচ্চ ধারণা ছিল, তিনি কত ভক্তি ও ভালবাসার সহিত বলিয়া গিয়াছেন—

"(সেই ক্ষীরসমুদ্রে) একটুখানি টেনা পরে
নেবে যে যেতাম।
নেবে যে যেতাম—আর উঠ্তাম না হে।
ও, গিন্নি এসে ডাকাডাকি কল্লেও উঠ্তামনাহে—
ডুব্ দিতাম, আর সাঁতার কাট্তাম, উঠ্তাম
না হে।"

পাঠক দেখুন, এত আদরের গিন্নি জিনিষটিও ক্ষীরের তুলনায় কত তুচ্ছ! ইনিই ক্ষীরের মান রক্ষা করিয়াছেন, ইনিই ক্ষীরের যথার্থ প্রেমিক, যথার্থ ভক্ত!

যাহা হউক,কবি এইটুকু লিখিয়াই যে, কাব্যা-

হাঁড়ী কাৎ করিয়া ধরিয়াছেন, এইজন্যই আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। এই জন্যই আমরা তাঁহার ভক্ত, তিনি ও আমাদিগের নিকট "কবির্ কালিদাসঃ"। কয়েকটি বৃদ্ধ অজীর্ণ ও আমাশয় রোগী (যাহাদের ক্ষীর সহজে পরিপাক হয় না) মধ্যে মধ্যে "উদিতে নৈষধে," "মাঘে শক্তি"—ইত্যাদি বলে বটে, কিন্তু সে সব বাতুলপ্রলাপ! তার পর আরও বাহাদুরি দেখুন, "দিলীপ ইতি রাজেন্দু রিন্দুঃ ক্ষীরনিধৌ ইব" এই বাক্যে ক্ষীরনিধির নিকট যদি ক্ষীরগন্ধাকৃষ্ট দুই একটি মক্ষিকা আসিয়া জুটে, এবং "রিন্দু"র রকারের অস্থান-স্থিত বিন্দুটা চাটিয়া মারিয়া দেয়, তাহ'লেই হঠাৎ কি অঘটন-ঘটনা! একেবারে "বিন্দুঃ ক্ষীরনিধৌ"—অর্থাৎ আকাশ হইতে ঐ ক্ষীরের হাঁড়ীতে "বিন্দু" অর্থাৎ বোঁদে বৃষ্টি! এমন কৌশল কালিদাস ভিন্ন, আর কে দেখাইতে পারেন?

কিন্তু শ্লোকে 'ইন্দু' পদটা দুইবার ব্যবহার করা ঠিক হয় নাই। দিলীপকে যখন একবার 'রাজেন্দু' বলা হইয়াছে, তখন আবার 'ইন্দু বা চাঁদের মত' বলিয়া লাভ কি? তদপেক্ষা কবি যদি দিলীপের তুলনা দিতে 'জিলিপি'র উল্লেখ করিতেন, মন্দ হইত না। নামে নামে বেশ খাপ্ খাইত, অর্থেরও উৎকর্ষ হইত। চন্দ্রে অমৃত আছে বলিয়া চন্দ্রের নাম 'অমৃতী,' আমাদের জিলিপির 'অমৃতী'ই ত ভাল নাম—উহার প্যাঁচে প্যাঁচে অমৃত। আকাশের অমৃতী কেবল রজনী-যোগেই শোভা পান। আমাদের অমৃতী মোদক মহাশয়ের দোকানে দিবানিশি 'হাস্যময়ী'। আকাশের অমৃতী ঘিয়ে ভাজাও নহেন, আর 'সারাটি রজনী' তাহার পানে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিলেও, তিনি মুখে আসিয়া পড়েন না। কিন্তু পৃথিবীর অমৃতী ঘিয়ে ভাজা ত বটেই, দেখিলে মন প্রফুল্ল, খাইলে উদর ও রসনা উভয়ই পরিতৃপ্ত! তদুপরি ঐ অমৃতী যদি ক্ষীরে চোবান হয়, (বিশ্বাস না হইলে নিকটস্থ দোকান হইতে আনিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন) তা হ'লে উহা যে আকাশের ইন্দু অপেক্ষা দেখিতে শুনিতে শতগুণ মনোহর এবং উদরে পুরিতে "অদ্বিতীয়ম্" হয় তাহা আমি হলফ্ করিয়া বলিতে পারি।

'ক্ষীরনিধি' শব্দে ক্ষীরের হাঁড়ী বা গামলা হইলেই এ পক্ষে বেশ অর্থসঙ্গতি হয়। যদিও গ্রাজুয়েট্ কোম্পানি ক্ষীরনিধি নামে একরূপ ক্ষীরের পুর বিশিষ্ট মিষ্টান্ন আবিষ্কার করিয়াছেন, তথাপি পাড়াগাঁয়ের লোকেরা এখনও তাহার আস্বাদ বা পরিচয় না পাওয়ায়, এবং ঐ অর্থের অবশিষ্ট বাক্যার্থের সহিত অসঙ্গতি হওয়ায়, আমরা "ক্ষীরনিধি" শব্দের পূর্ব্বোক্ত অর্থ ই গ্রহণ করিলাম।

"ইন্দু রিন্দুঃ" শুনিয়া ইন্দুরকুলের কথা মনে হয়। ভয় হয়, পাছে ময়রার মেটে ঘরে ইন্দুরেরা রাত্রিকালে হুড়াহুড়ি করিতে করিতে ক্ষীরের হাঁড়ীর মধ্যে পড়িয়া সমস্ত ক্ষীরটাই মাটি করিয়া দেয়। কিন্তু এই আতঙ্ক সম্পূর্ণ অমূলক, কারণ আজকাল ওরূপ মেটে ঘর সহরে নাই বলিলেই হয়; তাহাতে আবার মিউনিসিপাল্ আইন পাশ হইবার পর হইতে রসগোল্লা, লেডিকেনি প্রভৃতি রসবতীদিগের সহিত শ্রীমতী ক্ষীরের হাঁড়ীও অনেকটা নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছেন। পূর্ব্বে নেংটি, চিট্‌কে ও ধেড়েদের উৎপাতে বাহিরে বসিয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইত। এখন ঐ ইন্দুমুখীরা গ্লাসকেসের মধ্যে নির্ভয়ে ও সহাস্যে বিরাজ করিয়া ইন্দুরকুলকে উপহাস করিয়া থাকেন—ভ্যাঙাইয়া মারেন।

গুরুদেব বলিতেন "লুচিঃ ক্ষীরনিধাবিব" কি "ফুকো ক্ষীরনিধাবিব" এইরূপ একটা পাঠান্তর করিলেই এখানে সকল গোল মিটিয়া যাইত। তাঁহার মতে এক একখানি লুচি, আর পাঁচ পাঁচ বৎসর পরমায়ু, একই কথা। একখানি লুচিতে পাঁচ বৎসর পরমায়ু বৃদ্ধি হয়।—তাহাতে আবার যখন ক্ষীর সংযোগ, তখন এ বিষয়ে বোধ হয়

কাহারও আপত্তি হইবে না। যে সকল পাঠক গরম লুচি ঘন ক্ষীরে ডুবাইয়া মধ্যে মধ্যে আত্মার পরিতৃপ্তি এবং আয়ুর্বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, তাঁহারা এ পাঠ কল্পনার উপযোগিতা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন। তবে যাঁহাদের তাহা আদৌ জুটে না, তাঁহাদের এ বিষয়টা বুঝান একটু মুস্কিল হইতেছে। যাহা হউক, আজ এমনতর দুর্ভাগ্য পাঠক মহাশয়দের সম্মুখে লুচি ও ক্ষীর হাঁড়ীশুদ্ধ রাখিয়া আপাততঃ সরিয়া পড়িলাম, তাঁহারা এক মাস ধরিয়া দিন রাত ভোগ করুন, পরীক্ষা করুন—বুঝিয়া দেখুন, তারপর মতামত প্রকাশ করিবেন। কেবল একটু সাবধান থাকিবেন, মনে রাখিবেন, শরীরটা ও পেটটা নিজের!

গীতা-প্রবেশ।

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন, বি, এল।]

পরমব্রহ্ম নারায়ণ এই সংসার সৃষ্টি করিয়া তাহার রক্ষার জন্য শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এই দুইপ্রকার ধর্ম্ম বিধান করিলেন। শ্রেয়ো ধর্ম্মের ফল আত্ম সাক্ষাৎকার, মুক্তি, চিরশান্তি বা অক্ষয় অসীম আনন্দ। প্রেয়োধর্ম্মের ফল অভ্যুদয় স্ত্রী, পুত্র, ধন, ধান্য, ঐশ্বর্য্য, স্বর্গ ইত্যাদি। যখন মানবের বিবেকজ্ঞান সঙ্কুচিত হইয়া ধর্ম্মের অভিভব ও অধর্ম্মের প্রভব হয়, তখন জন্মমৃত্যুরহিত ভগবান্ নারায়ণ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব হইয়াও, স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া, মায়িক দেহধারীর ন্যায় জন্মগ্রহণ করেন ঃ—

* যদিও নাহিক মোর জনম মরণ।
সর্ব্বভূতেশ্বর আমি পরম কারণ॥
শুধু স্বীয় প্রকৃতিতে আত্মমায়া-বলে।
জনম ধারণ করি এই ভূমণ্ডলে॥৬
ধর্ম্মের বিনাশ আর পাপের বিকাশ।
ঘটিলে ধরাতে হয় আমার প্রকাশ॥৭
সাধুদের পরিত্রাণ করিতে কেবল।
বিশ্বহিতে বিনাশিতে দুষ্কৃত সকল॥
ধরাতে পরম ধর্ম্ম করিতে স্থাপন।
করি আমি যুগে যুগে জনম গ্রহণ॥৮

গীতা—৪অ।

ভগবান্ এইরূপে বহুবার ধরায় অবতীর্ণ হইয়া পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করা সত্বেও, দ্বাপর যুগের পর, কলিযুগের অন্যূন সার্দ্ধ ছয় শত বৎসর অতীত হইলে, নারায়ণের অংশাবতার তপোনিধি মহর্ষি ব্যাসদেব ও তদীয় পুত্র ধার্ম্মিক প্রবর পরমহংস যোগীন্দ্র শুকদেব বিদ্যমান থাকিতেও, যখন পরমধর্ম্ম বা যোগধর্ম্ম অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন সাক্ষাৎ ঋষিনারায়ণ, অর্জ্জুনরূপী স্বকীয় অংশ ঋষিনরের সহিত, স্বীয় পূর্ণতায় আসিয়া বসুদেবের ঔরসে, দৈবকী জঠরে জাত হইয়া মথুরাধামে কংস কারাগারে ভূমিষ্ঠ হইলেন। এবং আত্মসন্দর্শন ও সংসার নিবৃত্তির প্রকৃষ্টতম মার্গ যোগধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ নাম গ্রহণ করিলেন।

কর্ষণার্থক 'কৃষ' ধাতু ও নিবৃত্তিবাচক 'ন' প্রত্যয় যোগে 'কৃষ্ণ' শব্দ হইয়াছে। প্রাণায়ামরূপ কৌশলে শরীররূপ ক্ষেত্র কর্ষণ করিলে যিনি অব্যয় কেবল আত্মস্বরূপে দর্শন দিয়া মানবকে চিরমুক্ত করেন, অথবা যিনি কূটস্থ চৈতন্যজ্যোতিঃ ও অনাহত ধ্বনিস্বরূপে চঞ্চলপ্রাণকে আকর্ষণ করিয়া স্বস্থানে আনয়নপূর্ব্বক প্রাণের চাঞ্চল্য চিরনিবৃত্তি করেন, তিনিই কৃষ্ণ। ভগবান্ বাসুদেব কলিযুগের একমাত্র পরিত্রাণোপায় যোগ-

ধর্ম্ম প্রচারপূর্ব্বক অমৃতময় কৃষ্ণনাম সার্থক করিলেন।

* কহিলাম সাংখ্যযোগ শুনহ এখন।
কর্ম্মযোগ যাহে তব ঘুচিবে বন্ধন॥
গীতা, ২।৪০

* "কর কর্ম্ম ধনঞ্জয় যোগস্থ হইয়া।"
গীতা, ২।৪৯।১

* "তাই হও কর্ম্মযোগ সাধিতে উদ্যোগী।"
গীতা, ২।৫১।২

* "এই যে অব্যয় যোগ কহিনু এখন।"
গীতা, ৪।১।১

* "এইরূপে পরে পরে রাজা—ঋষিগণ।
এই মহা যোগতত্ত্ব অবগত হন॥
ধরা হ'তে, মহাবাহো, কাল মহিমায়।
হইয়াছে সেই যোগ আজ লুপ্ত প্রায়॥২
তাই সেই নষ্ট প্রায় যোগ পুরাতন।
কহিলাম আমি আজ তোমার সদন॥
উত্তম সাধন ইহা অতি গোপনীয়।
কহিনু তোমারে সখা তুমি মোর প্রিয়॥"৩
গীতা, ৪অ।

ভগবানের কৃষ্ণনাম ধারণের অন্যতম কারণ তিনি, ব্যাসদেব শুকদেবাদি ভক্তবৃন্দের অভিলাষ পূরণার্থ, কলিযুগে অবতীর্ণ হওয়ায় তাঁহার গাত্র বর্ণ সান্দ্রপয়োদশোভ কৃষ্ণ হইয়াছিল ঃ—

অক্ষরং পরমংব্রহ্ম জ্যোতীরূপং সনাতনম্।
গুণাতীতং নিরাকারং স্বেচ্ছাময়মনন্তকম্॥১
ভক্তধ্যানায় সেবায়ৈ নানারূপধরং বরম্।
শুক্লরক্তপীতশ্যামং যুগানুক্রমণেন চ॥২
শুক্লতেজঃস্বরূপং চ সত্যে সত্যস্বরূপিণম্।
ত্রেতায়াং কুঙ্কুমাকারং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা॥৩
দ্বাপরে পীতবর্ণং চ শোভিতং পীতবাসসা।
কৃষ্ণবর্ণং কলৌ কৃষ্ণং পরিপূর্ণতমং প্রভুম্॥৪
নবধারাধরোৎকৃষ্টশ্যামসুন্দরবিগ্রহম্।
নন্দৈকনন্দনং বন্দে যশোদানন্দনম্ প্রভুম্॥৫

"যিনি অক্ষর, পরমব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ, সনাতন বিদ্যমান আছেন, যিনি গুণাতীত ও নিরাকার, স্বেচ্ছাময় ও অনন্ত, যিনি ভক্তের ধ্যান ও সেবার্থে যুগানুক্রমে শুক্ল রক্ত পীত শ্যাম বর্ণে নানা শ্রেষ্ঠরূপ ধারণ করিয়া থাকেন, যিনি সত্যযুগে সত্যস্বরূপ তেজ প্রকাশক শুক্লবর্ণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি ত্রেতাযুগে ব্রহ্মতেজ দ্বারা জ্বলন্ত কুঙ্কুমাকার ধারণ করিয়াছিলেন। যিনি দ্বাপরে পীতবাসে ও পীতবর্ণাকারে শোভিত ছিলেন এবং যিনি কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই যশোদানন্দন ও নন্দৈকনন্দন উৎকৃষ্ট নবধারাধর শ্যামসুন্দর বিগ্রহ পরিপূর্ণতম প্রভুকে নমস্কার করি।"

এই বচন হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেকের একটা ভ্রমাত্মক সংস্কার আছে যে ভগবান্ দ্বাপরযুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং কুরুক্ষেত্র সমর দ্বাপরের শেষেই ঘটিয়াছিল। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনার্থ এই বিষয়ের একটু বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা এস্থলে উক্ত ভ্রমের নিরাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

সকলেই জানেন যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথ্য করেন, যুদ্ধকালে পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ভে ছিলেন এবং যুদ্ধের অল্পকাল পরেই পরীক্ষিতের জন্ম হয়। অতএব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বা পরীক্ষিতের জন্ম প্রায় একই সময়ের কথা এবং তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব দেহত্যাগ করেন নাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর মহারাজ যুধিষ্ঠির ষট্‌ত্রিংশ বৎসর রাজ্য করিলে, ব্রহ্মশাপে (মহা, মৌসলপর্ব্ব ১অঃ) যদুবংশ ধ্বংস হইল (মহা, মৌ, প, ৩অ), মহাত্মা বলদেব যোগে প্রাণত্যাগ করিলেন (মহা, মৌ, প, ৪অ), মহাত্মা বাসুদেব মহাযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিলেন এবং জরা নামক ব্যাধ দ্বারা বাণবিদ্ধ হইয়া যোগে দেহত্যাগ করতঃ আকাশমণ্ডল দিব্য-

হইলেন (মহা, মৌ, প, ৪অ), ইহার অত্যল্প পরেই যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা যোগপরায়ণ হইয়া হিমগিরিতে মহাপ্রস্থান করিলেন (মহা, মহা প্র, ২-৩ অ)। সুতরাং পরীক্ষিতের জন্ম, শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃপক্ষের দেহত্যাগ পরীক্ষিতের রাজ্যারোহণ ইত্যাদি সমস্তই কুরুক্ষেত্র সমরের সপ্তত্রিংশ বৎসরের মধ্যে ঘটিয়াছিল। কুরুক্ষেত্র সমর দক্ষিণায়নে কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীর (মহা-ভী, প, ২অ) পর আরম্ভ হইয়া অষ্টাদশ দিন ব্যাপিয়া হয়। যুদ্ধের দশম দিনের শেষভাগে ভীষ্মদেব ভূপতিত হইয়া শরশয্যায় শায়িত হন ও মৃত্যুর জন্য উত্তরায়ণ প্রতীক্ষা করেন এবং মৃত্যুকালে এই কথাগুলি উচ্চারণ করেন—"বৎস এক্ষণে উত্তরায়ণ সমুপস্থিত হইয়াছে, আমি (যুধিষ্ঠির) তোমাকে অমাত্যগণের সহিত আগমন করিতে দেখিয়া নিতান্ত প্রীত হইলাম। আমি অষ্টপঞ্চাশৎ দিবস এই সমুদয় নিশিত শরনিকরে শয়ান রহিয়াছি। ঐ অষ্টপঞ্চাশৎ দিবস আমার শত বর্ষের ন্যায় বোধ হইতেছে। যাহা হউক এক্ষণে সৌভাগ্য বশতঃ পবিত্র মাঘ মাস ও শুক্লপক্ষ সমাগত হইয়াছে।" (মহা, অনু-প, ১৬৭ অ)। ভীষ্মদেব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারম্ভের অষ্টষষ্টিতম দিবসে উত্তরায়ণে মাঘ মাসের প্রারম্ভে শুক্লাষ্টমী তিথিতে যোগে প্রাণত্যাগ করিলেন।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, তখন মাঘ মাসেই যথার্থ উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। এখনও মাঘ মাসের প্রথম দিবসে উত্তরায়ণ সংক্রান্ত ধর্ম্মকর্ম্ম সকল কৃত হইয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃত উত্তরায়ণ এখন মাঘ মাসে হয় না, ৭ই বা ৮ই পৌষ অর্থাৎ ২১শে ডিশেম্বর উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়। যদি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে উত্তরায়ণ এখনকার মত ৭ই বা ৮ই পৌষে আরম্ভ হইত, তাহা হইলে ভীষ্মদেব "উত্তরায়ণ সমুপস্থিত হইয়াছে" "পবিত্র মাঘ মাস ও শুক্ল পক্ষ সমাগত হইয়াছে" বোধগম্য হয় যে, তখন উত্তরায়ণ ও মাঘ মাস প্রবৃত্ত হইতেছে মাত্র। ভীষ্মদেব মাঘ মাসের ১লা উত্তরায়ণে শুক্লাষ্টমী তিথিতে দেহত্যাগ করেন, অদ্যাবধি মাঘী শুক্লাষ্টমী সেইজন্য ভীষ্মাষ্টমী নামে প্রসিদ্ধ। ভীষ্মদেব ইহার অষ্টপঞ্চাশত্তম দিবস পূর্ব্বে রথ হইতে শরবিদ্ধ দেহে ভূপতিত হন। তখন দক্ষিণায়ন ছিল। অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই দুই মাসে প্রায় ৫৮ দিবস হয়। অতএব সম্ভবত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুক্লা প্রতিপদে কার্ত্তিক মাসের ২১শে আরম্ভ হয়, ও ভীষ্মদেব শুক্লা দশমী কার্ত্তিকী সংক্রান্তিতে শরশয্যায় শায়িত হন। যদি ধরা যায় যে যুদ্ধ কার্ত্তিকী সংক্রান্তি দিনে আরম্ভ হয়, তাহা হইলেও উত্তরায়ণ ১১ই মাঘের পরে হইতেছে না—যেহেতু যুদ্ধ কার্ত্তিক মাসেই হয়, ও তাহার ৬৮দিন পরে ভীষ্মের উত্তরায়ণ দিনে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে ১১ই মাঘে প্রকৃত উত্তরায়ণ হইত। এক্ষণে ৭ই পৌষ বা ২০শে ডিসেম্বর প্রকৃত উত্তরায়ণ হইয়া থাকে; সেই দিন হইতে ১১ই মাঘ ৩২ দিন অন্তর। এই তফাৎ অয়ন চলনের জন্য হইয়াছে। প্রতিবৎসর ৫০½ বিকলা ধরুন ৫০ বিকলা অয়ন চলন হয়, এবং এই ৩২ দিনে রবির স্ফুটগতিও প্রায় ৩২ অংশ হয়, অতএব ৩২ অংশ পিছাইতে প্রায় ৩৪৫৬ বৎসর লাগিবে। সুতরাং উক্ত যুদ্ধ এখন হইতে ৩৪৫৬ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫৬২ কল্যব্দে বা খৃ, পূ, ১৫৩৯ বৎসরে ঘটিয়াছিল।

বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন যথা :—

যাবৎ পরিক্ষীতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥
সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যং সমং নিশি॥
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তা স্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্।
তে তু পরীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দ শতাত্মকং॥

এই বচনে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে পরীক্ষিত যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন কলির দ্বাদশশতাব্দ প্রবৃত্ত হইয়াছে সুতরাং কুরুক্ষেত্র সমর কলিযুগেই হইয়াছে, কিন্তু উপরে যে হিসাব দিয়াছেন তাহার সহিত ঐতিহাসিক ঘটনার কিছু তারতম্য পাওয়া যায়। এই বচনের অর্থ যথা :—

পরীক্ষিতের জন্ম হইতে যাবৎ মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যাভিষেক হইবে, তাবৎ ১১১৫ বৎসর হইবে জানিবে। সপ্তর্ষিগণের মধ্যে যে তারা দুইটীকে নিশাকালে পূর্ব্বাকাশে উদিত দেখা যায়, ইহাদের সমসূত্রে রাশিচক্রমধ্যস্থিত যে নক্ষত্র দেখা যায়, সেই নক্ষত্রে সপ্তর্ষি শতবর্ষ অবস্থান করেন। দ্বিজোত্তম, পরীক্ষিতের জন্মকালে সপ্তর্ষি সিংহ রাশিস্থ মঘা নক্ষত্রে ছিলেন এবং তখন কলির দ্বাদশ শতাব্দ প্রবৃত্ত হইয়াছিল।"

সপ্তর্ষি মণ্ডল রাশিচক্রের বহির্ভাগে বহু উত্তরে অবস্থান করেন। সেইজন্য সপ্তর্ষি কখনই রাশিচক্রের কোন নক্ষত্রেই অবস্থান করিতে পারেন না। মঘানক্ষত্র সিংহ রাশিস্থ একটি নক্ষত্র। তবে সপ্তর্ষি সিংহ রাশিস্থ মঘানক্ষত্রে ছিলেন বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সপ্তর্ষি মণ্ডলের তারাগণের মধ্যে পূর্ব্বাকাশে উদিত তারাদ্বয় যে সূত্রে আছে সেই সূত্রটী দক্ষিণদিকে প্রলম্বিত করিলে রাশিচক্রস্থ যে নক্ষত্র স্পর্শ করে সপ্তর্ষিকে সেই নক্ষত্রে অবস্থিত বলা যায়। এবং এইরূপে সপ্তর্ষি ১০০ বৎসর করিয়া এক এক নক্ষত্রে অবস্থান করেন। পরীক্ষিতের সময় সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। এবং তখন কলির দ্বাদশশতাব্দ প্রবৃত্ত হইয়াছিল বিষ্ণুপুরাণে এই ভবিষ্যৎবাণীটী দেখিতে পাই,—

প্রযাস্যন্তি যদা চৈতে পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেব কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি॥

"সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে যাইবেন তখন সেই কলি (মহাপদ্ম) নন্দ প্রভৃতি রাজগণ পর্য্যন্ত পালিত হইবেন।" বি, পু, ৪ অংশ। ২৪।৩৯॥

নক্ষত্রে যখন সপ্তর্ষি ১০০ বৎসর অবস্থান করেন তখন পরীক্ষিতের (মঘা নক্ষত্র) জন্ম হইতে নন্দের সময় পর্য্যন্ত (১০ = ১০০ =) ১০০০ বৎসর অন্তর হইতেছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত ৩৩শ শ্লোকে সেই জন্য বলা হইয়াছে ১১১৫ বৎসর।

বিষ্ণুপুরাণ পুনশ্চ বলিতেছেন :—

"মহাপদ্মঃ তৎপুত্রাশ্চ একবর্ষ শত মবনী, পতয়ো ভবিষ্যন্তি। নবৈতান্ নন্দান্ কৌটিল্যো-ব্রাহ্মণঃ সমুদ্ধরিষ্যতি। তেষামভাবে মৌর্য্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। কৌটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।" ৪ অং। ২৪অ॥

মহাপদ্ম নন্দ ও তাহার পুত্রাদি নয় জনে সর্ব্ব সমেত ১০০ বৎসর রাজত্ব করিবেন। কৌটিল্য (চাণক্য) নামক ব্রাহ্মণ নন্দবংশীয়গণকে উন্মূলিত করিবেন। তাঁহাদের অভাবে মৌর্য্যগণ অবনী ভোগ করিবেন। কৌটিল্য মৌর্য্যগণের আদি নৃপতি চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন।"

তবেই বিষ্ণুপুরাণের মতে কল্যব্দ ১২০০ শত বৎসরে কুরুক্ষেত্র সমর, তাহার ১১১৫ বৎসর পরে নন্দ রাজা হইবেন, তদ্বংশীয়গণেরা তাঁহার পর ১০০ বৎসর রাজত্ব করিবেন তাহার পর চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন। আমরা জানি চন্দ্রগুপ্ত ৩১৫ খৃঃ পূঃ অব্দে রাজা হইয়াছিলেন অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র সমর ১৭৩০খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বা এখন হইতে ৩৬৪৭ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। এবং উহাও যখন ১২০০ কল্যব্দে হয়, তখন এই হিসাব মতে কলির বয়স ৩৬৪৭+১২০০=৪৮৪৭ বা বর্ত্তমান বয়স ৫০১৮ হইতে ১৭১ বৎসর কম।

ভাগবতও বিষ্ণুপুরাণের মতই বলিয়াছেন যে, পরীক্ষিতের সময় সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে ছিলেন আর নন্দের সময়ে পূর্ব্বাষাঢ়ায় থাকিবেন। ইহাদ্বারা ১১০০ হইতে ১২০০ বৎসর পর্য্যন্ত বলা হইল। অন্যান্য পুরাণেও বিষ্ণুপুরাণের মতই বলা আছে তবে বায়ু ও মৎস্যপুরাণে ১১১৫ বৎসর স্থলে

বচনে সম্ভবতঃ লিপিকর প্রমাদবশতঃ কিছু কিছু বিভিন্নতা ঢুকিয়াছে। অতএব দেখা গেল যে, মহাভারত ও সর্ব্বপুরাণের মতে **কুরুক্ষেত্র সমর কলিকালেই হইয়াছিল।**

কহ্লণ পণ্ডিত বলেন যে, কাশ্মীরাধিপতি মহারাজ গোনর্দ্দ কুরুক্ষেত্র সমরে পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধে যোগদান করেন, এবং কাশ্মীর দেশের ইতিহাস হইতে গোনর্দ্দের রাজ্যাভিষেক ৬৫৩ কল্যব্দে হইয়াছিল, দেখাইয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলেও, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, কুরুক্ষেত্র সমর কলিকালেই হইয়াছিল, দ্বাপরে নহে।

ভগবানের নিজের কোন অভাবই থাকিতে পারে না। তাঁহার পরম ধর্ম্মের প্রচার কেবল লোকহিতার্থে মাত্র ঃ—

* অর্জ্জুন সারথ্য যিনি করিয়া স্বীকার।
করিতে সাধন লোকত্রয়-উপকার ॥
বিতরিলা যিনি এই গীতামৃত সার।
সে কৃষ্ণ পরমাত্মনে করি নমস্কার ॥

গীঃ মা, ৬ ॥

এই গীতামৃতরূপ ধর্ম্মের সুপ্রচারের জন্য অর্জ্জুনের ন্যায় মহাকর্ম্মবীর ও শ্রেষ্ঠ শিষ্যের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। যেহেতু অর্জ্জুন ভারতের ভাবী আদর্শ সম্রাট্ রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরের সহোদর ও দক্ষিণ হস্ত এবং একজন সর্ব্বগুণসম্পন্ন অসামান্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজকুল ও গুণাধিক্য উভয়ই সমভাবে বিরাজিত ছিল। ধর্ম্ম এতাদৃশ শ্রেষ্ঠপুরুষের দ্বারা গৃহীত ও অনুষ্ঠিত হইলে সুপ্রচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

* কর্ম্মে ভক্তি, জ্ঞান আর মুক্তি অভিমত।
কর্ম্মযোগে সিদ্ধ হল জনকাদি যত ॥
তাই বলি যোগ করা তোমার উচিত।
যাহাতে স্ব-ধর্ম্মে হবে লোক প্রবর্ত্তিত ॥২০
শ্রেষ্ঠগণে যে প্রকার করে আচরণ।
তাঁহাই করিয়া থাকে লোক সাধারণ ॥
কর্ত্তব্য নির্ণয় যাহা করে শ্রেষ্ঠজন।
তাহাই ইতরে করে অবাধে গ্রহণ ॥২১

গী, ৩ অঃ ॥

মহাভারতে দেখা যায় যে, অর্জ্জুন ও ইতঃপূর্ব্বেই যোগসিদ্ধ পুরুষ। তাঁহার যোগ উপদেশ গ্রহণ করিবার কোন স্বকীয় কারণ ছিল না। ভগবতী পার্ব্বতী যেমন লোকের উপকারার্থে অজ্ঞানতার ভান করিয়া মহেশ্বরের নিকট ধর্ম্মোপদেশ লইয়াছিলেন, মহাযোগী অর্জ্জুনও তেমন শোকমোহাচ্ছন্নতার ভান করিয়া, লোকহিতার্থে ভগবানের শ্রীমুখ হইতে পরম ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া লইলেন, যেহেতু তাহাতে সাধারণে অধিকতর শ্রদ্ধাবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া উঠিবে।

ক্রমশঃ

* এই চিহ্নাঙ্কিত অংশগুলি মদনুদিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে উদ্ধৃত। উক্ত গ্রন্থ মূল্য ।৵০ আনা মাত্র, বিদ্বৎসভা কার্য্যালয় ২১৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট অথবা ৮৪ নং বেচু চাটুর্য্যে ষ্ট্রীট হইতে প্রাপ্তব্য।

বৃদ্ধের বচন।

সকাল সন্ধ্যা দুই বেলা ভগবান্‌কে ডাক্‌চি, আর বল্‌চি,—'হে নারায়ণ শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর লড়াইটা শেষ ক'রে দেও; আমাদের রাজার জয় হউক, আমরা হিন্দু 'রাজার সুখে অরণ্যে বাস' এটাই আমাদের মূলমন্ত্র। কাজেই রাজার সুখ চেষ্টটা দেখ্‌তেই হবে। কিন্তু দেখ্‌তে পাচ্ছি, কিছুতেই তাহা কিছু হচ্চে না—হতভাগা লড়াইটা কিছুতেই এগিয়ে আস্‌চে না! আমাদের এত কাকুতি মিনতি এত ডাকাডাকি, কিছুই যেন ভগবানের কাণে ঢুকচে না।

নাই। হাল-হকিয়ৎ দেখে মনে হয়, ভগবানও যেন হালে পানি পেয়ে উঠ্‌চেন না। এই দেখনা কেন,—লড়াইটা যাতে শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর শেষ হ'য়ে যায়, তার খরচা যোগাড় কর্‌বার জন্যে খোদ রাজা প্রজার দুয়ারে টাকা ধার কত্তে নাবলেন;—পাছে প্রজার মনে কোনরূপ সন্দেহ হয়, তাই গোটা সাম্রাজ্যটা জামীন রাখ্‌তে তৈয়িরী হলেন। রাজার কারপরদাজ মশায়রা বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথায় ছোট বড় সব প্রজাকেই বেশ বুঝিয়ে সুজিয়ে পথে আনতে সুরু কল্লেন; মিষ্টি কথা শুনে, হাল-গরু বাঁধা দিয়েও নেহাৎ গরীব প্রজারা টাকা ধার দিতে সুরু কল্লে। এই ধারের ব্যাপারটা দে'খে সত্যি সত্যি মনে হচ্ছিল,—এখন থেকে বুঝি রাজায় প্রজায় হেসে-খেলে দিন কাট্‌বার রাস্তা পড়্‌লো। কিন্তু এর্‌ ভেতরেই রাম উল্‌টা বু'ঝে বস্‌লেন!

বাঙ্গালা মুলুকের আধখানা যখন আসামের সঙ্গে জু'ড়ে দেওয়া হ'য়েছিল, তখন থেকে দেশে কতকগুলি লোক মাতব্বরের সঙ্‌ সেজে 'স্বরাজ' 'স্বরাজ' ক'রে দিন কতক খুব গলাবাজী ক'রেছিল। তার ফলে আসল কাজের কাজ কতটা কি হ'য়েছিল বা এখন কত হয়েচে, তার খবর তাঁরাই রাখেন, আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি সেই হেপা হ'তে হাজার খানেক ডব্‌গা-ছেলে আট্‌কা পড়ে আছে, এখনো সে আটক-ফাটকের জের মেটে নাই!

এই লড়াই ঋণ, আর রংরুটের ব্যাপারটা যেরূপভাবে চল্‌ছিল,—কর্ত্তারা যেভাবে কথাবার্ত্তা বল্‌তে সুরু করেছিলেন, তা' দেখে কিন্তু সত্যি সত্যিই মনে হচ্ছিল,—এবার থেকে ভারত আর বিলেতের লোক এক মাকৃতা হ'য়ে যাবে,—লড়াইটা ফতে হ'তে যা দেরী। দেশের লোকগুলা বেশ খোস্‌ মেজাজে নেচে-কুঁদে বেড়াচ্ছিল।

হঠাৎ মান্দ্রাজ থেকে তারে খবর এলো, আর থাকতে পারচেন না। তাই শান্ত কর্‌বার জন্যে উত্তকামন্দে বাসা ঠিক করে দিয়েচেন, সেখানে তাঁর দুইজন চেলা সঙ্গে করে বাস কত্তে হবে! বিবি বেশান্ত এদেশের লোকের সঙ্গে মিলে মিশে বিলিতী "হোমরুল" এদেশে খাড়া করবেন ব'লে ঢের দিন থেকে বকাবকী লেখালেখী করে বেড়াচ্ছিলেন, মান্দ্রাজের লাটের কাছে এটা ভাল লাগ্‌লো না ব'লেই তাঁকে পাহাড়ে তুলে রাখ্‌বার ব্যবস্থা কল্লেন।

আমি ত বুঝি কাজ্‌টা ভালই হলো। 'রুল' পদার্থটা 'হোমের'ই হউক আর বাইরেরই হোক্‌, গোলমেলে— যেখানে 'রুল' সেখানেই গুঁতোগুঁতির ভয়! কাজ কি বাবা! সুস্থ দেহে, যে কয়টা দিন পরমায়ু আছে, সে কয়টা দিন সুখে-সোয়াস্তিতে থেকে মরনা কেন? না, সেটী ত হবার যো নেই! তা হ'লে যে মাতব্বরীটা মানায় না!

আর এই ভুয়া মাতব্বরীরই বা কিম্মত কি! দেখ্‌তে পাচ্ছি,—ফি বছরে দু'বার ক'রে মাতব্বরীর খতেন হয়;—একবার বছরের পয়লা তারিখে, আর একবার রাজার জন্ম দিনে। মাতব্বরদের ওজন মাফিক খতেন হ'য়ে—রাজা, মহারাজা, রায়বাহাদুর রায়সাহেব আদি রকমোয়ারি মুখোস্‌ বিলি হয়। গল্পে শুনেচি, আগেকার দিনে বাদসাই আমলে জায়গীর দিয়ে রাজা মহারাজা করা হ'তো; এখনকার কালে আর সে ব্যবস্থাটী নেই! এখন জায়গীরের বদলে শুধু চাপরাশ দিয়ে রাজা মহারাজা তৈরী হয়। খুঁজে পেতে দেখ্‌লে 'ভূমি-শূন্য' রাজাও এদের ভে'তর ঢের মিলে। তা ছাড়া যারা রায়বাহাদুর, রায়সাহেবী চাপরাশ পায়, তাদের মধ্যে অনেকের দুঃখু দেখে তোমাদের দুঃখু হয় না কি বাপু? এই যারা চাঁদা দেবার ভয়ে সহর ছেড়ে পাড়াগাঁয়ে গিয়ে আস্তানা করে বসেন, তাদের কথাটা একবার ভেবে দেখনা কেন?

(Hon'ble) মাস্তবর নামে একরূপ ঠিকে চাপরাশ পান, মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে এদের মাতব্বরী খ'সে যায়; তখন যেই কে সেই! কিন্তু এই কেলাসের মাতব্বরদের তেজ একটু বেশী বলেই মনে হয়। এঁরা লাট কৌন্সীলের মেম্বর। দেশের দশে মাতব্বর ব'লে বাছাই ক'রে প্রতিনিধি খাড়া করে ব'লে, এঁরা বগল বাজিয়ে বেড়ান। কিন্তু দেশের দশের খবর-বার্ত্তার সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক খুবই কম। এই যে গোটা ভারতটার ভেতর তিরিশ কোটী না তেত্রিশ কোটী লোক আছে ব'লে তোমরা বল, এদের ভেতর তিরিশ জনের সঙ্গেও এঁদের দেখা-সাক্ষাৎ নেই! আমার মনে কিন্তু এ ধারণাটাই খুব বেশী। তবু এঁরা দেশের দশের প্রতিনিধি! আর এই যে তোমরা "হোমরুলই"বল, আর সেল্‌ফ্ গবর্ণমেন্টই বল, এর ভেতর যে কি আছে, দেশের আদত প্রাণ যারা, তারা কিছুই বোঝে না!

উকীল কৌঁসলীরা দেশের শিক্ষিত লোক ব'লে ডাক্‌সাইট আছে, কিন্তু এদের ভেতর শতকরা কয়জন—এই নাচা-কোঁদার ভেতর আছেন, তা বুঝ্‌তে পারি না। যখন একটা হুজুগ ওঠে—বা হুজুগের বৈঠক বসে, তখন ঝাঁকে ঝাঁকে বৈঠকখানায় লোক ঢুক্‌তে দেখা যায়, কিন্তু এদের ভেতর তামাস্‌গীরে সংখ্যাই বেশী! ওপরে যাদের কথা বল্লুম,—শাদা কথায় যাঁরা এই সকল বৈঠকে গলাবাজী কত্তে পারেন, তাঁরাই হচ্চেন নেতা। কেহ কেহ এদের 'লীডার' বা চালকও ব'লে থাকে। এ সব হুজুগ এরাই চালিয়ে থাকে।

এই যে বিবি বেশান্তকে শান্ত কর্‌বার জন্যে মান্দ্রাজের লাট যে ব্যবস্থা করেচেন, তাতে গোটা ভারতের ঐ কেলাসের নেতা বা লীডারের দল অশান্ত হ'য়ে উঠেচেন! মান্দ্রাজে ত মহামারি ব্যাপার উপস্থিত! বোম্বে, যুক্তদেশ, প্রভৃতি

বাঙ্গালার মাতব্বর বাবাজিরা খুব্ সেয়ানা কিনা, তাই তাঁরা ফাক খুঁজে খুঁজে পা বাড়াচ্চেন। এখানে যে "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" গোছের লোক ঢের আছে। বাঙ্গালার নেতাদলের চাঁই খোদ সুরেন্দ্র নাথের এ সময় মেজাজটা বে-সরিফ্, তাই তিনি রাঁচীতে মাস খানেক হাওয়া খাবেন। তাঁর শিষ্যই বল, আর জুরীদারই বল—ভূপেন্দ্র নাথ চল্লেন বিলেতের বড় কৌন্সীলে। তা হ'লেই দেখ্‌তে পাচ্ছি, বাঙ্গলার নেতার দল এখন "কন্ধ-নাশা"! কারো কারো মুখে শোনা যায়,—"কুচ্ পরোয়া নেই, বিপিন পাল আছে"। কিন্তু আবার লোকে এটাও বলে,—"বিপিন পালের বিষ দাঁত ভেঙ্গে গেচে। সেবারে অশ্বিনী দত্ত, কেষ্টমিত্তির শ্যামসুন্দর ঠাকুরতা প্রভৃতির বনবাসের ব্যবস্থা দেখে যখন পাল বাবু বিলেতে পালিয়েছিলেন সেখান থেকে ফেরৎ আস্‌বার সময় বোম্বে সহরে তাহাকে কিছুকাল আটক থাক্‌তে হ'য়েছিল। তার পর থেকেই তিনি "তোবা" করে এখন্ বোষ্টম্ হয়েচেন, নারায়ণের সেবা কর্‌চেন। তিনি আর এখন বড় একটা হাত পা নাড়্‌চেন না, ঠুঁটো-জগন্নাথ হ'য়েই আচেন।"

আদত কথাটা যা-ই হোক্ না কেন, এই যে গোটা ভারত ময় "এছা করেঙ্গা তেছা করেঙ্গা" একটা ঢেউ উটেচে, শর্ম্মার কাছে কিন্তু এটা ভাল ঠেক্‌চে না। কেন ভাল ঠেক্‌চে না, বলি শোন। সেই বঙ্গ ভাঙ্গার সময় এদেশে যে ঢেউ উঠেছিল, তার বেগটা নেহাৎ কম ছিল না। কিন্তু শেষটা কি হয়েছিল জান ত? যারা হুজুগের মুরব্বী ছিলেন তারা ছেলেগুলকে ক্ষেপিয়ে 'গাছে তুলে শেষে মইখানা সরিয়ে নিলেন,—সেই হেপা থেকে ছেলেগুলা কিন্তু এখনো গাচে উঠেই রয়েচে, নাব্‌তে আর পাচ্ছে না! এবারকার হুজুগে শুধু ছেলে নয়, সব মাতব্বর মাতব্বর মুরব্বীরা ক্ষেপেচেন। সেবারকার হুজুগটা শুধু বাঙ্গালায় ছিল,

হোক্, আর 'কু'-ই হোক্ একটা জাঁদরেলা গোচের হবে, এটা ঠিক্ জেনো।

আর একটা কথা আমার মনে সময়ে সময়ে জেগে উঠে। সকলেই বলে বেড়ায়,—আনী বেশান্ত গোটা ভারতের জন্যে প্রাণপাত করেচে,—দেহ মাটী করেচে, তার যথাসর্ব্বস্ব এদেশের তরে খুয়িচে। কিন্তু বুঝ্তে পাচ্ছিনা, তার এতটা করায় জনসাধারণের কি উপকারটা হয়েচে বা হবার পথ পড়েচে। তার কাজের ভেতর প্রধান একটা কাজ, তোমরা বলচ,—হিন্দু কালেজ প্রতিষ্ঠা। সেটাতে যে জনসাধারণের কি ফায়দা হচ্চে, সেটাত সকলে বলচে না! এই যে 'হোম রুলের' কথা,—যেটা নিয়ে আজ তাঁর পাহাড়ে বাসের ব্যবস্থা হ'ল, এটাতেই বা তোমার আমার কি ফায়দা? বকাবকী, লাঠালাঠী, মুখোমুখী ক'রে যদি সত্যি সত্যি এটা মিলে, তাতেই কি নকড়ি বাড়ুয্যের কন্যাদায় বা রামু ঘোষের অন্ন কষ্ট ঘুচ্বে তায়? তোমাদের ভেতর যারা মাতব্বরী তক্ত পেয়েচ, তারা না হয়, ফোপর দালালী কর্বার পথটা বেশ খোলসা পেলে; কিন্তু জিজ্ঞেস কত্তে ইচ্ছে হয়,—দেশশুদ্ধ লোকের মধ্যে প্রায় পনের আনা লোক যে দুবেলা দুমুটো ভাত খেতে পায় না, তার কোন একটা ব্যবস্থা কর্তে পার্চে কি? যদি নিজেদের হাতে দেশ-শাসন কর্বার ক্ষেমতাটা পাও,—মুখ চিনে চিনে না হয়, মোটা মোটা, সরু সরু চাকরীগুলিই বিলি ব্যবস্থা কল্লে, কিন্তু গরীব গুর্বোগুলোর অদেষ্টে তখন কিছু ঘট্বে কি? এখনো ত মুন্সীপালীতে তোমরা কেহ কেহ মাতব্বরী কর্বার ক্ষেমতা পেয়ে থাক। বল দেখি, কখনো কোন গরীব-গুর্বোর কথা তোমাদের কাণে ওঠে কি?—অথবা তাদের দুঃখু কষ্ট দেখে তাদের পানে চাইতে মন সরে কি? একটা মোটা কথা দেখনা কেন,—এই যে বরপণ ও যৌতুকের কসুনীতে বাঙ্গালা দেশটা উচ্ছন্ন যাবার পথে দাঁড়িয়েচে,—একথা নিয়ে তর্গলাবাজী অনেকেই করেচ, বলি কিছু কত্তে পাল্লে কি? এই সামান্য একটা কাজ কর্বার ক্ষেমতা যাদের নেই, তাদের মুখে দেশোদ্ধারের কথা! মরণ আর কি !!!

টীকা-টিপ্পনী।

রাজনীতিক্ষেত্রে ইদানীং বৈদ্যসন্তানের সম্পূর্ণ অভাব ছিল, উহা একরূপ ছিল ভাল। গত নির্ব্বাচনে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় লাট কৌন্সীলের মেম্বর হইয়াছেন। তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতায় জনসাধারণ পরিতৃপ্ত আছে।

বিদ্বৎসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর এবারকার কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইতি-পূর্ব্বে তিনি একবার লাট-কৌন্সীলের মেম্বর [illegible] কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে বহরমপুর ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ডের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

এই সংবাদ শুধু বৈদ্যসমাজ কেন, বাঙ্গালী মাত্রের নিকটেই সুখের সংবাদ। রায় বৈকুণ্ঠনাথই দেশীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে এই সম্মান লাভ করিলেন। স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রাপ্তির ইহাই মুখবন্ধ, এবং এজন্যই ইহা জনসাধারণের আনন্দের বিষয়। যাহা হউক, বর্ত্তমান সময়ে দেশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে রায় বৈকুণ্ঠনাথ একজন প্রবীণ এবং বিচক্ষণ লোক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিলাতী ইণ্ডিয়া কৌন্সীলের সদস্য পদে বৃত হইয়াছেন, এই সংবাদে দেশবাসী যেরূপ সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন, ভারত-বন্ধু (!) "ষ্টেট্সম্যান" পত্রও তদপেক্ষা অধিক বলিয়া বোধ হয়। হইবার কথা বই কি! দেশীয় সমাজে যে মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ 'দু-মুখো শঙ্খিনী' বলিয়া যশোলাভ করিয়াছেন। দুমুখো লোকেরই এখন আদর একটু বেশী। যাহারা মৎলববাজ, তাহারা দুমুখোই চায়।

ভূপেন্দ্রনাথ নূতন চাকরী পাইয়া বিলাত গেলে তাঁহার আয় কমিয়া যাইবে, এই চিন্তায় 'নায়ক' পত্রের অনিদ্রা-রোগ জন্মিয়াছে! দিন রাত্রি শুধু এই ভাবনা, এই কথা। আমরা ত দেখিতেছি, নূতন চাকরীর বেতন মাসিক ১২৫০৲ টাকাটা তাঁর উপরি লাভ। কারণ, এটর্নীগিরির জন্য তাঁহার যে 'ফার্‌ম্‌' আছে, তাহার অষ্টাঙ্গ পূর্ণ থাকিবে, কাজ কর্ম্ম ফার্‌ম্মের নামেই চলিবে, তাঁহার বখরার ন্যায্য-গণ্ডা তিনি ষোল-আনাই পাইবেন, অতএব তাঁহার আর্থিক ক্ষতিটা ত আমরা কিছু দেখিতে পাই না! 'নায়ক' তবে এতটা আঁত্‌কে উঠ্‌লেন কেন?

কিন্তু একটা কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে 'নায়কে'র একটু বিচলিত হইবার হেতু আছে, বলিয়া মনে করা যায়। ভূপেন্দ্রনাথ গতবার বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বৈষ্ণব হইবার চেষ্টা করিতেছেন, 'নায়ক' এরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন। 'নায়ক' বলিয়াছিলেন,—ভূপেন্দ্রনাথের বাড়ীতে সর্ব্বদা কথকতা হয়, কথকতা শুনিয়া তিনি ভাবে বিভোর হন,—তাঁহার বাটীতে শালগ্রাম শীলা প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতেছে ইত্যাদি। ভূপেন্দ্রনাথ বিলাত গেলে আর তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং মাঝে মাঝে ভূপেন্দ্রনাথের বাড়ীতে 'মাল্‌সা ভোগের' বখরার প্রত্যাশা হইতে নায়ককে বঞ্চিত হইতে হইবে, এই যা কথা।

ভূপেন্দ্র বাবুর স্থলে বড় লাট কৌন্সীলের তক্তে কে বসিবেন, সে কথাটা লইয়া এখন হইতে কাণাঘুষা চলিতেছে। ভূপেন্দ্র বাবুর গুরু সুরেন্দ্র বাবু এই খালি তক্ত অধিকার করিবার প্রয়াস পাইবেন, এরূপ কথা উঠিয়াছে। আমরা বলি "উঁহুঁ"। গত নির্ব্বাচনের সময় এতটা ঢলাঢলির পর আর তাঁহার ঐ দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত নহে। এখন তিনি মণিরামপুরে বসিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করেন, আমাদের ইচ্ছা তাহাই। অধিকন্তু বিলাতী কৌন্সীলে ভূপেন্দ্রনাথের পূর্ব্বে তাঁহার নিয়োগ দেখিলে মনে হইত,—তাঁহার প্রতিভার মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে। তাহা যখন হইল না, তখন অনর্থক এই বৃদ্ধবয়সে শিমলা আর দিল্লীতে টানাপড়েন করিয়া সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করায় লাভ কি?

মাননীয় শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় এই সুযোগ অবহেলা করিবেন কি? অনেকের মতে,—অম্বিকা বাবুর জন্য সুরেন্দ্র বাবুর চেষ্টা করাই উচিত। আমরাও ইহা মন্দ বুঝি না। অম্বিকা বাবু বৃদ্ধ হইলেও কর্ম্মঠ। তাঁহার তেজস্বিতা, সৎসাহসিকতা এবং ন্যায়পরতা দেশের সেবায় নিয়োজিত হইবার সুবিধা ঘটিলে অনেকটা কাজে হইতে পারে, অনেকের মনের ধারণা এইরূপ। তবে আমরা তফাতে থাকিয়া যাহা দেখি, এবং তাহা হইতে যতটুকু বুঝিবার সুবিধা ঘটে, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, এসকল ব্যাপারে প্রকৃত কাজের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া অনেকে ভূয়া সম্মান লাভের প্রত্যাশায় সব গুলাইয়া দেন! ফলে এসকল নিয়োগ-নির্ব্বাচন যে এখন কতকটা রঙ্গ-তামাসায় দাঁড়াইয়াছে!

কবিরাজ গণনাথ সেন মহাশয় যখন মহামহোপাধ্যায়" উপাধিপ্রাপ্ত হন, তখন এক বিদ্বৎসভার বিশেষ অধিবেশনে তাঁহাকে রৌপ্যাধারে এক অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইয়াছিল। কোন কোন

বৈদ্যসন্তান বলিতেছেন,—এমন কি, কেহ কেহ লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, ঐরূপ অভিনন্দন প্রদান করা সর্ব্বসাধারণের অভিপ্রায় ছিল না। এই সকল অভিযোগের কৈফিয়তে বক্তব্য এই যে, সভার একজন সহকারী সভাপতির প্রস্তাবে, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অনুমোদনে ঐ অভিনন্দন প্রদত্ত হইয়াছিল। ঐরূপ অভিনন্দন প্রদান করা অবশ্যকর্ত্তব্য, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি এজন্য ঐ প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়াছিলেন। প্রতিবাদকারীদিগের উদ্বেগ দূরীকরণার্থে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রৌপ্যাধার প্রভৃতি প্রস্তুতে যে ব্যয় পড়িয়াছিল, তাহার ব্যয় কোন বৈদ্যসন্তান স্বয়ং বহন করিয়াছিলেন। সভার অর্থব্যয় ব্যতীত যদি তাঁহাদের উদ্বেগের অন্য কোন কারণ থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতিকার করা আমাদের সাধ্যাতীত। ইঁহারাও বৈদ্য !!!

গৈলা-কবীন্দ্র কলেজ।

[বৈদ্য-অধ্যাপক কর্ত্তৃক পরিচালিত।]

বিগত ১৩২৩ সালের গভর্ণমেণ্ট গৃহীত সংস্কৃত পরীক্ষায় অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত কবি-শেখর এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অশ্বিনীকুমার কাব্য ব্যাকরণতীর্থ (স্মৃতি, কাব্য ও পৌরোহিত্যের প্রফেসর) মহোদয়দ্বয় এক বৎসরের জন্য মাসিক ১০৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির অধ্যাপনা হয়।

১। কলাপ ব্যাকরণ, ২। মুগ্ধবোধ, ৩। সুপদ্ম ব্যাকরণ। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যাকরণ পড়াবার বন্দোবস্ত আছে। ৪। কাব্য, ৫। সাংখ্য। ৬। বেদান্ত, ৭। ন্যায়, ৮। স্মৃতি, ৯। বেদ। ১০। পৌরোহিত্য, ১১। আয়ুর্ব্বেদ।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দর্শনাদি এবং পুরাণাদি অধ্যাপনারও সুবন্দোবস্ত আছে। বর্ত্তমান সময় এই কলেজে ১২০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করে।

বিগত ১৩২৩ সনের গভর্ণমেণ্টে গৃহীত প্রথম দ্বিতীয় ও উপাধি পরীক্ষার ফল।

কলাপব্যাকরণ উপাধি বিভাগ।

গুণানুসারে।

১ম বিভাগ। ১। হরিদাস ভট্টাচার্য্য। বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার মধ্যে ইনি প্রথম স্থান

২য় বিভাগ। ১। জিতেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত ২। বিমলাকান্ত সেন গুপ্ত, ৩। বিজয়প্রসন্ন দাশ গুপ্ত। মোট পরীক্ষার্থী ৬ জন। উত্তীর্ণ ৪ জনের ১ জন ১ম বিভাগে, ৩ জন ২য় বিভাগে।

কাব্য-উপাধি বিভাগ।

গুণানুসারে।

২য় বিভাগ। ১। হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণতীর্থ, ২। ললিতকুমার চক্রবর্ত্তী, ৩। হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

কাব্য দ্বিতীয় বিভাগ।

প্রথম বিভাগ। ১। হেমেন্দ্র- চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ২। অশ্বিনীকুমার দাশ গুপ্ত ব্যাকরণতীর্থ।

সাংখ্য দ্বিতীয় বিভাগ।

১ম বিভাগ। ১। ঋষিকেশ চক্রবর্ত্তী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।

২য় বিভাগ। উপেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।

দ্বিতীয় বিভাগ। ১। নকুলেশ্বর চক্রবর্ত্তী ব্যাকরণতীর্থ, ২। লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্ত্তী ব্যাকরণ-তীর্থ, ৩। হীরালাল দাশ গুপ্ত, ৪। যতীন্দ্রনাথ

বরের বাবা ও বর।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত]

বরের বাবাটী প্রবীণ, সরকারী আপীশে চাকরী করিতেন, মাসিক ৪০৲ টাকা পেন্সন পাইতেছেন। তাঁহার তিনটি পুত্র। যেটির কথা আমরা বলিব, এটি মধ্যম, বি-এ পাশ করিয়া এম্, এ পড়িতেছে। বড়টিও বি-এ; সরকারী শিক্ষাবিভাগে চাকরী করেন, মাসিক বেতন ৭৫৲ টাকা। কনিষ্ঠটি মাতৃকুলেশন পাশ করিয়া ১৫৲ টাকা জলপানী পাইয়া কলেজে পড়িতেছে। মধ্যমটি অর্থাৎ যেটিকে আমরা বর বলিয়া উল্লেখ করিতেছি, সেটি ও জুনিয়ার এবং সিনিয়ার বৃত্তি পাইয়া কলেজে পড়িয়াছে এখনো পড়িতেছে। এরূপ সংসারকে মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন একটি সুখের সংসার বলিলে বেশ বলিতে পারা যায়। ইহারা জাতিতে বৈদ্য, বাসস্থান পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মাঝামাঝি।

জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ দিয়া বাবা মজকুর পণ যৌতুক ও গহনায় প্রায় আড়াই হাজার টাকা আদায় করিয়াছিলেন। কনের বাবা বেচারীকে বরের বাবা মহাশয়ের এই আবদার রক্ষা করিতে যাইয়া পৈত্রিক ভদ্রাসন শুদ্ধ বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। কন্যার বিবাহ দিয়াই, তাঁহাকে বসত বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় লইতে হয়। বিবাহের পর বর যখন শ্বশুরালয়ে গেলেন, তখন শুনিলেন,—সপ্তাহান্তে শ্বশুরকে স্থানান্তরিত হইতে হইবে। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের সময় বাড়ীখানা বাঁধা পড়িয়াছিল, এই কন্যার বিবাহে তাহা বিক্রয় করিতে হইয়াছে। বন্ধক গৃহীতাই ক্রয় করিয়াছেন। তিনি এক পক্ষ কাল বাড়ীতে থাকিবার অবকাশ দিয়াছেন। তাড়া দিয়া এ বাড়ীতে বাস করিবার অধিকার কোত্থেকে; ছ'বচ্ছর বাড়ী বাঁধা রেখে দেড় হাজার টাকা নিয়ে ছিল, এর ভেতর একটি পয়সা সুদ দিতে পারেন নি। আর দেবেনই বা কোত্থেকে। ষাটটী টাকা মাইনে পান, তার ভেতর সংসারে পুষ্যি এগারটী, সুদ যোগাবেন কোত্থেকে। তার ওপর আবার ভাড়া।"

জামাই বাবাজী এ সকল কথা শুনিয়াই শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। বলিয়া আসিলেন,—"যদি কোন দিন দেখ্‌তে পাই, আপনারা আবার এ বাড়ীতে বাস করবার সুবিধে পেয়েচেন, তবেই এখানে আস্‌ব নতুবা এই শেষ আসা।

বুঝিবার সুবিধার জন্য এখানে বরের বাবা ও পুত্রদের নামকরণ করা হইল। এ নাম করণে লুচীর প্রত্যাশা নাই।

বরের বাবার নাম,—মহেশ্বর এবং পুত্রত্রয়ের নাম যথাক্রমে যামিনী, নলিনী এবং কামিনী।

চৈত্র মাস চলিতেছে, বৈশাখ মাসে বিবাহের মরসুমে কন্যাদায় মুক্ত হইবার জন্য কনের বাবারা আহার নিদ্রা-বর্জ্জিত হইয়া বরের সন্ধানে ব্যস্ত। মহেশ্বর এই মরসুমে একটা দাঁও মারিবার সুযোগ খুঁজিতে রত হইলেন। চারিদিক হইতেই নলিনীকে দেখিবার জন্য লোক আসিতেছে, কিন্তু নলিনী কাহাকে ও দেখা দেয় না। সে বিবাহ করিবে না, ইহাই তাহার সঙ্কল্প।

মহেশ্বর বেগতিক দেখিয়াই একদিন নলিনীকে ডাকিয়া বলিলেন—'বিয়ে কর্‌বে না, এ কেমন তর কথা ?

নলিনী। নিতান্ত লজ্জিত ভাবে বলিল—"যদ্দিন কোন্ চাকরী বাকরীর যোগাড় না হয়, তদ্দিন বিয়ে কর্‌বো না, এটা আমার ইচ্ছে।

মহে। চাকরী বাকরী যদি দশ বছর না হয়

নলিনী। আমার ইচ্ছেত তেমনি। যদি সত্যি সত্যি তদ্দিন চাকরী না হয়, তাহ'লে ত সকলের ভরণ পোষণ আপনাকেই কর্ত্তে হবে, আপনি আর ক'দ্দিন। তবে বল্‌বেন, দাদা আছেন, তা দাদারই বা আয়টা কি, পঁচাত্তর টাকা বইত নয়। এতে তিনি ক'দিক সাম্‌লাবেন। কামিনীকে মানুষ কত্তে হবে ত ?

মহে। সে ভাবনা তুমি ভাব্‌তে যাচ্ছ কেন বাপু। যামিনীর বিয়ের হাজার টাকা দিয়ে রামতনু বোসের বাড়ীটে বাঁধা রেখেছি, মাসে তার সুদ দশ টাকা আস্‌বে। তাছাড়া এইত সেদিন সারুলের মাণিকসেন তার মেয়ের সম্বন্ধ কর্‌বার্ জন্যে এসেছিল, আমি তিন হাজার টাকা চেয়েছি, বাদ সাদ দিয়ে নিদেন দেড় হাজার কি সাড়ে সতের শয় দাঁড়াবে ত! সে টাকাটা আবার সুদে খাটাব। এর ভেতর তোমার এম্‌-এটা, হয়ে গেলে আর ভাবনা কি বাপু ?

নলিনী। আমার বিয়ে দিয়েও টাকা নেবার ইচ্ছে করেছেন কি ? বদ্দার শ্বশুর ত বদ্দার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে এখন মাস্‌তুতো ভেয়ের বাড়ীতে বাসা নিয়েছেন। আবার আমার বিয়ে হ'লে ত আর একটি বৈদ্য সন্তানের তেম্‌নি অবস্থা হবে। তেমন ভাবে বিয়ে কত্তে ত আমি কিছুতেই পারবো না বাবা!

মহে। সে কি কথা! দেশ শুদ্ধ লোক যা কচ্ছে, আমিও তাই কত্তে যাচ্ছি। তুমি তা কত্তে পার্‌বে না, এ কেমন তর কথা ?

নলিনী। দেশ শুদ্ধ লোকে যদি নিষ্ঠুর হয়, দেশশুদ্ধ লোক যদি ডাকাতি নরহত্যা করে, তা হইলে যে আমাকেও কত্তে হবে, তার কোন মানে নেই। এত স্পষ্টতঃ দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের অবস্থার দিকে লক্ষ্য না রেখে, মানুষের সামর্থ্যের প্রতি দৃষ্টি না ক'রে কেবল শুধু আপনার দিকেই দেখ্‌বে।—এটা ভাল বলে বোধ হচ্চে না।

মহে। লেখা পড়া শিখে, কোন্‌টা নিজের ভাল, তা যদি না দেখ্‌লে, তবে আর এ শিক্ষায় লাভটা কি হ'লো ?

নলিনী। একজনের সর্ব্বনাশ ক'রে নিজের ভাল দেখাটা আমার বিবেচনায় কুশিক্ষা। আপনি ত বল্‌বেন, বিয়ের পণ নেওয়াটা নিজেদের লাভ। কিন্তু যার কাছ থেকে নেওয়া হয় তার যে সর্ব্বনাশ! এটাত শিক্ষার গুণ বল্‌তে পারিনা বাবা।

মহে। এই যে দেশের দশ জনে বিয়েয় টাকা নিচ্ছে, এটাকে তবে তুমি কি বল্‌তে চাও ?

নলিনী। দেশের লোকে আজ কাল যে ভাবে টাকা নিচ্ছে, এটাকে আমি ঘোর নিষ্ঠুরতা মনে করি। একজন লোক তার মেয়েটীকে খাইয়ে পরিয়ে, কাজ কর্ম্ম শিখিয়ে মানুষ ক'রে একটী ভাল ছেলের হাতে দিতে সাধ করে ব'লে আমরা তার যথা সর্ব্বস্ব ধরে টান দেবো! এটা কি মানুষের মতন কাজ হবে ?

মহে। তা'হলে খুলেই বলনা কেন, টাকা নিয়ে বিয়ে করা তোমার ইচ্ছে নয়।

নলিনী। আজ্ঞে সে কথাটা মিথ্যে নয়। যদি বিয়ে কত্তে হয়, তবে পণ-যৌতুক নিয়ে,শাদা কথায় নিজে বিকি হয়ে বিয়ে কত্তে আমার আদবে ইচ্ছে নাই, আপনার পায়ে ধরে বল্‌চি আমাকে তেমন আদেশ কর্‌বেন না।

মহে। ভাল কথা, তোমার মায়ের সঙ্গে এ সকল কথার বোঝা পড়া ক'রো। সে যে দিন রাত তোমার বিয়ের জন্যে আমায় জ্বালাতন কর্‌বে, তাকে সে কথাটা বুঝিয়ে ব'লো।

(ক্রমশঃ)

ধন্বন্তরি।

মাসিক পত্র।

২য় বর্ষ, } শ্রাবণ, ১৩২৪, ইং ১৯১৭ জুলাই, আগষ্ট {১০ম সংখ্যা।

৺কবি প্যারিমোহনের কুমারসম্ভব হইতে

রতি-বিলাপ।

[অধ্যাপক শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী, এম্, এ]

অচেতন হ'য়ে রতি রহি কতক্ষণ।
ভুঞ্জিতে বৈধব্য-ব্যথা লভিল চেতন॥
ললাটে আছিল দুখ কে ঘুচাবে বল।
তাই বুঝি হেন কালে চেতনা ফিরিল॥১
মূর্চ্ছা অবসানে রতি চারিদিকে চায়।
কোথা ও প্রাণের ধনে দেখিতে না পায়॥
ছট্ ফট্ ক'রে তারে খুঁজে আঁখি দুটি।
হারা'য়ে নয়ন তারা কাঁদে তারা দুটি॥
জনম ভরিয়া দেখি না মিটিল সাধ।
আজি সেই নিধি বিনা পরম বিষাদ॥
জনমের মত যেই লয়েছে বিদায়।
দেখা তার বল আর পাবে বা কোথায়?২
না হেরে' পতিরে রতি গণিল প্রমাদ।
'কোথা প্রাণনাথ' বলি হইল উন্মাদ॥ ‡
'হায়, প্রাণ-নিধি তুমি আছ কি বাঁচিয়া।
কোথা গেলে একাকিনী আমারে ফেলিয়া॥,
এত বলি অন্বেষণ করিতে পতিরে।
ভূমি হ'তে রতি দেবী উঠে ত্বরা ক'রে॥

উঠি অভাগিনী রতি শিহরে দেখিয়া।
অদূরে কন্দর্প পুড়ি রয়েছে পড়িয়া॥৩
ভাঙ্গিয়া হৃদয় উঠে আর্ত্তনাদ মুখে।
বজ্রাঘাত হ'ল যেন রমণীর বুকে॥
কোথা নাথ, কোথা নাথ, ঘন ঘন বলে।
করাঘাত করি শিরে পড়িল ভূতলে॥
এলো-থেলো হ'ল কেশ কাঁদে উচ্চস্বরে।
দেখিয়া তাহার দুখ ধরণী বিদরে॥৪
বলে, "প্রাণনাথ, দেখা দাও একবার।
অভাগিনী মরি আমি শোকেতে তোমার॥*
এ তোর কি রীতি, ওরে নিদারুণ বিধি।
দিয়ে কেন পুন হরে নিলি প্রাণনিধি॥ *
হে প্রিয়, তুমি যে ছিলে সুরূপে তুলনা। †
আজিকে এমন দশা, কেন রে বল না॥
আজিকে তোমার দশা দেখিয়া এমন।
ধিক্ ধিক্ এখন এ রহেছে জীবন॥
ধিক্ নারীগণে ধিক্ কঠিন হৃদয়।
এত দুঃখ সহি তারা প্রাণে বেঁচে রয়॥*

ওহে প্রাণ প্রিয়! চির প্রেম পাসরিলে।
অনাথারে একা ফেলি কেমনে পলা'লে?
আমি যে নলিনী তুমি ছিলে জলাশয়।
প্রণয়েতে বাঁধা ছিল তোমার হৃদয়॥
আজি সে প্রেমের বাঁধে ভাঙ্গিলে কেমনে।
ছিঁড়িয়া মায়ার ডোরে গেলে কোন্ প্রাণে?৬
জানিলাম 'নাথ, তব নাহিক বিচার।
দুখিনীরে তাই দেখা নাহি দেহ আর॥
কখন অপ্রিয় প্রভু করনি' আমার।
তবে কেন আজি এত কঠোর ব্যাভার॥
আমি বা কি অপরাধ করেছি ও পায়।
কোন্ দোষে বল নাথ, ত্যজিলে আমায়॥৭
খেলিতে খেলিতে যেই বাঁধিতাম হাতে।
কখনো কমল ছুড়ি মারিতাম মাথে॥
আকুল হইত আঁখি মাখিয়া পরাগ।
সে সব স্মরিয়া বুঝি করিয়াছ রাগ?৮
বলিতে 'প্রেয়সি, তুমি হৃদয়ের ধন'।
সে কথা ছলনা মাত্র জানিনু এখন॥
সে কথা যথার্থ যদি এতটুকু হবে।
তবে অভাগিনী কেন এত দুঃখ স'বে?
হৃদয় তোমার, নাথ, পুড়িল যখন।
অভাগিনী দগ্ধ কেন হল না তখন॥৯
মিছে কথা বলে নাথ ভুলাতে আমারে।
কি বলে ভুলাবে আজ শুধাই তোমারে॥
এই ছিলে এই তুমি গেলে কোন্ পথে।
তব সনে সব সুখ ফুরা'ল জগতে॥
কেবল রতির তব পোড়েনি' কপাল।
সবারে পোড়াল পোড়া হর-কোপানল॥
আমি ত যেতেছি, প্রভু, পশ্চাতে তোমার।
দাসী হয়ে তব পদ সেবিব আবার॥১০
কিন্তু আজি পৃথিবীতে যত নরনারী।
কি উপায় তাহাদের বলিতে না পারি॥
নিশীথের অভিসারে যবে অন্ধকার।
ঘন ঘন ঘন-ঘোষে কাঁপে ত্রিসংসার॥
কখন বিজন পথে বল আনি মনে।
তুমি, স্মর, যেতে সাথে প্রিয় নিকেতনে॥
এখন সে সব, হায়, স্বপন সমান।
বিফলে মানবগণ ধরিবেক প্রাণ॥১১
মদালসা প্রমদার মদ বিড়ম্বনা। †
কি কাজে লাগিবে বিনা মদন-বাসনা॥১২
শশীরও গলায় ফাঁসি হাসি না ফুটিবে।
তোমার অভাবে শশী মসী-ম্লান হবে॥১৩
কে আর পড়িবে চূত-মুকুলের বাণ।
কুহুরবে কে বধিবে বিরহীর প্রাণ॥১৪
মধুপ ঝঙ্কার ছিল তোমার টঙ্কার।
অলিমালা ছিল তব ছিলা ‡ চমৎকার॥
এবে সেই অলিকুল সবে পর্য্যাকুল।
গুণ গুণ করি তাই কাঁদিয়া আকুল॥১৫
উঠ, কাম, এস ত্বরা, যদি না জাগিবে।
কোকিলা কাহার দূতী বলগো সাজিবে?
ফুরায়েছে কার্য্য তার ভুলেছে চাতুরী।
বনে বাস করে আর মরে ঘুরি ঘুরি॥১৬
মরিবে বসন্ত তব শোক পেয়ে চিতে।
মলয় পাইবে লয় না চাহি বাঁচিতে॥
হা হা নাথ, মনে পড়ে কত কি বলিয়া।
সাধিতে কতই মোরে কত না করিয়া॥
কত খেলা মোর সনে খেলিতে নিভৃতে।
সে সব স্মরিয়া এবে জ্বলিতেছি চিতে॥১৭
অঙ্গে অঙ্গে পরাইতে পুষ্প আভরণ।
সে সব রয়েছে কিন্তু তুমি অদর্শন॥১৮
দারুণ বিবুধগণ কিছু না বুঝিয়া। *
এমন বিপদ মাঝে দিল পাঠাইয়া॥
তখনি মনেতে কত হইল সংশয়।
করিলাম যেই ভয় ফলিল নিশ্চয়॥১৯
জানিতাম আগে যদি হেন-দশা হবে।
চরণে ধরিয়া তোমা বারিতাম তবে॥
না জানি আরো কি আছে এ পোড়া কপালে।

† মদ্যপান ও মত্ততা বৃথা। কোনও ফলদায়ক নহে।
‡ ধনুর ছিলা। অর্থাৎ জ্যা।
* বিবুধ = (১) দেবতা ও (২) মূর্খ।

নহিলে কৃতান্ত মোরে কেন রবে ভুলে ॥*
আমার হৃদয়শশী কোথায় লুকা'ল।
নিমেষে সুখের নিশি পোহাইয়া গেল ॥*
বেরো রে দারুণ প্রাণ না জ্বালাও আর।
সহিতে না পারি আর যন্ত্রণা অপার ॥*
মিনতি করিহে তোমা পূর্ণ কর আশে।
অনলে স'পিলে কায়া যেও তাঁর পাশে ॥২০
মরিলেও এই নিন্দা লাগিবে আমায়।
পতি বিনা ছিল রতি জীবিত ধরায় ॥ ২১
পরলোকে যায় লোক দেহ তার রয়।
আমার কপালে তাও হ'ল বিপর্য্যয় ॥
দারুণ পাপিণী আমি অতি পাপমতি।
আমা হ'তে নাহি হ'ল পতির সুগতি ॥২২
বুক ফেটে যায়, নাথ, ভাবিয়া-তোমায়।
কমল আনন সেই, সুধা ভরা তায় ॥
মধুসনে সেই তব মধুর আলাপ।
হাসিমুখে কত কথা, কোলে পুষ্প চাপ ॥
অসরল শরগুলি করিতে সরল।
হানিতে রতির প্রতি কটাক্ষ প্রবল ॥
এখন সে সব হায়, কথামাত্র সার।
কেবল অনলস্মৃতি জ্বলিছে তাহার ॥ ২৩
কোথা গেল প্রিয়সখা বসন্ত তোমার।
সেও নাকি তব সাথে হ'ল ছারখার ॥ ২৪
হতভাগা দেবগণ দেখিল কৌতুক।
পুড়িয়া মরিলে তুমি—কিবা তা'তে দুখ ॥
এইরূপে করে রতি বিলাপ বিস্তর।
বাজিল মধুরে যেন বিষদিগ্ধ শর ॥
রহিতে নারিল শেষে আসি দেখা দিল।
সান্ত্বনা করিতে আগে নিজে শান্ত হ'ল ॥২৫
আর কি সে শান্ত হয় সান্ত্বনা করিলে ॥
থেকে থেকে শোকানল উঠে জ্বলে জ্বলে ॥
ভেঙ্গেছে দুখেতে হিয়া—জ্বলেছে আগুন।
স্বজনে দেখিয়া আর বাড়িল দ্বিগুণ ॥
বুকে করে করাঘাত কাঁদে উচ্চস্বরে।
উপাড়িয়া পাড়ে কেশ পড়ে ভুমিপরে ॥২৬

ক্ষণে মূর্চ্ছা হয়, ক্ষণে সংজ্ঞা পায় রতি।
কেঁদে কেঁদে কহে খেদে বসন্তের প্রতি ॥
"দেখরে, বসন্ত, তোর সখারে চাহিয়া।
রতির পাষাণ প্রাণ যেতেছে ফাটিয়া ॥
ভস্মদেহ দেখ অই ধরণী উপরে।
তাহাও পবন আসি ছড়াছড়ি করে ॥২৭
তোমাকে দেখিয়া যদি জাগে বা মদন।
দয়া করি এই স্থানে থাক ততক্ষণ ॥
এত বলি ডাক ছাড়ি কাঁদে উচ্চস্বরে।
দরশন দাও, নাথ, হৃদয় বিদরে ॥
মধু যে এসেছে তব কর সম্ভাষণ।
বন্ধুজনে বন্ধুমন না টলে কখন ॥
আমাতে যদিও তব হয়ে থাকে রোষ।
বসন্ত তোমার কাছে কি করিল দোষ ॥
এস রে বারেক স্মর দেহরে দর্শন।
তোমার বিহনে মধু ব্যাকুলিত মন ॥২৮
যাহার সহায়ে জয় কৈলে ত্রিভুবনে।
সেই চির-সহচরে ভুলিলে কেমনে ॥২৯
কি দেখ, বসন্ত, কাম আসিবে না আর।
নিভেছে জীবন-দীপ সৃজিয়া আঁধার ॥
দুর্ব্বলা পলিতা তার এখনো ধোঁয়ায়।
কাম দীপ; আমি বর্ত্তি, শোক ধূম তায় ॥ ৩০
দেহার্দ্ধ হরিল যবে কৃতান্ত নিষ্ঠুর।
জানিনু জীবনে দুঃখ আছয়ে প্রচুর ॥
ব্রততী-আশ্রয় তরু যদি ভাঙ্গি পড়ে।
কেমনে দাঁড়ায় বল তরুবরে ছেড়ে ॥৩১
আর কিবা হবে কাঁদি—না আছে উপায় ॥
শেষ ভিক্ষা এই বন্ধু চাহি হে তোমায় ॥
আগুণে পুড়ায়ে দেহ করি দেহ ছাই।
পরলোকে দেখি গিয়া যদি পতি পাই ॥৩২ †
চন্দ্রিকা চন্দ্রকে ছাড়ি ক্ষণ নাহি রয়।
বিদ্যুৎ বারিদ বিনা না রহে নিশ্চয় ॥
আমি সচেতনা তবে থাকিব কেমনে।

† ইহা স্বর্গলোকবাসিনী রতির উক্তি না হইয়া মানবীর হইলেই শোভা পাইত।

মম মনোমত ধন মন্মথ বিনে ॥৩৩
অনঙ্গের অঙ্গ ভস্ম মাখি সর্ব্ব গায়।
আনন্দে ঢালিব তনু অনলশয্যায় ॥ ৩৪
পুষ্পশয্যা করে কত দিতেরে যতনে।
পায়ে ধরি চিতা রচি দেহ এইক্ষণে ॥৩৫
জ্বালিয়া দেহরে অগ্নি দখিণা বাতাসে। ‡
শেষ ভিক্ষা এই মধু যাচি তব পাশে ॥
রতি বিনা ক্ষণমাত্র নাহি বাঁচে স্মর।
জানিয়া কেমনে তুমি এমন কঠোর ॥৩৬
বিলম্ব না সহে আর যাব পতি পাশে।
শেষ কার্য্য শেষ করে পূর্ণ কর আশে ॥*
পরে একাঞ্জলি জল দিও রে উদ্দেশে।
দুজনে করিব পান একাসনে বসে ॥৩৭
চূতকলি পিণ্ড দিও সখাকে তোমার।
রসাল মঞ্জরী † সে যে বড় প্রিয় তার ॥৩৮
এবে জনমের তরে হলাম বিদায়।
এত বলি অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে যায় ॥*
হেনকালে দৈববাণী হইল আকাশে।
জুড়াল রতির প্রাণ অমিয়-বরষে ॥
শুষ্কতল হ্রদে যথা শফরীর দল।
ছটফট করে প্রাণে আতপে দুর্ব্বল ॥
কিন্তু যাই বর্ষাগমে পড়ে বৃষ্টিজল।
অমনি আশায় পুন প্রাণে পায় বল ॥
দৈববাণী কহে "রতি শুন এইক্ষণ।
মিছামিছি অকারণে না ত্যজ জীবন ॥
অবধান কর যেই কহে দেবগণ।
পতি সনে শীঘ্র তব হইবে মিলন ॥
যে কারণে এই দশা পাইলেন পতি।
বলি তবে শুন, সতি, সে সব ভারতী ॥৪০
জান ত পতির তব যেই ব্যবহার।
পাত্রাপাত্র কালাকাল না ছিল বিচার ॥
এক দিন চপলতা করি ফুলশর।
হানিলেন ফুলশর বিধাতা উপর ॥
অনর্থ করিল কাম মর্য্যাদা ভুলিল।
ক্রোধে প্রজাপতি তাই তারে শাপ দিল ॥
সে শাপের ফলে এই দুর্দ্দশা তাহার।
এড়ায় বিধির বাণী হেন সাধ্য কার ॥ ৪১
কিন্তু কাম বিনা সৃষ্টি কিরূপেতে রবে?
ধর্ম্ম অনুরোধে † বিধি কহিলেন তবে ॥
"পার্ব্বতীর তপে তুষ্ট হয়ে ত্রিলোচন।
করিবেন পার্ব্বতীকে বিবাহ যখন ॥
কামের কামনা করি কামারি তখন।
কামদেবে পুনর্ব্বার দিবেন জীবন ॥
অদ্ভুত এ সব কথা লাগিছে তোমারে।
পরমেশ ইচ্ছাবশে কি না হৈতে পারে?
তুষ্ট প্রতি রুষ্ট যদি সদা-তুষ্ট জন।
রুষ্ট নন—ইষ্ট তাঁর লোকনিয়মন ॥
যেই দেয় অভিশাপ শান্তি সেই করে।
বজ্রানল বারিধারা মেঘের ভিতরে ॥ ৪২-৪৩
অতএব দেহত্যাগ ক'রো না যুবতি।
প্রিয় সমাগম তব হবে শীঘ্রগতি ॥
নিদাঘের তাপে তনু ক্ষীণ তটিনীর।
প্রাবৃটেতে পুন সেই হয় পূর্ণনীর ॥
তাই সতি, আপনাকে রাখহ জীবিত।
পতিসনে কিছু দিনে হবে ত মিলিত ॥৪৪

আকাশ-ভারতী শুনিয়া রতি।
কিঞ্চিৎ হইল সুস্থির মতি ॥
বলে কি এমন, হবে রে আর।
পাব কি হারাণ নিধি আমার ॥
আকাশ-ভারতি, যা কর তুমি।
তুমিই আমার জীবন ভূমি ॥

বসন্ত তখন শুনি বিবরণ।
হৃদয়ে পাইল বল।
আশ্বাসিয়া ধীরে বুঝা'ল সখীরে
মুছা'ল নয়ন জল।
মধুর † বচন, শুনিয়া তখন, বাঁধি নিজ মন রতি।

† (১) রসযুক্ত মঞ্জরী। (২) আম্রমঞ্জরী।
‡ বসন্তের মলয়পবন।

† ধর্ম্ম বা ধর্ম্মদেবের অনুরোধে।
† (১) বসন্তের। (২) সুন্দ্র (বিশ)

ক্রন্দন ত্যজিল, প্রবোধ মানিল, গৃহেতে ফিরিল সতী ॥৪৫
শোকে কৃশা রতি সদা ভাবে পতি।
কবে বা আসিবে হায়!
দিনে অনুজ্জ্বলা যথা শশিকলা
বিষাদে লুণ্ঠিতকায় ‡ ॥৪৭

‡ রতি স্বগৃহে এবং শশিকলা গগনতলে।

ঈশোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তির পর)

[অধ্যাপক শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী, এম্, এ]

লীলায় সে লীলাময় ধরি কত রূপ
মায়ার সংসার সৃজি বেরিয়া তোমায়।—
প্রবৃত্তির ঢালু পথে অবিদ্যার কূপ
নিবৃত্তির উর্দ্ধমার্গ মুক্তি পানে ধায়॥ ৭
না শোভে কামনা তবে নশ্বর জগতে
ধন-জন-পুত্র-কন্যা-যশ-আয়ু তরে।
কর্ম্ম ক্ষেত্রে কর্ম্ম কর অনাসক্ত চিতে
ফলাফল ভক্তিভরে সঁপিয়া ঈশ্বরে॥ ৮

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ
শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম
লিপ্যতে নরে॥ ২॥

জ্ঞানযোগে যদি তুমি নহ অধিকারী
চিত্তশুদ্ধি কর কর্ম্ম করি অবিরাম।
শতবর্ষ আয়ু লয়ে পূজা কর তাঁরি
পাবে জ্ঞান—নাহি রবে বন্ধনের নাম॥ ১
কর্ম্মে ব্রহ্মজ্ঞান করি কর অঙ্গীকার
কর্ম্মশূন্য কেহ কভু না রহে সংসারে।
দোষযুক্ত কর্ম্মে করি যত্নে পরিহার
শুদ্ধ কর্ম্ম-ব্রহ্মে পূজ' পূর্ণ উপচারে॥ ২॥

† শ্লোকের 'তেন ত্যক্তেন' শব্দের অর্থ (১) 'তেন ঈশ্বরেণ দত্তেন' অথবা (২) "তস্মাৎ ত্যাগেন অর্থাৎ অনাসক্ত্যা"

অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন
তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে
চাত্মহনো জনাঃ॥ ৩॥

জ্ঞান-নেত্রহীন যারা—নাহি চাহে জ্ঞানে—
অন্ধ, অবিদ্বান্, মূঢ়,—আত্মঘাতী তারা।
যেমন সংস্কার তারা দেহ-অবসানে
লভিয়া অসুরযোনি দুঃখে হয় সারা॥ ১
দেব মাত্রে নহে দেব—অসুর অসুর
বিরত পরম জ্ঞানে ভোগে রত যারা।
বিষয়ে মজিয়া ভাবে সংসারে মধুর—
তাদেরই 'অসুর' নাম আত্মহন্তা তারা॥ ২
অতএব আত্মজ্ঞানে না হও বিমুখ
যথা শক্তি জ্ঞানপথে হও অগ্রসর।
যতটুকু পার আগে চল ততটুক
সকলি তোমার পরে করিছে নির্ভর॥ ৩

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥৪॥

ছুটো-ছুটি করে মন জগৎ জুড়িয়া
আত্মার নাগাল তবু কোথা নাহি পায়।—

ক্রন্দন ত্যজিল, প্রবোধ মানিল, গৃহেতে ফিরিল
সতী ॥৪৫

শোকে কৃশা রতি সদা ভাবে পতি।
কবে বা আসিবে হায়!

দিনে অনুজ্জ্বলা যথা শশিকলা
বিষাদে লুণ্ঠিতকায় ‡ ॥৪৭

‡ রতি স্বগৃহে এবং শশিকলা গগনতলে।

ঈশোপনিষৎ

(পূর্ব্বানুবৃত্তির পর)

[অধ্যাপক শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী, এম্, এ]

লীলায় সে লীলাময় ধরি কত রূপ
মায়ার সংসার সৃজি ঘেরিয়া তোমায়।—
প্রবৃত্তির ঢালু পথে অবিদ্যার কূপ
নিবৃত্তির ঊর্দ্ধমার্গ মুক্তি পানে ধায় ॥ ৭
না শোভে কামনা তবে নশ্বর জগতে
ধন-জন-পুত্র-কন্যা-যশ-আয়ু তরে।
কর্ম্ম ক্ষেত্রে কর্ম্ম কর অনাসক্ত চিতে
ফলাফল ভক্তিভরে সঁপিয়া ঈশ্বরে ॥ ৮

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ
শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম
লিপ্যতে নরে ॥ ২ ॥

জ্ঞানযোগে যদি তুমি নহ অধিকারী
চিত্তশুদ্ধি কর কর্ম্ম করি অবিরাম।
শতবর্ষ আয়ু লয়ে পূজা কর তাঁরি
পাবে জ্ঞান—নাহি রবে বন্ধনের নাম ॥ ১
কর্ম্মে ব্রহ্মজ্ঞান করি কর অঙ্গীকার
কর্ম্মশূন্য কেহ কভু না রহে সংসারে।
দোষযুক্ত কর্ম্মে করি যত্নে পরিহার
শুদ্ধ কর্ম্ম-ব্রহ্মে পূজ' পূর্ণ উপচারে ॥ ২ ॥

---

† শ্লোকের 'তেন ত্যক্তেন' শব্দের অর্থ (১) 'তেন ঈশ্বরেণ দত্তেন' অথবা (২) "তস্মাৎ ত্যাগেন অর্থাৎ অনাসক্ত্যা"

অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন
তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে
চাত্মহনো জনাঃ ॥ ৩ ॥

জ্ঞান-নেত্রহীন যারা—নাহি চাহে জ্ঞানে—
অন্ধ, অবিদ্বান্, মূঢ়,—আত্মঘাতী তারা।
যেমন সংস্কার তারা দেহ-অবসানে
লভিয়া অসুরযোনি দুঃখে হয় সারা ॥ ১
দেব মাত্রে নহে দেব—অসুর অসুর
বিরক্ত পরম জ্ঞানে ভোগে রত যারা।
বিষয়ে মজিয়া ভাবে সংসারে মধুর—
তাদেরই 'অসুর' নাম, আত্মহন্তা তারা ॥ ২
অতএব আত্মজ্ঞানে না হও বিমুখ
যথা শক্তি জ্ঞানপথে হও অগ্রসর।
যতটুকু পার আগে চল ততটুক
সকলি তোমার পরে করিছে নির্ভর ॥ ৩

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥৪॥

ছুটো-ছুটি করে মন জগৎ জুড়িয়া
আত্মার নাগাল তবু কোথা নাহি পায়।—

কূটস্থ অচল আত্মা মনে ফাঁকি দিয়া
কোথায় রহেছে—তারে দেখা নাহি যায় ॥ ১
বাহিরে যেমন এই বিশাল জগৎ
অন্তরেও অবিকল আছে সেই মত।
প্রাণ-শক্তি জগতের দ্বিধা পরিণত
সপ্তভুবন দ্বিধা—দ্বিধা সৃষ্টি-স্রোত ॥ ২ ॥
তথাপি বাহিরে চক্ষু মোদের সতত
ভিতরে না ফিরে আঁখি ক্ষণেকের তরে।
বিষয়লোলুপ অন্ধ ইন্দ্রিয়েরা যত
আত্মার সন্ধানে তারা যত্ন নাহি করে ॥ ৩
সকলের উর্দ্ধে যেই রহে সহস্রারে
বিনা যোগে কেহ তাঁরে না ধরিতে পারে।
অন্তরে বাহিরে এই নিখিল সংসারে
তাঁহার শক্তিতে প্রাণ সর্ব্ব কর্ম্ম সারে ॥ ৪
আত্মজ্ঞানী মুক্তি চাহে না চাহে মরিতে
সংসারের মোহগর্ত্তে আত্মঘাতী যথা।
ব্যাকুল জিজ্ঞাসা যাই জাগে তার চিতে—
বেদরূপী ভগবান্ কহে তত্ত্ব-কথা ॥ ৫ ॥

বরের বাবা ও বর।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৩)

"হ্যাঁরে যামিনী! তুই এর ভেতর শ্বশুরবাড়ী থেকে এসে পড়্‌লি! ব্যাপার খানা কি বল্ দেখি?" বলিয়া যামিনীর মাতা একদৃষ্টে যামিনীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। (যামিনীর মাতার নাম জগদম্বা।)

যামিনী। শ্বশুরের বাড়ী কি আর তোম্‌রা রেখেচ যে শ্বশুর বাড়ী থাক্‌ব?

জগ। সে কি রকম কথা হ'লো! আম্‌রা কি তার বাড়ী-ঘর নিয়ে এসেচি, না কাউকে দান-পত্র ক'রে দিয়েচি?

যা। 'বেচে এনে[illegible]' একথাটা নেহাৎ মনে করা যায় না, একথা বল্‌তে পার কই? তোম্‌রা না বেচে থাক, তাঁকে বেচ্‌তে বাধ্য করেচ। একই কথা হ'লো।

জগ। তোর এ হেঁয়ালীর কথা যে আমি মোটেই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না! খুলেই বল্‌না বাপু?

যা। এ মোটা কথাটা যে তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, তা ত আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না মা! বড় মেয়ে বিয়ে দেবার সময় সে বেচারী ঘর-বাড়ী বাঁধা দিয়ে একটী বরের বাবার টাকার টান মিটিয়েছিল; তার কিনেরা কর্‌বার সুবিধে কত্তে না কত্তেই আবার তোমাদের টান পড়েচে! বেচারী আর করে কি? তোমাদের টানে বাড়ী খানা এবার সাফ্ কওলা ক'রে দিতে হয়েচে। যার কাছে বাড়ী বাঁধা ছিল, তাকেই বিক্রী করেচেন। বিয়ের পর পনের দিনের ভেতর বাড়ী ছেড়ে দেবার কথা। ভাড়া দিয়ে বাড়ীতে থাক্‌তে চেয়েছিলেন, কিন্তু যিনি কিনেচেন, তিনি রাজী হ'লেন না। তিন চার দিনের ভেতর তাঁকে বাড়ী ছাড়্‌তেই হবে। এখন্ তাঁরা কোথা যান তার ঠিক নেই, আমি আর থাক্‌বো কোথা?

জগ। মিন্‌সের কেমন আক্কেলটা একবার দেখ! নতুন জামাই যাবে, একথাটা ত তার জানা ছিল; পনের দিনের জায়গায় আর সাতটা দিন বাড়িয়ে নিলেই ত হ'তো। সে যখন পনের দিন সময় দিতে রাজী হ'য়েছিল, আর সাতটা দিন সে অবিশ্যি দিত। জামাইয়ের আদর কর্‌বার ইচ্ছে যদি তার থাক্‌ত, তবে সে মিন্‌সে কি আর তা কত্তে পাত্ত না, অবিশ্যি পাত্ত। যে কোন রকমে মেয়েটা পার ক'রে রেহাই নিয়েচে বইত নয়! জামাই নিয়ে আর এখন তার দরকার কি বল?

যা। সে কি রকম কথা হ'ল মা! আমরা

যখন গেলুম, তখন বেলা ১২টা বেজে গ্যাচে। সদরে ঢুকেই দেখি,—স্যাক্‌রা, মুদী, গয়লা, সন্দেশওয়ালা বেচারীকে ঘিরে ব'সে রয়েচে, 'টাকা ফেলে রাখ্‌তে পার্‌বনা' ব'লে সব্বাই একটানা সুরে কথা কইচে! ভদ্রলোক কাকে কি জবাব দেবেন, খুজে পাচ্ছেন না। আমাদের দে'খে ত তাঁর চোক্ ছল্ ছল্ কত্তে লাগ্‌লো! এদের ফে'লে উঠেও আস্‌তে পাচ্ছেন না,—না এসেও পাচ্ছেন না! পাওনাদারদের ভেতর একটী লোক বল্লে—"এই না আপনার জামাই? দেখ্‌তে ত দিব্বি সোণার কাত্তিকটীর মতন; শু'নেচি, তিন্‌টে পাশ দিয়েচেন; লেখা পড়া পেটে ঢুকে কি দয়া-মায়াটা একদম বের করে দিয়েচে নাকি?" কথা শু'নে তিনি বল্লেন,—'এর আর অপরাধ কি বাবা! বাপ্ মার কথার ওপর কথা বল্‌বার যো আছে কি?' আরো ঢের ঢের কথা হয়েচে, তা শু'নে সেখানে কোন লোক টিক্‌তে পারে না।

জগ। তা এসেছিস্ বেশ করেছিস, আর সেখানে যাবার দর্‌কার নেই। বউ সেখানে রয়েছে, থাক্ গে; তোকে আবার বিয়ে দিয়ে এর্ চাইতে খাসা বউ আন্‌ব।

যা।—বেশ্ ব্যবস্থাটা কল্লে ত মা! সে বেচারাত যথা সর্ব্বস্ব—এমন কি, পৈত্রিক ভদ্রাসন টুকু পর্য্যন্ত খুয়িয়ে মেয়েটিকে তোমাদের দিয়েচে; এখন তাঁর মেয়েটিকে আর তোম্‌রা আন্‌বে না, আমাকে আবার বিয়ে দিয়ে আর একটি খাসা বউ আন্‌বে! এই খাসা বউয়ের সঙ্গে আর একটা ভদ্রলোককে নাস্তানাবুদ ক'রে আরো কিছু টাকাও আন্‌বে ত? বলি, যাকে ঘরে আন্‌তে চাও না, তার অপরাধটা কি বল্‌তে পার? তা ছাড়া, তার বাপের অপরাধটাই বা কি? তোম্‌রা যখন তোমাদের দাবি-দাওয়া কড়ায় গণ্ডায় ষোলআনা বুঝে নিয়েছিলে, তখন তার ঘরের খবরটা একবার নিয়েছিলে কি মা? তার সঙ্গে ত চিরকালের জন্য একটা সম্পর্ক পাতা'তে গিয়েছিলে। যার সঙ্গে এমনতর সম্পর্ক পাতান হয়, তার পরিণামটা একবার ভাবা উচিত নয় কি মা?

জগ।—অত হিসেব কিতেব ক'রে ছেলে বিয়ে দিতে ত কখনো দেখিনি বাবা! সংসার শুদ্ধ লোকেইত নিজের পাওনা গণ্ডা বুঝে নেয়। মেয়ের বিয়ের পর সে কি খাবে, কোথায় থাক্‌বে, এ সকল খবর আর কে ক'রে থাকে?

যা। আচ্ছা মা, বড়দিদির যখন বিয়ে হয়েছিল, তখন তোম্‌রা কত টাকা দিয়েছিলে? সেত আর বেশী দিনের কথা নয়।

জগ।—নগদ কিছুই দি নাই। গহনা শাদা সিদে মত দিয়েছিলুম,—যৌতুকও যেমন সাধ্যি তেমনি দিয়েছি। তারা ত আর টাকা কড়ি চায়নি যে, সেধে সেধে নিয়ে দিয়ে আস্‌বো? আর তখন টাকা দেওয়া চলন ছিল না।

যা।—বেশ কথা, তোমরা আমার বিয়েতে চলনের দোহাই দিয়ে যেরূপ দাবি করেছিলে, বড় দিদির শ্বশুর যদি তেমন তর কত্তেন, তাহ'লে তোমরা কি কত্তে মা? তেমন তর দিতে হ'লে আজ আমাদের বাড়ী ঘর থাক্‌তো কি?

জগ।—তখন তেমনতর নেওয়া দেওয়ার চলন ছিল না।

যা।—ছিল না, তাত জানি; যদি থাক্‌তো তা হলে ত আমাদের ও তেম্‌নি দশা হ'ত? বলি, তখন ছিল না, আজ হচ্চে কেন? এ-ত আর শাস্ত্রের কথা নয়,—আইন কানুন ও তেমন তর কিছু একটা হয়নি, ইচ্ছে ক'রেই ত এটা করা হচ্চে? এটা অত্যাচার নয় কি?

জগ।—তাত বটে, কিন্তু দশ জনেইত তা কর্‌চে, বাবা!

যা।—দশজনে ডাকাতি করে ব'লে আমরাও তাই কর্‌বো, এমন কোন কথা আছে কি? মা, তুমি আমার পরমগুরু, আমি তোমার পা ছুঁইয়ে

বল্‌চি,—যে ভাবেই পারি, আমি সে ভদ্রলোকের পৈত্রিক ভদ্রাসন উদ্ধার ক'রে দেব। তুমি আশীর্ব্বাদ কর,—আমার ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়।

(৪)

"বলি গিন্নি কোথা গেলে। শুন্‌তে পাচ্ছ কি তোমার মেঝো ছেলের কথা? এরা যে দেখ্‌চি এখন ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে যাচ্ছে।" বলিয়া মহেশ্বর সদর হইতে অন্দরে প্রবেশ করিলেন। জগদম্বা ঘরে আহ্নিক করিতেছিলেন, মহেশ্বর হুকাটী টানিতে টানিতে সেখানে যাইয়া এক পাশে বসিলেন। জগদম্বা তাড়াতাড়ি পূজা শেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপার খানা কি বল দেখি?

মহে। ব্যাপার খানা আর কি মাথা মুণ্ডু,—তোমার মেঝো ছেলে বিয়ে কর্‌বেনা ব'লে জিদ্দী হ'য়ে বসেছে।

জগ। কি বলেচে খুলেই বলনা শুনি।

মহে। তাকে বিয়ের কথা বল্‌তে, গোড়ায় বল্লে,—চাক্‌রী না হ'লে বিয়ে কর্‌ব না। তার পর বল্লে, টাকা নিয়ে কিছুতেই বিয়ে কর্‌বে না। কেন কর্‌বেনা বল্‌তে বল্লে,—'বিয়ে ক'রে বড়দার শ্বশুরের মতন আর একজন বৈষ্ণসন্তানের ভিটে মাটি চাটী কর্‌ব ত?'

জগ। তা বল্‌বে বই কি? তোমার বড় ছেলে যামিনী শ্বশুরবাড়ী থেকে যে ভাবে ফিরে এসেছে, আর সেখানকার হাল-হকিয়ৎ যা বল্লে, তা শুনে যে আমারি বল্‌তে ইচ্ছে হয়,—টাকা নিয়ে বিয়ে দিতে হয়ত ছেলেদের বিয়ের দরকার নেই। দু'টী মেয়ে বিয়ে দিয়ে মাগী-মিন্‌সে একবারে রাস্তায় দাঁড়িয়েছে গা! জামাইটী বাড়ী গেচে, কোথা আহ্লাদ-আমোদ কর্‌বে, না জামাইকে একটু ভাল খাবার দিতে না পেরে শাউড়ী মাগী এক হাতে চোখের জল মুচ্‌চে, আর যামিনীকে দুঃখের কথা বল্‌চে! যামিনী ত সে সব দে'খে শু'নে সইতে না পেরে চলে এসেছে! বাছা আমার লেখাপড়া শিখেচে, পরের দুঃখু দেখে পরাণে লাগে,—আর ছাই পরই বা বলি কেন,—শ্বশুর-শাশুড়ী বাপ-মার তুল্যি, তাদের দুঃখু দে'খে যার মন না গলে, সেত মনিষ্যির মধ্যেই নয়।

মহে।—বলি সে দোষ ত আমার নয়, সমাজে যা চ'লে আস্‌চে, আমি ও তাই কর্‌চি, তার বাড়া কিছু কর্‌চি ব'লে বল্‌তে পার কি?

জগ। উচ্ছন্ন যাক্ তোমার হতভাগা সমাজ। তুমি যদি ছেলের বিয়ের টাকা না নেও, সমাজ কি তোমায় ফাঁসী দিতে আসে? কই, রাম-নগরের রামকান্তসেন যে তার ছেলের বিয়ের টাকা নেন নাই, তাকে ত কেউ ফাঁসী দিতে পারে না! সে ছেলেও ত পাঁচটা পাস্ দিয়ে হাকিম হয়েচে। টাকা নিলে ত পাঁচ হাজার টাকা অনায়াসে নিতে পাত্তেন। চাদ্দিকের লোকেত রামকান্ত বাবুকে ধন্নি ধন্নি কর্‌চে। টাকা নেওয়া চুলোয় যাক্ খুঁজে পেতে যেন একটি গরীবের মেয়ে এনেচেন! শুনেচি, মেয়েটী নাকি খুব ভাল, লেখাপড়ায় কাজেকর্ম্মে খুব চতুর। গেরস্তের ঘরে ত এমনটীই চাই।

মহে। সংসার শুদ্ধ লোকের ঘরে যে আজ কাল বউ আস্‌চে, তারা কি আর বউ নয়?

জগ। বউ নয় ব'লে কি আর বল্‌চি ছাই? বউ ত সবাই; এর ভেতরেই কোন বউ ঘরে এসে সংসার গোছালো ক'রে তোলে,—সংসারে লক্ষ্মী-শ্রী হয়, আবার কোন বউ ঘরে ঢুকে সংসার ছারখার করে দেয়। এতদিন ছেলের বিয়ে দিতে লোকে, ক'নেটী সুলক্ষণা কিনা, ঘরকন্নার কাজকর্ম্ম জানে কিনা, এগুলোই খুঁজত; এখন খোঁজে,—ক'নের রূপ আর ক'নের বাবার ট্যাক্। টাকার কাঁড়ি পেলে রূপের দিকেও ততটা চাইতে দেখা যায় না! বলি, তুমি যখন যামিনীর সম্বন্ধ ঠিক কল্লে, তখন ক'নেটী কেমন, তার কোন খোঁজ খবর নিয়েছিলে

কি? কেবল টাকা টাকা ক'রেইত যেতে ছিলে। আমি ত লুকিয়ে বাঁড়ুয্যে বাড়ীর শ্যামা ঝিকে পাঠিয়ে জানলুম যে, ক'নেটী গেরস্ত ঘরের যুগ্গী।

মহে। তাইত! তুমিও যে দেখ্‌চি আবার উল্‌টো গীত ধল্লে! তবে যত দোষ কি আমারি? টাকা নেবার কথা কি আর তুমি বলনি?

জগ। বলেচি তোমার ভয়ে; এখনো যা বলি, তাও তোমার ভয়ে। নইলে একটা লোকের ভিটেমাটী চাটী ক'রে টাকার কাঁড়ি এনে মহাজনী কত্তে আমার ইচ্ছে কখনো ছিল না, এখনো নেই। আমি যদি গোড়ায় জানতুম যে, বড়মেয়ে বিয়ে দিতে বেচারীর বাড়ীখানা বাঁধা প'ড়েচে, এখনো খোলসা হয় নি, তাহ'লে যামিনী আজন্ম আইবুড় থাকলেও একাজ কত্তুম না। এখন যামিনী শ্বশুরবাড়ী গিয়ে, আমোদ আহ্লাদ করা দূরে থাক্, দাঁড়াবার একটু স্থানও পায় না! কত বড় দুঃখের কথা বল দেখি? আমাদের কিসের অভাব যে, অমন ক'রে একটা লোককে নাস্তানাবুদ ক'রে বড় মানুষী না দেখা'লে আর চল্‌তো না?

মহে। বলি, এ'টাকা, আমি যখন মর্‌বো, তখন কি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব, না, তোমাদেরি থাক্‌বে?

জগ। তুমিই যে আগে মর্‌বে, আর আমরা থাক্‌ব, এমনতর কোন আইন আছে কি? আর তা হলেই বা কি? বাছারা আমার মানুষ হ'য়ে উঠেচে, আমার কিসের ভাবনা? পরের ধনে পোদ্দারী না ক'রে আমার বাছারা যা আন্‌তে পার্‌বে, অদেষ্টে থাকলে, তাতেই আমার সোণার সংসার হবে। পরের পয়সা নিয়ে কে কখন বড়মানুষ, অথবা সুখী হয়েচে বল? তার ওপর এ ভাবে পয়সা নেওয়া ত একতর ডাকাতি!

মহে। আমার ঝকমারি হয়েচে; আর আমি ছেলেদের বিয়ের কথা কখনো তুল্‌ব না; তুমি আছ, আর তোমার ছেলেরা আছে, যা প্রাণ চায় তাই কর। আমার কি? আমি যা পেন্‌সন্ পাই তাতে আমার চ'লে যাবে। তোমাদের জন্যেই ত আমার চিন্তা।

জগ। আজ থেকে তোমার সে চিন্তার দুয়ারে কপাট দেও। ছেলেরা এখন লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়েচে, দশজন ভদ্রলোকের কাছে যাওয়া আসা করে। কসাই ক'রে কাজ কর্‌বে তুমি, আর তা নিয়ে লোকের কাছে ওদের ঘাড় হেঁট ক'রে চল্‌তে হবে! আমি তা দেখ্‌তে পার্‌ব না। ওদের যা কত্তে হয় আমিই কর্‌ব, তুমি চুপ করে থাক্‌তে পার্‌বে ত?

মহে। তা—তা, বলি পার্‌ব বই কি, যদি নেহাৎ না পারি, বাড়ী থেকে চ'লে যাব, তোমাদের যা কত্তে হয় ক'রো।

জগ। বাড়ী থেকে চ'লে যাবার দর্‌কার? তুমি কোন কথায় না থাক্‌লেই হল। যদি নেহাৎ চুপ্ ক'রে থাক্‌তে না পার, চলে যেও, সেও বরং ভাল, তবু টাকা টাকা ক'রে ছেলে বেচে কশাইগিরি কত্তে এসোনা।

(৫)

পৌষ মাস, সূর্য্যাস্তের অল্পক্ষণ বাকী আছে। জগদম্বা গৃহের বারান্দায় এক পার্শ্বে বসিয়া আলুলায়িত কেশরাশিতে অঙ্গুলী সঞ্চালন, আর ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। শ্বশুর বাড়ী হইতে প্রত্যাগমনের পর কার্য্যস্থল কলিকাতায় যাইয়া যামিনী মাসে মাসে বাড়ীতে খরচের টাকা পাঠান বটে, কিন্তু পিতামাতাকে চিঠিপত্র লিখেন না। জগদম্বা ইহাই চিন্তা করিতে ছিলেন। এমন সময় নলিনী সহসা উপস্থিত হইয়া মাকে প্রণাম করিল। জগদম্বা মুখ তুলিয়া দেখিলেন নলিনীর মুখ প্রফুল্ল, কোন শুভ সংবাদ লইয়া যেন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। জগদম্বা তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া বলিলেন,—"হঠাৎ বাড়ী এলি যে?"

নলি। বড় দিনে বার দিন কলেজ ছুটি আছে, তাই এসেছি।

জগ। যামিনীর খবর কি? সেত মাসে মাসে খরচার টাকা পাঠাচ্ছে বটে, কিন্তু আজ ছ'মাস একখানা চিঠি লেখে না! সে ভাল আছে ত?

ন। ভাল আছেন, তিনি ডেপুটী হ'য়ে বর্দ্ধমানে গিয়েচেন, তাঁর মাইনে হয়েচে দু'শ' টাকা।

জগ। সে কদ্দিনের কথা? একথাটা ত তোরা কেহই জানাস্‌নি? আমার কিন্তু বিশ্বেস হচ্চে না। এত বড় চাক্‌রী সই-সুপারিশ ছাড়া হয় না,—আমাদের এমন কে আছে বাবা, যে এতটা কর্‌বে।

ন। মা! এটাতে কোন বড় লোকের সই সুপারিশের দরকার হয়নি, তোমার সেই রাস্তায় দাঁড়ানো বেয়াই মশায় করেচেন! তিনি বাট্‌ টাকা মাইনে পা'ন বটে, কিন্তু সে আপীশটা লাট সাহেবের আপীশ। একজন সেক্রেটারী দাদার শ্বশুরকে খুব স্নেহ করেন। আর তিনি গরীব হ'লেও তাঁর চরিত্র খুব ভাল। তিনি নিজের দুর্দ্দশা জানিয়ে সেক্রেটারী সাহেবকে বড়দাদার একটা চাকরীর কথা ব'লে ধ'রে পড়েন, তাতেই তার এ চাকরী হয়েচে।

জগ। সেত এ খবরটা জানায় নি?

ন। জানাবে কি মা! তোম্‌রা ত টাকাই চিনেচ, টাকাই চাও—তাই পাচ্ছ। এসকল খবরে আর তোমাদের দরকার কি মা? আবার আমাকে বেচে টাকা নেবার কথা সেদিন বাবা আমাকেই বল্লেন! আমার অবাধ্যতা প্রকাশ পেলেও, মা, আমি তাঁকে সাফ্‌ জবাব না দিয়ে পাল্লুম না।

জগ। তা সে সব কথা আমি শুনেচি, তার জবাবও আমি দিয়েচি। এখন তোর মনের ভাব্‌টা কি, আমার একটু জান্‌তে সাধ হ'য়েচে।

ন। আমি ত বাবাকে লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে সব কথাই বলেচি। তিনি কি তোমায় বলেন নি?

জগ। তবে কি তোর বিয়ে কত্তে ইচ্ছে নেই?—অথবা পণ-যৌতুক না নিতে হলে বিয়ে করবি?

ন। আমার কোন বন্ধু আমায় একখানা চিঠি লিখেচে। চিঠিখানা ইংরেজীতে লেখা, তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না, তোমার হাত দিয়ে বড় দাদাকে সেখানা পাটিয়ে দেব, এই আমার ইচ্ছে।

জগ। তুইত চিঠি পড়েচিস্‌? কি লিখেচে বল্‌না শুনি।

ন। সেই যে পূজোর ছুটী শেষ হয় হয় সময় একটী ছেলে আমাদের বাড়ী বেড়াতে এসেছিল, মনে পড়ে কি? সে ছেলেটীই এই চিঠি লিখেচে। ক'নেটী নাকি বেশ গুণবতী, কিন্তু ক'নের বাপ খুব গরীব, পয়সা নেই ব'লে মেয়ে বিয়ে দিতে পার্‌চেন না। জমীদারের সরকারে সামান্য মাইনায় চাক্‌রী করেন, যা পা'ন তাতে সংসার খরচ কায়ক্লেশে চলে।

জগ। মেয়েটী দেখ্‌তে শুন্‌তে কেমন?

ন। সেকথা চিটিতে কিছু লেখা নেই। তা বাইরের সুন্দরের চেয়ে ভেতর-সুন্দর কি ভাল নয় মা? আমার বিশ্বাস, গরীবের ঘরের মেয়ে-গুলিই ভাল হয়। গরীবের ঘরে আদর-আপ্যায়নও বেশী। গরীবের ঘরের আদরের শাক্‌ ভাত, বড় লোকের ঘরের মামুলী আদরের পোলাও-কালিয়ার চেয়ে ও সুখের। রূপের চাইতে গুণেরই ত আদর করা উচিত। তুমি কি বল মা?

জগ। কথাগুলি ত সবই ঠিক; তবে যে তুই বল্‌চিস্‌, বড্ড গরীব?

ন। হ'লই বা গরীব, তাতে ক্ষতিটা কি? বড় দাদার শ্বশুরও গরীব, কিন্তু তিনি যা করেচেন, কয়জন বড়লোককে তেমনটী কত্তে শুনেচ? যাক্‌ সে কথা। বিপন্ন গরীবকে দায়মুক্ত করাটা কি মানুষের কর্ত্তব্য নয়, মা? পরের বিপদ যদি আমি না দেখি, আমার বিপদ পরে দেখ্‌বে, এমনতর আশা ত কত্তে পারি না! আজকাল দেখা যাচ্ছে, ভদ্রঘরে যার মেয়ে আছে, তার চেয়ে আর বিপদ

কারু নেই। চাদ্দিক থেকে যা শোনা যাচ্ছে, তাতে মনে হয়, মেয়ের দায়েই ভদ্রসমাজে গরীবের সংখ্যা দিন দিন বে'ড়ে যাচ্ছে।

জগ। যাদের ছেলে আছে, তারা বড়লোক হচ্চে।

ন। মিছে কথা মা। কোথা দেখেচ মা, যে ছেলের বিয়ের টাকা নিয়ে বড়লোক হয়েচে? শুধু "ছেলে-বেচা" বদ্‌নাম ছাড়া আর তাদের কোন লাভই হচ্চে না। তোমরা ঘরে থাক, চাদ্দিকের খবর ত রাখনা, তাই বলচ; আমরা চাদ্দিকের খবর পাই, তাই বলচি,—যাদের ছেলে আছে, তাদের টাকা লওয়া একটা রোগ জন্মেচে, টাকা নিতেই হবে। ছেলেরা এটাকে জঘন্য কাজ ব'লেই মনে করে, কিন্তু বে-আদবী প্রকাশ পাবে ব'লে, বাপ-মার মুখের উপর কোন কথা না ব'লে তাঁদের মতেই মত দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সমাজের অবস্থা যেরূপ দাঁড়িয়েচে, তাতে আর ও পরদাটুকু থাক্‌চে না।

জগ। কেন, এখনকার ছেলেরা লেখা-পড়া শিখে বাপ-মার অমতে বিয়ে কর্‌বে ব'লে ধর্ম্মঘট করেচে নাকি?

ন। কর্‌বে বই কি মা! তোম্‌রা ছেলের বিয়ের যে টাকার দাবি কর, তার অজুহাৎ হচ্চে—ছেলেকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেচ—তাকে লেখা-পড়া শিখিয়েচ, তার খরচাটা ক'নের বাবার দিতে হবে, এইত?

জগ। হাঁ, তাইত।

ন। বলি, তোমাদের ছেলে, তোম্‌রা মানুষ করেচ, সেটা কত্তে তোমরা বাধ্য। তোমাদের ছেলে মানুষ হ'য়ে টাকা উপার্জ্জন কর্‌বে, তোমরা সুখ ভোগ কর্‌বে; যার মেয়েটা আন্‌বে, তাকে তার বখ্‌রা দেবে কি?

জ। তা কি কখনো কেউ দিয়ে থাকে?

ন। তবে তার কাছ থেকে সে দাবিটা করে টাকা নেওয়া কেন মা? শুধু কি তাই, আবার সোণার ওজন ধরে খতেন ক'রে গয়নার ফর্দ্দ দিয়ে টাকা আদায় করা! এগুলি কি ভদ্রভাবে ডাকাতি করা নয়? তোমার ঘরের বউ, গহনা দিয়ে সাজিয়ে নিতে সাধ হয়, তুমি তা কর্‌বে, বিয়ের দিন থেকে সে তোমারি হল, তোমার হুকুম ছাড়া তার এক পা নড়্‌বার যো নেই; যে বাপ-মা পেলে' পুষে' মানুষ করেচে, তা'দের কোন অধিকার থাক্‌চে না। তার উপর এতটা চাপ দেওয়া আর ডাকাতি করা সমান কথা নয় কি?

জগ। বেঁচে থাক বাবা। কথাগুলি শুনে প্রাণ ঠাণ্ডা হ'ল। তোম্‌রা যা করে সুখী হও, তাই কর, আমার বল্‌বার কোন কথা নেই।

(৬)

যামিনীর চিঠি।

মা! তোমার ও নলিনীর চিঠি পাইয়াছি। তোমাদের নিকট চিঠি লিখিনা বলিয়া অনুযোগ করিয়াছ। বস্তুতঃ আমি এ অপরাধে অপরাধী। কিন্তু ইহা আমার ইচ্ছাকৃত অপরাধ নহে। তোমাদের নিকট চিঠি লিখিতে হইলেই আমার সুখ দুঃখের কথা লিখিতে হয়; ফলে আমি মানসিক খুবই অসুখী। এই অসুখের কারণ তোমরা—পিতা-মাতা! সামান্য অর্থের লালসায় তোমরা আমার এই অশান্তি জন্মাইয়াছ। আমার বিবাহ যে এক ভদ্রসন্তানের সর্ব্বনাশের মূল, একথা মনে করিয়া আমার অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতেছে। কিন্তু আমি যাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছি, তিনি তাঁহার মনীবের নিকট দয়া ভিক্ষা করিয়া আমাকে ডেপুটী করিয়া দিয়াছেন। ইহা আমার ঘোরতর শাস্তি। শাস্তি হইলেও ইহাই আমার শান্তিলাভের একমাত্র উপায়। টাকা ধার করিয়া শ্বশুরের ভদ্রাসনখানি খোলসা না করিয়া পারিলাম না, তাহা করিয়াছি। পরিশোধ করিবার উপায় তিনিই করিয়া দিয়াছেন।

এখন নলিনী ও কামিনীর জন্য ভাবনা।

প্রার্থনা,—উহাদিগকে আমার ন্যায় বিপন্ন করিও না। বাধ্য হইয়া সন্তান পিতামাতার আজ্ঞা পালন করে, কিন্তু সে আজ্ঞাপালন যদি অশান্তি ভোগ, অথবা অপদস্থ হইবার কারণ হয়, তাহা নিতান্তই মর্ম্মান্তিক। নলিনীর কোন বন্ধু তাহাকে এক দরিদ্রের কন্যা বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছে; নলিনীর মত হইলে তাহাতে তোমরা বাধা দিওনা। পণ-যৌতুকের কথা মুখে না আনিয়া বিবাহ স্থির করিয়া আমাকে জানাইলে যথাসময়ে আমি উপস্থিত হইব। নলিনীর বিবাহ দিয়া যতদিন তোমাদের পূর্ব্বার্জ্জিত কলঙ্ক মোচন করিতে না পারি, ততদিন স্থানান্তরে থাকিয়াই পিতামাতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিব। নলিনীকে স্বতন্ত্র পত্র দিলাম। পরমারাধ্য পিতৃদেবের চরণে আমার অসংখ্য প্রণাম জানাইয়া আমাকে ক্ষমা করিতে বলিবে। ইতি

সেবকাধম,

তোমার অধম সন্তান

যামিনী।

সাহিত্য-পরিষদ্ প্রহেলিকা।

(১)

সাহিত্য-পরিষদের সৃষ্টিতত্ত্ব আমরা জানি, যে উদ্দেশ্যে ইহার গঠন তাহাও জানি, এবং ব্যক্তিগত প্রাধান্যের হস্ত হইতে ইঁহাকে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে যে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বাটী হইতে ইহাকে শ্যামপুকুরের মোড়ে স্থানান্তরিত করা হয়, তাহাও জানি। কেবল আমরাই যে জানি, এরূপ নহে, সহরের যাবতীয় সাহিত্য-সেবীই তাহা জানেন, সুতরাং পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

যে অজুহাতে পরিষদ্ স্থানান্তরিত হইল,—"সাহিত্য-সভা" নামে অপর একটী সমিতি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বাটীতে প্রতিষ্ঠিত হইল, কার্য্যতঃ কিন্তু তাহাই ঠিক রহিল; শ্যামপুকুরের মোড়ে স্থানান্তরিত হইবার পর হইতেই ইহা সম্প্রদায় বিশেষের ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়া উঠিল, ইহা দেখিয়া অনেক সভ্য পরিষদের সহিত সম্পর্কচ্যুত হইলেন। ইহা অন্যূন ১৬।১৭ বৎসরের কথা।

এই সময়ে ঠাকুরবাড়ীর ঠাকুর মহাশয়দিগের [illegible] পরিষদের পারিষদমণ্ডলীর উঠা বসা [illegible] পরিষদের [illegible]দিগের [illegible] কোন কোন পদে মৌরসীস্বত্ব ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা সেই সময়ে 'তথাস্তু' বলিয়া ঠাকুরদের আবদার অথবা সম্মান রক্ষা করিয়া আসিতেন, তাহাও এখন পর্য্যন্ত বিস্মৃত হই নাই। গত কতিপয় বৎসর যাবৎ পরিষদের পারিষদমণ্ডলীর মধ্যে অন্তর্ব্বিপ্লবের স্রোত অপ্রতিহত ভাবে প্রবাহিত হইতেছে; যাঁহার বদান্যতায় পরিষদ-মন্দিরের স্থান প্রাপ্তি,—যাঁহাদের অর্থ সাহায্যে মন্দিরের দেহ ধারণ, তাঁহারা এই অন্তর্ব্বিপ্লবের আভ্যন্তরিক সাম্প্রাদায়িকতার সংবাদ রাখেন না, এসকল সংবাদ জানিবার সুবিধা তাঁহারা পান বলিয়াও মনে হয় না।

কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, এই সকল সাম্প্রাদায়িকতা, এই সকল দলাদলির প্রভাবে পরিষদের প্রকৃত উদ্দেশ্যসাধনপক্ষে ঘোরতর অন্তরায় ঘটিতেছে; পক্ষান্তরে পরিষদের সংগৃহীত অর্থ জনকতক লোকের পরিপোষণে নিয়োজিত হইতেছে! আমরা ক্রমে ক্রমে তাহা সম্যক্রূপে প্রদর্শন করিবার প্রয়াস পাইব।

কলিকাতা ১৬নং সাগরধরের লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় পরিষদের একজন সভ্য। সম্ভবতঃ তিনি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি সংসৃষ্ট একজন কর্ম্মকর্ত্তা। তিনি গত ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে এক-

খানি মুদ্রিত চিঠি পরিষদের সভ্যগণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন। তদুল্লিখিত বিষয়গুলি পাঠ করিলে সত্য সত্যই প্রতীতি হয় যে, বর্ত্তমান পরিষদ জনকতক লোকের ক্রীড়াক্ষেত্র! আমরা নিম্নে তাহার কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা করিব। যতীন্দ্রবাবু একস্থলে লিখিয়াছেন,—

"আমার বোধ হয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়, গত ১৩২১ বঙ্গাব্দের বড় দিনের ছুটীর সময়ে, সাহিত্যসভার এক অধিবেশনে, "আদিশূর" শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহা হইতেই পরিষদে দলাদলির সূত্রপাত হয়। চন্দ মহাশয়ের প্রবন্ধ লেখা হইলে, তিনি এই প্রবন্ধ সাহিত্য পরিষদে পাঠ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, এবং পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি ও ন্যাসরক্ষক, আজীবন সদস্য কুমার শরৎ কুমার রায় চেষ্টা করেন, যাহাতে এই প্রবন্ধ পরিষদে পঠিত হয়। কিন্তু পরিষদের কোনও কর্ম্মাধ্যক্ষ তাঁহার বিশস্ত বন্ধুর (শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর) মান বাঁচাইতে যাইয়া, (কারণ এই প্রবন্ধ পরিষদে পঠিত হইলে তাঁহার বন্ধুর অনেক কীর্ত্তিকাহিনী প্রকাশিত হইয়া পড়িবে), শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়ের সবিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও, উক্ত প্রবন্ধ যেন পরিষদে পঠিত হইতে না পারে, তাহার জন্ত বিশেষ যত্ন করিয়া সফলকাম হইয়াছিলেন।"

চন্দ মহাশয়ের লিখিত "আদিশূর" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু অথবা তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুর যে আপত্তি হইবে, যাঁহারা বসু মহাশয়ের সহিত বিশেষ পরিচিত,—তাঁহার কৃতিত্বের বিষয় যাঁহারা সম্যক্ অবগত আছেন,—তাঁহার প্রকাশিত বিশ্বকোষ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা একথা অস্বীকার করিতে পারেন না।

'আদিশূর' প্রকৃত নাম নহে, ইহা উপাধি মাত্র। আদিশূর বলিয়া যিনি অভিহিত হইতেছেন, ইহার প্রকৃত নাম মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণ সেন ইনি ধন্বন্তরি গোত্রীয় বৈদ্য। বসু মহাশয় তাঁহার প্রকাশিত বিশ্বকোষে এই মহাপুরুষের জাত্যন্তর ঘটাইয়া "বর্ম্মণ" উপাধির বিষয়ীভূত করিয়া ফেলিয়াছেন! কাজেই রমাপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধ পরিষদে পঠিত হইলে পরিষদ-পত্রিকায় অবশ্যই প্রকাশিত হইবে, তাহা হইলে বসু মহাশয়ের সমাজে মুখ দেখাইবার অনেকটা অন্তরায় ঘটে না কি? ফলে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বাহাদুরী যথেষ্ট আছে বলিতে হইবে। তিনি 'কাঁটাপুকুরকে' 'প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবে' পরিণত করিয়া তাহাতে হাবুডুবু খাইতেছেন! শুধু তাহাই নহে, এই মহার্ণব হইতে 'বিশ্বকোষলেন' নামক এক নালা কাটিয়া বিশ্বকোষ মন্দির পবিত্র করিয়াছেন! সত্য সত্যই তিনি ধন্য!

পত্রের অপর স্থলে লিখিত আছে,—

"তৎপরে শাস্ত্রী মহাশয় বর্দ্ধমানের সাহিত্য-সম্মিলনে যে সম্বোধন পাঠ করেন, তাহাতে পরিষদে গোলমাল উপস্থিত হয়। এই অভিভাষণে তিনি সম্প্রদায়-বিশেষ সম্বন্ধে যেরূপ অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। বর্দ্ধমান সম্মিলনের অব্যবহিত পরেই এই বিষয় লইয়া কিঞ্চিৎ কানাঘুষা আরম্ভ হয় এবং ইহাও শুনিতে পাওয়া যায় যে, শাস্ত্রী মহাশয়ের এই সম্বোধন পরিষদ্ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। পরিষদের ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কায়, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, এইরূপ প্রবন্ধ প্রকাশে আপত্তি করেন। * * * কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় অত্যন্ত জেদ করিতে লাগিলেন, অনন্যোপায় হইয়া পরিষদের সম্পাদক আপত্তিকারিগণকে পরিষদে আহ্বান করিলেন, এবং তাঁহার কথাতে, আপত্তিকারিগণ এই প্রবন্ধ পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে, যাহাতে পরিষদের কোনও অনিষ্ট হয়, তাহা করিবেন না বলিয়া, প্রতিশ্রুত হইলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের জেদ বজায় রাখিবার জন্য তাঁহার এই সম্বোধন সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় বাহির হয়। * * * *। যাহা হউক শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় প্রবন্ধটী প্রকাশ করিয়াই নিরস্ত হইলেন না। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত ৮বৎসর কাল সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করিয়া, ১৩২১ সালের শেষ ভাগে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য পরিষদের কোন কর্ম্মাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু হেমবাবু এই অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়-দ্বয়ের কথাতে, সহকারী সম্পাদক রূপে পুনরায় কার্য্য করিতে স্বীকৃত হন। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ লইয়া যে ব্যাপার হয়, তাহার পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ প্রকাশের পর আমার লিখিত

শ্রীবিক্রমপুর প্রবন্ধ যথা রীতি অনুমোদিত হইয়া, পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সময়ে সহকারী সম্পাদক রূপে, কোন প্রবন্ধ পত্রিকাতে প্রকাশিত হইবে বা না হইবে, তৎসম্বন্ধে নিয়মানুসারে যাহা করণীয়, তাহা হেমবাবুর অন্যতম কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। সুতরাং এই প্রবন্ধ ব্যাপারে, হেমবাবুর বিরুদ্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের জেদ বাড়িয়া যায়। ফলে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির যে অধিবেশনে হেমবাবুকে সহকারী সম্পাদকরূপে মনোনয়নের কথা হয়, সেই সময়ে তিনি বলিয়া পাঠান যে, যদি হেমবাবু সহকারী সম্পাদক মনোনীত হন, তবে তিনি পরিষদের সভাপতি পদ ত্যাগ করিবেন। ইহা শুনিয়া হেমবাবু সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন।"

শাস্ত্রী মহাশয় 'অভিভাষণে' যে 'সম্প্রদায়-বিশেষ' সম্বন্ধে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, ধন্বন্তরির পাঠকবর্গ সম্ভবতঃ সেই 'সম্প্রদায়-বিশেষ'কে চিনিতে পারিয়াছেন, আমরাও চিনিতে পারিয়াছি! প্রায় বিশ বৎসরের অধিক হইল, শাস্ত্রী মহাশয় মেঘদূতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া যখন যাবতীয় সংবাদপত্রের সমালোচনার তীব্র কষাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন, তখন এই সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি তাঁহার পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় আজ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বভাবসিদ্ধ কৃতঘ্নতার সম্মানপ্রদর্শনাত্মক বিষয় অবলম্বন করিয়া ধন্বন্তরির কলেবর পবিত্র করিতে হইল। শাস্ত্রী মহাশয় দেশ বিদেশের বহু Researeh Societyর সহিত বেশী পরিচিত আছেন বলিয়াই কি সাহিত্য-পরিষদ কর্ত্তৃক অভিনব তাম্রফলকের আবিষ্ক্রিয়া এতদূর প্রশ্রয় পাইতেছে? বৈদ্যজাতির প্রতি উৎকট বিদ্বেষ ভাবটাও কি তাঁহার গভীর গবেষণা-প্রসূত ফল? শাস্ত্রী মহাশয়ের গুণে ঘাট নাই। কিন্তু এহেন ব্যক্তির নিকট লাঞ্ছিত হইয়াও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় পরিষদের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি! আত্মসম্মান রক্ষায় এহেন উদাসীন বৈদ্যসন্তান আমাদের নেত্রগোচর হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না।

'সম্প্রদায় বিশেষের' উপর পরিষদের উল্লিখিত দুই মহাত্মার 'অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য' কেন, সংক্ষেপে তাহা প্রদর্শিত হইল। এই মহাপুরুষদ্বয় পরিষদের অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কিরূপ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া থাকেন, এবং তদ্দ্বারা পরিষদের অর্থ কিরূপভাবে অপচিত হইতেছে তাহার আলোচনায় প্রয়াস পাইব।

পরিষদের অনেক টাকা গ্রন্থপ্রকাশে ব্যয় হয়। আমাদের বিশ্বাস, এই টাকায় পরিষদের একটী নিজস্ব ছাপাখানা অনায়াসে হইতে পারে; কিন্তু তাহা না হইয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বিশ্বকোষ ছাপাখানায় পরিষদের প্রায় যাবতীয় কার্য্যই হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, পরিষদ-গ্রন্থাবলীর সম্পাদন অছিলায় নগেন বাবু প্রতি ফর্ম্মা ৪৲ টাকা হিসাবে পরিষদ তহবীল হইতে গ্রহণ করিবার সুবিধা করিয়া লইয়াছেন! সম্প্রতি 'তীর্থভ্রমণ' নামক পরিষদ-গ্রন্থাবলীর ৫৩ নং গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কায়স্থবংশসম্ভূত মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী (বসু) মহাশয়ের পিতামহ ৺যদুনাথ (বসু) সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের ভ্রমনবৃত্তান্ত অবলম্বনে লিখিত। পরিষদের অর্থে এসকল গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া পরিষদ-গ্রন্থাবলীর কলেবর পুষ্ট করা বিধিসঙ্গত কি না, পরিষদের কর্ত্তারা অবশ্যই তাহা সম্যক্ অবগত আছেন। যাহাহউক গ্রন্থপ্রকাশ ও প্রেস-কমিটী সম্বন্ধে আমরা দ্বিতীয় প্রবন্ধে সম্যক আলোচনা করিব।

প্রাপ্ত।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।

২৯, ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট্—শ্যামবাজার কলিকাতা।

প্রতিষ্ঠা—বিগত ১৩২৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতা শ্যামবাজারের অন্তর্গত ফড়িয়া-পুকুরের ষ্ট্রীটের ২৯ সংখ্যক ভবনে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উদ্দেশ্য—(১) আয়ুর্ব্বেদের আটটী অঙ্গ যথা—শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমার-ভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়ন ও বাজীকরণ। এই আটটী শাখার যোগ্যাকরণ পূর্ব্বক অধ্যাপনা, কর্ম্মাভ্যাস ও শিক্ষাপ্রদান। (২) সুপ্রণালীতে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিতে হইলে যাহা প্রয়োজন যেমন—বৈদ্যক-বৃক্ষবাটিকা, আরোগ্যশালা, রসশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা। (৩) সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা। (৪) আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসকগণকে ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞান সম্পন্ন করণ।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের বিভাগ।—এই বিদ্যালয়ের দুইটা বিভাগ আছে সংস্কৃত-বিভাগ ও বাঙ্গালা বিভাগ।

সংস্কৃত-বিভাগ—সংস্কৃত-বিভাগের পাঠ পাঁচ বৎসরে শেষ হয়। চারিবৎসর বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও এক বৎসর কর্ম্মাভ্যাস বিষয়ক বিশেষ শিক্ষা ও আয়ুর্ব্বেদের দর্শনাংশের অধ্যাপনা হয়।

বাঙ্গালা বিভাগ—বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপনাপ্রণালী ও পাঠ্য-পুস্তক প্রভৃতি সংস্কৃত বিভাগের তুল্য—কেবল ভাষার প্রভেদ। এই বিভাগের পাঠ চারিবৎসরে শেষ হয়।

ছাত্রের শ্রেণী বিভাগ।—বাঙ্গালা ও সংস্কৃত উভয় বিভাগেই দুই-শ্রেণীর ছাত্র গ্রহণ করা হয়—(১) নিয়মিত ছাত্র—যাহারা বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট যাবতীয় পুস্তক যথারীতি অধ্যয়ন করিবে। (২) অনিয়মিত ছাত্র—যাহারা কোন বিষয় বিশেষ (যেমন, শারীরবিদ্যা, দ্রব্যগুণ, চিকিৎসা বা ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষা প্রভৃতি) অধ্যয়ন করিবে।

প্রবেশাধিকার—প্রবেশিকা পরীক্ষা।—এই বিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বিভাগে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট ব্যাকরণ বা কাব্যশাস্ত্রের কিম্বা অন্য কোন শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথবা সংস্কৃত-ভাষায় বোধাধিকার থাকা আবশ্যক। বাঙ্গালা বিভাগে অধ্যয়নার্থিগণের বাঙ্গালাভাষা শুদ্ধভাবে লিখিবার পড়িবার বুঝিবার শক্তি থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কিছু সামান্য সংস্কৃত জ্ঞান থাকা স্পৃহনীয়, ইংরাজি কিছু জানা থাকিলে ভাল। উভয় বিভাগের ছাত্রকেই বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হইবে। যতদিন নূতন ছাত্র ভর্ত্তি করিবার নিয়ম থাকিবে ততদিন বিদ্যালয়ে বিজ্ঞাপিত সময়ে প্রতিদিন একজন প্রবেশিকা পরীক্ষক প্রবেশার্থী ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিয়া প্রবেশাধিকার পত্র দিবেন। "অনিয়মিত" ছাত্রগণের যোগ্যতা "নিয়মিত" ছাত্রের তুল্য হওয়া আবশ্যক।

ছাত্রের বেতন।—সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় বিভাগে "নিয়মিত" ছাত্রদিগের মাসিক বেতন তিন টাকা। সংস্কৃত বিভাগে ব্যুৎপন্ন ছাত্রদিগের মধ্যে কতকগুলি ছাত্রের বিনা বেতনে অধ্যয়নের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক ছাত্রকে ভর্ত্তি হইবার সময় ৫৲ পাঁচ টাকা "প্রবেশ শুল্ক" দিতে হইবে। "অনিয়মিত" ছাত্রগণের বেতন, বিষয় বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট আছে।

বার্ষিক পরীক্ষা।—বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য প্রতি বৎসর পরীক্ষক সভা অর্থাৎ "বোর্ড অব্ একজামিনার্স" গঠিত

হইবে। প্রত্যেক বিষয়ের জন্য ২ জন পরীক্ষক থাকিবেন, তন্মধ্যে যিনি বিদ্যালয়ে সেই বিষয়ের অধ্যাপনা করিবেন তিনি একজন এবং অপর পরীক্ষক, সেই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বাহিরের লোক হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন। ২ জন পরীক্ষক মিলিয়া লিখিত বিষয়ের প্রশ্নপত্র রচনা করিবেন। এই প্রশ্নপত্র ২ ভাগে বিভক্ত থাকিবে এবং দুইজন পরীক্ষকের প্রত্যেকে স্ব স্ব ভাগের প্রশ্নপত্রের পরীক্ষা ও নম্বর দিবার পক্ষে দায়ী থাকিবেন।

যে সকল ছাত্র বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিবে তাহারা বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে তাহাদিগকে বেতন দিতে হইবে। যে ছাত্র বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করিবে তাহার জন্য বৃত্তি পুরস্কারাদি নির্দ্দিষ্ট আছে। বৃত্তি পুরস্কারাদি না পাইলেও অধ্যাপকগণ যাহাদিগকে উত্তম ছাত্র বলিয়া বিবেচনা করিবেন; অধ্যাপকগণের সহিত পরামর্শ করিয়া অধ্যক্ষ তাহাদিগকে "শিষ্যোত্তম নিদর্শনপত্র" দিবেন।

দাতব্য চিকিৎসালয়।—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের অন্তর্গত একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিদিন প্রাতে ৮॥০ টা হইতে ১০॥০ টা পর্য্যন্ত এই দাতব্য চিকিৎসালয়ে সমাগত রোগিগণকে সুযোগ্য চিকিৎসক কর্ত্তৃক রোগ পরীক্ষান্তে ঔষধ বিতরণ করা হয়। রোগ-পরীক্ষায় কুশলতা লাভ করিবার জন্য বিদ্যার্থিগণকে এই ঔষধালয়ে রীতিমত কর্ম্মাভ্যাস করিতে হইবে।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপনা যথার্থ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ব্বাহ করিবার জন্য যে দ্রব্যসম্ভার সগৃহীত হইতেছে তদ্বিষয়ক স্থূল বিবরণ—

(ক) রসশালায়—ঔষধ নির্ম্মাণের বিবিধ যন্ত্র পাত্রাদি।

(খ) ভৈষজ্য-পরিচয়াগারে—বিবিধ বনৌষধি, বণিক্‌দ্রব্য, রসোপরস ধাতু-পধাত্বাদি।

(গ) যন্ত্রশস্ত্রাগারে—শস্ত্রকর্ম্মোপযোগী বিবিধ যন্ত্রশস্ত্র।

(ঘ) বিকৃতশরীর দ্রব্যসম্ভারে—পীড়া বিশেষ বিকৃতিপ্রাপ্ত নর-শরীরের আশয়াদি।

(ঙ) গবেষণামন্দিরে—চিকিৎসা-বিজ্ঞানোচিত বিবিধ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান ও পরীক্ষার জন্য নানা উপকরণ এবং যন্ত্রাদি।

(চ) বৈদ্যক বৃক্ষবাটিকা—ঔষধার্থ ব্যবহৃত বিবিধ বৃক্ষগুল্ম লতা।

(ছ) শারীর পরিচয়াগারে—নর-কঙ্কাল মানব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুরঞ্জিত চিত্র ও মৃত্তিকা রচিত রঞ্জিত আশয়াদি।

এবং

(জ) গ্রন্থাগারে—মুদ্রিতামুদ্রিত বিবিধ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়া রক্ষিত হইবে।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণী।

বনৌষধি বিজ্ঞান, দ্রব্যগুণ, রসশাস্ত্র, অঙ্গবিনিশ্চয় বিদ্যা, শারীরবিজ্ঞান ও এই সকল শাস্ত্রের অধীত অংশের যোগ্যাকরণ। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উন্নীত-করণের পরীক্ষা।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী।

পরিভাষাও রসরত্নাদি-তত্ত্ব, ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষা, অঙ্গবিনিশ্চয় বিদ্যা (তদ্বিদ্য-সম্ভাষা [পাঠ চাওয়া) ও ব্যবচ্ছেদ পূর্ব্বক মৃতকপরীক্ষাসহ) শারীর-বিজ্ঞান, রোগবিনিশ্চয়। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উন্নীতকরণের পরীক্ষা।

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী।

দ্রব্যগুণ, ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষা, রোগবিনিশ্চয় কায়চিকিৎসা, শল্যতন্ত্র, প্রসূতি-তন্ত্র, (ধাত্রীবিদ্যা) আরোগ্যশালাকর্ম্মাভ্যাস, কৌমার ভৃত্য। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে উন্নীতকরণের পরীক্ষা।

চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী।

কায়-চিকিৎসা, শল্যতন্ত্র (যন্ত্রশস্ত্রকর্ম্মাভ্যাসসহ)

শালাক্য-চিকিৎসা, উভয় তন্ত্রগত তত্ত্বিশ্লসম্ভাষা ব্রণ-বন্ধন শিক্ষা, নাড়ীবিজ্ঞান, স্বাস্থ্য-তত্ত্ব, অগদতন্ত্র, আরোগ্যশালাকর্ম্মাভ্যাস। সংস্কৃত বিভাগের ব্যুৎপত্তিলাভের সাধারণ প্রশংসাপত্র ও বাঙ্গালা বিভাগের চরম পরীক্ষা।

পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণী।

নাড়ীবিজ্ঞানের বিশেষ আলোচনা, দ্বাদশ মাস আরোগ্যশালাকর্ম্মাভ্যাস, কায়-চিকিৎসা ও শল্য-শালাক্য তন্ত্রের প্রত্যক্ষদর্শনমূলক বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশ। চরম পরীক্ষান্তে উপাধিদান।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাঠ্য পুস্তকরূপে গৃহীত হইল—

১। চরক-সংহিতা ২। সুশ্রুত-সংহিতা ৩। অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ ৪। অষ্টাঙ্গহৃদয়। ৫। মাধব-নিদান ৬। প্রতিসংস্কৃত রোগবিনিশ্চয় (যামিনী ভূষণ কৃত) ৭। সিদ্ধযোগ ৮। চক্রদত্ত ৯। ভাবপ্রকাশ ১০। শার্ঙ্গধর ১১। রসরত্ন-সমুচ্চয় ১২। রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ ১৩। বঙ্গসেন ১৪। ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু ১৫। রাজ নিঘণ্টু ১৬। বনৌষধি-দর্পণ (বিরজাচরণ কৃত) ১৭। নাড়ীবিজ্ঞান ১৮। পরিভাষাপ্রদীপ ১৯। পথ্যাপথ্যবিনিশ্চয়। ২৯। প্রত্যক্ষশারীর (গণনাথ কৃত)।

বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট সমগ্র পাঠ সমাপ্ত হইলে ছাত্রদিগকে চরম পরীক্ষা দিতে হইবে। চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণ যোগ্যতানুসারে প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে স্থান লাভ করিবে এবং বিদ্যালয়ের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র ও উপাধি লাভ করিবে।

শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম্, এ, এম বি,

অধ্যক্ষ—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় মহাশয়ের উদ্যম যথেষ্ট প্রশংসনীয়; এবং এই শুভ অনুষ্ঠানে সাফল্য লাভ করিতে পারিলে যে দেশের একটী গুরুতর অভাব দূরীকৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংরেজীভাষায় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের শিক্ষাদান-ব্যবস্থা না হইলে কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃতি লাভ করিবে বলিয়া মনে করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। বাঙ্গলা ও সংস্কৃতভাষা জগতের সর্ব্বত্র প্রচলিত নহে। বঙ্গদেশের বাহিরে এক আসাম-প্রদেশ ব্যতীত অন্যত্র বাঙ্গালাভাষার প্রচলন নাই। সুতরাং যাঁহারা বাঙ্গালাভাষায় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র শিক্ষা করিবে, তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র বঙ্গদেশ ও আসামেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র নামজাদা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক আছে বলিয়া সর্ব্বসাধারণ অবগত না থাকিলেও, অনেক অনেক স্থলে, এমন কি সুদূর পল্লীতে, অনেক শিক্ষিত প্রবীণ সুচিকিৎসক আছেন, এবং তাহাতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের অভাব অনুভূত হয় না। বঙ্গের বাহিরে ভারতের কোন কোন স্থানে সংস্কৃতের চর্চ্চা থাকিলেও সে ক্ষেত্রকেও বেশ বিস্তৃত-ক্ষেত্র বলিয়া স্বীকার করা যায় না। আমাদের দেশে যেসকল কবিরাজ সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যে সংস্কৃতভাষায় কথাবার্ত্তা বলিবার শক্তি কয়জনের আছে জানিনা। অতএব সংস্কৃত ভাষাও যে আয়ুর্ব্বেদের কার্য্যক্ষেত্র সম্প্রসারিত করিবার পক্ষে বিশেষ অনুকূল, করিতে পারি কই?

আজকাল ইংরেজীভাষা সমগ্র সভ্যজগতের প্রচলিত ভাষা। ইংরেজীভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে, বুঝিতে অসমর্থ, সমগ্র জগতে এরূপ স্থান নাই বলিলেই হয়। অতএব যদি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালীর ক্ষেত্রের বিস্তৃতি সাধন করিতে হয়,—এবং এই চিকিৎসাপ্রণালীর প্রয়োজনিয়তা সর্ব্বত্র প্রতিপন্ন করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে এই অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও বাঙ্গালার সঙ্গে ইংরেজী ভাষায় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের বিশ্বাস, এরূপ ব্যবস্থা হইলে এই বিদ্যালয়ে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থীর অভাব হইবে না। আমরা আশা করি, কবিরাজ যামিনীভূষণ আমাদের এই স্থূল কথাটী বিবেচনা করিয়া দেখিতে অবহেলা করিবেন না।

ধঃ সঃ

গীতাপ্রবেশ।

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, বি, এল।]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

মহাভারতীয় ভীষ্মপর্ব্বের ত্রয়োদশ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়ে ভগবদ্গীতা পর্ব্বাধ্যায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত এই অষ্টাদশ অধ্যায় উপনিষদ্ভাগ। ইহাতে সর্ব্ব সাকল্যে ৭০০ শ্লোক আছে। যথা ধৃতরাষ্ট্রোক্তি ১ শ্লোক ও সঞ্জয়ের উক্তি ৬৯৯ শ্লোক। পুনশ্চ এই ৬৯৯ শ্লোকের মধ্যে সঞ্জয়ের নিজ উক্তি ৩০ শ্লোক, দুর্য্যোধনের উক্তি ৯ শ্লোক, অর্জ্জুনের উক্তি ৮২ শ্লোক এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ৫৭৯ শ্লোক। এই সপ্তশত শ্লোকময় উপনিষদ্ভাগই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামে পরিচিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকেই সংক্ষেপ করিয়া গীতা বলা যায়।

গীতার উৎপত্তির সম্বন্ধে আমরা মহাভারত হইতে যেরূপ সংগ্রহ করিয়াছি তাহা নিম্নে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে। ভারতযুদ্ধের অব্যবহিত প্রাক্কালে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কৌরব রাজ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত হস্তিনানগরে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পুত্রগণকে কুলক্ষয়কর যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিতে উপদেশ দেন। ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় অক্ষমতা জ্ঞাপন পূর্ব্বক বলেন, যাহা ভবিতব্য তাহা তাঁহার নিবারণ করিবার সাধ্য নাই, এবং যখন ইহা নিশ্চয়ই ঘটিবে তখন ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে সমরে প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্তি অপেক্ষা অধিকতর কিছুই বাঞ্ছনীয় নহে। ভগবান্ ব্যাস দেব বলিলেন, তাহাই হউক; কিন্তু তুমি তজ্জন্য যেন শোক করিও না। যদি তুমি এই যুদ্ধ ব্যাপার স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিতে অভিলাষী হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে চক্ষু প্রদান করিতে পারি। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—পিতঃ! এই কুলক্ষয়কর

তখন তিনি ধৃতরাষ্ট্রমন্ত্রী সঞ্জয়কে বর দিলেন যে সঞ্জয় দূর হইতে যেখানে যাহা ঘটিবে, যেখানে যাহা কথা বার্ত্তা হইবে, এবং যাহার যাহা মনে উদয় হইবে, তাহা দেখিতে, শুনিতে ও জানিতে পারিবেন; অধিকন্তু তিনি আকাশ মার্গে ভ্রমণ করিতে পারিবেন, এবং তাঁহার গাত্রে কোন অস্ত্রাদি স্পর্শ করিতে পারিবে না। যাহা হউক সঞ্জয় কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন ও ভীষ্মদেব শরশয্যায় শায়িত হইলে, তথা হইতে হস্তিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে আদ্যোপান্ত যুদ্ধপ্রসঙ্গ বর্ণন করিতে আদেশ করিলেন। সঞ্জয় তদনুযায়ী যাহা ঘটিয়া গিয়াছে ও যেমন যেমন ব্যাপার ঘটিতে লাগিল বিবৃত করিতে লাগিলেন। এইরূপ যুদ্ধ ব্যাপার বর্ণন প্রসঙ্গে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধ প্রারম্ভের অব্যবহিত প্রাক্কালে যুদ্ধ ক্ষেত্রে শ্বেতাশ্ব রথোপরি মাহাত্মা ধনঞ্জয় ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যোগ বিষয়ক যে অত্যদ্ভুত রোমহর্ষণ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা মহর্ষি ব্যাসদেবের কৃপায় শুনিয়া যথাযথ বর্ণন করেন। এই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের যোগবিবরণ পূর্ণ পরম শ্রেয়স্কর সংবাদই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামে প্রসিদ্ধ।

গীতা ভগবান্ বেদব্যাসের রচিত নহে। ব্যাসদেব গীতার সঙ্কলনকারী। ইহা সাক্ষাৎ পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম বিনিসৃতা পীযুষ ধারায় পরিপূর্ণ। ইহার শ্রীকৃষ্ণের উক্তিগুলি শ্রীমদ্ভগবানের নিজ মুখপ্রোক্ত বচন বলিয়াই ইহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কথিত হয়। মহর্ষি ব্যাসদেব এই অষ্টাদশাধ্যায়ী ভব ভয়হারিণী অমৃতময়ী গীতাকে বেদ পাঠে অনধিকারী স্ত্রী শূদ্রাদি আপামর সর্ব্ব সাধারণের হিতার্থ সর্ব্ব ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে পাঠ্য পঞ্চমবেদ

অংশাবতার ভগবান্ মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব, সর্ব্ব সাধারণের ব্যবহার্য্য মহাভারত রূপ অমূল্য প্রদীপে গীতারূপ তৈল দ্বারা পরিপূর্ণ করত, সমগ্র জগতে যে জ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা চক্ষুষ্মান্ মানবমাত্রেই আনন্দধামে উপস্থিত হইবার সুগম পথ দর্শনে সমর্থ হইয়াছেন। ব্যাসদেবের কৃপায় সজ্জন ষট্পদগণ গীতার্থ গন্ধোৎকট পূর্ণ অমল সরোজ মধু পানে মনানন্দে সদানন্দে বিহার করিতেছেন। কলিমল প্রধ্বংসিনী গীতারূপ অমৃত বারিময় মহাভারতরূপ স্বচ্ছ সরোবর ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ভগবান্ বেদব্যাস মাদৃশ অধম মানবগণেরও সংসার পিপাসা শান্তির প্রশস্ততম উপায় করিয়া দিয়াছেন। তিনি এই প্রচার কার্য্যের দ্বারা জগতের যে মহদুপকার সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি জগতের চিরপূজ্য থাকিবেন। জগৎ তাঁহার ঋণ কখনই পরিশোধ করিতে সক্ষম হইবে না।

অপার করুণাসাগর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় পাণ্ডব শ্বেতবাহন অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া (গী, মা ৫-৭) অগাধ উপনিষৎ সমুদ্র হইতে গীতামৃত মন্থন পূর্ব্বক চাতুর্ব্বর্ণ্য জগতে স্ত্রী শূদ্র নির্ব্বিশেষে আপামর সাধারণের উপকারার্থে বিতরণ পূর্ব্বক বৈদিক পরম ধর্ম্ম সুগম করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সুকৃতিশালী ত্রিতাপতাপিত, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, মোক্ষার্থী ও জ্ঞানী এই সকল সদ্বুদ্ধি মান সাধকগণের মধ্যে যে কেহ গীতামৃত পান করিয়া অমরত্ব লাভ পূর্ব্বক পরম ধামে পরমাত্মার আশ্রয়ে অখণ্ড ভূমানন্দ ভোগে দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম সার্থক করিতে পারেন।

এ স্থলে বেদের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি। জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতু হইতে বেদ (বিদ্+অল) শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। বেদ বিদ্যার নামান্তর মাত্র। বেদ শব্দের অর্থ সমস্ত বিদ্যা বা সমস্ত জ্ঞানের আধার। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' এই তৈত্তিরীয় শ্রুতি বাক্য হইতে দেখিতে পাই যে ব্রহ্ম স্বয়ং নিত্য ও অনন্ত জ্ঞানের আধার। এবং 'অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম' (গী, ৮।৩) পরম ব্রহ্ম ক্ষয় রহিত। অনন্ত জ্ঞানময় ব্রহ্ম নিত্য ও অক্ষয় সেই হেতু ব্রহ্মই বেদ ও বেদ নিত্য। বেদ চিরদিনই ব্রহ্মে আছে ও চিরদিনই থাকিবে, ইহার ক্ষয় নাই। বেদ নিত্য, কিন্তু বেদের ভাষা বা শব্দ নিত্য নহে; ইহা মহর্ষি পতঞ্জলি মহাভাষ্যে বলিয়াছেন। সুতরাং বেদ বলিতে পুস্তক বেদকে বুঝায় না, সনাতন ব্রহ্মই বেদ শব্দ বাচ্য:—

ন বেদং বেদমিত্যাহু র্বেদো ব্রহ্ম সনাতনং।

যত প্রকার কার্য্য হয় তাহা প্রথমে জ্ঞানের আকারে থাকে, তাহার পর জ্ঞানের প্রেরণায় চেষ্টা হয়, তৎপরে সেই জ্ঞানই বাহ্যে কার্য্যাকারে পরিণত হয় এবং এই কার্য্য সকল ও শেষে পুনশ্চ জ্ঞানেই পর্য্যবসিত হয়। জগৎ ও একটি কার্য্য উহা ব্রহ্মেই জ্ঞানাকারে ছিল তৎপরে তাঁহার ঈক্ষণাদি দ্বারা জগদাকারে পরিণত হইয়াছে। ইহার আদি মধ্য ও অন্ত সমস্তই জ্ঞানে, জ্ঞানেই উৎপত্তি জ্ঞানেই স্থিতি এবং জ্ঞানেই পুনরায় লয় হইবে। সুতরাং সংসারের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় বেদ দ্বারাই হইয়া থাকে।

যত প্রকার জ্ঞান আছে সমস্তই সেই বেদময় ব্রহ্ম হইতে জাত।

প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী শ্বেত, ৪।১৮
"তাঁহা হইতে সনাতনী (পুরাণী) প্রজ্ঞা (জ্ঞান) প্রসূত হইয়াছিল।"

সৃষ্টিকালে ব্রহ্ম হইতে এই বেদ আপনা আপনি বিনির্গত হইয়া থাকে। সেই জন্য বৃহদারণ্যক (২।৪।১০) বলিয়াছেন:—

আর্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগ্ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরে, অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিত মেতদ্যদৃগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদো। থর্ব্বাঙ্গিরস

ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্য নুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি নিঃশ্বসিতানি।

"আর্দ্র কাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্বালিত অগ্নি হইতে যেরূপ নানা প্রকার ধূম শিখা ও বিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হয়, হে মৈত্রেয়ি, তদ্রূপ এই মহান্ স্বতঃসিদ্ধ পরব্রহ্মের নিঃশ্বাসের ন্যায় স্বতঃই ইহা বিনির্গত হয়। (ইহা কি?) যাহা ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, (যজ্ঞ নৃত্য গীতাদি কলাবিদ্যা, উপনিষৎ (ব্রহ্ম বিদ্যা), শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান (বা অর্থবাদ বাক্য) ইত্যাদি সমস্ত বিদ্যা (বেদান্তর্গত জ্ঞান) নিশ্চয়ই ব্রহ্মের নিঃশ্বসিত মাত্র।"

নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যেমন প্রাণিগণের স্বভাবতই হইয়া থাকে তদ্রূপ বেদাদি বিদ্যা সকল ও ব্রহ্মের স্বভাব ও তাঁহা হইতে স্বভাবনিয়ত বা অযত্ন প্রসূত হইয়া থাকে। যাহা স্বভাব তাহার কোন কর্ত্তা নাই তাহা স্বতঃসিদ্ধ যাহা ব্রহ্ম হইতে নিঃশ্বসিত তাহার ও সেইজন্য কেহ স্রষ্টা নাই ও তাহা ব্রহ্মের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ। অতএব বেদের অন্য কোন প্রমাণ আবশ্যক করে না ও উহার কেহ রচয়িতা নাই, উহা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব বেদ অপৌরুষেয়। এই বচনে আরও দেখিতে পাই যে অগ্নির সহিত তাহা হইতে বিনির্গত বিস্ফুলিঙ্গের যে সম্বন্ধ ব্রহ্মের সহিত ব্রহ্ম হইতে নিঃশ্বসিত বেদের ও সেই অভেদ সম্বন্ধ।

জ্ঞানের বা বিদ্যার কেহ স্রষ্টা হইতে পারে না লোকে বিদ্যার আবিষ্কারক মাত্র। আবিষ্কর্ত্তার নিকট হইতে গুরুশিষ্যাদি পরম্পরা ক্রমে জ্ঞান বা বিদ্যার প্রচার হইয়া থাকে।

বেদ সকল সৃষ্টির প্রাক্‌কালে ব্রহ্মা হইতে নিঃশ্বসিত হইয়া ব্রহ্মাতে সঞ্চারিত হইয়াছিলঃ—

তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরংধীমহি
ভাগবত।

"সেই সত্য স্বরূপ পরমাত্মার—ধ্যান করি, যিনি আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ সঞ্চারিত করেন, যে বেদ পণ্ডিতগণের ও দুর্ব্বোধ্য, এবং যিনি আপন স্বপ্রকাশ জ্যোতিতে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করেন।"

একদা আদি সৃষ্ট পুরুষ ব্রহ্মা যোগাসীন হইয়া পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হইলে বেদ সকল পরমাত্মা কর্ত্তৃক নিঃশ্বসিত হইয়া ব্রহ্মার হৃদয় কন্দরে একটি অস্ফুট নাদধ্বনি স্বরূপে অভিব্যক্ত হইল; পরে সর্ব্ববেদের বীজরূপী শব্দব্রহ্ম ওঁ বা ব্রহ্ম নাম প্রণব, স্বর ব্যঞ্জনময় বর্ণরাশিসহ একে একে অভিব্যক্ত হইল। তখন ব্রহ্মার মুখ চতুষ্টয় হইতে সেই সকল বর্ণরাশি সংযোগে যে সকল শব্দ উচ্চারিত হইল তাহাই বেদ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

শ্বেতাশ্বতর (৬।১৮) ও বলিয়াছেন

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।

"যিনি (ব্রহ্ম) ব্রহ্মাকে প্রথম সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে বেদ সকল প্রদান করেন।

বেদ সকল একদিনে আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহারা ধ্যানস্থ যোগিগণের হৃদয় কন্দরে ক্রমে ক্রমে আবির্ভূত হইয়াছে। যাঁহার হৃদয়ে বৈদিক মন্ত্র আবির্ভূত হইয়াছে তিনিই ঋষি (ঋষ্ দর্শনে) এই প্রত্যেক বৈদিক মন্ত্রের পূর্ব্বেই যে ঋষির নাম উচ্চারিত হয় তিনিই সেই মন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা ঋষি। যাহা হউক ব্রহ্মা হইতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্ব, সমগ্র বেদ বিদ্যা লাভ করেন।

ব্রহ্মা দেবাণাং প্রথমঃ সম্বভুব,
বিশ্বস্যকর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্ম বিদ্যাং সর্ব্ব বিদ্যা প্রতিষ্ঠাম্
অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠ পুত্রায় প্রাহ॥মুণ্ডক, ২।১।১-২

"বিশ্বস্রষ্টা, জগৎ পাতা ব্রহ্মাই আদি সৃষ্টদেব, তিনি সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্ম বিদ্যা আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বাকে কহিয়াছিলেন।"

এই অথর্ব্বাই বিরাট্ অন্ত কেহ নহেন। সর্ব্ববিস্তার আশ্রয় ব্রহ্ম বিদ্যা বলায় সমগ্র ঋক্, যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব এই বেদ চতুষ্টয় ও তদন্তর্গত ইতিহাস, পুরাণ, যজ্ঞ ও নৃত্যগীতাদি কলা বিদ্যা, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র ব্যাখ্যান, অনুব্যাখ্যান বেদাঙ্গচয় (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ছন্দ ও জ্যোতিষ) মীমাংসা (পূর্ব্ব ও উত্তর) ন্যায়বিস্তর (সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায় ও বৈশেষিকাদি যুক্তি শাস্ত্র) ধর্ম্ম শাস্ত্র (স্মৃতি সকল) ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ গান্ধর্ব্ববেদ, ও অর্থ শাস্ত্র এতদ্ভিন্ন পঞ্চাগ্নি বিদ্যা বারুণী বিদ্যা, মধু বিদ্যা ইত্যাদি।

সর্ব্ব প্রকার বিদ্যাই বেদোদ্ভব। কিন্তু ব্রহ্ম বিদ্যা শব্দ ব্যবহার করায় ইহাও বুঝাইল যে বেদ বিদ্যার দুইটী প্রধান বিভাগ আছে (১) পরা ও (২) অপরা—দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ ॥ ৪ ॥ তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো! অথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষর মধিগম্যতে ॥ ৫ ॥ মুণ্ডক ১।১।

"দুই প্রকার বিদ্যাই অবশ্য জ্ঞাতব্য অপরা ও পরা। সেই উভয় বিদ্যার মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্পসূত্র ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ শাস্ত্র ও জ্যোতিষ এইগুলি অপরা। আর যাহার দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই পরা বিদ্যা।" সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয় বা প্রতিষ্ঠা বলায় আরও বুঝাইতেছে এক কালে সমগ্র বিদ্যার আশ্রয় বা নিদান বেদই ব্রহ্মবিদ্যা নামে অভিহিত হইত, যে হেতু ব্রহ্মাই ইহার আদি প্রবর্ত্তক। এই ব্রহ্মবিদ্যা কালে পরিবর্দ্ধিতাকারে অভিব্যক্ত হইয়া পরা ও অপরা ভেদে বিভাগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এবং পরিশেষে পরা বিদ্যা গুলিই ব্রহ্মবিদ্যা নামে কথিতা হইত।

অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা—

থর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যান্।

স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ

ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাশরাম্ ॥২ মুণ্ডক ১।১

এই শ্লোকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রবর্ত্তক সম্প্রদায় ক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে—"আদি পুরুষ ব্রহ্মা অথর্ব্বন্ ঋষিকে যে ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছিলেন, অথর্ব্বা সর্ব্ব প্রথম সেই বিদ্যা অঙ্গির্ নামক ঋষিকে বলেন। অঙ্গির ভরদ্বাজ গোত্রীয় সত্যবাহকে; ভারদ্বাজ সত্যবাহ আবার অঙ্গিরাকে বলেন এইরূপে এই বিদ্যা পূর্ব্ব পূর্ব্ব (আচার্য্য) হইতে অবর শিষ্যগণ প্রাপ্তহন এবং ইহা কালে নূতন নূতন মন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইলে, পরা ও অপরা নামে পরিবর্দ্ধিত ও অভিব্যক্ত হইয়াছিল।

অথর্ব্ব সমগ্র বেদ পারদর্শী ছিলেন বলিয়া বেদের অন্যতম নাম অথর্ব্বন্ হইয়া পড়ে, এবং যিনি সমগ্র বেদ বা ব্রহ্মবিদ্যা পারগ হইতেন তাহার পূজ্যতম অথর্ব্বা উপাধিলাভ হইত। ব্রহ্মর্ষি প্রধান ভগবান্ বশিষ্ঠ এই জন্য অথর্ব্বা উপাধি মণ্ডিত হইয়াছিলেন।

ব্রহ্মপ্রতিপাদক পরাবিদ্যাই বেদের জ্ঞান কাণ্ড অভিহিত হইত। ইহার প্রথম অংশ আরণ্যক ও শেষ অংশ উপনিষৎ। এবং ইহার একমাত্র লক্ষ্য অপবর্গ অর্থাৎ জীবকে নিঃশ্রেয়স বা মুক্তির অধিকারী করা। অপরা বিদ্যার লক্ষ্য জীবকে স্ত্রী,পুত্র, ধন, স্বাস্থ্য, যশ, ঐশ্বর্য্য বল ও স্বর্গাদির অভ্যুদয়ের ভাগী করা; পরাবিদ্যা ভিন্ন বেদের বক্রী সমুদায় বিদ্যাই ইহার অন্তর্গত; ইহাই বেদের কর্ম্ম কাণ্ড উক্ত হয়। কর্ম্ম কাণ্ড বেদের দুইটি বিভাগ আছে প্রথম মন্ত্রভাগ বা সংহিতা ভাগ দ্বিতীয় ব্রাহ্মণভাগ। মন্ত্রভাগে যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়ার বিধি,নিষেধ,মন্ত্র দেবস্তুতি (অর্থবাদ) প্রভৃতি বিষয় সমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মন্ত্রভাগে যে সকল রহস্য প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে তাহার ব্যাখ্যা অনুব্যাখ্যান, স্তোত্র, ইতিবৃত্ত, যতপ্রকার বিদ্যা, যজ্ঞের ন্যায়, সাধনপ্রণালী, পদ্ধতি উপকরণ, ফল প্রভৃতি অপরাপর বিষয়, উপাসনা, ব্রহ্মবিদ্যা ও (আরণ্যক উপনিষৎ) নিবদ্ধ হইয়াছে।

বেদ ছন্দময়, সেই হেতু বেদের একটি নাম ছন্দ, ইহাই পারসিকদের জেন্দে পরিণত হইয়াছে। ছন্দ শব্দে শ্লোক বুঝাইতেছে না যেহেতু বেদে গদ্য ও পদ্য উভয়ই আছে। ছন্দের বিশেষত্ব এই যে ইহা চারিটি চরণ বা পাদবিশিষ্ট। কতকগুলি ছন্দ এমন আছে। যাহাদের প্রত্যক্ষ পাদ ব্যবস্থা নাই। তাহাদের অর্থবশে পাদ ব্যবস্থা করিতে হয়। এই সকল ছন্দের নাম ঋক্, দ্বিতীয় কতকগুলি ছন্দ আছে যাহারা গদ্য বহুল ও যাগ যজ্ঞ প্রধান, তাহারা যজুঃ। অপর কতকগুলি ছন্দ আছে যাহারা প্রকৃত ঋক্ ও যজুরই অন্তর্গত কিন্তু সুর লয় তাল, উদাত্ত ও অনুদাত্তযোগে গেয় এবং তজ্জন্য পরিবর্ত্তিত আকার প্রাপ্ত-ইহাদিগকে সাম বলে। তদ্ভিন্ন বক্রী সমস্ত ছন্দকে অথর্ব্ব বলা যায়। অথর্ব্ব বেদে রাজধর্ম্ম ও অধিকাংশ উপনিষৎ বা ব্রহ্ম বিদ্যা, জ্যোতিষ আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে সাধারণ আর্য্যজাতীয় লোকের যাগ যজ্ঞাদির বিষয় পাওয়া যায় না। আর্য্যগণের যাগ যজ্ঞ সম্বন্ধীয় ব্যাপার সকল ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ সকলেই, সন্নিবিষ্ট আছে।

বৈদিক ছন্দ সকল পূর্ব্বে বিক্ষিপ্তাকারে বিদ্যমান্ ছিল এইজন্য শিক্ষার্থিগণের পক্ষে ইহার অধ্যয়ন কষ্টসাধ্য ছিল। এবং কালে যতই নূতন নূতন বৈদিক ছন্দের আবিষ্কার হইতে লাগিল ততই সমগ্র বেদ অধিগত করা শিক্ষার্থিগণের অসম্ভব হইয়া পড়িল। এইজন্য বেদের পৃথক্ ঋগাদিভেদে সঙ্কলন আবশ্যক হইয়া পড়ে॥

এক এব পুরাবেদঃ প্রণবঃ সর্ব্বাঙ্ময়ঃ।
দেবোনারায়ণোনান্য একোঽগ্নি বর্ণ এবচ॥
ভাগবত।

"পূর্ব্বে ঋক, ও যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বেদ বলিয়া কোন পৃথক্ ভেদ ছিল না। বেদ একমাত্র ছিল তখন সর্ব্ববাক্যের বীজস্বরূপ প্রণব ছিল, উপাস্য দেবতা ও একমাত্র নারায়ণ ছিলেন, এবং অগ্নি ও বর্ণ এক ভিন্ন দুই ছিল না।"

পরে ত্রেতায় এইগুলি হয়ঃ—

বর্ণানাং প্রবিভাগশ্চ ত্রেতায়াং সংপ্রকীর্ত্তিতাঃ।
সংহিতাশ্চ.ততো মন্ত্রাঃ ঋষিভি র্ব্রহ্মণৈ স্তুতে॥
বায়ু, পু, ৫৭।৬০

"ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ঋষিগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের পৃথক্ পৃথক্ প্রবিভাগ এবং বৈদিক মন্ত্র সকল পৃথক্ পৃথক্ সমাহৃত হইয়া ঋগাদি সংহিতাকারে পরিণত ও মন্ত্র সকল ব্যাখ্যাত হইয়াছিল।"

বেদের এইরূপ পৃথক গ্রন্থকারে শেষ সঙ্কলন মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন করেন, সেইজন্য তিনি বেদব্যাস বলিয়া পরিচিত আছেনঃ—

পরাশরাৎ সত্যবত্যাং অংশাংশ কলয়া বিভুঃ।
অবতীর্ণো মহাভাগো বেদং চক্রে চতুর্ব্বিধম্॥
ঋগথর্ব্ব-যজুঃ সাম্নাং রাশীন্ উদ্ধৃত্য বর্গশঃ।
চতস্রঃ সহিতাশ্চক্রে মন্ত্রৈ র্মণিগণা ইব॥

"ভগবান নারায়ণ পরাশরের ঔরসে ও সত্যবতীর গর্ভে অংশাংশ কলায় অবতীর্ণ হন। সেই মহাভাগ বেদ চতুর্দ্ধা বিভাগ করেন। তিনি বেদ শিক্ষার সৌকর্য্যার্থ মন্ত্রদ্বারা মাল্য গ্রন্থের ন্যায় এক এক শ্রেণীর মন্ত্রসমূহ সংগ্রহ পূর্ব্বক ঋক্ যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব নামে চারিটী সংহিতা করিলেন।"

বেদব্যাস ব্রহ্মার আদেশেই বেদের প্রবিভাগ করেনঃ—

ব্রহ্মণাচোদিতো ব্যাসো বেদান ব্যস্তুংপ্রচক্রমে।
অথ শিষ্যান্ সজগ্রাহ চতুরো বেদপারগান্॥
বিষ্ণু পু, ৩.৪।৭

ব্রহ্মার আদেশে ব্যাসদেব বেদ বচন সকল পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ পূর্ব্বক সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং সেই হেতু (ঋগ্বেদের জন্য পৈল, যজুর্ব্বেদের জন্য বৈশম্পায়ন, সামবেদের জন্য জৈমিনি এবং অথর্ব্ববেদের জন্য সুমন্ত এই) বেদপারগ শিষ্য-চতুষ্টয়কে নিযুক্ত করিলেন।"

বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেনঃ—(৩।৪.১৩—১৪)

ততঃ স ঋচমুদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ মুনিঃ।
যজুংষি চ যজুর্ব্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ॥

রাজস্বথর্ব্ববেদেন সর্ব্বকর্ম্মাণি স প্রভুঃ।
কারয়ামাস, মৈত্রেয়, ব্রহ্মত্বঞ্চ যথা স্থিতিঃ॥

"পরে ব্যাসদেব ঋকসমূহ সমাহার করিয়া ঋগ্বেদ সঙ্কলন করিলেন, যজুঃ সমূহের উদ্ধার করিয়া যজুর্ব্বেদ, এবং সাম সমূহের সংগ্রহ করিয়া সামবেদ সঙ্কলন করিলেন। এবং ঋক্ যজুঃ ও সামের অতিরিক্ত ছন্দ সমূহের দ্বারা অথর্ব্ববেদ সঙ্কলন করাইলেন, এবং ইহাতে রাজ ধর্ম্ম বা রাজার অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম কর্ম্মাদি বিষয় সকল ও ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদক বৈদিক বচন সকল সন্নিবেশিত করাইলেন।"

বেদব্যাস কেবল এইরূপ বেদকে চতুর্ধা বিভাগ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই তিনি বেদ সকলকে বহু শাখায় বিভক্ত করিয়াছেন:—

একবিংশতিভেদেন ঋগ্বেদং কৃতবান্ পুরা।
শাখানাং তু শতেনাথ যজুর্ব্বেদ মথাকরোৎ॥
সামবেদং সহস্রেণ শাখানাঞ্চ বিভেদতঃ।
অথর্ব্বাণামথো বেদং বিভেদং নবকেন তু॥

"পূর্ব্বে একবিংশতি বিভিন্ন শাখায় ঋগ্বেদ, শত বিভিন্ন শাখায় যজুর্ব্বেদ, সহস্র বিভিন্ন শাখায় সাম বেদ, ও নয়টি বিভিন্ন শাখায় অথর্ব্ববেদ বিভাগ করিয়াছেন।"

পূর্ব্বে বেদ লিখিত গ্রন্থ ছিল না, গুরুর নিকট হইতে শুনিয়া শিখিতে হইত এইজন্য ইহার অন্যতম নাম শ্রুতি। শ্রুতি অতি যত্নের সহিত আবৃত্তি পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতে হইত, ইহার নাম স্বাধ্যায় (সু+আ+অধ্যায়)। আবৃত্তির অভাবে পাছে শিষ্যগণ ভুলিয়া যায় ও তজ্জন্য বেদ বিকৃত হইয়া পড়ে, ও ধর্ম্ম কর্ম্ম বিকৃত হয় সেই হেতু গুরু ব্রহ্মচারী শিষ্যকে বিদায় কালীন যে সকল উপদেশ দিতেন তন্মধ্যে এইটিও একটি—স্বাধ্যায় প্রবচানাভ্যাং ন প্রমাদিতব্যং—"স্বাধ্যায় ও প্রবচন হইতে ভ্রমে ও স্খলিত হইবে না।"

প্রাচীন আর্য্যসমাজ বৈদিক আশ্রম চতুষ্টয়ে বিভক্ত ছিল, যথা—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস বা ভিক্ষুঃ—

ব্রহ্মচারী ভূত্বা গৃহী ভবেৎ, গৃহীভূত্বা বনীভবেৎ, বনীভূত্বা প্রব্রজেৎ—জাবল, ৪।

"প্রথমে ব্রহ্মচারী হইয়া পরে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবে, গৃহী হইয়া পরে বানপ্রস্থাবলম্বন করিবে, বানপ্রস্থের পর প্রব্রজ্যা অবলম্বন পূর্ব্বক ভিক্ষু হইবে।" এই চতুরাশ্রম ব্যবস্থা আর্য্য বা দ্বিজাতিগণের জন্য শূদ্রগণের একমাত্র গৃহস্থাশ্রমই বিহিত।"

অষ্টবর্ষ প্রাপ্ত হইলে আর্য্যকুমারকে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইত। এই আশ্রমে প্রবেশের যে সংস্কার তাহার নাম বেদারম্ভ বা উপনয়ন। অর্থাৎ এই সংস্কার বা বৈদিক যজ্ঞ দ্বারা আর্য্যকুমার শিষ্যস্বরূপে গুরুকুলে উপনীত হইয়া বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিবার জন্য যেন দ্বিতীয়বার পবিত্র জন্ম লাভ করেন এবং তথায় বেদ বা ব্রহ্মে বিচরণ অর্থাৎ অধ্যয়ণ আবৃত্তির দ্বারা শিক্ষা করেন এই হেতু এই সংস্কারের নাম বেদারম্ভ বা উপনয়ন এবং আশ্রমের নাম ব্রহ্মচর্য্য এবং তখন হইতে আর্য্যকুমার ব্রহ্মচারী এবং দ্বিজ অভিহিত হন। ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে গার্হস্থধর্ম্মে প্রবেশের উপযোগী হইবার জন্য বৈদিকসংহিতা ও ব্রাহ্মণ সকল বিশেষ রূপে আয়ত্ত করিতেন।

অধ্যয়ন সমাপন পূর্ব্বক দ্বিজ ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তন সংস্কার দ্বারা গুরুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। তথায় দ্বিজ সবর্ণবৃত্তি অনুসারে জীবিকার্জ্জন করিতেন, এবং তথায় উদ্বাহ সংস্কার দ্বারা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক অগ্নিরক্ষা করিয়া স্বীয় বৈদিক শাখার মন্ত্র ও ব্রাহ্মণানুযায়ী সর্ব্বপ্রকার আভ্যুদয়িক যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা ইহ দৈব ও পৈত্র্যলোকত্রয় পরিতৃপ্ত করিতেন। অধিকন্তু অপর আশ্রমত্রয়ও গৃহস্থাশ্রমের উপর নির্ভর করিতেন, সেইজন্য গৃহস্থাশ্রমই মুখ্য আশ্রম গণ্য হইয়া আসিতেছে। গৃহস্থের সকাম যাগ যজ্ঞাদির (আম্নায়স্তক্রিয়ার্থত্বাৎ—জৈমিনী সূত্র) ও আশ্রমের মুখ্যত্ব হেতু ঋক্, যজুঃ, ও সাম

এই বেদত্রয়, যাহাতে গার্হস্থ্য অনুষ্ঠেয় সকাম যজ্ঞ সকল সন্নিবেশিত আছে তাহারা সাধারণতঃ বেদ বা ত্রয়ী নামে পরিচিত হইয়া থাকে। তাহা হইতে ঋগাদি বেদত্রয়ের ব্রাহ্মণভাগে আরণ্যক ও উপনিষদ্ সংযোজিত থাকিলেও উহাদের সকাম যাগ যজ্ঞীয় অংশকে বেদ বা ত্রয়ী বলা যায়।

গৃহস্থের পক্ষে অনূ্যন পঞ্চাশৎ বৎসর স্বীয় আশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়া পুত্রাদির উপর সংসার ভার অর্পণ পূর্ব্বক নিশ্রেয়স ধর্ম্মার্থে অরণ্যাশ্রমের উপদেশ আছে। গৃহস্থাশ্রমে যে নিশ্রেয়স ধর্ম্ম অননুষ্ঠেয় তাহা নহে, তবে সংসারের কোলাহল ও ভার হইতে অপসারিত হইলে ধর্ম্মানুষ্ঠানের কথঞ্চিৎ সুবিধা হয়, সেইজন্য এই উপদেশ ও তদনুসারে অনেকে বনচারী হইতেন। তখন হইতে গৃহস্থের নাম হইত আরণ্যক—ইহাই বানপ্রস্থাশ্রম। আরণ্যকের অনুষ্ঠেয় উপাসনা প্রণালী বেদের যে সকল অংশে ব্যবস্থিত তাহাদের নাম আরণ্যক। প্রত্যেক ত্রয়ী বেদের ব্রাহ্মণভাগের শেষ অংশ আরণ্যক। যথা ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শেষ ভাগ ঐতরেয় আরণ্যক, কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকের শেষাংশ তৈত্তিরীয় আরণ্যক এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণের অন্তভাগ বৃহদারণ্যক। আরণ্যকও গৃহস্থের ন্যায় যজ্ঞসম্পাদন করেন কিন্তু সে যজ্ঞ ঘৃত আজ্য, চরু পুরোডাশাদি দ্রব্য সাহায্যে সকাম অভ্যুদয়াদির জন্য কৃত নহে তাহার উপকরণ প্রাণ। প্রাণের প্রক্রিয়া দ্বারা কামনার অত্যন্ত নিবৃত্তি, দুঃখের চিরশান্তি ও জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনের উদ্দেশ্যে আরণ্যকের যজ্ঞ। গৃহীর যজ্ঞ সকাম ও দ্রব্য সাহায্যে সেইজন্য সেই গুলিকে দ্রব্যযজ্ঞ বলে আর আরণ্যকের যজ্ঞকে প্রাণযজ্ঞ বা প্রাণায়াম কহে।

আরণ্যক সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন অধিকারী হইলে চরম আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেন। পরিব্রাজক কর্ম্মসন্ন্যাস পূর্ব্বক ভৈক্ষ্যদ্বারা দেহ রক্ষা করিতেন ও সমস্ত সময় ব্রহ্মমার্গে অবস্থান করিতেন এইজন্য তাঁহার নাম সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু। তাহার অনুষ্ঠেয় উপাসনা সম্বন্ধে আরুণেয়ী উপনিষদে এইরূপ লিখি আছে—

সর্ব্বেষু বেদেষ্বারণ্যক মাবর্ত্তয়েদুপনিষদ-
মাবর্ত্তয়ে দুপনিষদ মাবর্ত্তয়েৎ।

"সন্ন্যাসী সর্ব্ববেদের আরণ্যক ও উপনিষৎ সকল অবশ্য আবৃত্তি করিবেন।"

অরণ্য বা প্রাব্রাজ্য গ্রহণ না করিলেও কোন গৃহস্থের পক্ষে উপনিষদোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান বাধিত হইত না।

মুক্তিকোপনিষদের মতে ১০৮ খানি উপনিষৎ আছে। তন্মধ্যে ১০ খানি ঋগ্বেদীয়, ১৯ খানি শুক্ল যজুর্ব্বেদীয়, ৩২ খানি কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয়, ও ১৬ খানি সামবেদীয় ও ৩২ খানি অথর্ব্ববেদীয়। উপনিষদ্ গুলি প্রত্যেক ত্রয়ী বেদের অন্তভাগে সংস্থিত ও ইহাতে বেদের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদক চরম উত্তম উপদেশ সমূহ সন্নিবিষ্ট আছে বলিয়া ইহাদের নাম বেদান্ত। অধিকাংশ উপনিষদ্ই ঋগাদি ত্রয়ীর ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত, সংহিতা ভাগে উপনিষদের অংশ অতি অল্প। পুনশ্চ উপনিষৎ সকল ব্রাহ্মণভাগের শেষ ভাগস্থ আরণ্যকের ও অন্তভাগ। উপনিষৎ শব্দটী 'উপ'+'নি' পূর্ব্বক 'ষদ্' ধাতু হইতে ক্বিপ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে ইহার অর্থ আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা। যে (নি) গুরুমুখনিঃসৃতরহস্যবিদ্যা (উপ) আচার্য্যের অতিশয় সমীপ্যে (ষদ্) আগমন করিয়া তাঁহার সেবা সুশ্রুষার দ্বারা অন্তরঙ্গ শিষ্যভাবে শিক্ষা করিতে হয়, যে বিদ্যাদ্বারা মুমুক্ষগণের আত্মা বা ব্রহ্মের (নি) নিতান্ত উপসান্নিধ্যে (ষদ্) আসিয়া (নি) নিশ্চিতরূপে আত্মা বা ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়, অথবা যে পরা বা রহস্যবিদ্যা (উপ) আত্ম বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হেতু (নি) অসংশয়রূপে সংসার-নিদান অজ্ঞান (ষদ্) নাশ বা উন্মূলিত করে সেই আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার নাম উপনিষৎ। (ক্রমশঃ)

বৃদ্ধের বচন।

[শ্রীআত্মারাম শর্ম্মা।]

শ্রাবণ মাস, থেকে থেকে বর্ষার ঝরনা ঝরুচে, কিন্তু তবু গরম ছুটুচেনা। বাতে দেহ খানিকে ত বেশ দখল ক'রে বসেছে,—সোজা হ'য়ে বসুবার শক্তিটি নেই। তাই দিনরাত, ঠিক সটান লম্বা হয়ে প'ড়ে না থাকুলেও তাকিয়াটী ভর ক'রে এপাশ ওপাশ ক'রে দিন কাটাতে হচ্চে। কিন্তু এপাশ ওপাশ ক'রে ঘুমনো হচ্চে, এটা মনে করোনা। এ বয়সে রোগের সঙ্গে যেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হ'য়ে থাকে, তাহা ষোল আনাই হয়েচে, কিন্তু বুড় বয়সের আরামটুকু ভাগ্যে ঘটুবার সুবিধে হয় নি। আমি বুড় হয়েচি বটে, পেটত আর বুড় হয়নি। ভাই-বেরাদর যারা ছিল, তারা ক্রমে ক্রমে জাতিত্ব সম্বন্ধ পেতে তফাৎ হ'য়ে দাড়াচ্ছেন। পুত্তুরটী বউমার কষ্ট দেখ্‌তে না পেরে নিরিবিলিতে শান্তি ভোগ করুচেন্। আর গিন্নি বুড়ী দিনরাত জুতোশেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত করুচেন। যাদের পেলে পুষে মানুষ ক'রেছিলেন, এখন তারা ধরা-ছোঁয়া দিচ্ছে না দেখে, একবারে হতভম্ব হয়ে আচেন। গিন্নি বুড়ীকে ভগবান দুনিয়ার মায়া-মমতা দিয়ে একটী নারীরূপী কদলীবৃক্ষ গ'ড়ে ছিলেন— একবারে সার শূন্য।

যখন এপাশ ওপাশ ক'রে বেফায়দা কসরৎ করি, তখন ঘুমুই ব'লে কেউ মনে ক'রো না। উপরে যে কথাগুলি বল্লুম, মনের ভেতর সে গুলি একটী একটী করে নাচানাচি করে। এদের নানানাচির চোটে অনেক সময় মেজাজটা বিগড়িয়ে যায়। তা দেখে যতীন ভায়া সময় সময় বলেন,—"রাগটা কমিয়ে ফেলুন।" উত্তরে তাঁকে বলি,—'তোমার মত বিরাগী হ'তে পারি কই, ভায়া? তুমি ভগবানের পেছনে যেরূপ দোঁড়াচ্ছ, আমার ত তেমনতর দৌড়াবার বল নেই, কাজেই বিছানায় প'ড়ে প'ড়ে ঐ সকল মন্ত্রই আমাকে জপ্‌তে হয়।

সুবোধ ভায়াকে পেলে মনটা একটু ভাল বোধ হয়; কিন্তু রোব্‌বার ছাড়া ত আর তার সময় নেই, কাজেই তার জন্যে সাতটা দিন সবুর করে থাকৃতেই হয়। এমাসের ৬ই তারিখ রোবুবার সন্ধ্যের একটুকু আগে ভায়া এসে হাজির। 'ঘুমুচ্ছেন নাকি',—ঘর ঢুক্‌তেই সম্ভাষণের এই ভূমিকাটী বল্লেন। জবাব দিলুম—"নিদ্রাদেবীর সঙ্গে সম্পর্কটা দিন দিন খাটটা হ'য়ে আসুচে, ভায়া।"

সুবোধ।—কেন, ঘুম হয় না বুঝি? একটু একটু আফিং অভ্যেস্ করুন না, দাদা।

বৃদ্ধ।—এক সিদ্ধির পয়সাই যোটে না, তার ওপর আবার আফিং।

সুবোধ।—দাদা, আফিঙে কিন্তু বেশ মজা আছে।" ধন্বন্তরির সেই 'কালাচাঁদেরপিনিক' প'ড়েছেন ত?

বৃদ্ধ।—শুধু পড়্‌ব কেন, পিনিকপ্রেয়সীর প্রণয়মত্ত মহাপুরুষকেও দেখেচি! বলি, কালাচাঁদের সংসারতত্বটা সুধু পড়েচ, না বুঝ্‌বার চেষ্টাও একটু করেচ? যদি বুঝে থাকে, তবে এ'বুড় দিনরাত বিছানা সই হ'য়ে এপাশ ওপাশ করে কেন, তাও বুঝ্‌তে পেরেচ। ঐ সংসারতত্বটীর ভেতর যে তুমিও আচ—আমি ও আচি,— আজকালকার দিনে প্রায় সবাই আচেন, সেটী খেয়াল ক'রে দেখেচ কি ভায়া?

সুবোধ।—অতটা খেয়াল কত্তে পারিনি দাদা! তবে নেহাৎ কিছুটা যে না লেগেচে এমন নয়। যা হোক্, ধন্বন্তরিতে, আজ ছ'মাস হ'ল, একটা বিয়ের গপ্প ছাপ্‌তে দিয়েছিলুম, সেটা ছাপা হয় নি।

বৃদ্ধ।—আর ছাই বিয়ের কেচ্ছা ছেপে আর কি হচ্চে বল! সে দিনকার একটা কেচ্ছা শুন্‌বে কি? এ যে তোমাদেরি দুয়োর গোড়ায়।

সুবোধ।—কি কেচ্ছা দাদা, বলুন না শুনি

বৃদ্ধ।—তবে বল্‌চি শোন। নাম কর্‌ব না। এই কালীতলার কাছে চোরবাগানের রাস্তার ধারে একজন কোব্‌রেজের একটী ছেলে আর একটী ভাইপো আছে। দু'টীই বিয়ের যুগ্যি। ছেলেটী বুঝি বি, এ, পড়ে, আর ভাইপোটী তেমন তরই একটা কিছু করে,—সে কথাটা ঠিক্ বল্‌তে পাল্লুম না। আজ দিন্ পনের হ'ল, দর্জ্জিপাড়ার বিপিন সেন তাঁর মেয়েটীর সঙ্গে এই কোব্‌রেজ মশায়ের ছেলেটীর বিয়ের প্রস্তাব কত্তে যান। কোব্‌রেজ মশায় তখন অন্দরে ছিলেন, খবর পেয়ে বৈঠকখানায় এলেন। বিপিন বাবু মনের কথাটী খুলে বল্‌তেই, কোব্‌রেজ মশায় বল্লেন,—'ছেলের বিয়ের জন্য ত আমি এখনো প্রস্তুত হই নি।'

বিপিন।—প্রস্তুত হন নি, কথাটা বুঝ্‌তে পাল্লুম না। আপনি কি ছেলের বিয়ের মাশুল টাশুল নেবেন না?

কোব্‌রেজ।—না সে কথা বল্‌চি না। আমার ছেলের বিয়ে এখন দেব না, মনে করেচি। তবে যদি খুব সুন্দরী ক'নে পাই, তবে দিতে পারি।

বিপিন। আপনার ঘরে কয়টী সুন্দরী আছে মশায়?

কোব্‌রেজ।—আপনি মেয়ের বিয়ের কথা তুলে যে ঢের চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বল্‌চেন দেখ্‌চি।

বিপিন।—আমি ইচ্ছে করে বল্‌চি না মশায়, আপনার ঐ 'খুব সুন্দরী' কথাটায় গলাটিপে বলিয়ে ফেল্‌চে,—মাপ্ কর্‌বেন মশায়।

কোব্‌রেজ।—আপনাকে আর কি কর্‌চি বলুন?

বিপিন।—আচ্ছা আমার একটী আত্মীয়ের একটী সুন্দরী মেয়ে আছে ;-দেখ্‌বেন চলুন।

'আচ্ছা চলুন' ব'লে কোব্‌রেজ মশায় সঙ্গে চল্লেন।

খানিক দূর গিয়ে বল্লেন—"ঐ যা! চস্‌মাটা ফেলে এসেচি। বিপিন বাবুর সঙ্গে একটী লোক ছিলেন, তিনি বল্লেন—'আমি দৌড়িয়ে চস্‌মা এনে দিচ্ছি, বেশীদূর ত আসিনি?"

কোব্‌রেজ মশায় তখন বল্লেন,—'কনে দেখ্‌তে যাচ্ছি, চস্‌মা নাই বা হ'ল।"

'তথাস্তু' ব'লে সবাই ক'নের বাড়ী উপস্থিত হ'লেন। কোব্‌রেজ মশায় অনেক রকম কায়দা ক'রে ক'নে দেখ্‌লেন; চস্‌মা ছিল না ব'লে, যত রকম এক্টিং ক'রে দৃষ্টি শক্তিটা চাঙ্গা হয়, তার কসুর কল্লেন না। শেষ কালে বল্লেন—'বেশ মেয়ে' আমার খুব পছন্দ হয়েচে।'

বিপিনবাবু তখন বল্লেন,—'তবে চলুন দেনা পাওনার কথাটা পাকা ক'রে ফেলা যাক্।"

কোব্‌রেজ।—বলি,—মেয়ের ঠিকুজি খানা এনেচেন ত?

বিপিন।—'এনেচি বই কি। চলুন কোথা দেখাবেন।' উভয়ে চোর্‌বাগানেই একটী জ্যোতিষীর নিকট গেলেন; জ্যোতিষী বল্লেন,—ঠিক মিল্‌বে, কোন গোলমাল নেই।

কোব্‌রেজ মশায় বিপিন বাবুকে সঙ্গে করে বাড়ী এলেন; বিপিনবাবু বৈঠক খানায় বস্‌লেন, তিনি ভেতরে গেলেন। ভেতর থেকে ফিরে এসে বল্লেন,—'গিন্নি একবার ক'নেটী দেখ্‌তে চাচ্ছেন, তার কি হবে?'

বিপিন।—তা বেশ, এখনি আমি একখানা গাড়ী ডেকে আন্‌চি।

কোব্‌রেজ।—তা হবে না, আপনাদের বাড়ীতে দেখা হবে না; আপনার ও আমার উভয়ের জানা কারো বাড়ীতে তিনি দেখ্‌তে যাবেন। বিপিনবাবু বল্লেন,—'তাই হবে'।

উভয় পক্ষের জানা একটী বাড়ী ঠিক হ'ল, পরদিন দেখ্‌তে যাওয়া হবে—সাব্যস্ত হল। বিপিন

বাবু পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে এলেন, তখন কোব্‌রেজ মশায় ডানহাতে মাথাটা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বল্লেন,—'আমার ভাইপোটীর সঙ্গে করুন, আমার ছেলের বিয়ে এখন দেওয়া হবে না ; কারণ, আমার ভাইপোটী ছেলের চাইতে ক'দিনের বড় ; তাকে ফেলে ছেলেটীর বিয়ে দিলে মাঠাকরুণ দুঃখু করবেন ; সেটা ভাল দেখায় না।'

বিপিনবাবু তখন অবাক্‌ হ'য়ে বল্লেন,—সে কি কথা মশায়! আমারা অপনার ছেলের সঙ্গে কত্তে চাচ্ছি, তারি জন্যে এতটা দেখা শুনা হ'ল, এখন আপ্‌নি বল্‌চেন,—ভাইপোর সঙ্গে কত্তে। এ কেমনতর কথা হ'ল? এসব কথা কি আপনার গোড়ায় মনে ছিল না?

কোব্‌রেজ। তা কি জানেন, আমি ত গোড়াতেই ব'লেচি আমি প্রস্তত নই।

বিপিন।—তাত ব'লেছিলেন, কিন্তু তারপরে ত প্রস্তত হ'য়ে দেখাশোনা হ'ল ; এখন আপনি অপ্রস্তুতের ভয় রাখেন না বটে, আমাদের সবাইকে ত অপ্রস্তুত কল্লেন? বলি, ও সব কথা চুলোয় যাক্‌, আপনার সন্ধানে ভাল ছেলে আছে বল্‌তে পারেন?

কোব্‌রেজ।—আছে বই কি? (তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা তিনটী আঙুল দেখাইয়া) বল্লেন,—এই দিকে রাজী আচেন, ত বলুন?

বিপিনবাবু বল্লেন,—'না মশায়, হাজার ডেড়্‌কের ভেতর হয়ত রাজী আছি।"

বুঝ্‌লেত সুবোধ ভায়া, ব্যাপার খানা কি? আমিত ঢের বাদ্‌সাদ দিয়ে বল্লুম, এর চাইতেও অনেক কথা হয়েছিল। এখন বুঝ্‌লে ত, তোম্‌রা বদ্দি কতদূর নেবে গেচ? এতদিন বদ্দি জাতের ভেতর এতটা টাকার খাই ছিল না। খেতে না পেলেও, যে কাজে বদনাম হয়, তেমন কাজ কত্তে যেত না, দুঃখী কাঙ্গালী দেখ্‌লে মুখের গ্রাস থেকে বখ্‌রা দিত। আর এখন দেখ্‌তে পাচ্ছ ত? কোব্‌রেজ মশায় কেমন লুকো-চুরিটা, খেল্‌লেন বুঝলে ত?

সুবোধ।—কোব্‌রেজ মশায়দের গুণে ঘাট নাই। লোকেত বল্‌চে,—যত নষ্টের গোড়া কোব্‌রেজ মশায়রা! আমি কিন্তু দাদা এটা বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। তবে এদের ভেতর যে হিংসা জিনিশটা বেশ পসার জমিয়ে বসেচে, এটা খুব টের পাওয়া যাচ্ছে।

বৃদ্ধ। একথাটা নেহাৎ মিথ্যা ব'লে বল্‌তে পারি না ভায়া! একটা কথা কি জান?—এতদিন পয়সার দিগে এ জাতটার ততটা খেয়াল ছিল না। তার প্রমাণ,—জাতটা গরীব। বদ্দি জাতের ভেতর কয়টা বড় লোক দেখ্‌তে পাচ্ছ ভায়া? রাজা খেতাব পাবার মতন ত একটা লোকও খুঁজে পাবে না। তবে আজকাল যে দু'চার জন খেয়ে দেয়ে একটু সুখে আছে দেখ্‌তে পাচ্ছ, এঁরা 'রায়সাহেব' 'রায় বাহাদুরের' মত নিরামিষ খেতাব পাবার যুগ্যি। এঁরা সেলামী দিয়ে এসব খেতাব চান না। তবে কোব্‌রেজ মশায়রা "মহামহোপাধ্যায়" খেতাবটার জন্যে যেন একটু কেমন কেমন করেন, নয় কি?

সুবোধ। আচ্ছা কোব্‌রেজদের ভেতর এই হিংসাটার মানে কি, দাদা?

বৃদ্ধ। এর মানে শুধু পয়সা নয় ভায়া, খোস্‌নামী ; মাতব্বরী নামটা পাওয়া হচ্চে এর আসল মতলব।

সুবোধ। সেদিন যামিনী কোব্‌রেজের 'আয়ুর্ব্বেদপত্রে' দেখ্‌লুম, প্রমথ তর্কভূষণ লিখেছেন, কোব্‌রেজদের দর্শনী নেওয়ার রীতি ছিল না, এখন সবাই মোটা মোটা দর্শনী নিচ্ছেন ; এটা অন্যায়।

বৃদ্ধ। ও সব তর্কভূষণী বাজে বচন ছেড়ে দেও ভায়া! কোব্‌রেজরা দর্শনী নেবেনা, অষুদের দাম নেবেনা—শুধু খয়রাৎ করবে, এটাও কি কথা ভায়া! এরা পড়ো রাখ্‌বে, তাদের খরচা চালাবে কোত্থেকে? তর্কভূষণ মশায় যে বড় ওস্তাদী ক'রে, সেকেলে কথা টেনে এনে

কোব্‌রেজদের উপর বেশ এক হাত নিলেন,—জিজ্ঞেস ক'রে দে'খো দেখি, টুলো পণ্ডিতদের চাকরী কর্‌বার ব্যবস্থা কোন্‌ যুগে ছিল? ছাত্র পড়িয়ে তাঁর বাপ পিতামহেরা কোন কালে পয়সা নিয়েছেন? আর এখন তিনি কি কর্‌ছেন? বাজে কথায় কাণ দিও না তারা। বল্‌তে গেলে ঢের বল্‌বার কথা আছে। কাজ কি তায়া বৃথা ব'কে।

টীকা-টিপ্পনী।

বিনিময়ে সংবাদপত্রের ও সাময়িকপত্রের আদান-প্রদান একটা চিরন্তন প্রচলিত প্রথা। এই প্রথা অনুসারে আমরা প্রায় যাবতীয় পত্রের সম্পাদককেই বিনিময় প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ধন্বন্তরি পাঠাইয়া থাকি, কিন্তু কেহ কেহ তাঁহাদের কর্ত্তব্যপালন করিতে অবহেলা করিতেছেন। এই অবহেলা তাঁহাদের জ্ঞানকৃত ত্রুটী কি না বলিতে পারি না।

কোন কোন সম্পাদক, এই বিনিময় প্রথাকে সম্মানের লাঘব বলিয়া মনে করেন। যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহাদিগকে এই গৌরবাত্মক পদের যোগ্য বলিয়া মনে করিতে কুণ্ঠা বোধ হয়। তাঁহারা মনে করেন না যে, সকলেরই উদ্দেশ্য এক সাহিত্যচর্চ্চা। এই উদ্দেশ্য সাধনে পরস্পরের সাহচর্য্য একান্ত প্রয়োজন। এই স্থূল কথাটী যাঁহাদের মনে স্থান পায় না, জানিনা, তাঁহারা সাহিত্যসেবী বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য কি না!

নব্যভারত-সম্পাদক প্রবীণ সাহিত্যসেবী পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় বলেন,—সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র যেরূপ অবস্থাপন্নই হউক না কেন,সকলের সঙ্গেই পত্রিকার আদান-প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য; কেননা, সকলেরই উদ্দেশ্য সাহিত্যচর্চ্চা এবং ভাষার পুষ্টিসাধন। আমি যে উদ্দেশ্যে এক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছি, অপরের উদ্দেশ্যও তাহাই; সুতরাং তাঁহাকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করাই সমীচীন। দেশীয় সংবাদপত্রসম্পাদক তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই একথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন!

'প্রবাসী', 'ভারতী' এবং 'সবুজপত্র' সম্পাদকত্রয় সম্বন্ধে বেশী কথা বলিবার নাই; কারণ ইহাঁরা বাঙ্গালাসাহিত্য ও ভাষাসম্বন্ধে এক মনগড়া রাস্তা অবলম্বন করিয়াছেন; ইহাঁদের মতের সহিত সর্ব্বসাধারণের মতের মিল নাই। 'ভারতী' ও 'সবুজপত্র' উভয়েই ঠাকুরবাড়ীর ভাষা দিয়া বাঙ্গালাসাহিত্যের গঠন করিবার প্রয়াসী। 'প্রবাসী'ও ধীরে ধীরে, সেই রাস্তা ধরিয়াছেন! এই অভিনব পন্থার প্রবর্ত্তক খোদ রবিঠাকুর। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, তিনি এই পন্থা প্রবর্ত্তনের প্রয়াস পাইয়া দেশশুদ্ধ লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িতেছেন! তাঁহাকে এরূপ বিড়ম্বিত দেখিয়া আমরা সুখী নহি।

আমরা দেখিতেছি, বিলাতী 'নোবেল-প্রাইজ'ই তাঁহার এরূপ বিড়ম্বনার হেতুভূত! বাঙ্গালা ভাষানভিজ্ঞ ইউরোপীয়েরা বাঙ্গালা-কবির কবিত্বের পরীক্ষা করিয়া রবীন্দ্রনাথকে এসিয়ার রাজকবি বলিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন,—বিলাতী 'নোবেল প্রাইজ' বক্‌সিস্‌ করিয়াছেন! ইহাই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিড়ম্বনার কারণ নয় কি? দেশের লোকে রবীন্দ্রনাথকে এহেন আসনের যোগ্য বলিয়া ত এখনও স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ

তাহা একটীবারও মনে করেন না! তিনি বাঙ্গালা-ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে অধুনা যে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা বাঙ্গালাভাষার উন্নতির ঘোরতর পরিপন্থী বলিয়া দেশময় আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। এজন্যই, 'ভারতী' 'সবুজপত্র' এবং ইহাঁদের পোঁ-ধরা 'প্রবাসী'র প্রতি লোকের তাদৃশ শ্রদ্ধা ভক্তি আর নাই। থাকাও অসম্ভব!

বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, ভূদেব, রাজনারায়ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, দীনবন্ধু, রমেশচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যরথীদিগের ভাষাকে যিনি 'মেকীভাষা' বলিয়া উল্লেখ করিতে লজ্জা অথবা সঙ্কোচ বোধ করেন না, তাঁহার মস্তিষ্ক অবিকৃত আছে বলিয়া স্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না কি? আজ বঙ্কিমচন্দ্র জীবিত থাকিলে রবীন্দ্রনাথের এরূপ ধৃষ্টতা ও অর্ব্বাচীনতা প্রশ্রয় পাইতে পারিত না। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে 'এসিয়ার কবি-সম্রাট' বলিয়া 'নোবেল-প্রাইজ' খয়রাৎ করিয়াছেন, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের দেশীয় কবিকুলের এবং সাহিত্যরথীবর্গের সংবাদ রাখেন না। বাঙ্গলায় যাঁহারা কবি ও সাহিত্যিক বলিয়া যশোলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের গুণপনা যাচাই করাইবার উদ্দেশ্যে ইয়োরোপীয়দের দ্বারদেশে উপস্থিত হন নাই, অথবা উপস্থিত হওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই। সুযোগ বুঝিয়া প্রিন্স দ্বারকা-নাথের পৌত্র এক লম্ফে সমুদ্র ডিঙ্গাইয়া অন্ধকে দর্পণ প্রদর্শনের ন্যায় নিজের কৃতিত্বের ধ্বজা উড়াইয়া ছিলেন!

চতুরতাটুকু এক হিসাবে মন্দ হইয়াছিল না! যদি "মাগো! আমি কি হনু গো"!! ভাবটা মনে মনে পোষণ না করিয়া,—অনুচিত গর্ব্বে স্ফীত না হইয়া ধীর ভাবে চলিয়া যাইবার প্রয়াস পাইতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহার এই বিলাতী সম্মান 'গলগ্রহে' পরিণত হইত না। বিলাত হইতে সঙ সাজিয়া আসিয়া বোলপুরের অভিনন্দন-প্রাঙ্গনে যখন তিনি বলিয়াছিলেন,—"দেশের লোকে তাঁহার গুণের আদর করিল না, কিন্তু বিদেশে তাঁহাকে লুফিয়া লইল," তাঁহার এই অনুচিত আত্মশ্লাঘা-ব্যঞ্জক উক্তি শুনিয়া অনেকেই বলিয়াছিলেন, এখনও বলিতেছেন,—বঙ্গীয় কবি ও সাহিত্যিক-বর্গের মধ্যে তিনি ঐরূপ সম্মানের দাবি করিবার যোগ্য নহেন। ফলে ইহাতেও সর্ব্বসাধারণের দুঃখের কোন কারণ ছিল না; কিন্তু তিনি যে একদমে, ভাষা ও সাহিত্যের গড়া-পেটায় সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবার আশায় হস্ত প্রসারিত করিয়া বসিয়াছেন! এতটা সহ্য করিয়া যাওয়া জনসাধারণের পক্ষে অসম্ভব কথা।

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলে,—কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে সর্ব্বময় কর্ত্তা করিবার যোগ্য মনে করিলে, তাহা বাঙ্গলীর পক্ষে গৌরবের কথা। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশীয়দিগের কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত; সেস্থলে বঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় যদি বাঙ্গালীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়, বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা অতি গৌরবের বিষয় নহে কি? বাঙ্গালীর এহেন সম্মান দর্শনে, যে বাঙ্গালীর অন্তরে ব্যথা লাগে, তাহার ন্যায় স্বজাতিদ্রোহী আর কে হইতে পারে, জানি না! এরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী-সন্তান বলিয়া স্বীকার করিতেও সঙ্কোচ বোধ হয়! কর্ত্তৃপক্ষ গুণগরিমার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়া স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা করিয়া দিয়াছেন বলিয়া 'নায়ক-পত্রের' এতটা গাত্রদাহ কেন হইতেছে, বুঝিতে পারি না।

স্যর আশুতোষ শিক্ষা-দীক্ষা, গুণ গরিমায় বঙ্গের আদর্শ পুরুষ। বিচারাসনে তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী;—মাতৃভাষার প্রতি তিনি নিতান্ত অনুরক্ত,

ইহার উন্নতিকল্পে তিনি একান্ত তৎপর। তাঁহার যত্ন ও চেষ্টাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালাভাষার এতদূর প্রচলন সম্ভবপর হইয়াছে। দেশের অবস্থা সম্যক পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্যে যে প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছিলেন, কর্তৃপক্ষ তাহা অনুমোদন করিতে অনুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। দেশের শিক্ষিত সমাজের স্বাধীনচেতা মনস্বীগণ অকপট চিত্তে তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যপ্রণালীর অনুমোদন করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছেন না। যিনি এহেন গুণসমন্বিত,—যাঁহার ক্ষমতা এতদূর অসীম,—প্রতিভাবান্ ইংরেজ রাজপুরুষগণ যাঁহার বিধি ব্যবস্থার প্রতিকূলাচরণে অসমর্থ, এহেন প্রতিভাবান্ ব্যক্তির দোষ কীর্ত্তন করা বাঙ্গালী সন্তান নায়ক সম্পাদকের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম! তাঁহার বিশ্বাস, স্যর আশুতোষের ন্যায় একজন ক্ষণজন্মা পুরুষের অযথা গ্লানি প্রচারে তিনি বাহাদুর বলিয়া অভিহিত হইতেছেন।

তাঁহার এ ধারণা কিন্তু ভুল। স্যর আশুতোষের তুলনায় নায়কসম্পাদক, একজন 'কীটস্য কীট' বলিয়াও লোকের ধারণায় আসেন না। তাঁহার মনে যদি এরূপ ধারণা থাকে যে, স্যর আশুতোষ 'নায়কের' এরূপ গ্লানিকীর্ত্তনে বিচলিত, সে ধারণাও ভুল। ফলে এ সকল কাগজ আদবে তাঁহার নেত্রগোচর হয় কিনা,—অথবা এ সকল ফেরুপালের চীৎকারে কর্ণপাত করিবার তাঁহার অবসর ঘটে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাহাহউক, সম্পাদকীয় পবিত্র আসনে আসীন হইয়া এরূপ নীতির অনুসরণ করা কিন্তু বিজ্ঞতা অথবা ভদ্রতার পরিচায়ক নহে। তাঁহার মনে করা উচিত যে, দেশীয় বিদেশীয় কোন সংবাদপত্রই যখন তাঁহার চীৎকারের প্রতিধ্বনি করেন না, তখন তাঁহাকে যে সকলে হেয় বলিয়া মনে করে, ইহাই স্বীকার্য্য।

ভারতসচিব মিঃ চ্যাম্বারলেনের পদত্যাগের পর তৎপদে মিঃ মণ্টাগুর নিয়োগবার্ত্তা শুনিয়াও নায়ক-সম্পাদক ঐরূপ চীৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন! তাঁহার এই চীৎকারে, মন্ত্রিসমাজ বিচলিত হইয়া তাঁহাকে উক্ত পদে বরণ করিবেন, অথবা তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রিটিশরাজ সাম্রাজ্য-শাসন-পদ্ধতি প্রণয়ন করিবেন, এরূপ ধারণা কাহারও নাই। নায়ক-সম্পাদক স্বয়ং তাহা মনে করেন কিনা, তাহা আমরা জানি না। তবে মনে হয়, যদি মন্ত্রিসমাজ যদি নায়কের সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধগুলির মর্ম্মগ্রহণ করিয়া সম্পাদক মহাশয়কে ভারতসচিবের পদটী প্রদান করিতেন, তাহা হইলে 'ভূপেন-দাদা' আর 'পাঁচু-ভায়া' একযোগে কালাপানি পারে যাইয়া মালসা-ভোগের ব্যবস্থাটা করিতে পারিতেন; ভূপেনবাবুর শালগ্রাম শিলার প্রতিষ্ঠা কার্য্যটী (White Hall) হোয়াইট্ হলেই চলিতে পারিত, নিত্যসেবার ভাবনাটা ভাবিতে হইত না পূজারি ঠাকুর সঙ্গে থাকিতেন!

নিলফামারী হইতে "একজন কন্যার পিতা" স্বাক্ষরিত একখানি বেনামী পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তিনি পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী বিবাহের সুসংবাদ প্রদান করিয়াছেন,—

১। জলপাইগুড়ি নিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ সেন মহাশয়ের, পুত্রের সহিত করিদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন মুন্সেফ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বর বি, এ পাশ, এবার এম্, এ দিবে, মূল্য ১৫০০৲ টাকা।

২। জলপাইগুড়ি নিবাসী শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার রায় মহাশয়ের পুত্রের সহিত তমলুকের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যার শুভ উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্র বি, এ পাশ, এম্ এ পড়ে, মূল্য কোং ২০০০৲ টাকা।

৩। পাটগ্রাম নিবাসী ফরিদপুরের সবজজ হেমচন্দ্র নিউগী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত সাকরাইল নিবাসী যোগীন্দ্র চন্দ্র নিয়োগী মহাশয়ের বি, এস্ সি পাশ করা পুত্রের বিবাহ হইয়াছে, পাত্রের মূল্য ১০০০৲ টাকা।

৪। নারায়ণ গঞ্জের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দাশগুপ্ত

মহাশয়ের কন্যার সহিত যোগেন্দ্র চন্দ্র সেন মহাশয়ের পুত্রের বিবাহ হইয়াছে; বর বি-এসসি, মূল্য নগদ ১৩০০৲ টাকা মাত্র।

পত্র প্রেরক মহাশয় লিখিয়াছেন,—'সকল পাত্রই বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবক, তাঁহাদের কেহ কেহ হয়ত কলিকাতার বক্তাদিগের বক্তৃতার মোহে বরপণ গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, এখন দেখুন কেমন প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইয়াছে।" আমরা সমাজের অবস্থা যতদূর জানিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাতে এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, শিক্ষিত যুবকেরা এজন্য অনুযোগের ভাজন নহে, অভিভাবক কর্ত্তৃক বাধ্য হইয়া তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এরূপ কার্য্যে রত হইয়া থাকে। আমরা সাকরাইল নিবাসী একটী দরিদ্র বৈদ্যসন্তানের বিষয় অবগত আছি। এই ছেলেটী অন্যের সাহায্যে বি,এ পর্য্যন্ত পাশ করিয়া এখন এম্,এ, ও ল পড়িতেছে, তাহাও অপরের সাহায্যে। ছেলের পিতা সামান্য বেতনে জমীদারের সরকারে চাকরী করেন। কিন্তু তিনি এই ছেলের মূল্য ২০০০৲ টাকা চাহিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই! ছেলে কিন্তু পণগ্রহণে নিতান্ত নারাজ! দোষ কার দিব বলুন?

আজকালকার দিনে দেখা যায়, যে ব্যক্তি একসঙ্গে একশত টাকা কখনও চক্ষে দেখে নাই,—মাসিক ১৫।২০ টাকা যাহার ৫।৭টী পোষ্য সম্বলিত পরিবার প্রতিপালনের একমাত্র সম্বল,—শতগ্রন্থি বস্ত্র ব্যতীত যাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার লজ্জা নিবারণের উপায়ান্তর নাই, বিদ্যাশিক্ষার জন্য যে ব্যক্তি সন্তানকে অপরের অন্নদাস করিতে বাধ্য হয়—এহেন ব্যক্তিও ছেলের বিবাহে হাজার দু'হাজার নগদ, ২০।২৫ ভরি সোণার গহনা চাহিতে সঙ্কোচ বোধ করে না! সাতপুরুষের মধ্যে যাহার সংসারে স্ত্রীলোকের অঙ্গে সোণা স্পৃষ্ট হইবার সুবিধা ঘটে নাই, তাহার মুখে ২০।২৫ ভরি সোণার গহণার কথাটা শুনিলে, অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না কি?" আকাঙ্ক্ষাটা মানুষের নিজের অবস্থানুযায়ী হওয়াই উচিত; অতিরিক্ত হইলেই তাহাকে দুরাকাঙ্ক্ষা বলিতে হয়, তেমন আকাঙ্ক্ষা কখনও পূর্ণ হয় না। আমার পরিবার চিরকাল কাঁচের চুড়ি হাতে দিয়া ছেলের গর্ভধারিণী হইয়াছেন, সে ছেলের বধূকে 'বাউটী সুট' অথবা 'চুড়ি সুট' গহনা পরাইবার সাধ করাটা দুরাকাঙ্ক্ষা নয় কি? তা-ও আবার পরের পয়সায়!!

মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন প্রণীত 'প্রত্যক্ষশারীর' গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া দেখিতেছি, হিতবাদীর পুনরায়, গাত্র-কণ্ডূতি উপস্থিত হইয়াছে। 'শ্রী—' স্বাক্ষরিত প্রেরিতপত্রের ভনিতা দেখিয়া, উহাতে হিতবাদী সম্পাদকের সেই বিট্‌কেল গাত্রগন্ধই অনুভূত হয়, এরূপ অনেকের ধারণা। 'শ্রী—' মহাশয় যাঁটাই হউন, অথবা যবনিকার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া খোদ্ হিতবাদীসম্পাদক মহাশয়ই হউন, এক বৎসর পূর্ব্বেকার কথা সম্ভবতঃ বিস্মৃত হন নাই। সম্পাদক মজকুর 'প্রত্যক্ষশারীর' গ্রন্থের যেরূপ বিকৃত সমালোচনা করিয়াছিলেন, শ্রীরামপুর কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ শাস্ত্রী এম,এ মহাশয়ের প্রেরিত তৎপ্রতিবাদ সম্পূর্ণ প্রকাশ না করিয়া যে প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যজ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে! বৎসরান্তে সেই পুরাতন কাসুন্দী ঘাটিয়া 'কেঁচো খুঁড়িতে সাপ' বাহির করিবার প্রয়াস দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি! নির্লজ্জতারও একটা সীমা থাকা দরকার।

গতবারে এই ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া বৈদ্যান্ন-প্রতিপালিত ভৃত্য হিতবাদীসম্পাদক বৈদ্যজাতির বাপান্ত করিতে ক্রুটী করেন নাই। হিতবাদীর

স্বত্বাধিকারী কবিরাজ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় চক্ষু বুজিয়া তাহা সহ্য করিয়া গিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত এ বিষয়ের আলোচনা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন,—'তিনি তাহা জানেন না।' কবিরাজ উপেন্দ্রনাথের সহিত অল্প-বিস্তর সম্পর্কে সম্পর্কিত, হাইকোর্টের উকীল এবং বিদ্বৎ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত বি, এল মহাশয়ের নিকট কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, তিনি এ সম্বন্ধে যতীনবাবুর সমক্ষে অনুসন্ধান করিবেন। যতীনবাবু প্রায় ৬মাস যাবৎ চেষ্টা করিয়াও কবিরাজ উপেন্দ্রনাথের অবসর দেখিতে পাইলেন না! এই কতিপয় পংক্তি কবিরাজ মহাশয়ের নেত্রগোচর হইলে, তিনি একটু 'অবসর' পাইবার ব্যবস্থা করেন কি না, আমরা তাহার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

সবিনয় নিবেদন।

বিদ্বৎসভার মফস্বলস্থ যে সকল সভ্যের নিকট চাঁদা, এবং ধন্বন্তরির গ্রাহকের নিকট বার্ষিক মূল্য বাকী পড়িয়াছে, আমরা তাঁহাদের নামে ক্রমে ক্রমে ভিঃ পিঃ করিতে বাসনা করিয়াছি। যে সকল গ্রাহকের নিকট দুই বৎসরের মূল্য বাকী পড়িয়াছে, তাঁহাদের নিকট এক বৎসরের মূল্য ভিঃ পিঃ করিব। সভ্য ও গ্রাহকগণ দয়া করিয়া ভিঃ পিঃ গ্রহণ পূর্ব্বক উপকৃত করিবেন। কাগজের দুর্ভিক্ষের বাজারে অনেক কষ্টে ধন্বন্তরি প্রকাশ করা হইতেছে। গ্রাহকগণ এসময় দয়া করিয়া স্ব স্ব দেয় পরিশোধ করেন, ইহাই সানুনয়ে নিবেদন। এস্থলে আরও একটী কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। আমরা অনেক যত্ন ও চেষ্টায় বঙ্গের নানা স্থানবাসী বৈদ্য সন্তানগণের নাম সংগ্রহ করিয়া প্রথম হইতেই ধন্বন্তরি পাঠাইয়া আসিতেছি, তাঁহারাও ফেরৎ না দিয়া বরাবর গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। অনেকে মেম্বর হইয়াছেন, অনেকে গ্রাহকরূপে বার্ষিক মূল্য দিয়াছেন। যাঁহারা ফেরৎ দেন নাই, মূল্যও দেন নাই, তাঁহাদিগকে গ্রাহক বলিয়া গ্রহণ করা অসঙ্গত নহে। ক্রমে তাঁহাদের নিকটেই ভিঃ পিঃ পাঠাইব।

বিনীত
শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন, বি, এল
কার্য্যাধ্যক্ষ।

ধন্বন্তরি

মাসিক পত্র।

২য় বর্ষ, } ভাদ্র, ১৩২৪, ইং ১৯১৭ আগষ্ট, সেপ্টেম্বর, { ১১শ সংখ্যা

চৈতন্য।

[শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় ব্যাকরণতীর্থ।]

চেতনা জড়িত চেতনা দীপিত
তুমি গো চেতনাময়,—
তব চেতনায় নিখিল চেতন
অচেতন কেহ নয়।
আলোক-আঁধার অরুণ-আলোকে
অবনী গো আলোকিত,
তেমনি তোমার চেতনা কণায়
সচেতন ত্রিজগত।

চেতনা দানিছ অখিল অবনী
গাহে তাই তব নাম,
করুণা করিয়া দাওহে ভরিয়া—
চেতনা, চেতনধাম!
তব চেতনার প্রতিচ্ছায়া লভি
সচেতন আজি আমি।
অনাবিল তব চেতনার রাশি
দাও হে চেতন-স্বামী॥

আমার দেশ।

[শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় ব্যাকরণতীর্থ]

ঐ গো আমার দেশ,—
ঐ চলে যায় উজল রবি,
আমার দেশে তুল্‌তে ছবি,
ঐ যে সুনীল সাগরপারে
ঐ যেখানে শেষ,—
ঐ গো আমার দেশ।

ঐ—আঁধার-ঘেরা সীমার শেষে
আলোক-ভরা দীপ্তি হাসে,
পুলক-ধারা যাচ্ছে ভেসে,
উজল মোহন বেশ।
ঐ গো আমার দেশ।

ঐ—নিত্য নবীন শোভায় ঘেরা,
হর্ষে-গীতে গন্ধে ভরা,
ঐ শুনা যায় আস্‌ছে ভাসি
মধুর গীতের রেশ।
ঐ গো আমার দেশ॥

ঐ—ঘরে ঘরে আস্‌ছে শুনি,
বেণু-বীণা বংশীধ্বনি,
সুললিত লহর-মালায়
ভাস্‌ছে ভাবাবেশ,
ঐ গো আমার দেশ।

ঐ—উল্লাসে আর মহোৎসবে,
মুখরিত মধুর রবে,
কম্পনে কম্পনে ছুটে
বিশ্বব্যাপি রেশ,
ঐ গো আমার দেশ।

ঐ—সদাই ভাতে বিমল রাগে,
কতই কথা মনে জাগে,
ঐ সুদূরে পার কররে
সয়না দেরীর লেশ,
ঐ গো আমার দেশ।

নাপিত বৌ।

[শ্রীবিমানবিহারী গুপ্ত।]

(১)

"ওমা! সে কি কথা! বউভাতে কিছু বাড়াবাড়ি কত্তে পার্‌বেনা, যা নৈলে নয়, তার চেয়ে বেশী কিছু কত্তে পার্‌বে না ব'লে ছেলে বেয়ারা আবদার ধরেচে" বলিয়া হরেন্দ্রের জননী বৃদ্ধা শাশুড়ীর নিকট পুত্রের বে-আদবীর কাহিনী কীর্ত্তন করিতে বসিয়াছেন।

বৃদ্ধা বলিলেন,—"হরেন ত তেমন ছেলে নয় যে, এতটা বে-আদবী কর্‌বে। জিজ্ঞেস ক'রে দেখ, অবিশ্যি এর ভেতর একটা কিছু আচে।"

"আপনি ত হরেনের দোষ কখনি দেখ্‌তে পান না। ছেলে বেলা থেকে আপনার আদর পেয়েই ত ছেলে এমনতর হ'য়েচে আমার যেম্‌নি কপাল তেম্‌নি হয়েচে, আপনাকে দোষ দিলে কি হবে', বলিয়া হরেন মাতা অঞ্চলে চক্ষের জল মুছিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ তাহা দেখিয়া বলিলেন,—"একি তোমার অনাছিষ্টি-অলক্ষুণে কাণ্ড গা! কাল বেটা-বৌ ঘরে এসেচে, আজ ফুলশয্যে, বাড়ীতে দশজন কুটুম-সাক্ষেৎ এয়েচে, তাদের নিয়ে আহ্লাদ আমোদ কর্‌বে, না তুমি বেটার কথা নিয়ে আমার কাছে কাঁদ্‌তে বস্‌লে!"

"আপ্‌নি কি বল্‌চেন মা? ছেলের কথায় যেন আমার সর্ব্বাঙ্গে আগুণ ছড়িয়ে দিয়েচে। আমার সাত নয়, পাঁচ নয়, একটা ছেলে; তার বিয়ে,—মনের সাধ মিটিয়ে দশজন কুটুম-সাক্ষেৎ নিয়ে আহ্লাদ কর্‌বো, তা ছেলে বল্‌চে কিনা, কিছু বাড়াবাড়ি কত্তে পার্‌বে না।"

"কি জানি বউমা তোমার কেমন কথা! দেশ শুদ্ধ লোকের মুখে হরেনের প্রশংসা ধরে না, সবাই বলে,—কুড়ি বছর পার হ'তে না হ'তে চারটে পাশ দিয়েচে, বদ্দি জাতের ভেতর এমনতর ছেলে খুব কম আচে।' আর তোমার কাছেই আজ ওর নিন্দে শুন্‌তে পেলুম" বলিয়া বৃদ্ধা হরেনের জননীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন।

'আমার ওপর রাগ কল্লে কি হবে মা? ছেলে যা বল্লে, সে কথা শুন্‌লে যে দুনিয়া শুদ্ধ লোক না চ'টে থাক্‌তে পারে না। কর্ত্তা শুন্‌লে না জানি কি বলেন।' হরেনের জননীর নাম প্রিয়ম্বদা।

বৃদ্ধা। বলি, হরেন একথাটা কেন বলেচে, তার খবরটা নিয়েচ কি? না, কেবল তার ঐ কথাটা শুনেই আকাশ পাতাল গড়্‌তে সুরু করেচ।

প্রিয়। সব্‌টা না শুন্‌লেও, একবারে যে কিছুটা না শু'নেচি এমন নয়।

বৃদ্ধা। যে টুকু শুনেচ, তাই বল দেখি?

প্রিয়। বিয়ের সময় সেখানে নাকি টাকা কড়ির কথা নিয়ে কি একটু গোলমাল হ'য়েছিল। তা' আমি সব্‌টা ভাল ক'রে শুন্‌তে পাইনি।

বৃদ্ধা। কথাটা ষোল আনা বুঝ্‌তে পারবার আগেই যে, একবারে কেঁদে কেটে দুনিয়া তোল পার ক'রে নিতেছ দেখ্‌চি! তোমারি ত ছেলে, আমি না হয় আদর ক'রেই অপরাধ করেচি। ব্যাপার খানা কি, আগে বুঝে নেও, তার পর কান্নাকাটা যা হয় ক'রো। কান্নার সময় ত আর ফুরিয়ে গেল না, কিন্তু আজকার দিনে যে শুভকাজটী হবার কথা, তা' আজ ছাড়া আর কখনো হবার নয়।

প্রিয়। ঘাট হয়েছে মা আমার, ঘাট হয়েচে।

বৃদ্ধা। তোমার আর ঘাট হবে কেন, ঘাট হয়েচে আমারি, তোমার ছেলেকে আদর দিয়ে মাটী ক'রেচি যে! যাও, ঐ শাঁক বাজাচ্ছে যে, ফুলশয্যের তত্ত্ব এলো বুঝি, দেখে শু'নে তু'লে নেও গে।

(২)

বিনোদবিহারী সেনের নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কোন গণ্ডগ্রামে। হরেন্দ্র তাঁহার একমাত্র পুত্র। পুত্রটী এম্, এ পাশ করিয়া ল পড়িতেছে।

প্রিয়ম্বদা বিনোদবিহারীর স্ত্রী। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা ব্যতীত সংসারে আর কেহই নাই। মনোরমা নাম্নী তাঁহার কন্যা হরেন্দ্রের জ্যেষ্ঠা, তাহার বিবাহ হইয়াছে।

বিনোদের পিতা কবিরাজী করিয়া বেশ দু'পয়সা সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন। বিনোদ তাহা সুদে খাটাইয়া বেশ সুখস্বচ্ছন্দেই আছেন। ইহা ছাড়া, নিজে জাতীয় ব্যবসা অবলম্বন করিয়াও দুপয়সা উপার্জন করেন। ফল কথা, সংসারে তাঁহার অনাটন নাই।

বিনোদের জননীর বয়স সত্তরের উপর, তাতে রোগগ্রস্তা। একমাত্র পৌত্র হরেনের বধূর মুখ দেখিয়া গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়, এই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া নিয়তই বিনোদকে বলেন, "শিগ্‌গির হরেনের বিয়ে দে, আমি বউয়ের মুখ দেখে মরি।"

পাশাপাশি গ্রামে শ্যামলাল গুপ্তের বাস। তাঁহার একটী সুন্দরী কন্যা ছিল। বিনোদ তাহারই সঙ্গে হরেনের বিবাহ স্থির করিলেন। শ্যামলাল কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বারিষ্টারের বাবু, বেতন ৮০৲টাকা। তাঁহার ছেলে মেয়ে অনেক গুলি; বেতন, এবং উপরি যাহা কিছু পান, তদ্দ্বারা কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। লোকের একটা ধারণা ছিল, শ্যামলালের পিতার অনেক টাকা ছিল, পিতার মৃত্যুর পর শ্যামলাল সে গুলি পাইয়াছেন। পাছে লোকে টের পায়, এজন্য কায়ক্লেশে দিন গুজরাণ করেন। ফলে পৈত্রিক ত্যজ্য অর্থ যাহা তিনি পাইয়াছিলেন, তাহা লোকে টের পাইবে আশঙ্কায় ঘরেই রাখিয়া দিয়াছিলেন। এমন ভাবে রাখিয়াছিলেন যে তাঁহার গৃহিণী পর্য্যন্ত তাহা জানিতেন না। সেবারকার দামোদরের বন্যায় যখন দেশ ভাসিয়া যায়, তখন শ্যামলালের ঘরবাড়ীও ভাসিয়া গিয়াছিল, অতি কষ্টে ছেলেপুলে লইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন মাত্র, আর কিছুই রক্ষা পাইয়াছিল না।

বিবাহের প্রস্তাব যখন স্থির হয়, তখন বিনোদ বাবু বেশ সরলতাই দেখাইয়াছিলেন; পণ-যৌতুক সম্বন্ধে কোন রূপ দাবি-দাওয়া না করিয়া শ্যামলালকে এই মাত্র বলিয়াছিলেন,—'দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া আপনি যাহা দিবেন, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকিব। আপনি বিবেচক লোক, বনেদী ঘরের সন্তান, আপনার সঙ্গে আবার একটা কথা কি।'

শ্যামলাল মনে করিলেন,—বিনোদ বাবু বনেদী ঘরের ছেলে, দু'পয়সার সঙ্গতি আছে, তা ছাড়া একটী পুত্র বই আর তাঁহার কেহ নাই, পুত্রটীও মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং অর্থলিপ্সা তাঁহার না থাকিবারই কথা। তিনি যেন হাতে আকাশ পাইলেন। বিবাহের দিন স্থির করিয়া সমস্ত যোগাড় করিলেন; বরাভরণ, ক'নের গহনা প্রভৃতি যাহা আয়োজন করিলেন, বলিতে গেলে, তাহা তাঁহার তাৎকালীন অবস্থা অতিক্রম করিয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন, বিনোদ বাবু যখন নগদ কিছু গ্রহণ করিলেন না, অন্যান্য সম্বন্ধেও যখন কোন কথা বলিলেন না, তখন নিজের শক্তির অতীত হইলেও যৌতুক ও গহনায় প্রায় সহস্রাধিক টাকা ব্যয় করিলেন। তিনি ইহাতে ঋণগ্রস্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মনে কোনরূপ অসন্তোষের ভাব জন্মিয়াছে বলিয়া কেহ অনুমান করিতে পারিল না।

বন্যায় বাড়ীঘরের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছিল, কোন প্রকারে নিজেদের বাস করিবার মত কয়েকখানি অস্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বিবাহ উপলক্ষে তেমনি আরও কয়েখানি ঘর প্রস্তুত করিলেন। বরযাত্রী কত আসিবে, এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। বিনোদ বাবু জানাইলেন,—৪০।৫০এর বেশী নয়। শ্যামলাল একটু আতঙ্কিত হইলেন। কিন্তু নগদ টাকা যখন দিতে হইল না, তখন একথায় কোন কথা বলা সঙ্গত মনে করিলেন না, যথাসাধ্য তাহার ব্যবস্থায় রত হইলেন।

(৩)

গোধূলি লগ্নে বিবাহ, বেলাবেলি বর আসিবে, রাত্রি প্রায় ৮টা, তবু বর আসিয়া পৌঁছিতেছে না দেখিয়া, শ্যামলাল নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। এতটা নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে আসিতে অনুচিত বিলম্ব হওয়া—বিশেষতঃ বিবাহক্ষেত্রে,—আশঙ্কা হওয়া অস্বাভাবিক নহে। দেখিতে দেখিতেই বর আসিয়া পৌঁছিল। সঙ্গে প্রায় শতাধিক বরযাত্রী দেখিয়া শ্যামলালের মাথা ঘুরিয়া গেল, স্থানের অভাব ও দ্রব্যসম্ভারের অল্পতা তাহাকে হতবুদ্ধি করিয়া ফেলিল। অর্থের সচ্ছলতা থাকিলেও পল্লিগ্রামে ব্যবস্থার অতিরিক্ত দ্রব্য-সম্ভার সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য, বিশেষতঃ রাত্রিকাল।

দুই দিন পরে শ্যামলালের প্রতিবেশী এক জ্ঞাতি-কন্যার বিবাহের দিন ছিল। তিনি শ্যামলালকে বিপন্ন দেখিয়া উপস্থিত অভাব পূরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। শ্যামলাল আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তির আশা পাইলেন।

গোধূলি লগ্ন অতিবাহিত হওয়ায় রাত্রি ১০টার পরবর্ত্তী লগ্নে বিবাহের উদ্যোগ হইল। বিবাহক্ষেত্রে বর উপস্থিত হইলেন, বরকর্ত্তা বিনোদবাবু বরযাত্রীগণ সমভিব্যাহারে বিবাহ সভায় আসীন হইলেন।

সভাস্থলে বরাভরণ ও যৌতুকাদি দেখিয়া বিনোদ বাবু বলিলেন,—'আমি আজকালকার প্রচলিত প্রথামত পণ ও যৌতুকের কোনরূপ দাবি দাওয়া করিনি বটে, কিন্তু তা'বলে আপনার এরূপ সামান্য বরাভরণ ও যৌতুকের ব্যবস্থা করা উচিত হয়নি। জানি না, গয়না সম্বন্ধে আপনি কিরূপ ব্যবস্থা করেছেন। আমার ইচ্ছা, সম্প্রদানের পূর্ব্বে গয়নাগুলি একবার দেখি।'

শ্যামলাল কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। ছাঁদলাতলায় বর, পুরহিত ক'নে আনিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন, শ্যামলাল সম্প্রদান করিবার জন্য আসন পরিগ্রহ করিয়াছেন, এরূপ সময়ে গহনা দেখাইবার কথা! স্তম্ভিত হইবার কথা বই কি!

শ্যামলাল গললগ্নীকৃতবাস হইয়া বলিলেন,—'বিনোদ বাবু! আমার যথাসাধ্য দশজনের পছন্দ মত গয়না গড়িয়েছি; ইহাতে আমার প্রায় হাজার টাকার ওপর পড়েচে। গয়না এখন ক'নের গায় আছে। ক'নে এখন এখানে আনা হবে, এ সময়ে তার শরীর থেকে গয়নাগুলি খুলে আনা, শুধু দৃষ্টিকটু নয়, কতকটা অমঙ্গলব্যঞ্জক। আপনি পরেও ত দেখ্‌তে পাবেন, অথবা ক'নে এখানে আনা হ'লেও তার গায়ে তাহা দেখ্‌তে পাবেন।'

বিনোদ। তখন দেখ্‌লে কি হবে? ক'নে পাত্রস্থ হ'লে ত সব মিটেই গেল, তখন আর কোন কথা খাট্‌বে কি?

শ্যাম। সে কি কথা মশায়! ছাঁদলাতলায় বর-ক'নে এনে কি আবার কোন নূতন কথা হবে নাকি?

বিনোদ। আমি ত আপনাকে এতক কোন কথাই বলিনি, তার আর নূতন পুরাতন কি? আপনাকে বিশ্বাস ক'রে যা বলেছিলুম, তা ঠিক হয়েচে কিনা, সেটাই একবার দেখা। কি বলেন পুরুত ঠাকুর?

পু। তা, ক'নে ত এখনি এখানে আস্‌চে, তখন দেখে নেবেন। এখন আর ঐ সব কথা তু'লে লগ্নটা বাদ করা ভাল দেখায় না।

বিনোদ। ভাল তাই হোক।

ক'নে সভাস্থ হইল। বিনোদ বাবু ক'নের পরিহিত গহনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই বলিলেন,—"একি গয়না দেওয়া হয়েচে! আজকাল হাড়ী বাগদীর ঘরের মেয়ের বিয়েতেও যে এর চেয়ে ঢের বেশী দিয়ে থাকে। শ্যাম বাবু! আপনার সঙ্গে সরল ব্যবহার করেচি ব'লে কি, তার প্রতিফলটা এই হ'ল? যাক্ যা হবার হ'য়েচে, আমি এখানে ছেলে বিয়ে দেব না, এখনি বর নিয়ে চ'লে যাব', বলিয়া হরেনের হাত ধরিয়া তুলিতে উদ্যত হইলেন! তাঁহারই সঙ্গীয় পরামাণিক তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল,—"ছি! এমনতর কত্তে কি আছে, মশায়! ভদ্দরলোকের জাত যাবে যে!"

বিনোদ। এমনতর বিশ্বাসঘাতকের জাত যাওয়াই উচিত। ইনি আমার সঙ্গে যে ভাল ব্যবহার কর্‌বেন, মুখপাতেই তা বোঝা গেচে। এর প্রতিকার এখন না হ'লে ত আর তা'হবার যো নেই।' তাই বল্‌চি, শ্যাম বাবু! আপনি যদি গহনার বাবত আর পাঁচশ' টাকা এবং বউভাতের খরচার বাবদ আড়াইশ' মোট ৭৫০৲ টাকা না দেন, তা হ'লে সম্প্রদান হতে দেব না।

শ্যাম। সে কি মশায়! আমি সম্প্রদান কত্তে বসেছি, শালগ্রাম শিলের সাম্‌নে মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে শুভকার্য্যে ব্রতী হয়েচি, এখন আপ্‌নি বল্‌চেন, ৭৫০৲ টাকা না হলে সম্প্রদান কত্তে দেবেন না, বর নিয়ে চলে যাবেন! আমি এই নারায়ণ এবং ব্রাহ্মণমণ্ডলীর সাক্ষাতে শপথ ক'রে বল্‌চি,—বন্যায় আমার যথাসর্ব্বস্ব গিয়েচে, বাকী যা ছিল, তা সমস্ত বিক্রী ক'রে এ কার্য্যে ব্রতী হ'য়েচি, আমার আর কিছু বল্‌তে, কিছু নেই। গিন্নির হাতের নোয়াগাছটী ফুলশয্যার তত্ত্বের জন্য বাকী আছে মাত্র। এ মাসের মাইনে না পেলে কাচ্চাবাচ্চা-গুলির পেট চালাবারও সম্ভাবনা রাখিনি। এখন আমি সাড়ে সাত শ' টাকা কোথায় পাই বলুন? আপনি দয়া করে আমায় সাহস দিয়ে ছিলেন বলেই আমি এতটা কত্তে পেরেচি, নচেৎ এখন আমার বিয়ের কথা মুখ দিয়ে বের কত্তেও ভরসা হত না। আমি আপনার পায় ধ'রে বল্‌চি, আমার জাত-মান রক্ষা করুণ।

বিনোদ। এখন দিতে না পারেন, হ্যাণ্ডনোট লিখে দিন, পরে দেবেন;—কি বলেন, পুরুৎ ঠাকুর?

পুরু। এর ভেতর আমাদের কোন কথা বলা চলে না মশায়। বিনোদ বাবু রাগ্ করবেন না,—আপনাদের এ সকল কথা গোড়াতেই মেটান উচিত ছিল, ছাঁদলাতলার জন্য কি আর এসব বাকী রাখ্‌তে আছে? দেখতে পাচ্ছি, এ লগ্নটাতেও আপনারা শুভকার্য্য হ'তে দিচ্ছেন না!

শ্যাম। আচ্ছা আমি হ্যাণ্ডনোট লিখে দিচ্ছি, তবু শুভ লগ্নে কাজটা হ'য়ে যাক্।

বিনোদ। টাকা না দেওয়া পর্য্যন্ত শত করা ২৲ টাকা হারে সুদ দেবেন, এ কথাটা লিখে দিতে হবে।

শ্যাম "যে আজ্ঞে" বলিয়া হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিলেন, শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। বরযাত্রীসহ বরকর্ত্তা প্রীতিভোজনে গেলেন।

(৪)

স্থানের সঙ্কীর্ণতা বশতঃ বরযাত্রীগণের আহারের ব্যবস্থা একবারে হইতে পারিল না। বরকর্ত্তা বিনোদবাবু তাঁহার আত্মীয়-অন্তরঙ্গ জনকতক লইয়া বসিলেন, হরেন্দ্র তাহার সহপাঠী জনকতক কলেজের ছাত্রসহ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। বিনোদ বাবু হরেন্দ্রকে বসিতে অনুরোধ করিলে, তাহার সহপাঠী একজন বলিল,—"আমরা হরেন্দ্রকে নিয়ে এক সঙ্গে বস্‌ব।"

শ্যামলাল একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—"আমার দুর্ভাগ্য, নৈলে আপনাদিগের এই কয়-জনকে এক সঙ্গে বসাবার সামর্থ্য আমার হ'লো না।" হরেন্দ্রের সহপাঠীগণ নিতান্ত বিনীতভাবে বলিল,—'শ্যামলাল বাবু—আপনি লজ্জিত হবেন না। আপনার অবস্থা আমরা বেশ বুঝ্‌তে পেরেচি, বুঝ্‌তে পেরে মর্ম্মাহত হয়েচি। মেয়ের বাপ হওয়া মহাপাপ, তা' আমরা আজ বেশ বুঝতে পেরেচি। আমরা যে কয়জন রয়েচি, আপনার নিমন্ত্রিত সকলের খাওয়া হ'লে বস্‌ব। আমরা অভুক্ত থাক্‌লে আপনার সৌজন্যের কোনরূপ অপলাপ ঘটবে, আপনি এরূপ মনে কর্‌বেন না।

বিনোদ বাবু হরেন্দ্রের সহপাঠীগণের ব্যবহারে যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন। বিশেষতঃ হরেন্দ্রকে পংক্তিতে বসিতে না দেখিয়া তিনি একটু বিরক্তি বোধ করিয়াছিলেন বলিয়াই অনুমান হইল। তিনি বলিলেন,—'আজ কালকার ছেলেরা যতই লেখা-পড়া শেখে না কেন, তারা ঘোড়া ডিঙিয়ে

ঘাস খাওয়া'টা যেন একটু বেশী অভ্যেস করে! অনেক স্থলেই দেখা যায়, মুরুব্বীদের মতের উল্‌টা চল্‌তে তারা দোষ ব'লে মনে করে না। এজন্যেই অনেকে ব'লে থাকেন, ইংরেজীবিদ্যের প্রচলনে সমাজটা উচ্ছন্ন যাচ্ছে।

হরেন্দ্রের সমপাঠীরা সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত, সুতরাং বিনোদবাবুর মন্তব্যটী তাহাদের প্রাণে আঘাত করিল। তাহাদের মধ্যে একজন বিনোদ বাবুর মন্তব্য উপলক্ষ করিয়া ব'লিল,—"মশায়! হরেন্দ্র আমাদের সহপাঠী, আপনি তার পিতা, সুতরাং আমাদেরও তত্তুল্য। অপনার সহিত কোন বিষয় অবলম্বনে বাদানুবাদ করা আমাদের পক্ষে ঘোরতর ধৃষ্টতা। কিন্তু আপনার মন্তব্যে ইংরেজী শিক্ষার যে দোষ দেখান হ'ল, সে সম্বন্ধে আমার কিছু বল্‌বার আছে, আমার ধৃষ্টতা মাপ কর্‌বেন।'

সন্তানের পিতা-মাতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শিক্ষক ; পিতা মাতার দৃষ্টান্তে সন্তানের চরিত্র গঠন হয়, এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এজন্যই দুক্রিয়াসক্ত জনকজননীর সন্তান প্রায়ই দুক্রিয়াসক্ত হ'য়ে থাকে। অন্য কথা দুরে থাক্, আজ কাল বর-পণ ও যৌতুক উপলক্ষ ক'রে পুত্রের পিতা যেরূপ নিষ্ঠুর নীতি অবলম্বন করে থাকেন, প্রত্যেক পিতার সন্তান যদি তাঁর অনুকরণে নিজ নিজ চরিত্র গঠন কর্‌তে যায়, তা হ'লে সমাজের অবস্থা কিরূপ হবার সম্ভাবনা, বোধহয় বিশেষ ক'রে বুঝিয়ে বল্‌তে হবে না। আমায় ক্ষমা কর্‌বেন,—আজ আপনি সামান্য অর্থের জন্য শ্যামলাল বাবুর প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্‌তে কুণ্ঠা বোধ কর্‌লেন না, হরেন্দ্র যদি এই প্রকৃতি অনুকরণ করে, তা'হলে হরেন্দ্রের মনুষ্যত্ব রক্ষা পাবে ব'লে কেউ বিশ্বাস কর্‌তে পারে কি ?

বিনোদ। পিতার মতের প্রতিকূলাচরণ করাটা কি শিক্ষার গুণ বল্‌তে হবে ?

সহপাঠী। অন্যায় কাজে প্রতিকূল আচরণ কর্‌লে তাকে শিক্ষার গুণ ব'লেই স্বীকার কর্‌তে হয়। অন্ততঃ আমি ত স্বীকার করি।

বিনোদ। বাছা, এতদিন কিন্তু সে পদ্ধতির প্রচলন ছিল না। তোমাদের আমলেই তাহা শিক্ষার গুণ ব'লে চ'লে যাচ্ছে। এতকাল,—ভাল হ'ক মন্দ হ'ক, পিতা যেরূপ ক'রে গেচেন, পুত্র তার অনুসরণ করেচে।

সহপাঠী। আপনি নিজে ত তা কর্‌চেন না! আপনি কি বল্‌তে পারেন,—আপনার বিয়ের সময় আপনার পিতা, পণ-যৌতুক অথবা গয়নার ফর্দ্দ দিয়ে আপনার শ্বশুরকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলিয়াছিলেন ?

বিনোদ। তখন এ রীতির চলন ছিল না।

সহপাঠী। তা'হলেই আপনি স্বীকার কর্‌তে যাচ্ছেন যে, আপনার পিতার আমলে যা ছিল না, আপনি তা কর্‌চেন, কাজেই আপনার পিতার মতের প্রতিকূলাচরণ করা হ'ল। আপনি মনে রাখ্‌বেন, অনেক ছেলের পিতা আজকাল ছেলের শিক্ষার দোহাই দিয়ে কন্যার পিতার প্রতি অমানুষিক অত্যাচার ক'রে থাকেন ; কিন্তু ইহাতে যে ছেলেরা সুখী, এরূপ মনে কর্‌বেন না। এখন হিন্দুসন্তানের স্বাভাবিক পিতৃভক্তি আছে ব'লে এসকল গর্হিত কার্য্য চ'লে যাচ্ছে। আর কিছুকাল এরূপ অত্যাচার চল্‌লে, এই পিতৃভক্তি টেক্‌বে ব'লে মনে হয় না। যাদের হৃদয় আছে, তারা কয়দিন নিষ্ঠুরতার প্রশ্রয় দিতে পার্‌বে ?

বিনোদ। তোমরা আমার কার্য্যে কি নিষ্ঠুরতা দেখিলে ?

সহপাঠী। আমায় ক্ষমা কর্‌বেন,—আপনার কার্য্য শুধু নিষ্ঠুরতা নয়, ডাকাতি!—বর তু'লে নিয়ে যাবার ভয় দেখিয়ে হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নেওয়া অপেক্ষা অত্যাচার আর কি হ'তে পারে? আপনার মতন মুরুব্বীদিগের জানা উচিত যে, যাদের হৃদয়ে এ সকল অত্যাচার

প্রবেশ কর্‌বার অবসর ঘটে নাই, তারা এসকল ব্যবহার দেখে বিচলিত না হ'য়ে পারে না। ভক্তি-শ্রদ্ধার দোহাই দিয়ে মানুষ কতক্ষণ বিবেকের প্রতিকূলে কার্য্য কর্‌তে পারে? হরেন্দ্র আপনার পুত্র হলেও তার হিতাহিত বিবেচনা, কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য জ্ঞান সম্বন্ধে আমরা সহপাঠী যতটা জানি আপনি ততটা জানেন না। শ্যামলাল বাবুর প্রতি আপনার দুর্ব্যবহার যে তার হৃদয়ে,—শুধু তার কেন, আমাদের হৃদয়েও আঘাত করেচে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আজ যদি কল্‌কাতায় এরূপ দৃশ্য আমাদের চোখে পড়্‌ত, তা হ'লে শ্যামলাল বাবুকে হ্যাণ্ডনোট লিখে দিয়ে আপনার কবল হ'তে উদ্ধার পেতে হ'ত না। মনের আবেগে কর্ত্তব্যের পীড়নে আপনাকে অনেকগুলি কথা বলে ফেলিচি, স্নেহগুণে ক্ষমা কর্‌বেন।

(৫)

ফুলশয্যার তত্ত্ব নিয়ে কুড়ি জন স্ত্রীপুরুষ বিনোদ বাবুর বাড়ী উপস্থিত। প্রিয়ম্বদা তত্ত্ব দেখিয়াই একেবারে তেলে-বেগুণে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"হাড়ী, ডোম, বাগ্‌দীর বাড়ীতেও ফুলশয্যার এমন তত্ত্ব যায় না। ইনিও যেমন,—লোকে গোড়ায় সব কথা পাকাপাকি ক'রে নেয়; এঁর ছিল সব সেই ছাঁদনাতলার জন্যে। যাক্‌, আমি এর কিছুই ছোবনা—এক তিলও ঘরে তুল্‌ব না, যার ছেলে তিনি এসে যা কত্তে হয় করুন।"

শাঁক বাজানো শুনিয়া পাড়াপড়শী সকলে তত্ত্ব দেখিবার জন্য উপস্থিত। যার যার মনের মত সকলে তত্ত্বের সমালোচনা করিতেছিল। প্রৌঢ়া নাপিত-বৌ প্রিয়ম্বদাকে ডাকিয়া বলিল,—

'বলি গিন্নি মা! নিজের বিয়ের কথাটা ভুলে গেচ কি? আমার ত এখনো জল-জিয়ন্ত মনে পড়ে,—একটা উড়ে বাকে ক'রে দু'টী চেঙ্গারীতে ছয়টী ছোট ছোট হাঁড়ীতে কিছু কিছু মিষ্টি, আর কত্তার ধুতী-চাদর, তোমার একখানা সাড়ী, একখানি গাম্‌চা, আর একটী নারকেল নিয়ে এয়েছেলো। বুড় কত্তা—তোমার শ্বশুর উড়ে মিন্‌সের হাতে একটী দু'য়ানি গুঁজে দিলেন, উড়ে মিন্‌সে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে কত্তার মুখ পানে চেয়ে রইল। কথাটা মনে পড়ে কি?

প্রিয়। তোম্‌রা তা বুঝ্‌বে কি মা! এখন যে আর সে দিন-কাল নেই। এখন পাশের কাল, আমার ছেলে যে চাট্টে পাশ দিয়েচে, আর ও একটা দেবে।

না-বৌ। তোমার ছেলে চাট্টে পাশ দিয়েচে ব'লে ক'নের বাবাকে ফাঁস দিয়ে ট্যাকা নেবে নাকি? আমাদের মিন্‌সে ত বল্লে,—তোমাদের কত্তা নাকি ছেলের হাত ধ'রে তু'লে আন্‌তে গেছ্‌লেন। ক'নের বাবা সাড়ে সাতশো টাকার খত নিকে দেয়, তবে বে হয়। এমন তর অনাছিষ্টি কথা ত আর শুনি নি বাবা!

প্রিয়। তা কত্তার আর দোষটা কি? সে মিন্‌সে গোড়ায় সব পাকাপাকি করে নিলেই ত পার্‌ত। কত্তা ভালমানুষি ক'রে না হয় কিছু বলেন নি, কিন্তু তাঁর ত বিবেচনা করা উচিত ছিল?

না-বৌ। তার বিবেচনার কসুরটাই বা হয়েচে কি? গয়নাগাটী সব নিয়ে পেরায় ডের হাজার ট্যাকা দিয়েচে শুনেচি, তাতে তার ঘর বাড়ী বাঁধা পড়েচে। আর সে কি করবে? বাকী রয়েচে মাগ্‌টী! সেটী বাঁধা দেবে নাকি?

প্রিয়। ক্ষেমতা না থাক্‌লে পাশ করা ছেলে নিতে এ'লে কেন?

না-বৌ। পাশ করেচে ব'লে ছেলে কি একবারে লাট হ'য়ে গেচে নাকি? আমার বাপের বাড়ী ত কলকেতার সহরের কানাচে। দেখি ত কত পাশকরা ছেলে রাস্তাঘাটে এপাশ ওপাশ করে বেড়াচ্ছে! কত পাশকরা মিন্‌সে ঘি, চিনি ময়দার দোকান ক'রে বসেচে। কেউ বা খাবারের দোকান ফেঁদে গরীব ময়রাদের অন্ন মারবার চেষ্টায়

আচে। এইত তোমাদের পাশের মুরদ ? এই ছাইপাশের দোহাই দিয়েই ত মেয়েওলা গরীবদের ভিটে-মাটী চাটী করা গা! দেশ থেকে এমন সব্বনেশে পাশের কল সরকার বাহাদুর তু'লে নিয়ে যাক না গা, গরীব গুর্‌বোর হাড় জুড়োক্।

প্রিয়। নাপিত-বৌ! সে কথা তোমরা বুঝ্‌তে পারবে না।

না-বৌ। ও ছাই পাশ আমাদের বুঝেও দরকার নেই। তোমার কত্তা যে কিছু পাশ দেন নি, তাঁর বিয়ের সময় বুড়কত্তা আমাদের বসত বাড়ীখানা চাক্‌রাণ দেছ্‌লেন, আমায় একখানা কস্তা-পড়ে সাড়ী দেছ্‌লেন, মিন্‌সেকে ধূতী চাদর দেছ্‌লেন। আর খাওয়া দাওয়ার সামিগ্‌গিরির ত কথাই নেই, কুটুম-সাক্ষেৎ নিয়ে আমরা সাতদিন খেয়ে ফুরতে পারি নি। আর তোমার এই চাট্টে পাশের ছেলের বিয়েয় কি টা দিয়েচ বল দেখি ? নেবার বেলা ত ক'নের বাবা মিন্‌সের যথা সব্বস্বি ধরে টেনেচ, তার পর সাড়ে সাতশো টাকার খত নিকিয়ে নিয়ে রেহাই দিয়েচ।

প্রিয়। নেবার সুবিদে পেলে কি কেউ কসুর করে, নাপিত-বৌ ?

না-বৌ। এর নাম তোমার সুবিদে ? সাতশো ঝাটা মারি এমন সুবিদের মুখে! এই ত, গেল বছর আমার ছেলের বে হয়েচে, কনের বাবাকে পঁচিশ গণ্ডা, আর পৌনে তেরগণ্ডা ট্যাকা দিয়িচি, ঘরে বউটী এনেচি। ক'নের বাপ তৈরি মেয়েটী দেবে, তোমার ঘরে এসে তোমাদের দাসীপনা করবে, আবার তোমাদের ট্যাকার কাঁড়ি দেবে! কেন গা ? এটা তোমাদের কেমন বেবস্থা ? তোমরা ভদ্দর নোক, তোমাদের কি এই বেবস্থা হ'লো! নোকটা মেয়ের বাপ হয়েচে ব'লে তাকে পুচিয়ে পুচিয়ে কেটে ট্যাকা আদায় কর্‌বে ? তোমরা দেখচি কসাইর চাইতেও বাড়া!

প্রিয়। সে কি রকম কথা হ'ল নাপিত-হয় ? লঘু গুরু ভেদ নেই, তোমার যে দেখ্‌চি কথা কইতে মুখে আর কিছু আট্‌কাচ্ছে না।

না-বৌ। আটকাবে কি বল ? মিন্‌সে সেখান থেকে এসে বল্লে—'কত্তার কাণ্ড-কারখানা দে'খে সেখানে আর কথা কইতে পাল্লুম না! পাড়া পড়শী দশজনে বল্‌তে সুরু কল্লে,—এ কেমনতর ভদ্দর গা! এরা নাকি বদ্দি-বামুন! ছেরকাল শুনিচি, বদ্দি-বামুনেরা দাতা, ট্যাকার দিগে তাদের খ্যাল্ নেই, নিজের সামনের ভাত অপরকে খেতে দেয়। ওমা! এই বরের বাপটী কেমনতর বদ্দি-বামুন ?" এ সব কথা শু'নে কি আর তোমাদের কাজে-কর্ম্মে কোথাও যেতে ইচ্ছে যায় ? মিন্‌সেত বলেচে, আর কক্‌খনো তোমাদের কত্তার সঙ্গে কোথাও যাবে না।

প্রিয়। চাক্‌রাণ খায় ত তার ঘাড় যাবে।

না বৌ। না হয় তোমাদের চাকরাণ্ কেঁড়েই নেবে। তোমরা ত অনায়াসে কত্তে পার। ব্যাটার শ্বশুরের কাছ থেকে বিয়ে রেতে যখন খত নিকে নিতে পেরেচ, তখন তোমরা না পার কি, তা জানিনে! তা অদেষ্টে যা থাকে তা হবে, আজ থেকে আর আমরা তোমাদের বাড়ী কাজ কর্‌বোনা, তোমাদের ছোঁয়া জলও খাব না। দেখি, আমরা ত ছোট জাত নাপিত, কিছু কত্তে পারি কি না।

(৬)

'ঠাকুমা! দিদি বল্লে তুমি আমায় ডেকেচ।' বলিয়া হরেন্দ্র বৃদ্ধা পিতামহীর নিকট উপস্থিত।

বৃদ্ধা। বলি সেই কাল্‌কে সন্ধ্যে বেলা এসে একটী পেন্নাম করে গেচিস্, তারপর আর এমুখো হোস্‌নি! কেন বল্‌দেখি ? তোর মা বল্লে, তুই নাকি বউভাতে কিছু বাড়াবাড়ি কত্তে বারণ করিচিস্ ?

হরে। হাঁ ঠাকুমা, করিচি।

বৃদ্ধা। কেন করিচিস্। তুই বাপের এক বেটা, ঈশ্বর ইচ্ছায় আমার বাছার সংসারে কোন-

জনকে নিয়ে আহ্লাদ করবে, তাতে তোর বাধা দেওয়া কেন?

হরে। ঠাকুমা! তোমাদের সংসারে যদি অভাবই নেই, তবে আমাকে বেচে টাকা নেওয়া কেন? একে বেচাই বা বলি কি করে,—এযে জোর করে একজনকার থেকে টাকা আদায় করা!

বৃদ্ধা। সে কি কথা! কে কাকে বেচ্‌লে?—কে কার থেকে জোর করে টাকা আদায় কল্লে?

হরে। তুমি দেখ্‌চি আমার কাছে ন্যাকা সাজ্‌তে যাচ্ছ ঠাকুরমা?

বৃদ্ধা। সত্যি, তোর দিব্বি, আমিত তোর এ হেঁয়ালী-কথা কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।

হরে। বাবা যে তোমার নাত্‌বৌয়ের বাবার ঠেঙ্গে সাড়ে সাতশ টাকার হ্যাণ্ডনোট নিয়ে তবে আমাকে বিয়ে দিয়েচেন, সে খবরটা কি তুমি জান না?

বৃদ্ধা। হ্যাণ্ডনোট আবার কি রে?

হরে। তাও বুঝ্‌তে পাচ্চ না,—সে একতর খৎ। এ খতের টাকা চাইবা মাত্র দিতে হয়।

বৃদ্ধা। খৎ নেওয়া হ'ল কেন?

হরে। বৌয়ের গয়না কম হয়েচে বলে। তা ছাড়া তোমরা তোমাদের বাড়ীতে যে বউভাত করবে, তার খরচা।

বৃদ্ধা। কেন, বউকে যে এক গা গয়না দিয়েচে, দেখেচি। তার যেমন ক্ষেমতা তেম্নি দিয়েচে, এর বেশী দেবার সাধ হয় তোর বাবা নিজে দিক্‌না কেন? বউভাতের টাকা ক'নের বাবা দেবে কেন? এমনতর ছিষ্টিছাড়া কথা ত কখনো শুনিনি! বউ ঘরে এনেচিস্, দশজন বন্দু-বান্দব কুটুম-সাক্ষাৎ নিয়ে তুই আমোদ করবি, সেটা তোর কাজ। পারিস্ করবি, না পারিস্ না করবি। তা'না-ই বা করবি কেন? তোর কিসের অভাব? তার জন্যে আবার ক'নের বাবার ঠেঙ্গে টাকা আদায় করা কেন?

হরে। ঠাকুমা! তুমি যখন কথা তুল্‌লে, তখন সব কথাই তোমায় খুলে বল্‌চি। আমার সঙ্গে আমার কয়েকজন বন্ধু বরযাত্রী গেচিল। তাদের সকলেই কালেজের ছেলে। বিয়েতে টাকা নেওয়া এদের কারুই মত নয়। আর দেখাও যাচ্ছে, এরূপ ভাবে টাকা নেওয়া, আর নিজেকে বিক্রী করা একই কথা। কথাটা শুন্‌তেও যেন কেমন কেমন শোনায়! আজ্‌কে নাপিত-বৌতে আর মাতে যেসব কথাবার্ত্তা হয়েচে, তা শুনে, আমার মুখ দেখাতে লজ্জা হচ্চে! সে নাপ্‌তেনী বল্লে কি,—'তোম্‌রা ছেলে বেচে ট্যাকা নেও,তোমরা কসাই, তোমাদের ছোঁয়া জল আমরা খাব না, তোমাদের কামাব না।' এসব কথা শুনে লজ্জা হয় না কি ঠাকুমা? কাল হয় ত ধোবানীও বল্‌বে, তোমাদের কাপড় কাচ্‌ব না।

বৃদ্ধা। তা বল্‌বেই ত। (বিনোদ বাবুকে দেখিয়া) হ্যাঁরে বিনোদ! তুই নাকি হরেনের শ্বশুরের ঠেঙ্গে খৎ লিখিয়ে নিয়েচিস্?

বিনোদ। টাকা দেন্‌নি ব'লে নিয়েচি।

বৃদ্ধা। কিসের টাকা?

বিনোদ। হরনের বিয়েতে কিছু নেইনি ত। মনে করেছিলুম, টাকা নিলুম না, বউমাকে গয়না গাটী দেখে-শুনে দেবে। তা তেমনতর কিছু দেন নি, তাই গয়না ও বউভাতের বাবদ সাড়ে সাতশো টাকার খৎ নিয়েচি।

বৃদ্ধা। ছেলে বিয়ে দিয়ে বউ আন্‌বি,—কনের বাপ পেলেপুষে মানুষ করে তার মেয়েটী তোকে দেবে,—তোর ঘরে এসে সে গিন্নি হবে, ঘরকন্না দেখ্‌বে, আবার তোকে টাকা দেবে কেন? কর্ত্তা ত তোকে বিয়ে দিয়ে টাকা নেন নি, বরং দু'হাজার টাকা ঘর থেকে খরচ করেছিলেন; তুই টাকা নিচ্ছিস্ কোন লাজে? হরেনকে কি শ্যাম-লালের কাছে বেচ্‌তে যাচ্ছিস যে তোকে টাকা দেবে?

বিনোদ। এখন যে এটা সবাই করচে মা!

বৃদ্ধ। এখন ত হিন্দুর ছেলে জুতোর ব্যবসাও

করুচে, তা ব'লে কি তোকেও তাই কর্ত্তে হবে? তোর কিসের অভাব? তোর টাকারি বা এত কি দরকার যে হরেনকে তার শ্বশুরের কাছে বেচে টাকা নিবি? এইত শুনলুম, নাপিত-বৌ বলে গেল, তারা আর আমাদের বাড়ী কামাবে না, চাকরাণ ফিরিয়ে দিতেও রাজী। হরেন বল্লে,—খৎ ফিরিয়ে না দিলে তার কালেজের বন্ধুরা কেউ আস্‌বেনা। যদি তারা না আসে, তবে হরেনও কল্‌কেতা গেলে আর বাড়ী মুখো হবে না। এখন দুনিয়া শুদ্ধ সব ছেড়ে কি তুই টাকা নিয়ে থাক্‌বি? যদি তাই তোর ইচ্ছে হয়, তা' হ'লে কালই আমায় কাশী পাটিয়ে দেবার বন্দোবস্ত ক'রে দে, তুই তোর টাকা নিয়ে থাক।

বিনোদ। তা এটা যদি তোমাদের সকলেরি অসহ্য হ'য়ে থাকে, তা হ'লে না হয় হ্যাণ্ডনোট ফিরিয়ে দেব। সত্যি সত্যি আমি ত আর টাকাটা নেই নি, একটা কাগজ সই করে নিয়িচি মাত্র। তা, এখনি তোমায় এনে দিচ্ছি, তোমার যা প্রাণ চায় তাই কর।

বৃদ্ধা। আমি তা দিয়ে কি করুব? ঐ হরেনের কাছে দিয়ে দে, সে তার কালেজের বন্ধুদের সাম্‌নে শ্যামলালকে ফিরিয়ে দিক্‌।

বিনোদবাবু জননীর সমক্ষে হরেন্দ্রের হাতে হ্যাণ্ডনোট অর্পণ করিলেন। বউভাত উপলক্ষে হরেনের বন্ধুবর্গ বাড়ীতে উপস্থিত ছিল, শ্যাম লালও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নাপিত বৌকে ও ডাকা হইল। হরেন সকলের সম্মুখে হ্যাণ্ডনোট খানি শ্যামলাল বাবুর চরণে রাখিয়া পদধুলি গ্রহণ করিল। হরেনের বন্ধুবর্গ সকলে একবাক্যে নাপিত-বৌয়ের প্রশংসা করিতে লাগিল। নাপিত-বৌ যোড় হাত করিয়া বলিল,—'আমার বয়স আড়াই কুড়ি হ'তে চল্‌লো, বদ্দি-বামুনের দয়াতেই আমরা দুবেলা দুমুটো খেয়ে আচি। আজ যদি সেই বদ্দি-বামুনের নিন্দে আমাদের কাণ-পেতে শুন্‌তে হয়, তা হ'লে আমাদের মরাও ভাল। ভগবান খোকা বাবুর ঘরে খোকা দিন, আমি চোখে দেখে চক্ষু বুজ্‌তে পারি, ইহাই আমার সাধ।'

কালিদাসের কাব্য।

(সমালোচনা)

[শ্রীবিদ্‌ঘুটেবুদ্ধি কাব্যবিদ্যামহার্ণব।]

গতবারে 'ক্ষীরনিধি' সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি, কিন্তু এখনও একটু বক্তব্য বাকি আছে। ক্ষীর জিনিষটি যেমন ভোগের, (পেটরোগার পক্ষে) নিদানও তেমনি রোগের, সুতরাং ধন্বন্তরিতে ইহার আলোচনার সার্থকতা অবশ্যই আছে।

মহাকবি কালিদাস একদিকে ক্ষীরের প্রতি যতই অবিচার করুন, তিনি ভিতরে ভিতরে ক্ষীর বা ঘন দুধের একজন বড় ভক্ত ছিলেন। বঙ্গভাষায় 'ক্ষীর' শব্দটা একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালী কবি যে ঐ স্বদেশী অর্থের দিকে একটু টানিয়া শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা দুগ্ধবাচক অতগুলি শব্দ থাকিতে 'ক্ষীর' শব্দের নির্ব্বাচন হইতেই বুঝা যায়। পাঠক যদি বলেন, ক্ষীর যদি 'ক্ষীর'ই হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে দধির বন্দোবস্ত নাই কেন? চিপিটক-ফলাহার-প্রিয় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষীর ও দধির তুল্য প্রিয় বস্তু আর কি আছে? অন্নপ্রাশনে, উপনয়নে, বিবাহে, শ্রাদ্ধে সর্ব্বত্রই ত এই দুইটী দ্রব্য 'বাগর্থা-বিব' পরস্পরের নিত্য সহচর! তবে এস্থলে দধির প্রতি এ অবিচারের কারণ কি? ইহার কারণ

আর কিছুই নহে, কবি সুদীর্ঘ কাল পশ্চিম দেশে অবস্থান করায় দধির কদরটা ভুলিয়া গিয়া থাকিবেন। পশ্চিমের অনেক পণ্ডিত দধি ও ছানাকে দুগ্ধের বিকার বলিয়া অভোজ্য জ্ঞানে বর্জ্জন করিয়া থাকেন। খুব সম্ভব, সেই সঙ্গদোষে আমাদের কবিবরেরও দধির প্রতি ঐরূপ অশ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকিবে। নহিলে 'ক্ষীরনিধি' স্থলে ক্ষীরোদধি ("ক্ষীর—ও—দধি") শব্দটা ব্যবহার করিয়া, দধির মান রক্ষা করিতে পারিতেন না কি? শব্দ দুইটির অর্থ এক—অথচ 'ক্ষীর—ও—দধি' শুনিতে কর্ণ যুগল ভরিয়া উঠে, বলিতে রসনা লালায়িত হয়। বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব ও ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব—ঐ শব্দটার গায়ে যেন মাখা-মাখি!

যেসকল বৃদ্ধেরা শ্লেষ্মাধিক্যের ভয়ে দধি আহার করিতে নারাজ, আমরা ধন্বন্তরির প্রমুখাৎ তাঁহাদিগকে ভরসা দিতেছি,—তাঁহারা নির্ভয়ে দধি ভোজন করুন। রাত্রিতে দধি ভোজনের অনুকূল শাস্ত্র-বচনও স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্য হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি। "ন রাত্রৌ দধি ভোজনম্"—অর্থাৎ পার ত উপর্য্যুপরি নয় রাত্রি দধি ভোজন করিবে, ইহাতে বয়োহানির আশঙ্কা থাকে না! যিনি যে বয়সে দধিব্রত গ্রহণ করেন, তিনি সেই বয়সেই থাকিয়া যান! এই ব্রতপালনে এখন আর কোনও অসুবিধা নাই। দেশী বিলাতী সকল শতমারী—সহস্রমারী এখন দধির জয়জয়কার করিতেছেন। তবে আর ভয় কি? এখন অহরহ—দিবারাত্র—হাতে দৈ, পাতে দৈ, যত ইচ্ছা ভোজন করিব—দধির সহিত প্রেম করিয়া, আমরা সকলে দধিস্বামী হইব।

পশ্চিমে পণ্ডিত মহাশয়রা বুঝি সকলেই ক্ষীরস্বামী—পাঠক হাসিবেন না,সত্যসত্যই প্রাচীন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেরই নাম ক্ষীরস্বামী ছিল। বিশ্বাস না হয়, রঘু—১।৩৬, কুমার—৭।১১, মল্লিনাথের টীকা দেখুন। তাঁহারা ক্ষীর ভোজনে বিশেষ পটু ছিলেন কিনা, তাহা তাঁহাদের লেখা হইতে জানা যায় না। তবে তাঁহাদের মধ্যে কাহারও দধিস্বামী নাম দেখিতে না পাওয়ায়, তাঁহারা যে ক্ষীরের প্রেমেই মজিয়া ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। হিন্দুস্থানীদের মধ্যে একটি প্রবাদ-বাক্য আছে—"দইয়ের মাথায় ঘোল ঢালা।" কোনও অপমানিত ব্যক্তির বহু অপমানেও চৈতন্য না হইলে, তদুদ্দেশে হিন্দুস্থানীরা এই প্রবাদ বাক্যটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমাদের মনে হয়,—অতি প্রাচীন যুগে উঁহারা দধির উপর রাগ করিয়া সত্য সত্যই দধির মাথায় ঘোল ঢালিয়া দেশ হইতে বাহির করিয়া দিয়া থাকিবেন। তদবধি দধি বঙ্গদেশে আপন পসার বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন, এবং তদবধি পশ্চিমে ক্ষীরেরই আদর বাড়িয়াছে! এই ঘটনা কত প্রাচীন কালে ঘটিয়াছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও দধির আদর পশ্চিম ভারতে কমিয়াছিল, ইহা বেশ বুঝা যায়। ঠাকুর হিন্দুস্থানী গোয়ালাদের পাল্লায় পড়িয়া, কেবল ক্ষীর, ননী খাইয়াই সারা হইতেন, দধি কখনও মুখে তুলিতে পাইতেন না। দধি হইতে এমনভাবে বঞ্চিত না হইলে, ঠাকুরের বাঁশী যে করুণসুরে আরও খাসা বাজিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আজ দুই মাস ধরিয়া, ক্ষীর, দধি, প্রভৃতি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে, ভারতের সেই প্রাচীন খাইয়ে পুরুষদের কথা মনে পড়িতেছে। আজি সেই ভারত-গৌরব পেট-সর্ব্বস্বেরা কোথায়? বর্ত্তমান কালে শাক, পাতা, সব্জি, বড় জোর মাছ, মাংস পর্য্যন্ত—তার বেশী আর এখন চলে না। এখন সে ইল্বল, বাতাপিও নাই, সে অগস্ত্যও নাই। অগস্ত্য সাগর পান করিয়াছিলেন, এখন তাঁহার বংশধরেরা অজীর্ণ রোগে ভুগিয়া ত সাগরের জল অতিসার করিতেছেন! সোডা বা "অজীর্ণসুধা" পান করিয়া তবে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করিয়া থাকেন। জহ্নু মুনির

কথা কে না জানেন? তিনি জাহ্নবী দেবীকে এক চুমুকে নিঃশেষে পান করিয়াছিলেন, আর এখন তাঁহারই সন্তান-সন্ততিরা সারাজীবন বুক চাপড়াইয়া, পেট চাপড়াইয়া, চোঁয়া ঢেকুর তুলিয়া, অকালে সেই জাহ্নবীজলে দেহরক্ষা করিতেছেন! দামোদর বৃকোদরের ত বংশই লোপ হইয়াছে। সেদিনকার একমুনে, আধমুনে, দশসেরা পাঁচসেরা দিগের কথাও এখন গল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কলিকালে সাগ্নিক দ্বিজাতির যে ঘোর অধঃপতন হইয়াছে, তাই ঘোরতর অগ্নিমান্দ্য ঘটিয়া তাঁহাদের অগ্নি একেবারে লোপ পাইতে বসিয়াছে! এমন সময় খাঁটি ক্ষীর অপেক্ষা দধিমিশ্রিত ক্ষীরই যে অধিকতর গ্রহণযোগ্য, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

অতএব "ক্ষীরোদধি" শব্দটি দধির মাঙ্গল্যগুণ সংযোগে অধিকতর সুশ্রাব্য, সুগ্রাহ্য ও সুপাচ্য বলিয়া, উহাই গ্রহণ করিবার জন্য পাঠক মহাশয়দিগকে অনুরোধ করিতেছি।

এইবার আমরা "শকুন্তলা" নাটকের একটি শ্লোকের একাংশ সমালোচনা করিব। তাহা এই,—"হংসো হি ক্ষীরমাদত্তে তন্মিশ্রাঃ বর্জ্জয়ত্যপঃ"। পাঠক মহাশয়, পাঠ মাত্রেই দেখিতে পাইতেছেন, আপনার ক্ষীরভাগ্য কিরূপ প্রবল! ভাগ্যবানের ভাগ্য নাকি সঙ্গে সঙ্গে ফিরে। নহিলে, এই নূতন প্রসঙ্গেও সেই ক্ষীরের কথাই পুনরায় উঠিবে কেন?

গুরুদেব বলিতেন,—ক্ষীরশব্দের অর্থ মৃণালের মধ্যবর্ত্তী ক্ষীরবৎ কোমল অংশ। হংসগণ সরোবরে পদ্মদণ্ডের মধ্যস্থিত সেই ক্ষীরবৎ সুস্বাদু অংশটি ভক্ষণ করিয়া থাকে। ভক্ষণকালে একবিন্দু জলও তাহারা উদরস্থ করে না! এমনই তাহাদের আশ্চর্য্য কৌশল, মৃণালের সহিত প্রতি কবলে জলপ্রবেশের সম্ভাবনা থাকিলে, হাঁসেরা জল খাইয়াই পেট ফুলিয়া মরিত! আমার মনে হয়, উহার আরও দুই রকম সদর্থ করিয়া গুরুদেবের কাছে বাহবা পাইয়াছিলাম! নিম্নে তাহা একে একে বলিতেছি।

প্রথম অর্থ,—অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, হাঁসেরা পথের ধারে নর্দমায়, শুষ্কপ্রায় পুষ্করিণীতে, বা ডোবায় পাঁকের মধ্যে তাহাদের দীর্ঘ-গ্রীবা নিমজ্জিত করিয়া, কত কি আহার্য্য দ্রব্য নিম্নপ্রদেশ হইতে ক্রমাগত উত্তোলন করিয়া সুখে খাইয়া থাকে। কিন্তু কবির চক্ষে উহা আর একরূপ দেখায়। কবি ভাবেন,—হাঁস জলে মুখ ডুবাইয়া কি খায়? জল খায় না নিশ্চয়ই, তবে জলের নিম্নে যে ক্ষীরবৎ ঘন ও সুখাদ্য জিনিষ দৃষ্ট হইতেছে, তাহাই খাইতেছে। উহা কি? কবি ভাবিলেন, উপরে যদি নীর—তবে নীচে নিশ্চয়ই ক্ষীর। হংস নীর ত্যাগ করিয়া কিরূপে, ক্ষীরভাগ গ্রহণ করে পাঠক হয়ত তাহা বুঝিতে পারিলেন!

অথবা, হংস অর্থাৎ 'সোঽহং' কিনা 'সোঽহং'-জ্ঞানী সন্ন্যাসীরা—পরমহংসদিগের ত কথাই নাই—তাঁহারা সকলে কি আহার করেন? প্রধানতঃ ক্ষীর বা 'ঘন দুধ' (অনেকে পোড়ামুখে "ক্ষীর" নাম লইতে চাহেন না)!! এই কলিকাতা সহরে দুধ টাকা সেরই হউক, আর দু'টাকা সেরই হউক, বাবাজিদিগের বরাদ্দ দুধ কম হইবার যো নাই। কিন্তু বাবাজিরা যিনি যতই খান, পাঁচসের দশসের অমনি ঢক্ ঢক্ করিয়া খান না, বেশ করিয়া জ্বাল দিয়া, তাহার অপ্রয়োজনীয় জলীয় অংশটুকু মারিয়া, বেশ ঘন ঘন করিয়া তবে আহার করেন। ইহা অবশ্য মানুষ-হাঁসের কথা, পাখী-হাঁসের কথা উপরে বলিয়াছি।

যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা আমাদিগের কথা বুঝিয়াছেন। আমি অনেক বাবাজিদের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহারা পানকালে জলমগ্ন হইবার ভয়েই দুধকে অত করিয়া জ্বাল দিয়া জলটুকু মারিয়া ফেলেন! পাঠকগণ! আপনারাও অদ্যাবধি এইরূপ হংস হইবেন, অর্থাৎ দুধ বেশ করিয়া জ্বাল দিয়া খাইবেন তাহা হইলেই গোয়ালাকে আর বকিতে হইবে না। সে যাহাই করুক—দুধেই জল দিউক বা জলেই দুধ দিউক, আপনার কাছে তাহার চালাকি খাটিবেনা, আপনি ঠিক খাঁটি মাল পাইবেন, "হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ"।

মুন্সেফের মূল্য ২০০০৲ টাকা !

পাঠকগণ হয়ত এই সংবাদে স্তম্ভিত হইবেন। কারণ, হাতী, ঘোড়া, উট, গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি বিক্রয়ের কথাই আপনারা শুনিয়াছেন, 'মুন্সেফ' বিক্রয়ের কথা সম্ভবতঃ এপর্য্যন্ত কাহারও শ্রুতিগোচর হয় নাই! শুধু মুন্সেফ নহে, ইঞ্জিনিয়ার বিক্রয়ের সংবাদও পাইবেন।

ধন্বন্তরির একজন সম্ভ্রান্ত এবং পদস্থ গ্রাহক লিখিয়াছেন,—

"সবিনয় নিবেদন,—আমি ময়মনসিংহ হইতে চট্টগ্রামে বদ্‌লী হইয়াছি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার নামে ধন্বন্তরি ময়মনসিংহ না পাঠাইয়া চট্টগ্রামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন। আপনার শ্রাবণ মাসের ধন্বন্তরি পত্রিকার ৩১৮ পৃষ্ঠায় যে ৪টী বিবাহের সুসংবাদ প্রদান করিয়াছেন সে কয়টীই আমাদের আত্মীয় ও বিশেষ পরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে। ইহার সহিত আরও ২টী বিবাহের সংবাদ বোধ হয় আপনারা জ্ঞাত নহেন, নতুবা সে সুসংবাদ দুটীও বিশেষ উল্লেখের যোগ্য।

১। ফরিদপুর জজকোর্টের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেনের প্রথম পুত্র শ্রীকেশব-চন্দ্র সেন। ইনি এম্, এ, বি, এল, মুন্সেফের পদ প্রার্থী; একবার একটিনীও করিয়াছেন। মুন্সেফের একবার একটিনী করার পর ইহার বিবাহ হইয়াছে ময়মনসিংহের সবজজ শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র সেনের মেয়ের সহিত। রেবতী বাবু উমেশ বাবু হইতে নগদ ২০০০৲ টাকা নিয়াছেন।

২। উক্ত রেবতীবাবুর দ্বিতীয় পুত্রের বিবাহ কলিকাতার সুরেন্দ্র কবিরাজের কন্যার সহিত হইয়াছে, রেবতীবাবু সুরেন্দ্র কবিরাজ হইতে নগদ ২৫০০৲ টাকা নিয়াছেন। রেবতীবাবুর দ্বিতীয় পুত্র ইঞ্জিনিয়ার; রেবতীবাবু নিজে ও বি, এল।"

সেরেস্তাদার রেবতীবাবুর তহবীলে আর দুই একটী ছেলে আছে কিনা আমরা তাহা জানি না। না থাকিলেও এখন তিনি অনায়াসে পেন্সেন লইয়া ঘরে বসিতে পারেন। কিন্তু মুন্সেফ এবং ইঞ্জিনিয়ারের জনক হইয়াও যখন তাঁহার অর্থলিপ্সা এতটা প্রখর, তখন তিনি হয়ত দুই একবার (extension) কার্য্যকাল বৃদ্ধির প্রার্থনা না করিয়া অবসর গ্রহণ করিবেন না।

রেবতীবাবুর উচ্চ শিক্ষিত পুত্রদ্বয়েকে কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না! ইহাঁদের একজন মুন্সেফের গদিতে পা বাড়াইয়া রহিয়াছেন, মুন্সেফ হইলেই স্বত্বাস্বত্বের বিচার করিয়া ডিক্রী-ডিস্‌মিসের রায় দিবেন। কিন্তু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি,—সবজজ উমেশ বাবুর নিকট হইতে তাঁহার পিতা যে রোক্ দুই হাজার টাকা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কোন্ স্বত্বে? যদি কেহ বলে, দুই হাজার টাকার বিনিময়ে কেশববাবু আত্মবিক্রয় করিয়াছেন, একথার কোন যুক্তিযুক্ত প্রতিবাদ আছে কি?

অনেকে বলিয়া থাকেন, কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া অনেকে পুত্রের বিবাহে পণ গ্রহণ করিয়া থাকেন; কিন্তু রেবতীবাবু যখন তাঁহার মুন্সেফ এবং ইঞ্জিনিয়ার পুত্রের বিবাহে যথাক্রমে দুই হাজার ও আড়াই হাজার টাকা বরমূল্য গ্রহণ করিয়াছেন, তখন এই যুক্তি দ্বারা তাহা সমর্থন করিবার উপায় কোথায়?

কন্যাকর্ত্তা সবজজ বাবু, এবং কবিরাজ মহোদয়ের অর্থের অভাব নাই, সুতরাং তাঁহারা দুই-আড়াই হাজার কেন, এতদপেক্ষা অধিক অর্থ দিয়াও বর ক্রয় করিতে পারেন; কিন্তু সমগ্র বৈদ্যসমাজের মধ্যে সকলেই ত আর সবজজ অথবা পয়সাওয়ালা কবিরাজন হেন! আমরা জানি, এবং বিদ্বৎসভার মুখপত্র ধন্বন্তরির প্রচারে বিশেষরূপে অবগত

হইয়াছি যে, বৈদ্যজাতির মধ্যে শতকরা ৯৫ জন কায়ক্লেশে দুই বেলা দুই মুষ্টি খাইয়া জীবনধারণ করিতে পারে কি না সন্দেহ। এই সকল লোক কন্যাদায়ে কিরূপ অবস্থাপন্ন, তাহা সবজজ বাবু অথবা কবিরাজ মহাশয়ের বুঝিবার অবসর না থাকিলেও, আমরা এবং অপর যাঁহারা সমাজের জন্য একটু চিন্তা করিবার অবসর পান, তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারেন। সমাজের যে দুই চারিজন সবজজ অথবা পয়সাওয়ালা কবিরাজ আছেন, তাঁহারা ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব প্রদর্শন প্রবৃত্তিটা যদি একটু লঘু করিবার প্রয়াস পান, তাহা হইলে এই অধঃপাতিত সমাজের অনেকটা উপকার হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের এই ঐশ্বর্য্য-গৌরবটা ঘরে ঘরে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া যদি স্বজাতীয় দুস্থ পরিবারে প্রদর্শিত হয়, তাহা হইলে স্বজাতির মঙ্গল হয়। এই সদিচ্ছা তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না, অথচ অনুচিত অর্থের বিনিময়ে বর ক্রয়পূর্ব্বক কন্যাসম্প্রদান করিয়া এই নিষ্ঠুর প্রথার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। ইহাঁদের উভয়পক্ষকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারি না কি যে, তাঁহাদের আত্মীয় সম্পর্কিত যতগুলি লোক আছেন, তাঁহারা সকলেই কি সম্পন্ন? তাঁহাদের মধ্যে যে অনেকেই আধুনিক এই আসুরিক বরপণ প্রথার পীড়নে নিপীড়িত হইয়া হৃতসর্ব্বস্ব হইতেছেন, একথা তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন কি? তাঁহারা সমাজের সামাজিক, সমাজে তাঁহাদের স্থান উচ্চ; তাঁহাদের আদর্শে সমাজ পরিচালিত হইবার কথা। তাঁহারাই যদি বরপণ ও যৌতুক গ্রহণ প্রথার প্রশ্রয় দেন,—তাঁহারাই যদি বর ক্রয়-বিক্রয়ের পোষকতা করেন, তাহা হইলে সমাজ হইতে এই কুপ্রথা—এই নিষ্ঠুর প্রথা দূর করিবার জন্য আমরা কাহার নিকট দাঁড়াইব?—কাহার সহানুভূতির প্রত্যাশা করিব?

উপরে যে দুইটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইল, ইহাদের উভয় পক্ষই শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত এবং পদস্থ। এই শ্রেণীর লোকের যত্ন, চেষ্টা এবং সহানুভূতি ব্যতীত সমাজ হইতে এই কুপ্রথা তিরোহিত হইবার উপায় নাই। আমরা জানি, স্নেহলতার দুর্ঘটনার পর শিক্ষিত যুবকগণ বর-পণ-প্রথার তিরোধানের পক্ষপাতী। অভিভাবকবর্গের প্রতিকূলাচরণ অসমর্থ হইয়া যদিও কেহ কেহ এই প্রথার প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হন, তাহার পরিণামফল বড় শুভজনক হয় না।

এসকল দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত এবং পদস্থ বৈদ্যসন্তানগণের একটু চৈতন্য হওয়া উচিত। যাঁহারা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত থাকিয়া সমাজের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে উদাসীন,—যাঁহারা জাতীয় অধঃপতনের কারণ প্রতিরোধের প্রয়াস না পাইয়া শুধু ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যেই পরিতৃপ্ত, তাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং পদমর্য্যাদার যে কোন মূল্য নাই, একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে।

সাহিত্য পরিষদ প্রহেলিকা।

(২)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশ সম্বন্ধে সামান্যে আভাস দেওয়া হইয়াছে, সে সম্বন্ধ আর ও অনেক রহস্যাত্মক কথা আছে। পত্র প্রেরক যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়ের পত্রের এক স্থানে লিখিত আছে,—

"পরিষদের অনেক টাকা গ্রন্থপ্রকাশে ব্যয় হয়। যাহাতে এই সমস্ত ব্যয় যথার্থভাবে পরীক্ষিত হয়, সে উদ্দেশ্যে পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক মৃণালবাবু প্রেস্ সমিতি গঠনের প্রস্তাব করেন, ও আমার যতদুর জানা আছে, তাহাতে যাহাদের

ছাপাখানায় পরিষদের গ্রন্থাদি ছাপা হয়, এরূপ দুই এক জনের নাম এই সমিতির সভ্যরূপে প্রস্তাব করেন, কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির যে অধিবেশনে প্রস্তাব আলোচিত হয়, সেই অধিবেশনে বোধ হয় কুমার শরৎকুমার রায় সভাপতি ছিলেন। তাঁহার প্রস্তাবে ইহাই গৃহীত হয় যে, যাঁহাদের প্রেস আছে বা যাঁহাদের প্রেসে পরিষদের পুস্তকাদি ছাপা হয়, তাঁহারা ঐ সমিতির সভ্য থাকিতে পারিবেন না। ফলে পূর্ব্বোক্ত সভ্যগণের নাম তখন এই কমিটি হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তৎপরে জানি না কি ভাবে, তাহাদের কেহ কেহ এই সমিতির সভ্য হইলেন এবং তাহাদের ছাপাখানাতে পরিষদের যতগুলি শাখাসমিতি আছে, তন্মধ্যে এই ছাপাখানা সমিতি, যেরূপ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের সহিত, নিজ কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, অপর কোন শাখাসমিতি বোধ হয় তাহা করেন নাই। ইহার ফলে এই হইল যে, শাস্ত্রীমহাশয়ের আশ্রিত কাহারও অযথা আর্থিক লাভ বন্ধ হইতে লাগিল এবং তাহারা, শাস্ত্রী মহাশয়কে, এই সমিতির বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। যাহাতে এই সমিতি না থাকিতে পারে, সেইজন্ম শাস্ত্রী মহাশয় বিশেষভাবে চেষ্টিত হইলেন। এই সমিতির প্রথম বর্ষের ইতিহাসে অনেক ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাহার মধ্যে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ঘটনা পরিষদের কোন ও কর্ম্মাধ্যক্ষের নিজের প্রেস সম্বন্ধীয়। এই প্রেসে পরিষদের একখানি পুস্তক ছাপা হয়, কিন্তু প্রেস পুস্তক ছাপিতে অযথা বিলম্ব করায়, press committeeকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া, উক্ত কাপি সেই প্রেসে ফিরাইয়া দেওয়ান। ইহাতে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হয় ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি শাস্ত্রী মহাশয়ের পক্ষ লয়েন। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এই সিদ্ধান্ত, press committeeর পক্ষে অপমানজনক ও সুচারুরূপে কার্য্য সম্পাদনের পক্ষে প্রতিকূল বিবেচনায়, press committeeর, কতিপয় সভ্য পদত্যাগ করিয়াছিলেন।”

প্রেস কমিটীর আবাহন ও বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা দেখিয়া স্বতঃই মনে হয়, পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশ জনকতক লোকের স্বার্থসিদ্ধির একটী প্রকৃষ্ট উপায়! পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক মৃণালবাবু প্রথমে প্রেস-সমিতি গঠনের প্রস্তাব করিয়া সমিতি গঠন করেন, যাঁহাদের প্রেসে পরিষদের মুদ্রাঙ্কন কার্য্য হইয়া থাকে, তাঁহারা সমিতির সভ্য থাকিতে পারিবেন না, ইহা নিরপেক্ষতার পরিচায়ক বলিয়াই প্রেসওয়ালাদিগকে সভ্য শ্রেণী হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু তাহার পর পুনরায় তাহাদের কেহ কেহ কোন্ যাদু মন্ত্রে সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন, এ রহস্য ভেদ হইল না! কাজেই বলিতে হয়, পরিষদ জনকতক লোকের ক্রীড়াক্ষেত্র। যাঁহারা পরিষদের কর্ণধার, তাঁহারা যে স্বেচ্ছামত বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া পরিষদে অনুচিত স্বাধীনতা প্রয়োগ করিতেছেন। উদ্ধৃত অংশ তাহা চক্ষে আঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছে।

যতীন্দ্রবাবুর পত্রে প্রকাশ, প্রেস কমিটী অবলম্বন করিয়া পরিষদে দলাদলি উপস্থিত হয়, এবং যাহাতে প্রেস কমিটী একবারে উঠিয়া যায়, হীরেন্দ্র বাবু এবং মৃণাল বাবু তজ্জন্য বিধিমত চেষ্টা করেন, কিন্তু মাননীয় দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের মধ্যস্থতায় তাহা “কোনরূপে রক্ষা পায়” ‘কোনরূপে রক্ষা পায়’ বাক্যটী দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, প্রেস কমিটীর অস্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু ক্লীবত্ব প্রাপ্ত! আরও একটী বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যে মৃণাল বাবুর প্রযত্নেই প্রথমে প্রেস কমিটীর সৃষ্টি, সেই মৃণালবাবুই হীরেন্দ্র বাবুর সাহচর্য্যে প্রেস কমিটীর উচ্ছেদ সাধনে তৎপর হন! কেহ কেহ বলিতেছেন, প্রাচ্যবিদ্যার মহাসাগর নগেন্দ্র বাবুর কন্যার সহিত মৃণালবাবুর পুত্রের বিবাহের

পর মৃণালবাবুর এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! ফলে বিশ্বকোষ প্রেস ও শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেসে যখন ভাগাভাগি করিয়া পরিষদের মুদ্রাঙ্কন কার্য্য হইতেছে বলিয়া প্রকাশ, তখন লোকের এরূপ ধারণা নিতান্ত ভিত্তিহীন বলিয়া মনে করা দুষ্কর।

পরিষদ গ্রন্থাবলী প্রকাশ সম্বন্ধে আর ও একটী অভিযোগের কথা শুনিয়া আমরা অধিকতর বিস্মিত হইয়াছি। যে সকল সৎগ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণের সুবিধার অভাবে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা,—যে সকল সুলেখক অর্থাভাবে সদ্গ্রন্থ প্রকাশে অসমর্থ, পরিষদ সেই সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিবেন। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি সংগ্রহ করিয়া পরিষদ তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবেন, এই সকল কথা মুখে করিয়াই পরিষদ ভূমিষ্ঠ হন। এ পর্য্যন্ত পরিষদে ৫৩ খানি পুস্তক পরিষদগ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত "গীতার ঈশ্বরবাদ" গ্রন্থখানি অন্যতম। শুনা যায় পরিষদের অর্থে এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও ইহার লভ্যাংশ হীরেন্দ্র বাবুর ভাগে এবং গ্রন্থসত্বও হীরেন বাবুর নিজের। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোক লইয়া মানবসমাজ গঠিত। সামান্য সাহিত্যপরিষদের সভ্যমণ্ডলীর মধ্যেই যখন ছত্রিশ রকম প্রকৃতিসম্পন্ন লোকের সমাবেশ, তখন এই বিরাট মানবসমাজে যে কতরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন লোক থাকা সম্ভব তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই কোন কোন লঘুচেতা লোক বলিয়া বেড়ায়,—পরিষদের অর্থে গীতা হইতে ঈশ্বরকে 'বাদ' দিবার পোষকতা করিয়া জনসাধারণের অর্থের অপব্যবহার করা হইয়াছে।

'তীর্থ পর্য্যটন' নাম দিয়া মাননীয় দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পিতার যে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পরিষদের অর্থে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, শুনা যায় ঐ গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে গ্রন্থপ্রচার সমিতির [illegible] গৃহীত হয় নাই। আমরা যতটা জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে ঐরূপ গ্রন্থপ্রণয়ন সভ্যগণের মতের প্রতিকূল। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এরূপ অর্থহীন নহেন যে, তাঁহার পিতার ভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশের উপযোগী হইলে তিনি স্বয়ং সে ভার গ্রহণ করিতে পারিতেন না। অতএব জনসাধারণের অর্থে সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের প্রতি এরূপ অযাচিত ভক্তি প্রদর্শন বিধিবিরহিত বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে।

সত্যকথা বলিতে হইলে, ইহাই বলিতে হইবে যে, গ্রন্থপ্রকাশ সম্বন্ধে পরিষদের কর্ম্মকর্ত্তাগণ যে নীতির অনুসরণ করিতেছেন, তাহা পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী নহে। পরিষদে গ্রন্থপ্রচারসমিতি অথবা প্রেসকমিটী দেশের লুপ্তগ্রন্থের উদ্ধারকল্পে কোনরূপ চেষ্টা করেন বলিয়া মনে হয় না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে বহরমপুরে প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত কবিরাজ গঙ্গাধর কবিরত্ন মহাশয়ের মনুসংহিতা (প্রমাদভঞ্জনী টীকা সহ) গ্রন্থ খানির পুনর্মুদ্রাঙ্কন জনসাধারণের নেত্রগোচর হইত। বিশেষ চেষ্টা করিলে উক্ত গ্রন্থের দুই চারি খণ্ড এখনও পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু দিনকতক পরে উহা হয়ত দুষ্প্রাপ্য হইবে। জানি না, সাহিত্যপরিষদ্ এই অমূল্য গ্রন্থখানির পুনর্মুদ্রাঙ্কনের ভার গ্রহণে অগ্রসর হইবেন কি না।

যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়ের প্রেরিত পত্র পাঠ করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পরিষদের সভাপতি রূপে যেরূপ স্বেচ্ছাচারিতা প্রয়োগ করিয়াছেন, পরিষদের কার্য্যপরিচালন সম্বন্ধে তাহা অনুমোদনীয় বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে যে, রামেন্দ্রবাবু, হীরেন্দ্রবাবু, মৃণাল বাবু, নগেন বসু প্রমুখ জনকতক লোকের দ্বারা অনেক অসঙ্গতিও সঙ্গত বলিয়া চলিয়া গিয়াছে, এখনও চলিতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শাস্ত্রী মহাশয়ের আমলে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত প্রমুখ বৈদ্য-সভ্যগণ যেরূপ নিগৃহীত হইয়াছেন

বলিয়া প্রকাশ, তাহাতে বৈদ্য-সভ্যগণের পরিষদের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য ছিল। জানি না, ইঁহারা কোন্ উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আত্মসম্মান-আত্ম-মর্য্যাদা বলিদান দিয়া সম্প্রদায় বিশেষের ক্রীড়া-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছেন না। পত্রপ্রেরক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় একজন বৈদ্যসন্তান। তিনি এই পত্র প্রচার করিয়া পরিষদের সহিত কোনও সংশ্রবে সংসৃষ্ট আছেন কি না জানি না। আমাদের বিশ্বাস্ তিনি নিশ্চয়ই সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমরা বারান্তরে তাঁহার পত্র অবিকল প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের গোচর করিব।

৺কবি প্যারীমোহনের কুমারসম্ভব হইতে

পার্ব্বতীর তপস্যা।

[অধ্যাপক শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী, এম, এ]

মদন দহন করিয়া স্মরণ
কাতরা পার্ব্বতী অতি।
পিতার ভবনে কান্দে মনে মনে
নিন্দিয়া রূপের প্রতি॥ ১

কাম না পূরিল কাম যে মরিল
হৃদয়ে হানিল শূল।
আমি যে পাপিনী অতি অভাগিনী
আমি ত ইহারি মূল॥ *

বৃথা এ জীবন বৃথা এ যৌবন
না মিলিল প্রিয়জন।
সলিলে মগন হব বা দহন
অথবা পশিব বন॥*

যদি সে পিণাকি, দিলে মোরে ফাঁকি
দেখিব কি হয় বাকি।
যে আছে কঠোর সেই গতি মোর—
পাই কি না পাই দেখি॥ †

তবে কত দিনে বাঁধি নিজ মনে
এমনে পার্ব্বতী সতী।
তপস্যার তরে ভাবিল অন্তরে
পাইবারে পশুপতি॥

অর্দ্ধ দেহ ভাগ যাঁর অনুরাগ
মৃত্যুঞ্জয় যেই পতি।
তাঁহারে লভিতে এই পৃথিবীতে
কি আছে অপর গতি। ২

ধিক্ এ সংসারে ধিক্ বিধাতারে
অবলারে দেহ ক্লেশ।
নাহি বিবেচনা নাহি রে করুণা
নাহি রে দয়ার লেশ॥*

যে জন-যৌবন করিতে বহন
ভারে অবনত-কায়।
বিরহের ভার উপরে তাহার
দেওয়া কি উচিত হয়?*

শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে
হরে ভাবি কাল হরে।
দেহ যে বা সোণা হইল বাসনা ‡
বাসনা কে পূর্ণ করে?*

এথা সখীচয় মেনকারে কয়
দুহিতার সমাচার।
পড়ি প্রেমপাশে হরলাভ আশে
পাগলী মেয়ে তোমার॥*

না মানে বচন নহে নিবারণ
নাহি চাহে সখীগণ।
কান্দয়ে গোপনে অঝোর নয়নে
মাগি সে জীবন-ধন॥*

---

* তারকা-চিহ্নিত পদ্যগুলি অনুবাদ নহে, ও গুলি গ্রন্থকারের নিজের।

† কঠোর কষ্টসাধ্য উপায়ে কামনা পূর্ণ হয় কিনা দেখিব।

‡ কদলীকাণ্ডের শুষ্ক ত্বক্।

ভূধর মহিলা অমনি বোহিলা
শুনি তনয়ার পণ।
নিকটেতে গিয়া বুকেতে করিয়া
কতই কাঁদিয়া কন ॥৩

ওরে বাছাধন, প্রাণের রতন
তপেতে কেন রে মন।
কিসের অভাব কেন রে এ ভাব
বুঝিতে নারি কারণ ॥*

জিনিয়া মাখন দেহ সুচিকণ
তাহে কি তপস্যা হয়।
কমল কোমল বিনা ভৃঙ্গ-দল
অন্যের কি ভার সয়?

পলকে পলকে সতত যাহাকে
হারাই—হারাই করি।
সে হেন রতনে পাঠাইয়া বনে
কেমনে জীবন ধরি ॥ *

যার চাঁদ মুখ দেখে ভুলি দুখ
বিরহে নয়নে জল।
তাহারে বিদায় দিয়া হায় হায়
বাঁচিব কেমনে বল ॥ *

বাছা রে আমার 'মা' বলিয়া আর
কে ডাকিবে দুখিনীরে।
সোণার সংসার হবে রে আঁধার
ডুবিবে দুখের নীরে ॥*

নয়নেতে আর ওরূপ তোমার
হেরিতে কভু না পাবে।
ও সুধা-বচন না করি শ্রবণ
কেমনে পরাণ রবে? *

পাষাণ-তনয়া পাষাণ-হৃদয়া
দয়া নাহি তোর মনে।
তাই হেন পণ করেছ ভীষণ
যাইতে চাহরে বনে ॥*

ধরেছি উদরে কত ক্লেশে পরে
করেছি তোরে পালন।
মায়ের বচন কর রে শ্রবণ
যেওনা যেওনা বন ॥ *

গৃহে দেব কত আছে শত শত
তাঁদিগে কর পূজন।
নহে এই ক্ষণে দুখিনীরে প্রাণে
বধিয়া কর গমন ॥ ৪

এরূপে বিবিধ মত বুঝান জননী কত
তবু কন্যা না মানে বারণ।
নিম্নগামি জলধারে কেবা নিবারিতে পারে
কে নিবারে প্রিয়গামি মন ॥ ৫

এক দিন সতী সখীগণ প্রতি
কহিলা করি মিনতি।
মোর সমাচারে জানায়ে পিতারে
আনি দেহ অনুমতি ॥

বনবাসী হব তপস্যা করিব
শঙ্করে করিব সেবা।
তপস্যা সাধন ও শরীর পাতন
কপালে আছয়ে যেবা ॥ ৬

জনক আমার ইথে যেন আর
না করেন অন্য মত।
তা হ'লে এবার চরণে তাঁহার
বিদায় জন্মের মত ॥ *

হেন নিবেদন করিয়া শ্রবণ
প্রমাদ ভাবিল গিরি।
চক্ষে ধারা বয় কাঁপিছে হৃদয়
সব শূন্যময় হেরি ॥*

নিদারুণ পণ কেন রে এমন
করিল তনয়া মম।
হায় হায় হায় শুনে প্রাণ যায়
বাজিল ব্যথা বিষম ॥*

কেন বা বামণা † দিল এ মন্ত্রণা—
সেই ত ইহারি মূল।
কেন বা তথায় ‡ রাখিনু সুতায়
এখন না পাই কূল ॥*

† নারদ। ‡ শিবের আশ্রমে (শিবের পূজার জন্য)।

বুঝিতে না পারি এখন কি করি
উপায় কোথায় হায়!
আজি এ কি দায় ঘটিল আমায়
কুঠার হেনেছ পায়॥
এইরূপ শেষ বিলাপি বিশেষ
দিলা গিরি অনুমতি।

হয়ে হর্ষযুতা গিরিরাজ-সুতা
কাননে করিল গতি॥
অতি মনোহর হিমের শিখর
ময়ূর দখিণে বামে।
গৌরীর আশ্রয় লোকে তাই কয়
"গৌরী-শিখর" নামে॥৭

(ক্রমশঃ)

বৃদ্ধের বচন।

[শ্রীআত্মারাম শর্ম্মা।]

বুড় বয়সে ঢের উৎপাৎ সইতে হয়। যাঁরা পেন্‌সুনে বুড়, তাদের কতকটা সুখ আছে,—রাত্ পোয়ালে হাতমুখ ধুয়ে বৈঠকখানায় বসা,—সাম্‌নে চা'র পেয়ালা,—হাতে খবরের কাগজ, আর মুখে গড়্‌গড়ার নলটা!—তার উপর নাতি-পুতি থাক্‌লে বাটী হাতে ক'রে চৌদ্দিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে, 'দা'মশয়ি আমায় একটু চা' বলে কুরুক্ষেত্র বাধান! এগুলি কলির একতর স্বর্গসুখ। আর যারা আমার মতন বিনা তন্‌খায় পেন্‌সুনে-বুড়, তাদের কি দশা, তা তোমরা কল্পনাতেও আন্‌তে পার না। কাজ কর্ম্মের শক্তি ও প্রাপ্তি, এ দুটোর অভাবেই এহেন পেন্সন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি দগ্ধ উদরটার পেন্‌সনের ব্যবস্থা থাকৃত, তা'হলে একরূপ মন্দ ছিল না। ফলে এশ্রেণীর পেন্‌সুনেদের উদরটা আবার বেয়াড়া! যাঁরা তন্‌খাওলা পেন্‌সুনে, শুনেচি তাদের খিদেটা অনেক কম। তা হবারই কথা। সুখভোগেই তাঁদের উদরটা ভর্ত্তী থাকে, অন্নের স্থানটা সুতরাং কমই থাক্‌বার সম্ভাবনা। কিন্তু আমার মতন বিনে তন্‌খার পেন্‌সুনেদের খিদেটা আঠার আনার ওপর! লোকে বলে,—যাদের ভাবনা-চিন্তা বেশী, তাদের খিদে হয় না। আমি ত দেখ্‌তে পাচ্ছি, সে কথাটাই মিছে। মোদ্দা নিজের কথাটা ধ'রে ত ঐ কথাটা মিছে ব'লে বল্‌তে আমার একটুকু শঙ্কা হয় না।

তা যাক্। 'চিন্তা জিনিষটা কিন্তু বড়ই সর্ব্বনেশে। শুধু সর্ব্বনেশে নয়, সর্ব্বব্যাপী। তবে কারু বেশী, কারু কম। যাদের যেটার অভাব, তাদের চিন্তার চেয়ে, যাদের সেটা আছে, তাদের চিন্তা, জায়গা বিশেষে বেশী। এই দেখ না কেন, যাদের পয়সা আছে, তাদের পয়সার চিন্তাটাই বেশী! চিন্তাটা—বাড়াবার আর পুঁজি কর্‌বার। এ চিন্তা ক'রে যাঁরা বাড়ান, আর পুঁজি করেন, তাঁদের চিনির বলদও বল্‌তে পার,—ধোবার গাধাও বল্‌তে পার! পয়সার ব্যবহারের মধ্যে তারা জানেন,—মাগ্-ছেলেকে সাজান,—দুয়োর থেকে ভিকিরী তাড়ান,—ছেলেকে কুষ্মাণ্ড গড়ান, আর কিসে পয়সায় পয়সা বিয়োয়, তার ফাঁদ পেতে পয়সা ভাঁড়ে ফেলান! কিন্তু যাঁরা এরূপ করেন, চোক্‌টী বুজবামাত্রই স্বহস্তে গঠিত সোণার-চাঁদ বাবু-নন্দন তা ফুঁকে দিতে বড় বেশী বিলম্ব করেন না! পয়সার সঙ্গে একটু সৎকার্য্যের গন্ধ না থাক্‌লে তা টেকে না!

তার প্রমাণ দেখ্‌বে? অবশ্য আমার শোনা কথা, চোকের দেখা নয়। কলুটোলার গোপাললাল শীল যেদিন সাবালকত্বে পা দেন, সে দিন বেলচেম্বারের হাত থেকে রোক্ চুয়ান্ন লাক টাকা পান। তার ওপর তিন্‌টে ইষ্টেটের মুনফা তাঁর হাতে পড়্‌ল। বল্‌তে গেলে গোপাললাল যেন টাকার

মহাসাগরে পড়্‌লেন! শুনলে বিশ্বেস করবে কি যে, বছর বার-চৌদ্দ বাবুয়ানা ক'রে মরবার সময় ছয় লাক্ টাকা দেনা রেখে গেলেন! তারপর থেকে এ সংসারটায় চাদ্দিক থেকে লুট-তরাজের ধূম লেগে গেল, কত উকীল এটর্ণী গুছিয়ে গেল! এখনো যে তার কসুরটা হচ্চে তা মনে ক'রোনা। কিন্তু এততেও যে সংসারটা এখনো ঠিক থাক্‌তে পার্‌চে, কেন বল দেখি?

মতিশীল পয়সার সদ্ব্যবহারের জন্যে যে সব বিধি-ব্যবস্থা ক'রে রেখে গেচেন, তাতে ছুঁচ ফোটাবার কারু ক্ষেমতা নেই। বিধবাদের মাসিক বৃত্তি, ফিরি ইস্কুল, ধর্ম্মশালা, অতিথিশালাগুলোর জন্য যা ক'রে রেখে গেচেন, লুট-তরাজের হাত তার কাছেও ঘেঁস্‌বার যো নেই! পউত্তুর দুটীও তেমনি, ঠিক্ কাঁটায় কাঁটায় পিতেমো'র হুকুম তালিম ক'রে যাচ্ছেন। আর বাহাদুরী দিতে হয় ট্রাষ্ট-ষ্টেটের ম্যানেজার সুপ্রসন্ন বাঁড়ুয্যেকে। এ ব্রহ্মাণ-সন্তানের চেষ্টায়, পউত্তুর দু'জনের সদিচ্ছায় মতীশীলের মৃত্যুর ৬৯ বছর পর, এই গত আষাঢ় মাসে দুর্গাপুরে একটী নূতন অতিথশালার প্রতিষ্ঠা হয়েচে! তোমার আমার জাতের ভেতর এমনতর একটা ব্যাপার আজ কালকালকার দিনে দেখা'তে পার কি?

সেকথাটা ছেড়ে দেও। আমি একজন নিরামিষ্ পেন্‌সনে বুড়ো, আমার তন্‌খা নেই, আমার চিন্তার পারাপারও নেই। আজকালকার দিনে পেটের চিন্তার চাইতে মেয়ে পার করবার চিন্তাটাই সেরা। এটা ছোট-বড় সকলকারই আছে। বড়র চিন্তা হচ্চে ঐশ্বর্য্যের ফোয়ারা ছুটিয়ে দশজনকে দেখান, আর ছোটর চিন্তা হচ্চে বরের মূল্যের টাকা যোটান! এর কোন্ চিন্তাটা শর্ম্মাকে পাক্‌ড়িয়ে রয়েচে, তা অবিশ্যি তোমরা অনেকে বুঝ্‌তে পার। শুধু চিন্তা হ'লেও বাঁচতুম, সঙ্গে সঙ্গে একটা দুঃখ যা লেগে রয়েচে, সেটায় চিন্তাটাকে আরো চাঙ্গা করে তোলে! ভগবান ধন আর জন, এই দুটো জিনিষ সমান তুলে ওজন করে কেউকে দেন না। তাই যারা শুধু জনের বখ্‌রা পেয়েচে, কাচ্চা-বাচ্চাদের আবদার রেখে চল্‌তে না পেরে তাদের কি সুখে দিন কাটায়, শর্ম্মা তা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌চেন।

আর একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। একথাটায় একটু রগড় আছে। আইবুড় মেয়েটীর জন্যে একটী বর খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে গিয়ে হঠাৎ এক গেঁয়ে-পাটারীর দুয়োরে হাজির হলুম। বরের বেচা-কেনা সুরু হবার পর থেকে যে, কুলীন-অকুলীন সমাজ-অসমাজের বিচারটা গোল্লায় গিয়েচে, বোধ হয় এটা তোম্‌রা বেশ টের পাচ্ছ। কুল-শীল না জেনেই এর দুয়োরে গিয়েছিলুম। জান্‌তে পেলুম, তাঁর ছেলেটী অপরের ভাত খেয়ে বি, এ পর্য্যন্ত পাশ দিয়েচে, এম্ এ, পড়্‌চে। মূল্য কি চান, জিজ্ঞেস কত্তে বল্লেন,—"দু'হাজারের কম ত নয়-ই, তার ওপর যথাযোগ্য গয়না আর বরাভরণ! শুনে ত চম্‌কে গেলুম! শুধু টাকার হাক্ শুনে নয়,—পাটারি মশায়ের স্কিদের বহরটা দেখে! তাঁকে বল্লুম,—'মনীষের কৃপায় হয়ত হাজার টাকা এক সঙ্গে দেখে থাক্‌তেও পারেন, কিন্তু আইবুড় মেয়ে একটী ঘরে থাক্‌লে যদি আপনার কাছে কেউ দু'হাজার চাইত, তা' হলে আপনি মূর্চ্ছা যেতেন না কি?

যাদের মনে চব্বিশঘণ্টা এসকল চিন্তা ওঠা-নাবা করে, তারা মনটার ভেতর আর একটা কিছু এনে, নিদেন খানিককালের জন্যেও একটু সোয়াস্তির আশা করে। খবরের কাগজ পড়াটা এই সোয়াস্তি এনে দেয় ব'লে লোকের ধারণা। আমারও তেম্‌নি ছিল, কিন্তু হাল্‌কিলের খবরের কাগজ দেখে বোঝা যাচ্ছে, সেটা আরও অসোয়াস্তি ডেকে আনে! এই দেখনা কেন, আজকাল 'সেল্‌ফ-গবর্ণমেণ্ট' আর 'হোমরুল', এই দুটো জিনিষ পাবার জন্যে গোটা ভারতের লোকগুলো যেন হন্যে হ'য়ে উটেচে! এ দুটো যে কি দিল্লীর লাড্ডু, যারা দেশের প্রাণ,

—যাদের রক্তে দেশের কোটী কোটী লোকের পেটের যোগাড় হয়, তারা তার কিছুই বোঝে না। যাঁরা যাত্রারদলের ললিতা, বিশাখা, চম্পকলতার মত সমাজে নেচে-কুঁদে ফোপলদালালী করেন, তারাই বোঝেন! আবার না বুঝেও লম্ফঝম্প দেন, এমনতর দু'একটাও আছে। এরা লাফাচ্চেন তালে বেতালে! মতলবটা এই যে, এদের ভালুকে নৃত্য দেখে লোকে ঠাওরাবে—এরাও দলের 'কেষ্ট-বেষ্ট' একজন!

এখন কথা হচ্চে কি যে, স্বায়ত্বশাসনই বল, আর পরায়ত্বশাসনই বল, গরীব-গুরুবোর জান্‌টা থাক্‌লে ত শাসন আর সমরক্ষণ? দিন দিন নুন আর কাপড়ের দর যেরূপ বাড়্‌চে—নুনের দর চারপয়সার জায়গায় আটপয়সা হয়েচে,—১।৷ টাকায় যে কাপড় মিল্‌তো এখন তার দাম ৪৲ টাকা! এ সকলটার দিকে কিন্তু কেউকে চাইতে দেখা যায় না! সবারি ঝুঁকেছে, ঐ মাতব্বরী করা!!

এই ত গেল এককথা। আর একটা কথা দেখ,—চল্লিশ বছরের ওপর থেকে সুরেন বাঁড়ুয্যে দেশের জন্তে খাট্‌চে ব'লে এতদিন ছেলে-বুড়ো তোমরা সবাই বলেচ; ফলে খেটে-খুটে তোমার-আমার কি করেচেন, তা আমি ততটা বুঝ্‌তে না পাল্লেও তোমরা যদি বুঝে থাক, বেশ ভাল কথা। যে জন্তেই হোক্‌, এতদিন স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতালের ছেলেবুড়ো তাঁকে একটা বড়লোক ব'লে মেনে আস্‌চে। আজ্‌কে দেখ্‌চি, একটা ফিঙ্গেনেচা তার পেছনে লেগে তাঁর ছেঁড়া চোগাটী ঠোক্‌রাচ্চে!

আরো একটা কথা দেখনা কেন,—যাঁরা মাতব্বরী নিয়ে দেশটার শাসন নিজেদের হাতে আন্‌বার জন্তে উঠে পড়ে লেগেচেন, তাদেরি জনকতক লোক সাহেবদের দেখাদেখি 'বেঙ্গল ন্যাশন্যাল-ব্যাঙ্ক' নামে একটা কারবার ফাঁদ্‌লেন। কারবারের গা থেকে আতুড়ের গন্ধ দূর হ'তে না হ'তেই দলাদলি,—তারপর আদালতে গড়াগড়ি!

খবরের কাগজ খুলে ত আগাগোড়া এসকল সম্বাদই দেখ্‌তে পাওয়া যায়! তা' ছাড়া আর যা কিছু থাকে, তা ধর-পাকড় রাহাজানি, চুরি-ডাকাতী, খুন-জখমী ইত্যাদি! সোয়াস্তি আস্‌বে কোত্থেকে বল? এসকল ব্যাপার-ব্যবস্থার ওপর যখন ইন্দির বাঁড়ুয্যের শিষ্য ব'লে পরিচয় দিয়েও মানুষ খাঁটী বামুন ব'লে বিকা'বার জন্তে কোমর বাঁধে, তখন যে একবারে মাথাটী গুলিয়ে যায়!

ওপরে যে কয়টা কথা বল্লুম, যার মনে এতগুলো চিন্তা ওঠা-নাবা করে, তার আবার সোয়াস্তি আস্‌বে কোত্থেকে? এসব অসোয়াস্তি দে'খে এক নাতজামাই একদিন বল্লেন, 'আফিং খেতে সুরু করুণ দাদা!' আমি বল্লুম, 'দাদা' আফিং যে খায়, তাকে খেলেও মৌতাত জম্‌বে না।"

এমন বিপদকালে সুবোধ ভায়াটী নিখোজ! কেহ সন্ধান দিতে পার্‌লে ৩॥০ চৌদ্দশিকে পুরস্কার!!!

কালাচাঁদের পিনিক!

(সমাজ-তত্ত্ব।)

[শ্রীকালাচাঁদ শর্ম্মা।]

সেদিন আমার বিরহবেদনার অনেক আগেই পিনিকসুন্দরী বুঝি বিরহবিধুরা হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাই সহসা স্বয়মাগতা হইয়া আমার পৃষ্ঠদেশে মৃদু করাঘাত করিলেন। কবিরা সত্যই বলিয়াছেন,—"কবিতা বনিতা চৈব আয়াতা সুখমাবহেৎ।" তাই সরসা প্রেয়সীর সে সুখস্পর্শে

আমার এই জীর্ণ-শীর্ণ রুক্ষদেহেরও সারা অঙ্গে পুলকসঞ্চার হইল। প্রেয়সী তাই দেখিয়াই হয়তো হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"কেমন আছ কালাচাঁদ!" আদর করিয়া অনেক সময়ে তিনি আমার নাম ধরিতেন!, ইহাতে পাঠকগণ যেন তাঁহার পতিভক্তির অভাব মনে করিবেন না। কেমন আছি, তাহাতো তাঁহার জানা ছিল! তাই সে কথা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই আবার শুধাইলেন, —"তোমার এমন তত্ত্বকথা শুনিবার অবসর আছে কি?" আমি সাগ্রহে উত্তর দিলাম,—"আমার সদাই অবসর। আমিতো পরের চাকর নই লক্ষ্মী! জানত,—তোমার ঐ বিধুমুখের মৃদুহাসি মাখান মিষ্টকথা শুনিবার জন্য ভাতের ভিখারী ক্যাংলার মত সর্ব্বদাই আমি প্রস্তুত হইয়া আছি! এখন কি বলিবে, বল।"

পিনিক্ আর বৃথাকথায় সময় নষ্ট না করিয়া গম্ভীরভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন।—"সে দিনের সংসারতত্ত্ব মনে আছে ত? সংসারধর্ম্ম করিতে হইলেই মানুষকে সমাজের ভিতর থাকিতে হয়। অতএব সংসারের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজটাকে জানা আবশ্যক। সমাজ কি? সেই তত্ত্বই আজ তোমায় শিখাইয়া দিতেছি, শোন। এই 'সমাজ' কথাটার একটা বৈজ্ঞানিক অর্থ আছে। লোকে সে অর্থ না বুঝিয়া না ভাবিয়াই সমাজের গৌরব গাহিতে ব্যস্ত! কিন্তু সমাজটা সত্যই গৌরবের জিনিষ কিনা, তাহাতো আমি বুঝিতে পারিনা। তোমার ব্যাকরণের বিদ্যা বেশী নাই জানি। তবু বোধ হয় "বাঙ্গালা শিশুব্যাকরণ"খানা নিশ্চয়ই পড়িয়াছিলে! সুতরাং 'সমাজ' পদের সন্ধিবিচ্ছেদ করিলে যে 'সম' আর 'অজ' হয়, তাহা অবশ্য বুঝিতে পারিবে! 'সম' মানে সমান এবং 'অজ' অর্থে ছাগল। যদিও আদিপুরাণ রামায়ণ, রঘুর পুত্রকে ও দশরথের পিতাকে 'অজ' বলিয়াছেন এবং আমাদের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র গীতা "অজোনিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণঃ" বলিয়া 'পরমাত্মার অজ নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধের সম্ভাবনা না থাকায় এখানে আমাদের পরম লোভনীয়, মা-কালীর মহাপ্রসাদযোগ্য, ছাগনন্দনকেই অজ বুঝিতে হইবে। এখন 'সম' ও 'অজ' দুইটী কথা একত্র করিয়া দেখ, সমাজের অর্থ ছাগলের সমান হইল কিনা! এই সমান যে আকৃতির সমান নহে, তাহা অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছ? অতএব বুঝিতে হইবে, যেখানে থাকিয়া মানুষের প্রকৃতি-প্রবৃত্তি আচার ব্যবহার প্রভৃতি ছাগলের সমান হয়, তাহাই সমাজ! একে একে ইহার উদাহরণ দিতেছি! মনে রাখিও,—আমি পর্দানসীন কুলবধূ; পরের ঘরের খবর রাখিনা। অতএব আমি কেবল আমাদের বাঙ্গালী সমাজের কথাই বলিব।

শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন,—জীবের জীবাত্মা জন্মগ্রহণ কালে পূর্ব্বজন্মের প্রকৃতি-প্রবৃত্তি সঙ্গে লইয়া আসে। তাই এক এক জাতীয় জীবের মধ্যেও নানা জাতির প্রকৃতি-প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এসব 'ফিজিক্সের' কথা! হঠাৎ তুমি বুঝিতে পারিবে না। আগে আহার-বিহার প্রভৃতির সোজা কথাগুলি বুঝাইয়া দিয়া, ঐ কঠোর বিষয় দুইটী পরে বলিব।

ছাগলের আহার সম্বন্ধে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে,—"পাগলে কি না বলে? ছাগলে কি না খায়?" অর্থাৎ গৃহপালিত গরু, মহিষ, ঘোড়া, ভেড়া প্রভৃতি পশুগুলি যেমন তাহাদের নির্দ্দিষ্ট খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত অপর জিনিষে মুখ দেয় না, ছাগল তেমন নহে। এক আমিষ ব্যতীত আর সকল জিনিষই ছাগলের খাদ্য। যে কোন দেশের যে কোন মানুষ যাহা কিছু খাইতে পারে, উচ্চ শিক্ষিত সভ্য বাঙ্গালী স্বেচ্ছায় তাহাতে বঞ্চিত থাকেনা। কেবল ঐ আমিষের মত হবিষ্যান্ন মাত্র তাঁহাদের অখাদ্য! মাংসাশী 'মার্কিন' মাংস ত্যাগ করিয়া হবিষ্যান্নের পক্ষপাতী হইতে পারিয়াছে, কিন্তু চৌদ্দপুরুষ হবিষ্যান্নে অভ্যস্ত ব্রাহ্মণ-সন্তান আর নিরামিষ

খাইয়া জীবনধারণ করিতে পারেন না! শুনিতে পাই, কুলপাতা নাকি ছাগলের প্রিয় খাদ্য। সামাজিক বাঙ্গালীর ভিতরেও কতজন যে কত কত উচ্চ-কুলের মাথা খাইতেছে, তাহা বোধ হয় সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতেছ। বেড়ার রাংচিতা কোন পশুকেই খাইতে দেখ নাই; কিন্তু ছাগলের পাল, সেই রাংচিতার পাতা অতিলোভে খাইয়া থাকে। আমাদের বাঙ্গালী-সমাজের পূর্ব্বপুরুষগণ সমাজে যে জাতিধর্ম্মের বিচিত্র বেড়া বান্ধিয়া গিয়াছিলেন, আধুনিক সামাজিকগণ সেই বেড়ার বিধিনিষেধের পাতাগুলি ভক্ষণ করিয়া, অনেক দিন আগেই তাহার বৃতিত্ব নষ্ট করিয়াছেন। এখন আবার মূল পর্য্যন্ত তুলিয়া ফেলিয়া, সমস্ত সমাজ খোলা-মাঠে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন!

সমাজের আহারে অজসমত্ব বুঝিতে পারি-লেত? ব্যবহারেও সমাজ তৎসদৃশই। গ্রীষ্মের তাপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁটিগুলিও সর্ব্বাঙ্গে জল ছড়াইয়া অঙ্গ জুড়াইবার চেষ্টা করে। কিন্তু কোন ছাগলকে কখন অতিগরমেও জলস্পর্শ করিতে দেখিয়াছ কি? পিপাসায় নিতান্ত ছাতি ফাটিবার উপক্রম না হইলে বুঝি ছাগল জলপান করিতেও প্রবৃত্ত হয় না। বাঙ্গালি-সমাজ অভাবের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছে, তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াও ততোধিক কষ্ট পাইতেছে, তথাপি জুড়াইবার আশায় কখন শান্তি জলাশয়ের খোঁজ লয় না, কখন বিবেক-বৈরাগ্যের জলপান করি-য়াও তৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টা করেনা! এক ফোটা বৃষ্টির জল গায়ে পড়িলেই, ছাগল যেমন ছুটিয়া পলায়; আমাদের সভ্যসমাজও তেমনি ধর্ম্মের কথা-ভগবানের নাম শুনিবামাত্রই সেস্থান পরি-ত্যাগ করে! কেবল বলির ছাগল বলির পূর্ব্বে যেমন পরের দায়ে একবার অন্তিম স্নান করিতে বাধ্য হয়, সেইরূপ হিন্দুসন্তানেরা মরণকালে অনে-কের অনুরোধ—উপরোধ বা চক্ষুলজ্জার দায়ে একবার "গঙ্গা নারায়ণব্রহ্ম" কিংবা "হরিবোল" বলিয়া থাকে।

আহারের অতিরিক্ত যাহা কিছু, তাহাকেই আমি ব্যবহার বলিতেছি। অনেকে আবার ব্যবহারকে বিহারও বলিয়া থাকেন। যিনি যাহাই বলুন, উদ্দেশ্য সকলেরই এক, প্রভেদ কেবল উপসর্গের! একটী উপসর্গ দিয়াই বিহার নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু ব্যবহারের জন্য অনেক উপসর্গের প্রয়োজন! এই উপসর্গের অভাব দেখিয়াই বুঝি এখনকার লোকেরা বিহারের অর্থসঙ্কোচ করি-য়াছে! সে যাহাহউক, আধুনিক শাস্ত্রকারগণ যে তাঁহাদের নব্য নীতিশাস্ত্রে লিখিয়া রাখিয়াছেন,—"আহারে ব্যবহারে চ ত্যক্তলজ্জঃ সুখী ভবেৎ" ইহাও কি সমাজ অজসম না হইলে সম্ভবপর হইতে পারে? মানুষের শাস্ত্র মানুষকে নির্জ্জন স্থানে, অর্থাৎ সকলে সম্মুখে লজ্জাহীন না হইয়াই আহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। প্রকৃত বিহার কাজটি ও গোপনে কর্ত্তব্য। ব্যবহারেরও অনেক-গুলি নিলর্জ্জ হইয়া করিতে পারা যায় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত নব্যতন্ত্রের শাস্ত্রবাক্য দ্বারাও সমাজের অজসমত্বই প্রমাণিত হইতেছে না কি?

যাহাতে অনুস্বর বিসর্গ আছে, তাহাইতো আমাদের দেশে শাস্ত্র বাক্য? এইরূপ আরও একটী শাস্ত্রবাক্য আছে, তাহাতেও সমাজের অজসমত্বই প্রতিপন্ন হয়। যথা—"অজাযুদ্ধে ঋষি শ্রাদ্ধে * * * বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া।" এখানে শাস্ত্র অজাযুদ্ধে যেমন বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া বলিয়াছেন, তেমনি বাঙ্গালীর যুদ্ধকার্য্যটা যদিও এতদিন অশ্ব-ডিম্ববৎ অসম্ভব ছিল, তথাপি তাহাদের সাধারণ মারামারি দেখিলেও সেই বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়ারই পরিচয় পাওয়া যাইত। তাহারা কাপড় সামলাইতে, আস্তিন গুটাইতে, তাল ঠুকিতে যতখানি আড়ম্বর করে, তাহার তুলনায় তাহাদের মারামারি কাজটী লঘু ক্রিয়াই হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কেবল মারামারি কাটাকাটিই এখানে যুদ্ধ কথার উদ্দেশ্য নহে; এ যুদ্ধের অর্থ প্রতি-যোগিতা। তুমি দ্বিতল অট্টালিকায় বাস করিতেছ,

আমি ত্রিতল প্রাসাদ খাড়া করিয়া তোমার উপরে উঠিতেছি! তুমি তোমার বাড়ীতে রং চং সাজসজ্জা প্রভৃতির আড়ম্বর অল্প কর নাই, আমিও আমার প্রাসাদ বহু বহু ফর্ণিচারে সুসজ্জিত করিয়াছি! কিন্তু সে বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্ম উভয়েরই অতি লঘু। তোমার অত বড় অট্টালিকাতেও দুইজনের বেশী দশজন স্থান পায় না, আমি ও আমার রাজপ্রাসাদে পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রটীকে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে বারণ করি! তুমি তোমার পরিবারভুক্ত অপর সকলের জন্য মোটা ডাল ভাতের বরাদ্দ করিয়া, নিজের জন্য দুইবেলা দুই সের খাঁটি দুধ ও দুই ছটাক করিয়া গব্যঘৃতের ব্যবস্থা করিয়াছ, আমিও আমার জন্য কালিয়া পোলাও, ক্ষীর, মাখনের বন্দোবস্ত করিয়া, বাপ মা ভাই ভগ্নীদের জন্য ডাঁটা পাতা খোলা বীচির চড়চড়ি ভাতের বরাদ্দ রাখিয়াছি! তুমি জুড়ী হাঁকাইতেছে, আমি চৌঘুড়ি চালাইতেছি! তোমার দুয়ারে একটী দ্বারবান্ দীন দুঃখীদিগকে ভিতরে যাইতে দেয় না! আমার সিংহ দ্বারেও দুইজন দ্বারবান্ ভিক্ষুক মাত্রকেই গলাধাক্কা দেয়। এইরূপে আমাদের বাড়ী, গাড়ী, সাজ, সরঞ্জাম, আয়োজন, অনুষ্ঠান, সকল বিষয়েই যেমন প্রতিযোগিতা চলিতেছে, তেমনি তাহার আড়ম্বরে বাহুল্যের এবং ক্রিয়ার লাঘবের পরিচয়ও আমরা প্রচুর দিতেছি! সুতরাং এই প্রতিযোগিতার যুদ্ধকে অজাযুদ্ধ বলিতে হইবে বই কি?

কেবল যুদ্ধে নহে, বাঙ্গালীর বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া সর্ব্বত্রই। কাহারও ধর্ম্মে মতি হইয়াছে; সর্ব্বাঙ্গে তাঁহার তিলক-ছাপ ও হাতে হরিনামের মালা একমুহূর্ত্তের জন্য ও ছাড়া নাই দেখিবে! কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম—সত্য, দয়া, সরলতা প্রভৃতিতে তিনি এমনই লঘুত্বের পরিচয় দিতেছেন যে তাহার অস্তিত্বই স্বীকার করা যায় না! কেহ 'দাতা' নাম পাইবার আশায় 'পুত্রোৎসব' উপলক্ষে 'দানসত্র' খুলিয়া, খবরের কাগজে দশলাখ টাকা খরচের কথা ছাপাইয়া দিলেন! কিন্তু সে খরচের লক্ষ টাকায় পুত্রবধূর অলঙ্কার, দুইলক্ষে গৃহিণীর গহনা, আর পাঁচ লাখ টাকার পুত্রবধূর বাসোপযোগী প্রকাণ্ড ধর্ম্মভবন (?) গড়াইয়া, বাকী টাকা বাগ্ভাণ্ডে প্রীতিভোজে উড়াইয়া দিলেন! তাহার এক কপর্দ্দক ও চিরদিনের আশ্রিত অনুগত প্রত্যাশী দিগকে দিতে কুলাইল না! কোন পণ্ডিত 'পুত্রের বিবাহে যৌতুক লইব না' বলিয়া বড় গলায় তাহা গল্প করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিবাহের সময়ে ফর্দ্দ পাঠাইয়া তিন প্রস্থ গহনা আদায় করিতে ক্রটী করিলেন না! পণ্ডিত তিনি, কুটুম্বের সহিত আর্থিক ব্যবহারে চক্ষুলজ্জা দেখাইয়া, শাস্ত্র শাসনে উপেক্ষা করিবেন কেন? অথবা, এই সকল কার্য্যে ও জয়ের আশা অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং ইহা ও যুদ্ধ। তাই এসব যুদ্ধেও অজাযুদ্ধের মতই বহ্বাড়ম্বর এবং ক্রিয়ার লাঘব দেখিতে পাওয়া যায়।

আহার বিহারের পর আচার বিচারের কথাও আলোচনা করা উচিত। এখানে আচার অর্থে আচরণ বা চাটনি আমার লক্ষ্য নহে। এ আচার মানে শুচিতা। অজের শুচিতা-বোধ কিনা? তাই তাহারা লোভনীয় শস্যভূমিতে ঢুকিবার জন্য যেমন বিষ্ঠাবন মাড়াইয়া যাইতে আপত্তি করে না, কিংবা শস্য-জমীতে কাঁটার বেড়া থাকিলেও, তাহার ফাঁকে গলা গলাইয়া শস্য খাইবার চেষ্টা করে, আমাদের সমাজও তেমনি কাঞ্চন-কুলীনকে মাথায় লইবার জন্য কোন অপকর্ম্মে অরুচি দেখান না! এবং তাহার জন্য ধর্ম্মের শাসন, ভদ্রতার মর্য্যাদা পদদলিত করিতে ও কুণ্ঠিত হন না, তোমার পয়সা থাকিলে, তুমি মুসলমান বাইজি রাখ, ইংরাজি হোটেলে খাও, ঘরে মুর্গি পুষিয়া বাবুর্চ্চি দিয়া রান্ধাও, সমাজ তাহাতে কোন কথা বলিবে না! পয়সার জোরে বড়সাহেবের সহিত পঙ্ক্তি ভোজন কর, হিন্দুমতে বিলাত বেড়াইয়া এস, ট্যানারি খুলিয়া চামড়ার কারবার কর, তবুও সমাজ তোমাকে

সমাজপতি করিবার জন্য তোমার দুয়ারে দশবার আসিবে! কিন্তু তুমি দরিদ্র-শ্রোত্রীয় হইলে, পেটের দায়ে ব্রাত্যের গলায় পৈতা দিলেও তুমি পতিত হইবে। আর তোমার 'মামার শালা পিসের ভাই' বিলাত গেলেও তোমার জাতি যাইবে! ছাগলের গায়ে ময়লা মাটী লাগিলে, তাহারা যেমন গা ঝাড়িয়া তাহা পরিষ্কার করে, আমাদের সমাজও তেমনি, কোথাও মুখের বচন কোথাও বা শাস্ত্রীয় বচন ঝাড়িয়া সকল কালী মুছিয়া ফেলে! হিন্দুসমাজ মুসলমানস্পৃষ্ট জল স্পর্শ করে না, কিন্তু সোডা, লেমনেড্ সমাজে চলে! শাস্ত্র বলিয়াছেন "দ্রব্যং মূল্যেন শুদ্ধতি।" টীকাকার আবার দ্রব্যের সহিত দ্রব্যবাহককেও শুদ্ধ করিয়াছেন! নতুবা, যে মেথর গা ঘেঁসিয়া গেলে গা ঘিন ঘিন্ করে, সে-ই আবার পাগড়ী বান্ধিয়া চাপকান উড়িয়া খানার ডিস্ আনিয়া দিলে, তাহা অমৃত বোধ হয় কেন? কোন্ বাবুই বা গ্রেট্ইষ্টার্ণের পাঁউরুটি সহিসের মারফৎ আনাইয়া সান্ধ্যভোজন না করেন? অথবা বাবুদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, যে সব অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী মহা-ব্রাহ্মণ, সৎশূদ্র প্রদত্ত সিধা লইতেও জাতিনাশের আশঙ্কা করেন, তাঁহারাই আবার সহরে আসিয়া হোটেলওয়ালীর আশ্রিত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের হাতে অন্ন-ব্যঞ্জন খাইতে আপত্তি করেন না! কত বলিব? সমাজের সকল আচারই এইরূপ অজ্ঞ-বুদ্ধির পরিচায়ক।

বিচার ব্যাপারেও সমাজের এইরূপ বুদ্ধিরই প্রমাণ পাওয়া যায়। সংসারীর কাছে ছাগলের পাঁটা, পাঁটী, খাসী সকলেরই প্রয়োজন আছে। তন্মধ্যে হিন্দুরা কেবল পাঁটাই খোঁজে; পয়সার জোরে অনেকে খাসীও খুঁজিতেছে! কিন্তু হিন্দুকে কখন পাঁটী খুজিতে দেখি না! তাই হিন্দুপর্ব্বে, বিশেষতঃ শক্তিপূজার সময়ে পাঁটার দর বড়ই বাড়িয়া উঠে। যাঁহাদিগকে ভগবতীর প্রতিমূর্ত্তি কুমারীর পূজা করিতে হয়, অর্থাৎ যাঁহারা কন্যাদায়গ্রস্ত, তাঁহারা সকলেই জানেন পাঁটীর বিকট দরের জন্য হিন্দুকে কেমন সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইতেছে! হিন্দুর ঘরে পাঁটীর দর নাই বলিয়াই বুঝি কন্যা-বিদায়ের সময়ে ধনকুবের দিগকেও বাড়ী বাড়ী কন্যা লইয়া ঘুরিতে হয়! মুসলমান-সমাজে কিন্তু পাঁটীর বা হালোয়ানের আদর খুব বেশী। তাই মুসলমান-মহিলার দুই তিনবার বিবাহও অক্লেশে হইতে দেখা যায়। মুসলমানের জাতি আছে, ধর্ম্ম আছে, একতা আছে,—তাঁহারা একের দুঃখে অন্যে কাঁদিতে জানেন। সুতরাং তাঁহাদের কাছে পাঁটা-পাঁটীর কোন পক্ষপাতিতা নাই। আর আমরা দেবর্ষি-মহর্ষির বা দেবতার বংশধর আর্য্যসন্তান বলিয়া গৌরব করি, কিন্তু স্বার্থের দায়ে মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত আমরাই বিসর্জ্জন করিয়াছি! সমাজে যখন পাঁটা সৃষ্টির জন্য পাঁটীরই বেশী প্রয়োজন ছিল, তখন পাঁটী ব্যবসায়ীরা যেমন চরাদামে তাহা বেচিয়া গিয়াছে, আজ্ দুই দশজন বড়-লোক অসম্ভব অতিরিক্ত দাম দিয়া পাঁটা কিনিতেছেন বলিয়াই বুঝি পাঁটাব্যবসায়ী মাত্রই পাঁটার দর আগুন করিয়া তুলিয়াছে!

শুধু দর বেশী নহে, পাঁটাওয়ালাদের গুমোরও বড় বেয়াড়া রকমের চড়িয়া উঠিয়াছে! মা-লক্ষ্মীর ঝাঁপি পাইয়া, যাঁহারা দশ-বিশ হাজার টাকা দামেরও বিশেষ লোভ রাখেন না, তাঁহাদের কাছেই ঐ গুমোরের বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়! যথাসময়ে পাঁটী বিদায় না হইলে, গৃহস্থের বিপদ্ আছে! যাঁহারা ধনবানের গৃহে তাহা রাখিবার আকাঙ্ক্ষা করেন, এখন তাহাদিগকে পাঁটী ঘাড়ে করিয়া ধনীর গৃহে পছন্দ করাইবার জন্য যাইতে হয়! বড় বড় ধনকুবেরগণই এই কদর্য্য প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, এবং এখনও তাঁহারাই কেবল ইহার পরিণাম ফলে আত্মগ্লানি ভোগ করিতে-ছেন! কিন্তু ইহাদিগকেই আদর্শ করিয়া আমরা যেরূপ সামাজিক বিধিব্যবস্থা চালাইয়া থাকি, তাহাতে এই কুপ্রথাও যে একদিন সমস্ত সমাজে

ছড়াইয়া পড়িবে না, কে বলিতে পারে? এখন বলতো কালাচাঁদ! এমন বিচারবুদ্ধি যে সমাজের, তাহাকে সম+অজ ভিন্ন আর কি বলিব?

পাঁটা—পাঁটী বুঝিতে পারিয়াছ ত? এখন বল দেখি—আমাদের সমাজে খাসী কে? "স্ত্রীলোকের কাছে বিশেষতঃ নিজের স্ত্রীর সম্মুখে অপ্রতিভ হইতে মানুষে পারে না! আমিও তো মানুষ! তা'তে আবার আগেকার কালে নবাব-বাদসাদের বাড়ী যে খোজা পাহারা থাকিত, সে কথাটা আমার জানা ছিল। তাই চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিলাম—"কেন? খোজা!" উত্তর শুনিয়া পিনিক্ একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"না পণ্ডিত! খোজার সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ নাই। হিজ্‌রের দলও সমাজের বাহিরে থাকে! তা'দেরকে আর আমাদের ভিতর টানিয়া আনিও না। সমাজের খাসি, ঘর-জামাই ও পোষ্যপুত্র। প্রচুর টাকা থাকিলেই লোকে সখ্ করিয়া এসব কিনিয়া লয়। ইহাদের নধরদেহে চর্ব্বির বাহুল্য দেখিয়া, সমাজের কত লোক তাহা চোঁয়াইয়া পড়িবার আশা করে! কিন্তু খাসী জীবিত থাকিতে সেই মোটা চামড়া ভেদ করিয়া কখনও এক ফোটা চর্ব্বি কোথাও পড়িতে দেখিবে না! তবে, চর্ব্বির গরমে আপনি যখন তাহারা ফাটিয়া মরে, তখন পথের লোকেও সে চর্ব্বি কুড়াইয়া পাইতে পারে! ঘর-জামাই ও পোষ্যপুত্র প্রভৃতি উত্তরাধিকারী হইলে প্রসিদ্ধ দাতার সম্পত্তিরও কিরূপ সদ্ব্যবহার হয়, এবং তাঁহারা কেমন অবস্থায় কত স্থানে কল্পতরুর মত অর্থব্যয় করেন,, তাহা ভাল করিয়া দেখিলেই অমার এ কথা বুঝিতে পরিবে। এখন যে কথাটা বাকী আছে, সেই ফিজিক্সের বিষয়ই বুঝাইয়া বলিব, অবহিত হও।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জীবের পূর্ব্বজন্মের সংস্কার অনুসারে বর্ত্তমান জীবনে প্রকৃতি-প্রবৃত্তি প্রকাশ পায়! সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তির সাদৃশ্য অনুসারে আমাদের সমাজ অজসম হইলেও, সামাজিক সকল লোকের প্রকৃতি-প্রবৃত্তি কখনই এরূপ হইতে পারে না। অতএব অজ কথাটা এখানে উপলক্ষণ মাত্র মনে করিয়া, সমাজপালিত সমস্ত পশুর সঙ্গেই আমাদের তুলনা করিতে হইবে। মানুষ যেমন অর্থের ও অবস্থার প্রভেদানুসারে ভাগ্যবান ও হতভাগ্য বলিয়া গণ্য হয়, পশুরাও তেমনি আকৃতির ও কর্ম্মভোগের তারতম্যে ছোট বা বড় নামে পরিচিত হইতে পারে। এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া বুঝিয়াছি,—মানব-সমাজের বড় লোক আর পশুসমাজের মধ্যে হাতী, উভয়ই এক জাতীয়। উভয়ের দেহ পরিধিই তাহার প্রথম প্রমাণ! তাহা হইতেও প্রকৃষ্ট প্রমাণ—উভয়ের চক্ষু সাদৃশ্য! হাতীর ছোট চোখ, আর বড়লোকের ছোট নজর প্রসিদ্ধ। অনেকে আবার বড়লোকের বিদ্যা-বুদ্ধিও হাতীর মত মনে করে। হাতীর দেহে বল প্রচুর থাকিলেও বিক্রমের অত্যন্ত অভাব। সেই দোষেই হাতী নিজের গণ্ডীর বাহিরে কাহাকেও আক্রমণ করিতে পারে না। কিন্তু শুঁড়ের কাছে পাইলে বড় বড় মহীরুহ মুহূর্ত্তে ভূমিসাৎ করে, এবং পদতলে ফেলিতে পারিলে,সিংহ ব্যাঘ্রকেও অনায়াসে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলে। মানুষ-হাতীও, নিজের অধিকার মধ্যে পাইলে,অতি বড় তেজস্বী পুরুষকেও লাঞ্ছিত করিয়া উদ্বাস্ত করেন! আবার পেটের জ্বালায় বা দেনার দায়ে পদলুণ্ঠিত হইলে, মহা মহা পণ্ডিতদিগকেও পদাঘাতের মত অপমানিত করিতে ক্রটী করে না! চাকুরির বাধ্যতায় বা ভিক্ষার প্রলোভনে যাঁহারা ধনিসমাজের আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বোধ্ হয় এই মীমাংসার সত্যতা সম্বন্ধে স্বাক্ষ্য দিতে পারিবেন।

হাতী যখন অত্যন্ত গরম হইয়া উঠে, তখন তাহার মাথা খারাপ হয়! সেই অবস্থায় সকলের আগে নিজের মাহুতকেই তাহারা হত্যা করেন। মানুষ-হাতীও আশার অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিলে, বড় বেশী রকম গরম হইতে দেখা যায়। সেই গরমে সর্ব্বাগ্রেই তাঁহারা তাঁহাদের পুরাতন

কর্ম্মচারীকে দূরে তাড়াইয়া দেন। হয়তো মনে করেন,—ইহারা না থাকিলেই আমার পূর্ব্ব পরিচয় চাপা পড়িবে। যাহারা নিজের দেহপাৎ করিয়া তাঁহাকে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দিয়াছে, তাহাদের প্রতি কোন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ যাঁহারা কর্ত্তব্য মনে করে না, তাঁহাদের মাথা গরম বই আর কি বলিব? আমাদের দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া, যাঁহারা আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়াছেন, তাঁহাদের সংসারে এ কথার প্রমাণ দিবার লোক অনেক আছে। মাহুতহত্যার পরেই হাতীর গরমের প্রভাব এত অধিক বাড়িয়া উঠে যে, তখন যাহাকে কাছে পায়, তাহাকেই হত্যার জন্য আক্রমণ করে। আমাদের হাতীগুলির প্রথমে তাঁহার হিতৈষী-হিতকরীদিগকে হত্যা করিয়া, তৎপরে নিকটস্থ পাওনাদার বা প্রার্থীমাত্রকেই গলাধাক্কা দিতে বা প্রহার করিতেও কুণ্ঠিত হন না! মত্ত-মাতঙ্গের মদলুব্ধ মক্ষিকাপালের মত, কেবল চাটুকারের দলই তখন তাঁহাদের প্রিয় সঙ্গী হইয়া নিকটে থাকে।

বাঙ্গালাদেশে হাতীর কাছে কোন বিশেষ কাজ পাইবার আশা নাই। কেবল শোভাযাত্রার সময়ে সুসজ্জিত হাতী বাহির করিয়া আমরা শোভাযাত্রার শোভা বৃদ্ধি করি; আর শীকারের সময়ে বা জলকাদার পথে নিরাপদ থাকিবার আশায় হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করি। এদেশের মানুষ-হাতিগুলিও জুড়িগাড়ী বা মোটর হাঁকাইয়া বরানুগমন করিলে, বিবাহের শোভাযাত্রা বেশ্ সৌষ্ঠব সম্পন্ন হয়। শীকারের মত কোন জুয়াচুরির ফাঁদ পাতিতে হইলে, কিম্বা জল-কাদার পথের মত কোন নিরুপায়-কার্য্য উদ্ধারের জন্য চাঁদা সংগ্রহের প্রয়োজনকালে, দুই চারিজন বড় লোকের নাম তাহাতে জড়াইতে পারিলে, নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহার অধিক হাতীর প্রয়োজন এদেশে আর কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না।

হাতীর পরেই আমরা ঘোড়ার নাম গণনা করি। ঘোড়াজাতিটা যেন হুবহু মানুষের নকল! জাতিভেদে, অবস্থাভেদে ও ভাগ্যভেদে যেমন মানুষ নানারকম, ঘোড়ার ভিতরেও ঠিক তাই। তার মধ্যে বড় বড় ওয়েলারগুলি যেমন উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী! ঘাস, ভূষি, দানা ও সহিসের প্রচুর বন্দোবস্ত। দেহখানিও হৃষ্ট-পুষ্ট, প্রভূত বলশালী। তথাপি কিন্তু একবার শোয়ারি দিলে, আর তাহাকে যুতিবার নিয়ম নাই। সেইটুকু শোয়ারীর পরেই আবার তোয়াজের ব্যবস্থা কত! ডলন, মলন, স্নান, মার্জ্জন! বলিতে কি, সে সব দেখিয়া আমারও মনে হিংসা আসে! ইহাদের সহিত আমাদের সমাজের উজীর, দেওয়ান, ম্যানেজার প্রভৃতির বা উচ্চ রাজপুরুষদের তুলনা কর, ঠিক্ ঠাক্ মিলিয়া যাইবে। তাঁহাদেরও একমাস কাজের পর তিন মাস ছুটির বরাদ্দ! পাঁচ ঘণ্টা কার্য্যকালের ভিতরেও আবার দেড় ঘণ্টা টিফিন বা তিন ঘণ্টা খোসগল্পের অবসর আছে! তারপর গ্রীষ্মবিরাম, টুর, এলাউয়েন্স্, প্রাইজ, জায়গীর,—কত কিসের ব্যবস্থা! "বুঝ মনে যে জান সন্ধান!"

ওয়েলারের নিম্নশ্রেণীস্থ সুস্থ, সবল, পুষ্ট পরিশ্রমী মধ্যম জাতীয় ঘোড়াগুলিকে 'গৃহস্থ ঘোড়া' নামে আমি অভিহিত করিতেছি। ইহাদের মেহনতের উপযুক্ত খাদ্যের অভাব নাই! দেহখানিও দেখিতে মন্দ নয়! প্রয়োজন অনুসারে কখন বেশী, কখন বা অল্প খাটুনি থাকিলেও, জীবন রক্ষার উপযোগী অবসরের বন্দোবস্ত আছে। অতএব ইহাদের সহিত আমাদের ডেপুটী, মুনসেফ্, দারোগা, নায়েব প্রভৃতি গৃহস্থশ্রেণীর কর্ম্মচারীগণের সাদৃশ্য বেশ পরিস্ফুট। সেটুকু তুমি নিজেই অবশ্য মিলাইয়া লইতে পারিবে, বিস্তৃত ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

অতঃপর ঐ অগতির গতি, পতিতপাবন, ছ্যাক্‌রা গাড়ীর ভুগ্নপৃষ্ঠ, রুগ্নদেহ অস্থিচর্ম্মসার পক্ষিরাজগুলিকে স্মরণ কর। তাহারা যেন আমাদের এই বংশসর্ব্বস্ব কঙ্কালসার কেরাণী ক্লাশ। টীকাটুকু না লিখিলে, বংশসর্ব্বস্ব কথাটা বোধ হয়

বুঝিতে পারিবে না! যাহাদের নিজের কোন কৃতিত্ব নাই, যোগ্যতা নাই, পরিচয় দিবারও কিছু নাই, কেবল পিতা-পিতামহ প্রভৃতির সুকৃতি সুনাম স্মরণ করাইয়াই যাহারা নিজের গৌরব-মর্য্যাদা জানাইতে চাহে, অথবা জীবনধারণে, সংস্কার-পালনে, চাকুরী চালাইতে, ইজ্জৎ বাঁচাইতে, সর্ব্বত্রই যাহাদের—"............বাঁশরে লক্ষণ।" তাহারাই জানিবে বংশসর্ব্বস্ব!

গাড়ী ও ঘোড়ার অবস্থানুসারে যেমন তাহা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে বিভক্ত কেরাণী ক্লাশের মানুষগুলিও তেমনি বেতনের তারতম্য এবং শরীরের সৌষ্ঠব ও বসনের পারিপাট্য ভেদে তিন শ্রেণীর আছে। কিন্তু শ্রেণীভেদে ভাগ্যভেদ বড় কাহারও দেখা যায় না। পক্ষিরাজদের মত ইহাদেরও কার্য্যকাল শেষরাত্রি হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত। ডেলি-প্যাসেঞ্জার অফিসারগণ ইহা মিথ্যা বলিতে পারিবেন কি? অন্নাভাবে বেচারাদের দৌড়িবার শক্তি নাই; তথাপি সোয়ারের হুকুম—"জল্‌দি হাঁকাও।" কাজেই প্রতিপদক্ষেপে কোচো-য়ানের তীক্ষ্ণ চাবুক নীরবে হজম করিতে হয়। আপীসের বড়বাবুরা যখন বড় সাহেবের কাছে 'আর্জেণ্ট' কাজের হুকুম পান, তখন এইসব কেরাণীর ভাগ্যেও ঐরূপ চাবুকের মতই লাঞ্ছনা পীড়ন যুটিয়া থাকে! বড় আপীসের বড়বাবু এবং নিজের আপীসের নিজেই খোদ্ বাবু, ইহাঁরা সকলেই যেন এই জীবগুলিকে কাজের কল মাত্র মনে করেন! কাজেই তাহাদের প্রতি কৃপাকটাক্ষের কোন প্রয়োজন দেখেন না। অথচ ইহাঁরাই তাঁহাদের কার্য্যসাধন—বিপত্তারণ—লজ্জানিবারণ! বহুমূল্য মোটারখানি যখন দূরপথে গিয়া বিকল হয়, তখন ছ্যাক্‌রা গাড়ী না পাইলে, তাহাদের কেমন দুর্দ্দশা হয়, বুঝিতেছ ত? আশ্চর্য্য এই যে, তুমি ইহা বুঝিতে পারিলেও, শিক্ষিত সজ্জন নামে পরিচিত বাবুর দল ইহাদিগকেই 'স্লাট' বা বোকা-গরীব বলিয়া ঘৃণা করিতে ত্রুটী করেন না!

ঘোড়ার কথা বলিতে বলিতে, তাহারই মত আর একটা অযাত্রা জানোয়ার—গাধার কথা মনে পড়িল! ইহারা আকারে ঘোড়ার মত হইলেও ইজ্জতে অনেক হীন! ধোবার গৃহে ব্যতীত গাধার স্থান অন্যত্র নাই। ভার বহিতে তাহার পটুতার অভাব নাই, তথাপি কি জানি কেন, অতি হাল্‌কা 'ভাতের কাটিটী' বহিতে গাধা নিতান্ত নারাজ। এতকাল উচ্চ হিন্দুগণ গাধা স্পর্শ করিতে ঘৃণা করিতেন; এখন কিন্তু বড় বড় ধনীর গৃহে ধাত্রীর মত স্তন্যদানের তাহারা অধিকার পাইয়াছে। আমাদের মানুষ সমাজে এই গাধার সহিত কাহার তুলনা, বলিতে পার? ঐ যে বড়লোকদের পাশে 'কিম্ভুত কিমাকার' মোসাহেবের দল দেখিতে পাইতেছ, উহারাই সেই আদত গাধ! প্রভুর জুতা, ঝাঁটা, পরিত্যক্ত জামা-কাপড়, ভুক্তাবশিষ্ট মহাপ্রসাদ পর্য্যন্ত পেটে-পিটে করিয়া ইহারা সর্ব্বদা বহিতেছে! প্রভুর সহিত হাসিয়া-কাঁদিয়া, নাচিয়া-গাহিয়া, তাঁহার আদরের 'রাপান্ত' পর্য্যন্ত হাসিমুখে হজম করিতেছে! কিন্তু কেহ উপহাস করিয়াও তাহাদিগকে 'মোসাহেব' বলিলে, তাহা আর তাহারা 'ভাতের কাঠির' মত কোনরূপেই সহ্য করিতে পারে না! মুখে ধর্ম্ম, সভ্যতা, আত্মীয়তা যাহারই যত ভাণ করুক না কেন, তথাপি কোন ভদ্রলোক বিশ্বাস করিয়া ইহাদিগকে নিজের সমাজে স্থান দিতে চাহেন না। তাই ধোবার মত অধম শ্রেণীর দলেই ইহাদের আবাসস্থান! ভদ্র পল্লীপাশে ধোবাবাড়ী থাকিলে, গাধার চিৎকারে ভদ্রলোকদিগকে যেমন বিব্রত হইতে হয়, গৃহস্থ গৃহের নিকটে বড়লোকের বাস থাকিলেও, তেমনি এই মোসাহেবদের জ্বালায় গরীব গৃহস্থের ইজ্জৎ-রক্ষা কঠিন হইয়া উঠে! শৈশবে গাধার স্তন্য পান করিয়া, অনেক ধনিপুত্রকেই পরিণামে গর্দ্দভবুদ্ধি হইতে দেখা যায়! মোসাহেবের চাটু-বাক্যেও তাঁহারা কিরূপ মনুষ্যত্বহীন হইতেছেন, তাহা বোধ হয় তোমার অবিদিত নহে।

সমাজপালিত পশুগণের মধ্যে গরু,—মহিষ, (গাভী—মহিষী নহে) নিতান্ত মন্দভাগ্য হইলেও ইজ্জতে উন্নত। মানব সমাজের নিরীহ সজ্জনসমূহের সহিত ইহাদের তুলনা সুসঙ্গত। কৃষকের বা গাড়োয়ানের তীব্র বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়াও নীরবে বেচারীরা তাহাদের কার্য্যসাধন ও ভারবহন করিতেছে! তপ্ত-লৌহশলাকায় দগ্ধদেহ হইলেও, প্রতিপালককে মিত্র ভিন্ন কখনও শত্রু মনে করে না! তিরস্কার—পুরস্কার সমান জ্ঞান করিয়া এমন ভাবে কাজ করিবার প্রবৃত্তি, গরু, মহিষ ও সজ্জন ব্যতীত অন্য কাহারও দেখিয়াছ কি? তথাপি কোন্ অপরাধে যে গরু-মহিষ নাম দু'টী গালাগালির পর্য্যায়, আর সজ্জন মাত্রই দীন দুঃখী হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

গরু-মহিষের পরেই ছাগলের আসন! ছাগলের অধিকাংশ কথাই আগে বলিয়াছি। কিন্তু আমাদের সমাজে কোন্ শ্রেণী ঠিক ছাগল জাতীয়, সেই কথাই শুধু বলিতে বাকী আছে। বিশেষ-রূপে বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আধুনিক যুগের নূতন আলোকপ্রাপ্ত নব্যসভ্য দিগকেই প্রকৃত অজপ্রকৃতি বলিয়া মনে হয়। অজজাতির স্বার্থপরতার মত ইহাঁদের কাছেও বাপ-মায়ের খাতির নাই, ভাই-ভগ্নীর আদর নাই, সমাজবিধির মর্য্যদা নাই। আছে কেবল অবাধ আহার-বিহার, আর উদ্দাম দন্ত-দাপট! "ছাগীর মুখে দাড়ীর" মত ইহাঁদের মহিলাগণও সকল কাজেই পুরুষের প্রতিযোগিতার দাবি করেন, স্বয়ং উপার্জ্জন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, আর অধিকাংশই প্রায় চিরকুমারী থাকিয়া চিরকুমার সভার সেষ্ঠব বৃদ্ধি করেন!

পশুসমাজে যেমন ছাগ ও মেষ অনেকটা সমশ্রেণীস্থ, আমাদের সমাজেও তেমনি স্কুল কলেজের ছাত্রগণ, নব্যসভ্যগণের মতই নব্য-ভাবাপন্ন। অতএব মেষপালের সহিত ছাত্রদলেরই তুলনা করা উচিত। মেষপাল কোনরূপে একটী ভেড়াকে জলে নামাইতে পারিলেই পালের সমস্ত ভেড়া বিনাবিচারে জলে পড়ে! এদেশের 'নেতা' নামধারী বক্তৃগণ বক্তৃতার কুহকে একবার একদল ছাত্রকে 'নূতন কিছু' করাইতে পারিলে, দলে দলে সকল ছাত্রই তাহাতে উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়া থাকে! এমন দৃশ্য অনেকবারই এদেশে দেখিতে পাইয়াছ। ভেড়ারপাল পালকের ইঙ্গিতে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও, পালক কি করিতেছে, তাহা দেখিতে জানেনা। আমাদের ছাত্র দলও যাঁহাদের বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া অনন্ত আগুনেও প্রবেশ করিতে পারে, সেই নেতার দল যে নিজের কথারই বিপরীত ব্যবহার করেন, তাহা তাহারা দেখিয়াও দেখেনা—শুনাইলেও শুনিতে চাহেনা। এইজন্যই তাহাদের সহিত মেষপালের এত অধিক সাদৃশ্য!

একে একে প্রায় সকল পশুর কথাই বলা হইল। গ্রাম্য পশু ভিন্ন কোন বন্যপশুর সহিত আমাদের সম্বন্ধ নাই। সুতরাং অবশিষ্ট ক্ষুদ্র পশু দুইটি কুকুর-বিড়ালের বিবরণ বলিয়াই আমার তত্ত্বকথা সমাপ্ত করিব। কুকুর যে কাহার অভিশাপে এমন ঘৃণিত লাঞ্ছিত, তাহা বুঝিতে পারিনা। কুকুরের মত গুণের জীব তো আর দ্বিতীয় নাই! তাহাকে লাথি-ঝাঁটা-জুতা-মার, পাতের ভুক্তাবশেষ আঁস্তাকুড়ে খাইতে দাও, পাপোষের উপর বা ছাইগাদার ভিতর শুইতে দাও, কিছুতেই তাহার বিরক্তি নাই, অভিমান নাই, রোষ নাই, ক্ষোভ নাই! সকল অবস্থাতেই সমান ভাবে সে কৃতজ্ঞ ভৃত্য! চাণক্য বলিয়াছেন, —"বহ্বাশী স্বল্পসন্তুষ্টঃ শীঘ্রনিদ্রঃ সুচেতনঃ। প্রভুভক্তশ্চ শূরশ্চ ষট্ শিক্ষেৎ কুক্কুরাদপি॥" মানুষের ভিতর কোন পরমাত্মীয়ও বোধ হয় পেট ভরিয়া খাইতে না পাইলে এমন সন্তুষ্ট থাকে না। গাঢ়-নিদ্রার সময়ে পরের দায়ে জাগিয়া উঠিবে এমন কর্ত্তব্যপরায়ণ মানুষই বা কয়জন আছে? যদি থাকে, তবে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সভ্যদের ভিতর তাহা

পাইবেনা, যাঁহাদিগকে আমরা অত্যন্ত অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করি—দূরে রাখি, সেইসমস্ত অসভ্য-নীচগণের মধ্যেই ঐরূপ বিশ্বাসী ভৃত্য দেখিতে পাইবে। তাহারা কণিকাপ্রমাণ পাতের প্রসাদ পাইলেও কৃতার্থ হয়! কিন্তু আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী তাহাদের আহারের পরিমাণ! শয়ন মাত্রই গাঢ়নিদ্রায় অচেতন হয়, কিন্তু সামান্য শব্দে সন্দিহান হইয়া বিপদের আশঙ্কায় জাগিয়া উঠে! দেহে অমিত বল, তথাপি হাসিমুখে শত অপরাধ ক্ষমা করে! শিক্ষা নাই, জ্ঞান নাই, তথাপি কখনও বিশ্বাস হারাইতে তাহাদের প্রবৃত্তি হয় না! এইরূপ বিশ্বস্ত উপকারী ভৃত্যদিগকেই আমরা কুকুরের মত আঁস্তাকুড়ে রাখিয়া আমাদের সুসভ্য কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছি!

আর বিড়াল? আমাদের মেনী বিড়ালকেতো সর্ব্বদা দেখিতেছ! মানুষের ভিতর কাহারা এই মেনীর মত, বলিতে পার? জানতো আমার নিজের পাতে ঝোল টানিবার অভ্যাস নাই! স্বজাতির খাতিরে আমি সত্য গোপন করিব না। মানুষের সমাজে স্ত্রীলোক গুলিকেই আমার বিড়াল জাতীয় মনে হয়। বিড়ালের গরু-পুকুর নাই, তবু তাহারা নিত্য দুধ-মাছ খায়! স্বামী বেচারার পয়সায় না কুলাইলেও, গৃহিনীকে সধবার লক্ষণ মাছ-ভাত খাওয়াইতেই হইবে! নতুবা স্বামীরই অকল্যাণ! পোয়াতী পত্নীকে একটু দুধ না দিলেও, স্তন্যপায়ী শিশু পেট ভরিয়া স্তন্য পাইবেনা। বিড়ালকে দিনের মধ্যে দশবার করিয়া পেট পুরিয়া খাইতে দিলেও, তাহারা হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া মাছ এবং ঢাকা ফেলিয়া দুধ চুরি করে! স্বভাবদোষে পরের বাটীতেও উপদ্রব করিতে ত্রুটী করে না! সুখের সংসারে কোন দুঃখ না পাইলেও,কত স্ত্রীলোক কত কি করে, তাহা অনেক ঘরেই দেখিতে পাইবে। নরম—গরম—পরিষ্কার বিছানা, বিড়ালের মত স্ত্রীলোকদেরও লোভনীয়। সেই লোভে পরশয্যা-গ্রহণেও অনেকের আপত্তি দেখা যায় না। বিড়ালের অকৃতজ্ঞতা চিরপ্রসিদ্ধ। স্ত্রীসমাজেও কৃতজ্ঞতার সুনাম অতি বিরল। বিড়ালকে আদর কর, কোলে লও, সে তোমাকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া আদর দেখাইবে! কত পত্নীবৎসল পুরুষের হৃদয়ও যে পত্নীর ঐরূপ আদরে ক্ষত-বিক্ষত হইতেছে, আবরিত না থাকিলে, অনায়াসেই তাহা দেখা যাইত!

এমন দুই একটা লক্ষণ-ব্যভিচারে সন্দিগ্ধ হইও না; শাস্ত্রেই আছে—"ক্বচিৎ ক্বচিৎ ব্যভিচারী,ছাগীর মুখে যথা দাড়ী।"উভয়ের প্রায় সকল সাদৃশ্যই এইরূপ সমান হইলেও, কেবল একটী বিষয়ে স্ত্রীস্বভাব বিড়াল প্রকৃতির বিপরীত দেখা যায়। আমি নিজেই কতবার বিপন্ন বিড়ালছানা কুড়াইয়া আনিয়া বাড়ীর মেনীকে প্রতিপালন করিতে দিয়াছি। মেনী দুই চারিবার মাত্র তাহাকে লইতে আপত্তি জানাইয়া, তারপর বোঝার উপর শাকের আটির মত তাহার তিন চারিটী ছানা সত্বেও সেই অসদৃশ বয়সের কুড়ান ছানাটিকেও অপত্যনির্ব্বিশেষেই স্তন্যদান করিয়া প্রতিপালন করিয়াছে। এমন মহান্ উদার স্বর্গীয় দৃশ্য, মনুষ্য সমাজে. স্ত্রীজাতির মধ্যে দেখা দূরের কথা, দেখিবার আশাও অসম্ভব!

আর কত বলিব? ইহাতেই বোধ হয় সমাজ জিনিষটা গৌরবের কিনা বুঝিতে পারিয়াছ। এই মানব কিসের অভিমানে যে সকল জীবের উপর আধিপত্য করিতে চায়, কোন্ গর্ব্বে যে তাহারা মাটীতে পা না দিয়া হাতী ঘোড়াকে বাহন করে, গরু-মহিষ দিয়া ভার বহাইয়া লয়, আমিতো তাহা বুঝিতে পারি না। পার যদি, এই সমাজতত্ত্বটা তোমাদের সামাজিক মানুষগুলিকে একবার বুঝাইয়া দিও। নচেৎ, তোমারও এই শিক্ষালাভ বৃথা হইবে, আমারও এত পরিশ্রম পণ্ড হইবে! আজ এই থাক। পারিতো আবার কোন দিন আর কোন তত্ত্ব বুঝাইয়া দিব।

টীকা-টিপ্পনী।

স্বাধীন ত্রিপুরারাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী রায় উমাকান্ত দাশ গুপ্ত মহাশয় ৭৮ বৎসর বয়সে ৺কাশী প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৺কাশীধামে নিজ-বাটীতেই তাহার তনুত্যাগ হইয়াছে। তিনি প্রথম জীবনে ডেপুটীমাজিষ্ট্রেটের পদে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণান্তর ত্রিপুরা-রাজ্যের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। তাহার নিবাস ঢাকা মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত তেওতা গ্রামে।

স্বাধীন ত্রিপুরার বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী রায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাশ গুপ্ত মহাশয়ও বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। মহারাজ তাঁহার কার্য্যকলাপ বিধিব্যবস্থায় বিশেষ পরিতুষ্ট। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময় হই-তেই ত্রিপুরারাজ্যে বৈদ্যসন্তানের প্রতি মন্ত্রিত্বভার অর্পিত হইয়া আসিতেছে, তাঁহারাও সুখ্যাতির সহিত কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। জয়পুররাজ্যও বৈদ্যজাতির ব্যবস্থায় সুপরি-চালিত। বৈদ্যজাতির পক্ষে শ্লাঘার কথা বটে।

মাননীয় ভুপেন্দ্রনাথ বসু ১২ই ভাদ্র বুধবার রাত্রি৮৷৹ সময় বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। বেঙ্গল-ন্যাসন্যাল ব্যাঙ্কের মোকদ্দমাকে তৃণের মত তুচ্ছ করিয়া তিনি ডিঙ্গা ভাসাইয়াছিলেন! পদের এমনি খাতির। মাম্‌লাত এখন ধামাচাপা রহিল। মোকদ্দমার ফলাফল যাহাই হউকনা কেন, যৌথকারবারে বারংবার বাঙ্গালীর এই নিষ্ফলতা-এরূপ দলাদলি জাতীয় কলঙ্কের একশেষ! দলা-দলিতে যে আমাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে। আমাদের এই বৈদ্যজাতির ভিতর তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না কি? ভুপেন্দ্রনাথ উল্‌টাপাক দিয়াছেন।

কবিরাজ রাখালচন্দ্র সেন এল্ এম্ এস্ মহা-শয়ের অনুজ গোপালচন্দ্র সেনকে দেখিতে যাইয়া স্থানীয় কোন সম্ভ্রান্ত কবিরাজ ফি গ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ একটা কথা উঠিয়াছে। আমরা অভিযুক্ত কবিরাজ মহাশয়কে একথা জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম, তিনি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে পড়েনা। হইতে পারে, তিনি তাঁহাকে দেখিতে গিয়া থাকিলেও তাহার পরিচয় জানেন না, তাঁহাকে কেহ তাহা জানায়ও নাই। ফলে কোন মতে এরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকিলেও ভদ্রতার অনুরোধে এ সকল কথা চাপা রাখাই সঙ্গত। তাহা না করিয়া এরূপ আন্দোলনে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ এবং জাতীয় কলঙ্কের পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র। আমাদের বিনীত অনুরোধ, বৈদ্যসন্তানগণ এসকল হিংসা-বিদ্বেষ হইতে অন্তরে থাকিয়া জাতিটার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুণ। নানা কারণে এই জাতির অস্তিত্ব লোপ হইবার উপক্রম হইল যে! বৈদ্যসন্তান বলিয়া যাহারা পরিচয় দেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা নিতান্ত লজ্জার কথা নয় কি?

পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' নামক মাসিকপত্র সাহিত্যসেবী এবং সাহিত্যা-মোদী মাত্রেরই আদরের জিনিষ। নিয়মিতরূপে ইহা প্রকাশিত হইবার বিঘ্নবাধা সত্ত্বেও ইহা পাঠে পাঠকবর্গের আগ্রহ অক্ষুণ্ণ। একখানি মাসিক পত্রের পক্ষে ইহা সামান্য গৌরবের কথা নহে। ইহা আমাদের নেত্রগোচর হইবার সুবিধা না থাকিলেও আমরা ইহার প্রচারে আন্তরিক সুখী, এবং সতত ইহার মঙ্গলকামনা করিয়া থাকি। সাহিত্যের বাজারে 'সাহিত্য' সৎসাহিত্যের প্রবর্ত্তক। এহেন 'সাহিত্য'কে অবহেলা করিয়া, সমাজপতি মহাশয়কে, ভাগাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইয়া পবিত্রদেহ কলঙ্কিত করিতে দেখিলে সাহিত্যসেবী মাত্রেরই অন্তরে ব্যথা লাগে।

গত ১০ ভাদ্র সোমবার একটী চরিত্রবান্ লোকের মুখে শুনিতে পাইলাম। চারিমাসের সাহিত্য বাহির হইয়াছে, শ্রাবণের সাহিত্যে কয়েকটী সুলিখিত প্রবন্ধ আছে, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ লিখিত 'রবিয়ানা' নামক গ্রন্থের প্রতিবাদ প্রবন্ধটী সুপাঠ্য। 'রবিয়ানা' গ্রন্থখানি 'ভারতবর্ষ' পত্রের 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' লেখক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায়ের লিখিত। উহা রবি-ঠাকুরের একখানি নিখুঁৎ ছবি। সুলেখক হেমেন্দ্রনাথ 'রবিয়ানার' কি প্রতিবাদ করিয়াছেন জানি না; তবে ইহা জানি যে, রবিঠাকুর সম্বন্ধে সময়ে সময়ে 'সাহিত্য' পত্রে যে সকল মতামত প্রকাশিত হইয়াছে, 'রবিয়ানা'র স্থানে স্থানে তাহাও উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় মেসপটেমিয়া গমনের পথে রবিয়ানার সমালোচনা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, দেশে প্রত্যাগমন করিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই প্রকাশ। জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে যে হেমেন্দ্রনাথের ন্যায় একজন নিরপেক্ষ সমালোচকের ন্যায়-নিষ্ঠা পারস্যোপসাগরে নিমজ্জিত হইবে, এরূপ ধারণা আমাদের নাই। হেমেন্দ্র প্রসাদ হিন্দুসন্তান, হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মে হিন্দুর আচার-ব্যবহারে, হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার আস্থা আছে। হিন্দু-পত্র বসুমতীর তিনি সম্পাদক। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম-কর্ম্মের মর্ম্ম আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যে সীতাদেবী প্রাতঃস্মরণীয়ারূপে হিন্দুমাত্রেরই পূজনীয়া, তাঁহার চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিতে যাহার সঙ্কোচবোধ হয় না, তাঁহাকে হেমেন্দ্রবাবু কি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, জানিবার জন্য সত্য-সত্যই কৌতুহল জন্মিয়াছে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

জননীর কর্ত্তব্য।—গৃহিণীর কর্ত্তব্য, আদর্শ-লিপিমালা, প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত মূল্য ১৷৽ টাকা।

আধুনিক উপন্যাসপ্লাবিত সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রকৃত শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থ প্রণয়নে অনুরক্তি কাহারও আছে বলিয়া মনে করিবার সুবিধা নাই। কিন্তু আনন্দ-বাবুর সাহিত্যচর্চ্চার প্রধান উদ্দেশ্যই শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের আলোচনা, তাহার পুষ্টিসাধন এবং সমাজে তাহার প্রচার। তাঁহার "গৃহিণীরকর্ত্তব্য" গ্রন্থখানি এরূপ উপাদেয় হইয়াছে যে, এ পর্য্যন্ত ইহার ছয়টী সংস্করণ হইয়াছে। 'জননীর কর্ত্তব্য' তাঁহার গভীরগবেষণাপ্রসূত অদ্বিতীয় গ্রন্থ। সন্তানের শিক্ষা সম্বন্ধে জননীর যাহা জ্ঞাতব্য, তদ্বিষয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনীষিবর্গের মতামত সংগ্রহ করিয়া আনন্দ বাবু এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। জগতের অন্য কোন ভাষায় এরূপ শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থ আছে বলিয়া মনে হয় না। এই গ্রন্থ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে গৃহপঞ্জিকার ন্যায় থাকা বাঞ্ছনীয়।

আত্ম-নিবেদন। শ্রীকুসুমকুমারী দাশ গুপ্তা প্রণীত মূল্য ।৵৹ আনা। ইহা বালবিধবা গ্রন্থকর্ত্রীর শোকোচ্ছ্বাস। পঞ্চদশবর্ষে পতিহীনা হইয়া সময়ে সময়ে মনে যে সকল আবেগ অনুভব করিয়াছেন গ্রন্থকর্ত্রী সরল কবিতায় তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যেকটী বিষয় এরূপ অকপট ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহা পাঠ করিলে অশ্রুসম্বরণ করা যায় না। শুদ্ধ বালবিধবার অকপট মর্ম্মান্তিক হৃদয় বেদনার আভাস পাইবার জন্যও ইহা সকলের পাঠ করা উচিত। গ্রন্থকর্ত্রী কলিকাতা ছোট-আদালতের রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাশ গুপ্ত মহাশয়ের পুত্রবধূ। তাঁহারই অর্থানুকূল্যে গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ কলেরা রোগীর চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষায় ব্যয়িত হইবে।

ধন্বন্তরি

মাসিক পত্র।

২য় বর্ষ, } আশ্বিন, ১৩২৪, ইং ১৯১৭ সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, { ১২শ সংখ্যা

দান।

[অধ্যাপক শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী, এম্, এ]

জীবনের ভার দুর্ভর বলে' তোমারে করিনু দান,
সকল সুখের সকল দুখের তোমাতেই অবসান—
বিশ্ব চেতনা হয় তোমা ময়,
বিশ্ব বেদনা তোমাতেই লয়,
জলের বুদ্বুদ জলেতে বিলয়—
একেতে অযুত প্রাণ।
আজি সুখ দুখ—চেনা নাহি যায়;
সুখী ছিনু আগে, সে সুখ কোথায়?
স্বপনের সম কোথা মিশে যায়
গাহিয়া মরণ গান।
দুখেরো ফোয়ারা খুলেছিল ভাল
নয়নে আমার, তা'ও এত কাল
ঝরিয়া ঝরিয়া আজি শুকাইল—
মোহে মগন প্রাণ।
ক্ষণেক এখন রহ, দয়াময়!
মোট ফেলে মোর উঠিলেই হয়,
অবশ চরণ শৃঙ্খলময়,
বেদনা ব্যথিত প্রাণ।
তোমারি এ দান জীবন দুর্লভ
এত দিন পরে ফিরে দিনু, ভব!
অকলঙ্ক মোর অন্য বিভব
নাহি যে করিতে দান!

গীতাপ্রবেশ।

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, বি, এল।]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

উপনিষদের বচনগুলি ভগবান্ গীতায় কোথাও অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন, কোন কোন স্থলে ভাবসংরক্ষণ পূর্ব্বক আংশিক পরিবর্ত্তিত করিয়া বা সম্পূর্ণ ভাবান্তর করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

অনেকে বেদান্ত বলিতে মহর্ষি ব্যাসদেবকৃত বেদান্ত-সূত্র বা শারীরকসূত্রকেই বুঝেন। কিন্তু তাহা বেদান্ত নহে। বেদান্তসমূহ অপৌরুষেয় বেদেরই অন্তর্গত, কোন মনুষ্যপ্রণীত গ্রন্থ নহে।

উপনিষদ্ সকলই প্রকৃত বেদান্ত। এই সকল বেদান্তের যুক্তিপূর্ণ উপদেশসমূহ লইয়া, মহর্ষি-বেদব্যাস সূত্রাকারে গ্রথিত করিয়া যে গ্রন্থ করিয়াছেন, তাহাই বেদান্ত-সূত্র বা বেদান্তদর্শন নামে পরিচিত। বেদান্তসূত্র, অপৌরুষেয় বেদান্ত-শ্রুতির তুল্য পূজার্হ ও প্রামাণ্য না হইলেও, ইহা মহর্ষি ব্যাসদেবের কৃত বলিয়া আপ্তবাক্য ও প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া অবশ্যই গ্রহণীয়।

অপরাপর সকল শাস্ত্রের ন্যায় গীতাতেও চারিটী নিমিত্ত বা অনুবন্ধ আছে,—যথা ১। প্রতিপাদ্য বিষয়, ২। সম্বন্ধ, ৩। প্রয়োজন, ৪। অধিকারী। বিষয় বলিতে যে বিশিষ্ট ফলপ্রদ বস্তুটী লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্র রচিত হয় অর্থাৎ যে বস্তুটী শাস্ত্র প্রতিপাদন করিতে চাহে সেই বস্তুটি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই বিষয়টি না থাকিলে, শিক্ষার্থীর শাস্ত্রাভ্যাসে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এবং এই প্রতিপাদ্য বিষয় ও শাস্ত্র এই উভয়ের পরস্পর প্রতিপাদ্য প্রতিপাদক, বা বোধ্য বোধক সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক; নচেৎ অসম্বদ্ধ প্রলাপে কোন ফলোদয় নাই। বিষয় ও সম্বন্ধের ন্যায় প্রয়োজন থাকাও আবশ্যক, কেননা বিনা প্রয়োজনে কেহই কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। যে কারণে শিক্ষার্থী শাস্ত্র অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেইটী শাস্ত্রের ও শিক্ষার্থীর প্রয়োজন। যেমন বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন ভিন্ন কোন শাস্ত্র বলা হইতে পারে না, সেইরূপ উপযুক্ত অধিকারী ভিন্ন শাস্ত্রোপদেশ হইতে পারে না। যে ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে, তাহাকে বলা না বলা দুইই সমান; অতএব শাস্ত্রের কে অধিকারী তাহাও দ্রষ্টব্য।

গীতার বিষয় কি? গীতা ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগশাস্ত্র, ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় জীব-ব্রহ্মের ঐক্য।—মনুষ্য ভ্রমবশতঃ আপনাকে ব্রহ্ম নামক সর্ব্বগুণাতীত নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্তস্বভাব আত্মা হইতে পৃথক্, অনিত্য, অশুদ্ধ, অজ্ঞানী ও বদ্ধ জীব বলিয়া জ্ঞান করে। তাহার সেই ভ্রমের নিরাস হইলে, যে শাশ্বত, বিশুদ্ধ বা নির্দোষ, চৈতন্যময় ও বন্ধহীন বা মুক্তস্বভাববিশিষ্ট পদার্থ বিদ্যমান থাকে, সেই জীব-ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন বা অভ্রান্ত জ্ঞানের বিষয়ই ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগশাস্ত্র গীতার বিষয়। বেদান্তদর্শনস্বরূপে গীতা ঈশ্বরেরতটস্থ লক্ষণ, অর্থাৎ যাঁহা হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি নাশ হয়, তিনি ঈশ্বর, এইরূপ পরিচয়ে অন্যবস্তুর দ্বারা প্রমাণ করে, ইহাতে ঈশ্বরের স্বরূপের পরিচয় হয় না, তটস্থ পরিচয় হয়। যোগশাস্ত্র স্বরূপে যোগ রূপ উপায়ে অপরোক্ষ অনুভূতি দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ দেখাইয়া দেন।

গীতার সম্বন্ধ কি? সেই জীব-ব্রহ্মের ঐক্য গীতার বোধ্য এবং গীতা তাহার বোধক। বেদান্ত-দর্শনশাস্ত্রস্বরূপে এই বাক্য গীতায় তটস্থ ভাবে বোধ্য ও যোগশাস্ত্ররূপে স্বরূপ ভাবে বোধ্য। গীতা বেদান্তশাস্ত্র স্বরূপে সেই ঐক্যের তটস্থ বোধক ও যোগশাস্ত্ররূপে স্বরূপ বোধক।

গীতার প্রয়োজন কি?—পরমাত্মা হইতে অপৃথক্ ব্রহ্মচৈতন্য, যাহাকে জীব বা জীবাত্মা বলিয়া থাকি, তাহাতে অজ্ঞান সম্পর্ক ঘটিয়াছে, অজ্ঞান সম্পর্কে জীব আপনার অশোক, দুঃখহীন, চিন্তাদি-বিহীন, মুক্ত ব্রহ্মভাব জানে না, আপনাকে ক্ষুদ্রায়তন, জন্মমরণবান্, ষট্পরিণামশীল, সুখদুঃখ-শীত-তাপ-রাগদ্বেষ-আদির ভোক্তা বা বিকারশীল বলিয়াই জানে। সেই অজ্ঞানের চিরনিবৃত্তি এবং তদনন্তর আপনার শান্তিময়ত্ব আনন্দময়ত্ব নিত্যত্ব জ্ঞানময়ত্ব অনুভব এই দুইটি গীতার প্রয়োজন। গীতা বেদান্ত-দর্শনশাস্ত্রস্বরূপেঅধ্যারোপ ও অপবাদ এই দুই যুক্তিপথ অবলম্বন করিয়া, ব্রহ্মোপদেশ অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন পূর্ব্বক জ্ঞাপন করেন। কোন এক বস্তুতে ভ্রম ক্রমে যে অপর বস্তুর আকার দর্শন হয় তাহাকে, অধ্যারোপ বা ভ্রম বলে, যথা রজ্জুতে ভ্রমক্রমে সর্পের যে বোধ, তাহা অধ্যারোপ। এবং অধ্যারোপপ্রণালীর বিপরীতক্রমে জন্যপদার্থের মিথ্যাত্ব

দেখানকে অপবাদ বলে, যথা রজ্জুতে যে সর্পজ্ঞান হইয়াছিল, এই সর্পজ্ঞান ভ্রমাত্মক, ইহা মিথ্যা,রজ্জুই সত্য, রজ্জু ছিল বলিয়া সর্পের বোধ হইয়াছিল, কারণরূপ রজ্জুটি সত্য, কার্য্যরূপ সর্পটি মিথ্যা, এইরূপ জ্ঞানের উদয়ে ভ্রমাত্মক কার্য্যটির অপবাদ বা লয় হইল। মৃত্তিকা হইতে ঘট জন্মে। ঘটটি জন্যপদার্থ বা কার্য্য, মৃত্তিকাটি কারণ বা জনক। বস্তু ঘটটি মিথ্যা, ইহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলে ঘটরূপ বিদ্যমান থাকে না; তাহার সত্যস্বরূপ যে মৃত্তিকা পুনরায় তাহাই দেখা যায়। এইরূপ যুক্তি-দ্বারা বেদান্ত-দর্শনশাস্ত্ররূপে গীতা প্রমাণ করেন যে, চিদাত্মাতে এই জগদ্রূপ অজ্ঞান কল্পিত হইয়াছে; জগৎ মিথ্যা, চিদাত্মাই সত্য। এই সকল বিষয় পরে বিশেষ ভাবে যথাস্থানে আলোচিত হইবে। যোগশাস্ত্র গীতা, প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধ্যান-ধারণা-নিদিধ্যাসন-সমাধি এই বড়ঙ্গ যোগরূপ উপায় দ্বারা অজ্ঞানের আবরণ চিরতরে উন্মোচন ও জীবাত্মার নিত্যত্ব জ্ঞানময়ত্ব ও আনন্দময়ত্ব দর্শন করাইয়া, জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। বেদান্তদর্শনশাস্ত্রস্বরূপে যুক্তিপথে গীতা প্রমেয়ের তটস্থ-বোধন করান, ইহাতে ব্রহ্ম-আত্মার পরোক্ষ দর্শন হয় এবং যোগশাস্ত্র স্বরূপে অপরোক্ষা-নুভূতি দ্বারা জীবাত্মাকে পরমাত্মায় সংযোজিত করিয়া, জ্ঞানের পরিপূর্ণতা সম্পাদন করেন। কোন বস্তুর চক্ষুর্দ্বারা দর্শন করিয়া যেরূপ অচল অটল জ্ঞান হয়, তাহার সম্বন্ধে পড়িয়া শুনিয়া বা যুক্তি তর্কাদিযুক্ত পরোক্ষ অনুভূতিতে সেইরূপ সুদৃঢ় জ্ঞান হয় না। এই জন্য বেদান্ত দর্শন অপেক্ষা যোগশাস্ত্রের প্রাধান্য। যৌগিক জ্ঞান কর্ম্মভক্তি-জাত জ্ঞান, বৈদান্তিক জ্ঞান যৌক্তিক জ্ঞান। এই শেষোক্ত অংশ লইয়াই মহর্ষি বেদব্যাস বেদান্ত সূত্র রচনা করিয়াছেন। সেইজন্য তাহাকে বেদান্ত দর্শন বলা যাইতেছে। উপনিষদই একাধারে এই পরোক্ষ ও অপরোক্ষ উভয়বিধ উপায় দ্বারাই আত্ম-দর্শন করান। উপনিষদের যে অংশটী যুক্তিমূলে প্রয়োজন সিদ্ধ করে, তাহা বেদান্তদর্শন; আর যাহা যোগরূপ অপরোক্ষ অনুভূতি মুখে করে, তাহা যোগশাস্ত্র।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে একাধারে বেদান্ত-দর্শন ও যোগশাস্ত্ররূপ উপনিষদ্ বা ব্রহ্মবিদ্যো-পদেশ দিয়া, অর্জ্জুনের সর্ব্ব অজ্ঞানজ সংশয় দূরী-ভূত করিয়া, জীব-ব্রহ্মের ঐক্য প্রদর্শন করেন। এক্ষণে যে অবস্থায় গীতা উপদিষ্ট হইয়াছিল, দেখা যাউক সে সময়ে গীতার উপদেশের কোন প্রয়োজন ছিল কিনা।

প্রয়োজন—ন্যায়তঃ-ধর্ম্মতঃ যুধিষ্ঠির হস্তিনার রাজা, যেহেতু রাজার জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজ্যের অধি-কারী। পাণ্ডুই রাজা ছিলেন, পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠিরই রাজা। ধৃতরাষ্ট্র বিচিত্রবীর্য্যের জ্যেষ্ঠপুত্র হইয়াও রাজ্যাধিকারী ছিলেন না ও তজ্জন্য রাজা হন নাই, যেহেতু ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন—

অনংশৌ ক্লীবপতিতৌ জাত্যন্ধবধিরৌ তথা।
উন্মত্তজড়মূকাশ্চ যে চ কেচিন্নিরিন্দ্রিয়াঃ॥

মনু ৯।২০১

"ক্লীব, পতিত, জন্মান্ধ, জন্মবধির, উন্মত্ত, জড়, মূক এবং কাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়শূন্য পুত্রগণ পিত্রাদির ধনে অধিকারী নহে।"

কিন্তু পাণ্ডুর বংশ যদি নিঃশেষ হইয়া যায়, তাহা হইলে দুর্য্যোধন রাজা হইতে পারেনা, যেহেতু—

যদ্যর্থিতা তু দারৈঃ স্যাৎ ক্লীবাদীনাং কথঞ্চন।
তেষামুৎপন্নতন্তূনামপত্যং দায়মর্হতি॥ মনু ৯।২০৩

"ক্লীবাদির যদি বিবাহ হয় (ইহাতে তাহাদের বিবাহ অধর্ম্ম বলা হইল এবং ক্লীবাদির পুত্রাদিকে নিন্দিত পুত্র বলা হইল) এবং সেই ক্ষেত্রে যদি পুত্র জন্মে, তবে সে পিতামহাদির ধন পাইতে পারে। (ইহাতে অনিন্দিত বংশধর অভাবেই পাইতে পারে বলা হইল)।" সেই জন্য দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবদিগকে বিষ প্রদান, জলে নিক্ষেপণ, জতুগৃহদাহাদি নানাবিধ উপায়ে

বাল্যকাল হইতে নিধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এইসকল কারণে দুর্য্যোধন, রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট বধ্য।

রাজা যুধিষ্ঠির, জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের গৌরব রক্ষার্থ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি প্রকৃত রাজবৎ ব্যবহার করিতেন। এই লোভে লুব্ধ হইয়া, যুধিষ্ঠিরের রাজ্য অপহরণ করিবার প্রয়াসে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে ছলে ও কৌশলে হস্তিনা ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যস্থাপনে বাধ্য করেন। ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং হস্তিনার রাজত্ব করিতে থাকেন, এবং ভীষ্ম দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য হস্তিনাতেই, ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে, ধৃতরাষ্ট্রান্নে প্রতিপালিত হইতে থাকেন। ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনায় রাজত্ব করিলেও সে রাজ্যেরও অধিকারী যুধিষ্ঠিরই রহিলেন। সেইজন্য ধৃতরাষ্ট্রগণ পাণ্ডবগণকে রাজ্যচ্যুত করিবার মানসে রাজা যুধিষ্ঠিরকে কপট দ্যূতে আহ্বান করেন এবং কাপট্য দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে পণে হৃতরাজ্য করিলেন এবং দ্রৌপদীও পণস্বরূপে ধার্ত্তরাষ্ট্রহস্তে পতিতা হন। কিন্তু শাস্ত্রে কাহারও ভার্য্যা দানবিক্রয়ের অধিকার দেওয়া হয় নাই—

ন নিষ্ক্রয়-বিসর্গাভ্যাং ভর্ত্তু র্ভার্য্যা বিমুচ্যতে।
এবং ধর্ম্মং বিজানীমঃ প্রাক্ প্রজাপতিনির্ম্মিতম্॥

মনু ৯।৪৬

"পুরাকাল হইতে প্রজাপতি এই নিয়ম করিয়াছেন যে, ভর্ত্তার সহিত ভার্য্যার যে সম্বন্ধ তাহা কদাপি দান বিক্রয় বা ত্যাগদ্বারা মুক্ত হয় না,—ইহা আমরা অবগত আছি।" ইহা জানিয়া শুনিয়াও কর্ণের পরামর্শে ও দুর্য্যোধনের আদেশে দুঃশাসন কৃষ্ণার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক হস্তিনার রাজসভামণ্ডপে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্মদেব, দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্যের সাক্ষাতে সবলে আনিয়া তাঁহাকে বিবস্ত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছিল এবং দুর্য্যোধন সেই সময়ে সভাস্থলে সকলের সাক্ষাতে "অয়ি ভামিনি, তুমি ষণ্ডতিল স্বরূপ পূর্ব্ব পতিগণকে ত্যাগ করিয়া, আমাকে পতিত্বে বরণ কর ও আমার ক্রোড়ে স্থান গ্রহণ কর" এই বলিয়া উরুদেশে করতল প্রহারপূর্ব্বক স্বকীয় উরু প্রদর্শন করিল। তাহাতে ভীষ্মাদি সকলে কৃষ্ণার কাতরোক্তি শুনিয়াও নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ ও প্রতিকারবিহীন হইয়া অবস্থিত রহিলেন। এইরূপে সেই সভাস্থ ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ-প্রমুখ ধার্ত্তরাষ্ট্রপক্ষীয় উপস্থিত সকলেই পাণ্ডবগণের নিকট প্রাণদণ্ডার্হ হইয়াছিলেন। যাহা হউক, সেই কপট দ্যূত ও কৃষ্ণার অবমাননার পরে ইহা স্থিরীকৃত হইল যে, পাণ্ডবগণ দ্বাদশ বৎসর রাজ্যত্যাগ করিয়া বনচারী হইবেন এবং একবৎসর অজ্ঞাতবাসে থাকিবেন; যদি অজ্ঞাতবাসকালে তাঁহারা প্রকাশিত হইয়া পড়েন, পুনরায় ঐরূপ বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন এবং ঐরূপই পুনরায় অজ্ঞাতবাস ভোগ করিবেন এবং এই বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের পর তাঁহারা তাঁহাদের রাজ্য পুনরায় প্রাপ্ত হইবেন। পাণ্ডবগণ,যখন তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা সম্যক্‌রূপে পালন করিবার পর হৃতরাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে বলিলেন, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। সমরোদ্যোগ চলিতে লাগিল। পাণ্ডব পঞ্চভ্রাতা সকলেই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে তাহাদের পাপের উপযুক্তদণ্ড বিধান করিবেন ও যুদ্ধ করিয়া নিজরাজ্য পুনরুদ্ধার করিবেন। ভীম কুরুসভায় কৃষ্ণার অবমাননা কালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রকে তিনি স্বহস্তে নিধন করিবেন, দুঃশাসনের বক্ষোবিদারণ করিয়া রুধির পান করিবেন ও গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিবেন। কৃষ্ণা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাঁহার স্বামিগণ যদি দুর্য্যোধনাদিকে সবংশে নিধন না করেন, তাহা হইলে উন্মুক্তবেণী সংহরণ পূর্ব্বক আর কবরী বন্ধন করিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ কুলক্ষয়কর যুদ্ধ নিবারণার্থে পাণ্ডবপক্ষ হইতে হস্তিনাপুরে কুরুসভায় দূতরূপে গিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র যদি পঞ্চ পাণ্ডবভ্রাতার জন্য পাঁচখানি গ্রাম প্রত্যর্পণ করেন, তাহা হইলে তিনি পাণ্ডবগণকে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করাইতে পারেন ও পাণ্ডবগণ তাহা হইলে তাঁহাদের রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিবেন।

পথিমধ্যে দুর্য্যোধন দূত অবধ্য জানিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণের সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইল না। সে বলিল যে, সে বিনাযুদ্ধে এক সূচ্যগ্র পরিমাণভূমিও প্রত্যর্পণ করিবে না। যদি পাণ্ডবগণ ক্লীব না হয়, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়ের ন্যায় তাহাদের রাজ্য পুনরুদ্ধার করুক। শ্রীকৃষ্ণ বিফলপ্রযত্ন হইয়া, প্রত্যাবর্ত্তন-কালে পাণ্ডবমাতা কুন্তীদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। কুন্তীদেবী যুদ্ধদ্বারা হৃতরাজ্য উদ্ধারের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া, অক্ষত্রিয়ের ন্যায় পঞ্চগ্রাম ভিক্ষা করা ও তাহাতে সন্তুষ্ট হইবার প্রস্তাবে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন, এবং বিদুলা-সঞ্জয়ের উপাখ্যানটি বিবৃত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন যে, এই উপাখ্যানটি পাণ্ডবগণকে বলিবে এবং আরও বলিলেন যে তাহাদিগকে বলিবে যে যদি আমি ক্ষত্রিয়া রমণী হই ও তাহারা যদি আমার স্তন্য পান করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা পরীক্ষা দিউক যে, তাহারা তাহা বৃথা পান করে নাই। রাজা হইয়া ক্ষত্রিয়ের ন্যায় নিজ রাজ্য উদ্ধার করুক—কোন ক্ষত্রিয়ই ধর্ম্মতঃ ভিক্ষালব্ধ দান গ্রহণ করিতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ বিরাটরাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া, দৌত্য-ফল ও কুন্তীর আদেশ যথাযথ পাণ্ডবগণকে জ্ঞাপন করিলেন। যুধিষ্ঠির যুদ্ধের আদেশ করিলেন ও উদ্যোগ চলিতে লাগিল। তৎপরে উভয় পক্ষীয় সৈন্য ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে যুদ্ধার্থ আসিয়া সমবেত ও ব্যূহিত হইল। এইরূপ সময়ে অর্জ্জুন উভয় সৈন্যের সৈন্য-সমাবেশ ও ব্যূহরচনাদি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য সারথি শ্রীকৃষ্ণকে উভয় সেনার মধ্য-স্থলে রথ স্থাপন করিতে প্রার্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রণস্থলের মধ্যভাগে রথ স্থাপন করিলে, অর্জ্জুন দেখিলেন যে, কুরু ও পাণ্ডব পক্ষীয়ের আত্মীয় স্বজন গুরুজন বান্ধব প্রভৃতি প্রাণপণ করিয়া সমরে প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধার্থে অপেক্ষা করিতেছেন। ইহা দেখিয়া অর্জ্জুনের শরীর কম্পান্বিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, যুদ্ধ করিব না বলিয়া, ধনুঃশরত্যাগ করিয়া শোকাকুল মনে ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিলেন।

এইসকল ঐতিহাসিক ঘটনায় অর্জ্জুনের তদানীন্তন অবস্থা ও গীতাশ্রবণের প্রয়োজন বিচার করা কর্ত্তব্য। অর্জ্জুন বেদ-বেদাঙ্গ আদি সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়নাদি দ্বারা কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়ের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম—ধর্ম্মার্থে ন্যায় যুদ্ধ, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে অক্ষয়স্বর্গবাস—ইত্যাদি তিনি জানিতেন এইসকল ঐতিহাসিক ঘটনা ও অর্জ্জুনের অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, গীতার উপদেশের যথার্থ প্রয়োজন ছিল কিনা। অর্জ্জুন সদ্গুরুর নিকট বেদ-বেদান্ত যথারীতি অধ্যয়ন করিয়া, ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক জ্ঞানের মর্ম্ম ইতঃপূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন। অতএব বলা বাহুল্য তিনি বাল্যেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কর্ত্তব্যনিচয়ে যথা-রীতি অভিজ্ঞ ছিলেন ও এতাবৎ যথারীতি পালন করিয়া আসিতেছিলেন। সুতরাং তিনি ভালরূপই জানিতেন যে ক্ষত্রোচিত, ধর্ম্ম-যুদ্ধ ত্যাগ করিলে তাঁহাকে বর্ণসাঙ্কর্য্য দোষে লিপ্ত হইতে হয় ; যথা—

বর্ণানাং ব্যভিচারেণ অবেদ্যা-বেদনেন চ
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ।

"নিম্নবর্ণের পুরুষ কর্ত্তৃক উচ্চবর্ণের স্ত্রীগমনে কিম্বা (দুষ্টা) পরভার্য্যা গমনে যে বর্ণগণের মধ্যে ব্যভিচার হয়, তদ্দ্বারা, শাস্ত্রনিষিদ্ধ অবিবাহ্যা বিবাহ দ্বারা, এবং স্ববর্ণের বৃত্তিত্যাগ জনিত বর্ণসাঙ্কর্য্য ঘটে। অধিকন্তু এই যুদ্ধ না করিলে তাঁহার নিজের ভ্রাতৃগণের এবং দ্রৌপদীর প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়, মাতৃ-আদেশ, পিতৃসম জ্যেষ্ঠভ্রাতৃ-আদেশও রাজাদেশলঙ্ঘন পাপ ভোগ করিতে হয়। তিনি জানিতেন, দুর্য্যোধনাদি ধৃত-রাষ্ট্র-তনয়গণ ও ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি সকলেই আততায়ীস্বরূপ বধার্হ এবং রাজ্য অপহরণকারী স্বরূপে দণ্ডার্হ। অর্জ্জুন জানিতেন, দণ্ডার্হকে দণ্ড না দিলে ও অদণ্ডার্হকে দণ্ডদিলে উভয় কারণেই রাজাকে গুরুতর পাপভাক্ হইতে

হয়। তিনি জানিতেন, যে ব্যক্তি পাপকারীর সাহায্য করে সে তাহার সমফলভাক্ হয়। এবং রাজার কাছে স্বধর্ম্মে না থাকিলে কি পিতা, কি মাতা, কি আচার্য্য, কি পুরোহিত, কি সুহৃৎ, কি পুত্র কেহই অদণ্ডনীয় নহে। (মনু ৮।৩৩৪) অর্জ্জুন জানিতেন রাজ্য পুনরুদ্ধার না করিলে গত্যন্তর নাই। অপর পক্ষে অর্জ্জুন ইহাও দেখিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ করিলেও অনেকগুলি গুরুতর পাপভাগী হইতে হয়, যথা—গুরুবধ, আত্মীয়স্বজনের বধ, কুলক্ষয় জন্য পাপ এবং তাহা হইতে গৌণভাবে বর্ণসাঙ্কর্য্য পাপ জনিত ইত্যাদি। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া অর্জ্জুন বলিয়া উঠিলেন—

যুদ্ধ জয় করি কিম্বা যাই মোরা হারি।
এ দুয়ের কিবা ভাল বুঝিতে না পারি॥
যাদের বধিয়া ইচ্ছা না রহি জীবিত।
সংগ্রাম কারণে তা'রা সম্মুখেই স্থিত॥
দীন সকাতর চিত ধর্ম্মমূঢ় মন।
শ্রেয় কহ শিষ্য আমি লইনু শরণ॥
ইন্দ্রিয়-সন্তাপকর শোকবিমোচন।
করিতে সমর্থ কিছু না দেখি এমন॥
অকণ্টক ধরা রাজ্য কিম্বা ইন্দ্রাসন।
পেলেও না হবে মোর শোকবিমোচন॥

গী।২।৬-৮

ভগবান্ দেখিলেন যে, অর্জ্জুন যথাবিধি ভক্তি সহ গুরুসেবা ও পরিপ্রশ্নাদি দ্বারা সদ্গুরুর নিকট বেদ-বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন বটে,কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিশেষ ফল হয় নাই, যেহেতু শ্রুত অধীত ও যুক্তি দ্বারা অধিগত বিদ্যা নিঃশেষে সংশয়ের মূলোৎপাটন করিতে পারে না। অর্জ্জুনের জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান থাকিলেও সংশয়মূল বিদ্যমান থাকায় জন্য জ্ঞান সুদৃঢ় হইতে পারে নাই। সেই জন্যই 'আমি-আমার' মোহে আবদ্ধ হইয়া শোকাভিভূত হইতেছেন। অর্জ্জুন ইহা বুঝিতে পারিয়া অনন্যোপায় হইয়া ভগবানের শিষ্যরূপে শরণাপন্ন হইলেন এবং পুনশ্চ শ্রেয়োপদেশ ভিক্ষা করিলেন। ভগবান্ দেখিলেন যে, অর্জ্জুনের আমি-আমার মোহের চির নিবৃত্তি করিয়া, তিনি যে দোষসংস্পর্শহীন নিত্যচৈতন্যময় ও আনন্দময় ব্রহ্ম-পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র জীবাত্মা নহেন, ইহার সুদৃঢ় সম্বোধের জন্য এক যোগোপদেশ ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় নাই। যোগের দ্বারা অপরোক্ষ অনুভূতির বলে অর্জ্জুন দেখিতে পাইবেন যে তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহার কোন দুঃখ হইতে পারে না, তিনি শান্ত শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব। ইহাই গীতারূপ ব্রহ্মবিদ্যা যোগশাস্ত্রের প্রয়োজন। এক্ষণে প্রবন্ধবাহুল্য ভয়ে এইস্থলে প্রবন্ধের শেষ করা গেল। আগামী বারে গীতার অধিকারী সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

ক্রমশঃ

৺কবি প্যারীমোহনের কুমারসম্ভব হইতে

পার্ব্বতীর তপস্যা।

[অধ্যাপক শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী, এম, এ]

সেখানে সুন্দরী, মনোনীত করি
গড়িল আশ্রম স্থল।
মরি প্রেমদায় হেন প্রমদায়
প্রেমেতে প্রমাদ হ'ল॥ *

ত্যজিয়া চন্দন ভস্ম বিলেপন
শ্রীঅঙ্গে করিল গৌরী।
অরুণ বরণ বল্কল ধারণ
সুবসন পরিহরি॥

মুকুতার হার　　গলেতে যাঁহার
　　দুলিয়া করিত খেলা।
সেখানে এখন　　গৈরিক-রঞ্জন
　　উত্তর বসন দিলা॥ ৮

অলকের শোভা　　মুখে মনোলোভা
　　চিকন কুন্তল-জাল।
সেখানে এখন　　জটা বিভূষণ
　　তেমতি শোভিল ভাল।

ধরি ভৃঙ্গদল　　শোভে শতদল
　　এমন কেবল নয়।
যদিও শৈবল　　থাকয়ে কেবল
　　তথাপি সুন্দর হয়॥ ৯

মৌঞ্জী রসনা *　　ধরিল ললনা
　　ত্রিগুণা মধ্যম ভাগে।
পরুষ স্পর্শে　　কুটিল ঘর্ষে
　　শিহরি রক্তরাগে॥ ১০

অঙ্গরাগে আর　　কাম † নাহি তার
　　কন্দুক কান্দিয়া মরে।
মুকুতার মালা　　ত্যজি রাজবালা
　　জপমালা নিল করে॥

নবনী কোমল　　সে কর কমল
　　ক্ষত হ'ল কুশা ফুটি'।
ভূমিতে চলনে　　বাজিল চরণে
　　টুটিল কমল দুটি॥ ১১ ‡

মহার্হ শয্যায়　　যেই দুখ পায়
　　কুসুমে কণ্টক জ্ঞান।
এবে ভূমি সার　　শয়ন তাহার
　　বাহু তার উপধান॥ ১২

পিতার ভবনে　　লয়ে সখীগণে
　　খেলিত রাজার বালা।
গহন কাননে　　রহে সে নির্জ্জনে
　　মরি কি প্রেমের জ্বালা॥ *

পরম আদরে　　মাতা কোলে ক'রে
　　বদনে দিত আহার।
সে হেন কামিনী　　সাজিল যোগিনী
　　কি আর কহিব আর॥ *

ব্রতের কারণ　　দিলা বিসর্জ্জন
　　যৌবন বিভ্রম যত।
চাহনি চঞ্চল　　পে'ল মৃগীদল
　　ব্রততী † বিলাস যত॥ ১৩

সাধনা অতুল　　সাধ্য সমতুল
　　সকল করমে লাগে।
তাই বুঝি উমা　　হতে হর-রমা
　　যোগিনী সাজিল আগে॥ *

আশ্রমে তাঁহারি　　তরু সারি সারি
　　সিঞ্চিতে আপন করে।
পুত্র-স্নেহ ধীরে　　উমার অন্তরে
　　জাগিল তাদের' পরে॥ ১৪

তপের প্রভাবে　　ত্যজে দুষ্ট ভাবে
　　কাননেতে যেবা বসে।
দিন দিন দিন　　বনের হরিণ
　　আইল তাঁহার বশে॥ ১৫

করে নিত্যস্নান　　অগ্নির আধান
　　বল্কলে আবরি কায়।
স্তুতি-পাঠে রত　　হোম বিধিমত
　　কত কাল হেন যায়॥

বিস্ময় মানিয়া　　মনে প্রশংসিয়া
　　মুনিরা দেখিতে এল।
তপ নিরখিয়ে　　গেল লজ্জা পেয়ে—
　　এমন না কভু ভেল! ১৬

পশু যত ছিল　　কলহ ভুলিল
　　তরুগণ দিল ফল।
উটজে অনল　　জ্বলে অবিকল
　　এমনি তপের বল॥ ১৭

---

* মুঞ্জাতৃণ নির্ম্মিত কোমরের মেখলা।
† (১) রুচি, (২) প্রয়োজন।
‡ চরণকমল দুটি আঘাতে যেন ছিন্ন-ভিন্ন হইল।

† লতা।

কিছু দিন যায় ফল নাহি পায়
যখন দেখিল সতী।
মহা আড়ম্বরে ঘোর তপ করে
না চাহি শরীর প্রতি ॥ ১৮
কন্দুক-ক্রীড়ায় যেই ক্লেশ পায়
সে সহে এমন ভার।
স্বর্ণ পদ্ম † ল'য়ে বুঝি মিশাইয়ে
গঠিত শরীর তার ॥ ১৯
অনল জ্বালিয়া চৌদিকে বেড়িয়া
হাসিয়া বসিল ধ্যানে।
অটল নয়নে চেয়ে রবি পানে
দারুণ নিদাঘ দিনে ॥ ২০
তপন কিরণে কমল আননে
মরি কি সোভার ছটা।
নয়নের কোল কালরে কেবল
হইল কালেতে ছুটি ॥ ২১
রসের আকর হিমকর-কর
আর জলধর-জল।
ঐ দুটি সার আহার তাঁহার
যাহে বাঁচে তরুদল ॥ ২২
নিদাঘ কাটিল বরষা আসিল
বরষি নবীন বারি।
উমা অকাতরা কাতরা সে ধরা
লইল শরণ তারি ॥ ২৩
বজ্র কড়-মড়ি শিলা তড়-তড়ি
পড়ে সদা জলধার।
ক্ষণেকে ক্ষণেকে চপলা চমকে
ঘন ঘোর অন্ধকার ॥ ২৪
ঘন ঝড় বয় এমনো সময়
রজনীতে শশিমুখী।
একাকিনী বনে ভয় নাহি মনে
ধেয়ানে মুদিত আঁখি ॥

† কারণ, স্বর্ণের কঠিনতা ও পদ্মের কোমলতা পার্ব্বতী দেহে একত্র রহিয়াছে।

আকাশের তলে পড়ি শিলাতলে
ভিজিছে জলদ-জলে।
দেখি সেই বালা রজনী ব্যাকুলা
লইল আসিয়া কোলে ॥
দেখিল রজনী প্রকাশি' দামিনী *
চঞ্চল নয়ন তার।
অবাক হইয়ে মৃদু গরজিয়ে
করিলেক তিরস্কার ॥
"কার তুই বাছা হায়রে দুর্দ্দশা
কেন রে দুর্গতি ঘোর।
নাহি কিরে গুরু, গুরু, গুরু-গুরু
নাহি কি জননী তোর?"২৫ †
ভীম হিমকালে ব্যাপ্ত হিমজালে
শীতে কাঁপে থর-থর।
তাহাতে কামিনী পোউষ যামিনী
জলে ডুবি নিরন্তর ॥
চকা-চকী যত নিশাতে বিযুত
নদীর দু'পারে বসি।
তাদের লাগিয়া কাঁদে তাঁর হিয়া
যাবৎ না যায় নিশি ॥ ‡
প্রালেয় দুর্দ্দিনে প্রলয়ই গণে
জলের কমল দল। †
উমার কোমল আনন-কমল
তখন ও ঢল-ঢল ॥
কম্পিত অধর পত্র মনোহর
নিশ্বাস সৌরভময়।
দেখি মনে লয় কমল নিশ্চয়
ভ্রমরের ভ্রম হয় ॥ ২৭

† মেঘের গুরু গুরু গর্জ্জন ধ্বনিই রজনীর কণ্ঠস্বর। গুরু অর্থাৎ পিতা, পতি বা পূজনীয় পালক। এই পদ্যে মেঘধ্বনির অনুকারী কয়েকটি শব্দ ও স্বর-ব্যঞ্জন আছে।

‡ চকা-চকীরা রাত্রিকালে বিযুক্ত হইয়া নদীর এপারে ও পারে অবস্থান করে। পরের দুঃখে মহতের নিজের দুঃখ মনে থাকে না। * বা দামিনী চঞ্চল।

† শীতকালে তুষার বর্ষণে কমলদল ছারখার হয়।

সাহিত্য পরিষদ প্রহেলিকা।

[শ্রীযতীন্দ্র মোহন রায়।]

কলিকাতা, ১৬ নং সাগরধরের লেন, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪।

সবিনয় নিবেদন,---বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সদস্যবৃন্দের মধ্যে মতভেদে যে মনোমালিন্যের সঞ্চার হইয়াছে, তৎসম্পর্কে আমার লিখিত একখানি পত্র "নায়কে" এবং অপর একখানি "বসুমতীতে" প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু, পরিষদ সম্বন্ধে সাময়িক পত্রে আলোচনা করা অপেক্ষা যে ঘটনা-পরম্পরায় পরিষদের বর্ত্তমান দলাদলির আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার যথাযথ বিবরণ প্রত্যেক সদস্যের গোচরীভূত করিলে, প্রতিবিধান সহজসাধ্য হইবে বলিয়া, আমি এই পত্রখানি লিখিতেছি।

পরিষদে যে দলাদলির সৃষ্টি হইবে, তাহা ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে পরিষদের অন্যতম "ধাত্রী" আচার্য্যপাদ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। অনেকেই হয়ত জানেন যে, পরিষদ সম্পর্কীয় অনেক বড় বড় ব্যাপার, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায় আলোচিত না হইয়া, পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে অথবা সাধারণ সমিতিতে উপস্থাপিত করা হয় না, এবং গত কয়েক বৎসরের মধ্যে, কোনও বারই পরিষদের কর্ম্মচারিনির্ব্বাচন, তাঁহার বৈঠকে আলোচিত না হইয়া, পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে আসে নাই। যে বৎসর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের স্থলে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন, সেবারও শ্রীযুক্ত ত্রিবেদী মহাশয়ের পার্শিবাগানের বাসায় এক পরামর্শ সভা বসিয়াছিল। এই সভাতে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়কে সভাপতি করিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলে, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "শাস্ত্রী মহাশয়কে পরিষদে আনিলে তিনি সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারিবেন না, তাহাতে পরিষদে দলাদলি হইবার আশঙ্কা আছে"। সেদিন সেইস্থানে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে ভোট লওয়া হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীযুক্ত ত্রিবেদী মহাশয় পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পক্ষে ভোট দেন নাই।

আমার বোধহয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়, গত ১৩২১ বঙ্গাব্দের বড়দিনের ছুটির সময়ে, সাহিত্যসভার এক অধিবেশনে, "আদিশূর" শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহা হইতেই পরিষদে দলাদলির সূত্রপাত হয়। চন্দ মহাশয়ের প্রবন্ধ লেখা হইলে, তিনি এই প্রবন্ধ সাহিত্যপরিষদে পাঠ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, এবং পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি ও ন্যাসরক্ষক, আজীবন সদস্য, কুমার শরৎকুমার রায় চেষ্টা করেন, যাহাতে এই প্রবন্ধ পরিষদে পঠিত হয়। কিন্তু পরিষদের কোনও কর্ম্মাধ্যক্ষ তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধুর (শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর) মান বাঁচাইতে যাইয়া, (কারণ এই প্রবন্ধ পরিষদে পঠিত হইলে তাঁহার বন্ধুর অনেক কীর্ত্তিকাহিনী প্রকাশিত হইয়া পড়িবে), শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়ের সবিশেষ চেষ্টা স্বত্বেও, উক্ত প্রবন্ধ যেন পরিষদে পঠিত হইতে না পারে, তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়া, সফলকাম হইয়াছিলেন। এই কথা উক্ত প্রবন্ধ পাঠকালে রমাপ্রসাদ বাবু বলিয়াছিলেন। ইহাতে যে বরেন্দ্র অনুসন্ধানসমিতির সহিত সাহিত্যপরিষদের মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

তৎপরে শাস্ত্রী মহাশয় বর্দ্ধমানের সাহিত্যসম্মিলনে যে সম্বোধন পাঠ করেন, তাহাতে পরিষদে গোলমাল উপস্থিত হয়। এই অভিভাষণে তিনি সম্প্রদায়-বিশেষ সম্বন্ধে যেরূপ অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। বর্দ্ধমান সম্মিলনের অব্যবহিত পরে এই বিষয় লইয়া কিঞ্চিৎ কাণাঘুষা আরম্ভ হয় এবং ইহাও শুনিতে পাওয়া যায় যে,

শাস্ত্রী মহাশয়ের এই "সম্বোধন" পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

পরিষদের ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কায়, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, এইরূপ প্রবন্ধ প্রকাশে আপত্তি করেন। হেমবাবুর আপত্তি করিবার আর ও একটি কারণ ছিল যে, উক্ত সম্মিলনের পরবর্ত্তী বৈশাখ মাসের ১লা তারিখেই এ প্রবন্ধের অনেকানেক অংশ "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং পরিষদপত্রিকায় তখন ও উহা প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় অত্যন্ত জেদ করিতে লাগিলেন; অনন্যোপায় হইয়া পরিষদের সম্পাদক আপত্তিকারিগণকে পরিষদে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার কথাতে, আপত্তিকারিগণ এই প্রবন্ধ পরিষদপত্রিকায় প্রকাশিত হইলে, যাহাতে পরিষদের কোনও অনিষ্ট হয়, তাহা করিবেন না বলিয়া, প্রতিশ্রুত হইলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের জেদ বজায় রাখিবার জন্য তাঁহার সেই সম্বোধন সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বাহির হয়। সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা একখানি Research Journal, পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় দেশ বিদেশের বহু Research Societyর সহিত যত পরিচিত, তদপেক্ষা বেশী পরিচিত আর কেহ এদেশে আছেন কিনা জানি না; সুতরাং এইরূপ, অপর পত্রিকায় পূর্ব্বে প্রকাশিত কোনও প্রবন্ধ, কোন ও Research Journalএ প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছে কিনা, তাহা তিনি আমাদিগকে দয়া করিয়া জানাইলে বাধিত হইব। যাহা হউক, শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় প্রবন্ধটি প্রকাশ করিয়াই নিরস্ত হইলেন না। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, ৮ বৎসরকাল সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করিয়া, ১৩২১ সালের শেষভাগে, অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য পরিষদের কোনও কর্ম্মাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু হেমবাবু এইরূপ অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র মহাশয়দ্বয়ের কথাতে, সহকারী সম্পাদক রূপে পুনরায় কার্য্য করিতে স্বীকৃত হন। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ লইয়া যে ব্যাপার হয়, তাহার পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ প্রকাশের পর, আমার লিখিত 'শ্রীবিক্রমপুর' প্রবন্ধ, যথারীতি অনুমোদিত হইয়া, পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সময়ে, সহকারী সম্পাদক রূপে, কোন প্রবন্ধ পত্রিকাতে প্রকাশিত হইবে বা না হইবে, তৎসম্বন্ধে নিয়মানুসারে যাহা করণীয়, তাহা হেমবাবুর অন্যতম কর্ত্তব্য মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ছিল। সুতরাং, এই দুই প্রবন্ধের ব্যাপারে, হেমবাবুর বিরুদ্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের জেদ বাড়িয়া যায়। ফলে, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির যে অধিবেশনে হেমবাবুকে সহকারী সম্পাদকরূপে মনোনয়নের কথা হয়, সেই সময়ে তিনি বলিয়া পাঠান যে, যদি হেমবাবু সহকারী সম্পাদক মনোনীত হন, তবে তিনি পরিষদের সভাপতিপদ ত্যাগ করিবেন। ইহা শুনিয়া হেমবাবু সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন।

যশোহর সম্মিলনের ইতিহাস শাখার সভাপতি নির্ব্বাচন লইয়া গোলমাল হয়। সম্মিলন পরিচালনসমিতির এক অধিবেশনে এই বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, অধিবেশনের পরে পরিষদের তাৎকালীন সভাপতি, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এবং গৌড়রাজমালার লেখক সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দকে অভিধানবহির্ভূত ভাষায় সম্বোধন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের এই ব্যবহারে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সহিত পরিষদের মনোমালিন্য পাকাপাকি হইয়াছিল।

এই সময়ে "গুপ্ত বলভি সংবৎ" এবং "লখ্‌নৌ সহরের নামের উৎপত্তি" প্রবন্ধদ্বয়, পরিষদ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে "মানসী ও মর্ম্মবাণী" এবং

যতদূর অবগত আছি, তাহাতে শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত প্রবন্ধদ্বয় পরিষদপত্রিকায় প্রকাশের জন্য অনুমোদন করিয়াছিলেন। পরিষদের এক নিয়ম আছে যে, কোনও প্রবন্ধে কোনও রূপ মৌলিক গবেষণার পরিচয় না থাকিলে, সেই প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় না। এই নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, রাখালবাবু শাস্ত্রী মহাশয়কে বলিয়াছিলেন যে, ১৯০৫ সালে Prof Sylvain Levi Le Nepsl নামক গ্রন্থে, (গুপ্ত বলভি সংবৎ) সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার পর এই বিষয় সম্বন্ধে আর কেহ নূতন কোনও কথা বলেন নাই। এই প্রবন্ধে New juxtaposition of facts নাই। তাহাতে শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, তাহা নাই। রাখালবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহা হইলে আপনি কেন এরূপ প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য অনুমতি দিলেন? তদুত্তরে শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন, যে দেশে ও সমাজে অনেক লোক, তাঁহাদের কোন কৃতিত্ব না থাকা স্বত্বে ও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগকে চালাইলে, পরিষদের ক্ষতি হইবে বলিয়া, আমি এরূপ অনেক প্রবন্ধ প্রকাশের অনুমতি দিয়াছি।

পরিষদের অনেক টাকা গ্রন্থ প্রকাশে ব্যয় হয়। যাহাতে এই সমস্ত ব্যয় যথার্থভাবে পরীক্ষিত হয়, সে উদ্দেশ্যে পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক, মৃণালবাবু প্রেস সমিতি গঠনের প্রস্তাব করেন, ও আমার যতদূর জানা আছে, তাহাতে যাহাদের ছাপাখানায় পরিষদের গ্রন্থাদি ছাপা হয়, এরূপ দুই-একজনের নাম এই সমিতির সভ্যরূপে প্রস্তাব করেন কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির যে অধিবেশনে প্রস্তাব আলোচিত হয়, সেই অধিবেশনে বোধ হয় কুমার শরৎকুমার রায় সভাপতি ছিলেন। তাঁহার প্রস্তাবে ইহাই গৃহীত হয় যে, যাঁহাদের প্রেস আছে বা যাঁহাদের প্রেসে পরিষদের পুস্তকাদি ছাপা হয়, তাঁহারা ঐ সমিতির সভ্য থাকিতে পারিবেন না। ফলে পূর্ব্বোক্ত সভ্যগণের নাম তখন এই কমিটি হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তৎপরে জানি না কি ভাবে, তাহাদের কেহ কেহ এই সমিতির সভ্য হইলেন এবং তাহাদের ছাপাখানাতে পরিষদের কাজ কর্ম্ম হইতে লাগিল। পরিষদের যতগুলি শাখা সমিতি আছে, তন্মধ্যে এই ছাপাখানা সমিতি, যেরূপ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের সহিত নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, অপর কোন শাখা সমিতি বোধ হয় তাহা করেন নাই। ইহার ফলে এই হইল যে, শাস্ত্রীমহাশয়ের আশ্রিত কাহারও কাহারও অন্যথা আর্থিক লাভ বন্ধ হইতে লাগিল এবং তাহারা শাস্ত্রী মহাশয়কে, এই সমিতির বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। যাহাতে এই সমিতি না থাকিতে পারে, সেইজন্য শাস্ত্রীমহাশয় বিশেষভাবে চেষ্টিত হইলেন। এই সমিতির প্রথম বর্ষের ইতিহাসে অনেক ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাহার মধ্যে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ঘটনা পরিষদের কোনও কর্ম্মাধ্যক্ষের নিজের প্রেস সম্বন্ধীয়। এই প্রেসে পরিষদের একখানি পুস্তক ছাপা হয়, কিন্তু প্রেস পুস্তক ছাপিতে অযথা বিলম্ব করায়, Press committee অনেক লেখালেখির পর গ্রন্থের যে অংশ ছাপা না হইয়াছিল, সেই অংশ উক্ত প্রেস হইতে আনাইয়া, অপর প্রেসে পাঠাইতে হইবে বলিয়া স্থির করেন এবং বাকি কাপি উক্ত প্রেস হইতে আনান হয়; কিন্তু তৎপর শাস্ত্রী মহাশয় বোধ হয়, সেই কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট সমস্ত অবগত হইয়া এবং Press committeeকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া, উক্ত কাপি সেই প্রেসে ফিরাইয়া দেওয়ান। ইহাতে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হয় ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি শাস্ত্রী মহাশয়ের পক্ষ লয়েন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির এই সিদ্ধান্ত, Press committee পক্ষে অপমানজনক ও সুচারুরূপে কার্য্য সম্পাদনের পক্ষে প্রতিকূল বিবেচনায় Press committeeর কতিপয় সভ্য পদত্যাগ করিয়াছিলেন।

ডাক্তার বসুর সভাপতি নির্ব্বচন-কাহিনী সম্বন্ধে একটি কথা আপনাদিগকে জানান বিশেষ ভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। পূর্ব্বাপর রীতি অনুসারে, গত বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে, পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে, ত্রিবেদী মহাশয়ের বাড়ীতে, একাধিক বার বৈঠক বসিয়াছিল। এই বৈঠকে, কেহ কেহ সার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে শাস্ত্রী মহাশয়ের স্থলে সভাপতি প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাহাতে হীরেন্দ্র বাবু প্রমুখ পরিষদের যাত্রীগণ বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করেন। এই বৈঠকে স্থির হইয়াছিল যে ডাক্তার বসুর মনোগত অভিপ্রায় কি, তাহা হেমবাবু

প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে জানিয়া, সকলকে অবগত করাইবেন। ইহাতে রামেন্দ্রবাবু আপত্তি করিয়া বলেন যে, তিনি নিজেই ডাক্তার বসুর সহিত কথাবার্ত্তা বলিলেন। ডাঃ বসুর সঙ্গে তিনি কি কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না। পরে ডাক্তার বসু, সত্যানন্দ বাবুকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, তিনি পরিষদের সভাপতি হইতে অক্ষম; কিন্তু তিনি আমার নিকট তাহার বহু পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন যে, যদি পরিষদ তাঁহাকে চায়, তবে তিনি সভাপতি পদ গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন। ত্রিবেদী মহাশয়, সত্যানন্দ বাবুর এই চিঠির খবর রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহারই কথা মত, হেমবাবু সত্যানন্দ বাবুর নিকট গিয়া, বসু-মহাশয়ের পত্রখানা লইয়া আসেন এবং সত্যানন্দ বাবুকে অনুরোধ করিয়া আসেন যে, তিনিও যেন সভাতে উপস্থিত হন। শ্রীযুক্ত জগদীশবাবুর নির্ব্বাচনের পর পরিষদের অনেক যাত্রী বিশেষভাবে বিচলিত হইলেন। রামেন্দ্রবাবু শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতিবেশী হইয়া, তাঁহার দ্বারা এতদূর বশীভূত হইয়াছিলেন যে, সভাস্থান হইতে নিম্নে আসিয়া, পরিষদের কার্য্যালয়ে বলিয়াছিলেন, ডাঃ বসুর নির্ব্বাচন নিয়মাবলী সঙ্গত হয় নাই; সুতরাং তাঁহারা ইচ্ছা করিলে requisition meeting call করিয়া এই বিষয় পুনর্বিবেচনা করিতে পারেন।

গত বার্ষিক অধিবেশনের কিছু পূর্ব্ব হইতে, পরিষদে দু'টি দলের সূচনা হয়, এবং বোধ হয় এক দলের পরামর্শদাতা হন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু এক অপর দলের পরামর্শদাতা হন শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। গত বৎসর যে সমস্ত কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা-দিগের মধ্যে রমেশবাবু ও কালিদাস বাবুর নির্ব্বাচন বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। রমেশবাবুর নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, তাঁহার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু, চিত্রশালাধ্যক্ষ ছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই দুইজনের কেহই প্রকৃতপক্ষে চিত্রশালার কোনও কাজ করেন নাই। এ কয় বৎসর চিত্রশালার কাজ রাখালবাবুই করিয়াছেন, তাহা open secret, এমন কি যে দিন Lord Carmichael পরিষদে আসেন, সে দিন চিত্র-শালাধ্যক্ষ নগেন্দ্রবাবু কলিকাতাতে আসিয়াও, পরিষদে আসা নিরাপদ মনে করেন নাই। রমেশ বাবু, এই এক বৎসর চিত্রশালার কি কাজ করিয়া-ছেন, তাহা আপনারা ইচ্ছা করিলেই জানিতে পারিবেন। আমি জানি যে, রমেশবাবুর ইচ্ছা ছিল, তিনি পরিষদের চিত্রশালার উন্নতিসাধন করেন। বাস্তবিক পক্ষে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়কে বাদ দিলে, রাখালবাবু ও রমেশবাবু ব্যতিরেকে পরিষদের চিত্রশালার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন এরূপ লোক এ দেশে নাই। কিন্তু এই রমেশবাবুকে পরিষদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। তাহার কারণ পরে লিখিতেছি।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রবাবু ১৩১৪ হইতে ১৩১৮ পর্য্যন্ত পরিষদের ছাত্রাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি যে উৎ-সাহের সহিত, তাহার প্রতি অর্পিত ভার সম্পন্ন সম্পন করিয়াছেন, তাহা সবিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। সেই সময়ে, বাস্তবিকই পরিষদের ছাত্র-সভ্যদিগের মধ্যে, একটি নবজীবন ও উৎসাহের সাড়া পাওয়া গিয়াছিল। তাহার পর মন্মথবাবু ছাত্রাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন। মন্মথবাবু ইতি-পূর্ব্বে কিছুদিনের জন্য ছাত্রাধ্যক্ষ ছিলেন। সেই সময়েও, তিনি যেরূপ যোগ্যতার সহিত, তাহার প্রতি ন্যস্ত-কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, ১৩১৯—২২ পর্য্যন্তও তাহাই করিয়াছেন! ফলে এই দাঁড়াই-য়াছিল যে, পরিষদের ছাত্র-সভ্যদিগের কথা, অনেকেই ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কালিদাস বাবু ছাত্রাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইবার পর তিনি পরি-ষদের এই শাখার সংস্কারের, যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। ছাত্রসভ্যদিগের কয়েকটি অধিবেশন হইয়াছিল এবং যাহাতে সার রবীন্দ্র প্রভৃতি সভায়

আসিয়া, ছাত্রদিগকে উৎসাহ দেন, তিনি সেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং রবীন্দ্রবাবু সম্মতও হইয়াছিলেন। কিন্তু এই কালিদাস বাবুকে কার্য্যাধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে।

সে দলাদলির অঙ্কুরের উদগম গত বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে হইয়াছিল, ইহার কিছু কিছু কারণ আমি নায়ক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি। বৎসরের প্রারম্ভে, পরিষদের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে, এই দলাদলির সূত্রপাত দেখিতে পাওয়া যায় এবং হীরেন্দ্রনাথবাবু ও মৃণাল বাবু প্রভৃতি, Press Committee যাহাতে একবারে বিলুপ্ত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু হেমবাবু প্রভৃতির বিশেষ আপত্তিতে ও মাননীয় ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের মধ্যস্থতায়, Press Committee কোনরূপে রক্ষা পাইল।

ক্রমশঃ।

বৈজ্ঞানিক অবিষ্কার!

[মহাবৈদ্য শ্রীশূলপাণি সিদ্ধান্তমহার্ণব]

হিন্দুর বিজ্ঞান ও ইংরাজের বিজ্ঞান এক জিনিষ নহে। হিন্দুরা আয়ুর্ব্বেদকে বিজ্ঞান বলেন; কিন্তু ইংরাজেরা তাহা স্বীকার করেন না। ইংরাজের কথাকেই যাঁহারা বেদবাক্য অপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য মনে করেন, তাঁহাদের মতেও আয়ুর্ব্বেদ 'সায়েন্‌স্' নহে। তা' না হউক; কিন্তু আয়ুর্ব্বেদই যে সকল চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আদি জনক, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আদিসভ্য আর্য্যগণের আবিষ্কৃত আয়ুর্ব্বেদ হইতেই মুসলমানেরা হাকিমি এবং ইউরোপীয়ানরা এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি কত কি 'প্যাথি' চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পথে করিয়াছেন। সেই দেশি বিলাতী সমস্ত বিজ্ঞান খুঁজিয়া দেখুন, কোথাও 'ধনোন্মাদ' রোগের নাম নাই। আয়ুর্ব্বেদ, কামোন্মাদ ও শোকোন্মাদ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া, ভারতের দেশে ভূতভদর্শন গ্রহোন্মাদ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমানকালে সর্ব্বত্র সুলভ ধনোন্মাদের কথা আয়ুর্ব্বেদেও দেখিতে পাইনা কেন? ইহাতে মনে হয়—ধনোন্মাদ রোগ বুঝি আগে ছিল না, এখন হইয়াছে। আশ্চর্য্য এই যে, যখন ভারতে অতুলিত ধন রত্নরাজি ছিল, কথায় কথায় লোকে হাজার হাজার আসরফি ইনাম দিতে পারিত, তখন এ রোগের আমদানি হয় নাই! আর এখন যাহারা আসরফি দেখেনা, টাকা ছুঁইতে পায়না, কেবল কাগজে কলমে টাকার হিসাব করে ও সুদ কষে, তাহারাই এই ধনোন্মাদ রোগে নিতান্ত উন্মত্ত হইতেছে! সুতরাং ম্যালেরিয়ার মত আগে কারণ অভাবে রোগ ছিল না, অথবা এখন কারণ হওয়ার জন্য রোগ জন্মিয়াছে, একথা এই রোগ সম্বন্ধে বলা যায় না। তথাপি একটা কিছুর সদ্ভাব বা আর কিছুর অভাব ভিন্ন এখনই এত বড় একটা রোগ উৎপন্ন হইতে পারে নাই। সেই কিছু দুইটা কি পদার্থ, তাহাই অতঃপর চিন্তনীয়।

নিদান,—প্রচুর পয়সার অনায়াসে আমদানি এবং তাহারি গরমে সংযমের অভাব, এই দুইটাই ধনোন্মাদ রোগের আদি কারণ। আর কেহ আসিয়া বলিতেছে,—'ইমনটী আর নাই'! কেহ বলিতেছে 'বাবু আমাদের বিদ্যার জাহাজ, টাকার খনি, ধর্ম্মের অবতার!' আবার অপর কেহ বলিতেছে,—'জজ, মাজিষ্টর, লাট, বড়লাট কেউকি বাবুর কাছে লাগে? তাদের একবছরের ব্যাতন বাবুর একদিনের আয়!' এমন কথা নিয়ত শুনিলে, সংযম থাকিবে কেন? মাথা গরম হইবে বই কি? কাজেই এই গুলিকে ইহার সন্নিকৃষ্ট বা উত্তেজক কারণ বলিতে হইবে।

সম্প্রাপ্তি—ইহার সম্প্রাপ্তি বা 'ফিজিওলজি' এই

রূপ নির্ণীত হইয়াছে ;—অনবরত টাকা, মোহর, নোট, পেপার প্রভৃতি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে সেই সঙ্ঘর্ষণ ফলে বৈদ্যুতিকশক্তির মত একটা উত্তাপ উৎপন্ন হইয়া সমস্ত দেহের শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে একরূপ কম্পন উৎপাদন করে। সেই কম্পনের ফলে পা'দুখানি পরের মাথায় উঠিবার জন্য, হাত দু'খানি লোকের গলাধাক্কা দিবার জন্য, কণ্ঠস্বর সকলকে কুবাক্য বলিবার জন্য ক্রমশঃ লাফাইতে থাকে, এবং বুকটাও "কাহারও করিমাকো কেয়ার" বলিয়া ফুলিয়া উঠে। তারপর সেই কম্পন, উল্লম্ফন ও স্ফীতি মস্তকে উঠিয়া, সমস্ত মস্তিষ্কটাকে গুলাইয়া দেয়! সুতরাং তখন প্রতি-কার্য্যই তাহার উন্মাদলক্ষণবৎ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বরূপ—এই উন্মাদ-অবস্থা প্রকাশের পূর্ব্বে রোগীর মনে ধরাখানা শরার মত ক্ষুদ্র, এবং তাহার চক্ষুতে ধনহীন মানুষ কুকুর-শৃগালের মত নিকৃষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়। কথাগুলি অস্বাভাবিক লম্বা, পদাতিক মানুষের প্রতি নাসিকাকুঞ্চন ও তিরস্কার এবং কেবল গাড়ী-মোটরের আরোহীর প্রতিইআদর আপ্যায়ন প্রভৃতি প্রকাশ পায়। সম্বন্ধে গুরুজন বা খাতিরে নমস্য ব্যক্তিও অর্থহীন হইলে, তাঁহাকে উপেক্ষা প্রদর্শন অর্থাৎ তাঁহার সম্মুখে সিগারেট টানিতে বা তাহার সহিত অশ্লীল আমোদ করিতে উৎসাহ প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। আত্মীয় স্বজনের বা প্রকৃত হিতৈষীর পরামর্শে আস্থা না থাকায় তাঁহাদের বিশেষ অনুরোধেও এই সময়ে কোন চিকিৎসা হয় না। সুতরাং ক্রমশঃ রোগের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইয়া, রোগীকে সাধারণের নিকট প্রকৃত উন্মাদরূপে পরিচিত করে।

ধনোন্মাদ রোগের সাধারণ লক্ষণ—সর্ব্বদা মেজাজ গরম, সকলের প্রতি রুক্ষবাক্য ও নির্দ্দয় ব্যবহার, বিশেষতঃ আশ্রিতের প্রতি নানাবিধ অত্যাচার, দুর্ব্বলকে পীড়ন, কিন্তু বলবানের কাছে ভয়, অপর ধনীর প্রতি বিদ্বেষ ও তাঁহাদের কুৎসা আলোচনায় তৃপ্তি, কাহারও সর্ব্বনাশ শুনিয়া সন্তুষ্টি এবং নিজের ধনবৃদ্ধির চিন্তায় দারুণ অস্বস্তি ও ধনবৃদ্ধির জন্য জাতিধর্ম্ম পদদলিত করিয়া, যে কোন কুকার্য্য-দুষ্কার্য্যে অস্মোৎসর্গ ইত্যাদি। রোগের অধিক-প্রকোপ হইলে, কার্য্যাকার্য্যের বিবেচনামাত্র থাকে না, নিজের সমস্ত কাজই ভাল বলিয়া মনে হয়, লোকনিন্দায় নিতান্ত উপেক্ষা, অথবা নিন্দা শুনিলে সেই নিন্দার কাজ করিতেই অধিক জিদ্। কেহ সৎপরামর্শ দিলে তাহাকেই অনিষ্টকারী বলিয়া সন্দেহ, কিংবা উপকারী মাত্রকেই অপকারী বা স্বার্থসাধক বলিয়া বিশ্বাস হইয়া থাকে।

উপদ্রব,—নিকটে কোন প্রার্থী আসিলে, স্বহস্তে তাহাকে গলাধাক্কা বা প্রহার করিতে প্রবৃত্তি, দুর্ব্বল ও অসহায় আশ্রিত কেহ অপরাধ করিলে ব্রাহ্মণ-শূদ্র-নির্ব্বিশেষে তাহাকে পাদুকাঘাত বা মাটীতে ফেলিয়া তাহার মুখে মূত্রত্যাগ, এবং কেহ কখন এক কপর্দ্দক চুরি না করিলেও, সকলেই বুঝি সর্ব্বস্ব লুটিতেছে ভাবিয়া সর্ব্বদা দুশ্চিন্তা, সঞ্চিত অর্থের ক্ষয় হইবে আশঙ্কায় দেবকার্য্য ও সাংসারিক অবশ্য কর্ত্তব্য পালনেও দারুণ আপত্তি, নিজের ভোগ-বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য পরের সকলপ্রকার সর্ব্বনাশসাধনে প্রবৃত্তি প্রভৃতি নানা বিচিত্র অচিন্ত্য অসম্ভব কার্য্যে আসক্তিই ইহার উপদ্রব বলিয়া পরিগণিত।

এই কয়েকটী মাত্র লক্ষণই ধনোন্মাদ রোগের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ নহে। দুনিয়া'এসাইলামে' এই রোগীর সমস্ত কার্য্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিলে, আরও অনেক অপূর্ব্ব লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। রোগ-জ্ঞানের সুবিধার জন্য কতকগুলি সেইরূপ নূতন লক্ষণও অতঃপর বিবৃত করা যাইতেছে। স্থানাভাবে সকলের বিবরণ বিবৃত করিতে পারিলাম না। নতুবা ইহা অপেক্ষাও অধিক ভয়ঙ্কর আরও অনেক ব্যবহার দেখান যাইত। কাহারও তাহা জানিবার প্রয়োজন হইলে জানাইবেন ; বারান্তরে সে সমস্ত লক্ষণ নির্দ্দেশ করিব।

১। একদিন সান্ধ্যভ্রমণের পর ফিরিবার সময়ে

পথে একখানি ছাপান কাগজ কুড়াইয়া পাইলাম। কাগজের হেডিং রহিয়াছে—"কনিষ্ঠ পুত্র ও জ্যেষ্ঠা পৌত্রীর শুভসম্বন্ধ উপলক্ষে প্রীতিভোজন।" পুত্র কনিষ্ঠই হউক, আর পৌত্রী জ্যেষ্ঠাই হউক, তাহাদের একটা সম্বন্ধ অবশ্যই আছে। কিন্তু শুভসম্বন্ধ বলিলে লোকে যাহা বুঝে, তাহাতো পুত্র-পৌত্রীতে সঙ্গত নহে। এ যে নেহাৎ নোংড়া কথা! তথাপি সেই শুভসম্বন্ধের জন্য যে প্রীত হইয়া প্রীতি ভোজন করায়, আবার সেই কথা কাগজে ছাপাইয়া প্রচার করিতে পারে, তাঁহাকে উন্মাদ ভিন্ন আর কি বলিব?

তাহা না হইলে, সেই কাগজে এক দুই করিয়া ২৫ পঁচিশ রকম খাবার জিনিষের তালিকা ছাপান কেন? সে তালিকায় মাড়োয়ারীদের ডালভাজা, দিগম্বরী দিদির আম্ড়ার অম্বল, ফোক্‌লা বুড়োর লুচির পায়স, পূর্ব্ববঙ্গের দধি-ইলিশ,আবার মটনের হাঁড়ীকাবাব, মাংসের গ্রিল—ক্যাটলেট, শেষে ভট্‌চাজ্জি মহাশয়ের ফলমূল পর্য্যন্ত সবই আছে। ছাগমেষ-মৎস্ত-জাতির যেন নির্ব্বংশ করিবার ব্যবস্থা! নাই কেবল 'ফাউল-কারি!'—পাগলেরও নিষ্ঠা আছে! দেখিয়া বুঝিলাম,—প্রীতি-ভোজনের আয়োজনগুলিই এই কাগজে ছাপান হইয়াছে। কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না, ইহা ছাপানর উদ্দেশ্য কি? ফর্দ্দ দেখিয়া, খাদ্য বাছিয়া চাহিবে, সে প্রথা ইংরাজি হোটেলে থাকিলেও, নিমন্ত্রিতের কখন চাহিয়া খাওয়া চলে না। চাহিবার প্রয়োজনওতো কিছু নাই; আয়োজনের সকল জিনিষই যে পাতে পড়িবে! তবে কি, জিনিষের নাম শেখান উদ্দেশ্য? কিন্তু ফর্দ্দ দেখিয়া নাম ঠিক করাওতো সাধ্যায়ত্ত নহে! সে উদ্দেশ্য হইলে, প্রতি জিনিষের গায়ে টিকিট মারিয়া দেওয়াইতো উচিত ছিল। অথবা সে সব জিনিষের নাম জানেনা কে? এতো হাংলা—ক্যাংলা—ব্রাহ্মণভোজন নহে, এ যে ভদ্রলোকের প্রীতিভোজন।

"অনেক চিন্তার পর করিলাম স্থির"—তালিকা ছাপাইয়া পাগল অনর্থক অর্থব্যয় করে নাই। ইহার উদ্দেশ্য—'হ্যাণ্ড বিল' বিলি। আমি যে এত জিনিষ খাইতে দিলাম, যে যে খাইল সেই কয়েকজন ভিন্ন আরতো কেহ জানিতে পারিবে না! কিন্তু পকেটে করিয়া এই কাগজখানি একজন লইয়া গেলে, আরও দশবিশ জন তাহা দেখিতে পাইবে! এই দেখান টুকুইতো ধনের সদ্ব্যবহার; আর এই রূপ দেখাইতে দেখাইতেইতো ধনিগণ ধনোন্মাদ রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। সুতরাং এই কাগজ ছাপানও সেই উন্মাদের লক্ষণ বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

২। গাড়ী চড়িবার সুকৃতি নাই, ট্রামভাড়ারও পয়সা যোটে না। তাই সেদিন ছোট বড় গাড়ীর সহিষ-মুখনিস্থত "এই অব জানেবালে" শব্দের তিরস্কার শুনিতে শুনিতে রথচক্রনিক্ষিপ্ত কর্দ্দম-জলে সিক্ত হইয়া শ্রীচরণপ্রসাদাৎ ধর্ম্মতলায় যাইতেছিলাম; মোড়ের কাছাকাছি একখানি জুতার দোকানে দেখিলাম,—দুইটী পরিচিত বৈদ্যসন্তান বসিয়া আছেন। ভাবিলাম ইহাঁরা বুঝি জুতার অর্ডার দিতে আসিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই অপর ভদ্রলোক তথায় প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহারা যেরূপ সাগ্রহে সেই ভদ্রলোকের অর্ডার ও পায়ের মাপ প্রভৃতি দেখিতে লাগিলেন, তাহাতে বুঝিতে বাকী রহিল না যে ইহারাই এই দোকানের মালিকযুগল। কি সর্ব্বনাশ! অভিজাত্যগর্ব্বিত অহীনকর্ম্মা বৈদ্যসন্তানের এ কি ব্যবসায়?

পেটের দায়ে অনেকে অনেক হীন কাজ করে—জানি। কিন্তু ইহাঁরা উভয়েই যে লক্ষ লক্ষ টাকার অধীশ্বর। ইহাঁদের তো পেটের দায় নাই! তবে কিসের দায়ে আজ ইহাঁরা জুতাওয়ালা হইয়াছেন! বুঝিলাম,—ইহাও সেই রোগের দায়! ধনোন্মাদ রোগই ইহাঁদিগকে 'কার্য্যাকার্য্যবিভাগাজ্ঞ' করিয়াছে! পাগলের কাছে সমাজের একটা অভাব ঘুচিল, এখন নিষ্ঠাবানেরা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণসন্তানের বিশুদ্ধ চামড়ার বিশুদ্ধ জুতা পায়ে দিয়া ধর্ম্মরক্ষা

করিতে পারিবেন! পাগলের প্রাণেও এত হিন্দুয়ানি! আশা করি, বৈদ্যগণ ইহাঁদিগকে সমাজপতি করিয়া, ইহাঁদের গুণের পুরস্কার দিতে ক্রটী করিবেন না।

৩। একবার সুদূর মফস্বলে বিবাহের বরযাত্রী গিয়া, একটী ধনোন্মাদ-রোগী দেখিয়াছিলাম। তিনি বড় বাপের বেটা, সুতরাং বাপের খাতিরে এমন ভঁইষকেও সাধারণে চেয়ারে বসাইয়া রাখে! আমরা দূরদেশ হইতে গিয়াছি, তাঁহাদের বাড়ীতেই গভীর নিশীথে বরযাত্রী-ভোজনের বিপুল আয়োজন উদরস্থ করিয়াছি, নানা গোলযোগে অবশিষ্ট রাত্রিটুকুতেও সুনিদ্রালাভের সুবিধা পাই নাই। বিশেষতঃ সেই সব দেবদুর্লভ ভুক্তদ্রব্য পেটে করিয়া নিজের দরিদ্র-কুটীরে ফিরিয়া আসাও উচিত নহে! কাজেই বাধ্য হইয়া বেয়াদবের মত প্রত্যুষেই আমাদিগকে উদরের জিনিষ বাহিরে ঢালিবার স্থান খুঁজিতে হইল! বড়বাবুকে সম্মুখে পাইয়া তাঁহারই কাছে আমরা বার বার ব্যাকুলভাবে ব্যবস্থাপ্রার্থী হইলাম, কিন্তু কোনরূপেই সে ব্যবস্থাটাকে তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝাইতে পারিলাম না। তিনি কি এমন ছোটকাজের বন্দোবস্ত করিয়া, তাঁহার বড় ইজ্জৎ ছোট করিতে পারেন। তাঁহার সেই উপেক্ষার ভ্রূকুটী দেখিয়া, অগত্যা অবশেষে আমরা মা-গঙ্গার অাঁচলে আশ্রয় লইলাম।

বিপন্মুক্তির পর কেবলই মনে হইতে লাগিল— 'এটা হইল কি?' ধনে মানে কিছুতেই যাঁহারা তাঁহাদের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহেন, আমাদের দলে আমি ছাড়া আর সকলেই যে সেইরূপ লোক। তথাপি নিজের বাটী আহ্বান করিয়া, তাঁহাদিগকে যিনি এমন উপেক্ষা করিতে পারেন, তাঁহাকে তাঁহার বিজ্ঞ বিচক্ষণ অভিভাবকগণ 'এসাইলামে' না পাঠাইয়া, বাড়ীতে রাখেন কেন? এই একটী উন্মাদের একটীমাত্র উপেক্ষাতেই তাঁহাদের সমস্ত পরিবারের প্রাণান্তপণ যত্নও যে পণ্ড হইয়া গেল। অপর সকলে আর কি ভাবিলেন জানিনা, আমি ত কেবল আমার নূতন আবিষ্কার—ধনোন্মাদ রোগের একটী অসাধারণ রোগী দেখিতে পাইলাম ভাবিয়া, নিজেকে যেন লাভবান মনে করিতে লাগিলাম।

৪। বরযাত্রীর কথায় মনে পড়িল, এই কলিকাতা সহরেও একবার বরযাত্রী গিয়া, আরও কয়েকটী উৎকট উন্মাদরোগী দেখিতে পাইয়াছিলাম। অপর উন্মাদরোগ সংক্রামক না হইলেও, এই 'ধনোন্মাদ' রোগটা অত্যন্ত সংক্রামক। তাই সেখানে বৃদ্ধ পিতা হইতে তাঁহার যুবক পুত্রগণ পর্য্যন্ত সকলেই বিকটরূপে এই রোগাক্রান্ত। তাঁহাদের ব্যবহারের বিবরণ বিশেষ রূপে বলিলেই সকলে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

বর আসিল, বরযাত্রীগণও একে একে গাড়ী হইতে নামিয়া দাঁড়াইল, কন্যাকর্ত্তার পাশে বরকর্ত্তা দাঁড়াইয়া তাঁহাদের আদর-আপ্যায়ন করিলেন। কাজেই বরকর্ত্তার বিবেক-বিচার সেখানে কিছু বুঝা গেল না। যথাসময়ে বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীগণ মিলিত ভাবেই পঙ্‌ক্তি ভোজনে বসিলেন। নির্ব্বিবাদে সকল কার্য্যই সেবার সম্পন্ন হইল। স্থানাভাবেই হউক, আর নিকট আত্মীয়তার অভিমানেই হউক, এই পঙ্‌ক্তিতে যাঁহারা বসিতে পারেন নাই, তাঁহাদের জন্য আবার ভোজনায়োজন হইতে লাগিল। বড় বাড়ীর বড় আয়োজন, সেতো অল্পক্ষণে হইবার নহে! অনুমানের অতিরিক্ত সময়ই কাটিয়া গেল। অতিবিলম্বের ক্রটীমার্জ্জনার জন্য ভারপ্রাপ্ত ভদ্রলোকেরা মাঝে মাঝে আসিয়া অনুনয়-বিনয় করিতেছিলেন। এই সময়ে অন্যত্র কোথায় পাতা হইতে দেখিয়া, তাঁহাদেরই একজন অবশিষ্ট বরযাত্রীদিগকে সেইস্থানে যাইবার জন্য আহ্বান করিলেন ও স্বয়ং পথপ্রদর্শক হইয়া অগ্রগামী হইলেন।

আশে পাশে দুই একটী স্ত্রীলোক দেখিয়া, আমরা সে পথে অগ্রসর হইতে আপত্তি করিলেও

তিনি আমাদিগকে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিলেন। সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতেছি, এমন সময়ে উপর হইতে তীব্র গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম,—"কেহে তোমরা ছোট লোকের দল? ভদ্রলোকের অন্দর বাড়ী চেননা? কতদিন খাওনি? এত খাওয়ার লোভ কেন? ইত্যাদি।" ভদ্রলোকের বাড়ী আহার করিতে গিয়া, এইরূপ আদর অবশ্য আমাদেরও অসহ্য হইল! তথাপি পথপ্রদর্শকই তাহার উত্তর দিবেন ভাবিয়া, তাহাকে খুঁজিতে লাগিলাম। কিন্তু তিনি বোধ হয় সেই গর্জ্জন শুনিয়াই অন্তর্হিত হইয়া ছিলেন। কাজেই আমাদিগকেই তখন এপথে আসার কারণ জানাইতে হইল। তথাপি সেই গর্জ্জনের স্বর অবনত না হইয়া উচ্চতর রূপে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সে স্থানে যে বাড়ীর ছেলেদের পাতা করিয়াছেন, ইহাও তাঁহার কথায় বুঝিতে বাকী রহিল না। অবশেষে লুচির পরিবর্ত্তে আমাদের জন্য যখন তিনি গেট্ বন্ধ করিয়া পাদুকার হুকুম করিলেন, তখন আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, আমরাও তাঁহাকে পাদুকার স্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলাম। কিন্তু তাঁহার গর্জ্জনের মত সাহসের জোর প্রবল না থাকায় ক্রমশঃ তিনি পিছু হটিতে আরম্ভ করিলেন। তাই সেদিন বিবাহ-যজ্ঞটি সত্য সত্যই দক্ষযজ্ঞে পরিণত হইল না!

আশ্চর্য্য এই যে, বৃদ্ধ কন্যাকর্ত্তা পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে তাঁহার ধনোন্মাদ পুত্রেরই পক্ষ সমর্থন করিয়া, নিরপরাধ বরযাত্রীদিগকেই পীড়ন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন! বিজ্ঞ বরকর্ত্তা বর লইয়া ফিরিবার জন্য অগ্রসর না হইলে, বোধ হয় এই ধনোন্মাদদিগের তখনও চৈতন্যোদয় হইত না। বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীর বিবাদ অনেক স্থলেই হইয়া থাকে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু অকারণে কন্যাকর্ত্তার এইরূপ উদ্ধত ব্যবহার যে নিতান্তই ধনোন্মাদের পরিচারক, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না।

৫। আর একরকম বৈচিত্র্য দেখাইয়াই এই উদাহরণের উপসংহার করিব। এবারেও সেই উৎসবগৃহ, সেই বহুজনসন্নিপাত, সেই চর্ব্ব্য চোষ্য ভক্ষ্য ভোজ্যের বিরাট আয়োজন! আত্মীয়তার আধিক্য দেখাইবার জন্য আহারকালের অনেক আগেই সেখানে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, আমার মত অনেকেই তখন অধিক আত্মীয়তা প্রকাশের উদ্দেশ্যে, অথবা রাত্রিকালে অনবসরের আশঙ্কায় উপস্থিত হইয়া, গৃহস্বামীর সহিত খোসগল্প করিতেছেন! এদলের অধিকাংশই একটু বেশীরকমের 'হোমরা চোম্‌রা!' তাঁহারা সাধারণের সহিত পঙ্‌ক্তি ভোজন পছন্দ করেন না, সাধারণেও তাঁহাদিগকে ভোজন পঙ্‌ক্তিতে প্রবেশাধিকার দিতে চাহেন না! কাজেই তাঁহাদের জন্য "ড্রয়িংরুমে" টেবিলের উপর রৌপ্য পাত্রে করিয়া কয়েকটী উপাদেয় মিষ্টান্ন ও রৌপ্যগ্লাশে পানীয় জল প্রভৃতি আনিয়া, তাঁহাদিগকে "মিষ্টি মুখ" করান হইতেছিল। ব্যবস্থা উত্তম হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন ব্যারিষ্টার সাহেবের ভুক্তাবশিষ্ট পেস্তার বরফিখানি মাত্র সরাইয়া ও সেইস্থানে আর একখানি অখণ্ড 'বরফি' রাখিয়া, সেই 'ডিস্' খানিই আবার কুলীন ব্রাহ্মণ মুখর্জ্জি মহাশয়ের সম্মুখে দেওয়া হইতেছিল, তখন তাহাকে আর উত্তম ব্যবস্থা বলিয়া সমর্থন করিতে পারিলাম না। জাতি-ধর্ম্মে তাঁহাদের আস্থা থাকুক, বা না থাকুক, তাঁহারাও যে একের উচ্ছিষ্ট জানিলে, অপরে তাহা ভোজন করিবেন না, ইহা নিশ্চিত। এই সাধারণ কথাটীও যে গৃহস্বামী খানকতক মিষ্টান্নের মায়ায় বুঝিতে চাহেন না, তাঁহাকে 'উন্মাদ' ভিন্ন আর কি বলিব?

উন্মাদের একটী মাত্র স্থান সীমাবদ্ধ নহে! উপরে পঙ্‌ক্তি-ভোজনের স্থানে গিয়া, নীচের রূপার ডিসের কথাই মনে হইতে লাগিল। তাই পঙ্‌ক্তি ভোজনে প্রবৃত্তি হইল না। তখন নিকট আত্মীয় সাজিয়া, ভাঁড়ারের ও পরিবেশনের তদারক

করিতে আরম্ভ করিলাম। হা অদৃষ্ট! এখানেও যে তাই! প্রথম দলের ভোজন শেষ হইলে, তাঁহাদের সেই উচ্ছিষ্ট শরাগুলি সযত্নে তুলিয়া লওয়া হইল এবং সাজান শরার ভুক্ত-অংশ মাত্র পূর্ণ করিয়া ও ভুক্তাবশেষগুলি তেমনি রাখিয়া, সেই শরাই আবার দ্বিতীয় দলের পঙ্‌ক্তি মধ্যে সাজাইয়া দেওয়া হইল! এমন বীভৎস কাজে যাহাদের প্রবৃত্তি হয়, কেবল 'উন্মাদ' বলিয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করাও বুঝি উচিত নহে। কিন্তু উপায় নাই; সমাজ যে তাঁহাদেরই স্বর্ণকবচের উজ্জল-কিরণে দৃষ্টিহারা!

চিকিৎসা,—এই দৃষ্টির দোষেই সমাজ ইহার চিকিৎসার উপায়ও দেখিতে পায় না! বৈদ্যক শাস্ত্রে উপদেশ আছে,—তাড়ন, পীড়ন, ত্রাসন, বন্ধনই উন্মাদ রোগের প্রধান চিকিৎসা! এমন বিকট ব্যবস্থা ব্যতীত এই উৎকট উন্মাদের উপশম আর কিছুতেই হইবার নহে। কিন্তু তেমন চিকিৎসা করিবার মত সমর্থ চিকিৎসক যে আর নাই! সমাজই এ রোগের একমাত্র চিকিৎসক। কিন্তু অর্থলোভে সকল চিকিৎসকই যেমন রোগীর যথেচ্ছাচারে বাধা দিতে চাহেন না, এক্ষেত্রে সমাজ চিকিৎসকও ঠিক্ সেই পথাবলম্বী। তাই এ রোগ এখন 'শিবের অসাধ্য' হইয়া উঠিয়াছে! তথাপি রোগ চিনিয়া, রোগীর যথেচ্ছাচার হইতে সমাজ যদি আত্মরক্ষা করিতে পারেন, এবং রোগীর আত্মীয়গণও যদি শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিয়া বা দেবস্থানে হত্যা দিয়া ইহাদের মনোবিকারের পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যেই এই রোগের তত্ত্ব প্রচারিত হইল।

সাধের বাসর।

[শ্রীবিমানবিহারী গুপ্ত।]

(১)

"সাঁজ সকালের বিচার নেই, দিনরাত বই পড়া এখনকার মেয়েদের একটা অভ্যেস দাঁড়িয়েচে! এতদিন মনে কত্তুম, লেখাপড়া, শেলাই-বোনা শিখ্‌লে মেয়েদের একটু আদর হয়; এখন দেখ্‌চি সেটা ভুল কথা।" বলিয়া নলিনীর দিকে চাহিয়া মনোরমা বল্‌লেন,—'তোর হাতে ঐ চক্‌চকে বইখানা কি লা?'

নলিনী বলিল,—'জননীর কর্ত্তব্য"—সেই যে বাবা আমায় গেল বছর 'গৃহিণীর কর্ত্তব্য" বইখানি এনে দিয়েছিলেন, এই দু'খানি বই একি জনের লেখা। এ বই খানিও বেশ, দিদি। আমি খানিকটা পড়িচি, ঢের শেখ্‌বার কথা এতে আছে।

মনোরমা। তা শেখ্‌বার কথা থাক্‌লে আর কি হবে? এ সব বইতে শেখবার কথা যা আছে, তা শিখে তেমনতর চলতে পাবে কি?

নলিনী। কেন পাব না দিদি?

মনো। সেটা কি এখনো বুঝ্‌তে পারিস্ নি ছাই?

নলিনী। না দিদি, এখনো বুঝ্‌তে পারিনি, বুঝিয়ে দেও না।

মনোরমা। তাহ'লে আর এখন তোর বোঝা হচ্চে না। বইখানা আগে পড়্, তারপর এখনকার সংসারের বিধি-ব্যবস্থাটার সঙ্গে তুলনা করিস্, তা হ'লেই বেশ বুঝ্‌তে পার্‌বি।

নলিনী। কেন, আগেকার বিধি-ব্যবস্থা আর এখনকার বিধি-ব্যবস্থায় তফাৎ আছে নাকি?

মনোরমা। তা কি ক'রে বুঝ্‌বি? তোরা এখন যা দেখ্‌চিস্, মনে কর্‌চিস্ চিরকালই এমনটী ছিল, নয় কি?

নলিনী। হাঁ, তাইত মনে করি।

মনো। সেটা তোদের মস্ত ভুল। যদি তেমনটী থাক্‌তো, তা হ'লে আর "গৃহিণীর কর্ত্তব্য", 'জননীর-কর্ত্তব্য' বই লেখ্‌বার দরকার হ'তো না। আগেকার বুড়-বুড়ী যারা এখনো বেঁচে আছে, তারা এখনকার লোকের কাছে কলকে পায় না। এই একটা কথা দিয়ে দ্যাখনা কেন?—এই যে, তোর বিয়ের কথা এখন হচ্চে, সব জায়গা থেকেই টাকার কাঁড়ি, বাক্স ভর্ত্তি গয়না, কাঁসারী দোকানের রকমওয়ারী বাসনপত্র চেয়ে বস্‌চে! আমার বিয়ের সময় ত এসব ছিল না। সে আর ক'দিনের কথা, বিশ বছরের বেশী নয় ত!

নলি। কেন, তোমার বিয়ের সময় কি এ সব কিছু দেওয়া হয় নি?

মনো। না হবে কেন। তবে কোট ধ'রে ব'সে আমার শ্বশুর কিছু নেন নি। শ্বশুর এসে আমায় একদিন দেখে গেলেন, তার পর ব'লে পাঠা'লেন, ক'নে পছন্দ হয়েচে। দিন স্থির করে, আশীর্ব্বাদ করে যাবেন, খবর পেয়ে, বাবা দিন স্থির ক'রে আশীর্ব্বাদ করে এলেন। দশ দিন পর বিয়ে হয়ে গেল।

নলি। টাকা কড়ি গয়নাগাটী কি কিছুই দেওয়া হয় নি?

মনো। হয়েছিল বই কি! গয়নার মধ্যে বালা, তাগা আর একছড়া হেলে হার, পায়ের চার্ গাছি মল, আর চলনসই বিছানা ও থালা বাসন। নগদ টাকার ভেতর কুলীনদের মর্য্যাদা। তাতে শতাবধি টাকার বেশী পড়েনি।

নলি। তখন বুঝি লোক পাশ দিত না দিদি?

মনো। কেন দেবে না। এইত তোদের জামাই বাবু যেবার এল্ এ দেয়, সেবার আমার বিয়ে। সেও ত এণ্টেস দিয়ে দশ টাকা জলপানি পেয়েছিল। ঐ যে বাবা আস্‌চেন, এখন চুপ কর্!

"কাল নলিকে আশীর্ব্বাদ কত্তে সপ্তগ্রাম থেকে বিমলাবাবু আস্‌বেন বলে চিঠি লিখেচেন, তাঁর সঙ্গে পুরুত ছাড়া আর পাঁচটী লোক আস্‌বে।" বলিয়া অমূল্যবাবু মনোরমাকে তাঁহার কাছে বসিতে বলিলেন।

(২)

অমূল্যচরণ সেনের নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রামে। গ্রামে থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। সুচিকিৎসক বলিয়া পাড়াগাঁয়ে তাঁহার নাম-যশ বেশ আছে। বুদ্ধিমান্ ও সুবিবেচক বলিয়া গ্রামের লোকে তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। তাঁহার দুইটী কন্যা ও একটী পুত্র। কন্যার মধ্যে মনোরমা জ্যেষ্ঠা, পুত্র নির্ম্মল মধ্যম এবং নলিনী কনিষ্ঠা। মনোরমার বয়স প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি। পুত্র নির্ম্মলের বয়স একুশ বৎসর, সে বি, এ, পাশ করিয়া এম্, এ পড়িতেছে। নলিনী অবিবাহিতা বিবাহযোগ্যা।

বর্দ্ধমান জেলার সপ্তগ্রামের বিমলাচরণ গুপ্তের একমাত্র পুত্র বিভূতিভূষণের সহিত নলিনীর বিবাহের প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইয়াছে। বিভূতি এম্, এ, বি এল্ পাশ করিয়া সব-ডেপুটী চাকরী লইয়াছে। বিমলাচরণ কমিসেরিয়েটের গোমস্তাগিরি চাকরী করিয়া বেশ দুই পয়সা সঞ্চয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিতান্ত কৃপণ ছিলেন। এত অর্থ থাকাসত্ত্বেও তিনি আত্মীয় স্বজনের আশ্রয়ে রাখিয়া বিভূতির লেখাপড়ার ব্যবস্থা করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই। যেরূপ ব্যবস্থায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত, তাহা পাঠকবর্গের অগোচর থাকাই ভাল।

পিতার কথা শুনিয়া মনোরমা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কথা বার্ত্তা পাকাপাকি হয়েচে কি, বাবা?

অমূল্য। হাঁ মা, একরূপ ঠিক হয়েচে বলেই ত বলা যায়। তবে কি জান, আজ কালকার দিনের বিয়ের ব্যাপারে বরের বাবা মশায়রা সব জায়গার কথা ঠিক রাখ্‌তে পারেন না। কথা পাকাপাকি হ'লেও অপর কোথাও কিঞ্চিৎ বেশী পেলে আর সে কথা মনে থাকে না!

মনো। আশীর্ব্বাদ করা হ'লেও কি তেমন তর হয়?

অমূ। কোথাও তেমনতর হয়েচে কিনা বলতে পাচ্ছিনা, তবে আজকালকার দিনে ছেলেওয়ালা-দের যেরূপ মতি-প্রবৃত্তি দেখ্‌তে পাচ্ছি, তাতে যে এমনতর না হয়, তা বলতে পারি কই। কিন্তু শুনতে পাই, ছঁ্যাদনাতলা থেকেও নাকি টাকার তরে বর তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্চে!

মনো। দেনা-পাওনার কথা কি হয়েচে?

অমূ। সে কথা আর ব'লে কি হবে মা। হাজার টাকা নগদ, ২০ ভরি সোণা, ৬০ ভরি রূপো, খাটবিছানা, ঘড়ী ঘড়ীরচেন, হীরের আংটী, চেয়ার-টেবিল, এ ছাড়া তৈজসপত্রাদি।

মনো। দেখ্‌তে পাচ্ছি—এতে ত আপনি তিনহাজারের কমে পার পেতে পারবেন না।

অমূ। এর ওপর আরো কিছু আছে! ছেলে আলিপুরের সব-ডেপুটী, সেখানকার ডেপুটী, সবডেপুটী সব বরযাত্র আসবে। তাও ন্যাহাৎ-পক্ষে একশ; তা ছাড়া কুটুম-সাক্ষাৎ কোন্ না জন পঞ্চাশেক হবে।

মনো। তা হ'লে ত দেখ্‌তে পাচ্ছি আরো পাঁচ'শ! আপনি এত টাকা কোথা পাবেন? এদিকে শরীরের অবস্থা ত এরূপ, তাতে আগেকার মত আয় নেই, খরচ যথেষ্ট। তার ওপর এই চাপ সাম্‌লাবেন কি করে?

অমূ। তা বল্লে কি হবে, কত্তে হবেই। মনে করেচি—মনে করেচি বল্‌চি কেন,—একরূপ ঠিকই করেচি, বাড়ী ও বাগান ক্ষেতু সা'র কাছে বাঁধা দিয়ে দেড় হাজার টাকা আন্‌ব।

মনো। সে কি কথা বাবা! বাড়ী বাগান বাঁধা দিয়ে টাকা আন্‌বেন, শুধ্‌বেন কি করে? আপনার আয় থেকে সংসার খরচ চালিয়ে সুদে আসলে দেড় হাজার টাকা শোধা ত বড় সহজ কথা নয়। শেষকালে কি ঋণপাপ মাথায় নিয়ে মর্‌বেন?

অমূ। ঋণপাপ মাথায় ক'রে যে আমায় মত্তে হবে, তার আর ভুল নেই। তবে নিমু শুধ্‌বে।

মনো। আপনার যা কথা। নিমু কবে চাকরী কর্‌বে, তবে সংসার চালিয়ে দেনা শুধে বাড়ী-বাগান খোলসা কর্‌বে! কেন নিমুর বিয়ের যোগাড়টা এই সঙ্গে সঙ্গে ক'রে ফেলুন না কেন? সেও ত বি, এ, পাশ দিয়ে এম্ এ, পড়্‌চে?

অমূল্য। হ'লই বা। নিমুকে বিয়ে দিয়ে টাকা নিতে বল্‌চ নাকি?

মনো। আপনি যখন দিতে যাচ্ছেন, তখন নেবেন না কেন?

অমূ। আমি ত আর ইচ্ছে ক'রে দিতে যাচ্ছি নে, আমার গলা টিপে নিচ্ছে। অপরে ডাকাতি করে ব'লে আমাকেও ডাকাতি কত্তে হবে, তাঁর কোন মানে নেই!

মনো। লোকে ত বল্‌চে, এটা এখন চলন হ'য়ে গেচে। যেটা সমাজে চলন হয়ে যাচ্ছে, সেটা কত্তে আপনার আপত্তি কেন, বাবা?

অমূ। চলন হচ্চে ছাই আর পাঁশ! জনকতক পয়সাওয়ালা লোক, টাকার গরমে ঐশ্বর্য্যের ফোয়ারা দেখা'তে গিয়ে মেয়ের বিয়েতে জামাই মেয়েকে বেশী বেশী দিয়ে-থুয়ে একাণ্ডটা সমাজে ঢুকিয়েচে। তাই এখন সেই খোস্‌খেয়ালের দেওয়াটা এখন জবরদস্তিতে আদায় কর্‌চে।

মনো। আপনিও না হয় তাদেরি মতন করুন না। দায় প'ড়ে লোকে কতটাই ত করে। তা এতে ত এখন তেমন দোষ বলে লোকে মনে করে না।

অমূ। লোকের কথা ছেড়ে দেও। বাপ-পিতেমো কখনো যা ক'রেন নি, আমি যে সেটা এনে বংশে ঢুকিয়ে তাঁদের নাম লোপ কর্‌ব, তা কখনো হ'তে পার্‌বে না। আমি যে ছেলে বেচে পিণ্ড লোপ কর্‌ব, তা কখনো হবে না। তা যাক্, সে কথা তোমার মায়ের সঙ্গে হবে এখন। তুমি একটা কাজ ক'রো, কাল্‌কার ব্যবস্থা কত্তে যা যা দরকার হবে, আমায় ব'লো। আমি আজই, তার যোগাড় করে রাখ্‌ব।

(৩)

"কাল নাকি নলিকে আশীর্ব্বাদ কত্তে আসবে ?" বলিয়া অমূল্য সেনের স্ত্রী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। মনোরমা ও সেখানে আসিয়া পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। অমূল্যবাবুর স্ত্রীর নাম গিরিবালা।

অমূল্য। তামাক খাইতে খাইতে গৃহিণীর প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,—"হাঁ, এরূপ খবরই ত পাওয়া গেচে। কেন, খবরটা তোমার কাছে সুখের ব'লে মনে হয়নি কি ?

গিরি। বাড়ী-ঘর খুয়িয়ে যদি নলিকে পার কর্ত্তে হয়, তা হ'লে আর সুখের বলি কি ক'রে ?

অমূ। আমিত চেষ্টার আর কসুর করিনি। কিন্তু যখন দেখলুম, যে ছেলেটী লেখা পড়া শিখচে, তার বাপ যেন ছুরী শানিয়ে ব'সে রয়েচে! কাজেই তা না ক'রে আর উপায় কি বল ? আমার দেহের অবস্থা যেরূপ দাঁড়িয়েচে, তাতে আর বেশী দিন বাঁচ্‌ব ব'লে আশা নেই। আমি থাক্‌তে যদি মেয়েটার একটা বেবস্থা ক'রে না যাই, তা হ'লে নিমু যে অন্নর চোকে মুখে পথ দেখ্‌বে না।

গিরি। বাড়ী-ঘর বাঁধা দিয়ে নলিকে পার ক'রে গেলে নিমুর চোখে-মুখে পথ দেখ্‌বার সুবিধে হবে নাকি ?

অমূ। তখন নিমু এর একটা কিনেরা কত্তে পারবেই পারবে, ভগবান্ তাকে পথ ক'রে দেবেন। তা ছাড়া নিমু ত আর অযোগ্যি ছেলে নয়, আর একটা বছর বই ত নয়।

গিরি। আর একটা বছর পরে নিমু দৈবী ধন পাবে নাকি ?

অমূ। দৈবী ধন পাবে কেন, চাকরী করবে। এম্, এ টা পাশ দিলে কি সে ঘরে ব'সে থাকবে ?

গিরি। বলি, তুমিও কেন এই সঙ্গে, নিমুর বিয়ের চেষ্টা দেখনা ? তা হ'লে ত আর বাড়ী-বাগান বাঁধা দিতে হবে না।

অমূ। কেন, নিমুকে বেচ্‌তে তোমার ইচ্ছে হয়েচে নাকি ?

গিরি। পোড়া, সে কি কথা! দুনিয়া শুদ্ধ লোক যে, ছেলের বিয়ের টাকা নিচ্ছে, তারা কি ছেলে বেচ্চে নাকি ?

অমূ। এটা বেচা নয় ত কি ? আমার মেয়েটী পেলে-পুষে মানুষ ক'রে তার ছেলেকে দেব, তার ঘরে গিয়ে সে দাসীপনা গিন্নিপনা করবে, তাদের হুকুম মেনে চলবে, তাদের হুকুম ছাড়া,—আমি যে বাপ,—আমায় দেখ্‌তে আস্‌বারও তার ক্ষেমতা থাকবে না, তার জন্যে তাকে টাকা দেওয়া হবে কেন ? আর সে যখন বুক ফুলিয়ে বলে, এত টাকা না হ'লে তোমার মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেব না, এটাকে ছেলের দাম নেওয়া বল্‌ব না ত কি বল্‌ব ?

গিরি। এ টাকে বলবে কন্যাদানের দক্ষিণে।

অমূ। দক্ষিণাই যদি হয়, তাহ'লে তার পরিমাণটা নিজে হেকে বলা কেন ? দানের দক্ষিণে, দাতার ক্ষেমতায় যা কুলোয় গৃহিতা তাই নেয়, দক্ষিণার একটা দাবি দাওয়া নেই। এ যে নীলামের বেবস্থা হয়েচে! যে বেশী টাকা দেবে, সেই ছেলে পাবে!!

গিরি। সব্বাই যখন নীলেমে ছেলের বে দেয়, তুমি ও না হয় তা-ই কল্লে! তুমি একাত আর কত্তে যাচ্ছ না ? যাদের ঘরে নলির বে দিতে যাচ্ছ, তারাও ত তাই কচ্ছে, তাতে আর তোমার এমন বদ্‌নামটা কি হবে ?

অমূ। বদ্‌নাম চুলোয় যাক্, মন্‌টা ত আর বুঝ্‌চে না। যখন আমার বে হয়, তখন তোমার বাবা আমার বাবাকে বল্লেন,—"সেন মশায়, আমি বড্ড গরীব,আমায় এদায় থেকে উদ্ধার কত্তে হবে।" বাবা বল্লেন, আপনার যেমন সাধ্যি তেমনি দেবেন, আপনি পাঁচটী হত্তুকী দিয়ে কন্যাদান করুন, আমার কোন আপত্তি নেই।" জানত, বাবা তেমন বড়লোক ছিলেন না; পাড়া গাঁয়ে কোব্‌রেজী

ক'রে সংসার পুষেছেন। পুঁথিও স্নাহাৎ কমছিল না। প্রায় কুড়িজন ছাত্র টোলে পড়্‌তো, তাদের খোরাক দিতে হ'ত। সাত আট সের চা'লের কমে দিন গুজরান হ'ত না! মরবার সময় তিনি পাঁচশ' টাকা দেনা রেখে যান। এমনতর অবস্থাতেও ত তিনি আমার বিয়ের টাকার দাবি করেন নি! আর আমি আজ নিমুর বেতে টাকা নিতে যাব, আমার প্রাণ থাক্‌তে তা হবে না।

গিরি। তবে না হয় এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে অপর জায়গায় চেষ্টা কর। যেখানে কম টাকায় হ'তে পারে তারি চেষ্টা দেখ। একাজ কল্লে যে একবারে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে। নিমুত কাঁপরে পড়্‌বে।

অমূ। যখন কথা দিয়িচি তখন আমি তার খেলাপ কত্তে পার্‌ব না। বয়েস প্রায় সত্তরের কাছাকাছি হ'তে চল্‌লো, এর ভেতর কখনো কারুর সঙ্গে কথার খেলাপ করিনি, আজ নলির বিয়ে দিতে গিয়ে তার খেলাপ কত্তে পার্‌ব না; এখন অদেষ্টে যা থাকে তা ঘটবে। এ সব কথা এখন রেখে দেও, কাল তাঁরা আশীর্ব্বাদ কত্তে আস্‌চেন, তার যোগাড় দেখ গে। শুামি ঝিকে সেকরার বাড়ী পাটিয়ে দিয়ে গয়নার তাগাদা কর; আজ নিদেন তিন খানি গয়না যাতে পাওয়া যায় তার চেষ্টা দেখ গে। সে ত কাল বল্‌ছিল, আজ সব গয়নাই দেবে।

গিরি। টাকা না পেয়ে সে গয়না দেবে?

অমূ। কেন, আমি কি কারু সঙ্গে কখনো জুচ্চুরি করিচি যে টাকার জন্যে সে গয়না আট্‌কিয়ে রাখ্‌বে? পয়সাই আমার নেই, কিন্তু মান-ইজ্জৎ যেটুকু আছে, তাতে সেক্‌রা আমায় এ খাতির টুকু কর্‌বে। আর তার সঙ্গে আমার কথাই আছে, বিয়ের সময় অর্দ্ধেক টাকা দেব, বাদবাকী মাসে মাসে দিয়ে এক বছরে শোধ কর্‌ব। তা ওসব কথা রেখে দেও, কাল যাঁরা আস্‌বেন, তাঁদের আদর আপ্যায়নের যোগাড় কর। বনেদি ঘর বলে দেশের লোকের কাছে একটা খোস্‌নামী আছে, সেটা যাতে বজায় থাকে তার চেষ্টা দেখ। কি কি আন্‌তে হবে একটা ফর্দ্দ ক'রে দেও, এনে দিচ্ছি। আর ভগবান্‌কে ডাক, নিমুর এবার পাশটা হ'য়ে যাক্‌। আমি যদি সত্যি সত্যিই দেনা রেখে মরি, বাছা আমার শোধ দিতে পার্‌বে।

গিরি। বলি এ সব কথা নিমুকে জানিয়েচ কি? সে ত আর এখন কচি ছেলে নয় যে দুনিয়ার কিছু বুঝ্‌তে পারে না। তার ঘাড়ে যে বোঝাটা চাপিয়ে যাবার যোগাড় কর্‌চ, সেটা তাকে একবার জানান উচিত নয় কি? পাছে মনে না করে, বাপ আমায় দেনায় ডুবিয়ে গেলেন।

অমূ। নিমু আমার তেমন ছেলে নয়। ডাকই না তাকে। তুমি আমারই সাক্ষাতে তাকে জিজ্ঞেস করনা, সে-ই বা কি বলে।

(৪)

নির্ম্মল কুমার পাশের ঘরে পড়িতেছিল, গিরিবালা তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন। নির্ম্মল ঘাড় হেট করিয়া পিতার এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। অমূল্য চরণ বলিলেন, "নলির বিয়ে ঠিক হয়েচে শুনেচিস্‌ ত?

নি। আজ্ঞে শুনেচি।

অ। দেওয়া-থোয়া কি হবে, তাও শুনেচিস্‌?

নি। শুনেচি।

অ। আমার হাতে কি আছে, তা তোর অজানা নেই। আমি ঠিক করেচি, ক্ষেতু সা'র কাছে বাড়ী ও বাগান বাঁধা দিয়ে দেড় হাজার টাকা এনে এ দায় থেকে উদ্ধার হব। তুই কি বলিস্‌?

নি। আপনি যা ভাল বুঝ্‌বেন তাই করবেন, আমি তার কি বল্‌ব। আমি এসব বুঝিই বা কি, বল্‌বই বা কি।

অ। আসল কথা হচ্চে দেনা-নিয়ে বাড়ী-বাগান বাঁধা দেব বটে, কিন্তু আমি যে খোলসা করে রে'খে যেতে পার্‌ব তেমন সম্ভব নেই। এ ঋণের বোঝা তোর ঘাড়েই পড়্‌বে।

নি। পিতার দেনা ছেলের ঘাড়েই পড়ে, সংসারের নিয়ম তাই-ই। ঠাকুদ্দার দেনাও ত আপনাকেই শুধ্‌তে হয়েচে। তা ভেবে কি নলির বে দিতে হবে না?

গি। আমি বল্‌ছিলুম, যেখানে দেনা পাওনার কসাকসি ততটা না থাকে, সেখানে ঠিক করা হোক্‌, তা হ'লে এত দেনা হবে না।

নি। সে কি কথা বল্‌চ মা? ভাল ছেলে দেখে নলির বে দিতে হবেই, এতে অদৃষ্টে যা থাকে হবে। খুঁজ্‌লে যে ভাল ছেলে সুবিধেয় না যোটে, এমন নয়; কিন্তু খোঁজে কে মা? আমাদের এমন তর আপনার লোক কে আছে যে এতটা কর্‌বে? একা বাবা, তিনি কয় দিক সাম্‌লাতে পারেন। যা হয়েচে, ভালই হয়েচে।

গিরি। আমি একটা কথা বল্‌চি কি—এর সঙ্গে তোর বিয়ের চেষ্টাটা হ'লে ভাল হয় না কি? তা হ'লে হয়ত দেনাটা ঘাড়ে না কল্লেও চলে।

নি।—(খানিককাল চুপ করিয়া থাকিয়া) মা, তুমি ঐ ঘরে চল।

গিরি। কেন, যা বল্‌তে হয় এখানেই বল না। তাঁর কথাতেই ত তোকে ডেকেচি, তোর যা বল্‌বার এঁর কাছেই বল।

নি। এক সঙ্গে আমার বিয়ে হ'লে দেনা ঘাড়ে চাপ্‌বেনা কেন?

গিরি। আমরাও ক'নের বাবার ঠেঙ্গে তেমনি করে নেব। যখন দিতে যাচ্ছি, তখন নিতে আর লজ্জাটা কি?

নি। দেখ মা! আমাদের ক্লাশের ছেলেদের ভেতর প্রায় অর্দ্ধেকের বে হয়েচে; কিন্তু যাদের বাবা টাকা নিয়েচে, তারা যে কিরূপ নাকাল হচ্চে তার আর কথা নেই। সত্যি সত্যি যারা পড়ার খরচার অজুহাৎ দেখিয়ে টাকা নেয়, এটা কি কাজের কথা? বাবা আমাকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন, তাঁর কর্ত্তব্য কাজ তিনি কর্‌চেন। আমার কর্ত্তব্য, আমি তাঁকে বুড়োবয়সে লালন পালন কর্‌ব; তীর্থধর্ম্ম করাব। লোকে এই হিসেবে ছেলেকে মানুষ করে। বলদেখি, তোমার ছেলে মানুষ হ'লে তুমি সুখভোগ কর্‌বে, তার জন্য অপরে তোমার টাকা দেবে কেন? আর তুমিই বা সে বাবদ টাকা চাইতে লজ্জা বোধ কর্‌বে না কেন?

গি। যার মেয়েটী তোর জন্যে আন্‌ব, তুই মানুষ হ'য়ে দু'পয়সা আন্‌তে পাল্লে তার মেয়ের সুখ হবে।

নি। তোমার ঘরে তার মেয়েটী দিলে, তার-পর তার সঙ্গে তার সম্পর্কটা কতটুক্‌ থাকে মা? তোমার ছেলে মানুষ হ'য়ে যদি বিদেশে চাক্‌রী কত্তে যায়, বউটী তার সঙ্গে যাবে। হয়ত দু'চার বছরে তার সঙ্গে তার বাপ-মায়ের দেখা-সাক্ষাৎও ঘট্‌বে না। কাছাকাছি থাক্‌লেও, খোস্‌ মেজাজে ইচ্ছে ক'রে যদি হুকুম দেও, তবেই সে বাপের বাড়ী যেতে পাবে, নৈলে নয়। বাপ-মা যদি উপোস করেও মরে, তবু মেয়ের ক্ষমতা থাকে না যে শ্বশুর ঘর থেকে তাদের সাহায্য করে। বিয়ের পর ত বাপ-মায়ের সঙ্গে মেয়ের এতটা সম্পর্ক! এসম্পর্ক পাতাবার জন্যে যে আবার তার বাপ-মায়ের ঠেঙ্গে টাকা আদায় করা, এটা কি অন্যায় কাজ নয় মা?

গিরি। এ অন্যায়টা দুনিয়ার লোকে বোঝে না কেন?

নি। বোঝে সবাই, কিন্তু বুঝেও চোক্‌ বুজে থাকে মা। মান-সম্ভ্রম, ন্যায়-অন্যায়ের চেয়ে যারা টাকাটা বেশী দেখে, তারাই এসকল নিষ্ঠুর কাজের প্রশ্রয় দেয়। আমার মনে হয়, ভদ্রসন্তান মাত্রেরই এগুলি বেশ হিসেব করে কাজ করা উচিত। যখন লজ্জা-সরম ত্যাগ ক'রে আমাকে অতগুলি কথাই বল্‌তে হল,—তখন তোমরা পিতা-মাতা, আমার জীবন্ত দেবতা—তোমাদের সাক্ষাতে শপথ ক'রে

বল্‌চি, যদি তোমরা আমার বে'তে এক কপর্দ্দক নিতে ইচ্ছা কর, তা হ'লে আমি চিরকাল আইবুড় থাক্‌ব। অপরের সংসার ছারখার করে আমার নিজের সংসার পাত্‌ব না।

গিরি। তা না করিস্ তুই কষ্ট পাবি।

নি। অপরের সর্ব্বনাশ ক'রে টাকা নিয়ে সুখ-ভোগ করার চাইতে, আর বেশী কুকার্য্য কি আছে, আমি কল্পনায় তা আন্‌তে পারি না।

গিরি। তোরা দু'জনেই যখন একি কথা ধরে বসেচিস্, তার ওপর আমাদের কোন কথাই খাট্‌বে না। তা বাপু এতে যদি তোর মনের সুখ-সোয়াস্তি বজায় থাকে, তাই হোক্। তোর সুখে আমার সুখ।

(৫)

নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিমলা বাবু ক'নেকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য অমূল্যচরণের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। ক'নেকে আশীর্ব্বাদ করা হইলে, কি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, দেখিবার জন্য প্রতিবেশীরা সমবেত হইল। গিরিবালা তখন নিতান্ত অপ্রস্তত হইয়া পড়িলেন। সকলেই মনে করিয়াছিল, পয়সাওয়ালা লোকের ঘরে মেয়েটীকে দেওয়া হইতেছে, বিশেষতঃ এতগুলি টাকা নগদ দিতে যাইতেছে, সম্ভবতঃ একটু মূল্যবান্ জিনিষ দিয়া ক'নেকে আশীর্ব্বাদ করা হইবে। গিরিবালা যখন নলিনীকে আনিয়া তাহার কাণে এক জোড়া ইহুদী মাকড়ী দেখাইলেন, তখন সকলে অবাক্ হইল। যার যেমন প্রকৃতি তেমনতর সমালোচনা করিতে করিতে সকলে যার যার বাড়ী চলিয়া গেল।

মনোরমা গিরিবালাকে বলিলেন, "বাবা বেশ বেছে গুছে বনেদি ঘরের ছেলের হাতে নলিকে দিচ্ছেন।"

গিরি। যেমন অদেষ্ট! শোনা গেচে, সপ্তগ্রামের বিমলা গুপ্ত লোহার সিন্দুকের কাছে টাকা ধার করে! মিন্‌সের টাকা নাকি ঢের আছে, সুদে খাটায়, সুদেই তার সংসার চ'লে যায়।

মনো। যার এতটাকা, সে এতটা কঞ্জুস্ হয়? শুনেচি ত, এক ছেলে বই আর তাঁরা খাবার কেউ নেই।

গিরি। তা হ'লে কি হয় মা! যার যেমন স্বভাব! কেমন পোষাক প'রে এয়েচেন দেখ্‌চিস্ ত,? যেন দ্বিতীয় রাধা নাপ্‌তে।

অমূ। বলি, তোমাদের সমালোচনা রেখে দিয়ে এখন ভদ্রলোকদের খাবার আয়োজন কর, গে। বেলা দুপুর বাজে যে।

গিরি। আমাদের আর কিছু কত্তে বাকী নেই, ঠাঁই শুদ্ধ তৈরি হ'য়ে রয়েচে, ডেকে আন্‌লেই হয়। "তবে আমি ডেকে আন্‌চি" বলিয়া অমূল্যচরণ বহির্ব্বাটীতে গেলেন, এবং খানিককাল পরেই সকলকে লইয়া অন্দরে প্রবেশ পূর্ব্বক আহারে বসিলেন।

বিমলা। এতটা আয়োজনের দরকার কি, ছিল, অমূল্য বাবু? এক ডাঁল-চচ্চরী মাছের ঝোল হ'লেই ত যথেষ্ট হ'ত। গেরস্ত ঘরে একটু হিসেব ক'রে চল্‌তে হয়।

অ। এ আর বেশী কি হয়েচে বলুন, এ বেলাটা কাটাতে হবে ত?

বিমলা। তা বেশ করেচেন? বলি আস্‌চে বুধবার ১৭ই তারিখেই ত বিয়ের লগ্ন স্থির করেচি, আপ্‌নি কি বল্‌চেন?

অ। মাঝে মাত্র ছটী দিন আচে, এর ভেতর আমার সবটা যোগাড় করে ওঠা একটু কষ্ট হবে। তা আপ্‌নি যদি বলেন, তাই কত্তে হবে।

পুরুত। এমাসের ভেতর ঐ দিনটীই ভাল, ঐ দিনেই ধ'রে ফেলুন। "শুভস্য শীঘ্রম্"

অ। তাত বুঝি, কিন্ত সব শুভ হচ্চে টাকার যোগাড় নিয়ে।

বি। কেন, টাকার যোগাড় কি এখনো হয় নি?

অ। একরূপ হয়েচে বটে, কিন্ত যতক্ষণ না হাতে আসে, ততক্ষণ কিছু বলা যায় না।

বি। কোথায় টাকার যোগাড় করেচেন?

অ। আমাদের গাঁয়ের ক্ষেত্রমোহন সাহা ব'লে একজন লোক সুদে টাকা খাটায়; বাড়ীও বাগান বাঁধা রেখে তার ঠেঙ্গে দেড় হাজার টাকা নেব বলে কথা হয়েচে।

বি। অপরের কাছে থেকে নেবেন কেন? এখন আপনার সঙ্গে একটা সম্পর্ক হ'তে যাচ্ছে, তখন ইচ্ছে কল্লে আপনি আমার ঠেঙ্গে বাড়ী-বাগান বাঁধা রেখে এ টাকাটা নিতে পারেন। তবে আমার টাকার সুদ একটু বেশী। তা হ'লই বা। আপনার মেয়ে-জামাই পাবে, তাতে আর আপনার লোকসানটা কি? আর একটা কথা আমার আছে, মাসে মাসে সুদের টাকা না দিলে, সেটা আসলে ভর্ত্তী হ'য়ে সুদ চলে। তাতেও আপনার লোকসান নেই। যদি বাড়ী-বাগান খালাস কত্তে না পারেন, আপনার জামাই মেয়েরি হবে। কি বলেন পুরুত ঠাকুর? কথাটা ভাল নয় কি?

পুরুত। বটেইত, তাই করে ফেলুন, ঘরে ঘরে হ'য়ে যাক্। অপরের জানবার দরকার কি?

অমূ। তা আপনি যদি এতটা অনুগ্রহ করেন, তাতে আর আমার আপত্তি হ'তে পারে না। তাই হবে।

বি। আর একটা কথা বল্‌চি কি,—ফুলশয্যার তত্বটা যা দেবেন, তার বাবদ নগদ টাকা ধ'রে দিলেই ভাল হয় না? আপনারও টাকার টানাটানি, তার ভেতর ২০।২৫জন লোক যদি তত্ব নিয়ে যায়, তাদের বিদেয় কত্তে আমার কোন না ৫।৭৲ টাকা লাগ্‌বে। সেটাওত আপনার জামাই-মেয়েরেই যাবে। তার চেয়ে দু'শ টাকা ধ'রে দেবেন। নগদ দিতে না পারেন, ঐ খতেই তা তুলে দেবেন, কোন লেঠা থাকবে না।

অ। তা বেশ তাই হবে। তবে আমার একটী নিবেদন এই যে, ঈশ্বর না করুণ যদি হঠাৎ আমার মৃত্যু ঘটে, তা হ'লে এদেনাটা আমার ছেলের ঘাড়েই বস্‌বে। একটু র'য়ে স'য়ে টাকাটা নেবেন, ছেলে আমার বালক।

বি। তার বয়স কত? সে কি কর্‌চে?

অ। সে বি,এ পাশ দিয়ে এম্ এ পড় ছে।

বি। তা হ'লে এই সঙ্গে তার বিয়ের চেষ্টা কল্লেন না কেন? তাহ'লে ত আর আপনাকে দেনা কত্তে হ'তো না।

অ। আমায় মাপ্ করবেন। আমার বংশে কেউ কখনো ছেলের বিয়েয় টাকা নেন নি, আমি তা কি ক'রে কর্‌ব।

বি। আমার বংশেই কি কেউ কখনও টাকা নিয়েচে? এখন এই একটা সুবিদে ভগবান জুটিয়ে দিয়েচেন, তাই নিচ্ছি। এটাতে ত আর লোক-সান নেই?

অ। ন্যায়ের হিসাবে যথেষ্ট লোক্‌সান। একথা নিয়ে তর্ক করা বৃথা। যার যেরূপ অভিরুচি। ফল কথা, টাকা সম্বন্ধে আপনি যেরূপ প্রস্তাব কল্লেন, আমি তাতেই রাজী।

বি। তবে একখানা ষ্ট্যাম্প নিয়ে আপনি কালই হুগলীতে রাধারমণ বাবু উকীলের বাসায় যাবেন, আমিও টাকা নিয়ে সেখানে হাজির থাক্‌ব; সময় ত আর বেশী নেই।

অমূ। যে আজ্ঞে।

---

(৬)

অমূল্যচরণ বিমলাচরণের প্রস্তাব মতেই কার্য্য করিলেন, কিন্তু ফুলশয্যার বাবদ টাকা খতে তুলিয়া দিলেন না, তাহা যথারীতি পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত রহিলেন। শুভদিনে শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল। প্রায় দেড়শত বরযাত্রীর সমাগম হইয়াছিল, অমূল্যচরণ তাঁহাদের আদর-আপ্যায়নের কোনোরূপ ত্রুটী করিলেন না, বিবাহান্তে বিভূতি-ভূষণ বরযাত্রীবর্গের সহিত পংক্তি ভোজন করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অমূল্যচরণের অবস্থা সচ্ছল না হইলে ও তাঁহার

আত্মীয়-স্বজন কুটুম্বসাক্ষাতের সমাগম যথেষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং বাসর ঘরে শিক্ষিতা মহিলাগণের বাহুল্য একটু বেশীই হইল। মনোরমা বিভূতিভূষণকে বলিলেন,—'শুনেচি আপনি বেশ গাইতে পারেন, কবি রজনীসেনের বরপণের গানটী করুণ না শুনি।'

বিভূ। আপনি ভুল শু'নেচেন, আমি গাইতে জানি না।

১ম মহিলা। গাইতে না জান্‌লে, গাইতে পারে এমন ক'নে খুঁজ্‌চিলেন কেন?

বিভূ। যে গাইতে না জানে, তার কি গান শুন্‌বার সাধ হয় না? তবে যে বাঁধতে না জানে, তার খাবার সাধ হবে না!

১ম। না খেয়ে মানুষ বাঁচ্‌তে পারে না, কিন্তু গান না শুন্‌লে মানুষ মরে না। বলি, গেরস্ত ঘরের বৌ-ঝির গান শেখ্‌বার দরকার কি? তারা কি থিয়েটার কত্তে যাবে?

বিভূ। ওটাও ত একটা বিস্তে, জানা থাক্‌লে হানি কি?

২য়। না থাক্‌লেও হানি নেই। তবে আপনি হাকিম লোক, এখন ছোট হ'লেও সময়ে বড় হবেন, তখন যদি 'বল নাচে' যেতে হয়, বা পাঠাতে হয়।

বিভূ। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব, শিক্ষা-দীক্ষায় দুজনেরি সমান অধিকার থাকা উচিত। শিখে রাখ্‌লে হানি কি?

১ম। উচিত হ'লে সে অধিকারটা দেওয়া হয় না কেন?

বিভূ। হচ্চে বই কি? এখন যে মেয়েরা বি, এ, এম্‌. এ, এম্‌, বি, এমন কি,-বি, এল পর্য্যন্ত পাশ দিচ্ছে।

২য়। এজন্যেই বুঝি এখন বিনে টাকার মেয়েদের বর মিলে না?

বিভূ। এ ধারণা আপনাদের ভুল।

২য়। ভুল কি করে বল্‌চেন মশায়! এখন যে বরের বেসাতী ক'ত্তে হ'লে বিনে টাকায় মিলে না, তা কি আপনি জানেন না?

বিভূ। বিনা টাকায় মিলে না, একথা মেনে নিতে পার্‌চিনা। তবে, সমাজে জনকতক লোক এমনতর আছে, যারা ছেলের বিয়েটাকে একটা ব্যবসা ক'রে তুলেচে। তারা ভদ্রসমাজ থেকে তফাৎ ব'লেই আমি মনে করি। আমি যে বার এম্‌, এ, দিই, সেবাবেই স্নেহলতার দুর্ঘটনা। তখন কল্‌কেতায় অনেক সভা-সমিতি হয়, তাতে আমাদের কালেজের প্রায় দু'শ ছেলে, বিয়ের টাকা নেবে না ব'লে সই করেচে। ফলে এ ভাবে টাকা যারা নেয়, তারা যে ছেলে বেচে, তার আর ভুল নেই। আর এই টাকার দাবিটার আমি কোন একটা হেতুই ত দেখ্‌তে পাই না! একজন জন্মাবধি মেয়েটী খাইয়ে-পরিয়ে, সংসার কর্‌বার মতন তৈরি ক'রে আমার সংসারে দেবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে এক কাঁড়ি টাকা ও দেবে! এর যে কোন লজিক (lopic) নেই।

মনো। লজিক আছে বই কি? ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবার খরচার কথাটাই লজিক।

বিভূ। ছেলেকে লেখাপড়া শেখান নিজের স্বার্থের জন্যে, ক'নের বাবার স্বার্থের জন্যে নয়। যেখানে নিজের স্বার্থ, অপরে তার জন্যে টাকা দেবে কেন? জামাই রোজগার ক'রে কখনো শ্বশুরকে খেতে দেয় কি?

মনো। আপনার এ সকল যুক্তিতর্ক কি তবে শুধু পরের জন্যে?

বিভূ। পরের জন্যে হবে কেন, সবারই জন্যে।

মনো। তবে আপনি নিজেকে নিজে বিক্রী কল্লেন কেন?

বিভূ। সে কি কথা? আমি নিজেকে কি করে বেচলুম?

মনো। আপনি নিজেকে নিজে বেচে না থাকুন, আপনার বাবা আপনাকে বেচেচেন ত?

বিভূ। কেন, বাবা টাকা নিয়েচেন নাকি?

মনো। নগদ টাকা নেন নি বটে। বাবা বাড়ী-বাগান বাঁধা দিয়ে অপর জায়গা থেকে টাকার যোগাড় কর্‌ছিলেন, আপনার বাবা নিজেই বাঁধা রেখেছেন, দেড় হাজার টাকার খত লিখিয়ে নিয়ে ৫০০৲ টাকা দিয়েছেন, বাকী আপনার মূল্য বাবদ রেখেছেন।

বিভূ। আমার কথা আপনারা বিশ্বাস কর্‌বেন কি না জানি না, ফলে আমি এসকল কথার বিন্দুবিসর্গও জানি না। যা হোক্ আমাকে আধ ঘণ্টার জন্যে বাইরে যেতে অনুমতি দিন।

মনো। তা হচ্চে না। শেষকালে সেই 'বিবাহ বিভ্রাটের' বরের মত ক'রে বস্‌বেন কিনা, কে জানে।

বিভূ। না হয়, বাবাকে একবার ভেতরে ডাকুন!

মনো। কেন, আজ এ রাত্তিরে আর তাঁকে ডাক্‌বার দরকার কি? কাল সকালে যা হয় বল্‌তে কইতে পারবেন না?

বিভূ। আজ না হ'লে আমি শান্তিতে রাত্‌টা কাটাতে পার্‌ব না।

উপসংহার।

বিমলা বাবু অন্দরে আসিলে বিভূতিভূষণ বলিলেন,—"বাবা আপনি নাকি বরপণ বাবদ হাজার টাকার খৎ লিখিয়ে নিয়েছেন?

বি। হাঁ নিয়িচি।

বিভূ। আমি একথাটা একটুকু জান্‌তে পারি নি কেন? আপনি জানেন, আমি বিয়েতে টাকা নেবার বিরোধী। তা ছাড়া, টাকা নেবনা ব'লে আমি প্রতিজ্ঞাপত্র সই করেচি, তাও ত আপনি জানেন?

বি। জানি বটে, কিন্তু সংসারটা দেখেই আমি ক রেচি।

বিভূ। সংসারে যে অনেকে টাকা নেন না, সে দিকটা দেখ্‌লেন না কেন? এরূপ ভাবে টাকা নেওয়া, আর ছেলে বেচা যে একি কথা, তাকি আপনার মনে হয় না? আমি আপনার এক মাত্র ছেলে; আপনার যা আচে, আমিই তার একমাত্র ভোগের পাত্র; তার উপর আমার আয় এখন মাসে দু'শ টাকা। আপনার কিসের অভাব যে আপনি আমায় বেচে টাকা নিলেন? যার সঙ্গে চিরকালের একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক পাতান হ'ল, যাঁর বাড়ীতে সময়ে সময়ে আমার যাতায়াতের সম্ভাবনা রয়েচে, তার বাড়ী-ঘর বাঁধা রেখে এ ভাবে টাকা নেওয়া, আমার পক্ষে কতটা গর্হিত কাজ, তা হয়ত' আপনি কল্পনায়ও আনতে পার্‌চেন না। আলিপুর থেকে যাঁরা এয়েচেন, তাঁদের প্রায় সকলেই ডেপুটী, সবডেপুটী, মুন্সেফ, উকীল। এরা জানেন, কোনরূপ যৌতুক নেওয়া হয় নি। যদি একথাটা প্রকাশ হ'য়ে পড়ে, তাহ'লে যে আমার আর মুখ দেখাবার যো থাক্‌বে না। নগদ টাকার বদলে অমূল্য বাবুর বাড়ী-ঘর বাঁধা রেখেচেন; একথাটা যে আরও জঘন্য। যদি আমায় চান, তা'হলে এই দণ্ডে খৎ ফেরৎ দিন। যতক্ষণ তা না কর্‌চেন, ততক্ষণ আমি আর বাড়ী যাচ্ছিনে, এখান থেকে বরাবর আলিপুরে চ'লে যাব।

বি। আমি যে ঘর থেকে নগদ পাঁচশ' টাকা বের ক'রে দিইচি রে! এ যে আমার বড়ই কষ্টের টাকা। খৎ নয় ফিরিয়ে দিলুম, এ পাঁচশ' টাকার কি হবে?

বিভূ। তা দিয়েচেন বেশ ক'রেচেন; আমি আপনাকে এ টাকাটা দেব।

বি। তুই দিলে যে আমারি দেওয়া হ'ল।

বিভূ। তাতেই বা ক্ষতি কি? আপনার আছে, তাই দিয়েচেন। কাকে দিয়েচেন? আপনার ছেলের বিপন্ন শ্বশুরকে দিয়েচেন। এ ত আত্মীয়-স্বজনের কর্ত্তব্য কাজ। হিন্দু শাস্ত্রের মতে শ্বশুর ত পঞ্চপিতার অন্যতম। তাঁহাকে বিপদ্ থেকে মুক্ত করাত আমারও কর্ত্তব্য। তাই

আপনার পা ধ'রে এই ভিক্ষা চাচ্ছি, আপনি এখনি খৎ ফেরৎ দিন। আমার আর একটী ভিক্ষা এই যে, আজ থেকে আর আপনি অমূল্য বাবুর কাছ থেকে ফুলশয্যে প্রভৃতি কোন ব্যবদে কিছু দাবি কর্‌বেন না, তিনি স্বেচ্ছায় যখন যা দিতে পারেন তাই নেবেন।

বিমলা বাবু খৎ খানি বিভূতির হস্তে দিলেন, বিভূতি খৎ খানি এবং ১০৲ টাকার দশখানি নোট শাশুড়ীর পায়ের উপর রাখিয়া প্রণামান্তর বলিলেন,—'এই টাকা দিয়ে আপনি ফুলশয্যার তত্ত্ব পাঠাবেন। দেনা ক'রে কোনরূপে লৌকতা কত্তে যাবেন না। আমার আর একটী ভিক্ষা এই যে, এখন থেকে নির্ম্মলকে মেসে না রেখে আমার সঙ্গে থাক্‌তে বল্‌বেন। আমার বাসা নির্ম্মলের কালেজের খুব কাছে। নির্ম্মল আমার বাল্যবন্ধু। সে হিসেবেও আমার সঙ্গে থাক্‌বার তার অধিকার আছে।

টীকা-টিপ্পনী।

ধন্বন্তরির দ্বিতীয় বর্ষ শেষ হইল, কিন্তু অনেকের নিকট এখনও প্রথম বর্ষের মূল্য বাকী আছে! ধন্বন্তরি যাহাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে, ও হইতেছে, তাঁহারা অনায়াসে এই সামান্য মূল্য দিতে পারেন; সম্ভবতঃ বিস্মৃতিই না দিবার একমাত্র কারণ। আশা করি, এজন্য আর আমাদিগকে অসুবিধা অনুভব করিতে হইবে না।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত নিলমণি মুখোপাধ্যায় প্রণীত "সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালার ইতিহাস" নামক এক, খানি বই তৃতীয় ও চতুর্থ মানের পাঠ্য। এই গ্রন্থে লিখিত আছে, "সেনবংশীয় রাজগণ জাতিতে বৈদ্য ছিলেন না। তাম্রফলকাদিতে ক্ষোদিত দানপত্রাদি দর্শনে জানিতে পারা যায়, তাহারা চন্দ্রবংশীয় ও ক্ষত্রিয়।"

সাহিত্য পরিষদের শাস্ত্রী মহাশয়ের কৃপায় আজ কাল অনেক তাম্রফলকই আবিষ্কৃত হইতেছে। তাম্রফলকটা যখন বেওয়ারিস জিনিস, তখন ইহার আবিষ্কারে আর কোন বিঘ্ন-বাধা নাই! যা-তা একটা খাড়া করিয়া পরিষদ-প্রিভি-কৌন্সোলে হাজির করিলেই পাশ হইয়া যায়! এই শ্রেণীর ভ্রমপ্রমাদ পুর্ণ বই কচি ছেলেদিগের পাঠ্য করিয়া যে সর্ব্বনাশ করা হইতেছে, তাহার প্রতীকারের আশা অল্প।

রবিঠাকুর কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছেন শুনিয়া দেশশুদ্ধ লোক আনন্দে নৃত্য করিতেছেন বলিয়া শুনি। অনেকে বলিতেছেন, রবিঠাকুর কবিতা লিখিয়াই বাহাদুরী লইতেছিলেন, পেছনে এক দল ভক্তও বেশ যুটিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে 'ঋষি' পর্য্যন্ত গড়িয়াছিল। তিনি সহসা কাব্যকানন হইতে এক লম্ফে রাজনীতির শিখরদেশে উঠিয়া পড়িলেন কিরূপে, এ প্রশ্নটী লইয়া এখন বিষম বিভ্রাট উপস্থিত। কিন্তু যাঁহারা ইহাতে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন না যে, এখন কল-কারখানার মরসুম; কলে সহজে জিনিষ প্রস্তুত হয়। কলে গ্রন্থকার হয়, কলে সাহিত্যিক-উপন্যাসিক হয়, কলে উপাধির গঠন হয়, রাজনীতিক হইতে পারা যাইবেনা কেন?

কিন্তু ঠাকুর মহাশয়ের এত তাড়াতাড়ি রাজনীতিক পাণ্ডা না হইলেই যেন ছিল ভাল। সম্প্রতি পৃথিবীটা ঘুরিয়া আসিয়াছেন, মাথাটা একটু গরমই থাকিবার সম্ভাবনা। কিছু দিন বোলপুরের শান্তি

নিকেতনে বাস করিয়া শান্তিলাভের পর রাজনীতিক জগতে পা বাড়াইলে ভাল হইত। তাহা হইলে বোধ হয় প্রবীণ, বিজ্ঞ, বহুদর্শী রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়ান সঙ্গত কি না, তাহা বুঝিবার সম্ভাবনা ছিল। ইহা ছাড়া আরও একটী কথা আছে। রাজনীতি-ক্ষেত্রটা 'ঋষি'দিগের অগম্য। রবিভক্ত বালখিল্যের দল অতি অল্প দিন হইল, তাঁহাকে 'ঋষি'র তক্ত দিয়াছেন; ত্রিরাত্রি অতিবাহিত হইতে না হইতেই সহসা তাঁহাকে তক্তচ্যুত করিয়া রাজনীতিক সিংহাসনে বসাইলে পাছে বদহজম হয়, প্রবীণ, বিজ্ঞ বহুদর্শীরা এই আশঙ্কাই করিয়া থাকেন। রায় বৈকুণ্ঠনাথ, চিকিৎসা ব্যবসায়ী না হইলেও বৈদ্য সন্তান; এ সকল বদহজমের হজমিগুলি তাঁহার নিকট আছে বলিয়া যাঁহারা মনে না করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত।

অর্থাভাবে কন্যার বিবাহ দিতে পারিতেছেন না, আমরা বৈদ্যসন্তানদিগের নিকট হইতে প্রতি দিন এরূপ চিঠি পাইতেছি। কোন কোন স্থান হইতে এরূপ সংবাদও পাওয়া যাইতেছে যে, দুই তিনটী অপোগণ্ড শিশু লইয়া জননী অনাহারে অথবা অর্দ্ধাহারে জীবন যাপন করিতেছেন, তাহার উপর বিবাহযোগ্যা কন্যা শতগ্রন্থী বস্ত্রদ্বারা লজ্জা নিবারণ করিতেছে! এ সকল বিষয় ধন্বন্তরিতে প্রকাশ করিতে গেলে স্থানের সঙ্কুলনান হয় না। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, বঙ্গের বৈদ্যসন্তান মাত্রেই এসকল সংবাদ অল্প বিস্তর অবগত আছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এই পরম অনিষ্টকর সমাজবিধ্বংসী প্রথার তিরোধান কল্পে কেহই তেমন মনযোগ বিধান করিতেছেন না! বৈদ্যসন্তানগণ এসম্বন্ধে উদাসীনতা পরিহার না করিলে অচিরে যে বৈদ্যসমাজের অস্তিত্ব লোপ পাইবে, তাহা একটীবার ভাবিয়া দেখা উচিত।

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী ইউনিভার্সিটী কমিসনের মেম্বর হইয়াছেন, এসংবাদে সম্ভবতঃ দেশশুদ্ধ লোক সুখী হইয়াছেন। কিন্তু দুই একজন লোক দুঃখে ক্ষোভে জ্বলিয়া মরিতেছেন! তাঁহারা নিজে বেশ জানেন যে, তাঁহাদের অথবা তাঁহাদের আত্মীয় অন্তরঙ্গের মধ্যে এমন কেহ নাই যে,এই পদের আশা করিতে পারেন! তথাপি দুঃখ! তথাপি ক্ষোভ!! এটাকে পরশ্রীকাতরতার প্রকট বিকাশ বলিলে অপরাধ হয় কি? স্যর আশুতোষের কথায় ইউনিভার্সিটী ওলট্ পালট্ হয়, স্যর আশুতোষ যাহা বলেন, খোদ বড়লাট বাহাদুর সে কথায় সায় দিয়া যান,—এটাও স্যর আশুতোষের একটা অপরাধ নাকি? বাঙ্গালীর আত্মসম্মান জ্ঞানের পরিচয় ইহাতেই পাওয়া যায়!

আর পাওয়া গিয়াছে, এবারকার কংগ্রেসে কেল্লায়! বাঙ্গালী বুদ্ধিমান ও চতুর বলিয়া জগৎ যে খ্যাতি ছিল, এবারকার কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির বৈঠকে সে খ্যাতিটুকু লোপ পাইয়াছে। সমগ্র ভারতের মতের প্রতিকূলে দাঁড়াইবার প্রয়াস পাইয়া বাঙ্গালী স্বার্থপর, মিথ্যাবাদী, ষড়যন্ত্রকারী এবং আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে! দেশের মঙ্গলসাধনে যাঁহারা শ্রম ও অর্থ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত বলিয়া পরিচয় দিবার প্রয়াসী, তাঁহারা এতদর্থে অভিমানটুকু উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত, এটাকে কেমনতর স্বার্থত্যাগ বলিয়া মনে করা যায়! সামান্য অভিমানটুকু বিসর্জ্জন দিতে যাঁহাদের সাহস নাই, তাঁহারা দেশোদ্ধার করিতে সাহস করেন কোন লজ্জায়, আমরা তাহা কল্পনায় আনিতে অসমর্থ।

ভিন্ন দেশ হইতে ভিন্নধর্ম্মী কেহ আসিয়া যদি আমাদের মঙ্গল চিন্তা করে,—আমাদের জন্য যদি তাহার জীবন উৎসর্গ করে, তাহাকে আমরা

হইব কেন? যাঁহারা দেশের নেতৃত্ব করিতেছেন, লোকমতের প্রতি যে তাঁহাদের লক্ষ্য নাই, একথা মিথ্যা নহে। এবারকার কংগ্রেসী খেলায় বাঙ্গালী ক্রীড়কবর্গ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যেরূপ কার্য্যকলাপ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে রঙ-পালিশ মাখাইয়া-তাঁহারাই সমগ্র সভ্যজগতের চক্ষে ধরিয়াছেন! ইহা ছাড়া এহেন নেতৃবর্গের মধ্যে কাহারও কাহারও বাগ্মীতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে না পারিয়া ব্যথিত হইয়াছি। কংগ্রেসের জন্ম হইতে এ পর্য্যন্ত যত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা বেশ মনে আছে, কখনও ভুলিব বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এরূপ ঢলাঢলি হইতে ত কখনও দেখি নাই! বাঙ্গালী এ লজ্জা কি দিয়া ঢাকিবে বুঝিতে পারি না!

আনি বেশান্তের অভ্যর্থনা দেখিয়া মনে হইল, এই বিদেশী মহিলার প্রতি দেশের ছোট-বড় সকলেরই মন আকৃষ্ট। কথাটা নিতান্ত উপেক্ষনীয় নহে। জনসাধারণ কেন এত আকৃষ্ট, এ প্রশ্নের উত্তরে, বেনারস হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার কথা বলিতেই বোধ হয় যথেষ্ট হইতে পারে। খ্রীষ্টান মহিলা হিন্দুরধর্ম্মের জন্য—হিন্দুসমাজের মঙ্গলের জন্য স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া এদেশবাসিনী হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা অলৌকিক স্বার্থত্যাগের পরিচয় আর কি হইতে পারে? তিনি সম্প্রতি যে অন্তরীণ-শাস্তি ভোগ করিয়াছেন, বাঙ্গালী ও কিয়ৎ পরিমাণে তাহার বিষয়ীভূত বলিয়া অস্বীকার করিতে পারা যায় না। অতএব নিতান্ত দুঃখেই বলিতে হয়, বাঙ্গালী কৃতজ্ঞতার সম্মান রক্ষা ক্রমে ক্রমে বিস্মৃত হইতেছে! এটা শুভ চিহ্ন নহে।

পূজা যত নিকটবর্ত্তী হইতেছে, কাপড়ের দুর্ম্মূল্যতার প্রতি আমাদের ততই দৃষ্টি পড়িতেছে; আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়, "বেঙ্গলী" প্রমুখ কোন কোন ইংরেজী দৈনিকে কেহ কেহ একটু আন্দোলন করিতেছেন, কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। ভেজাল ঘৃত সম্বন্ধে যেরূপভাবে আন্দোলন হইয়াছিল, কাপড় সম্বন্ধে তেমনটী হইলে, এসম্বন্ধেও একটা কিছু হইবার আশা করা যাইত। যাহা হউক, পূজা অতিবাহিত হইলেই যে, কাপড়ের আর প্রয়োজন হইবে না, এরূপ নহে। এই আন্দোলন যাহাতে কার্য্যকরী হয়, দেশের নেতৃবর্গ সেদিকে একটু দৃষ্টি রাখিলে বোধ হয় জনসাধারণের একটু উপকারের আশা করা যায়।

আজ কাল মধ্যবিত্ত লোকের কষ্টের পরিমাণ কেন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার খতিয়ান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাঁহারা চাকরীজীবি, ভবিষ্যৎ লাভের আশায় তাঁহাদের বর্ত্তমান আয়ের একটু লাঘব হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ, খাদ্যদ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি। তৃতীয় কারণ কন্যাদায়। প্রথমোক্ত দুইটী কারণের প্রতীকারের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অশ্রুজল ফেলিতে হইতেছে, কিন্তু তৃতীয়টীর জন্যও যে চক্ষের জল ফেলিবার প্রয়োজন হইবে, দেশের অবস্থা দেখিয়া তাহা বেশ বুঝা যায়। আমরা ত বলি, কর্ত্তৃপক্ষ এদিকেও একটু দৃষ্টি করুন।

'বিলাত ফেরতা বাবুর দল' ও 'ইংরেজীশিক্ষিত বাবুর দল' বলিয়া কোন কোন মহাপুরুষ দেশের নেতৃবর্গকে বিদ্রূপ করার একটী সংজ্ঞা গড়িয়া লইয়াছেন! কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, ইংরেজী শিক্ষিত এবং বিলাতফেরতা ব্যতীত সমাজে কাহাকে মানুষ বলিয়া স্বীকার করা যায়? কর্ত্তৃপক্ষই বা কাহাদিগকে দেশের লোকের প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ উপাধি লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে 'হোমিওপ্যাথিক ভোজে' একটী

টিকী রাখিলেই যদি মনুষ্য পদবাচ্য হইবার যোগ্য হয়, শীর্ষদেশে চৈতনের ট্রেড্ মার্কা ঝুলাইয়া যবনিকার অন্তরালে কুক্কুটমাংস ভক্ষণে রসনার তৃপ্তিসাধন যদি ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক হয়, দিনে 'একষ্ট্রীমিষ্ট' রাত্রে 'মডারেট' সাজা যদি দেশহিতৈষণার পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে সমাজে দেশোদ্ধারকের অভাব থাকে না। দেখা যায়, এ হেন মহাপুরুষেরাই আজকাল দেশোদ্ধারের পাণ্ডা বলিয়া পরিচয় দিবার প্রয়াসী! বলিহারি যাই ভণ্ডামী দেখিয়া!

ব্যবসায়ী মাত্রেই স্ব স্ব ব্যবসার সম্মান রক্ষার জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া ব্যবসা পরিচালনে প্রবৃত্ত হয়। কাঁসারীরা ধর্ম্মঘট করিয়া বাসনের একটা দর বাঁধিয়া লইয়াছে, নির্দ্দিষ্ট দর অপেক্ষা কমে বেচিলে সমাজে দণ্ডিত হয়। পুস্তক বিক্রেতারাও তেমনতর একটা নিয়মের বাঁধাবাঁধি করিয়া লইয়াছেন। আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকমণ্ডলীর সকলে সমবেত হইয়া আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাবলীর একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্য বাঁধিয়া লইলে ভাল হয় বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে আর বাজারে মকরধ্বজ, চ্যবনপ্রাশ, মদনানন্দমোদক, এবং শাস্ত্রীয় ঘৃত তৈলাদি, যে যাহা ইচ্ছা দরে বিক্রয় করিতে পারেন না, ঔষধগুলিরও মানইজ্জত বজায় থাকিবার একটা সুবিধা হয়। আশা করি, কবিরাজ মহাশয়েরা একথাটা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

সাহিত্য পরিষদের কেলেঙ্কারী দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। নিতান্ত বাধ্য হইয়াই বলিতে হইতেছে যে-শিক্ষিত পদস্থ বৈদ্যসন্তানেরাই পরিষদের সম্প্রদায় বিশেষ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইতেছেন। সেদিনকার মাসিক অধিবেশনে, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্, এ, শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম্, এ, বি, এল, এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রমুখ বৈদ্যসন্তান বর্গের প্রতি সভাপতি রায় চুনিলাল বসু বাহাদুরের ব্যবহার সভাসমিতির সভাপতির কর্ত্তব্যোচিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বরং ইহাই বুঝা যায় যে, যাঁহারা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায় বৈকুণ্ঠনাথের কার্য্যে উচ্চকণ্ঠে দোষারোপ করিয়াছিলেন পরিষদের বৈঠকে সভাপতির পার্শ্বে বসিয়া তাঁহারাই সভাপতির তদনুরূপ কার্য্যের অনুমোদন করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই! দেখিতেছি সমাজে নির্লজ্জতার রাজত্ব বেশ বিস্তৃতিলাভ করিতেছে!

পরিষদের সৃষ্টি হইতেই আমরা ইহার সহিত সংসৃষ্ট ছিলাম, পরিষদের পরিপুষ্টি সম্বন্ধে আমরাও অল্পবিস্তর চেষ্টা করিতে ক্রটী করি নাই; কিন্তু যখন দেখিলাম, পরিষদের পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রদায় বিশেষের একচেটিয়া আধিপত্যও পরিপুষ্ট হইতে লাগিল, 'সাহিত্যপরিষদের' নামের পরিবর্ত্তে ইহার * * * * পরিষদ নামে উক্ত হইবার যোগ্য হইয়া উঠিল, তখন আমরা ইহার সহিত সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। তাই আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি, বৈদ্যসন্তান মাত্রেরই পরিষদের সহিত সম্বন্ধ রাখা উচিত নহে। আজকাল যাঁহারা পরিষদের কাণ্ডারী, তাঁহাদের ধারণা, পরিষদে বৈদ্যের সংশ্রব না থাকিলেও বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমাদের ধারণা, এই পরিষদে বৈদ্যসন্তান নিয়তই নিগৃহীত হইবেন।

কংগ্রেস কেলেঙ্কারী মিটিয়া গিয়াছে, দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। কিন্তু একটী বিষয় চিন্তা করিয়া বড়ই দুঃখ হয় যে, যে বিসম্বাদ পরিণামে মিটিয়া যাইবার সম্পূর্ণই সম্ভাবনা, তাহা ঢাকঢোল বাজাইয়া দেশ বিদেশের লোকের কর্ণ বধির করা হইয়াছে! ইহাতে কোন পক্ষেরই কোনরূপ

স্বার্থসিদ্ধি হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার সুবিধা পাইতেছিনা। ঘরে ঘরে যে ঝগড়া হয়, তাহা মিটিবার সম্ভাবনা থাকে, যাঁহারা নেতৃত্বের অধিকারের দাবি করেন, তাঁহাদের কি এই জ্ঞানটুকু থাকা উচিত নহে? দুই সতীনের কোঁদলের মত কোঁদল বাড়াইবার উদ্দেশ্যে যাঁহারা দেশবিদেশে দূত প্রেরণ করিয়া দলপুষ্টির প্রয়াস পাইয়াছিলেন,—এতদর্থে যাঁহারা অর্থব্যয়ে কৃপণতা করেন নাই, তাঁহারা এখন মনে মনে কি ভাবিতেছেন,জানিনা ; কিন্তু ব্যাপারটীর আদ্যোপান্ত ভাবিতে গেলে আমাদের লজ্জা বোধ হয়।

হেঁয়ালি!

প্রশ্ন।

পায়স-পিষ্টক খেয়ে বাবুর পেট হয়েছে ভার।
(তাই) শুনেই শুধু খালিপেটে পেট কাঁপলো কার ?
বাবুর পাতের প্রসাদ পেলে মাথায় করে' লয়!
(তাঁর) বাপান্ত গাল্ শুনেও তবু তাতেই কে দেয় সায়
(বাবু) হাঁসলে হাঁসে,কাঁদলে কাঁদে,তুড়িতে দেয় তুড়ী।
(বল) কোষ্ঠসাফের কালেও কে তাঁর চাপ ড়ে দেয় ভুঁড়ি ?

বদ্দি বামুন—ভদ্রঘরে এমন আছে যে,
(তার) মুখে আগুন, গলায় দুড়ি, ডুবে মরুক্ সে।

হেঁয়ালি!

উত্তর।

জ্যান্ত দেবীর বাহন সে যে, ময়লা কাপড় পিঠে।
'শেৎখানা' তার মুখে, তবু স্বার্থে বচন মিঠে।
বোঝার চাপে কোলকুঁজো সে, ঝাঁটার চোটে চলে।
(তবু) লাফিয়ে উঠে, পিঠের উপর ভাতের কাটী দিলে।

পর গোহালে জাব্না খেতে নিত্য রুচি তার।
পেটে ভরা 'বড় বিদ্যে' মুখে দাপ্‌ট সার।
(এরে) 'পণ্ডিতে চিনিতে পারে চক্ষের নিমিষে,
(শুধু) মূর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে।

জাতীয়-সংবাদ।

গত ১৫ই আষাঢ় সোণারঙ্গ নিবাসী ঢাকা জজকোর্টের নাজির শ্রীযুক্ত চন্দ্রপ্রকাশ দাশ গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান সীতেশরঞ্জন দাশ গুপ্তের শুভ-বিবাহ উক্ত গ্রাম নিবাসী বিশারদ বংশীয় শ্রীযুক্ত প্রিয়বন্ধু সেন গুপ্ত মহাশয়ের প্রথমা কন্যার সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সীতেশরঞ্জন M.A., B L. পাশ করিয়া এক বৎসর যাবৎ ঢাকাতে ওকালতী করিতেছে। প্রিয়বন্ধু বাবু রাঁচিতে সেক্রেটেরিয়েট আফিসে সামান্য বেতনে চাকরী করেন।

চন্দ্রপ্রকাশ বাবু ছেলে বিবাহ করাইয়াছেন কিন্তু তিনি কন্যার পিতার নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। তিনি ছেলে বিক্রয় করাকে যথেষ্ট ঘৃণা করেন, এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকেও নিঃস্বার্থভাবে বিনাপণে পটুয়াখালি স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত সেন গুপ্তের কন্যার সহিত বিবাহ করাইয়াছিলেন। তিনি আজ কালকার প্রথানুসারে ছেলেদের দ্বারা যথেষ্ট লাভবান হইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া সমস্ত বৈদ্যসমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।